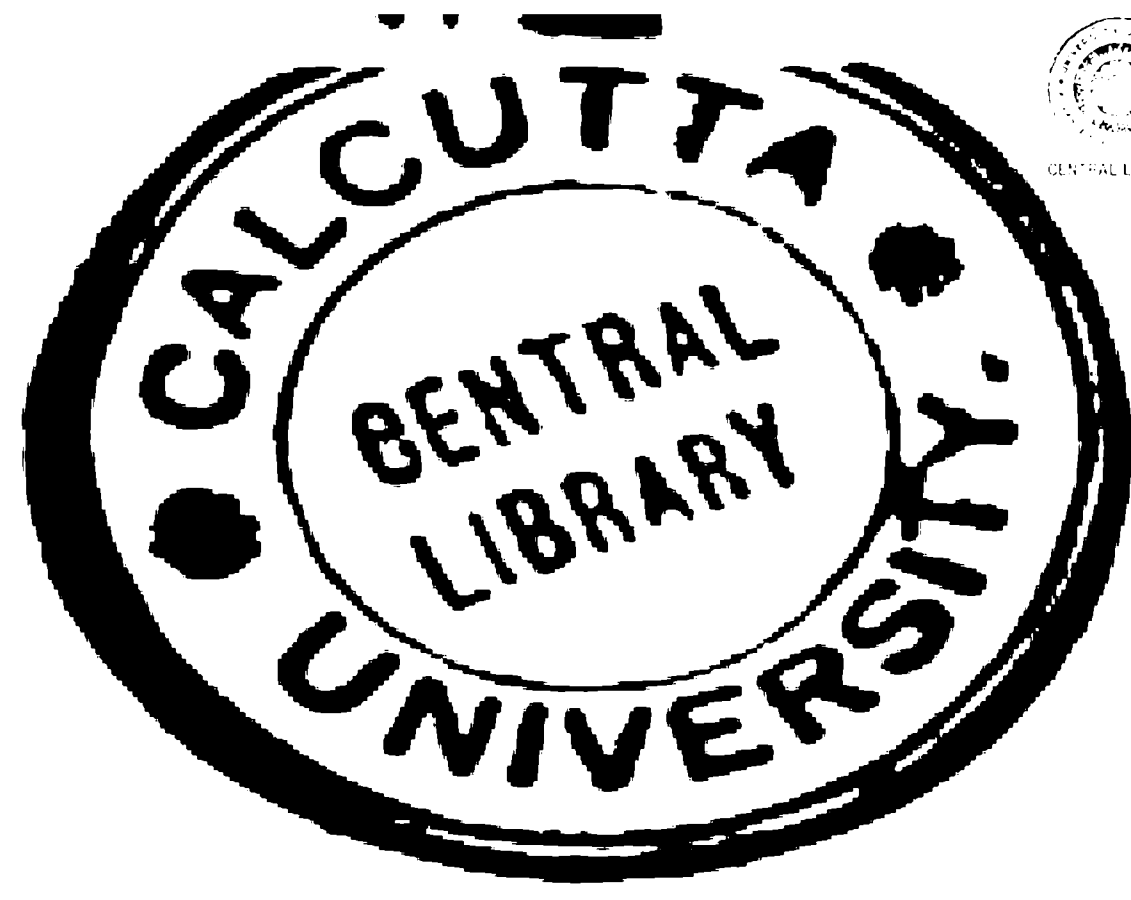




786
1016

নতুন সাহিত্য

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র

॥ সম্পাদক ॥

অনিলকুমার সিংহ

নবম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ (১৩৬৫)

সুধীর চক্রবর্তী ॥ ববীন্দ্রনাথের সংগীত বিপ্লব ৯

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মিথ্যার মাস্তা ২০

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ॥ জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত ২৭

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ আপস ১০৭

বিমল ভৌমিক ॥ আধুনিক চলচ্চিত্রের সমস্যা ১২১

তরুণ সান্নাল ॥ শিল্পী ও শিল্পী ১৩১

বীরেন্দ্রনাথ বক্রিত ॥ একটি অবিদ্বান মুহূর্ত ১৩৪

সুধীর রায়চৌধুরী, মৃগাক্ষেশ্বর রায়, অমল দাশগুপ্ত,

অচ্যুত গোস্বামী, মনীন্দ্র রায় ॥ সমসাময়িক

সাহিত্য ১৩৬

সুলেখা মহলানবীশ ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ১৫৭

করণাশঙ্কর রায়, শম্ভু মিত্র, ॥ চিঠিপত্র ১৫৯

প্রচ্ছদপট—পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

অনিলকুমার সিংহ কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,

কলিকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩নং শঙ্কুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২০

Interlude...

A good film, a music conference, a dance recital, an exhibition of art—these are joyful interludes in everyday routine. Here is a world of beauty and rhythm which the sculptors of old captured in stone as in the gracious figures of the 'Surasundaris' at Konarak. There are many such noble monuments in India. Visit them and, for a brief moment, you will be close to the springs of that tradition which inspires Indian art today.

SOUTH
 EASTERN
RAILWAY



P29956

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র
॥ সম্পাদক ॥
অনিলকুমার সিংহ

ন ত ন সাহিত্য

নবম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ (১৩৬৫)

সরোজ আচার্য ॥ সমালোচনার সূত্র ৯
অরবিন্দ পোদ্দার ॥ মূল্যবোধ ও সমাজ-ক্রান্তি ১৮
অনিলকুমার সিংহ ॥ মেঘলা আকাশ ২৯
অমলেন্দু চক্রবর্তী ॥ তিন পুরুষ ১২১
রাম বসু, স্বধাংশু ঘোষ, স্বধাংশু গুপ্ত ॥ সমসাময়িক সাহিত্য ১৪০
যুগাক্ষশেখর রায়, সীমান্ত সেন, বিমল ভৌমিক,
পূর্ণেন্দুশেখর পত্নী ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ১৪১
ঋষ গুপ্ত, বিমল ভৌমিক ॥ চিঠি-পত্র ১৬১

প্রচ্ছদপট—পূর্ণেন্দুশেখর পত্নী

অনিলকুমার সিংহ কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,

কলিকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩নং শম্ভুনাথ-পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২০

এ বছরও যথারীতি মননশীল ও মূল্যবান রচনায় ও
চিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার (১২ই অক্টোবর) আগে
প্রকাশিত হবে —

নতুন জাহিয শারদীয় সংখ্যা

শারদীয় সংখ্যায় থাকবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিবান
লেখকদের সাহিত্য-শিল্প সমাজনীতি বিষয়ক,
চিন্তাশীল প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা,
লঘু রচনা ইত্যাদি

* অন্ততম প্রধান আকর্ষণ *

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

শারদীয় সংখ্যার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমপক্ষে ২৫৬ ● দাম দু-টাকা মাত্র

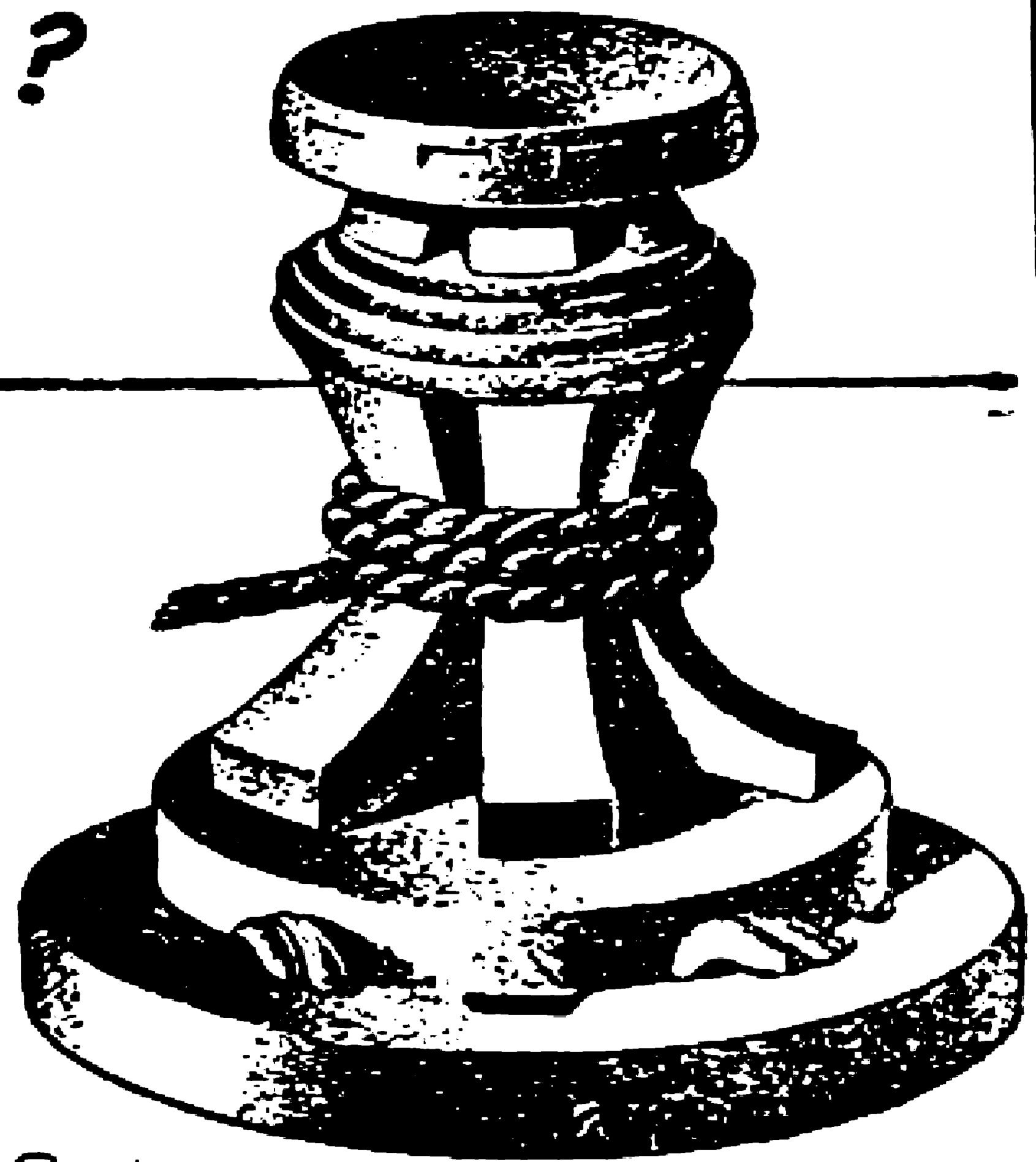
বার্ষিক টাঁদা ৬.০০ ॥ বার্ষিক টাঁদা ৩.০০

গ্রাহকদের প্রতি : যেসব গ্রাহক রেজিস্ট্রী ডাকে শারদীয় সংখ্যা আনাতে
চান তারা ৫ই অক্টোবরের মধ্যে অতি অবশ্যই আট আনার ডাক টিকিট
পাঠাবেন। স্থানীয় গ্রাহকরা আমাদের দপ্তরে এসে তাদের কপি নিয়ে যেতে
পারেন। যারা ডাক টিকিট পাঠাবেন না, তাদের পত্রিকা সাধারণ ডাকে
পাঠানো হবে। পত্রিকা ডাকে পোয়া গেলে দ্বিতীয়বার পাঠানো সম্ভব হবে না।

এজেন্টদের প্রতি : পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যের এজেন্টরা ১ই
সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার বুক করবেন। যারা ঐ সময়ের মধ্যে অর্ডার পাঠাবেন না,
তাদের বেশি কপি সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।

ক্যাপস্টান

মানেন কি ?



“নৌদ্র তোলাব যন্ত্র । দণ্ড দ্বারা

এই যন্ত্রে বজ্র কুণ্ডলিত করিয়া

নৌদ্র প্রভৃতি ভারী জিনিস

উত্তোলিত করা হয় ।” — অভিধানে

‘ক্যাপস্টান’-এর এই অর্থ পাওয়া যায় !

ক্যাপস্টান সিগারেটের নাম পর্বন্ত নেই ।

অথচ অভিধানে যাই বলুক, ‘ক্যাপস্টান’ বলতে

আজকাল লোকে ক্যাপস্টান সিগারেটই বোঝে । নৌদ্র

তোলাব যন্ত্রটি চেনা-চেনা মনে হতে পারে

কারণ যন্ত্রটির ছবি ক্যাপস্টান সিগারেটের

প্রত্যেকটি টিন আর প্যাকেটের ওপরে দেখা যায় ।

ধূমপানের এমন আনন্দ ক্যাপস্টান ছাড়া আর

কিছুতেই পাওয়া যায় না । ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই ।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র

॥ সম্পাদক ॥

॥ অনিলকুমার সিংহ ॥

ন তু ন সাহিত্য

নবম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ (১৩৬৫)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য এবং
অঙ্গীলতা ১৭

বিনয় ঘোষ ॥ নবযুগের চারণকবি মধুসূদন ৩১

অমিয়ভূষণ মজুমদার ॥ সুশোভনার কাহিনী ৩৯

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নব স্বয়ংবর ৫৯

মণীন্দ্র রায় ॥ সহকর্মিনী শ্রীলতা সেন ৭৭

তারাপদ রায় ॥ মায়ের জন্তে ৭৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ পাশ করার পর ৮১

সুধীর চক্রবর্তী ॥ উনিশ শতাব্দীর সাহিত্যে সংগীত প্রভাব ৯০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ এইটুকু ১০৩

অচ্যুত গোস্বামী ॥ সাহিত্যে বিয়োগান্ত-পরিণতি ১০৯

সুধীর করণ ॥ সীমান্ত বাংলার গ্রামদেবতা ১১৬



কাকে
ঘাড়ি
বজল?

দিন-রাত্রির সাদাকালো ছক

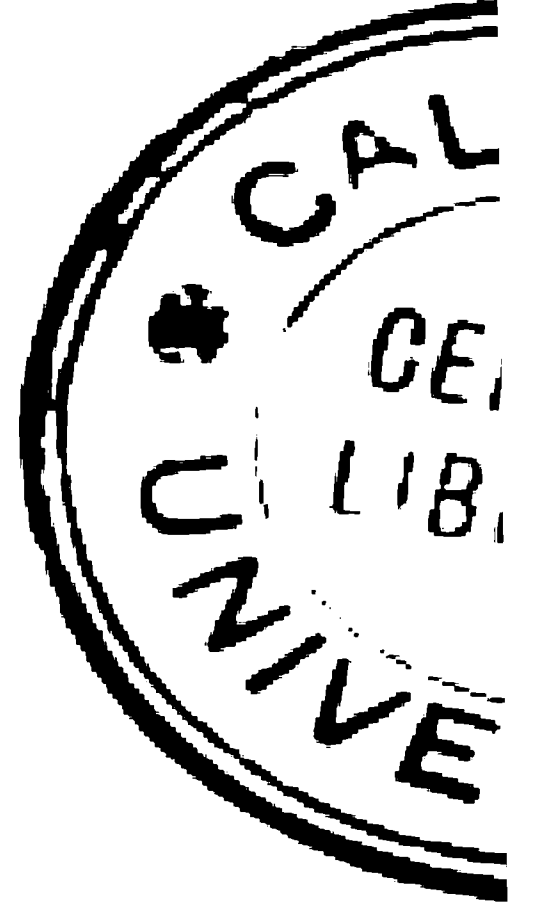
সময়কে ভাগ করে
চলেছে অনাদিকাল থেকে।
এমুগে প্রতিটি মুহূর্তকে যা'
দিয়ে ভাগ করা হয়, তার
নাম ঘাড়ি। সেই ঘাড়ির প্রয়োজনে
অথবা নিখুঁত মেসারসভের জন্যে

ফোন : ২৪-২০৫০

পদ্মনার ওয়াচ কোম্পানী

১০৫/১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

বিমলচন্দ্র ঘোষ ॥ কালোত্তীর্ণ ১২৩
 তরুণ সাত্তাল ॥ তরঙ্গে তরঙ্গে ১২৪
 চিত্ত ঘোষ ॥ খরগোশ ১২৫
 রামেন্দ্র দেশমুখ্য ॥ আগ্নেয়গিরি ১২৭
 শংকর চট্টোপাধ্যায় ॥ ডায়েরির পাতায় : ১৩৬৪ ১২৮
 অমল দাশগুপ্ত ॥ গ্রহণের আলো ১২৯
 বিজ্ঞান ভট্টাচার্য ॥ লোহার বাসর ২১৫
 যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ॥ কুমীর ২২৭



শারদীয় সংখ্যার সমস্ত অলংকরণ, ভেতরের ছবি ও প্রচ্ছদপট এঁ কেছে
 পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

‘নতুন সাহিত্য’র লেখক, গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা
 শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের আন্তরিক শারদীয় প্রীতি সম্ভাষণ জানাই।

ইনীলকুমার সিংহ কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
 কলিকাতা—১৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩নং শমুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০

ফোন ২২-২২২৩

বোর্ডনা

চশমা বিক্রেতা ও
 চক্ষু পরীক্ষক

মেন:- ৮-এ, লাল বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১
 শাখা:- ১১৭৭, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি:- ২৬



CAPSI&H

দিল্লী, কোলকাতা, বোম্বাই অথবা বাঙ্গাল
নর, পিকিং অথবা মস্কো, লণ্ডন অথবা
নিউইয়র্ক, কোনটাই নয়, কিন্তু সে একটা
দেশ। ধরা বাক, দেশটির নাম ব্যবহার।
এখানকার অধিবাসিরা বাঙালী। পোষাকে,
আচারে, ব্যবহারে, সব কিছুতেই তারা
বোর বাঙালী। দেশটা ছোট, খুব ছোট।
কিন্তু শৃঙ্খলার বদলে এখানের বিপুল
পবিত্রপ্রধান। নীতিবিশিষ্ট বৈরাচারী
শাসন এখানে সদাই বিদ্যমান।
এখানকার নিয়মকানুন এমনই বিচিত্র যে
কোন হুঁহ, সামাজিক ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন
লোকের সহ্যভীত। তাই রাজধানীতে
এই সম্পর্কে অভিযোগ পৌছেছে। তাঁরা
তদন্তের জন্য একজন বিশেষ পদমর্যাদা-
সম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্যবহারে পাঠানোর
মনোস্থ করেছেন। তাঁর আসার পর যে
সমস্ত অবিখ্যাত ঘটনা ঘটলো তাই নিচেই

ছায়া
চিত্র ৩৩
**রাজধানী
থেকে**
গোপাল মুক্তি ইন্সপেক্টর জেনারেল অবলম্বিত

জিলাটে মৃণাল জেন পরিচালিত নির্মল মিত্র
সম্পাদিত তচিকেন্তা ঘোষ
প্রথম উপল দঃ-কলী বন্দ্যোপাধ্যায়-মঞ্জু দে-মঞ্জু দে-মঞ্জু দে
জহর-জীবন-হরিশ-শ্যামলাল-অমর-মান প্রিয়দীপ
• পরিবেশনা-সুপার পিকচার্স •

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র
॥ সম্পাদক ॥
অমিলকুমার সিংহ



নবম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ১৮৮০ (১৩৬৫)

দীপ্তি ত্রিপাঠী ॥ আধুনিক উপন্যাস-চিত্তা ৯

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পকর্ম ২১

• অমল দাশগুপ্ত ॥ আমলা-তত্ত্ব ৩০

বিমল ভৌমিক ॥ তেউ গুটবার আগে ৩৯

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ॥ পুঁই-পালং-এর সাদ ১২৪

অন্নদাস্ত রায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুধীর করণ ॥ সমসাময়িক সাহিত্য ১৪৮

নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ১৫৬

প্রচ্ছদপট—পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

সুনীলকুমার সিংহ কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,

কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০

আপনার টিকিট ?

তেনে টিকিট চেয়ে টিকিট-পরীক্ষক
তার কর্তব্য কাজই করেন—
এ'তকাল তার ওপর হানলা করবেন না।
এদেশে বিনা-টিকিটে
যাত্রীর তো অভাব নেই—
সেইজন্যই টিকিট পরীক্ষার প্রয়োজন।
আপনার হয়তো টিকিট আছে,

ও'ব'লে, টিকিট দেখতে চাইলে
আপনার তা' দেখানো কর্তব্য।
নমুনা-পরীক্ষার মতো মাঝে মাঝে
হ' একজনের টিকিট দেখা তার কাজ নয়,
আর, ম'খ দেখে আপনার মনের
কথা কেনে নেবার ক্ষমতাও তার নেই।
সুতরাং টিকিট পরীক্ষার সময় আপনাকে
তিনি বাদ দেবেন কেমন ক'রে ?
হয়তো ঘুমোচ্ছেন, বা, বিশ্রাম করছেন—
কিন্তু আপনার সুবিধামতো সময়ের জন্ত
অপেক্ষা করতে হ'লে তার পক্ষে সুস্থভাবে
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই,
আপনার কাছে টিকিট চাইলে চ'টে উঠবেন না।
অপেক্ষা করার মতো সময় কোথায় তার ?



পূর্ব রেলওয়ে

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লব ॥ সুরধীর চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

ধনধান্যপুষ্প-ভরা বাংলাদেশে সংগীতও ফুলের মত মানুষের মনে ফুটে রয়েছে। রূপ থেকে প্রতিক্রম ঘিরে তার অগ্নান সৌরভ। সংগীতের শুভপ্রাণের শোভাময় প্রকাশ বাংলাদেশের নগর ও পল্লীজীবনের শ্রামাঞ্চল কেন্দ্রে। ভোরের অশ্রুট আলোর আকাশের নিচে মাঠে মাঠে চাষের গান। নবীনবয়স দিনে আউল বাউল সাঁই দরবেশের নৃত্যোচ্ছল গান। মধ্যদিনের নীরব ছপুয়ে গোকুল-চরানো রাখালিয়া গান। এ ছাড়াও জারি সারি মুর্শিদা ভাওয়াইয়া গান। তারপর গোখুলির হায়মান আলোর গোকুল রেণুর পথ বেয়ে যখন প্রবীণ সূর্য বিদায় নেয় তখন নদীর কালো জলে ভাটিয়ালের করুণ আর্তিনাদ। রাতে কীর্তনের আসর, পাঁচালী আর কথকতা। পূজোপার্বণে যাত্রাগান, পালা গান, কবি আর তরঙ্গা গান। উল্লাসের দিনে খ্যামটা আর বুমুর। ব্রতকথা আর পারণের দিনে শতনাম গান, পৌষপিঠের গান, মনসার গান। আবার জনপদ থেকে দূরে তমালসারির দেশে মাদলের তালে তালে আদিম সারল্যের আদি গান। এদেশে নতুন শিশু জন্মালে তাকে ঘিরে গানের আনন্দ। এদেশে মৃত্যুর পর, মৃত মানুষের প্রীতি ভালবাসা বেজে ওঠে করুণ গানের সুরে। এই সংগীতের দেশে সার্থক-জনম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ।

গীতাত্মপ্রাণ বাংলাদেশে বর্ষব্যাপী সংগীতের আসর আজও গ্রামাঞ্চলে লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র সমকালে আরও প্রদীপ্ত মহিমায় ছিল। এই গীতাত্মতা বাঙালীর শতাব্দী প্রবাহিত উত্তরাধিকার। যে কোন মৌলিক শিল্পীই প্রধানতঃ স্বদেশের সংগীত ধারাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেন। সংগীতের ইতিহাসকার সেন্সিল গ্রে সেইজন্যই মন্তব্য করেছিলেন, A great work of art is primarily regarded as the synthesis of previously existing elements, the outcome of several centuries of evolution. রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের মৌল স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রারম্ভেই তাই বাংলাদেশের শতাব্দীপ্রবাহিত সাংগীতিক বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য করা দরকার।

প্রত্যেক দেশের মত বাংলাদেশেও আদি সাহিত্য প্রয়াস সংগীতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। ফরাসী ক্রবাদুরদের মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গৃঢ় সাধনার ইঙ্গিতও বাংলার সংগীতে অভিব্যক্ত। গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মূলতঃ গীত-নাট্য এবং

অভিজাত সুর সমন্বয় সমৃদ্ধ। এ ছাড়া বন্দনামূলক কীর্তি গান, মঙ্গলমুচক মঙ্গল-গান, বাউল জাতীয় সাধন সংগীত এবং কাহিনীমূলক রামায়ণ-মহাভারত ও মনসা বা চণ্ডী ইত্যাদির পালাবদ্ধ পাঁচালী গান প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে। চৈতন্যপূর্ব এই সব বাংলা গানে লিরিকগুণের একান্ত অভাব। সুরের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ষড়ঙ্গ সমন্বিত প্রবন্ধ সংগীত কিংবা বিশিষ্ট লোকায়ত চণ্ডে রূপায়িত হত বাংলার গান। যুগ এবং যুগান্তরকে একই মাল্যবন্ধনে বেঁধেছিলেন চৈতন্যদেব। পরমকরুণায় তিনি সবকিছুই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে ঘিরে বাংলাদেশের প্রথম সংগীত-বিপ্লব। সংগীতকে তিনি ধর্মসাধনায় যুক্ত করেছিলেন। লীলা বা পালাকীর্তন, পদাবলী কীর্তন এবং নামকীর্তন এই ত্রিমুখী সংগীত প্রবাহে বাংলাদেশের কয়েক শতাব্দীর প্রাণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। পালাকীর্তনের মধ্যে চৈতন্যপূর্ব যুগের নাট্যরসের ফলশ্রুতি এবং পদ-কীর্তনে চৈতন্যপরবর্তী যুগের লিরিকের পূর্বসূত্র। নরোত্তম যে কীর্তনের রূপবদ্ধ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রবন্ধ সংগীতের সমন্বয় না রূপদের ধর্মালুগত তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে কীর্তনের ভাবরূপ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ ও সখীপ্রসঙ্গ বাংলার সংগীতে শাস্ত্রত গীতৌবিষয় এবং কীর্তনের সুররূপও দীর্ঘপ্রবাহিত। কীর্তনের লিরিক গুণ কতদূর শক্তিশালী ছিল তার প্রমাণ শাক্ত সংগীত। শুদ্ধ তাত্ত্বিক অভিচারের ভূমি থেকেই বৈষ্ণব গীতিসুরের অনুসরণে সৃষ্ট হয়েছে রামপ্রসাদ কমলাকান্তের শাক্ত পদাবলী। সুরের মাধ্যমেই সম্ভবতঃ তাঁরা আগমনী ও বিজয়ার মর্মবাণী অনুভব করেছিলেন। শাক্ত গীতিকারদের পরবর্তী কবিগুণালদের গানে রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ, সখী-সংবাদ এবং আগমনী-বিজয়াই মৌল প্রসঙ্গ। উনিশ শতাব্দীতে প্রথম সম্পূর্ণ সুরবিরহিত পাঠ্যকবিতা লিখেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু ঐ শতাব্দীর সাহিত্যপ্রয়াসে যে ব্যক্তিত্বের ভূমি তা প্রস্তুত করেছিলেন অষ্টাদশ ও উনিশ শতাব্দীর দীর্ঘায়ু সংগীতনায়ক নিধুবাবু। তিনিই প্রথম প্রণয় সংগীত লিখে বাংলার সংগীতে ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। রামমোহন রায়, উনিশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিরা এবং গিরিশচন্দ্র সাহিত্য-সাধনার সমান্তরালে সংগীত-সাধনা করেছিলেন। এঁদের গীতপ্রসঙ্গ ছিল আধ্যাত্মিক (ব্রহ্ম সংগীত), আগমনী-বিজয়া, প্রণয় এবং স্বদেশপ্রসঙ্গ। আরেকটি কথা স্মরণীয়; মনোমোহন বসুর অনুসরণে গিরিশচন্দ্র নাটকে সংগীতকে স্থান দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সাধনায় বাংলা সংগীতের একটি সমন্বিত রূপ প্রকাশিত।

প্রথম জীবনের অল্পশীলনে তিনি ধ্রুপদ ও হিন্দুস্থানী সংগীত আয়ত্ত করেছিলেন ; যুগপ্রচলিত আবহাওয়া থেকে টপ্পার মাদুর্ষ অনুভব করেছিলেন । কীর্তন এবং অন্যান্য লোকায়ত সংগীত ধারার পরিচয়ও তিনি পেয়েছিলেন । কিন্তু সর্বোপরি ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি শিল্পীমন ; যার জন্ম তিনি বিদেশী সুর এবং গীতিনাট্যের রীতি সহজেই বাংলাদেশে এনেছিলেন । বাংলার লোপমুখী লোক-সংগীতকেও তিনি বাংলার সংগীতে প্রাণতর ঐশ্বৰ্যে সংস্কৃত করেছেন ।

বস্তুতঃ, সংগীতকে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের সমাস্তুরালে রেখেছিলেন এবং সেইজন্মে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব বিচিত্রা, ভাষাবরন এবং রূপবন্ধে একজন মহাকবির পূর্ণচেতনার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করি । কাব্যে তিনি অনেক পূর্বাগত প্রসঙ্গের পুনর্নব বিচ্যাস করেছিলেন কিংবা ব্যক্তিত্বের আলোয় নতুন ব্যাখ্যা করেছেন । সংগীতের ক্ষেত্রেও এই প্রয়াস লক্ষ্যণীয় । তা ছাড়া তাঁর সাংগীতিক চেতনাই সংগীতের স্বরূপচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে । বাংলাদেশের আরও অনেক সংগীতনায়ক ছিলেন কিন্তু প্রবন্ধের মাধ্যমে সংগীত প্রাসঙ্গিক চিন্তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই করেছেন । সংগীতকে তিনি নাট্যে সংযুক্ত করে ব্যবহারমার্গেও উপস্থাপিত করেছেন । কাব্য, নাটক, গীতনাট্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকেই তাঁর সংগীত চেতনা বিতত । তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য, ধর্ম ও ব্যক্তিত্ব সাধনার স্বরূপটি সংগীতে শোভমান । এই সব সূত্র থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের সূচনা । তাঁর শতকান্তি সংগীতশিল্পের প্রাণ সন্ধান করা দরকার উৎসের দিক থেকে ; অর্থাৎ তাঁর চিরন্তন কবি-মনীষার পরিচয়ে ।

॥ ২ ॥

মনে হয়, কবিতা এবং সংগীত যে পৃথক এমন কোন চেতনা রবীন্দ্রনাথের ছিল না । সংগীতকে তিনি কবিতার সঙ্গে অদ্বৈত সম্পর্কে প্রাণবান মনে করতেন । সেইজন্মে কবিতা তাঁর সংগীতকে পথ দেখিয়েছে, সংগীতও তাঁর কবিতাকে পথ দেখিয়েছে । সঙ্ক্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি প্রথম জীবনের কাব্যগুলির সংগীতসম্বন্ধিত নাম লক্ষ্য করতে হবে এই প্রসঙ্গে । পরবর্তী কাব্যপ্রবাহেও এই সংগীতসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল ; তার প্রমাণ দু-ভাবে পাই । প্রথমতঃ, তাঁর কাব্যসংশ্লিষ্ট গান, যেমন কল্পনা, খেয়া মহুয়া বা বীথিকা কাব্যের গান এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিভিন্ন কবিতার পরবর্তী

সাংগীতিক রূপ ; এই প্রয়াস মানসী থেকে মহয়া-কাব্য পর্যন্ত বিস্তৃত । কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসব অনুষ্ঠানে সংযুক্ত করবার জন্য এবং প্রায়শই আপন খেয়ালে কবিতাকে সুরমণ্ডিত গীতরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । মানসী, কণিকা, কল্পনা, মহয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের অনেক কবিতার মূল রচনা এবং সংগীত রূপদানের মধ্যবর্তী সময় পাঁচ বছর, দশবছর এমনকি ত্রিশবছর পর্যন্ত । এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ সব কবিতার সাংগীতিক সম্ভাবনা চিরজাগ্রত ছিল । তাঁর কাব্যসংশ্লিষ্ট গানগুলিও কাব্যের পরিপূরক, যেমন খেয়া বা বীথিকা-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গানে সমগ্র কাব্যের মর্মবাণী উদ্ভাসিত হয়েছে ।*

এই প্রসঙ্গে বনবাণী-কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ । এই কাব্যের সমস্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে সংগীতের সূত্রে । ষড়ঋতুর বৎসরবিস্তৃত চক্রাবর্ত, বনস্থলীর নবীনতা এবং বিশ্বপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় বাণী সন্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বনবাণীর সংগীতাংশের সহায়তায় ।

রবীন্দ্র সংগীতের আলোর আরেকভাবে তাঁর কাব্যরস আশ্বাদ করা চলে । গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য এবং গীতালির গানগুলির সাহায্যে তৎকালীন রবীন্দ্র-মানসের ব্যাখ্যা করা যায় । এছাড়া বিদায় অভিশাপ কাব্যে সুরারোপ করবার প্রয়াস এবং কালিদাসের শকুন্তলায় সুরারোপ করবার আকাঙ্ক্ষার কথাও স্মরণীয় । এই সব আলোচনা করে সহজেই সিদ্ধান্ত করা চলে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবে কবিতার ভূমিকা মৌলিক ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিবর্তনে সংগীত কিভাবে সাহায্য করেছে সেটি লক্ষ্য করা দরকার । রবীন্দ্র কাব্যধারা অনুসরণ করলে দেখি, তিনি সর্বদাই দৃঢ়বদ্ধতা থেকে মুক্তির পথে পথিক হয়েছেন । তাঁর ছন্দোবন্দী কবিতা সুন্দরীকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন ‘বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে’ । এই মুক্ত ছন্দ থাকে কবিতার অন্তরে, বাইরে ষতি তাল মাত্রার পারিপাট্যে নয় । অর্থাৎ এই নব-প্রয়াসে ছন্দ থেকে ছন্দতরের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল । সংগীতে এই প্রয়াস আরো গভীর ভাবে লক্ষ্য করি । গাঠনিক ঋজু দৃঢ়তা থেকে তিনি সংগীতকে মুক্ত করেছেন সরল প্রবাহমানতায় । দীর্ঘ কাব্যনাট্য পরিশোধ (সমিল পয়ার) এবং চিত্রাঙ্গদা-য় (অমিল অক্ষরবৃত্ত) সুরারোপ প্রয়াসের মধ্যে

* এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য — ‘রবীন্দ্র কাব্য সংশ্লিষ্ট গান ও বনবাণী’ — সুধীর চক্রবর্তী ।
যাত্রী, শারদীয় ১৩৬৪

এই মুক্তি সূচিত। পরিশোধ কাব্য ১৩০৬ সালে রচিত ; এরই নৃত্যনাট্য রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালে। নৃত্যনাট্যটির পূর্ণ পরিণতি ১৩৪৬ সালে শ্যামা নৃত্যনাট্যে। মূল পরিশোধ কাব্যটি পয়ারে লেখা, সংগীতেও তাই। প্রবহমান পয়ারে সুরারোপের এই বিচিত্র প্রয়াসের একটু উদাহরণ দিই।—

পরিশোধ কাব্য

শ্যামা নৃত্যনাট্য

কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কাস্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী
বল্গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।

শ্যামা ॥ আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিত কাস্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী যা লো যা লো—
বল্গে নগরপালে মোর নাম করি
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উভয় রচনা মূলতঃ এক। কেবল সংগীতের প্রয়োজনে পয়ারকে পুনর্বিচলিত করা হয়েছে। চণ্ডালিকায় (মূল নাট্য রচনা ১৩৪০, নৃত্য নাট্যরূপ ১৩৪৪) এই মুক্তি প্রয়াস আরও অগ্রসর। সেখানে মূল গল্পকে সংগীতের মাধ্যমে বিচলিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন—

মূল গল্পনাট্য

পরিবর্তিত নৃত্যনাট্য

প্রকৃতি ॥ বললেম আমি চণ্ডালের
মেয়ে, কুয়োঁর জল অশুদ্ধ। তিনি
বললেন যে-মানুষ আমি তুমিও সেই
মানুষ। সব জলই তীর্থজল যা
তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে
তৃষিতকে।

প্রকৃতি ॥ ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো
মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কুপের বারি অশুচি।
আনন্দ ॥ যে মানব আমি সেই মানব
তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্তি করে
তৃষিতে,রে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই
তো পবিত্র বারি।

পয়ার এবং গল্পকে তিনি কি ভাবে সংগীতে যুক্ত করেছেন দেখা গেল। লক্ষ্যণীয় যে, ১৩৪০ সালে লেখা গল্প চণ্ডালিকা নাট্যকে ১৩৪৪ সালে তিনি সংগীত রূপে বিচলিত করেছেন। কিন্তু এর অনেক আগেই গল্পে সুর দেবার অভিপ্রায় তাঁর মনে জেগেছিল। ১৩৩৬ সালে লেখা একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“কখনো কখনো গল্প রচনায় স্তর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। ‘লিপিকা’ কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছি।” (পথে ও পথের প্রান্তে। ৩৯-সংখ্যক পত্র)। যখন এই অভিপ্রায় তাঁর মনে জেগেছিল তখন মহায়া থেকে পরিশেষ কাব্যের রচনা কাল। এই সময়েই ছন্দস্পন্দ থেকে গল্পের রাজ্যে উত্তরণকাল রবীন্দ্র কাব্যের। সংগীতেও গল্পকে মুক্ত করেছেন এই সময়। অর্থাৎ, এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীতে একটি বিপ্লব-কাল। কাব্যকে গল্পে মুক্ত করা এবং গল্পকে সংগীতে মুক্ত করার প্রয়াস মূলতঃ একই মুক্তি বিপ্লবের সমান্তরাল রূপ। ১৩৩৬ সালে চিত্রাঙ্গদা-র অমিল অক্ষরবৃত্তে সুরারোপ। ১৩৩৭ থেকে ১৩৩৯ সালের মধ্যে পরিশেষ কাব্যে গল্প কবিতার আভাস। ১৩৩৯ থেকে ১৩৪২ সালের মধ্যে পুনশ্চ ও শেষসংস্কৃত কাব্যে পূর্ণাঙ্গ গল্পকবিতা। আর ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৪ সালের মধ্যে সর্পিল পয়ারে লেখা পরিশোধ কাব্যের সাংগীতিক রূপ এবং চণ্ডালিকা নাটকের গল্পে সুরবিজ্ঞাস। এই দুই ধারাকে পাশাপাশি রাখলে রবীন্দ্র সংগীত চেতনার পূর্ণ পরিচয় এবং গল্পকবিতা সৃষ্টি-প্রেরণার পশ্চাদপট পাওয়া যায়। বোঝা যায়, কবিতা, গল্প এবং সুরের ত্রিবেণী সমন্বিত রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের একটি পর্যায়কে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার শুরু গীতনাট্যে, শেষ নৃত্যনাট্যে। সেই জন্মই চিরজীবনের নাট্য ধারায় সংগীত প্রধান স্থান নিয়েছে। উনিশ শতাব্দীর উপান্তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীতকে নাট্যে সংযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত বিপ্লবের একটি সূত্র নাট্যাবলম্বী। এই সূত্র দু-দিক থেকে আলোচ্য; প্রথমতঃ, নাটকের প্রাণ সঞ্চারের জন্ম সংযোজিত গান এবং দ্বিতীয়তঃ সমগ্র নাটকের মর্মবানী বা সংকেতছোতক গান। প্রথম ধারাটি বাংলা নাটকে প্রচলিত ছিল, দ্বিতীয় ধারাটি মূলতঃ তত্ত্ব নাট্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্ম নতুন ভাবে রচিত। রবীন্দ্রনাথ হার্ভার্ড স্পেন্সারের সংগীতবিষয়ক মতগুলির সমর্থক ছিলেন। সেই স্পেন্সার Music Drama-র অন্ততম উপাদান সংগীত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—‘The music is always to interpret the poetry’। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যে বিশেষ ভাবে সংগীত এই interpretation-এর কাজ করেছে। যেমন—

- ১ সর্ব স্বর্গতারে দহে তব ক্রোধদাহ (তপতী)
- ২ পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে (রক্তকরবী)
- ৩ আমি যে সব নিতে চাই সব নিতে খাইরে (অচলায়তন)

উল্লিখিত গানগুলি ঐ সব নাট্যের মর্মবাণীকে উদ্ভাসিত করেছে।

নাটকের সংগীতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাংলা দেশকে উদ্ঘাটিত করেছেন। শিলাউদহের তীরে তীরে যে গীতাত্মপ্রাণ বাংলাকে দেখেছিলেন তিনি, সেট আউল বাউল কীর্তনিসাদের বাংলা তাঁর নাটকে উপস্থিত। টমসন সাহেব এঁই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, এ বাংলা পুঁথিতে পড়া বাংলা নয়—অন্তরে অন্তরে চেনা। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ লোক সংগীত আবিষ্কারের সূত্রে গীতবশীভূত বাংলা দেশের হাট মাট বাটকে আবিষ্কার করেছিলেন মনে হয়। যে বাংলার বাউল-ভাটিয়ালি-রামপ্রসাদের সুর সংরাগ এঁই প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি। ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা, দর্ভকগণ কিংবা রক্তকরবীর ফসলকাটার গানে সেট চিরন্তন বাংলা দেশের সুনন্দ স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের আরেকটি পর্যায় নৃত্যনাট্যে গীত এবং নৃত্যের যোগাযোগ ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে জাভা বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের নৃত্যধারার ফলশ্রুতি লক্ষিত হয়। এঁই সব নৃত্যের অভিনয় একমাত্র দৃশ্যতঃ অমুভব করা সম্ভব বলে আলোচনার বিরত থাকলাম। শুধু দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। তাঁর ঋতুনাট্যে বর্ষব্যাপী প্রকৃতি উৎসবের যে বিপুল বিশ্বনৃত্য তার বনবাণী রবীন্দ্রনাথ বাংলার সংগীতক্ষেত্রে সংযোজিত করেছেন। পূব হাওয়া, মাধবী মঞ্জরী, যুখী মল্লিকার সেট সব অনতিশ্রুট সংলাপ আমরা শুনতে পাই। আর দেখতেও পাই ‘পিয়ালগুলি নাটের টাটে হাওয়ায় হেলে’। বুঝতে পারি, ‘আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে’।

নৃত্যপ্রাসঙ্গিক সংগীতের আর একটি তথ্য জানা যায়। “চণ্ডালিকা” নাটকের জন্য একটি দক্ষিণী তালের নাচের কথা ভেবে ‘আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা’ গানটি লিখেছিলেন। নাচের তালে যে তেহাই পড়ে তাকেই মিশিয়ে দিলেন ‘আয় তোরা আয়’ কথাটিকে তিনবার গাইয়ে।”

এইভাবে সৃষ্ট গানের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া গেলে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের আরেকটি স্তর আমরা দেখতে পাব।

॥ ৩ ॥

সংগীতের রূপবন্ধ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতবিদ এবং সাহিত্য-সমালোচক একযোগে রায় দিয়েছেন যে,

• রবীন্দ্রসংগীত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। পত্রিকা ১১১

সংগীতে, কবিতার মত শব্দ চয়ন, ইমেজ গঠন প্রভৃতি চলে না। সংগীতের শব্দ হওয়া উচিত কোমল, বিস্তারিত হওয়া উচিত ললিত এবং শ্রবণসুভগ (এই প্রসঙ্গে সেন্সিভ ডে লুইস বলেছেন, Words for music are like water-weed : they only live in the streams and eddies of melody. ...bold intense or closely-wrought images are inappropriate to verse written for music, since they tend to destroy the balance between the word pattern and the melodic line. সৌভাগ্যতঃ, রবীন্দ্রসংগীতে কাব্যের সমস্ত গুণই বর্তমান। শুধু কবিতা হিসেবেই সেইজন্য অনেকে রবীন্দ্রসংগীত পড়ে সুখ পান। দৃঢ় অক্ষরবৃত্ত, তৎসমশব্দবহুল মাত্রাবৃত্ত এবং লঘুচালের স্বরবৃত্ত, বাংলা কবিতার এই তিন ছন্দই রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত। ধ্বনিব্যঞ্জনাময় রবীন্দ্রসংগীতের ভাষাবয়নের কয়েকটি উদাহরণ—

- ১ নীলঅঞ্জনঘনকুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অধর হে গস্তীর।
- ২ নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
- ৩ নীলাঞ্জনছায়া প্রফুল্লকদম্ব বন

এই তিনটি উদাহরণের সাহায্যেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার বিশিষ্টতা প্রতীয়মান হয়। গানগুলি শুনলে এবং পড়লেও, বোঝা যায় যে, লুইসের আশঙ্কা রোধ করে এগুলি word pattern এবং melodic lineকে একত্রিত করেছে। সংগীতে ইমেজের অসারতা প্রমাণ করে যে যন্তব্য করেছেন তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। ঋতু-সংগীতগুলির অন্তঃস্থ ইমেজের প্রতি লক্ষ্য করলে লুইসের যন্তব্যেরই অসারতা প্রমাণিত হয়। সংগীতবিদ জেমস্ বিটল্ বলেছেন কবিতার শব্দ যোজনা হয় প্রথমতঃ তার Sense-এর জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ Sound-এর জন্য। সংগীতে তার বিপরীত পদ্ধতি। * রবীন্দ্রসংগীতে এই উভয় উদাহরণই আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে সংস্কৃত উচ্চারণ ভঙ্গিমার যে বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করেছেন তাও বিশেষভাবে আলোচ্য। কালিদাস প্রভৃতির সংস্কৃত নাট্যে যে সব গান আছে সেগুলি সংস্কৃতে লেখা নয়, প্রাকৃতে লেখা। অপেক্ষাকৃত কোমল ধ্বনি এবং সমীতবনের সরলতার জন্য এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন সংস্কৃত কবিরা।

* Essays : On Poetry and Music as they effect the mind
James Beattie.

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রায় তৎসমশব্দে, সন্ধি-সমাসে মণ্ডিত করে, তাঁর কয়েকটি গান লিখেছিলেন। উদাহরণ—

১ নমো নমো নমো ।

ভূমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য ;

অমৃত-অন্ন-ভোগ্য-ধন্য করো অন্তর মম ॥

২ তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নিখারিয়া গলিবে যে

প্রসূরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥

এই সমস্ত অসৌম্য সাহসিকতার মধ্যে, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের আরেক পর্যায়।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্র সংগীতে ভাব-বিপ্লবই সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি— তাঁর সংগীতের এই চতুরঙ্গ পর্যায়েই পূর্ব-ধারণার পুনর্নব বিস্তার লক্ষ্য করি। উনিশ শতাব্দীর ভক্তি-প্রবণতার আত্যন্তিকতা (যার প্রমাণ শাক্ত সংগীতে এবং গিরিশচন্দ্রের সংগীতে) রবীন্দ্রনাথের হাতে সংযত হয়েছিল। প্রথম জীবনের ব্রহ্মসংগীতগুলি বাদ দিলে তাঁর পূজা পর্যায়ের কোন গানকেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া চলে না। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি পর্যায় এবং ধেন্বা-কাব্যে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভব রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতে অভিসিদ্ধিত হয়েছিল তার রস ও রূপ বাংলার সংগীতে নতুন। ‘তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ’ বা ‘মধুর তোমার শেষ যে না পাই’ প্রভৃতি গানে মহৎ অনুভবের যে সব রত্নকণা আমরা পাই তা বাংলা কাব্যেও অনেকক্ষেত্রে দুর্লভ।

ভানুসিংহের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ রাধিকার রূপকে প্রেমের আতি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আপন অনুভবেই প্রেমের গান লিখেছিলেন; কিন্তু রাধিকার সেই রূপচিত্রটি রবীন্দ্র সংগীতে সর্বদাই মূর্তিমতী। প্রতি মুহূর্তে সখি ও সজনির শরণাকাজ্জিনী সেই প্রেমাস্থিতার প্রসঙ্গ বাংলার সংগীতে ভানুসিংহের দান। বৈষ্ণব পদাবলীর পুনর্নব বিস্তার হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রেমসংগীত আমরা পড়তে পারি।

উনিশ শতাব্দীর জাতীয় উদ্দীপনার ক্ষেত্রফল হিসেবে বাংলার অনেক কবি স্বদেশী কবিতা এবং গান লিখেছিলেন। হেমচন্দ্র-রঙ্গলাল প্রভৃতির কাব্য, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গণেশনাথ ঠাকুর প্রভৃতির স্বদেশী সংগীত বিখ্যাত। এই সব কবিতা ও গান পরাধীনতার তীব্র জ্বালা থেকে উৎসারিত; সেইজন্যই সম্ভবতঃ,

স্বদেশের প্রাক্তন গুণস্বরূপের পাঠভূমিকায় বর্তমান অবস্থায়, এই সব স্বদেশী সংগীতের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে হিন্দুমেলা ও সঙ্গীতমন্ডির সভার প্রেরণায় এই ধরনের কতকগুলি স্বদেশী সংগীত রচনা করলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাউল চণ্ডের যে স্বদেশী সংগীতগুলি লিখেছিলেন তাতে চেতনার রূপান্তর লক্ষ্য করি। এই স্বদেশী সংগীতগুলিতে ব্যক্তিনির্ভর, চারিত্রসম্পন্ন, প্রত্যয়ী কবিকণ্ঠ খুঁজে পাই। যে ভয় করবে না, নিশিদিন ভরসা রেখে যার মন প্রত্যয়শীল, বাতাস আর তুফানের অটুহাসিতেও যার না-ফেরার পণ, আপন বৃকের পাঁজর জালিয়ে নিয়ে একলা চলবার ব্রত যার—সেই দীপ্তপুরুষকে খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত বিশেষভাবে এই অগ্নি ব্যক্তিত্বের সুর সংযোজিত করেছে। গানগুলির সুরে বাউল ঢং; এটাও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ। বাউলের নির্ভয় জীবনচরণ এবং নিঃশব্দ পদচারণ এই সব গানে ধ্বনিত।

প্রকৃতি চেতনা রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনের কাব্যে ছায়া ফেলেছে। কিন্তু সংগীতে প্রকৃতি প্রসঙ্গ এসেছে পরে, জীবনের উত্তরাধে। কাব্যে এবং সংগীতে প্রকৃতির চেতনাও ভিন্ন। কাব্যে তিনি অন্ধ ভূমিগর্ভের উত্তাপ এবং মৌন বনবাণী অনুভব করেছেন; সংগীতে অনুভব করেছেন প্রকৃতি উৎসবের রূপলীলা। অবশ্য উভয় চেতনায় বিরোধ নেই; একটির রূপান্তর আরেকটি। কাব্যে যেখানে আছে বিশ্বের বোবা বাণী, সংগীতে তা-ই রূপান্তরিত হয়ে মনে হয়েছে, ‘বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা—ভাষাহারা নাচে’। রবীন্দ্রনাথ ঋতু-সংগীতে আরেকটি সুগাম্ভীর্য ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। বৃক্ষ, ঋতু, পূবহাওয়া, মেঘ ও তড়িৎবধু, যুথী ফুল প্রভৃতির রূপচিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপ্ত এক মহানটকের আভাস দিয়েছেন। যার পাদপ্রদীপের সামনে বিশ্বদেবের বিশ্বনৃত্য। এই সব ঋতু-সংগীতে কাব্য, নাট্য, সংগীত এবং নৃত্যের সমাহার ঘটেছে, যা বাংলার সংগীতরাজ্যে অভিনব।

বিভিন্ন ভাবান্দোলনে রবীন্দ্রকাব্যগুলি যুগের। সংগীতেও তাই। কয়েকটি বিশেষ তত্ত্ব, দার্শনিকতা ও সত্যদৃষ্টিতে মণ্ডিত হয়ে বারবার তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে যুগ্যতত্ত্বটি বিশেষ ভাবে আলোচনা করা চলে। রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে যুগ্য প্রসঙ্গ দ্রব পদের মতই নিত্য প্রত্যাবৃত্ত। প্রথম যুগের ভাষাসিংহের পদাবলীর একটি শ্লোক ‘যরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান’ তীব্র ভাব-বিপ্লবের ঢেউ তোলে। শ্যামপ্রতিম যুগ্যর কল্পনায় বৈকুণ্ঠ মহাজনদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে যুগ্যর ভয়ংকর রূপটি অনুভব

করেছিলেন তিনি। ‘মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে’ গানটির মধ্যে মৃত্যুর ভয়ংকরতা প্রকাশিত। কিন্তু শেষ বয়সে ধ্রুব শাস্ত্র অনুভবে তিনি মৃত্যুর মহিমা অনুভব করেছিলেন। ‘কেন রে এই ছয়ারটুকু পার হতে সংশয়’ গানটির মধ্যে ভাবসূক্ত শাস্ত্রতা লক্ষ্য করি। আর মৃত্যুর আগের বছর দার্শনিক অনুভবে লিখেছিলেন -

সমুখে শাস্তি পারাবার

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ॥

এই গানের পূর্ববীর সুরে কবির বিদায়লগ্নের পূর্বাভাস শাস্ত্র মধুরতায় সৃচিত হয়েছে। মৃত্যুর আলোয় এমন পরিপূর্ণ জীবনের গান আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিপ্লবের সমগ্র পরিচয় উন্মোচিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সম্ভবও নয়। সূত্র-সংকেতে সেই মহাজীবনকে অনুভব করতে পারি মাত্র।

এই প্রবন্ধের শেষ রেখা টানবার আগে শুধু একটি ঘটনা উদ্ধৃত করব। তার থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত সংগীত চেতনা। শাস্ত্রিদেব ঘোষ লিখেছেন, “বললাম, ‘নববর্ষের প্রভাতে বৈতালিকের জন্ত একটি নতুন গান রচনা করতে কি আপনার কষ্ট হবে?’ প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে তা বন্ধ রাখতে পারলেন না। বললেন, ‘সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি, মানবের জয়গান করিনি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।’”

এই গানটি হল—

ঐ মহামানব আসে

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

এখন আর মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে তাঁর চরণপাত হয় না। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ-শিহর জাগানো তাঁর সংগীতের পূর্ণ অনুভব কি আজও আমরা করতে পেরেছি?

মিথ্যার মায়া ॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যারা বলে তারা নিছক সত্য ছাড়া আর কিছু বলে না,—তারাষ্ট পয়লা নম্বর মিথ্যাবাদী—তাদের সঙ্গে, আমার পরামর্শ হল, মিশবেন না। আর যারা নিছক মিথ্যে কথা বলে আমার বারণ সঙ্গেও আমি জানি আপনি বারবার তাদেরই সঙ্গে মিশবেন। কারণ সাধারণভাবে মিথ্যাবাদীদের আমরা ভালবাসি। সংসার সূত্রের অমোঘ নিয়মে সত্যের প্রতি আমরা বিগতম্পূহ। মিথ্যা রঙিন। রঙিন বলেই মায়াময় মিথ্যা আমাদের প্রতিদিন-যাত্রায় শিরোধার্য। সেই উল্লে আমি যখন বলি যে আমি যা বলি তার নব্বুই ভাগই মিথ্যা, তখন আমার বন্ধুরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, বলে যাক অন্তত লোকটা নিরঙ্কুশ মিথ্যে কথা বলে না। জন্মান্তরের সংস্কারের মত সত্যটা কখনো কখনো লোকটার মুখে আসে। কিন্তু বহুজন প্রচারিত এ হেন compliments আমি সানন্দচিত্তে বরণ করতে পারি না একথা যখন তাদের নিবেদন করি তখন তাদের ব্যাখ্যায় আমি অধিকতর দ্বিষ্টমান হই। আমার নিয়ানন্দের হেতু হিসাবে তারা যা বলে তার নির্গলিতার্থ হল এই যে, আমি তাদের মন্তব্যের জন্ত বিমর্ষ নই, আমি বিমর্ষ নাকি এই কারণে যে আমার জিহ্বা অন্তত একটি সত্য ভাষণেও অযথা কলঙ্কিত হল।

Decay of lying নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে অস্কার ওয়াইল্ড সভ্যতা কেমন করে মিথ্যার মোহিনী শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তার ফলে সাহিত্যের জগতে কী দুর্দিন নেমে আসছে তার একটা মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। আমার কিন্তু সায়েবের সঙ্গে মূলেমূলেই তফাৎ। সাহিত্যের কথা জানি না—জীবনে কোথাও decay of lying ঘটেনি। আমার ধারণা সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতাও বেড়েছে। ঋষি বেকালে প্রতিবাসীত্যাগী গৃহী হয়ে অরণ্য-জীবন যাপন করত সেকালের ঋষির দুঃখে আমাদের চোখে জল আসে। দু-পাশে প্রতিবাসী নেই, মানে কাউকে ডেকে দুটো মিথ্যে কথা বলবেন এমন লোক নেই। মিথ্যে কথা না বললে যদি বা চলে, মিথ্যে কথা না শুনলেও কি চলে? এইখানেই তো সত্যি মিথ্যের তফাৎ। সত্যি কথা বললে যদি বা চলে, শুনলে চলে না। মিথ্যে কথা না বললে যদি বা চলে, না শুনলে চলে না। কাজেই ঋষিকে ডেকে প্রতিবাসী বসাতে হয় ঘরের পাশে। তারপরেই তাঁকে ছুটতে হয় ওকালতি পরীক্ষা দিতে। তারপরে উকিল হওন। প্রচুর মিথ্যা কথন। তারপরে অনেক পরে যত উকিলের এপিটাকে একথা

যখন লেখা থাকবে—Here lies an honest lawyer—তখন আমরা বই পড়ে
লেখা মন্তব্য করব—still lying.

সেইজন্মে প্রথম থেকেই দেরি না করে মিথ্যে কথার ওপর রচনা লিখতে শেখানো
উচিত—বিশেষতঃ বিজ্ঞানগণ্যে। সে-সব রচনার মডেল আমি কিছু কিছু ভেবে
রেখেছি। গোকুল ঘোড়ার রচনা যেমন করে ছেলেরা লেখে এ রচনাও ঠিক তেমন
করে লিখবে। বলবে “মিথ্যা একটি গৃহপালিত প্রাণী। ইহা মানুষের মত
দ্বিপদ বা গো-মহিষাদির জায় চতুষ্পদ নহে। ইহা বহুপদবিশিষ্ট দ্রুতগতি জীব।
মুহূর্তকাল মাত্র গর্ভধারণ করিয়া মিথ্যা এককালে অনেকগুলি শাবক প্রসব
করিয়া থাকে। তাহার কতকগুলি লাঁচিয়া থাকে। কতকগুলি কালক্রমে ঝরিয়া
যায়।” শুধু এ রচনার কোন উপসংহার নেই। কেননা মিথ্যে কথার কোন
উপসংহার নেই। মিথ্যার কেবল উপক্রমণিকা এবং বিস্তার থাকে। মিথ্যা
এক ধরনের উচ্চাঙ্গের গান। বরং বলা যেতে পারে তারও বেশি। উচ্চাঙ্গের
গান তান বিস্তার করে সমে ফিরে আসে। মিথ্যার কেবল তানবিস্তার আছে,
সম নেই। শুধু অফুরন্ত আলাপ।

তাই পাকা ওস্তাদ ছাড়া মিথ্যার তান বিস্তারে সকলে সমান* অধিকারী নন।
ক্যারিকেচারের ওস্তাদ যেমন এক কান পাগড়িতে চাপা দিয়ে আরেক কান হাত
দিয়ে ঢেকে গান শুরু করেন, মিথ্যার মালিকও তেমনি নিজের দু-কানে আঙুল
গুঁজে রটনাকার্য শুরু করেন। যদি নিজের স্বরে এবং স্বরে নিজেই বিভ্রান্ত হন
এই তাঁর ভয়। এ দক্ষতা অনায়াসে অর্জনীয় নয়। বহু সাধনার বহুদিবসের
প্রয়াসের ফলে কোন কোন ভাগ্যবান এ দক্ষতা অর্জন করেন। Decay of
lying-এর প্রখ্যাত লেখক উক্ত রচনায় Born liar এবং Born poet দেব
নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আমি Born liar কথাটি মানি না। অমৃত ভাষণ
অত সহজ বস্তু নয়। তা ছাড়া কবিতা এবং মিথ্যাচরণে বিস্তর ব্যত্থান, দুস্তর
ফারাক। কবিতা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সযুক্ত আবেগ। মিথ্যা হল এক্সপিরিয়েন্স
বিমুক্ত আবেগযুক্ত বিকৃতি বা ডিসটর্শন। প্রথমটা সহজসাধ্য, দ্বিতীয়টা
দুঃসাধ্য, কখনো কখনো অসাধ্য, যদি না সাধনাগত সিদ্ধি এর পশ্চাতে থাকে।
সেই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে যদিও poets are born not made
কিন্তু liars are made not born.

তথাপি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আমাদের অন্তরের টান। সত্যের সূর্যালোক
অপেক্ষা মিথ্যার রামধনু আমাদের প্রিয়তর এবং জানি যে সত্যের সঙ্গে অসত্যের

একাসনে ঠাঁই নেই। কেননা সূর্য বধন পূর্বে রামধনু তখন পশ্চিমে, রামধনু বধন পূর্বে সূর্য তখন পশ্চিমে। তেমনি সত্যের অলৌক প্রতিবিম্বই মিথ্যার রামধনু। কল্পনাপ্রবণ মানুষের কাছে তাই সত্যের কোন আকর্ষণ নেই। আপনি যদি কেবল সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তাহলে আপনার বলবার কথা সহর ফুরিয়ে যাবে। বন্ধুগণ, সত্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু মিথ্যা অসীম। সুতরাং যে মানুষ প্রতিভাবান বলে প্রচলিত হতে চান তাঁর পক্ষে সত্য প্রতিকূল পরিবেশ, মিথ্যার অসীম গগনে নবনব মেঘরচনা তাঁর পক্ষে লীলা, সেই তাঁর স্বক্ষেত্র।

আমার এ হেন বিবৃতির পক্ষে একটি মাত্র প্রমাণ আছে। সেটি হল এই যে মানুষ বধন সত্য বলে তখন সে তোতাপাখির মত মাত্র উচ্চারণ করে। কিন্তু সে বধন মিথ্যা বলে আন্তরিকতায় তখন সে ভাস্বর, উদ্দীপ্ত। মিথ্যার বেলাতেই মানুষ শুধু আন্তরিক হতে পারে সত্যের বেলায় নয়। কারণ সত্য পুনরাবৃত্তি, মিথ্যা রচনা। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মিথ্যা একটা শক্তিশালী আর্টফর্ম। এবং অন্য সমস্ত আর্টফর্ম-এর চেয়ে মিথ্যার মূল্য এইখানেই সমধিক। যে মিথ্যার আর্টিস্ট সদাসর্বদা তার রসবেত্তার সম্মুখসম্মানে, নগদ খাতিরে অভিসিদ্ধিত। গল্প লিখুন, গান বাঁধুন অথবা ছবি আঁকুন সকল প্রশংসা-বাণীই উচ্চারিত হবে নেপথ্যে। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আপনার সমজদারের সম্পর্ক পরোক্ষ। কিন্তু মিথ্যার আর্টিস্ট-এর ষাঁরা সমজদার মিথ্যার আর্টিস্ট তাঁদের সরাসরি খুঁজে বার করেন। তারপর স্বেদ কম্প রোমাঞ্চের মাধ্যমে সকৌতুক রসিকমণ্ডলীর মধ্যমণি হয়ে বিরাজিত আর্টিস্ট তাঁর শিল্পসস্তারের ঢাকা খুলে দেন। সমবেত জনমণ্ডলীর মন থেকে তখন অবিশ্বাসের নির্বাসন ঘটেছে—গল্পের গোকুলে গাছে ভুলে দিলেও কেউ আর সামনাসামনি আপত্তি করবে না। মায়ায় মিথ্যার ষাটকর তখন হয়তো মনে মনে আশ্রয় করে—গল্পের গোকুলে শুধু গাছে ভুললাম কেন? পক্ষীরাজ গোকুল করে আকাশে উড়িয়ে দিলাম না কেন। যা বাজার বোধহয় তাও চলে যেত।

হ্যাঁ, চলে যেত। কেননা সত্যের জলরঙের প্রতি আমাদের আসক্তি স্বল্প। সে স্থলে মিথ্যার বহুবর্ণ তৈলচিত্রে আমরা বৈচিত্র্য পাউ বেশি করে। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন বেদাগ জীবনে সত্যের জন্তু কোন প্রতীক্ষা পালন করা কাঁহাতক সম্ভব? সেই জন্তু লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না প্রতি আজডায় আসরে মজলিসে নির্ভেজাল সত্যভাষীর জন্তু কোন

শ্রদ্ধার আসন নেই। আপনি যদি প্রতি মুহূর্তে সত্য কথা বলেন আড্ডার পক্ষে আপনি একটি Bore। লুকাস সায়েব তাঁর Bores নামক রচনায় Boreদের রকমারিদের তালিকায় সত্যবাদী Boreদের কথা বলেননি বোধহয়। এরাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক Bore. রক্তকরবী নাটক দেখতে গিয়ে নয়নাভিরাম রক্ত গোধূলি দেখেছেন স্টেজের ওপর। আপনি মোহিত হয়ে গেছেন ঠিক সেই সময় সেই প্রাণান্তিক Bore (বাংলার বলুন সঙ্কশূল) সত্য বিতরণ যার ব্রত আপনার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করবে—ব্যাপারটা বুঝলি ছোটো লাল বাল্ব আর সাদা চাদর... ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। আপনিই বলুন এর চেয়ে মিথ্যাময়দের সঙ্গ অনেক ভালো কিনা। কিম্বা ধরুন বাংলা সিনেমা দেখেছেন দু-এক সিন দেখার পরই তিনি যখন আপনাকে অভয় দেবেন ভয় নেই শেষে মিল হয়ে যাবে বলুন তখনও আপনি ঐ একই কথা ভাববেন কিনা সত্যবাদী Bore-দের থেকে মিথ্যাবাদীরা অনেক বেশি সুসহ। অনেক ইনটারেস্টিং।

প্রাকৃত আড্ডায় যেমন মিথ্যাপ্রেমিক না হলে চলে না তেমনি মিথ্যাপ্রেমিক-দেরও আড্ডার আশ্রয় না হলে নাচার অবস্থা। কারণ মিথ্যার প্রেরণা আছে সত্যের নেই। সত্য আপনি অনুভব করেই চূপ করে বসে থাকতে পারেন। অপরে বিশ্বাস করল না করল আপনার ব্যয়ে গেল। মিথ্যা অপরে বিশ্বাস না করা ইচ্ছুক আপনার নিস্তার নেই। জেনে রাখবেন এর চেয়ে প্রকাশশীল বস্তু আর নেই। সেই জন্তে সত্যবাদীকে অসামাজিক হলে যদি বা চলে মিথ্যা ব্যবসায়ীদের সামাজিকতা প্রধান গুণ। আর অবস্থিৎ সামাজিকতাবোধ থাকার জন্তেই ভারত ইতিহাসের প্রাচীন রাজ্য-রূন্দের সভাকবিদের বিরচিত জীবনী প্রশস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন আপনি। কিন্তু সেদিনের রাজ্য-কুল সে কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তার ফলে সেই সব প্রাচীন প্রশস্তি-রচয়িতাদের নগদ বিদায় জুটেছিল অনেক বেশি। সে জায়গায় সত্য কথা বললে হয়তো শূলে যাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল।

প্রাচীন সভাকবিদের সঙ্গে আধুনিক এপিট্যাফ-রচয়িতাদের এক জায়গায় মিল আছে। একটি জীবিতের প্রশস্তি অপরটি মৃতের। এবং দুই-ই মিথ্যে কথা। ভারতেতিহাসের প্রাচীন স্মৃতিসন্ধানে Rock Edict-গুলি নাকি বিশেষ নির্ভরযোগ্য। Rock Edict never lies. এপিট্যাফ যদিও প্রায় শিলালিপি—

কিন্তু Epitaph always lies.। এপিটাক সব সময় মিথ্যে কথা বলে। তাই অষ্টম বর্ষীয়া সরলভাষিনী বালিকা কবরখানায় ঢুকে হরেকরকম এপিটাক পাঠ করার পর মন্তব্য করেছিল-- I wonder where they bury the sinners.

সত্য মিথ্যার প্রকারভেদ নিয়ে হু-কথা না বললে কিন্তু মিথ্যা প্রসঙ্গ শেষ হয় না। সত্য কয় প্রকার এ বিষয়ে লোকসমাজে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে সত্য দুই প্রকার—প্রিয় সত্য এবং অপ্রিয় সত্য। এসম্বন্ধে এক ভূয়োদার্শনিকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রিয় সত্য মানেই কিছু সত্য কিছু মিথ্যা। সত্য সাধারণতঃ অপ্রিয়। সেই জন্তেই কারো কাছ থেকে যখন শুনবেন সে আপনাকে বলছে—‘আমি তোমায় খুব ভালবাসি’ বুঝবেন খুবটা মিথ্যে। সে ক্ষেত্রে মিথ্যার প্রিয়-অপ্রিয় ভেদ নেই। মিথ্যা আমাদের সকলের কাছেই প্রিয় সদাসর্বদাই প্রিয়। মিথ্যা প্রিয় না হলে তাকে রচনা করে লাভ কী? রটনা করে মজা কী? মিথ্যের বুয়েরা শুধু মাঝেমাঝে নিজের কাছেই ফিরে আসে, এই যা, নইলে এ প্রসঙ্গে আর সবই কুশল। Truth is stranger than fiction একথা সত্য। কিন্তু ততোধিক সত্য বলেছেন যিনি বলেছেন fiction is stronger than truth তা না হলে ছাগল কুকুর হয় না ভগবান ভূত হয় না।

ব্যবহারিক জীবনেও দেখবেন যে সত্যের বিনাশ ঘটে। হামেশা না ঘটলেও, ঘটে। এবং বিনাশিত সত্য মিথ্যার ভূত হয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে। মিথ্যা স্বরূপ পরিবর্তন করে সত্যে পরিণত হল এ কখনো হয় না। এভাবে একদা সত্য ছিল কিন্তু আজ মিথ্যা, এমন ধরনের কতগুলি সার্বজনীন মিথ্যাকে আমরা সামাজিক ভাবে বংশানুক্রমে লালন করে থাকি। যেমন আমি বা আমরা যখন বলি ‘সূর্য উঠেছে’ কি ‘সূর্য পাটে বসেছে’ কিনা গ্রহণের সময় বলি ‘চাঁদের আন্ধেকটা খেয়ে গেছে’ তখন আমরা মিথ্যা কথাই বলে থাকি। একদিন আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞানে মনে হত সূর্য উঠেছে বা পাটে বসেছে, বা চাঁদকে খাচ্ছে রাহু। সেদিন ঐটাই ছিল আমাদের কাছে বাস্তব সত্য। আজ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মানুষ সত্যি সত্যি সত্যটা কী তা জেনেছে। কাজেই The sun rises in the east একথা এখন মিথ্যা। সূর্যের কাছে আমরাই ঘুরে গিয়ে হাজির হই। কিন্তু ও কথাকে আপনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। সমস্ত মানুষের সম্মতি নিয়ে এই মিথ্যাগুলি রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। কাজেই দেখছেন

মিথ্যা সত্যের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তবে বলতে পারেন মিথ্যারও সামাজিক ছাড়পত্র চাই, নইলে সে অচল।

এছাড়া আর এক ধরনের মিথ্যা আছে যেগুলিকে আমরা এখন ইয়তো আর তেমন দেখতে পাই না কিন্তু একদিন তারা মানুষের সমাজে রাজত্ব করেছে। এই ধরনের মিথ্যাকে আমরা socially necessary মিথ্যা বলতে পারি। ফসল ফলানো প্রভৃতি ব্যাপারে আদিম মানুষের ম্যাজিক প্রভৃতিতে বিশ্বাস আমাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা বিশ্বাস বা erroneous belief হওয়া সত্ত্বেও অভিপ্রেত ফল লাভের জন্য সংগ্রামে এগুলো যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করত একথা উপেক্ষা করা চলে না। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প গর্ডন চাইল্ড তাঁর Society and Knowledge নামক গ্রন্থে বলেছেন। গল্পটার আমরা হলে নাম দিতে পারতাম গুজবমাহাত্ম্য। প্রথম মহাবুদ্ধে যখন ইংলণ্ডের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন সেইসময় একদিন সারা ইংলণ্ডে গুজব রটল যে বিরাট একটি রাশিয়ান বাহিনী স্কটল্যান্ডে অবতরণ করেছে এবং কোণঠাসা ইংরাজ ও ফরাসী বাহিনীকে মদৎ দেওয়ার জন্য ইংলণ্ড হয়ে তারা ফ্রান্স ষাত্রা করবে। রায়টোসুর বাংলাদেশের মানুষ আমরা, কাজেই গুজবের চরিত্র যে কী তা আর আমাদের বোঝাতে লাগবে না। মৌর্যবংশে যেমন অশোক দি গ্রেট মিথ্যাবংশে তেমন গুজব দি গ্রেট। দেখতে দেখতে ইংলণ্ডে রুশসৈন্য অবতরণের সেই ‘বার্তা রটি গেল ক্রমে’। অধ্যাপক চাইল্ড বলেছেন যে কেউ কিন্তু চালুষ কিছু দেখেনি। তবে সকলেই যে-দেখেছে তাকে দেখেছে এবং এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে গল্পের হাত-পা গজাতে শুরু করল। খ্রীষুস্ত চাইল্ড সায়েব এই শশবিষাণের হেতু নির্ণয়করে তৎকালীন ইংলণ্ডবাসীর ইমোশনাল স্ট্রেসের কথা বলেছেন। নিদারুণ মানসিক হতাশার মধ্যে মানুষ যখন যে কোনদিক দিয়েই হোক আশার আলোক দেখতে চায় তখনই এই ধরনের গল্প বিশ্বাস করবার প্রবণতা বেড়ে যায়। সত্য বাই হোক, মিথ্যার এখানে একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। সুতরাং এ ধরনের সন্তান যুহুতোও আমরা বলতে পারি “সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল।” অবশ্য বলাই বাহুল্য মিথ্যার এ ধরনের ভূমিকা মানুষের ব্যবহার-সাপেক্ষ। মিথ্যার অন্য ভূমিকার কথাও আমরা জানি বলেই একথা বলছি। দাঙ্গার সময় বিহারে নোয়াখালির হিন্দু-নিধনের কাহিনী এবং পূর্ববঙ্গে বিহারে মুসলমান নিধনের কাহিনী রটনা সামাজিক শাস্তি প্রগতির বিরুদ্ধে মিথ্যার কামান দাগার কাহিনী।

মিথ্যা কী করে বলতে হয় এও কিন্তু এ প্রসঙ্গেই আর একটা প্রশ্ন। এর কোন বিধি-নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এ বিষয়ে কেবল একটাই সূত্র বাতলে দেওয়া যায়। মিথ্যা কথাটা প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস করে নেবেন। নিজেকে না বিশ্বাস করলে অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবেন না। এর পর জিজ্ঞাসা করতে পারেন—মিথ্যা বলতে হলে কী গুণের দরকার? কল্পনা-শক্তি আর স্মরণ-শক্তি। যে লোকের স্মরণশক্তি নেই সে যেন কখনো মিথ্যা বলতে না যায় কারণ কোথায় কোন্ মিথ্যা কী প্রসঙ্গে বলা হল এটা মনে রাখা দরকার। একই মিথ্যার বহু ধরনের সংস্করণ যে চালু করে সে নির্বোধ মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বখন ধরা পরে যাবে তখন কী করবেন? তখন? তখন একটু হাসি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শেষ কথা হল নির্ভয়ে মিথ্যা বলবেন। মিথ্যার পুরস্কারই আছে, কোন তিরস্কার নেই। ছেলেবেলায় আমার এক জ্যাঠামশাই বলতেন—মিথ্যে বললে নরকে যেতে হয়। নরকে নাকি একটি প্রকাণ্ড চুল্লি আছে। সেই প্রজ্জ্বলন্ত চুল্লির ওপর একটা নাকি ফুটন্ত তৈলপূর্ণ কটাহ আছে। মিথ্যাবাদীরা মরবার পর নরকে গেলে তাদের সেই কড়াইয়ে নিক্ষেপ করা হয়। আমাকে জ্যাঠামশাই প্রায়ই বলতেন, নরকে যেতে হবে তোকে, আর সেই কটাহে তোকে ফেলে দেওয়া হবে। তুই বড় মিথ্যে কথা বলিস।

জ্যাঠামশাই বেঁচে নেই। থাকলে এখন একটা চেনা গল্প একটু পান্টে বলে দিতাম। বলতাম : হে জ্যেষ্ঠতাত, সেই তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে কী আর জায়গা আছে? সে কবে ভস্মি হয়ে গেছে। স্মরণাং মর্তিভঃ। ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা। মায়াধীশ ব্রহ্মের মত নিঃসঙ্কোচে নব নব মিথ্যার জগত সৃষ্টি করেন।

জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত ॥ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

•• এক ••

কাচানো নীলাস্বরীর মত আকাশটাকেও সবিতার মনে হল মরা। শুধু আকাশ কেন, সমস্ত জীবনটাই মরা। মরা, মিথ্যে। অথচ যার জন্তে মরা তাকেই দরদ টেলে বলতে হবে, সৃজিত, তুমি ক-দিন আসনি। আমি আবার মরে যাচ্ছি।

সবিতা জানতো সৃজিত আজও আসবে না। তবু আসতেও পারে এই রকম একটা তৈরি-করা আশা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙলো সে। স্কুল থেকে শ্রামবাজার আসতে সময় লাগে আধঘণ্টা। শ্রামবাজার মোড় থেকে মানিকতলার মোড় পাঁচমিনিট, মোড় থেকে রাধারমণ বস্তু গলিটা কতই বা—খুব জোর মিনিট তিনেক। এতখানি সময় স্থির থাকে। পা গুনে গুনে হাঁটে। সংযত, গম্ভীর। তিরিশ বছরের তুলনায় বেশিই মনে হয় সেটা। কিন্তু দোতলার সিঁড়িতে পা দিলেই আলাদা মেয়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙে। ছলুনি ধায় সারা শরীর, গালের মাংস, কানের ছল, শাড়ির আঁচল টেলে ভারী বুকের রেখা।

সিঁড়িটা এসে বাক নিয়েছে উত্তরে। সিঁড়ির একটা বাক পর্যন্ত উঠে ঘাড় উঁচু করে তাকানোটা ওর অভ্যাস। দরজার সামনে কয়লার ঝুড়ি। জালানি কাঠ। বেঁয়া-ওঠা পাপোশ। কয়েক পাটি জীর্ণ জুতো। সবিতা তাকায় সেই জীর্ণ জুতোর জটলার দিকে একটা শাওলকে দেখবে বলে। ছেঁড়া, ময়লা, গোড়ালি-ধোয়া একটা শাওল। আর ঐ তাকানোর মুহূর্তটায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। ধবক করে ওঠে বুক। কালকের মত, তার আগের দিনের মত, আজও বুকটা একবার ধবক করে জলে উঠে হিম হয়ে গেল। সৃজিত আসেনি। দরজার সামনে শাওল নেই। আচ্ছা, ছুটুমি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না কি? যা সব ছুটুমি বুদ্ধি ওর মাথায় আসে।

আস্তুে দরজাটা খুলতে গিয়ে আঙুলের ডগায় যেন শরীরের সব শক্তি উঠে এল। ধড়াস করে দেওয়ালে খাঁকা খেল দরজাটা। কেউ চমকে উঠল না সে শব্দে। একটা লম্বা টিকটিকি কেবল মুখ ঘুরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তব্বত

করে দৌড়ে গেল শিকার ফেলে। চমকে উঠবার মত কেউ নেই ঘরে। কাঁদন কিংবা চিত্রা কেউ না। পাশের ঘরটা সবিতার শোবার ঘর। সেখানে তক্তাপোশের ওপর মিন্টু ঘুমোচ্ছে, বেকে, গোলা পাকিয়ে। মুখের ওপর মাছি ভন্ডন্। তার পাশে রান্নাঘর। বিস্তর মা ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। সমস্ত বাড়িটা চুপ। মৃত্যুর মত। বারান্দায় শুকনো কাপড় উড়ছে। একটা রঙীন হাউজ আর সাদা ক্রমালে জড়াজড়ি। নীচের টিউবওয়েলে বালতির লাইন। হাঁ-করা মুখ। সরু গলির ভেতর আটকে-পড়া মোটর গাড়ির কর্কশ হন। একবার বারান্দা আর একবার ঘর, এত করেও কিছু ভালো লাগছে না সবিতার। মিন্টুর বিছানায় বসে মাছি তাড়াল। তার ঘুমন্ত গালে চুমু খেল আলতো ভাবে। চোখের পাতার ওপর থেকে সরিয়ে দিলে পশমী চুল। নাকের ডগা থেকে মুছে নিলে কয়েকটা শিশিরের মত ঘামের বিন্দু। অন্য ঘরে অর্থাৎ সামনের ঘরটায় মেঝের ওপর বিছানা পাতা। কাঁদন কোথায় ঘেন গেছে। বিছানাটা গুটিয়ে বাবারও ফুরসত নেই। সেটা গুটোলো। টেবিলের ওপরে মাথার ঘাঁটা চুলের মত বইখাতা ছড়ানো। চিত্রাও গেছে হয়তো কাঁদনের সাথে। বইগুলো গুছিয়ে যেতে পারে না। কতবার বলেছি, ও এসব নোংরামি দেখতে পারে না। সবিতা বইগুলো গুছোল। রান্নাঘরের দরজায় ধাক্কা মারল অবশেষে।

—এ বিস্তর মা, বিস্তর মা, ওঠো দেখি। জল আনো। আঁচ দাও উত্তুনে। আমার পেট জলছে, মিন্টুকেও দুধ খাওয়াতে হবে। ওরও পেটে কিছু নেই। পেট পড়ে গেছে।

সবিতা এসে মিন্টুর বিছানার ওপর বসল। বসতে ভালো লাগলো না। শুয়ে পড়ল। জানলার নীচে টবে লাগানো গোলাপ গাছ কয়েকটা। তার পাতাগুলো পোকায় কেটেছে। কিসে মরবে পোকাগুলো? জানলার ওপরে আকাশ। আকাশের নীচে সারি সারি কয়েকটা টালির চাল। এদিকে ওদিকে অনেক সৌধিন বাড়ি। আকাশের দিকে তাকাল সবিতা। কাচানো নীলাবরীর মত আকাশকে তার মনে হল মরা। শুধু আকাশ নয়, জীবনটাও মরা।

সন্ধ্য হয়ে এল। বাইরে উনোনের ধোঁয়া ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প ঘরে আসছে। সবিতা তবু উঠে দরজাটা পুরো ভেজিয়ে দিতে পারল না। বিস্তর মা দুধ গরম করে আনলো।

—চা বসিয়েছ ?

—ক-কাপ জল চাপবে মা ?

—ওরা তো কোথায় বেরিয়েছে । আমাকে এক কাপ করে দাও ।

—চিনি কিন্তু কম আছে মা । আনতে হবে দোকান থেকে ।

—আনগে যাও । চা যদি কম থাকে সেটাও এনে ।

—পয়সা দিন্ মা ।

— পয়সা ! পয়সা আমি জানি না । পয়সা চাইবে বাবুর কাছে । আমি ছাড়া কি আর লোক নেই বাড়িতে । বাবু আছেন, কঁাদন আছে, চিত্রা আছে । সংসার নিয়ে আমাকে একা মাথা ঘামাতে হবে কেন ?

বিশ্বর মা বাড়ির সবাইকে বুঝতে পারে । কেবল তার এই মা-টিকে ছাড়া । আজ হাসি-খুশি । কাল আবার মন-মেজাজ কেমনতর । এদিকে দয়া-মায়ার অন্ত নেই । আবার রাগলে বাড়িসুদ্ধ কাঁপে ।

—আপনিই তো চিরকাল দিয়ে আসছেন গো । ওদের চাইবো কেন ?

সে কথা সত্যিই । বিশ্বর মার কি দোষ । ও কি বোঝে সংসারের ! ওর কাছেই বা নিজের নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের জ্বালা জানিয়ে কি লাভ ! সবিতার কি মনে হল সৃষ্টিতের না আসার পেছনে । তার এই স্বাদহীন মরা মরা দিনগুলোকে সহ্যে না পারার অসহ্য জ্বালায় পেছনে বিশ্বর মারও অপরাধ আছে কিছু ?

—ব্যাগ থেকে নিয়ে যাও একটা আধুলি । আর শোন, দুপুরে একঘর মাছির মধ্যে মিন্টুকে শুইয়ে গেলে । মশারীটা টাঙিয়ে দিতে পারলে না ? যে কথাটি না বলে দোবো সে কাজ আর কখনো হবে না তোমাদের দিয়ে । তোমরা সবাই মিলে কি পেয়েছ বল তো আমাকে ?

কান্নায় গলিয়ে দিতে পারলে মনের দাহ উপশম হয় যতটা, রাগের কৃত্রিমতায় তার আংশিক ঘটে । বিশ্বর মাকে খানিকটা রুঢ় ভাষায় কিছু বলতে পেরে সবিতা একটু শান্ত হল অন্তরে ।

দুধ খাওয়াতে বসল মিন্টুকে ঘুম থেকে তুলে । হাঁটু নাচিয়ে নাচিয়ে দেড় বছরের ছেলেকে কোলে শুইয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ান ।

—কে দুধ খায় । নোঙ্কী সোনা খায় । ঘুটু ঘুটু । সোনা দুধ খায় আমার । মিন্টুকে সাজগোজ করিয়ে বারান্দায় দোতলার অন্ত ভাড়াটের ছেলেমেয়ের সাথে খেলতে বসিয়ে এল ।

রাত শুরু হয় হয় । ঘরে আলো না জালিয়ে চুপ করে টেবিলের ওপর গালে

হাত দিয়ে বসে রইল সবিতা। বসে থাকা নিশ্চল স্তম্ভতার মধ্যে সে তখন তলিয়ে যাচ্ছিল এক নৈরাশ্রময় অনুভূতির অতলে।

দরজা ঠেলে কাঁদন ঘরে ঢুকল। ভালো জামা-কাপড় পাল্টে আটপোরে জামা-পায়জামা পরল সে।

টেবিলের ওপর কনুই রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই প্রশ্ন করল সবিতা,
—কোথায় গেছলি কাঁদন?

—কে? আমি? সিনেমায়।

—চিত্রা?

—সেও।

—ঘরের দরজা আঁলগা করে গেলি, বিস্তর মাকে ডেকে খিলটা দিতে বলতে পারলি না?

কাঁদন সে কথার জবাব দিলে না। যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা।

—শোন, এখানে আর তো কাঁদন।

কাঁদন চেয়ারে গা লাগিয়ে দাঁড়াল।

—একটা কথা খুলে বলবি আমাকে?

কাঁদন এই আকস্মিক প্রশ্নে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি কথা?

—তুই আমাকে এখন কি ভাবিস জানি না। তবে মনে রাখিস কাঁদন, আজও আমার চেয়ে বড় বন্ধু তোর কেউ নেই। আজ হয়তো সে বন্ধুত্বকে তুই মর্ষাদা দিস্ না। তবু আমি তোর দিদি। আমাকে খুলে বলবি একটা কথা? চিত্রাকে তুই ভালবাসিস? বন্।

—না।

—না? সত্যি বলছিস্ কাঁদন?

—দিদি, তুমি আমাকে জান। যদি সত্যিই ভালবাসতাম তোমাকে তা জানাবার মত সৎ সাহসও আমার থাকতো।

—তবু বলে রাখছি কাঁদন, কিছু হবার আগে আমার জানাস। খামখেয়ালি করে কিছু করিস্নে। ভালবাসাটা খেয়াল বা খেলার বস্তু নয়। আমার জীবনের সবটাই তুই জানিস্। তা থেকে কিছু শিখবি না?

—কিন্তু এমন সন্দেহ তোমার মনে এল কেন বল তো?

সবিতা কিছুক্ষণ ধামল। আকাশের প্রাণহীনতার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু রুদ্ধতা এসে গেল তার কণ্ঠস্বরে।

—তুই জানিস, বিরামের চোখে পড়েছে তোদের মেলামেশার বাড়াবাড়িটা। ওতো মুখ ফুটে কিছু বলে না। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ওর অমুমতি ছাড়াই চিত্রাকে এখানে থাকবার জায়গা দিয়েছি আমি। কিছু হলে সে অপমানের ভাগ আমাকেই বইতে হবে।

কাঁদনের গলায় পান্টা রুক্ষতা।

—বিরামবাবুর চোখে যা বিসদৃশ লাগে তুমিও কি সায় দাও তাতে। বিরামবাবুর চিন্তাধারাটা ফিউডাল। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে...

—চুপ কর, চুপ কর কাঁদন। ওসব আমি অনেক শুনেছি। তুই যে রাজনীতি করিস আর অনেক থিয়োরি মুখস্থ করেছিস সে আমি জানি। বিরাম কি ভাবে সে কথা বাদ দে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে যে আমি কোনদিন বঁকা চোখে দেখিনি তার যদি কেউ বড় সাক্ষী থাকে সে তুই। কিন্তু সে মেলামেশার সময় রাত্রি নয়।

কাঁদন কথাটার ঠিকমত অর্থ বুঝতে না পেরে দিদির দিকে বড় চোখে বোবা হয়ে তাকায়।

—কাল রাত্রে চিত্রা তোর কাছে বারান্দায় উঠে যায়নি? অনেক রাত পর্যন্ত হাসাহাসি করিসনি তোরা?

আবার সব চুপচাপ। আকাশের গায়ে আলো ছড়িয়েছে কলকাতা। পাশের বাড়িতে রেডিও বাজছে। আর ছোট ছেলেমেয়েদের জটলা। মিন্টুর থেকে থেকে নাকি-কান্না। বাকি সব চুপ। সবিতা বসে রইল এক জায়গাতেই মাথার কয়েকটা চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে।

—তোরা চারদিক থেকে আমাকে ফুরিয়ে দিতে চাস। ফুরিয়েই তো যাবো আমি, কি আছে রে আমার বাঁচার? কে চায় আমাকে?

সবিতা লক্ষ্য করেনি কাঁদন রান্নাঘরে চলে গেছে কখন। সবিতা উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচের চওড়া রাস্তায় ছড়িয়ে গেল তার লম্বা বিকৃত ছায়াটা। রিক্শার চাকা আর মানুষ থাকে পায়ের তলায় চেপ্টে চেপ্টে যাওয়া আসা করছিল। চিত্রা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে একটা কিছু ঘটেছে। সবিতাদির বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ সে বোঝে। প্রবল কোন মানসিক উত্তেজনাকে সামলাতে হলে বারান্দার রেলিঙ ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে সবিতাদি।

চিত্রা চোখের ভুরু বাকিয়ে নিঃশব্দে প্রশ্ন করে কাঁদনকে, কি হয়েছে? কাঁদন মুহূর্তে বন্ধ ঠোঁটের ওপর তর্জনী ছুঁইয়ে জানায়—চুপ। বিস্তর মা বোকা

হয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে কড়ার ভাজা আনাজে জল ঢেলে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে কাঁদন বাইরে বেরিয়ে যায় দরজাটাকে জোরে আছড়ে। তার ফোভ সবিতাকে জানাবার পরোক্ষ কৌশল ঐ শব্দটুকু।

দিদি কেবল নিজেকেই বোঝে। কিন্তু প্রাণবন্তটা যে দিদির মত প্রাকৃতিক নিয়মে সকলের মধ্যেই আছে অল্প বিস্তর দিদি সেটা বোঝে না। দিদিকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দিদির এই যে অহরহ মেলাফলি—এতে গা ঘিন ঘিন কবে। আমি জানি দিদির জীবনটা একটা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের ছাটে যারা স্তম্ভ তাদের পুড়িয়ে মারতে হবে? এটাকে ইন-হিউম্যানিটি ছাড়া কি বলবো। আসলে এর একটা কারণ আছে। কারণটা কি? কারণ দিদির জীবনে কোন নির্দিষ্ট ফিলসফি নেই। সেন্টিমেন্টের বীজাণু দিদির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুতে। আমি তো জানি—

কাঁদনের এটা একটা অভ্যেস। চেনা-জানা প্রত্যেক লোককে খুঁটিয়ে সমালোচনা করতে চায় ও। কে কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, কোন পরিবারে জন্ম, কি পরিবেশে মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাঁদন যখন এইসব ভাবতে ভাবতে রাধারমণ বস্তুর গলির বাক পেরিয়ে গেল, বারান্দা থেকে সবিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তাকে।

এ-জানলা ও-দরজার আলোয় কাঁদনের ছায়াটা ঘন হল, কালো হল, পায়ের তলায় পোষা বেড়ালের মত ভালগোল পাকিয়ে আবার ঈঁচুরের মত স্থাৎ করে মিলিয়ে গেল। মানুষের ছায়া মানুষের চেয়ে কী বিস্ত্রী। কাঁদনের শরীরটা আগের চেয়ে অনেক ভেঙেছে। সেদিন বলছিল কত পাউণ্ড যেন ওজন কমেছে ওর। কেন কমবে না? কি খাওয়াই ওকে আমি? যে বয়সে যা খাওয়া উচিত সে তুলনার কতটুকু খেতে পায়? শুধু আমার ওপর নির্ভর করে নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করছে ও। আই-এ শেষ করল না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবল না, রোদে ঘুরে ঘুরে গাল দুটোকে ভেঙেছে। কোন কিছুতে এনার্জি নেই। বিরাম আমাকে দোষ দেয়। একটা সক্ষম, স্তম্ভ, স্বাভাবিক ছেলেকে বসে বসে খাওয়ার সুযোগ দিলে সে জীবনে আর কোনদিন সিধে হয়ে হাঁটতে পারবে না। কিন্তু আমি কি ওকে বোঝাই না। তার বেশি আর কি করতে পারি, তাড়িয়ে দিতে পারি না তো। ও আমার নিজের ভাই।

চিত্রা বই নিয়ে পড়তে বসেছে। খেলা ভেঙে গেছে খিটুনের, তাকে একটা

ছবির বই দিয়ে ভুলিয়ে সবিতা রাঁধতে গেছে তরকারীটা, বিস্তর মা ডাল ভাত ভাজা-ভাতে এসব ভালোই রাঁধে কিন্তু ভাল তরকারী কিংবা মাছ মাংসের কিছু হলে রাঁধতে হয় সবিতাকে, নইলে বিরাম অধিকাংশ দিন সে সব যুগে তোলে না। ছবি দেখতে দেখতেই মিন্টু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে।

সবিতা রান্নাঘর থেকে জবাব দেয়, এঁই যে সোনা, হয়ে গেল আমার।

রান্না শেষ করে সবিতা মিন্টুকে কোলের কাছে নিয়ে তক্তাপোশে শোয়। স্তনটা একটু মুখে দিতে না দিতেই ঘুম এসে গেল তার। মিন্টু প্রতিদিনের অভ্যাসমত ঘুমোবার সময় একটা স্তনকে হাতে ছুঁয়ে থাকে।

সবিতা চূপচাপ শুয়ে রইল। উঠল না, ঘাম-লাগা শাড়ি ব্লাউজটা পান্টাবার প্রয়োজনে গা-ধুতেও গেল না।

আরও একটু রাত করে বিমলা আর রথীন বেড়াতে এল।

—আররে আর। কি ভাগ্য আমার! পথ ভুলে এসে পড়লি বুঝি?

বিমলা আর রথীন দুজনেই পাশাপাশি বসলো তক্তাপোশে।

ওদের চোখে পড়লো সবিতার দ্বান চেহারা, উকোখুকো চুল, কপালে সরু সরু ভাঁজ, জামাকাপড়ে অপরিচ্ছন্নতা।

—তোমার শরীর খারাপ না কিরে? কি হয়েছে?

—শরীর খারাপ? কই না তো? কিছুই হয়নি।

সবিতা খুব স্বাভাবিকভাবে হাসবার চেষ্টায় হাসতে হাসতে ভাবলে আমার মনের ভাবনাগুলো কি মুখে দাগ কেটেছে? আর সেই দাগ দেখে ওরা কি বুঝে নিতে পারবে আমার ভাবনাগুলোকে?

সবিতা কাপড়ের আড়ালে ঢাকা ওর স্তনের ওপর থেকে মিন্টুর স্পঞ্জের মত নরম হাতটাকে আশু সরিয়ে কাপড় চোপড়গুলো গায়ে ঠিকমত শুছিয়ে প্রায় লাফিয়েই উঠে বসল তক্তাপোশে। বিমলার শাখা চুড়ি ভরা হাতছটো যুঠোয় জাপটে হাঁচকা টান মারল।

—কিছু যদি হয়ে থাকে তো গায়ে জোর হয়েছে।

—কি জানি তোকে দেখলে ভয় হয়। তুই যা মেয়ে বাবা। কোন সময়েই বুকের মধ্যে একরাশ দুঃখ ছাড়া বাঁচতে পারিসনে।

—ওঃ তোরাই বুঝি দুঃখ ছাড়া বেঁচে আছিস পৃথিবীতে। রথীন কি তোকে এত ভালবাসে? আরে ও চশমা নিলে কবে?

সবিতা রথীনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। অনেক মোটা হয়েছে। ভারী

হয়েছে চোখ মুখ। অনেক গম্ভীর। আর কেমন যেন প্রাণহীন ভোঁতা।
দেখলেই মনে হয় কেরানী।

—চশমা ও অনেকদিন নিয়েছে। আট মাস তো বটে। বেশি হবে,
তো কম নয়।

—ইস্, তার মানে প্রায় এক বছর বাদে তোরা এলি ?

—দোষটা আমাদেরই বুদ্ধি শুধু ? তুই তোর বিরামকে বগলদাবা করে
একদিন যেতে পারতিস না ? ঠিকানাটা তোর জানা ছিল জানি।

বিরামের কথায় হাসলো সবিতা খলখল করে।

—বিরামকে তোরা কদিন দেখিসনি বলতো ? তাকে বগলদাবা করবো
আমি। মুটিয়ে হাতী হতে চলেছে সে।

বিমলা খুশিতে গদগদ হয়ে যায়।

—বলিস্ কিরে ? সেই রোগা ঢাঙ্গা বিরাম হাতী হয়েছে ? ভীষণ দেখতে
ইচ্ছে করে বিরামকে।

সবিতা রথীনের দিকে আঙুল বাড়ায়। ওকেই ভালো করে দেখ তাহলে
বুঝতে পারবি।

সবিতা ভাবে ইউনিভার্সিটির সেই মুখ-চোরা রথীন যাকে অবিরাম ঠাট্টা করার
মধ্যে অনাবিল ক্ষুতি উপভোগ করা যেত, অসম্ভব রকমের ভালবাসা নিয়েও
যে কোন সময়েই কোন মেয়েকে মুখ ফুটে ভালবাসা জানাতে পারেনি আবার
মেয়েদের সঙ্গ-ছাড়া হলেই যাকে মনে হতো ডাঙার মাছ, সেই রথীনকে কি
আজও তেমন করে রাগানো কাঁদানোর জন্তে ঠাট্টা করা যায় ? নাকি সেসব
অতীত বহুদিন আগেই মরে গেছে।

সবিতা রথীনের চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিজের চোখে লাগিয়ে বলে,
রথী, একবার হাসো তো দেখি। হাসো না।

রথীন কিছু বুঝতে না পেরে অপ্রতিভ ভাবে হাসতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে
ওঠে।

—দ্যাখ ঞাখ বিমলা ঠিক সেই রথীন। ছেলের বাপ হয়েও মেয়েদের সামনে
ওর এডালোসেন্ট ভাবটি গেল না।

বিমলা অবাক হয়ে যায় সবিতার ছেলেমানুষি দেখে। ওর মনটা কি
সেই হস্টেল লাইফের বেপরোয়া সুরে আজও বাঁধা ?

—আচ্ছা সবিতা, তোর বুদ্ধি বয়স বাড়েনি ?

—কিসের বয়স ? মরার ?

ঠাট্টা করতে গিয়ে মনের গভীর জিজ্ঞাসাই হঠাৎ বেরিয়ে গেছে তার ঠোঁট দিয়ে। কিন্তু কি জানলে ওরা খুশি হয়। কি বললে ওরা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে বয়সের যন্ত্রণাই আজ আমাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে একা করে দিয়েছে। সবিতা লাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে পৌঁছয়।

—জানিস বিমলা, এতদিন পরে এমন একটা সময়ে এলি যে ধোকাটা ঘুমোচ্ছে। তোদের বাচ্চাটা কেমন আছে ? নিয়ে এলি না কেন ?

—ভারী দুষ্ট হয়েছে জানিস। কিছুতেই মা বলবে না আমাকে।

—সে কি রে ?

—হ্যাঁ আমাকে বলে বড় মা। আর কাকিমাকে ডাকে মা। তার কারণ বাড়িতে তো এক পাল ছেলে। সকলেই প্রায় আমাকে ডাকে জেঠিমা, বড় মা বলে। ওর সঙ্গে খুব ভাব, বাপের কাছে ঘুমোনো, বাবা বললে তবে যাওয়া, বাবাকে চুমো খাওয়া আমাকে নয়…………।

ছেলের গল্পে বিমলা খামে না। শুনতে শুনতে ক্রান্তি লাগে সবিতার। বাবা-বাবা, ঘর সংসার, স্বামী পুত্র, এসবের মধ্যেই কি ইহলোকের স্বর্গ গড়ে উঠেছে বিমলার জীবনে ? বিমলা মরে গেছে। সবিতার ইচ্ছে করল বিমলাকে জিজ্ঞেস করে দুটো স্মৃতি এখনও সে মনে করতে পারে কিনা। যার নায়িকা বিমলা নিজেই। এক দোলের পরের দিন বেঁটে প্রফেসরের গালে আঁবীর মাখানো। আর একটা নভেম্বর দিবসের মিটিঙে পুলিশের ব্যাটন কেড়ে নেওয়া। এমনিতে মনে হয় কিছুই স্মরণীয় নয় ঘটনা দুটো। কিন্তু যেদিন ঘটেছিল, এবং যে ভাবে ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানে সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে বিমলাকে নিয়ে কি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কালো, মোটা, যগুয়ার্কা চেহারা নিয়ে বিমলা বক্তৃতা করতো আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে, ছাত্র-সমাজকে বুলেটের মুখে এগিয়ে যাওয়ার উত্তেজনা জোগাতে, একি সেই বিমলা ?

সবিতা আড়ে-আড়ে খুঁটিয়ে দেখে বিমলাকে। কপালে মস্ত সিঁহরের টিপ। হাতে শাঁখা, লোহা আর আটগাছা সোনার চুড়ি এক হাতে ; আরেক হাতে শুধু একটা রিস্টওয়াচ। ঘি রঙের সিল্কের শাড়িটা সাদা-মাঠা কিন্তু উজ্জল আর দামী ব্লাউজটা শাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ব্লাউজের কাঁকে গলায় আলো লাগা সাপের খোলশের আশের মত চিক্‌চিক্‌ করছে হারটা। ইউনিভার্সিটির ছেলে-জালানো বিমলা গৃহস্থ ঘরের নিপুণ গৃহিণী সেজে স্বামীকে আচলে

বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। বিমলা মরে গেছে।

রথীন সকালের কাগজটা টেনে পড়ছিল। সে কাগজ থেকে মুখ তোলে।

—এতটা রাস্তা এলাম, একটু চা খাওয়াবে না সবিতা?

বিমলা কথাটা সম্পূর্ণ করে।

—হ্যাঁ, একটু চা খাওয়া, একটা খবর আছে তোকে জানানোর।

সবিতার খেয়াল হল চা করার ব্যাপারে। বিস্তর মাকে আগেই জল চাপাতে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

শুধু চা নয়। ওরা দুজন অনেক দিন পরে এসেছে, সবিতা চায়ের সঙ্গে স্নজিও বানালে বিস্তর মাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই পিঁড়ি টেনে বসে।

তিনটে সাদা প্লেটে স্নজি আর তিন কাপ চা বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে তার ওপর রাখল সবিতা। শেষে নিয়ে এল এক গ্লাস করে জল। খানিকটা স্নজি ডেলা করে বিস্তর মাকেও খেতে দিয়েছে। আরো খানিকটা বাটিতে ঢাকা আছে কাঁদন আর চিত্রার জন্মে।

সবিতা চায়ের কাপে আলতো ঠোট ছুঁইয়ে গরম ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, কি নতুন খবর শুনি? এই, চায়ে চিনি কম হলে কিন্তু বলবি। আমাদের আবার চিনি একটু কম খাওয়া অভ্যেস।

রথীন বললে, লাগবে না।

বিমলা বললে, আমার একটু লাগবে রে।

সবিতা তক্তপোশ থেকে প্রায় নাচের মত দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, কয়েকটা ধাক্কা ধেয়ে চালের খোঁপা সাপের কুণ্ডলির মত ঘাড়ের ওপরে ছলতে ছলতে হঠাৎ পিঠ বেয়ে ঝুলে পড়ল পাছার দিকে। একটা খোঁপা আর বেণীর মধ্যে এত তফাৎ! এক মুহূর্তে সবিতার বয়স বেন কমপক্ষে পাঁচ কি সাত বছর কমে গেল।

—কই, বল কি খবর?

—টুকুকে তোর মনে পড়ে তো?

ঠোট থেকে চায়ের কাপটা নামিয়ে সবিতা আত্মহারা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে এমনি ঝাঁকুনি ভুললো শরীরে।

—ওমা, টুকুকে আমার মনে পড়বে না? কি বলিস রে তুই? চার বছর এক হস্টেলে কাটিয়েছি। মাসে কটা দিন ও নিজের বেডে শুতো? দুজনে গা-জড়াজড়ি করে না শুলে আমাদের যুম হত না জানিস? টুকুর বিয়ের দিন

চোখের জল ফেলে যদি কেউ কঁদে থাকে তো সে আমি। আর তোরা ভাবছিস টুইকে আমি ভুলে যাব? বিশ্বাস করবি, টুইকে আমি যা ভালো-বাসতাম বিরামকেও কোনদিন তেমন বেসেছি কিনা সন্দেহ।

বিরাম শব্দটা উচ্চারণ করার মুহূর্তে সবিতা একটু থেমেছিল, অন্তমনস্কতায় বিরামের বদলে সৃজিত নামটা উচ্চারণ করে ফেলার যারাজক ঝোঁক সামলাতে।

—ই্যা কি হয়েছে টুইক?

—আচ্ছা তুই কি জানতিস স্কুমার আর টুইক মধ্যে কোনরকম হিচ চলছিল।

—না তো।

—টুইক যে মাস সাতেক হল কলকাতা থেকে ওর দেশের বাড়িতে গেছে সেটা জানিস কি?

—ই্যা সেটা শুনেছি। কল্যাণ পূর্ণিয়ার এক কলেজে চাকরি পেয়েছে। ও যখন ছুটি-ছাটায় কলকাতায় আসে তখনই ওর কাছ থেকে টুইক খবর পাঠে।

—অন্ত আর কিছু খবর পাসনি?

—না। কি ধরনের খবর?

—এই ধর টুইক স্কুমারকে ডিভোর্স করে বাপ মায়ের মনোনীত এক পাত্রকে বিয়ে করে বিলেত যাচ্ছে। সবিতার বুকের মধ্যে আগুন লাফিয়ে উঠল।

—অসম্ভব, অসম্ভব। তোরা কি আমার গল্প শোনাতে এসেছিস বিমলা? কে বলেছে তোকে এইসব আজগুবি কাহিনী বল তো? স্কুমার নাকি?

—না, স্কুমার নয়। স্কুমারের দু-একজন বন্ধু ওর আপিসে কাজ করে। তারাই বলেছে ওকে।

—যেই বলুক বিমলা, আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই না, তার আগে টুইক মরে যাবে। সুইসাইড করবে, বিষ খাবে। জানিস বিমলা, আমি তাকে বুক জড়িয়ে হস্টেল লাইফ কাটিয়েছি।

বিমলা রখীন দুজনেই সবিতার ফ্যাকাসে মুখটার দিকে তাকিয়ে আর তার অতিরিক্ত ভাবাতিশ্য দেখে বিমূঢ় হয়। ওরা দুজনেই পরামর্শ দিলে সবিতাকে নিজের চিঠি লিখে সমস্ত ঘটনার সত্যি মিথ্যে জানতে।

বিমলা ও রখীন চলে যাবার পর সবিতা সেই এক জায়গাতেই বসে রইল। সে যেন হাঁপিয়ে উঠতে চাইছে অত্যধিক শোয়া-ঘটিত অস্থি যেমন হয়। অথচ ও রকম কোন অস্থি তার নেই। তাহলে কষ্টটা কোথায়? বুক? পিঠে? শিরদাঁড়ায়? না পায়ের চোখে? কোথায়?

কোথাও না। আমার কষ্ট আমার অস্তিত্বে। কেন বেঁচে আছি? কেন পাণ্টে ঘাইনি? বিমলা রথীন এদের সামনে আর কত দিন মুখোশ পরে থাকব? চিত্রা ভীষণ ভয়ে আঁশ্বে আঁশ্বে পাশের ঘরে গিয়ে নরম ঝুঁক এবং নিরপরাধ গলায় সবিতাকে ডাকে,— সবিতাদি, গা ধুতে যাবে না? রাত বাড়ছে। মস্তচালিতের মত সবিতা উঠে দাঁড়ায়।

.. দুই ..

পরের দিন সকালে সবিতার নামে দুখানা চিঠি এল। একটা খাম। আরেকটা পোস্টকার্ড।

সবিতার তখন মাথার চুলে তেল, কাঁধে পাট্‌করা শাড়ি ব্লাউজ। বাথরুমে ঘাচ্ছিল স্নান করতে।

পোস্টকার্ডটা লিখেছে রমা। মোগলসরাই থেকে। ও কলকাতায় আসছে মাস দুয়েকের মধ্যে। সম্মানবতী। কলকাতা থেকে স্বপ্নের শান্তি গিয়ে সাধ ঘাইয়ে এসেছেন। তার মানে এতদিন পরে রমাকে তাঁরা পুত্রবধূ হিসেবে সামাজিক মূল্য বা সম্মান দিলেন? নাতি-নাতনীর লোভেই কি? আর সব খবর ভালো। সবিতা অনুভব করে ছোট চিঠিটার প্রত্যেকটি অক্ষরে রমার জীবনের সুখী স্বচ্ছল আত্মসন্তোষকে। রমা ওর আরেক বন্ধু। নিশীথ ওকে বিয়ে করেছিল প্রেম করে, সংসারত্যাগী হয়ে। রমা মা হবে এতদিনে।

খামটা সজ্জিতের। সজ্জিত কি কলকাতায় নেই?

মরা পাখির গা থেকে ছোট ছেলেরা যে ভাবে পালক ছাড়ায়, সবিতা তেমনি করে খামের একটু ছেঁড়া অংশের ভেতর আঙুল চালিয়ে টেনে আনল পুরো চিঠিটা। দ্রুত হল শ্বাস-প্রশ্বাস।

সবিতাদি,

দেশ থেকে বাবার চিঠি পেয়ে হঠাৎ বর্ধমান চলে আসতে হল। তোমাকে না জানিয়েই। বিকেল চারটের গোমো একস্প্রেসে না এলে এখানে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যেত। আমার আকস্মিক অসুস্থ্যানে তুমি যে কতটা রেগেছ তা আমি বুঝতে পারি। কলকাতার আকাশে শেষ বসন্তের উজ্জল রোদের আভাস লেগেছিল। এখানে দিনরাত মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছে কম। কিন্তু মনে হয় সে যদি একবার তার অশ্রুভারাতুর হৃদয়টাকে উপুড় করে দেয় পৃথিবী ভেসে যাবে।

আকাশময় নিজের অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখছি। এখানে এসে ভাবতে পারি না আকাশ সোনার রোদে রঙীন হয় কোথাও। যার নীচে তুমি আছ। কলকাতা থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে এসেও তোমাকে মনে হয় অবিচ্ছিন্ন স্বপ্নের মত। তুমি আমাকে ভালবাসো এই সত্যটুকুও অসম্ভব ঠেকে। আমার চোখের তারার নির্জন অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুৎ-শিখার মত প্রতি মুহূর্তে তুমি ষাচ্ছ আসছ। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। বার বার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কবিতার টুকরো লাইন মুখে আবৃত্তি আর মনে গান হয়ে আমার বেদনাকে দ্বিগুণ করে তুলছে। অমিয় চক্রবর্তীর লেখা লাইনটা। —‘কৈদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।’

না, থাক, এসব কথা। আমার একান্ত আপন ও গোপন বেদনাকে চিরকাল তোমার অগোচরেই রাখবো। তোমাকে সুখী করা, বন্ধুত্ব দানের অমেয় আনন্দে ভরিয়ে রাখাই আমার জীবনের ব্রত। যতদিন বাঁচবো এ দায়িত্ব পালন করবো আমি। হয়তো ভবিষ্যৎকালে জীবনের অন্ত নানা রূপান্তর ঘটবে। তবু তুমি জেনো সবিতাদি, অনন্তকাল তুমি আমার আত্মার আত্মীয়ই থাকবে।

আরো অনেক কথা তোমাকে বলতে সাধ যায়। মনে আমার কথার সমুদ্র। মুখে কয়েকটা বুদবুদ। আমার জীবন এখন একটা বিরাট স্বপ্নের মুখোমুখি। তোমাকে সে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছি। তোমাদের মত শিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধির কাছে যা অত্যন্ত প্রচণ্ডতম অপরাধ ঘৃণ্য সংস্কার আমাদের সংসারে তাই অনিবার্যভাবে ঘটতে চলেছে। আমি নিজে উপার্জনক্ষম নই। আমার প্রতিবাদ তাই সামাজিক মূল্য বা সাবালকের মতামতের গুরুত্ব পাবে না। অত্যাগ্রে নীরবে সহ্য করার গ্লানি বহন করতে হচ্ছে তাই প্রতি পলে পলে। আর কেউ বুঝবে না কিন্তু তুমি আমাকে বুঝবে বলেই তোমাকে অকপটে জানাতে আমার সংকোচ নেই।

আমার ছোট বোনের বয়স মাত্র বারো বছর। গড়নটা বাড়নসার বলেই চোন্দর মত দেখায়। বাবা হঠাৎ এক উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেয়ে তার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের সাংসারিক অর্থাভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে এটা নাকি একটা মস্ত সুযোগ। কেননা পাত্রপক্ষের দাবি দাওয়ার কীসটা অনেক আলগা। পাত্রের বাবা বর্ধমান শহরে বিরাট মনোহারী দোকানের মালিক। ছেলেরি এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। পাত্রের বাপ কল্লার রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজের থেকেই প্রস্তাব করেছেন।

আমার এক এক সময় ভাবতে অবাক লাগে সবিতাদি, আমি এই বাড়িতে জন্মা-
লাম কি করে ? সমাজ ও শিক্ষার ভারতম্য কি এত শক্তিশালী যে পিতা ও পুত্রের
চেতনায় এমন একটা যুগের ব্যবধান গড়ে তুলতে পারে ? বিয়েটা এখানে একটা
প্রথা । নিবিবাদ আনুগত্যই প্রেম । ভালবাসা ললাটের লিখন । অথচ এইট চলে
আসছে । ভালবাসার অভাবে আমার মাকে কখনও হাহাকার করতে শুনিনি ।
আমার বড় বোঁদির আপাতত পাঁচটি সন্তান । তার মুখে জীবনের ক্লান্তি কিংবা
বৈরাগ্য আঁচড় কাটেনি তো । এরা তো সুখী । এরা তো জীবনের বঞ্চনার
পীড়িত নয় । আমি জানি আমার বোনও সুখী হবে । ওদের দুজনের
বিপুল অপরিচয়ের ব্যবধান এক নিমেষে দূর হয়ে যাবে পুরোহিতের মন্ত্ৰে, শাঁখের
শব্দে, হলুদ কমানো শাড়ির গন্ধে আর রাত্রির নগ্ন অঙ্ককারের আত্মসমর্পণে ।
তাহলে তোমার আমার জন্ম হয় কেন পৃথিবীতে ? দেহাতীত অন্য কোন
ঐশ্বর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তুমি জীবন বিদীর্ণ করে হাহাকার কর সবিতাদি ?
আমি কেন সাড়া দিয়ে তৃপ্ত হই সেই ডাকে যা তোমার দেহের অঙ্ককার কন্দরের
আদিম আহ্বান নয়, যুক্তির পিপাসা । তাহলে কি পৃথিবীতে ভালবাসার
চরিত্র দু-রকম । শিক্ষিতের কাছে তা অস্তরের সমস্তা । অশিক্ষিতের কাছে
দেহের অভ্যাস ।

খাক খাক, কপালের রং দুটো জালা করছে । কেন তোমাকে বিচলিত
করলাম এ চিঠি লিখে । অথচ জান সবিতাদি, প্রায় তিনটে অসম্পূর্ণ চিঠি
ছিড়েছি ইতিমধ্যে । রাত হয়েছে । খেতে যাবার তাড়া এসেছে । আজকের
মত এইখানেই যবনিকা পতন হোক তোমার আমার নিভৃত আলাপচারিতে ।
কবে কলকাতায় যাব ঠিক নেই । আগামী কাল প্রাতঃকালে হুগলী রওনা
হতে হবে পাত্রকে আশীর্বাদ করতে ।

তুমি আমার অজস্র ভালবাসা নিও ।

ইতি

তোমার

স্ব

সবিতা আবার ঘরে ঢুকতেই চিত্রা জিজ্ঞেস করলে, কার চিঠি ?

—রমার ।

—দুটো যে ।

—আরেকটা স্নজিতের ।

সবিতা স্মৃতিত নামটা উচ্চারণ করল বেশ জোর দিয়ে। এটা যে গোপন রাখার মত কোন ঘটনা নয় তা যাতে সবাই বুঝতে পারে। সবাই অর্থে একা বিরাম। সবিতা স্মৃতিতের চিঠিখানা নিজের স্মৃতিকে লুকিয়ে রমার পোস্টকার্ডটা বিরামের মুখের দিকে এগিয়ে দিল। বিরামের সারা মুখে তখন সাদা সাবানের ফেনা।

—রমা চিঠি লিখেছে। ওর বাচ্চা হবে। কি রকম খুশি হয়ে লিখেছে দেখ।

বিরাম চিঠিটার দিকে তাকাল কেবল। পড়ল না।

চৌবাচ্চার রঙীন স্ফু জল আর সাবানের সাদা ফেনার স্পর্শে সবিতার শরীর শুধু নয়, মনও পরিষ্কৃত প্রশান্ত হয়ে উঠল। চকচকে শুভ্র মুখে আর কপালের ওপরের দু-একটা চুলে শিশির বা মুক্তোর মত জলের বিন্দু ফুটেছিল। চিত্রা সেদিকে বোকার মত আচমকা এমন ভাবে তাকাল যেন এই মেয়েটিকে সে দেখল এই প্রথম। চিত্রার বিষয় অকারণ বা অহেতুক নয়। গত তিন-চার দিন ধরে সে সবিতাকে দেখছে শুকনো, মনমরা, সহজে রেগে ওঠার মত খিটখিটে, একা-একা, অন্তমনা। কোথাও কোন কিছুর সঙ্গে যোগ নেই। এমন কি একটু আগে কাঁধে তোয়ালে, সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি জড়িয়ে সবিতা সিঁড়ি ভেঙে নীচে গেল যখন তখনও তার মুখে বা চোখের কোণে বা চলার ছন্দে একটা বিষন্ন ক্রান্তির ছাপ লেগেছিল। কিন্তু বাথরুম থেকে স্নান সেরে সবিতা যেন তার ছদ্মবেশ খুলে এল। ম্যাজিকের কোশলে হঠাৎ অপক্লপ হয়ে গেছে সে। যদিও সত্যিকারের ম্যাজিকটা কি ভাবে ঘটল সেটা বোঝার বয়স চিত্রা বহুদিন পেয়েছে। স্মৃতিতের চিঠিখানা পৌঁছতে আর একবেলা দেরি হলে শুধু সাবান মেখে সবিতা এত সুন্দরী হয়ে উঠতে পারতো কিনা চিত্রার মনে সেই রকম প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল।

চিত্রার তাকানো দেখেই সবিতা বুঝেছিল চিত্রা তার মানসিক উচ্ছলতার কারণটা ধরে ফেলেছে। হয়তো ইচ্ছে করলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা যায়। গত তিন-চার দিন মনের ওপর দিয়ে যে সব কাঁকা কাঁপা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, আর নিঃসঙ্গতার চাপা ঝড় বয়ে গেছে তাকে সে নিজের মধ্যে সংহত করে রেখেছিল। স্মৃতিতের চিঠির কাটাকুটিহীন অক্ষরগুলো আবার দম্কা হাওয়ার মত তাকে যে অসম্ভব খুশি হওয়ার, উচ্ছল, তরল হওয়ার প্রেরণা এনে দিল তাকেও সংহত রাখা যায়। সবিতা তার চেষ্টা করল না। অশুস্থ রুগী চেপ্তে এসে শীতের সবটুকু হাওয়া শরীর দিয়ে যেভাবে

শুবে নিতে চায়, সবিতা তার মনের ভেতরে কেনিবে ওঠা আকস্মিক আনন্দকে তেমনি উপভোগ করতে চাইল শরীরের আন্দোলন দিয়ে। তার চলার-বলার, খেতে-বসার ভিত্তিতে, মিষ্টকে অশুভ্ৰুতি চুমো খাওয়ার আদরে, মোলায়েম কর্ণধরে সকলের সঙ্গে বেশি কথা বলার আগ্রহে একটা নতুন ছন্দ। স্কুলে বেরুবার সময়টা ঘড়ির কাঁটার পার হয়ে যাচ্ছে দেখেও সে অনর্থকভাবে কিছু তৈরি বে-কাজে ছুটোছুটি করে।

মিষ্টুর ময়লা ইজের জামা আর একটা-দুটো বালিশের ওয়াড় গোলাপাঙ্কিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের সামনে রেখে বললে, বিস্তর মা, চান করার সময় এগুলো মনে করে কেচে দিও। এঁয়া! সাবান আছে তো? মিষ্টুর আর সব জামা নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো না কাচলে ওর বিকেলে কিছু পরার নেই। চিত্রা বীজগণিতের একটা সিমপ্রিফিকেশন নিয়ে দু-ঘণ্টা মাথা ঘামাচ্ছে। সবিতা তার পিঠে হাত রেখে বসল। চোখের দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসল।

—কি হয়েছে রে? অঙ্ক? পারছিস না?

সবিতা হুড়হুড় করে অঙ্কটা কবে দিলে।

—একটা কাজ করতে হবে যে তোকে চিত্রা?

—কি কাজ সবিতাদি?

—দুপুরে তো পড়িস না, ঘুমোসও না। তাইতো? শুধু যে আজ্ঞা চলে তা আমি জানি। আজকে দুপুরে এষ্ট তাকগুলো ভালো করে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে পারবি? কতদিন ধরে ভাবছি। মেজাজ পাই না ঠিকমত।

চিত্রা উৎসাহ দেখাল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। কাল বিকেলে থেকে সবিতার সঙ্গে তার ভালো করে কথা হয়নি। আজ সকাল থেকে সে নানা ছতো আবিষ্কার করেছে যাতে কথা বলটা শুরু করা যায় সহজে। এই গোটা বাড়িটার মধ্যে একটি মানুষই জ্যাস্ত। সে ঐ সবিতাদি। তাকে মন-মরা বা শুকনো দেখলে চিত্রার পৃথিবীকে বিশ্বাদ বিবর্ণ বলে মনে হয়।

সবিতার তাক-মোছার প্রস্তাবে চিত্রা বললে, দুপুরে কেন সবিতাদি, চান করার সময়ই করে দেব। গায়ে তো ময়লা বুল এসব লাগবে, চান করার আগে করাই ভালো।

সাবিতা বিরামের সামনে এসে দাঁড়াল। বিরাম তখন কিছু লিখছিল সাদা কাগজে। দ্রুত বেগোল অক্ষরগুলো সাদা কাগজের পরিচ্ছন্নতাকে সেনাবাহিনীর মত ক্রমশ দখল করে চলেছে। লেখার মধ্যে অজস্র কাঁটাকুটির নোংরামি দেখেই কি

একথা মনে হল সবিতার? নাকি এটা ঈর্ষা। বা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের মনোভাব? স্বজিতের চিঠিখানায় এমনি কাটাকুটি থাকলে সবিতার মাথায় কি সেনাবাহিনীর তুলনাটা আসতো?

—এই শোনো।

সবিতা কচি মেয়ের মত গলায় ডাকল।

বিরাম মুখটা একটু তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

—বলো।

—না। শোনো না। মুখের দিকে তাকাবে তো।

সবিতা নিজেই বিরামের চিবুক ধরে মুখটাকে ওপরে তুলল। খানিকটা বিরক্তি সত্ত্বেও বিরাম স্বাভাবিকভাবে কথা বললে।

—কি হল?

—তাকাতে পারছো না যে মুখের দিকে? সেজে-গুজে কি রকম সুন্দর হয়েছি দেখাতে এলাম। কি রকম লাগছে?

—ট্রয় পুড়ে যাবে।

বিনা আবেগে সহজ সরল স্বাভাবিক একটা উত্তর। তবু উত্তরের অর্থ নয়, উত্তরের ভঙ্গিটাই খুশি করল তাকে। এইভাবেই বিরাম কথা বলতো। বুদ্ধিদীপ্ত টুকরো টুকরো কথা, আর এই সব কথা বলার সময় সবিতার চোখে বিরামের মুখটা উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো মিষ্টি হাসিতে। সে হাসি সবিতার বরাতে খুব কমই জোটে আজকাল।

হয়তো সেই জন্মেই সবিতার গলার স্বরে ভালবাসার কাঁপুনি এল। বিরামের অনারত ধবধবে ঘাড়ের ওপর মৃদু আঙুল ছুঁইয়ে আবার ডাকে, শোনো।

বিরাম এবার না হেসে তাকায় কেবল।

—আমি আর দাঁড়াবো না। বেশ দেরি করেছি। তোমার জন্মে পটল ভাজা করেছি আর মুসুরির ডাল। পয়সা কুলুলো না, তাই মাছ আনা হয়নি, আর শোনো, তোমার জামা-কাপড় ময়লা হয়েছে। এগুলো আজ ছেড়ে বেও। বিকেলে কাঁদন লগুণীতে দিয়ে আসবে। ট্রাকের ওপর তোমার নতুন জামা কাপড় আছে। নিও। আমি চলি তাহলে কেমন?

বিরামের এলোমেলো কালো নরম চুলগুলোকে তরল আঙুলে কেটে দিয়ে সবিতা দ্রুত হয়ে ওঠে দেরি হওয়া বাচাতে। মিন্টু সবিতার এঁটো খালার বসে কিছু

খাচ্ছিল। সবিতা খুঁকে পড়ে তার মাথার চুলে একটা চুমো খেলে।

—মিষ্ট। ওঠো। আর খেতে নেই। বিস্তর মা এর মুখটা ধুইয়ে দাও তো।

সিঁড়ির প্রায় শেষে ধাপে এসে মনে পড়ে সৃজিতের চিঠির কথা। তখন এক ঝটকায় পড়তে হয়েছে। হয়তো গভীর কোন তাৎপর্য চোখ এড়িয়ে গেছে মনের অন্তমনস্কতায়।

সবিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরাম পিছু ফেরে।

—কি হল, ফিরলে যে আবার?

—স্কুলের একটা দরকারী কাগজ কেলে যাচ্ছিলুম।

গলির বাকি কাঁদনের সঙ্গে দেখা। অসম্ভব রকম দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বুকে নিয়েও কাঁদনকে দেখে সবিতার চলা খেমে যায়।

একমাথা শুকনো ঘাঁটা জঞ্জালের মত চুল। রুখু রুখু চোয়াড়ে মুখ। ময়লা পাংলুন। গালে ধসখসে বিল্মী না-কামানো গৌক দাড়ি। কাঁদন বড় একা। ও যেন সব সময়েই কিছু হারাচ্ছে।

—কাঁদন খুব রেগে আছিস আমার ওপর, না?

কিছু না ভেবেই বলে কেলে সবিতা।

—কিছু বললেই তোরা রেগে যাস কাঁদন। তুই এত জানিস, এত বুঝিস আর আমাকে বুঝিসনে। আমাকে তোরা বুঝতে চাসনে কেন?

কাঁদন কোন জবাব দেয় না। পায়ের বুড়ো আঙুলের বড় নখটা রাস্তার পাথরে ঘষতে থাকে।

শোন, আমার স্ট্রটকেশে তিন চারটে কাপড়ের নীচে একটা টাকা আছে— নিস্। কি খাতা কিনবি বলছিলি না?

সবিতা চলে যাওয়ার পরও কিছুটা সময় কাঁদনের চোখে লেগে থাকে সবিতার মুখের সতেজ প্রসন্নতা।

কাঁদনের সব গুলিয়ে গেল, কাল রাত থেকে যত কিছু মনের মধ্যে গুছিয়ে তুলেছিল সে। কাল রাত থেকে একটা ঘুণার পাহাড় একটু একটু করে মাথা তুলেছিল কাঁদনের চেতনায়। নিজেকে সে প্রস্তুত করছিল একটা কবিতার জন্যে। ঘুণার কবিতা। সমস্ত কিছুর ওপর বিদ্বেষ-বিরক্তি জমিয়ে তোলার কবিতা। শব্দের ছন্দের বক্তব্যের পরস্পর-বিরোধী অসঙ্গতি ঘটিয়ে আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করে আধুনিক কবিতা।

অসঙ্গতি। কথাটা শুনেও বেখাপ্পা লাগে। বয়স্ক-মাথাদের ভুরু কুঁচকে ওঠার

মত একটা শব্দ বটে। কিন্তু এটা শব্দ নয়। প্রতীক। আধুনিক জীবন, আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক সাহিত্য, সব কিছুই অসঙ্গতির উপাদানে গড়ে উঠেছে। এই কলকাতা শহরটা আধুনিক। এর মধ্যেও অসঙ্গতি একাকার হয়ে আছে। শহরের সেরা রাজপথে অতি-আধুনিক বুটকের পাশাপাশি মোষে-টানা গাড়ির অসঙ্গতিটাকেও একটা প্রতীক বলে মনে হয়। বাইরে গতি ভেতরে মন্থরতা এটাইটেই কি এ-যুগের চরিত্র নয়? এই বাড়িটাও আধুনিক। এর মধ্যেও তাই অসঙ্গতির অঙ্গকার কোণে কোণে ছেয়ে আছে।

দিদির সঙ্গে বিরামবাবুর কি মিল? দিদির সঙ্গে আমারই বা কি? আমার সঙ্গে বিরামবাবুর? আমার সঙ্গে চিত্রারই বা সম্পর্ক কি, শুধুমাত্র অপোজিট সেক্সের সামান্য স্বাভাবিক আকর্ষণটুকু ছাড়া?

আর দিদির সঙ্গে সৃজিতের?

কাঁদনের চিন্তাটা ধমকে গেল একটু।

দিদি ওকে ভালবাসে। জীবনে অনেক ব্যর্থতার পর সৃজিতকে পেয়ে দিদি ভেবেছে সৃজিত ওকে বাঁচাবে। এটা এক রকমের বিশ্বাস। প্রবল নৈরাশ্রের উপলব্ধিকে খুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে বিশ্বাসের ওষুধ। কিন্তু আমি জানি এ বিশ্বাস বেশিদিন টিকবে না। দিদির জীবনে কোন নির্ভরশীল ভূমিকা নেওয়ার মত ক্ষমতা সৃজিতের নেই। দিদি সমাজকে ভাঙতে চায়। কিন্তু সমাজের পান্টা-আক্রমণকে প্রতিরোধ করার মত তীব্র একাগ্র আত্মনির্ভরতা কি গড়ে তুলেছে মনে? সমাজ যেদিন ওদের ভালবাসাকে অস্বীকার করবে, সেদিন সমাজকে অস্বীকার করার মত স্পর্ধা ওদের বুকের পাটায় ফুলে উঠবে কি? তবু এও সত্যি সৃজিত নষ্টলে দিদি মরে যেতো। বিরামবাবুর নির্বিকার প্রাণহীনতা আর দিদির অবিরাম আত্মকেন্দ্রিক বিক্ষোভে এই বাড়িটা কিছুদিন আগে নরকের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছিল। সৃজিতের আবিভাবে বাড়িটা স্বর্গ না হয়ে উঠলেও নরক হয়ে ওঠার অনেক উপসর্গ দূর হয়েছে। দিদি ঋণিকটা বাঁচতে শিখেছে।

সেফটি রেজারের কোঁটোয় দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে কাঁদনের নিজেকে বেশ খুশি খুশি মনে হল। অন্তমনস্কতার ফলে দাড়ির কয়েকটা জায়গা কেটেছে, জালা করছে। খুশি ভাবটা রক্তপাত সত্ত্বেও বেখাপ্পা মুখের চেহারাটা পান্টে মাহুষের মত গুল্মী মাজাঘষা হয়ে উঠেছে বলে

নয়। এই বাড়ির সম্পূর্ণ চেহারাটাকে ঠিকমত যুক্তি-তর্কের বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে বিচার করতে পেরেছে বলে।

বিরাম আপিসে চলে গেছে খেয়ে দেয়ে। চিত্রারও খাওয়া হয়ে গেছে।

মিষ্ট ঘুমোচ্ছে। প্রতিদিনই এই সময় বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়। পাশের বাড়িতে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে শুনেও কঁাদন বারান্দা থেকে ওঠে না। রোদের জ্বালায় ভেতরে আরও কিছুক্ষণ বসে মনের জ্বালায় আরও কিছু ভাববার মনোভাব তাকে উৎসাহ জোগায়।

চিত্রা এসে বকুনি দেয়।

—কঁাদনদা, খাবে না? বিস্তর মা রেগে যাচ্ছে। কেন মিছিমিছি বেলা বাড়ানো বল তো?

চিত্রা কঁাদনের সামনে থেকে সেকটি রেজারের বাস্‌সটা তুলে ঘরে রেখে আসে। ভাঙা চায়ের কাপে কুচিকুচি চুল আর সাবানের ফেনা মাখানো জলটা ঢেলে দেয় বারান্দার কোণের গর্তে। গামছা তেল এনে কঁাদনের সামনে জড়ো করে।

—মাথিয়ে দোব?

—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে বাবু, অনেকক্ষণ। আপনি উঠুন তো মশায়।

—কেন এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হল কেন?

—খিদে পেল তাই। আপনি তো দার্শনিকের মত বিশ্বজগৎ তুলে এতক্ষণ বিশ্বজোড়া ভাবনা ভাবছিলেন। ওদিকে আমার গা-হাত ব্যথা হয়ে গেল জিনিস নাড়তে-সরাতে। সামনের ঘরটা কি রকম গুছিয়ে সাফ করেছি সেদিকে চোখ আছে কি? চান করার সঙ্গে সঙ্গেই খিদে পেয়ে গেল, তাই খেয়ে নিলাম। উঠবে কি?

—টেনে তোল।

—না, টানতে হবে না। বোস, তেলটা মাথিয়ে দিই। সবিতাদি কাল তোমায় কেন বকেছিল, কঁাদনদা?

চিত্রা হঠাৎ আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করে।

—আমাকে? কই না তো?

—না তো! তাহলে মুখ গোমড়া করেছিলে কেন?

—তোমার সঙ্গে বেশি মাখামাখি মাতামাতি হচ্ছে বলে?

—সত্যি? ঠিক করে বল না।

—কেন, কথাটা কি মিথ্যে দিদির ?

চিত্রার গালে একটা টোকা মেরে কান্দন নাইতে ওঠে ।

খাওয়া দাওয়ার শেষে কান্দন গায়ে জামা চড়িয়ে নীচে যায় ।

সবিতার বাস্র থেকে একটা টোকা যথাসময়ে সে নিজের পকেটে ভরে নিয়েছে । খাতা কেনার টাকাটা ভাঙিয়ে সে একটা সিগারেট কেনে । প্রায়ই সে চেনাজানাদের লুকিয়ে চেয়ে মেগে নানাভাবে সিগারেট খায় আজকাল । খাওয়ার চেয়ে সিগারেটটা হাতে ধরতে পারার মধ্যেই কেমন একটা রোমাঞ্চ আছে, রোমাঞ্চকর তৃপ্তি । যত তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরা যায় তত তাড়াতাড়িই যেন শরীরে মনে সাবলকহের স্পন্দন ছড়ায় । ঠিক ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মায়াদের কোমর পর্যন্ত বেড়ে উঠেই মেয়েরা ছটকট করে কোমরে লাড়ি জড়াতে ।

মেঝেয় বিছানা পেতে জামা খুলে শুয়ে তারপর সিগারেটটা ধরাল কান্দন । বালিশের পাশে রাখা ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ । গত কয়েকদিন ধরে সে ওটা পড়ছে । আর একটু এগোলেই শেষ হয়ে যায় । অথচ সকাল পর্যন্ত তার পরিকল্পনা ছিল দুপুরে রাত্রে ভাবা কবিতাটা শেষ করবে । কিন্তু দিদির আকস্মিক স্নেহপ্রবণতার উত্তাপে তার মনের জমাট-বাধা বিরুদ্ধাচারের নেশা গলে গেছে ।

কান্দনের ডান দিকের জানলার পাল্লার কান দিয়ে বোদের ফালি ঘরের মেঝেয় একটা মাঝারি সাইজের কাসার খালার মত আকৃতি এঁকেছিল । কান্দনের সিগারেটের ধোঁয়া বোদের স্পর্শে এসে নাচের ভঙ্গিতে রঙিন আর আকাবাকা হয়ে যায় । বাকি চারপাশ স্থির । বেড়িওটা বন্ধ হয়ে গেছে পাশের বাড়িতে রাগপ্রধান গানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে । রান্নাঘরে এঁটো বাসনের ওপর দিয়ে দু-একটা ইঁদুর তন্তু পায়ে ছোটোছুটি করছে হয়তো ।

সিগারেটটা শেষ করে তার দক্ষাংশ ও ছাই সবসুদ্ধ জানলার বাইরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কান্দন ‘যোগাযোগ’ নিয়ে শুল ।

চিত্রা কিছুতেই পড়তে পারছিল না । কি নিয়ে সবিতাদি বকাবকি করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ না জানা পর্যন্ত ।

জল খাওয়ার ছল করে চিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে এক গ্রাস জল কুঁজো থেকে গড়িয়ে খেল । তারপর কান্দনের বিছানার কোণে বসে পড়ল ।

—সত্যি করে বল কান্দনদা, কি হয়েছে ।

—দাঁড়াও বলছি, এই চ্যাপটাটা শেষ করে নিই।

কাঁদনের বুকের কালো লোমের দিকে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। তার চোখে পড়ে কাঁদনের সীমের মত চ্যাপটা নাক। আর ছোট্ট কপাল। পুরুষমানুষের কপাল বড় হওয়াই ভালো।

—কই বলো।

—পরন্তু রাতে তুমি বারান্দায় উঠে গিয়েছিলে সেটা বিরামবাবু টের পেয়েছেন।

—সবিতাদি কি বললে?

—কি বলবে আবার। যা বলতে হয়, সব গুরুজনেরা যা বলে, তাই বলে। চাপকের শ্লোক আওড়ালে।

সব কিছুর মধ্যেই কাঁদনের একটা বেপরোয়া ভাব আছে। কিন্তু চিত্রা এই ভেবে ভয় পায় যে এ সব ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই নজর আর শাসন কড়া হয়ে থাকে। সবিতাদি মুখে কড়া কথা বললেও মনে ক্ষমা করবে। কিন্তু বিরামবাবুর নীরব উপেক্ষা কিংবা বিরূপ মনোভাবের কাছে ক্ষমা পাওয়ার প্রশ্ন অবাস্তব।

চিত্রা পড়ার টেবিলে এসে পড়ায় মনযোগ দেয়। পড়ার মধ্যেই তার বেশি মনযোগ পড়ে কাঁদনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মেলামেশার বিধি-নিবেধ ও কড়াকড়ির খসড়া রচনায়।

কাঁদন পড়তে পড়তে এক সময় পাশ ফিরে শোয়। খানিক পরেই তার নাক ডাকে। চিত্রার বিলম্বিত রকম অসহ্য লাগে এই নাক ডাকা। নাকে দেশলায়ের কাঠির সুড়সুড়ি দিয়ে সাময়িকভাবে নাক ডাকা থামানোর কায়দাটা অন্য দিনের মত আজও চিত্রার মাথায় এল বটে, কিন্তু কাজে খাটালো না।

ছপুরের রোদ চিত্রার বই খাতার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল রাস্তায়। বেখানে বিকেলের জলের জন্তে টিউবওয়েলের কাছে সারবন্দী বাসতিগুলোর মুখ হাঁ হয়ে থাকে।

প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে কাঁদনের চোখে পড়ল মিন্টু তাকে ঠেলা মারছে।

—ও মামা, ওতো না, ওতো না।

সবিতা মিন্টুর পাশে একটা হাঁটুর ওপর খুতনি রেখে হাতের আঙুলে মাথার সুরুচুল পাকাতে পাকাতে কি বেন ভাবছে। কাঁদন ছু-হাতের চেটোর চোখ

রগড়ে উঠে বসল।

—তোমার হয়েছে কিরে কাঁদন? এত ঘুমোচ্ছিস? কখন থেকে ডাকছি। কটা বেজেছে জানিস? সাড়ে পাঁচটা বাজে। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। নে মুখ ধুয়ে আয়।

গভীর ঘুমে গলার স্বরটাও মাথার মত ভারী ভারী হয়ে গেছে।

—দিদি, আলো জ্বাললে কখন?

—এই তো কিছুক্ষণ।

—কিছুক্ষণ মাত্র। আশ্চর্য।

—কি আশ্চর্য রে।

—দাঁড়াও বলছি।

বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কাঁদন বলে, দিদি, একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম।

সবিতা কাঁদনের দিকে তাকায়। তার চোখে উৎসাহ বা আগ্রহের কোন চিহ্ন কোটে না।

—কাল রাত্রে যখন ‘যোগাযোগ’টা পড়ছিলাম তখন তুমি টুইদার গল্প করছিলে। আমি স্বপ্নে টুইদিকে দেখলাম। পোয়াতি হয়েছে। তাকে দেখতে হয়েছে কুমুদিনীর মত। মধুসূদনবাবু গড়গড়া টানছেন ঘরের এক কোণে। টুইদি তাকে লুকিয়ে সেতারের তারগুলো ছিড়ে গলার জড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে মরে গেল।

কাঁদন কয়েকটা দৃশ্য কেটে বাদ দিলে তার স্বপ্নদর্শন থেকে। কুমুদিনীর মুখের সঙ্গে সবিতার মুখের সাদৃশ্যের দৃশ্যটা।

—স্বপ্নটা বড় আশ্চর্যের না দিদি? কাঁদন বোকার মত জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ। ক্রেড বলে : সব স্বপ্নেরই কার্ণ-কারণ আছে। আমি একটু আঁধা পড়েছিলাম ক্রেড। বেশ ভালো লাগত।

—ঠিক ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত।

—তুই ঠাট্টা করছিস?

—এটা ঠাট্টা হল? ক্রেড আর ডিটেকটিভ উপন্যাস এক জাতের নয় বলছো? দেখ, ক্রেড বাতি, হয়ে গেছে বহুদিন। কবে থেকে জান? যেদিন থেকে মাহুস মার্কসবাদকে পেয়েছে। মাহুসের মন যে শুধু যৌনচেতনা বা কামোত্তেজনার কীতদাস নয় এটা তুমি, তুমি কেন, কেউ অস্বীকার করতে

পারো? আসলে মনটা কি? মনও একটা ম্যাটার। এনভায়রনমেন্টের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমবিবর্তন.....

বেশ একটা তর্ক করার নেশা কাঁদনের চোখে মুখে স্পষ্ট হতে দেখে সবিতা বারান্দায় উঠে যায়।

ক্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বুঝতে পারি। মার্কসবাদের মনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি আমার মনকে বুঝি না। ঠিক এই মুহূর্তে আমার চোখে কারা এলে আমি খুশি হই। কিন্তু কেন কাঁদলাম তার কৈফিয়ৎ কাউকেই দিতে পারবো না। মনের প্রসঙ্গে অনেক আজ্ঞে-বাজ্ঞে ভাবনায় সবিতার মন ছেয়ে গেল।

বারান্দাটা টলে আড় হয়ে গেলে কেমন হয়? নীচে গড়িয়ে পড়বো। মুখটা বিকৃত বীভৎস হয়ে যাবে। প্রচুর রক্তক্ষয়ের অবসাদে ঝিমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে শরীরটা। শরীরে আর চেতনা নেই। সারা জীবনের স্মৃতির ভার, সারা জীবনের অভিজ্ঞতার জালা, সুখ-দুঃখের, পাপ-পুণ্যের বিচার বোধ, সব কিছুই অদৃশ্য পথে অসীম শূন্যে ছায়ায় অঙ্ককারে মিলিয়ে যাবে। কোন্টা সুখের? সেটা না এটা? এই প্রতিদিনের ঘন্ডে নিজেকে ভাঙা-গড়া বাঁচা-মরা। সৃজিতের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে জীবনের ভবিষ্যৎকে ভাবতে ভাবতে বিরামের সঙ্গে নিরুত্তাপ দিনযাপনের যান্ত্রিক অভ্যাস বজায় রাখার প্রতিদিনের ঘন্ড।

ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে সবিতা নিজেকে। শক্ত হাতে রেলিঙটা চেপে ধরে। কিন্তু প্রাণের বস্তুগায় প্রাণহীন বস্তু একটা অবলম্বন নয়। তাই একটা জীবন্ত প্রাণীকে খোঁজ পড়ে।

—চিত্রা, এই চিত্রা শুনে যা।

চিত্রা আসতেই সবিতার মুখে এমন একটা প্রশ্ন ফুটে ওঠে, যা সবিতা প্রশ্ন করবে তাবেনি।

—তুই কখনো অ্যাকসিডেন্ট দেখেছিস?

—কি রকম অ্যাকসিডেন্ট? ছোটখাট অ্যাকসিডেন্ট অনেক দেখেছি।

—চোখের সামনে একটা মানুষের মৃত্যু ঘটতে দেখেছিস অ্যাকসিডেন্টে?

—একেবারে চোখের সামনে একটা মানুষ মরা? না তো দেখিনি। খবরের কাগজেই যা দেখেছি অনেক বড় বড় অ্যাকসিডেন্টের ছবি।

ছুইজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর স্বগতোক্তির মত অস্পষ্টভাবে শুধুমাত্র নিজেকে শোনাতেই যেন কথা

বলে সবিতা। —জানিস চিত্রা আজ রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট দেখলাম।
এতক্ষণে চিত্রা সবিতার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নাগাল পেয়ে বেশ সহজ
হয়।

—বাসে চাপা পড়ল একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। হাতে রেশন ব্যাগ ছিল।
কিছু কিনে-কেটে বাড়ি কিরছিলেন হয়তো।

চিত্রা জিভে চুক্ চুক্ শব্দ করে। মৃত মানুষটার চেয়ে তার বেশি সমবেদনা
জাগে মৃত্যুর অন্ততম দর্শক সবিতার ওপর। যে মানুষটা নিজেকে নিজেকে
দিনরাত মরার কথা, আত্মহত্যার কথা, উদ্গাদ হয়ে যাওয়ার কথা শোনাচ্ছে, তার
চোখে এমন-সব ভয়ংকর মরার ছবি পড়ে কেন?

—কিছুতেই তাকাতো চাইছিলুম না। তবু চোখদুটো কয়েকবার বেকে গেল।
একটু-আধটু রক্ত ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। দেখতে দেখতেই বিরাট
ভিড় জমে গেল। এখনো গা-হাত ঝিম-ঝিম করছে।

—চল সবিতাদি, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—হেঁদোয় চল।

—মিষ্টু একা থাকবে কার কাছে?

—ওকেও নিয়ে যাব তো।

—না বাবা, আমি আজ আর বইতে পারবো না ওকে। তাছাড়া বাইরে
বেকুলেই ওর কেবল ঘ্যানর ঘ্যানর। এটা ওটার বায়নাঝা। তুইই বরং
ওকে নিয়ে পার্কে যা। আমি আজ একটু একা থাকি।

—না, না, একসঙ্গে চল। মিষ্টুকে আমি সামলাব।

—তাহলে গা-হাত ধুয়ে নিই।

হঠাৎ অনেক আলো, হাওয়া, স্নিগ্ধ জল, মন্থর মানুষ, মাথার ওপরের বিস্তৃত
আকাশ, বেধুন কলেজের সার-বাধা দেবদারুণ ছবির মধ্যে সাঁওতালী চরিত্রের
আভাষ, কুস্তিগিরদের গদা-গদা পারের মত পাম্ গাডের গুঁড়ি, অন্য দৃষ্টকোণ
থেকে অতি পরিচিত ট্রামকেও অন্য কোন বহুস্তময় যন্ত্রযান মনে হওয়া ইত্যাদি
পরিবেশ ও আবেষ্টনীর প্রতিকলনে সবিতার মনের চেহারার রূপান্তর ঘটে।

চিত্রা বলে,—ঐদিকটায় বাই।

না, আমি এখানেই দাঁড়াই। বেশি আলোয় ভালো লাগে না দাঁড়াতে। তুই

যা মিন্টুকে নিয়ে।

শুধু আলোর প্রতি অসহনশীলতা নয় বা অল্প অন্ধকারে মনের ভাঙা-চোরা ভাবনাগুলোকে স্পষ্ট করে দেখার সাধ মেটানোর জন্তে নয়, সবিতার ঠিক ঐ জায়গাতেই দাঁড়ানোর অন্য কারণ ছিল। সৃজিতের সঙ্গে এসে ঠিক এই জায়গাতেই সবিতা দাঁড়ায়। গত দশ-পনেরো দিন আগেও সব শেষ একবার এসেছিল।

সৃজিত! এটা একটা নাম নয়। শব্দ নয়। শিহরণ। সৃজিত মানে বন্ধুত্ব, অনাবিল প্রেম, আত্মার মুক্তি, আমার সব, সর্বস্ব। সৃজিত আমাকে মরা থেকে বাঁচাল। বহুদিনের জীর্ণ দুর্গন্ধেভরা কুপের আবদ্ধ অন্ধকার থেকে হাত ধরে টেনে তুলল আলোর বিশ্বভুবনে। যদি মরেই যেতাম, কত আনন্দ, উপভোগ, অধিকার, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, অজানা থেকে যেত।

এ সুখ চিরস্থায়ী নয় কেন?

সৃজিত কি লিখেছে চিঠিতে। ‘অনন্তকাল তুমি আমার আত্মার আত্মীয়ই থাকবে’। অনন্তকাল? না, অত সুখ সহিবে না আমার বরাতে। বিরামকে নিয়েও আমি অনন্তকালের স্বপ্ন-রচনা করেছিলাম। ও যে কি করে এমন বদলে গেল। সব বদলে যায় সৃজিত। এখনও জীবনের যা খাওনি। আমি যেন সেদিন না বাঁচি।

‘তাহলে তোমার আমার জন্ম হয় কেন পৃথিবীতে? দেহাতীত কোন ঐশ্বর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তুমি জীবন বিদীর্ণ করে হাহাকার কর সবিতাদি? আমি কেন সাড়া দিয়ে তৃপ্ত হই সে ডাকে যা তোমার দেহের অন্ধকার কন্দরের আদিম আহ্বান নয়, মুক্তির পিপাসা’। দেহের অন্ধকার কন্দর? দেহ সম্পর্কে সৃজিতের ধারণা আছে নাকি কিছু? দেহের আহ্বানকে কি অসুতব করার অভিজ্ঞতা পেয়েছে? নাকি শহরের অতি-চতুর মনের ব্যাধিগুলো ওকে অকালে পাকিয়ে দিয়েছে। না, সৃজিত অন্য অর্থে বলেছে কথাটা। ও এখনও পাকেনি। শুদ্ধ সুকোমল ওর হৃদয়। হৃদয়টাই সব সৃজিত। দেহটাকে ছুঁয়ো না। ওর শেষ আছে, বার্ষিক্য আছে। হৃদয়ের একূল ওকূল দু-কূল ভেসে যায় সজ্ঞানী, কিছু আর.....তুমি তো অনেক অবেলায় এসেছ সৃজিত। আমার দেহের কতটা মাধুরী দেখতে পাও? দেহটাই কি অভিশাপ? অসংখ্যই তো ভালবেসেছে। কি পায়নি বলে ঘৃণা জানিয়ে চলে গেছে? বিরাম? তোমাকে তো একদিন বলেছিলাম সৃজিত, বিরাম আমার দেহটাকেও

.....তাও যদি বাসতো আমি ধন্ত হয়ে যেতাম। ওর কাছে আমি এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়ে কতটা বেশি?

তবু ওকে আমি ঘৃণা করতে পারি না। শ্রদ্ধা, না-ভালবাসা, না-ভক্তি কি জানি না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সুজিত। কোন উত্তর দিইনি। কোনদিন যদি দিতে হয় কি দোব? দিলেও ও বুঝবে না। এখনও অপরিণত। যাক এসব জটিল ভাবনা কেন ভাবছি? মনের খুশি হয়ে ওঠাকে অকারণে জট পাকানো। ট্রামগুলো সার বেঁধে দাঁড়াল কেন? মানুষের চলা যেন থেমে গেছে খানিকটা। লাইনের গুণ্ডগোল? না—শ্লোগান ও প্রোশেসন, আজ কি মিটিং ছিল কিছু, হ্যাঁ তো, খাণ্ড আন্দোলন, মফস্বলের না কি শহরতলীর কৃষকরা ফিরে যাচ্ছে। অরের দাবি। ক্ষুধিতদের খাণ্ড সংগ্রহের অভিযান। আমাদেরও তো ফুটপাতে নামতে হবে। আমরা কৃষক মজুর নই, শিক্ষক, জাতির জন্মদাতা, গুরু। আমরাও ক্ষুধিত। চিংকার কলরব, শ্লোগান, অনশন, অবস্থান ধর্মঘট.....প্রয়োজনটাকে এইভাবে দাবি করে তুলতে হবে। দাবি কি মিটবে? মিটতেও পারে। কাগজে-পত্রে যা পাওয়া যায় তাতে সংগঠন বেশ জোরালো রূপ নেবে মনে হয়। এতেও তো খুশি হওয়া যায়।

যদি এমন হয় যে দাবি গর্জে ওঠার আগেই তা পূরণ হয়ে গেল। তা কি হয়? বেতন বৃদ্ধি বা খাণ্ডদ্রব্যের মূল্য কমানো অথবা বোনাস দেওয়া এসব ছাড়া আর যে সব দাবি? সেগুলো কি ভাবে মিটবে? আমি বিরামের কাছে একশোটা গলার জোর নিয়ে চিংকার করবো, ওগো, আমাকে ভালবাসো, ভালবাসো। সুজিত নীরবে একটা ক্লটানা খাতার পাতায় হঠাৎ লিখে ফেলেছিল—‘আমি তোমাকে ভালবাসি’। তারপর অনেক কেটেও মুছতে পারল না। ধরা পড়ে গেল। বুকে ধবক ধবক করে উঠল হুৎপিওটা। সুজিত তখন কঁকড়ে, হয়তো বা ভয়ে কঁচকে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কেন লিখল সুজিত? তার আগে ওর পাশে বসে আমি কিছু বলেছিলাম। মিক্টর জন্তে সোয়েটার বুনছিলাম মনে আছে। সুজিত কান্নার বন্ধ। প্রায়ই যাওয়া আসার ফলেই অন্তরঙ্গতা। ওর কাছে রোজই কিছু কিছু নিজের ব্যর্থ জীবনের ভগ্নাংশ প্রকাশ হয়ে যেতো। সেদিন কি ওকে উপলক্ষ্য করেই বলেছিলাম, ‘কেউ যদি পৃথিবীর কোন সূদূর প্রান্ত থেকে মিথ্যে করেও বলে আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহলে বেঁচে যাই আমি’। সুজিত জবাবটা

লিখল। সে রাতটা জীবনে আর ফিরবে না। খুশি, খুশি, ঘুম নেই; খোলস
ধসতে লাগল সারা রাতের চিন্তায়।

আজও আমি খুশি। সৃজিতই খুশি করল।

বুকে বেড় দিয়ে কাঁধে উঠে যাওয়া শাড়িটাকে টেনে গায়ের সঙ্গে ঝাপিয়ে
এঁটে নিতে সবিতা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। মনে হয় যেন অল্প খুশির এই
সংক্ষিপ্ত বর্তমানটুকুকে সে বুকের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করছে।

সবিতাকে একলা থাকার সুযোগ দিয়ে চিত্রা মিন্টুকে কোলে নিয়ে, দু-একবার
হাঁটিয়ে, অনেকদূরে চলে গিয়েছিল চারপাশে আইবুড়ো ছেলেদের চোখ দিয়ে
মেয়েদের ভালো-লাগা শুঁকবার জ্বলজ্বলে চাউনির দিকে জ্বলজ্বল না করে। অনেকে
চিত্রার শরীরের এত কাছ দিয়ে হেঁটে গেছে যেন ওর আচলের একটু ছোয়া
পেলেই আজকের রাতটা অনিদ্রার সুখে ভরে উঠবে তাদের।

চিত্রা এমন কিছু সুন্দর নয়। সাধারণ উপন্যাসের নায়িকাদের যতটা রূপ
ধাকলে উপন্যাসের সমাদর বাড়ে চিত্রার বোঁবনপুষ্ট শরীরে তার সমর্থন নেই
কোথাও। মুখটাকে মেজে ঘষে অর্থাৎ পুরু পাউডার স্নো-এর প্রলেপে মুখের
অসংখ্য ব্রণ-ঘটিত ক্ষতকে ঢাকা দিলে লোকচক্ষে নেহাৎ মন্দ মানাবে না।
কিন্তু আসল ক্রটি রয়েছে শরীরের বেমানান গড়নে। মাথা থেকে কোমরের
অংশটা কোমর থেকে পা পর্যন্ত অংশের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার ক্রটি। সামনে
থেকে দেখলে ক্রটিটা যত ঢাকা পড়ে তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয় পেছন থেকে
ওর ভারী পাছায় নজর লাগলে।

নিজের রূপ বা শারীরিক গড়ন-গঠন সম্পর্কে চিত্রার নিজেরও কোন দুর্বলতা
নেই। বরং ঐ ব্যাপারে খেদ না রেখে বেপরোয়া ভাবে মেলামেশা চলা-হাঁটার
সবলতাটাই তার মধ্যে প্রকট।

মিন্টুর মুখের আর বয়স্ক ছেলেদের চোখের স্থাংলামি সামলাতে গিয়ে চিত্রা
বিত্রত আর অর্ধৈর্ষ হয়ে ফিরে আসে সবিতার পাশে। মিন্টু মায়ের কোলে
উঠেও আইসক্রীমের বায়না বিরতি ঘটায় না।

চিত্রা বলে, চল এবার বাড়ি ফিরি।

একাগ্রভাবে অনেক কিছু ভাববার সুযোগ পেয়ে সন্ধ্যাটা সবিতাকে শান্তি দেয়,
মনের অনেক মিছেমিছির জটিলতাকে মুছে ফেলতে পেরে সহজ নিশ্বাস
নিতে পারে।

মিন্টুর একরোখা জেদী বায়নাটা যে আসলে চোখ-জোড়া ঘুমের জন্তে সেটা

বুঝে সবিতা মিন্টুর মাথা কাঁধে হুইয়ে পিঠে আস্তে চাপড় দিতে দিতে পথ হাঁটে।

সবিতা ঠিক করে গিয়েই ঘুম পাড়াবে মিন্টুকে। মিন্টু ঘুমোলে 'যোগাযোগ'টা পড়বে আরেকবার। কুমুদিনীর ট্রাজেডি হয়তো তার নিজের জীবনের সমীকরণে আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব ঠেকবে। চেনা সাহিত্যকে জীবনের অভিজ্ঞতা কি নতুন স্বরূপে চেনায়? পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার সাথে সাথেই কি লেখকের রচনা করা চরিত্রও রূপান্তর পায়? যেমন?

সবিতা নিজেকে প্রশ্ন করে।

যেমন? ঐ তো কুমুদিনীই।

সবিতার একসময়ে, ছাত্রী জীবনের মধ্যযুগে আর রাজনৈতিক জীবনের শৈশবকালে, মনে হয়েছে কুমুদিনী আর মধুসূদনের সমস্যায় শ্রেণী সমস্যারই প্রতিচ্ছায়া জড়ানো। ফিউডাল, যার ধ্বংস হচ্ছে, আর বুর্জোয়া যে ক্রমশ পুষ্ট হবার পথে, এই দুটো শ্রেণীর অস্ত্রবিবোধের প্রতিচ্ছায়া। আজ কেন তা মনে হয় না? আজ মনে হয় কুমুদিনী একটা অস্তিত্বের আত্মমর্যাদার মহত্তর প্রশ্ন। নারীর ব্যক্তিগততত্ত্বাবোধের নতুন-জাগা সমস্যা।

বাড়ি ফিরে চিত্রা বই নিয়ে বসে। কান্দন বেরিয়ে গেছে। সবিতা কাঁধে মাথা রেখে ঘুমানো মিন্টুকে বিছানায় শুইয়ে তার ঘুমকে আরও গাঢ় করে দেবার তাগিদে পাশে শুয়ে থাকে। বিস্তর মা রান্নার হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে এলে সবিতা গলা খাটো করে তাকে নির্দেশ দেয়।

পাশের বাড়িতে কে বুঝি হঠাৎ রেডিওটা খুলে দিলে। একটু আগে শুরু হওয়া রবীন্দ্র সংগীত বেশ স্পষ্ট হয়ে চারপাশের বাতাসে ব্যথার আলোড়ন ছড়াল।

সবিতাও মূহু স্বরে রেডিওর আসল গানের সঙ্গে অবিকলভাবে তার নকল গলাটা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—“কেন বামিনী না যেতে জাগালে না……”

গানের সুর জানে না কিন্তু ভাষা জানে এই বিচারে সবিতা প্রায় অর্ধেক গীতবিতান মুখস্থ বলতে পারে। তার এই দক্ষতার প্রকাশ প্রায়শই ঘটে থাকে চিঠির পাতায়, একেবারে শীর্ষদেশে, সম্বোধন শুরুর আগে যেখানে চিঠি শুরু হয়।

গান গাইতে গাইতেই সবিতার মনে এসে গেল, অতদিনের মত আজ সে আগে ধাবে না। বিরাম এলে একসঙ্গে খেতে বসবে দুজনে।

.. তিন ..

যে কোন মাসের শুরু ও শেষ ভারী বিপর্যয়ের সময়। মাসের শুরু ও শেষের অর্থ মাইনের টাকার শুরু ও শেষ।

শুরুর দিকে পোয়াতে হয় কি কি বিষয়ে কত খরচ করা হবে তার ঝামেলা। শেষের দিকে পোয়াতে হয় কতটা খরচ কোন্ বিষয়ে না করা হবে তার ঝাট। বেহেতু জীবন মানেই টাকার মাপে জীবন।

সকালের দিকে বিরাম ও সবিতার মধ্যে একটা অল্প-কথার বচসা বা বিবাদ হয়ে গেল, যা প্রায়শই ঘটে থাকে সব সংসারে। টাকা-কড়ির হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত বচসা। বিরামের অভিযোগ সবিতা কেন হিসেবের বাইরে খরচ করে। সবিতার অভিমান বিরাম নিজে কেন সংসারের খরচ-পত্রের দিকে কানা-বোবা হয়ে থেকে শুধু মাঝে মাঝে খুঁত ধরার কর্তালী করতে আসে। নিজে দায়িত্ব নিয়ে সংসার চালালে পারে।

অথচ এর মধ্যে যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হল যে টাকা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়নি। হয়েছিল মিন্টুর গতকাল রাত থেকে শরীর ধরাপ হওয়ার ব্যাপার নিয়ে। সেটাই ক্রমে ক্রমে গড়িয়ে এল টাকার হিসেবে, টাকার সঙ্গে জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সূত্র বেয়ে।

সবিতা ও বিরামের প্রাতঃকালীন ঘরোয়া কলহের উত্তাপ ঠিক বধন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয় হয় শর্বাণী এল সেই সময়ে। শর্বাণীর সঙ্গে ছিল অপরেশ। বিরামের সঙ্গে অপরেশের পরিচয় করিয়ে দেয় শর্বাণী। অপরেশ বারান্দায় গিয়ে আলাপ-আলোচনায় বসে বিরামের সঙ্গে। বিরাম সকালের ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে তিন-চারটে খবরের কাগজ পর্যায়ক্রমে উন্টে-পাণ্টে দেখছিল। এতগুলো কাগজ রোজই আসে বিরামের কাছে। এবং বিনামূল্যে। বিরাম যে সাপ্তাহিক পত্রিকার আপিসে কাজ করে সেখানকার বন্দোবস্তে। পত্রিকাটি কলকাতার চেয়ে মফস্বলেই চালু বেশি। বাংলার বাইরে বাধা গ্রাহক আছে বেশ কিছু বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যদিও বেশ বড় হরফে লেখা থাকে অমুক চন্দ্র অমুক, আসলে তিনি মালিকমাত্র। সম্পাদকীয় স্তম্ভ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এবং সময়োপযোগী বিশেষ প্রবন্ধাদি সব কিছুরই দায়-দায়িত্ব বিরামের ওপর।

যিনি নামে সম্পাদক তিনি নামজাদা সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্য-রসিক বা সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে স্বনামধন্য। সাহিত্য সম্পর্কিত সভা-সমিতি বা স্থায়ী বহু সংগঠন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট। যৌবনকাল থেকেই দেশপ্রেমের অপরাধে ইংরেজ সরকার তাঁকে এত বেশি সময় মানুষের জীবন ও মানুষের তৈরি সাহিত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল যে পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সাধ ও সাধনা তাঁর সাধ্যায়ত্ত হয়নি। স্বাধীন ভারতের শুরুতেই তিনি নির্বাচনে নেমেছিলেন এম, এল, এ হওয়ার তাগিদে। নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজয়ের পরই তাঁর এই নির্ভীক জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক মুখপত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে।

বিরামের সঙ্গে মহিমারঞ্জনর বোণাষোগের ঘটনাটি আকস্মিক ও আকর্ষণীয় বলেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে জীবনে বেকারত্বের গ্রানিকে উপলব্ধি করার শুরুতে বিরাম একটা দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত ‘ফিচার’ ও পুস্তক সমালোচনা লিখত। সেই সময় ওর হাতে একটা প্রবন্ধের বই আসে বেশ মোটাসোটা। নাম ‘ভারত-আত্মা’ বা ‘শাস্ত-ভারত’ এই জাতীয় কিছু। ত্যাগ ও তিতিকার পথেই যে ভারতের মুক্তি, ইউরোপের যুক্তি-বিজ্ঞান যে ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্যের বিরোধী ও অন্তরায় প্রচুর ইংরেজি উদ্ধৃতির সাহায্যে গোটা বইয়ে শুধু সেই বিষয়টিই আলোচিত। বিরাম বেশ বড় ও জোরালো সমালোচনা লিখেছিল বইটার, সস্ত-পড়া বিশ্বের চিন্তাশীল মনিষীদের রচনাবলী থেকে যথোপযুক্ত যুক্তি-তর্কের লাগসই ব্যবহার ঘটায়। টুকরো টুকরো ভাবে প্রশংসা করলেও আসলে বইটিকে বিরাম উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক বলেই প্রমাণ করেছিল। অথচ সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে বিরাম দেখে অবাক হল যে সেই বইটির বিজ্ঞাপনে তার সমালোচনার প্রশংসাসূচক বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে এক জায়গায় জোড়াতালি দিয়ে ছাপা হয়েছে। ওপরে লেখা রয়েছে “মার্ক্স, হেগেল, রাসেল, বার্ণাড শ’, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে ‘অমুক’ পত্রিকা বলেন…………”।

আরো অবাক হবার কারণ ঘটলো আরো পরে। যেদিন ঐ দৈনিক পত্রিকার আপিসে রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক ভবতোষবাবু প্রবন্ধকার শ্রীমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর সঙ্গে যুথোমুখি আলাপ করিয়ে দিলেন বিরামের। বিরাম বিধা

ও দুর্বলতায় প্রায় কেঁচোর মত কঁচকে ছিল। কিন্তু ভরাট স্বাস্থ্য ও গভীর মুখাবয়বের অধিকারী মহিমারঞ্জন প্রায় পঞ্চমুখে প্রশংসা করলেন বিরামের লেখার। বহুকাল তিনি এই জাতীয় খাঁটি প্রবন্ধ পড়েননি বলে মন্তব্য করলেন বিরামের উদ্দেশে। ভবতোষকে বললেন, ‘আজকাল তো মশাই লোকে ভালো সাহিত্য নাড়া-চাড়া করে। তা বলতে হবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে বেশ কাজ পেলুম আমার বইটার। টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। মনে তো হয় খরচা শিগ্গির তুলে ফেলবো।’

যাবার আগে সেইদিনই তিনি বিরামকে আশ্বাস দিলেন একটা স্থায়ী চাকরির। শীঘ্রই তিনি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন, তাতে। বিরামের মত শিক্ষিত ও সুযোগ্য লোক যে না খুঁজেই পেয়ে গেলেন এজন্তে কৃতজ্ঞতা জানালেন নিজের ভাগ্যকে।

পরবর্তীকালে বিরাম সত্যিই কাজ পেল মহিমারঞ্জনের সাপ্তাহিকে। আজও কাজ করছে সেখানে।

বিরাম নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা বাড়ায় অপরেশকে। অপরেশ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আপনারা সাংবাদিকরা আমাদের একটু সাহায্য করুন।

বিরাম প্রশ্ন করে, আপনারা ধর্মঘটের তারিখ ঠিক করেছেন?

—না, এখন সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্তেই সামনে অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ধর্মঘট শুরু হবার আগে আমাদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া আর সরকার পক্ষের বেমানুম চূপচাপ মেরে থাকা এসবের ভিত্তিতে সারা বাংলা শিক্ষক ধর্মঘটের ওপর কিছু লেখা-টেখা ছাপুন।

বিরাম আশ্বাস দেয়, লেখালেখি বিস্তর হবে। তার জন্তে ভাববেন না। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে আপনাদের স্ট্রং ইউনিটির ওপর। মনে তো হয় পিপলস্ সিমপ্যাথি বা পিপলস্ সাপোর্ট শহরে বেশ বড় রকম আকার নেবে। কেননা এটা তো ঘটনা হিসেবে সত্যিই খুব সিগনিফিকেন্ট……মানে শিক্ষকরা রাস্তায় নামবে……এতে পলিটিক্‌স পছন্দ করেন না ঝাঁরা তাঁরাও……ই্যা, আচ্ছা, কি রকম অর্গানাইজেশন চলছে আপনাদের?

—চলছে তো পুরোদমে। শহর বা শহরের আশপাশের রিপোর্ট তো বেশ আশাশ্রদ। তবে ভয় আছে মফস্বলের শিক্ষকদের নিয়ে।

— কেন মফস্বলে কি সংগঠন নেই?

—সংগঠন আছে। যেখানেই স্কুল বা শিক্ষক আছে সেখানেই সংগঠন। তবে ওরই মধ্যে উনিশ-বিশ। ধরুন যেখানে শিক্ষক সংগঠন ছাড়াও আর পাঁচটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে সেখানকার মানুষের চেতনা অন্তান্ত্র বিষয়বস্তু অঞ্চলের চেয়ে ধানিকটা বেশি তাজা বা বেশি উন্নত হবেই। আসলে কি জানেন.....

অপরের গলাটা একটু খাটো হয়ে আসে।

—যারা দেশকে শিক্ষিত করবে সেই শিক্ষক জাতটাই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে অশিক্ষিত রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এক কথায় চরিত্রে মেরুদণ্ডের অভাব। সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, রাজনীতি, সত্যিকারের শিক্ষা-নীতি কি হওয়া উচিত, এই যেমন ধরুন সোভিয়েট করেছে, এসব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক চেতনা তো থাকা চাই। নইলে গণচেতনা আসবে কোথা থেকে। তবে কি জানেন, হবে। এই ধর্মঘটের যাকার শিক্ষক সমাজের বেশ একটা মজবুত বেনেদ তৈরি হবে।

বিরাম সব কথাতেই সমর্থন জানিয়ে বায় খবরের কাগজের বিশিষ্ট সংবাদের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে।

ওদিকে অন্য চালে কথা চলে শর্বাণী ও সবিতার মধ্যে।

শর্বাণী সবিতার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। স্বাস্থ্য আরও ফুটপুটে। তবে মাথায় বেঁটে। শরীরে বেঁটে হওয়ার জটিলতা ঢেকে দিতে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুটো জিনিস। যৌবন। ও যৌবনের কমনীয়তা।

শর্বাণীর সাজ পোশাকগুলোর কোনটাই কম দামী নয়। শরীরের উঁচু নীচু ভাঁজের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো শাড়ি রাউজ, শুভ্র ও স্নডোল হাতের কজ্জিতে এঁটে বসা ছোট্ট রিস্টওয়াচ, রিস্টওয়াচের বিহুনি পাকানো চকচকে কালো ব্যাগ, মাদ্রাজী মাহুরি দিয়ে বোনা ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ের সাদাসিধে সর্বাধুনিক সাপেয় সব কিছুতেই রুচি ও প্রাচুর্যময় জীবনের ছাপ স্পষ্ট।

শর্বাণী প্রথম যৌবনে কিছুদিনের জন্যে কোন এক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয়েছিল। সেখানে পদচ্যুতা হবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটানা শিক্ষা-সংক্রান্ত সংগঠন ও নারী আন্দোলনের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যে বয়সে একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে জীবনের গৃহিণীপর্বে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে, সে বয়সে সবিতা মাত্র একটি সন্তানের জননী।

আর শৰ্বানী সবিতার বয়স কয়েক বছর আগে পার করে দিয়েও ঘোবনের জন্মগত দাবিকে উপেক্ষিত রাখার ক্ষমতায় আজও অবিবাহিতা।

ঘর সংসার আসবাব-পত্র, জিনিস-পত্রের দাম, কেনা-কাটার সমস্যা, কান্দনের মতি-গতি, মিষ্ট্র বয়সের চেয়ে বেশি রকম চতুরতা ও চাপল্য, গোলাপের পোকা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটা সময় অগোছানো কথা চলে সবিতা ও শৰ্বানীর মধ্যে। সবিতা শৰ্বানীকে ডাকে 'মিছুদি' বলে। শৰ্বানীর চেয়ে বাইরের জগতে 'মিছুদি' নামটাই বেশি প্রচলিত।

বিরাম একসময় অপরের সঙ্গে আলোচনা খামিয়ে বলে, আপনি বসুন। আমি একটু উঠবো।

—না। আমিও উঠবো।

অপরের শৰ্বানীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে তার যেতে দেরি হবে কিনা। শৰ্বানী দেরি হবে জানায়।

বিরাম তার লেখার টেবিল থেকে কিছু দরকারী কাগজপত্র নিয়ে গায়ের গেঞ্জির ওপর একটা আধ-ময়লা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সিঁড়িতে নামে। অপরেরও প্রায় একই সঙ্গে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে একটু থমকে শৰ্বানীকে আবার ডাকে। শৰ্বানী সিঁড়ির কাছে এলে অপরের আবার জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি ফিরতে খুব দেরি হবে এখান থেকে। আপিসে ওয়েট করবো কি?

—না। আপনি এখান থেকে সটান বাড়ি চলে যান।

—ও, তাহলে তুমি এ-বেলা আপিসে আসছ না। ওবেলা কখন আসছো? ঠিক সময়ে আসছ তো?

—হ্যাঁ বিকেলে আসছি।

—আচ্ছা। চলি তাহলে। পাঁচটায় আসছো, কেমন তো?

অপরের একটু দ্বান হেসে সিঁড়িতে নেমে যায়। ওর বয়স চল্লিশের গায়ের গায়ের। কথাবার্তায় বয়সের তারিক্কিয়ানা। স্ত্রী বা স্ত্রীপুরুষ নয় কিন্তু শরীরটা বেশ খাড়াই আর শক্ত।

শৰ্বানী ফিরে আসতে তার ঠোঁটের এক কোণে ঈষৎ হাসির আভাসটুকুকে সবিতা লক্ষ্য করে।

—হাসি কিসের মিছুদি?

—ছিট আছে খানিকটা। তার মানে, এত টকেটিভ, ওর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে পর্যন্ত ভয় পাই.....অত বক্ বক্.....

শরৎকে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে বুয়ে সবিতা বেশ আগ্রহ কণ্ঠে বলে, তাই বলা, আমরা ভাবলাম এতদিনে বুঝি তোমাকে ভালবাসবার মত একটা বুড়ো-হাবড়া জন্মাল পৃথিবীতে।

সবিতা ‘আমরা’ বলল এই জন্তে যে চিত্রা ঐ সময়ে উঠে এসেছিল মিষ্টার জরটা আছে কি নেই দেখতে। কাছের ডাক্তারখানা থেকে চিত্রা নিজে গিয়ে যে ওষুধটা নিয়ে এসেছে তারই নির্দেশ রয়েছে জর থাকলে না-খাওয়ানোর।

শরৎ সবিতার রকম-সকমে বিহ্বল হয় খানিকটা। সবিতার বয়সী বিবাহিতা অন্ত মেয়েদের সঙ্গে সবিতার চরিত্রের কিছু ভালো-মন্দ পার্থক্য তার চোখে পড়ে বারবার।

—কি ব্যাপার রে তোর সবিতা! বড্ড বেশি হাসি-খুশি দেখছি যে তোকে। তোরা দুজনে কি আবার নতুন করে ঘোঁষনে পা দিলি নাকি?

—সকলেই দেখছি আমাকে ঠিক চিনতে পারে। সকলেই দেখে আমি খুব মজাসে নেচে-গেয়ে দিন কাটাচ্ছি।

—আর কে বললে?

—কাল বিমলা আর রথীন এসেছিল।

—আরে, বিমলা এসেছিল! ওকে তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কিছু?

—কি?

—ওদের স্কুলে ধর্মঘটের অর্গানিজেশনটা কেমন চলছে। ওখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল।

সবিতা অবাক হয়। বিমলার সঙ্গে তার কতদিন পরে দেখা। আর দেখা মাত্র সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, স্ট্রাইকের তোড়জোড় কেমন চলছে। তা ছাড়া টুহুর যে ধবরটা সে শোনাল তারপর ওসব প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

টুহুর প্রশ্নটা কি মিথুদিকে জানাবো? আগ্রহ দেখিয়ে শুনবে ঠিক। কিন্তু বুঝবে কি? বুঝবার মত মন আছে কি মিথুদিক। সবিতার ঠোঁটে ছাপানো ছবির হাসির মত না-কমে না-বাড়ে একটু হাসি সব সময় লেগে থাকলেও একটুখানি সময়ের মধ্যে সে অনেকগুলো কথা ভাবে।

শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানোর সমস্যা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে মিথুদি। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে যা মাইনে বাড়িয়ে দিলেও কমে না।

সবিতা মনে মনে বলে কথাগুলো।

শর্বাণী বলে, শোন, কাজের কথা বলি।

—বল।

—তোকে একটা কার্ড নিতে হবে।

—কিসের মিভুদি? কার্ড?

—মহিলা সমিতির জন্তে চ্যারিটি শো করা হচ্ছে। কিন্না দেখানো হবে একটা।

—ওমা, পয়সা দিয়ে টিকিট। আমাকে মাপ কর বাবা, কি করে যে এখনো তিনটে দিন কাটবে তাই ভেবে অস্থির।

—আচ্ছা কার্ডটা তুই নিয়ে রাখ না। মাইনে পেলেই টাকাটা দিবি। আমি এখন এত গুচ্চের কার্ড নিয়ে কোথায় ঘুরবো তোরা না নিলে। আর কেউ যাবে?

চিত্রা কিন্না-এর নাম শুনেই উঠে এল দ্রুত পায়ে।

—কি ছবি দেখাবে মিভুদি?

—গর্কির ‘মাদার’।

—ও হো, ওটা আমার দেখা হয়নি। আমি কিন্তু দেখবো ওটা, সবিতাদি। সত্যি……ই্যা কিন্তু যাবো দেখতে।

চিত্রা নাকে কাঁদার মত আঁচুরে আবদার ধরে।

—তাইলে এক কাজ কর সবিতা, বিরামের তো সময় হবে না, তোরা তিনজনে তিনটে কার্ড নে।

সবিতা একবার ভাবলে প্রচণ্ডভাবে অগ্রাহ্য করবে কার্ডগুলোকে। তারপর ভাবলে, না নরম গলায় মিভুদিকে বোঝাবে যে এইসব বাড়তি খরচের ব্যাপার নিয়ে বিরামের সঙ্গে তার একচোট বচসা হয়ে গেছে আজকেই। সুতরাং…… কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্ড তিনটে সে হাতে নিলে বিনা বাক্যে।

মিভুদিকে সংসারের খবর জানিয়ে কি লাভ। এককানে ঢুকলে আরেক কান দিয়ে বেরোবে। সংসারের আলাদা আলাদা মানুষদের ওরা গ্রাহ্য করে না। সমষ্টির সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। দেশে একেবারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে তারপর সংসার নিয়ে ভাববে।

শর্বাণী উঠবার মত হয়ে দাঁড়ায়।

—বেড়াতে যাবি এক জায়গায়।

—কোথায়? কলকাতার বাইরে।

—ই্যা, তবে পুরী ওয়ালটোয়ার নয়। সুন্দরবনে। আমাদের মহিলা সমিতির কয়েকজন লেখিকা যাচ্ছে সুন্দরবন এলাকায়। এর আগে ওরা হগলীর

আন্দোলনের গ্রাম ঘুরে এসেছে। নিরুপমা, মানে নিরুপমা ত্রিবেদীকে তো তুই চিনি। ঐ যে রে ‘সমাজ প্রগতি ও নারী আন্দোলন’ বইটা যার লেখা। ও যাচ্ছে। আর যাচ্ছে শোভনা রায়। এম. এল. এ বিজ্ঞান রায়ের বো। আরও দু-একজন থাকবে সঙ্গে। আমিও যাবো ভাবছি। তুই যেতে চাস তো মন ঠিক করে ফেল।

—কেন, যাচ্ছে কেন?

—চব্বিশ পরগনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকাগুলো দেখতে। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সমস্তা এমন কিছু মারাত্মক বা জরুরী নয়। অথচ আমাদের ‘জাগৃতি’ প্রতিদিন মরা-মানুষের, কংকালসার মানুষের ছবি, শুকনো ফাটা মাঠের ছবি ছাপছে। শিয়ালদা স্টেশন ভরে যাচ্ছে উদ্বাস্ত কৃষকের ভিড়ে। পার্টির একদল এম. এল. এ গেছেন তদন্তে। ওরা ফিরলেই মহিলা সমিতির তরফ থেকে আমরা যাবো।

—না, আমার বোধহয় যাওয়া হবে না।

—কেন?

—মিষ্টুর শরীরটা খারাপ। আর……।

—যখন যাওয়া হবে তখনও কি আর জ্বর থাকবে।

—আর তাছাড়া……না আমার বোধহয় হবে না।

—ভেবে দেখিস। আর শোন, ফিল্ম শোতে পরন্তু ঘাস তাহলে।

শর্বাণী চলে যায়। সবিতা তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আসে।

মিষ্টুর সারাদিন রয়েছে আধো-তক্তায় ঘোরে। মুখটা টস্টসে, ফোলা ফোলা। চোখের নীল অংশ যেন জলে ডুবে আছে। সবিতা মিষ্টুর বুকের খালি অংশের ওপর জামাটা টেনে দেয়। ঘরের ভেতরের কিছু এলোমেলো জিনিসকে গোছায়। হাতে কাচা ধুতি-শাড়িগুলোকে ইস্ত্রি করার অন্ততম পদ্ধতি হিসেবে ভারী চামড়ার স্ট্রটেকেশের নীচে জাঁক দেয়।

বিশুর মার খুস্তি নাড়া ঝিমিয়ে আসাতে সবিতা বুঝতে পারে ঝোল হয়ে এল। নীচের বাথরুমে একটা বিশেষ ধরনের জল ঢালার শব্দে বোঝা গেল বঙ্কিমবাবুর চান করা শেষ। দোতলার অগ্নি ভাড়াটের ঘরের বিবাহিতা ও গর্ভবতী মেয়েটি সবিতাদের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রায়ই আসে, গল্পগুজব করে। ভারী ছেলেমানুষি মন। বাড়িতে ছোট ছেলের অসুখ জেনেই সে বোধহয় তার স্বভাবসুলভ হাসি-তামাসাকে খামিয়ে রেখেছে।

কাজের ফাঁকেই সবিতা কিছু কথা ভাবল।

মিভুদিকে সব কথা যদি জানাই কোনদিন? যদি জানতে পারে? সবিতা ঘরের একটা কোনায় এসে ব্লাউজের ভেতরের জামাটা খুলল।

বিমলা আর মিভুদির মধ্যে তফাৎ কি? বিমলা যদি বুঝতো? তার কাছে চাল-ডাল তেল-নুনের সাংসারিক সমস্তার চেয়ে অন্ত কিছু বেশি মূল্য পেত কি? বিছানার ওপর থেকে তিনটে কার্ড নিয়ে ছোট্ট চামড়ার স্লটকেশের ওপরে জমানো বই-খাতার মধ্যে চাপা দিলে অল্প একটু কোনা বাইরে রেখে।

মিভুদি যদি জানতে পারে সে কি আমাকে এই কথাই বোঝাবে না যে অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে সামাজিক ছোট বড় যে সব ভেদ-বিভেদ ঘটনা-দুর্ঘটনা, ভাঙা-গড়ার যোগ রয়েছে, প্রেমের ব্যর্থতা তারই একটা ভিন্ন রকম রূপ। সুতরাং সাম্যবাদ যতদিন না.....

সবিতার হঠাৎ মনে পড়ে কালকের হিসেবটা খাতায় লেখা হয়নি। দৈনিক জমা-খরচের খাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কলমটা নেয়।

এ যুক্তিতেও যদি রোগ না সারে? তখন কি তাকে রাজনৈতিক ডাক্তারদের চেম্বারে হাজির করানো হবে। বড় খরনের ক্ষয়ের আশঙ্কায় ডাক্তারেরা যেমন দুটো হাতের একটাকে ছেঁটে ফেলে, দুটো ফুসফুসের একটাকে ভেঁতা অকেজো করে দেয় চিরকালের মত শ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়ম ঘটিয়ে, রাজনীতিতে যেমন মতভেদ সংঘর্ষে বৃহত্তর স্বার্থের অজুহাতে এক বা একাধিককে দলচ্যুত করার সহজ পথ খোলা থাকে, মিভুদির কি তার জীবন থেকে তেমনি সুজিতকে মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে এর চিকিৎসা করবে?

বিরাম ফিরে এল। এসেই তার চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসল কাগজপত্র নিয়ে। সবিতা গিয়ে দাঁড়াল পাশে।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

বিরাম উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় তার শরীরের সবটা তার ছেড়ে দিয়ে টেবিলের দিকে হুয়ে পড়ে। সবিতা হাত রাখে বিরামের পিঠে।

—ফিরে এলে যে তুমি এত তাড়াতাড়ি? টাইপ করাতে গিয়েছিলে তো।

বিরাম আরো হুয়ে তার ইংরেজি লেখা কাগজগুলো ঘাঁটে।

—এখনো রেগে আছো তো? কি? রেগেছ?

—উঁহু।

—তাহলে কথা বলছ না যে।

—একটা টাইপরাইটার না কিনলে চলবে না।

—কেন? যেখানে করাও কি হল?

—এত ইরেসপনসিবল, একদিন খুশি আসে, একদিন খুশি আসে না।

বিরাম সাপ্তাহিক পত্রিকার চাকরি ছাড়াও আরও একটা কাজ করে।
বোম্বায়ের 'বোম্বে-রিভিউ' পত্রিকার কলিকাতা শহরের বিশেষ প্রতিনিধির কাজ।
সপ্তাহে একবার করে কলকাতার উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো সংগ্রহ করে পাঠায়।
কর্তৃপক্ষ তার থেকে পছন্দ মত ছাপেন। এর জন্যে একটা নিয়মিত টাকা
প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মনি অর্ডার যোগে আসে তার কাছে।

—একটা মেশিনের দাম কত?

—অনেক। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রেমিংটন কিনবার চেষ্টা করেছি কয়েকবার।
তাতেই দুশো-আড়াইশো করে চায়।

—আড়াই শো! সবিতার আগ্রহ ঢিলে হয়ে যায়। দুজনের মাসিক রোজগার
কানাকড়ি না বাড়িয়েও আড়াইশো টাকা খরচ করে কিছু কেনার কথা সে কি
করে ভাবছে? নিছক আবেগে? বিরামকে সহানুভূতি জানাবার অকাঙ্ক্ষা
উৎসাহে।

—শোনো।

—বল।

—এদিকে তাকাও। এবারেও তো ম্যাট্রিকুলেশানের পেপার দেখতে পাব।
কিছু বেশি করে নোব। তুমি যদি শ-খানেক একস্ট্রা ইনকাম কিছু করতে পার
তাহলে হয়ে যায়।

—আচ্ছা, এক্সপ্রোশন বানানটা কি বলতো? tion না sion?

—sion ঠিকই তো লিখেছ।

—কালকের স্টেটসম্যানটা কোথায় রেখেছ। একটু দ্যাখ তো।

—কাঁদনই পড়ে, কাঁদনই রাখে। দেখ ঐখানেই কোথায় আছে।

সবিতা তার ঘরে ফিরে এসে মাথার খোঁপা ভাঙে।

গোটা বাড়িতে ভাড়াটে পরিবার একতলা দোতলা মিলিয়ে পাঁচটি। কিন্তু
বাথরুম একটাই। মাঝারি ধরনের চৌবাচ্চা। তাই সকলের শরীরকে
সমানভাবে স্নিগ্ধ করার জল তার সিমেন্ট করা পেটে ধরবার কথা নয়।

গোটা বাড়িতে সকলের শেষে স্নান করে কাঁদন। কলে ময়লা হড়হড়ে তলানির

জলটা তারই মাথার জন্যে অবশিষ্ট থাকে রোজ। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের পক্ষে শহরবাসের কয়েকটি নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধেকে মেনে নেওয়াই বাহ্যিক ভাবে কান্নার মনে জলের ঘাটতি সম্বন্ধে কোন কান্না নেই।

কান্নার স্বভাবটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের তার পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে কিছু। একালের কান্নার সমগোত্রীয় আরও নানা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশকের পরবর্তী যুগের সৎ, শৃঙ্খলাহীন, স্বার্থবিরোধী তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কথাই বলা হচ্ছে। লক্ষণগুলো এইরকম।

সময়মত না নাওয়া, না খাওয়া। সাজ পোশাকের প্রতি অবহেলা। সমাজের প্রতি অবজ্ঞা। হাতে বিদেশী বই। চোখে চশমা। যে কোন কথাকেই গাড়িয়ে নিয়ে যায় তুমুল তর্কে। তর্ক গাড়িয়ে যায় আন্তর্জাতিক সমস্যায়। ভালবাসাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ভালবাসে। রাজনীতির প্রতি গভীর আগ্রহ। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, পুঁজিবাদের পতন, সমাজতন্ত্র, শাস্তি আন্দোলন ইত্যাদি বাক্যের বারংবার ব্যবহার ঘটায়। নিজের সঙ্গে কথা বলার সময় কান্না, রক্ত, নৈশক্য, আহত, বন্দী, হাহাকার, যন্ত্রণা ইত্যাদি শব্দ উদ্ভাসিত করে। মেলামেশা করে খুব ছোট সীমাবদ্ধ জগতে, যেহেতু মতের মিল ছাড়া মনের মিল ঘটে না।

কান্নার চরিত্রে অসহিষ্ণুতা প্রকট। নিজের যুক্তি, বিশ্বাস, ভালো-মন্দের ধারণাকে সে অন্যের ওপর আরোপ করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। এবং একই সঙ্গে সে প্রত্যাশা করে অন্যরাও তার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুক।

কিন্তু আজকের ঘটনাটা অন্তরকম।

অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক সকাল সকাল বাড়ি ফিরল কান্না। হাতের ধবরের কাগজের একটা বড় বাণ্ডুল আর পকেট থেকে একটা আলতার শিশি রাখল সামনের ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালের তাকে। তাড়াতাড়ি জামা গেলি খুলে গায়ে তেল মেখে বাথরুমে নেমে গেল স্নান করতে। চোঁবাচ্চাটা তখন শুকনো।

সারাদিন রোদে বেশি ঘোরাঘুরির জন্তে আর সকাল থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র দু-কাপ চা খেয়ে পেটে প্রচণ্ড খিদে আর দাউদাউ করতে থাকার ফলে কান্নার সারা শরীরে শীতল জলের চাহিদা বা তৃষ্ণা ভীষণ উগ্র হয়ে উঠেছিল। কান্না তাকিয়ে দেখল চোঁবাচ্চার জল নিকাশের যে

গর্তটা সব সময় ন্যাকড়া এঁটে বন্ধ করে রাখা হয় সেটা কে বেন খুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল সমস্ত বাথরুমে ভাত, ডাল, আলু-কুমড়োর টুকরো, মাছের কানকা, কাঁটা, কয়লা, ছাই ইত্যাদি আবর্জনা ছড়ানো।

ওপরে রাস্তার জন্তে মজুদ রাখা এক বাসতি জল নামিয়ে এনে কাঁদন পাশখানা সারল, চান করল। শরীরটা জালা জালা করছিল বলে সে সাবান মাখবে ভেবেছিল আজ। সেটা মাখা হল না।

ধেয়ে উঠেই বসে গেল কাগজ আর আলতা নিয়ে। বিকেলের মধ্যে গোটা পনেরো পোস্টার লিখতে হবে তাকে। ঝাঁটার কাঠিতে মোটা করে তুলো জড়িয়ে কাঁদন গোটা গোটা করে লিখল.....

আগামী ১৭ই চৈত্র শনিবার খাচ আন্দোলনের দাবিতে বিরাট.....

চিত্রা পড়তে পড়তেই মস্তব্য করল, কি ছিরি গো লেখার। ঐ বুকি আগামী হয়েছে, ঠিক বেন আসামী।

একটা হাসিকে ছুজনে ভাগ করে উপভোগ করল কিছুক্ষণ।

লিখতে লিখতে কাঁদন হঠাৎ বলে, একটা সাদা পাতা দাও তো কাগজ থেকে।

—সাদা কাগজ? না। হবে না। আমি কি খাতা ছিঁড়বো নাকি?

কাঁদন উঠে গিয়ে জোর করে ছিঁড়ে আনে একটা পাতা। তার ওপর আলতার লাল অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখলে।

অনুগ্রহ করিয়া বাথরুমটিকে বাসন মাজার পর পরিষ্কার রাখিবেন।

স্বানের জলের অপচয় ঘটানোর কথাটা কি ভাবে প্রকাশ করবে বুঝতে না পেরে কাঁদন আগের কথাকেই একটু বাড়িয়ে দিলে।—

বাথরুমের মেঝে সবসময় নোংরা থাকে।

লিখে তখুনি আঠা দিয়ে সেঁটে এল বাথরুমের দরজায়।

এর প্রতিক্রিয়া ঘটল অনেক পরে, রাতে।

বেশ রাত করে কাঁদন বাড়ি ফিরতেই সবিতা ডাকল তাকে।

—হ্যারে বাথরুমের দেয়ালে কি কাগজ মেরেছিস তুই?

—ওঃ। কে বললে?

কাঁদন একই হাসিতে ফোটাল তার তাক্কিল্য আর ঔচিত্য বোধ।

—আকাশ থেকে পড়লি বুকি? তুই লিখিসনি?

কাঁদন হাসে তার নিজস্ব হাসিটি।

—জান। কী বিশ্রী হয়ে থাকে বাথরুমটা সবসময়। যা—তা। আজকে এক বালতি খাবার জলে চান করতে হয়েছে।

—বেলা দেড়টা পর্যন্ত কে তোর জন্তে জল ভরে রাখবে চৌবাচ্চায় বলতো?

—দেড়টা! জান। চিত্রাকে, বিগুর মাকে জিজ্ঞেস করতো কটায় ফিরেছি আজ।

—যা বলার মুখে বলতে পারলি না। লিখতে হল?

—মুখে কাকে ডেকে বলবো? বাথরুমকে নোংরা তো আর একজনই করে না। তাই সকলকেই সাবধান করে দেবার জন্তে লিখলাম।

বিরাম বাড়িতে ফিরে গায়ের জামা-কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই নীচের তলার মাধববাবু এলেন।

—আসতে পারি?

বিরাম পিছনে তাকিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

—আরে। ওঃ, আপনি, আসুন আসুন।

—এই একটু আসতে হল আর কি আপনার কাছে। আচ্ছা উনি কোথায়, ঐ যে আপনার.....

বিরাম মাধববাবুকে বসবার চেয়ারটা এগিয়ে দেয়।

—কে বলুন তো? কাকে.....

বিরাম ভাবলো হয়তো সবিতাকেই খুঁজছে বুঝি মাধববাবু।

—ঐ যে আপনার ছোট ভাই না.....

—ও হো। না, না, আমার শালক.....

—ওকে ডাকুন না একবার।

কাঁদন দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। এসে দাঁড়াল বিরামের ডাকে। এবার বিরামের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত ব্যাপারটা।

প্রায় না খেয়ে, অনর্গল গতিতে মাধববাবু বকে গেলেন। রাগ বা অভিমান বা ফোভের অংশটুকু দ্রুত শেষ করে তিনি এলেন প্রচ্ছন্ন উপদেশ-মেশানো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশে। ভাড়াটে হলে কি কি মানুষকে সহ্য করতে হয়। কোন্ সময়ের মধ্যে স্নান সেয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। একজনের ফেলে-যাওয়া ময়লা আর একজন কেন সাফ্ করবে। বাড়িতে তো ভাড়াটে অনেক। অথচ মাধববাবুই তো মাঝে মাঝে মেথর ডাকিয়ে নিজের তদারকে পাশখানার ঘর, ড্রেন চৌবাচ্চায় অপরিচ্ছন্নতা খুচিয়েছেন।

বিরামও প্রথম প্রথম বেশ মাথা নেড়ে যথাসময়ে হেসে দু-একটা আলাগা 'হ্যাঁ' 'না' 'তাইতো' 'ঠিক বলেছেন' ইত্যাদি জবাব দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গায়ের ঘেমো জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আপিস থেকে ফিরে বারান্দার হাওয়ায় একটু সহজ হয়ে গা ছড়িয়ে বসতে না পারার জন্তে তার শরীরে ও মনে একটা অস্বস্তি পাকিয়ে উঠছিল। বিরাম মাধববাবুর গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকবার বললে, না না, ওসব আর হবে না আমি সাবধান করে দোব, আপনি নির্ভয়ে উঠতে পারেন। প্রথমে হেসে, তারপর একটু গভীর হয়ে, তারপর সামান্য বিরক্তি মিশিয়ে ঐ একই কথাকে নানাভাবে বলার পরও মাধববাবুর মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। বিরাম শেষ পর্যন্ত সবিতার ডাকে উঠে গেল মিন্টুর দিকে দেখতে। সবিতা ভাবছিল, যদি আরও কিছুক্ষণ ভদ্রলোক ঐভাবে হেঁড়ে গলা হাঁকান, আর তাতে মিন্টুর বহুকষ্টে পাড়ানো ঘুম এক পলকের জন্তেও ভাঙে সে উঠে গিয়ে সরাসরি মাধববাবুকে বেরিয়ে যেতে বলবে কিনা। অসভ্য, অসভ্য, কাদন ঠিকই করেছে। বিরাম উঠে যেতে মাধববাবু কাদনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন, আপনাদের সমস্তাটা মশাই আমরা বুঝি। ঠিক আমাদের মত করে বাঁচার কায়দাটা এখনো আপনাদের রপ্ত হয়নি। তাই পছন্দমত কোন জিনিস না পেলো, না ঘটলে একটু ডিসটারবেঞ্জেই আপনারা অধৈর্য হয়ে পড়েন, বুঝলেন না। আরে মশাই, এটা কি আর বুঝি না, যে টাকাকড়ির অবস্থা স্বচ্ছল হলেই আপনারা এই এঁদো গলিতে পড়ে থাকবেন না, বেশ বুঝি, নেহাতই অবস্থা-বৈশিষ্ট্যে পড়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু আমাদের কথাটা। ভেবে দেখুন, আমাদের স্বর্গ মর্ত্যই বলুন বা নরকই বলুন, এইখানেই জীবনটাকে কাবার করতে হবে। ওসব জীবনের রোমাস-টোমাস মশাই একদম হজম করে ফেলেছি। কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয়। আপনাদের গভর্নমেন্টকে তো বলে কয়ে চিঠি লিখে লিখে হৃদ-বেহৃদ হয়ে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যায় না, তাহলে আর.....

বিরাম বেরিয়ে এসে বেশ বিনীত গলায় বলে, দেখুন, মানে আমার ছেলের শরীরটা খারাপ, আপনি যদি কথা বলতে চান তাহলে বারান্দায় বসবেন কি, মাহুর পেতে দিচ্ছি বরং.....

—না, না, অসুখ নাকি, মিন্টুর? এহে, তাই তো কবে থেকে হয়েছে, হল, কাকে দেখাচ্ছেন, আপনাদের চেনা জানা ভালো ডাক্তার আছে তো? না হয় বলুন,

আমার চেনা একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টকে ডেকে এনে দেখাই। বাচ্চা-কাচ্চার অস্ত্রখে মশাই গাফিলতি করবেন না, এই দেখুন না সেবারে আমার ছোট ছেলোটোর সর্দি-সর্দি, জ্বর জ্বর হল, ভাবলুম এমনি হয়েছে সেরে যাবে, চার পয়সার হোমিওপ্যাথি খাওয়ালে সেরে যেত। তা থেকে গড়াল নিমুনিয়া, টাকার বাপের শ্রদ্ধ করে তবে ছাড়ল, সে কি কম ভোগান্তি.....

বলতে বলতে মাধববাবু নিচে নামবার জন্তে উঠে দাঁড়ালেন।

বিরাম বন্ধ দরজাটা খুলে দিল তাঁর যাওয়ার জন্তে। সবিতা মনে মনে জ্বলতে লাগল মাধববাবুর বিক্রকে, বিরামের বিক্রকে, কান্দনের বিক্রকে। ঘাড় ধরে বার করে না দিয়ে বসে বসে গল্প করল ওরা। কান্দনের সব কিছুতেই মোড়লি। পৃথিবীকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখছে। গাল বাড়িয়ে চড় খেতে হল। ঠাট্টা, ঠাট্টা আর বুঝি না আমি। নেহাতই অবস্থা-বৈশিষ্ট্যে এখানে এসে পড়েছেন। হ্যাঁ, তাই এসে পড়েছি তো। নইলে.....নইলে কি? সবিতা ভাবে জীবনকে সে কী ভাবে চেয়েছিল। কত ভাবে চেয়েছিল। ভাবতে ভাবতে একসময় সবিতার চোখদুটো প্রায় অশ্রুময় হয়ে ওঠে।

এই কী আমার জীবন নাকি? এই কী চেয়েছিলাম? বিরাম টাকা নিয়ে ঝগড়া করে আমার সঙ্গে। টাকা কত বড়? টাকা কিছু নয়, চাইলে, চেষ্টা করলেই মেলে। কিন্তু আমাদের মন এমনি করে বুড়ো হয়ে যাবে? কাজের কান্ধে একটু সময় পেলে আমরা সাম্প্রতিক জমা খরচের হিসেব কষবো কেবল? কেবল খরচ কমাবার হিসেব? আমি বড় বারান্দা খুঁজেছিলাম। তিন-চারটে টবে গোলাপ লাগাবো। একটা রেডিও সেট থাকবে। ছবি আঁকার হাত ছিল, ইচ্ছে ছিল। কুমোরটুলি থেকে কাঁচা মাটির ফাওয়ার ভাস্ কিনে এনে নিজে তার ওপর আলপনা আঁকব। বিরামের জন্তে বানাবো ছোট্ট একটা আশটে। দেয়ালে ছবি থাকবে। প্রথমে আমার ছেলে না হয়ে মেয়ে হবে, তাকে গান শেখাবো, যা নিজে শিখতে পারলাম না, রবীন্দ্র সংগীত। বড় বড় ঘর থাকবে। আমার বাবা, আমার ভাই আমার বোন আসবে মাঝে মাঝে। নিজের রোজগারের পয়সায় তাদের খাওয়াবো, দু-দিন প্রাণ ভরে হৈ-চৈ করবো। অথচ সামনে গরম আসছে। একটা টেমপোরারি ফ্যান ভাড়া করতে পারা যায় না। বাথরুমটার আলো নেই। নিজেরাই কিনে লাগিয়ে দিতে পারি তো একটা বাল্ব। কেন দিই না? নিজের পয়সায় অন্যদের উপকার করার ইচ্ছে নেই বলে? নাকি পয়সার অভাব, বিরাম তার

বিক্রক্ষে কিছু বলবে বলে? বিরামের কথার সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উঠতে হবে, নামতে হবে, চলতে হবে কেন? আমার নিজের ইচ্ছা, কামনা বাসনা স্বাধীনতা নেই? কেন বিরামের ব্যবহার আমার স্বাধীন অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দিতে চায়? বিরাম আমার স্বামী বলে? কিন্তু আমি কারো স্ত্রী হতে চাই না, বন্ধু হবো, বন্ধু হতে চাই, বিরামকেও চাই তেমনি ভাবে। কালই যদি আমার জীবনটা শেষ হয়ে যায়, কি পেলাম তাহলে? মরবার আগের মুহূর্তে কেন এই সুখটুকু পাব না যে জীবনে আমি যা কিছু ধ্যান করেছিলাম তার সব পেয়েছি।

আরো অনেকক্ষণ সবিতার চোখ ও মন অশ্রুময় হয়ে রইল। মাধববাবু চলে যাবার পর বিরাম কান্দনকে রুঢ় স্বরে আর চিত্রা বিস্তার মায়ের সঙ্গে হেসে হেসে কি যে বলাবলি করল, সবিতার কানে এল না।

• • চার • •

বিকেলের দিকের এক এক্সপ্রেসে সজ্জিত কলকাতায় আসছিল। খার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে প্রচণ্ড ভিড়। বসবার ছেড়ে দাঁড়াবার জায়গাই বিরল। সজ্জিতকে অস্বস্তিজনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কাটাতে হল অনেকক্ষণ। গাড়ি কয়েকটা স্টেশন দ্রুত-গতিতে পার হয়ে আসার পর ভদ্রলোক সজ্জিতকে নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিলেন।

—আপনি বসুন। আমি সামনের স্টেপেজে, ব্যাণ্ডেলে নেমে যাব।

ব্যাণ্ডেল? এ গাড়ির তো একেবারে একটাই স্টেপেজ—হাওড়াতে গিয়ে। তাহলে? জানলার সামনে মুখ এনে কিছুক্ষণ বাইরে তাকাবার পর সজ্জিত বুঝল তার ধারণার ভুলটা। গাড়িটা কর্ড লাইনের নয়। মেল লাইনের। একটা লম্বা ছুট দিয়ে পৌঁছবে ব্যাণ্ডেলে তারপর সব স্টেপেজেই ধরবে। তার মানে হাওড়া পৌঁছতে সক্ষম। সবিতাদি তো তখন স্কুল থেকে ফিরে আসবে। তাহলে আর কি হল। সবিতাদিকে তো চমকে দেওয়া যাবে না। সজ্জিত বেশিক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না মনের অস্থিরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মাথার পাট করা চুলগুলো হাওয়ায় মাথা ছাপিয়ে কপালে এলোমেলো উড়ছিল। চোখ জালা করছিল বালির মত কিছু আঘাতে। ট্রেনের গতি অনেকটা থেমে এসেছে।

এবার সৃজিতের চিন্তার জগতটা ক্রমে ক্রমে ভরে উঠল একক জীবনের নিঃসঙ্গ অসুভূতিতে। তার দৃষ্টি ও চিন্তার জগত থেকে মুছে গেল ট্রেনের কামরা ভর্তি নানা বিচিত্র মানুষের বিশৃঙ্খল ওঠানামা, কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীবন্ত পারিপার্শ্বিক।

সৃজিত ব্যাগ থেকে টানল একটা বই। অ্যানা কারেনিনা। বইয়ের প্রায় মাঝখান থেকে কয়েকটা পাতা খুঁজে নিয়ে তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বেখানে লেভিন আর কিটি টেবিলের ওপর চক পেঙ্গিলে কিছু সাংকেতিক অক্ষর সাজানোর মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে নিজেদের মনের গভীর তলদেশের সংবাদ জানাচ্ছে। কিটি লেভিনকে বললে, Yes. লেভিনের সমস্ত জীবন উপছে পড়ল সুখের ধারায়, 'me ? happiness ! Its happiness tha's come over me !'

সৃজিত আবেগ দিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল 'happiness' কথাটি। ঠিক এমনই তো ঘটেছিল আমাদের। কি প্রবল স্পর্ধায় স্পন্দিত ছিল সেই মুহূর্তটি। কত দুঃস্বপ্ন জটিল বেদনা বাসনা দিয়ে গড়া একটা অমার্জনীয় ইচ্ছা। কত সহজে নিরাপদে নির্বিঘ্নে হঠাৎ কুয়াশা কেটে রোদ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার মত উজ্জ্বলতার প্রকাশ পেয়ে গেল। আমার চেতনে ছিল পাপ-পুণ্য, ত্রায়-অন্তায়, সৎ-অসৎ এর বিচার বোধ। অবচেতনে ছিল এক অমার্জনীয় ইচ্ছা। রক্তের স্রোতে যে ইচ্ছা বহুদিন ধরে কলরব করেছে, শরীরকে ক্লান্ত করেছে প্রতিদিনের বিরুদ্ধ সংঘাতে। আমার কেবলই মনে হয়েছিল ক্ষয়, ধ্বংস, সর্বনাশ এমনি ভয়ংকর কোন পরিণতির কথা। মনে হয়েছিল একটা বিরাট তোরণের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিলাম আমি, এবার বেখানে গিয়ে পৌঁছব সে রাজ্য আমার অচেনা, বহুস্তরের আঁধারে ভয়াবহ, প্রত্যাবর্তনের পথ নেই, আছে কেবল প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সংঘাতে, বেদনায়, ক্ষয়ে বিষন্ন আর্তিতে নিজেকে ভেঙে চূরে পরিবর্তিত করার পরিস্থিতি।

আমার লেখাটার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সবিতাদি শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার সাহস ছিল না সেই যুগের দিকে তাকানোর। আমি তখন নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম ক্ষমা-প্রার্থনার জন্তে। সবিতাদি পরস্ত্রী, তার সন্তান আছে। আমি শিশু, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও অপরিণত, আমার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল এখনও কত অজ্ঞতার ভরা। আমার চিন্ত কেন শুরু নয় ? আমার ইচ্ছার

কেন পাপ? আমি কেন নির্বোধের মত হাত বাড়ালাম অনধিকারের দিকে।

সবিতাদি হাসল। মুহূ, একটুখানি। আমি ভাবলাম এই হাসির অর্থটা কি? একি আমার স্পর্ধার প্রত্যুত্তরে অবজ্ঞার হাসি? নাকি সবিতাদি আমাকে বিশ্বাস করল, নির্ভর করল আমার সত্যোৎসাহিত সততায়? আমি তখন চিৎকার করছিলাম মনের ভেতরে, আমাকে ক্ষমা কর সবিতাদি, আমাকে বিশ্বাস কর, কোন অসহৃদে দেশ্যে নয়, তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমাকে সামান্য সুখী করার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলেছি।

সবিতাদি হাসল আরো। আমার ভাবতে ইচ্ছে করল এ হাসি তার সমস্ত অস্তিত্বের মুক্তির উপলক্ষি হোক।

হাতের লাল উলবোনা খামিয়ে উঠতে গেল সবিতাদি। উলের গুলিটা কোঁচড় থেকে গড়িয়ে গেল মেঝের অনেকদূর। গোছাতে গিয়ে গিঁট পাকিয়ে জড়িয়ে গেল সব।

সবিতাদি বারান্দায় ডাকল আমাকে। আমরা দুজনে সেদিন অস্তুরে প্রায় প্লাবনের মত কথার উচ্ছ্বাস নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলাম কতক্ষণ।

সুজিত মাথা নীচু করে অ্যানা কারেনিনার যে পাতাগুলোর ওপর চোখ রেখে এতক্ষণ ভাবছিল সেটা বুজিয়ে ফেললে। ওপাশ ওপাশ তাকাল একবার। আগের থেকে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে গাড়ির ভিড়টা। সুজিত একটু গা ছড়িয়ে বসল। কম্পার্টমেন্টের কোণে কয়েকজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে জোরে তর্ক-বিতর্ক করছিল। সুজিত লক্ষ্য করল যার কথাগুলো বেশি যুক্তিহীন তার আশ্ফালনটাও তত বেশি। অন্তদিকে যার সঙ্গে সুজিতের নিজের মতামতের ঘনিষ্ঠতা আছে তার পক্ষে লোক-সংখ্যার মত প্রতিবাদের ভাষাটাও ক্ষীণ। সুজিত দরজার কাছাকাছি একটি মেয়ের দিকে তাকাল। বেশ আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য। কিন্তু সুজিতের সেই সব মেয়েকে আদৌ পছন্দ হয় না বাদের পোশাক পরিচ্ছদে প্রথর উচ্ছলতার সঙ্গে কিছু কিছু অশ্লীলতারও আভাস লেগে থাকে। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সুজিতের নিজস্ব কিছু অভিযত আছে। অল্প-স্বল্প যে দু-একজনের কাছে সুজিত তার সবিতাদির সম্পর্কে গল্প করেছে তাতে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রসঙ্গটাকে সে স্থান দিয়েছে গোড়ার দিকে। সুজিত বলে, সবিতাদির চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ও রকম রুচি-বোধ, আশ্চর্য। জানিস কোনদিন দেখলাম না মুখে

কসমেটিক্‌স পেণ্ট করতে। আর কাপড় পরে, অধিকাংশই সাদা, পাড়টা সবুজ, একেই বলে নিরাভরণ সৌন্দর্য। দেহটা যেন অন্তরের আয়না।

সুজিত ফিরে এল তার পুরনো ভাবনায়।

সবিতাদিকে কি অ্যানা কারেনিনা পড়াবে? এর আগে এক ছুটির ছপুয়ে সুজিত জঁ। ক্রিস্তফের অংশ বিশেষ পড়ে বুঝিয়েছিল যে মহৎ সাহিত্য মানুষকে ‘ফ্রাসট্রেশান’ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে। সবিতাকে সুজিত তাই সময় পেলেই অবিস্মরণীয় বহু সাহিত্যের সারাংশ শোনায় সবিতার মনের আত্ম-অবক্ষয়ের চিন্তাগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিতে। অ্যানার সঙ্গে সবিতার চরিত্রের সমতা উপলব্ধি করেই সুজিত বইটাকে শেষ করেছে দ্রুত গতিতে। কিন্তু অ্যানার জীবনের অপঘাত মৃত্যুর অনিবার্যতাকে সে সবিতার জীবনের শেষ অধ্যায় ভাবতে গিয়ে মগ্নমান হয়ে যায়। শেষটুকু বাদ দিয়ে কি শোনান যায় না? কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে শেষটা কি? সুজিত মনে মনে ভাবে আর এমন সাহিত্য কিছু আছে কিনা যেখানে অ্যানার মত চরিত্রের পরিণতি ঘটেছে কোন পরম সার্থকতায়।

গাড়ি এসে থামল হাওড়া স্টেশনে। একরাশ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে এগোতে গিয়ে সুজিত বার বার বাধা পেল। সে ভাবল শহর জীবনে মানুষের খণ্ড-অস্তিত্বের কথা। শৃঙ্খলা এখানে শৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খল ভিড় প্রাটফর্ম ছেড়ে পথে নামবে। তারপর কুলবে ট্রাম বাসের পাদানি পর্যন্ত ছাপিয়ে। অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে। সুজিত চাইছিল তার মনের গতির মত দ্রুততায় সবিতার বাড়ি পৌঁছে যেতে।

স্টেশনে বড় ঘড়ির তলার কে যেন হাত রাখল সুজিতের পিঠে।

—হ্যালো, সুজিত—

সুজিত পিছনে তাকিয়ে বারীনকে চিনল। স্মার্ট পোশাক। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। সেভ্‌ করা পরিচ্ছন্ন মুখ। সুজিতের চেহারা তখন তার উন্টো। ট্রেন জানিতে সারা মুখে একটা ক্রান্তির ধূসরতা। চুল এলোমেলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর জামা কাপড়ের অপরিচ্ছন্নতা ও অতিরিক্ত ভাঁজ কেমন একটা গ্রাম্যতার ছাপ ফুটিয়েছে চেহারায়।

—কি খবর? কোথা থেকে। দেশে গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ। তুই—

—আমি স্টেশনে এসেছিলাম একজনকে তুলে দিতে।

—একজনকে মানে কাকে……

—আমার লেটেস্টকে ।

সুজিত হঠাৎ কি যেন বুঝতে পেরে গম্ভীর হল ।

প্রেম, নারী জাতি, আধুনিক কবিতা, হিন্দী সিনেমা, রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি এই জাতীয় কিছু বিষয়ের ওপর বারীনের চূড়ান্ত সিনিক মন্তব্যের সঙ্গে সুজিতের যথেষ্ট পরিচয় আছে ।

—আচ্ছা চলি……

সুজিত এগোতে গেল । বারীন তার জামার কলার ধরে টান দিলে ।

—দাঁড়া, কোথা যাচ্ছিস ।

—না, আমার দরকার আছে ।

—খ্যাৎ, তোর আবার দরকার কি ? আর আমার সঙ্গে, স্টেশনের রেষ্টোরাতে গিয়ে বসি । কফি খাব ।

সুজিতের চা-তেষ্টা পেয়েছিল সত্যিই । তবু সবিতার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার আগ্রহে কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করল বারীনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ।

ছুটো কফির অর্ডার দিয়ে বারীন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল ।

সুজিত সিগারেট খায় না জেনেও তাকে একটা অফার করলে ।

—একটা ধা, খেলে চেস্টট যাবে না ।

সুজিত সিগারেট খায় না । মনের মধ্যে সবিতার জন্তে উদ্বেগতা আর বারীনের জন্তে বিরক্তি নিয়েও সাধারণভাবে হাসে ।

কফি এলে তাতে প্রথম চুমুক দিয়ে বারীন বলে, আর একটু আগে তোকে পেলে আলাপ করিয়ে দিতুম । খড়্গপুর চলে গেল ছটা বাইশের ট্রেনে । দারুণ মাল, জানিস ।

মাল ! সুজিত আবাল্য যে গ্রাম্য পরিবেশে মাহুষ সেখানে মাল কথাটার অর্থ পণ্যবস্তু । শহরের শিক্ষিত যুবকের মুখে ঐ শব্দের ভিন্ন প্রয়োগের বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নতুন । বারীনকে এর আগে এই শব্দ কখনো ব্যবহার করতে শোনেনি । এর আগে সুজিতকে ছাড়া-ছাড়া অনেক মেয়ের গল্পই শুনিয়েছে বারীন । প্রায় বলা যায় গড়ে তিন মাস অন্তর সে এক একটি নতুন মেয়েকে ভালবাসে । এবারেরটি হয়তো সত্যিই বারীনের পক্ষে খুব আকর্ষণীয় হয়েছে । সেই উপলব্ধির প্রাবল্যকে সার্থকভাবে প্রকাশ করার জন্তেই

কি বারীন মাল ছাড়া অন্য কোন বিশেষণের ব্যবহার ঘটান না ? এ দৈন্ত্য কি জ্ঞানের না বিস্তৃত আবেগের ?

—আগে যে মেয়েটিকে ভালবাসতিস ? তার সঙ্গে...

—ওঃ, তুই মিনতির কথা বলছিস। তাকে তো অনেকদিন ক্যানসেল করেছি। সি ওয়াজ টু মাচ ভালগার। দু-দিন প্রেম গড়াতে না গড়াতেই বলে বিয়ের কথা। আমার কি দায় পড়েছে ? হোয়াই সুড আই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সারাজীবন ঘাড়ে বহিবো ? অ্যাম আই এ চাইণ্ড, যে সারাদিন ধরে চুষবো একটাই লজেন্স ? মেয়েদের কাছ থেকে আমি চাই ফ্রেণ্ডশিপ, নাথিং মোর, নাথিং লেস।

বন্ধুত্ব কথাটার সঙ্গে সঙ্গে সৃজিতের অন্তমনস্ক মনে আবার জাগল সবিতার স্মৃতি। সবিতা সৃজিতের কাছে বন্ধুত্ব চায়। সৃজিতও প্রতিশ্রুত সবিতাকে অমেয় বন্ধুত্বদানের আনন্দে ভরিয়ে রাখতে। এ বন্ধুত্বে দেহের দরজা বন্ধ। অন্তর অব্যাহত। বারীনও তাই বলল। তবু কোথায় একটা গরমিল আছে দুয়ের মধ্যে।

—আচ্ছা, বারীন, কোন গভীর স্তরের ভালবাসা, ভালবাসা না বলে বন্ধুত্বই বলি যদি, বন্ধুত্ব কি স্কুলের ব্ল্যাক-বোর্ডের লেখার মত বার বার লিখে বারবার মোছা যায় ?

—জাধ, লর্ড কন'ওয়ালিশের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অনেকদিন বাতিল হয়ে গেছে।

—তাহলে কি ? এই ধরনের ক্রিবলিটি আমার ভালো লাগে না।

—তাহলে কিছুই নয়। মেয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কিছুই নয়। ওদের সঙ্গে সিরিয়াস বন্ধুত্বও করা যায় না। তার কারণ ওরা পুরুষের চেয়ে অনেক ইনফিরিয়র। সাহিত্য বোঝে না। রাজনীতি করে নিছক ফ্যাশান হিসেবে। বিয়ের পর কলেজে পড়া বিস্তে উনোনে দুধ গরম করতে করতে ফুঁকে যায়। তবু যদি কারো সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ঘটেও কিছুটা, তাকে বিয়ে করলেই সব হালুয়া হয়ে যাবে। যে ইলিশের পেটে ডিম থাকে তার স্বাদটা কি রকম পান্সে দেখেছিস তো। বিয়ে করলেই মেয়েদের পেটে ডিম গজাবে। তারপর সব পান্সে।

কফি খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। সৃজিত বললে, উঠি।

—উঠছি কেন ? কথাগুলো তেতো লাগছে বুঝি ? তোর তো এখনো মেয়েদের

‘মা’ বলে ডাকবার বয়স কাটেনি। এডোলেসেন্ট। বারীন হাসিতে মুখ ভরাল।

কথাগুলো সৃজিতের কাছে সত্যিই ভেতো খানিকটা। তার চেয়েও ভেতো লাগল বারীনের মুরুব্বিয়ানা। যেন নারী-প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য তার জ্ঞান ও ধারণার আয়ত্তে। বারীনই কফির দামটা মেটাল। বাইরে ছইলারের স্টলটার কাছে এসে সৃজিত তার মনের প্রবল বিক্ষোভ প্রকাশ করে ফেললে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—কিসে?

—মেয়েদের সম্পর্কে তোর বক্তব্য। আমার কাছে সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতির চেয়ে জীবন অনেক বড়। আমি বিশ্বাস করি জীবনে জীবনে বন্ধুত্ব ঘটে। যার কাছে আমি নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারি, যার মানস-লোকের স্পর্শে আমার চেতনার এক্সপ্যানশন, বিস্তৃতি ঘটে, আমার আত্মার যে ঘনিষ্ঠ সহোদর তাকেই বলি বন্ধু। সে বরকম বন্ধু লাখে লাখে মেলে নাকি? মেয়েদের সহক্কে তুই যা বলেছিস তার কোনটাই বিশ্বাস করি না আমি। আমি অন্তত পৃথিবীতে এমন কয়েকজনকে চিনি যাদের কাছে রাজনীতি রক্তের জিনিস, আতুড় ঘরের চার দেয়াল যাদের জীবনের চতুঃসীমা নয়। রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশীওয়ালা’ পড়েছিস তারা হচ্ছে সেই ঘোমটা-খসা নারী, ‘হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বালিকীর’। পৃথিবীটাকে অত ছোট করে দেখিসনে বারীন। মানুষের জন্মে খানিকটা অন্তত শ্রদ্ধা রাখিস।

সৃজিত শেষ দিকে তোতলাচ্ছিল। উত্তেজিত হলে ওর কথায় তোতলামি আসে। সৃজিত তার চেনা জগতের মেয়ের কথা বলার সময় স্মরণ করেছিল মাত্র দুজনকে। মিতুদি আর সবিতা। যদিও মিতুদির সঙ্গে তার নিজস্ব ঘনিষ্ঠতা খুব গভীর নয়, অন্যদের মুখ থেকে শুনে শুনেই তার শ্রদ্ধার পরিমাণ ভারী হয়েছে। বারীন অদ্ভুত চতুর হাসি হাসল সারা মুখ জুড়ে।

—প্রেমে পড়েছিস?

ঠাট্টা মিশিয়ে সে প্রশ্ন করল সৃজিতকে। সৃজিতও মরিয়া হয়ে উঠেছে বারীনের সঙ্গে পাল্টা লড়ায়ে।

—কেন, কি দরকার? প্রেমে পড়লেই যে লোকে মেয়েদের স্তব করে এই অর্ধাচীন উক্তিকে আর একবার তুই প্রমাণ করবি বলে?

—ই্যা, কাছাকাছিই ধরেছিস। মেয়েদের স্তব নয়। প্রথম প্রেমে পড়লে আর সম্ভব রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে, তোর বয়সী ছেলেরা রাতারাতি মানবপ্রেমের হোলসেলার এণ্ড রিটেলার হয়ে ওঠে এটা জানিস তো।

—না, জানি না, তোর বয়সটা কত জানতে চাই। প্রাচীন বট না অশ্বথ ?
বারীন উত্তেজিত হয় না। হাসির ছলে পরিহাস করায় সে যথেষ্ট পারঙ্গম।

—বয়সে কি আসে যায়। অভিজ্ঞতাটাই আসল। ওটা বাদ দে, তোর প্রেমের ‘গল্পো’ বল। প্রেমে পড়েছিস বুঝি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে—

‘গল্পো’ কথাটা এমন শীতলতা দিয়ে বারীন উচ্চারণ করল যেন প্রেম করাটা যে বানানো, অবাস্তব গল্প শোনার চেয়ে আর কিছু নয়, এটাই সে ইঙ্গিতে বোঝাতে চায়। সজ্জিত সবিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কাহিনী ইতিপূর্বে যে দু-একজনকে বলেছে তাতে সে কখনো প্রেমে পড়ার কথা বলেনি, বলেছে একটি মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বারীনের কাছে অভিজ্ঞতায় খাটো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং বারীনের প্রতি খানিকটা বিদ্বেষবোধ থেকেই সজ্জিত উত্তর দিল, ‘ই্যা’।

—তাই নাকি ? বাঃ। চুমু-টুমু খেতে দেয় ?

বারীনের অলঙ্ক্যেই সজ্জিতের মুখ রক্তাভ হল। সজ্জিতের মনে হল এত তর্ক-বিতর্কের পরেও সে যেন বারীনের কাছে অভিজ্ঞতায় খাটো ও অপরিণত হয়ে থাকছে। ‘চুমু’ শব্দটা সে মুখ দিয়ে স্পষ্ট করে আজও উচ্চারণ করতে পারেনি, মুখ দিয়ে গ্রহণ করা আরও সাংঘাতিক। সজ্জিতের চোখে সবিতার ঠোঁট দুটো ভেসে উঠতে করুণ হবার মত ব্যথা চঞ্চল হল তার বুকের মধ্যে। এলোমেলো ভিড় বারবার ওদের দুজনকে ছাড়াছাড়ি করে দিচ্ছিল। বাসস্টাণ্ডে পৌঁছেই সজ্জিত মানিকতলা যাওয়ার এইট-বি বাসে চেপে বসল। বাসস্টাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে ‘চলি’ কথাটা বলতেও দ্বিধাবৃত্ত হল সে। মনের ক্ষোভকে চাপা দিয়ে মুখের সৌজন্য প্রকাশ করতে পারল না।

বারীনের গন্তব্যস্থল ছিল কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউস। হারিসন রোডের ট্রামে চেপে বসল সে। হাওড়া ব্রিজ আলোর মালায় সাজানো। গঙ্গার জলে জোনাকির মত নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র আলোর বিন্দু। জাহাজের ভেঁপু বাজল কয়েকবার। দূর সমুদ্রের জলদ-গন্তীর প্রবাহের মত শব্দ। নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর চূড়োর দিকে তাকিয়ে বারীনের মনে পড়ল কয়েক মাস আগের এক দুর্ঘটনার কথা। দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বের জালা জুড়াবার জন্যে শহরের সব

চেয়ে উঁচু বিল্ডিং-এর ওপর থেকে একটি যুবক লাফিয়ে পড়েছিল। চলন্ত ট্রামের প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে যেতে যেতে সেই মৃত যুবকটি সম্বন্ধে আজ বারীনের ধারণা হল, লোকটা ছিল বোকা, হাঁদারাম। মধ্যবিত্ত ঘরের গাড়োল ছেলে। কেরানী হওয়ার জন্যে যারা জন্মায়, কেরানী না হতে পারলে যারা মরে। চাকরি না পাস, পকেট মার না বাপু, সলিড ইনকাম। তাও যদি না পারিস চৌরঙ্গীতে মেয়েমানুষের দোকান দে। চোরাই মালের ব্যবসা কর। মরবার আগে জীবনটাকে চেখে নিতে কি আপত্তি ছিল।

বারীন হাসল আত্মহত্যা প্রসঙ্গে তার অন্য একটা অভিজ্ঞতাকে মনে করে। ছেলেটি ছিল বারীনের ক্লাস-মেট। দুর্ধর্ষ ধরনের ছেলে। ডানপিটে বললে তার চরিত্র স্পষ্ট হয় না। তার কারণ ডানপিটে বিশেষণটা ব্যবহার করা হয় শারীরিক কার্যক্রমের বিচারে। ছেলেটির শরীর ছাড়া মনও ছিল একই গড়নের। মেয়েদের দেখলেই তার মধ্যে উদ্দামতা জাগত। আর সেই উদ্দামতার ঝোঁকে যে-কোন দুঃসাহসিক ছবু'দিকে কাজে লাগাতে পারত সে। যেমন দেড় মাইল দূরের মেয়ে-স্কুলের গেটে গিয়ে ধর্না দেওয়া। সরাসরি দেখা করে প্রেম-নিবেদন করা অথবা চিঠি দেওয়া। অন্য কোন ছেলে তার ভালবাসার প্রতিবন্ধক হলে তাকে ঘাড় মটকে শেষ করে দেওয়ার ভয় দেখানো। ছেলেটির জীবনে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা ছিল। সে জানতো ম্যাট্রিকে কেল করবে। কেল করলেই জাহাজের খালাসী হয়ে অথবা যে ভাবে হোক সে যাবে আমেরিকায়। ঘটনাচক্রে ছেলেটি একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে মজলো। এবং ঘটনাচক্রেই কিছুকাল পরে ছেলেটি জানতে পারল মেয়েটি অন্য একজনের প্রতি আসক্ত। উচ্ছে করলেই সে পারতো মেয়েটিকে পৃথিবী থেকে নিকেশ করে দিতে। তা কিন্তু করল না। তার বদলে এক দীর্ঘ চিঠিতে তার জীবনের ব্যর্থতার বা পরাজয়ের সমস্ত কাহিনী লিখে মেয়েটিকে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে আত্মহত্যা করতে গেল পাঁচ মাইল দূরের রেল লাইনের ধারে। সে লাইনে গাড়ি যায় দিনে তিন কি চার বার। সন্ধ্যা থেকে রাত এক প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষার মধ্যে ট্রেন এল না। ইতিমধ্যে মশার কামড়ে তার সর্বাত্ম জলে উঠেছে। ক্রমশ মশার জ্বালায় কাছে তার প্রেমের ব্যর্থতার জ্বালা এত জ্ঞান আর অহেতুক বোধ হল যে আত্মহত্যার ইচ্ছা বাতিল করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে হল তাকে। কয়েকদিন পরে ম্যালেরিয়ার পড়েছিল সে। এরকম আরও অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখ আছে বারীনের। বারীন এই

ভেবে বেশ খুশি অনুভব করল যে তার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে আরও কিছু সম্পদ বাড়বে সৃজিতের কল্যাণে। সৃজিত যদি সত্যিই কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে সে অদূর ভবিষ্যতেই গুনতে পাবে এমন সব কাহিনী যার সারমর্ম হল, নারী জাতি বিশ্বাসঘাতিকা। বারীন ভাবল, সৃজিতের মধ্যেও নিশ্চয় একবার দু-বার আত্মহত্যার ইচ্ছে চাড়া দিয়ে উঠবে। ওটা একটা বিশেষ বয়সের রোমান্স। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই সৃজিত সরকারী আপিসের পোষা কেরানীর সাংকল্যময় জীবনকে গ্রহণ করতে বাধ্য পাবে কি কিছু? না পাবে না। ব্যর্থ প্রেমিক আর ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতা খুব একনিষ্ঠ চাকুরে হতে পারে। বারীনের মনে পড়ল ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি-আন্দোলনের একটি অগ্রিময় অধ্যায়ের স্মৃতি। যাদের নেতৃত্বে সেই ষণ্ড-আন্দোলনের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নতুন বল-বীর্ষের রসদ জুগিয়েছিল বারীন তার তখনকার রাজনৈতিক জীবনে তাঁদের শক্তিমত্তাকে গভীর শ্রদ্ধা করত। স্বাধীন ভারতে তাদেরই একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার হয়েছেন। অধীনস্থ পুরুষ কর্মচারীদের ওপর তাঁর দোঁদগু প্রতাপ ও মহিলা কর্মচারীদের প্রতি প্রবল দুর্বলতা প্রায় সর্বজনবিদিত। উৎকোচ গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এমন অনেক দৃষ্টান্ত বারীনের জানা।

ট্রাম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামবার মুখে প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি হতে যাচ্ছিল তিনটি মেয়ের সঙ্গে। গ্লোব-নার্শারী থেকে সগু-কেনা রঙিন কাগজে মোড়া রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে দুটি-তিনটি মেয়ে হুড়মুড়িয়ে গাড়িতে উঠল। বারীন গাড়ির বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের উজ্জসিত ভঙ্গিতে গাড়িতে বসা দেখল। বারীনকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করল যে মেয়েটির গায়ে ঘন লাল ব্লাউজ। লাল ব্লাউজের ভেতরে ব্রেসিয়ারের সাদা অংশটা খুব প্রকট দেখাচ্ছিল। এই দৃশ্য বারীনকে ভারী আকৃষ্ট করে থাকে।

বারীন অকারণে ভাবল, মেয়েগুলো কোথায় চলেছে, বিয়ে বাড়ি? না চৈত্র মাসে তো বিয়ে হয় না। তাহলে? কারো জন্মদিনে? কিংবা... পিছনে একটা মোটরের কর্কশ হর্ন বারীনকে বিরক্ত করল। মেয়েদের অতিরিক্ত উল্লাস বা হাসিখুশির ঞ্চাকামিও বারীনের যথেষ্ট বিরক্তিকর লাগে।

তিরিশের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি লিখেছিলেন ট্রাম হল নিয়মতান্ত্রিক,

বাস স্বেচ্ছাচারী। অর্থাৎ বাসের যাত্রাপথ অনেক বেশি স্বাধীন ও স্ববল। ট্রামের পক্ষে নির্দিষ্ট বাধা-ধরা লাইনের বাইরে অধঃপতন ছাড়া অচ্যুতি নেই। এই হিসেবে বারীনের অনেক আগেই সৃজিতের মানিকতলার মোড়ে পৌঁছে যাওয়া উচিত কিন্তু জনাকীর্ণ ও যানবহন শহর ঐ কবিতাংশকে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে উঠতে দেখনি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতি এবং বিজ্ঞানের বিপুল বিকাশ ও বিস্তার, সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের রক্তধারায় অথচ ভারতবর্ষের যুত্ম ও ষড়্ভিত পাকিস্তানের জন্ম, পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ ষাণ্ড ও উদ্বাস্ত-সমস্তা ইত্যাদি ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে ইতিহাস সাল-তারিখের অনেক পর্ন-পর্বাস্তুর পার হয়ে পৌঁচেছে ১৯৫৪-এর শেষ প্রান্তে। ১৯৩১ সালের জনসংখ্যা ছিল ১,১৯৬,৭৩৪। ১৯৫১-পৌঁছে সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে ২, ৫৪৮, ৬৭৭। টালিগঞ্জ এলাকা এর সঙ্গে যোগ করলে আরও প্রায় দেড় লক্ষের কিছু বেশি সংখ্যাধিক্য ঘটবে। আর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অল্পপাতে বেড়েছে যানবাহনসংখ্যা। যানবাহনের অল্পবল হিসেবে বেড়েছে দুর্ঘটনা। কিন্তু পথের সীমা ও প্রশস্ততা বাড়েনি। স্ট্রাও রোড ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সরকারী বাস ও প্রাইভেট মোটরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায় ফলে সৃজিতের গাড়িকে অনেকটা সময় পথের মাঝখানে আটকে থাকতে হল। সৃজিত একবার ভাবল গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই মানিকতলা পর্যন্ত যাবে কিনা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে আশঙ্কিত হল এই ভেবে যে যদি ইতিমধ্যেই গাড়ি চলাচলের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়?

সৃজিত ভীষণ রকম অসহায় বোধ করল নিজেকে। বারীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই এই অল্পভূতিটা ক্রমশ পেয়ে বসছে তাকে। বারীন আর এই ষাণ্ডিক শহরের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?

বারীনের মত আরও অনেককে সৃজিত জানে ষাদের চরিত্র সমপর্যায়ের। ভালবাসার প্রতি এদের এমন ঘৃণা কেন? অথচ কেন এরা নারীসঙ্গের প্রতি লুব্ধ? এরা রবীন্দ্রনাথের গান গায়। অথচ অল্লীলতার ষাদ না মিশিয়ে কথা বলতে পারে না। বন্ধুত্ব কথাটার তাৎপর্যকে এরা তেবড়ে-তুবড়ে ষাকিয়ে মানবিকতাহীন সহানুভূতিহীন, নিছক ব্যঙ্গ বিক্রপ আর নিজেদের জীবনের চরম অচরিতার্থতা অক্ষমতার ব্যাধিকে অন্তের জীবনে সঞ্চারিত করার সম্পর্কে নামিয়ে এনেছে। কেন এমন হয়ে গেল?

অথচ এই বারীন একদিন কবিতা লিখতো: মানুষকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, শব্দ দিয়ে সাজানো স্বপ্ন রচনা করতো পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্তে।

আমরা এক সঙ্গে জেল ধটেছি। অনশন ধর্মঘট করেছি। লাঠি, গুলি ও মৃত্যুকে ভয় করিনি। ইঁ্যা, আমাদের রাজনীতি বারবার ব্যর্থ হয়েছে আমি স্বীকার করি, দেশের মানুষকে আমরা সঠিক নেতৃত্বের পথ ধরে কোন সম্ভাবনার জগতে এগিয়ে আনতে পারিনি স্বীকার করি। তার ফলে আমাদের দ্রব ও অধঃ বিশ্বাস অনেক সন্দেহ সংশয়ে টাল খেয়েছে—সত্যি। আমরা ক্রমশ রাজনীতির পথ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছি তাও সত্যি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারোনো.....

এতক্ষণে এঞ্জিনের শব্দে সমস্ত গাড়িটা কেঁপে উঠল। গাড়ির দু-পাশে জমে থাকা ঠেলা গাড়ি, রিকশা আর মালবোঝাই লরিগুলো চঞ্চল হল এবার। লরির ড্রাইভার ঠেলা গাড়ির চালককে খিস্তি করে গাল দিল। রিকশাগুলোকে আটকে দিল পুলিশ। দু-একটা প্রাইভেট কার অধৈর্য হয়ে হর্নের ককর্শ ও সুরেলা শব্দে যেন ব্যস্ত ট্রাফিক পুলিশের কানে পৌঁছে দিতে চাইল তাদের আগাম খালাস করে দেওয়ার আজ্ঞা। বাসের কণ্ডাকটর বারবার সজোরে ঘন্টা বাজাল, গাড়ির পিঠে হাত চাপড়ে ঢাকের মত শব্দ তুলল, থেমে থমকে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে এগোতে সজ্জিতের গাড়িটা আগের চেয়ে আরও অনেক যাত্রীদের ভিড় নিয়ে দ্রুতগতি হল। সজ্জিত এবার ভাবতে লাগল সবিতার চেহারা ও তার সঙ্গে ভাবী কথোপকথনের সংলাপ।

বাস থেকে নেমে সবিতাদের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত পথ হেঁটে আসতে আসতে সজ্জিত ঠিক করল, খুব আন্তে সিঁড়ি ভাঙবে যাতে জুতোর শব্দ না ওঠে, আর পিছন থেকে সবিতার চোখ দুটো টিপে ধরবে সে। সবিতার কপট অভিমান সজ্জিতের ভালবাসা জানাবার এই নতুন পদ্ধতির আকস্মিকতায় উবে যাবে।

জুতোর কোন রকম শব্দ না করেই সজ্জিত দরজাটায় আন্তে ঠেলা দিল। খুলল না। আর একটু জোরে ঠেলল। তবু খুলল না। বোঝা গেল ভেতর থেকে খিল দেওয়া। কড়া নাড়ল একবার। আরও একবার। রান্নাঘরের দিক থেকে বুড়োটে গলার হাঁক এল—কে গা?

বিশ্বর মার গলা। বিশ্বর মা ছাড়া আর কেউ নেই নাকি? তাহলে সবিতাদি কি.....

বিশ্বর মা দরজাটা খুলে দিল। সজ্জিতকে দেখে হাসল একটু।

—আগো বাবু, বলি এতদিন পরে এসলে।

—এঁ্যা, ইঁ্যা, দেয়ি হয়ে গেল। এরা সব কোথায় বিশ্বর মা?

—কারা বল দিনি ?

—এই এরা সব। কাঁদন চিত্রা-চিত্রা।

সুজিত কিছুতেই সবিতার নামটা উচ্চারণ করতে পারল না। যেন দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তাদের ঘন বন্ধুত্বেও কিছু অপরিচয়ের সংকোচ এসে মিশেছে। বিস্তর মা কিন্তু জবাব দিল তার না বলা প্রশ্নটারই।

—মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেছ তো ? তিনি যে বেরুলেন এই ঘন্টা খানিক আগে। আপনি বোসো না। এসে পড়বেধন।

—কোথায় গেছে জান না ?

—মা আর বাবু তো এক সঙ্গে বেরুল। ছেলেটার শরীর ধারাপ হোছিল। কাল খিকে আছে একটু সুবিধের দিকের। তাকেও তো সঙ্গে নিয়ে বেরোল। আপনি ভিতরে এসে বোসো না।

বিস্তর মা সামনের ঘরের আলো জ্বলে দিল। সুজিত সেটা নিভিয়ে দিয়ে আলো জ্বালল সবিতার শোয়ার ঘরের। বিছানায় গিয়ে বসল। বিস্তর মা জিজ্ঞেস করলে, চা করে দেব ? সুজিত মাথা নেড়ে জানাল, দিতে পার। বসে থেকে চোখ দিয়ে স্পর্শ করল সবিতার ব্যবহার্য বস্তুগুলোকে। চামড়ার স্ট্রাকেশের ওপর হলুদ পাড় একটা শাড়ি এলেমেলো ছড়ান ছিল। সেটার দিকে তাকালেই মনে হয় সবিতা আশেপাশে কোথাও আছে, এখুনিই এসে পড়বে। জানলার টাঙানো ময়লা শাড়ি, মিষ্টুর জামা, বিরামবাবুর ধুতি, গেঞ্জি। ছাঙারে ঝুলছে পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর ওপর একটা ব্লাউজ।

এঁয়া, পাঞ্জাবীর ওপর ওটা কি ? সাদা ব্লাউজ ? সবিতাদির ? ব্লাউজের বগলের কাছে ঘামের লালচে দাগ। কাঁধের কাছে লাল সূতোর একটু নকশা। সবিতাদি আর বিরামবাবু একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এক ছাঙারে ঝুলছে দুজনের পরিচ্ছদ। তাহলে কি……? সাদা ব্লাউজ আর সাদা পাঞ্জাবী কি একটা সংকেত ? সবিতাদি কি আমাকে জানাতে চায়, সুজিত, কাজের খাঁচায় আটকানো বিরামের বন্ধ হৃদয় এতদিন পরে আবার ভালবাসার আকাশের দিকে ডানা ছড়িয়েছে।

সুজিত এমনভাবে কথাগুলো ভাবল যেন সে ব্লাউজের সাদা পটভূমিতে লেখা ছিল কথা কটি।

অল্প হাওয়ায় পাঞ্জাবীর হাতা দুটো ব্লাউজের গায়ে ঠেকল। সুজিতের চোখে স্পষ্ট হল একটা আলিঙ্গনের ছবি। সবিতার সাদা শরীরটাকে সে প্রত্যক্ষ

করল এক আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবনত, স্থির, অচঞ্চল। সৃজিতের শাসনীন শুকনো ধোলের মত শরীরটা যত্নের অমুভূতিতে শিথিল হয়ে এল।

বিশ্বর মা চা নিয়ে এল। জ্রত চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে সৃজিত বললে, বিশ্বর মা, উঠছি। এলে বোলো আমি এসেছিলাম।

সারাদিনের সমস্ত জীবন্ত আকাজ্ঞাগুলো এখন শূন্যের বিকৃত ভঙ্গাবশেষের মত। শহরের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সৃজিত ভাবল, লোকবহুল এই শহরের কোন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি কি কেঁদে উঠতে পারি? ছেলেবেলায় দোকান থেকে খাবার কিনে ঘরে আসার পথে চিলে ছেঁ। মেরেছিল একদিন। কেঁদে উঠেছিলাম। আজ আর তা সম্ভব নয়। এগুলো জন্মে বুকের ভেতর। অথচ এত বড় শহরে কোথাও কি একটু ঠাঁঠি আছে যেখানে ব্যক্তি তার একক বেদনাকে নিয়ে কালিদাসের যুগের মত বিশ্বব্যাপ্ত শোকের পটভূমি রচনা করবে। ট্রাম, বাস, রিকশা, মোটর, লরি, মানুষের অবসরহীন গতিবেগ, প্রয়োজনের কলরব, মাথা কধা, স্বার্থের সম্পর্ক, সময়ের দাম দিয়ে গড়া এই শহরে? সবিতাদিকে আমার কৈশোরের একটি প্রেমের কাহিনী আজও বলিনি। দূর সম্পর্কের এক বোনকে কিছুদিনের জন্যে ভালবেসেছিলাম আমি। তারা যেদিন বর্ধমানের বাসা উঠিয়ে কলকাতায় ফিরে এল সেদিনও আমার আত্মাকে আজকের মত বিদীর্ণ মনে হয়েছিল।

পুকুর পাড়ের উঁচু তালগাছের নীচে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি কথা বলতে পেরেছি সেদিন অথও নীরবতার সঙ্গে। পুকুরের জলের ঢেউ গুনে গুনে, নীলাভ আকাশের অসীম বিস্তৃতির কাছে নিজের ক্ষুদ্রতাকে উপলব্ধি করে, ঝড়গাদার ওপরে শালিকের নাচ দেখে, ধুলো জালানো তীক্ষ্ণ রোদের ছপুয়ে নিজেকে জড়িয়ে জড়িয়ে আমার আত্মার ক্ষত জুড়ে জুড়িয়ে গেল। এই শহরে কোথাও কি আছে সেই দীর্ঘ তালগাছের তলাকার শীতল ছায়া?

সৃজিত দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরল তার বোডিং হাউসে। হ্যারিসন রোডের ওপরে নিউ ক্যালকাটা লঞ্জে। ওর থাকার ঘর দোতালায়। একতলার সিঁড়ির কাছে উঁকি মেরে দেখল ওর নামে কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা। না আসেনি। দোতালার যে ঘরে সৃজিত থাকে, বড় ঘর সেটা। শয্যা সংখ্যা মোট পাঁচটি। কয়েকজন এখনো কেয়েনি। রাজেন ও বিভূতি রাজেনের বিছানায় বসে ভুয়ুল তর্ক করছিল। বিছানাটা অগোছালো। তার ওপর

মুড়ি, মুড়ির ঠোঙা, শালপাতা, তেলেভাজার টুকরো ছড়ান। মেঝেটা নোংরা হয়ে উঠেছে সিগারেটের ছাই আর দধাবশেষের টুকরোর।

কাঁধের ব্যাগটা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখার অবসরে সজ্জিত ওদের তর্কের বিষয়টা বুঝতে পারল। স্টালিনের নতুন একটি থিয়োরি এসঙ্গে বিতর্ক। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও টিকে থাকতে পারে। প্রিন্সিপল অব কো-একজিস্টেন্স।

আবার দুটি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাত অবশ্যস্তাবী। কনফ্লিক্ট অব ইনটারেস্ট।

সজ্জিতকেও ওদের আলোচনার টানার জন্তে রাজেন ব্যঙ্গ করল সজ্জিতের একটি মতামতকে। সজ্জিত তার জবাব দিল না। জামা কাপড় পান্টাল। রান্নাঘরে গিয়ে ধাওয়ার কথা জানিয়ে অর্ডার দিল এক-কাপ চা-এর। রাজেনের ঘড়িতে দেখল মোটে সাড়ে আটটা। এখনো অনেক রাত বাকি। এতখানি সময়কে নিয়ে কি করবো? সবিতাদি হয়তো এতক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছে। কি ভাবছে? কিছু ভাবছে কি? আমি কি সত্যিই এবার সবিতাদির জীবন থেকে মুছে যাব? নাকি সবিতাদির জীবনে বিরামবাবুর পাশাপাশি আমারও কোন সহ-অবস্থানের ভূমিকা থাকবে? আমাদের মধ্যেও কি স্বার্থ-সংঘাত অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠবে কোনদিন?

সজ্জিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু গত কয়েক বছরে চূড়ান্ত কোন মানসিক সংকটের মুহূর্তে সজ্জিত ঈশ্বরের মত কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে চিন্তের শান্তি প্রার্থনা করেছে। চা খেয়ে বাইরের বারান্দায় এল সজ্জিত।

নীচের চলমান শহরের আশ্রয়িক গর্জনের দিকে তাকাতে ভয় পেয়ে সে তাকিয়ে রইল আকাশের সূদূর ধূসরতার দিকে।

• • পাঁচ • •

সকালের ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁত মেজে বারান্দায় গিয়ে বসল বিরাম। আজ তার কাজের তাড়াটা বেশি। পাশে চার-পাঁচটি মোটা-সোটা ফাইল। প্রায় ছাত্র জীবন থেকেই খবরের কাগজের উল্লেখযোগ্য লেখা বা কাটিং সংগ্রহ করে রাখা তার অভ্যাস। পরবর্তীকালে সাংবাদিক জীবন শুরু করার পক্ষে সেগুলো যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বিরামের ফাইলগুলো নানা পর্যায়ে বিভক্ত। একটি ফাইলে থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনিষীদের ওপর দেশ বিদেশের

খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সংগ্রহ। অন্য একটিতে থাকে কেবল বাংলার লোকশিল্প, লোকগীতি বা লোকচিত্রের ওপর প্রবন্ধ এবং শিল্প নিদর্শনের যুদ্রিত অনুলিপি। আর একটিতে থাকে দেশবিদেশের তাৎপর্যপূর্ণ রাজ-নৈতিক ঘটনাবলীর কাটিং। অন্যটিতে বিবিধ বিষয়ের ওপর এলোমেলো সংগ্রহ। বিরামের নিজের প্রবন্ধাদিরও একটি স্বতন্ত্র ফাইল আছে।

কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্তে বিরাম আজ তার সব কটি ফাইল নামিয়ে ঘাঁটছিল। সবিতা মিন্টুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় এল চায়ের কাপ হাতে। বিরাম অনেকক্ষণ কাপে চুমুক দিল না। ব্যস্তভাবে ফাইলের কাগজগুলো পরীক্ষা করছিল।

—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে এল তোমার।

সবিতার কণ্ঠস্বরও ঠাণ্ডা। এমন কি তার শরীরও। আজ খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে সে। কাল সমস্ত রাত কেটেছে নিদ্রাহীনতায়।

বিরাম চায়ে প্রথম চুমুক দিতেই সবিতা বললে, শোন।

মুখের দিকে তাকিয়ে বিরামের ভুরুতে সামান্য একটু ভাঁজ পড়ল।

—কি হল, রাত্রে ঘুম হয়নি তোমার?

সবিতা মুহূ হাসল, কেন কিসে বুঝলে?

—চোখের কোণে কালি জমেছে।

—হ্যাঁ, ঘুম হয়নি ভালো।

—বারান্দায় উঠে এলে না কেন? হজম হয়নি বুঝি। কাল বেশ গুরুপাক খাওয়া হয়েছে। আর সবই তো ঐ ভেজিটেবল ঘিয়ে রাঁধা।

বিরাম গত রাত্রে বারান্দায় শুয়েছিল। সবিতা নিজের শোবার ঘরে। গত রাত্রে সবিতার ভালো ঘুম হয়নি এটা বিরাম ঠিকই বুঝেছে। কিন্তু তার সঠিক কারণটাকে উপলব্ধি করার মত অনুশীলন বা আগ্রহ কি আছে বিরামের? সবিতা তার ভিজ্জে মুখের ওপর মনের ঘান আভা ফুটিয়ে ভাবল, এই হল বিরাম। আর এই হল আমাদের বিরোধের উৎস। ঘুম না হওয়ার পক্ষে গরম আর বদহজম ছাড়া আরও কোন কারণ থাকতে পারে এটা কি বিরামের অভিজ্ঞতার বাইরে? ছাত্রী জীবনে বিরামের সঙ্গে ভালবাসা-বাসির শুরুতেও যে কত রাত্রি এমনি না ঘুমিয়ে কেটেছিল বিরামকে কি আজ তা বলে দিলেও মনে করতে পারবে? নাকি বিরাম সবই জানে। জেনেই উপেক্ষা করতে চায় আমাকে। পরোক্ষে জানাতে চায় নতুন করে

ভালবাসার বা ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার পক্ষে দুরাশা। এই নির্লিপ্ততাই বিরামের শাসন। ওর সৌজন্য, ভদ্রতা, শিষ্টাচার এগুলোই আঘাত করে আমার মর্মমূলে। কেন বিরাম রুক্ষ, তিক্ত কর্কশ স্বরে বলতে পারল না যে আমার ঘুম না হওয়ার কারণ সৃজিত, সৃজিতের একা ফিরে যাওয়ার, সৃজিতকে না দেখে একা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাবোধ।

সবিতা স্নান করে পরা শাড়িটা শরীরে ভালো করে গুছিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বারান্দায় এল আবার।

—শোনো। এই টাকাটা রাখ। কাঁদনকে দিয়ে বাজার করতে। আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘন্টা দেড়েক পরে ফিরবো।

বিরাম টাকাটা হাতে নিল না। মাথা নীচু করে একটা ছাপানো লেখা পড়তে পড়তেই বিরক্ত স্বরে বললে,—বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি?

—আর কে থাকবে। চিত্রা আছে।

—তাহলে তার কাছে টাকাটা রেখে যেতে অসুবিধে কি? দেখছ না, একটা কাজ করছি, এসময়েই যত ডিসটারবেল।

বিরাম বাঁ হাতের আঙুলের ঝটকায় একটা ফাইলের ওপরে রাখা ময়লা নোটটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার যুঁহু স্বগতোক্তি করল—কাজের সময়েই যত ফাঁকড়া তোমাদের।

একটু বাদে বিরাম আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সবিতা টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। রেগেছে একটু। তা রাগুক। ওদের এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব! সাধারণ এই বোধটুকু পর্যন্ত নেই যে একটা লোক কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে চিন্তা করছে, তাকে বিরক্ত করা অন্তায়। এটা সবিতার এক-আধদিনের দোষ নয়। এইটেই চরিত্র ওর। কোন ইনটিগ্রিটি না থাকার ফল। শুধু মনের একরাশ মেয়েলী বিহ্বলতা নিয়ে, কৃত্রিম বেদনা নিয়ে হাওয়ার ওপর হাঁটছে। তার ফলেই ওর আর আমার চিন্তার মধ্যে, পরিকল্পনার মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমি চাই ধ্যান, সুনাম, যশ, সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। গত দু-তিন মাস থেকে আমার খাটুনির মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। সকালের ঘুমভাঙা থেকে রাতের ঘুমের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চিন্তা করি আমার আপিসের কাজ, আমার নিজস্ব লেখা-জোখা। পূর্ব নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা ও বজায় রাখা যাদের হাতের মুঠোয়

সমাজের অধিকাংশ মানুষের উন্নতির বা সার্থকতার চাবিকাঠি। কোন অলৌকিকত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমি বিশ্বাস করি পরিশ্রমে, অধ্যবসারে, ধৈর্যে। ছাত্রজীবন থেকে অথবা বলা যায় বাবার মৃত্যুর পর থেকে জীবনের নগ্ন, ভয়াবহ, করুণ, ক্লিষ্ট কদর্য যে সব দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা আর ছুর্ভোগের স্তর পার হয়ে এসেছি তারা নতুন করে আর আমাকে হতাশায় বিধতে পারবে না। আজ আমার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকে উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি শব্দ, আমি যা লিখি, তার জন্তে মূল্য মেপে রাখি, কারণ, এই শব্দগুলো আমাকে অর্জন করে হয়েছে ক্ষুধা, রক্ত আর কান্নার বিনিময়ে। সবিতা কিন্তু কোনদিনও আমার জীবনের গৃহ ও গভীর স্তরের এই সব উচ্চাশাকে সহানুভূতি, সমবেদনা বা সহযোগিতা দিয়ে স্পর্শ করতে পারেনি। ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে আত্মকেন্দ্রিকতার মোহে। শুধু কিছু মেট্রিরিয়েল বা পার্থিব সুখ সুবিধা পেলেই এবল খুশিতে ও জীবনকে ধন্যবাদ জানাবে। স্বামীকে ও চায় ওর উড়ো আঁচলের ধবজা উড়িয়ে বেড়াবার বন্ধু। জীবনকে ও এখনও মনে করে ইউনিভার্সিটির করিডোর। ভালবাসাকে ভাবে রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার ফটোগ্রাফ। জীবন সম্পর্কে এই রকম অলীক, ভ্রান্ত, কাঁপা আর কৃত্রিম ধারণার উপাদান ও সংগ্রহ করেছে ছাত্রী জীবনে পড়া কোন ভাবালু উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’ থেকে। কিন্তু জীবনটা কি রঙিন মলাটে আটকানো ছাপা হরফের উপন্যাস?

ফাইলের মধ্যে প্রয়োজনীয় লেখা খুঁজতেই বিরাম এই জাতীয় গভীর চিন্তার মধ্যে এসে গেল। অনেক সময় গভীর চিন্তার দীর্ঘ প্রবাহ, শব্দের বা অক্ষরের আকারে নয়, শুধু অনুভূতির মাধ্যমে এক বলকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। শব্দ বা অক্ষরের আকারে তাদের অনুবাদকে মনে হয় অসংলগ্ন। নিজের সজ্ঞান ইচ্ছার বা উপলব্ধির অজ্ঞাতসারেও চিন্তার এই ধারা প্রবাহিত হতে পারে। বিরাম ভেবে চলল।

মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি লাভের আকস্মিক অহংকার আজ মেয়েদের আবার টেনে নিয়ে চলেছে নতুন ধ্বংসের দিকে। কোটি কোটি বর্ষের সাহিত্য, চিত্রকলা, কোটি কোটি মানুষের ধ্যান ধারণা, বিজ্ঞা ও বেদনার যোগফলে গড়ে ওঠা নারীত্বের যে স্নিগ্ধ কোমল, বিস্ময় ও বিমূর্ত সৌন্দর্যরূপ, তাকে তারা নিজের হাতেই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চায়। এই সময়ে বিরামের চোখে ভেসে উঠল ম্যাডোনার ছবি। ম্যাডোনার সঙ্গে মিলিয়ে একটা

ব্যক্তির আভাস মাথায় এল তার। শব্দ দিয়ে নয়, অনুভূতির সাহায্যেই উচ্চারণ করল কথাটা ; ম্যাডোনার বদলে ম্যাডাম।

শহর জীবনে আজ একটা নতুন আর ভয়ংকর শব্দের আমদানি হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় মেয়েদের দিক থেকেই এই ব্যাপারে বেশি আগ্রহ। এর কারণ কি? মেয়েরা যা হতে লজ্জা পায়? যা হওয়ায় অর্থ কি পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করা? গর্ভে সন্তান ধারণ করাটা তাদের ঝাঁক। মুটের সমপর্ষায়ে নামিয়ে নিয়ে যাবে এই ভয়? শিক্ষার সঙ্গে এত ক্ষুদ্রতা, দীনতা। মেয়েরা আত্মস্থ করল কি করে? চাকুরিজীবী হওয়ার মধ্যে, ট্রামে-বাসে পুরুষের ধাক্কা খেয়ে আপিসে হাজিরা দেওয়ার মধ্যে, পুলিশের টিয়ার গ্যাস খেয়ে রাজনীতি করার মধ্যে যাদের আত্মবিকাশ ঘটে, চিন্তের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়, তারা আপন সংসারের একটি মাত্র স্বজনের জীবনে সেবা, সাহায্য, সমবেদনা জোগাতে গিয়ে দাসত্বের জ্বালা অনুভব করে কেন? আরও কারণ থাকতে পারে। পুরুষ এতকাল যৌন-সন্তোগের যে উচ্ছৃঙ্খল আধিপত্য ঘটিয়ে এসেছে সমাজে, হয়তো মেয়েরা নতুন জাগা বিবেকের বশে তারই প্রতিষেধক হিসেবে সুধাভাণ্ডকে বিষকৃন্ত করে তুলতে চাইছে। ভালবাসা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত গাছ না হয়ে পালিশ করা কাঠের টেবিলে রূপান্তরিত হতে চলেছে আজ। সবিতার ওপর ভীষণ রকম বিরক্ত হয়েছিল বলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিরামের মগজে, পর পর, প্রায় প্রবন্ধাকারে, এই ভাবনাগুলো এসে গেল।

একটি বহুলপ্রচারিত মাসিক পত্রিকার মহিলা বিভাগে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছে সে কয়েকদিন আগে। স্বনামে নয়। ছদ্মনামে। পত্রিকাটির আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট হওয়ায় ফলে পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে নিয়মিত এবং মনোমত। আটপেজী ডবল ক্রাউনের আড়াই পাতা প্রবন্ধের জন্যে ২৫১ টাকা। আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই প্রবন্ধটি তৈরি করার তাড়া থাকায় বিরাম আজ সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে তার ফাইলের সংগ্রহগুলি নিয়ে বসেছিল। মোটামুটি ভাবে তিনটি সংখ্যার লেখার কথা এখন থেকেই ভেবে রেখেছে বিরাম। প্রথমটিতে লিখবে ইংরাজি ভাষায় প্রথম বাঙালী মহিলাকবি তরু দত্ত প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়টি সরোজিনী নাইডুর কবি প্রতিভা ও দেশপ্রেম প্রসঙ্গে, তৃতীয়টি চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবী প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন নতুন পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে তরু দত্তের ওপরে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ

বিরামের সংগ্রহে ছিল। এতক্ষণ সেইগুলিই খুঁজছে সে।

বাজার করার টাকা আর মিন্টুকে চিত্রার হেফাজতে রেখে সবিতা বাইরে এল। সকাল সাড়ে আটটা বাজে এখন। অথচ কী তীব্র তীক্ষ্ণ রোদের ঝাঁজ। হয়তো রাত্রে নিদ্রাহীনতায় সবিতার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বলেই রোদের উত্তাপটা অতিরিক্ত ঠেকল। সবিতা ভেবেছিল বিরাম প্রস্তুত হবে, কোথায় বেরুচ্ছে? সবিতা উত্তর ভেঁজে রেখেছিল। বিনতার কথা বলবে। একই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ওরা। বিনতা থাকে শ্রামবাজারে। সবিতা মানিকতলার মোড় থেকে শেয়ালদাগামী একটা বাসে চাপল। তার গন্তব্যস্থল সূজিতের বোর্ডিং-হাউস।

সূজিত সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শুয়েছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল না। নিদ্রা এবং জাগরণের একটা মাঝামাঝি স্তরে সজাগ ও আচ্ছন্ন হয়েছিল তার চেতনা। সূজিত ভেবেছিল রাত্রে তার চোখে ঘুম আসবে না কিছুতেই। কিন্তু টেন-জার্নির শারীরিক ক্লান্তি এবং মনের নৈরাশ্রজনিত অবসাদ তাকে সহজেই, প্রায় বিছানায় শোয়ামাত্র, গাঢ় নিদ্রায় অচেতন করে দিয়েছে। গাঢ় ঘুমের আচ্ছন্নতার ভেতরেও সূজিত সমস্ত রাত উপভোগ করেছে একটা অলীক, অসম্ভব, তৃপ্তিদায়ক স্বপ্ন-স্বপ্ন। যার রেশটুকু এখনও লেগে রয়েছে তার মনে। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বা বস্তু অংশটুকু জেগে ওঠার সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেছে। স্বপ্নের সেই সুখকর জগতে আবার ফিরে যাওয়ার বেদনাদায়ক আগ্রহেই সূজিত তার চোখে আহ্বান জানাচ্ছিল ঘুমকে।

স্বপ্নের অবশিষ্ট রেশটুকু থেকে সূজিতের মনে কেবল ভেসে উঠেছিল কয়েকটি টুকরো এবং অসংলগ্ন ছবি। সবিতার মুখ, ঝাড়া ও শুকনো একটা গাছ, আলতা দিয়ে লেখা কতকগুলো অলীক চিঠি পড়ছে সূজিতের বাবা, নিত্যানন্দদার বলিষ্ঠ চেহারা আর জলন্ত চোখ, পুরীর সমুদ্রতীরের কোন এক হোটেলে ঘুমিয়ে আছে সূজিত আর সবিতা, ঘুম ভাঙার পর সবিতার হাসির শব্দ আন্তে আন্তে সাবানের সাদা ফেনার মত সারা ঘরে ঘুরপাক খেয়ে সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল আর শীতল শ্রোত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল দুজনকে। সবিতার শরীরের নীচের আধখানা মৎস্ত-কন্টার মত। সূজিত তার স্বপ্নকে ফিরে না পেয়ে অনেকবার চেষ্টা করল স্বপ্নের এই টুকরো অসংলগ্নতাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার এবং এই অসংলগ্ন দৃশ্যের উৎসকে খুঁজে পাওয়ার।

সবিতাদির সঙ্গে আমার দেখা না হওয়ার জন্যে তার নিজস্ব মাধুর্যেভরা মুখটাকে দেখবার আগ্রহ আমার মধ্যে জাগা স্বাভাবিক। মানিকতলা থেকে শেয়ালদার কাছাকাছি আমার এই বোর্ডিং পর্যন্ত আমি হেঁটে এসেছিলাম। কাশিমবাজার রাজবাড়ির সামনে পাতা ঝরা একটা জীর্ণ দেবদারু গাছ আমার চোখে পড়েছিল বটে। ঐ গাছের সঙ্গে আমি আমার বর্তমান অস্তিত্বের তুলনা করেছিলাম যেন। সারা পথে আমার চোখে পড়েছিল আলতায় লেখা অসংখ্য পোস্টার। তার অধিকাংশ ঋণ আন্দোলনের। বাকিগুলি শান্তি আন্দোলনের। ঐ সময়ে আমি হয়তো ভেবেছিলাম সবিতাদি ও বিরামবাবুর জীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে আসার পর সবিতাদিকে লেখা আমার চিঠিগুলো বাবার কাছে পাঠিয়ে আমাকে শাসন করবেন বিরামবাবু। বাবা রাজনীতি ভালবাসেন না। কমিউনিস্টদের লাল রঙের প্রতি তাঁর ভীষণ বিদ্বেষ ও আতঙ্ক। সেইজন্মেই কি আমার চিঠির অক্ষরগুলো আলতায় লেখা হয়ে গেল? কিন্তু নিত্যানন্দদা এই স্বপ্নে এলেন কেমন করে? ঋণ আন্দোলনের কথায় আমি তাঁকে মনে করেছিলাম। নিত্যানন্দদা আমাদের জেলার জনপ্রিয় নেতা। কৈশোর থেকে আমাদের তিনি রাজনীতি শিখিয়েছেন। বজ্রের মত কঠোর আর কুসুমের মত কোমল কথাটি তাঁর প্রসঙ্গে ভীষণ ঋণে। পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে পার্টির সবচেয়ে বিশ্বস্ত একজন কর্মীকে কঠোর দণ্ড দেওয়ার সময় তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় দণ্ডাদেশ পাঠ করেছিলেন বলে শুনেছি। সেটা ১৯৪৯ সালের ঘটনা। পরে সে দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হয় নানা কারণে। আমি কি ভেবেছিলাম বাবা ঐ চিঠিগুলো নিত্যানন্দদার হাতে দেবেন আমার শাস্তির যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্মে? সূজিত সামান্য হাসল।

—আপনাকে নীচে একজন মেয়েমানুষ ডাকছে সূজিতবাবু!

বোর্ডিং হাউসের বছর চোদ্দ বয়সের চাকরটা এসে জানাল সূজিতকে।

মেয়েমানুষ! অর্থাৎ ভদ্রমহিলা। আমার সঙ্গে দেখা করবে এমন ভদ্রমহিলা এই কলকাতা শহরে কে আছে—এক সবিতাদি ছাড়া? কিন্তু সবিতাদি…… সূজিত বিছানায় তখন উঠে বসে লুঙ্গির প্রান্ত দিয়ে চটচটে মুখটাকে মুছে ফেলে। সেই সঙ্গে চোখের পিচুটি। লুঙ্গি ছেড়ে পায়জামাটা গলিয়ে নিল পায়ে। মাথা দিয়ে গলায় গেঞ্জিটা নামাতে গিয়ে গালে ব্যথা অনুভব করল। চুলটা আঁচড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল গালে ব্রণ উঠেছে একটা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা সবিতাকে দেখে সূজিতের মনে হল

সে এখনও ঘুরছে তার মরীচিকাময় স্বপ্নের জগতে। সবিতার ভিজে চুলের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিতের মনে পড়ল স্বপ্নের সমুদ্রের কথা। অনেকক্ষণ জলে সাঁতার কাটার পর হাত-পা শরীরের চামড়ায় যেমন একটা সাদা, শিথিল, কুঞ্চিত বিবর্ণতা ফুটে ওঠে সবিতার মুখে তার স্পষ্ট চিহ্ন। মৃত্যুর পরে এমনি বর্ণহীন, অভিব্যক্তিহীন পাংশু আকৃতি পায় মানুষ। স্মৃতিতের মন থেকে হঠাৎ কখন উবে গেছে গতরাত্রির জটিল বেদনাবোধ।

সবিতা হাসল। এই তার স্বকীয় মাধুর্যভরা হাসি। যার প্রতিক্রিয়া বিষের মত। যুহুর্তে দুর্বল, অবশ, দ্রবীভূত করে দিতে পারে অন্তর অন্তর্জগতের সুরক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের সমস্ত গর্ব, অহংকার, স্বাতন্ত্র্য। সবিতা হেসে স্মৃতিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজল চোখে গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিয়ে। স্মৃতিতের চোখ ঈষৎ নত হয়েছিল মাটির দিকে। এই ক-দিনে আশ্চর্য রকম কালো ও রুগ্ন হয়েছে স্মৃতিত। মুখটা কত ছোট। অথচ সবিতার মনের আকাজক্ষার বা স্বপ্নে স্মৃতিত কত বড় ও শ্রেষ্ঠ। সবিতা কি সেইটাই খুঁজছিল? স্বপ্ন এক। কিন্তু বাস্তব যে কত ভিন্ন!

—কাল চলে এলে কেন? স্মৃতিত.....

শরীরে কোথায় যেন একটা কাঁপুনি বয়ে গেল স্মৃতিতের। আমি অবিশ্বাস করেছিলাম সবিতাদিকে। অথচ সবিতাদির সেই পরিচিত ঘনিষ্ঠ করুণ বিষণ্ণ সন্দোহনের মধ্যে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি তো।

—কাল চলে এলে কেন? কী হয়েছে তোমার? স্মৃতিত.....

—আমার? না কিছু হয়নি।

—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলে? এই করে শরীর ধরাপ হয় তোমার।

স্মৃতিত হাসল। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার অপরাধ স্বীকার করল যেন হেসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, হাসলেই মূল্যহীন হয়ে যাবে তার ব্যক্তিত্ব। সহজ, সুলভ হতে দেবে না সে নিজেকে। নিজেকে গভীর ও নিস্পৃহ করে তোলার চেষ্টা করল স্মৃতিত।

—খুব অভিমান করেছ না? রেগে তো দেখছি টং হয়ে আছ? খুব রেগেছ? এই, তাকাও তো মুখের দিকে।

স্মৃতিত তাকাল। তাকিয়ে ভাবল আমার মুখে আমি নিশ্চয় সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি আমার করুণ ও দৃঢ় অস্তিত্ব। মেয়েদের কাছে ছেলেরা করুণ হতে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু মেয়েরা সব সময় করুণ মুখকে

করণা করে না। সবিতার হাতে নষ্ট করার মত সময় ছিল কম। সবিতা ভাবল, সৃজিতের কাছে নরম হলে প্রচুর সময় লাগবে ওর অবুঝ অভিমান বা মনের ঘা সারাতে। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস সবিতাকে শাস্তি দিল না। সৃজিতের মুখমণ্ডলের রুক্ষতা। চোখের কোণে সামান্য কালিমা, ঈষৎ কোটরে নেমে যাওয়া চোখ, হলুদ কষ জমা দাঁত, সারা মুখে ঘামের তৈলাক্ত প্রলেপ আর লাল ব্রণ সব মিলিয়ে সৃজিতের মুখটাকে অপরিচিত ও অপ্রিয় লাগছিল। সৃজিতের বয়সী ছেলেরা শরীরের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করার সাময়িক উত্তেজনায় কী ভাবে শরীরকে ক্ষয় করে। সে অভিজ্ঞতা সবিতার আছে। সৃজিতের শরীরের ক্ষয় সবিতাকে পীড়িত করল।

—শোনো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। তুমি যদি নাও শুনতে চাও, আমাকে বলতে হবে। আমি নীচে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে এস।

সৃজিত ওপরে গিয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে গণেশকে দেখে একটা ধমকানি দিলে।—মেয়েমানুষ কি রে? এবার থেকে ভদ্রমহিলা না বললে চাঁটা ধাবি। বিভূতির সঙ্গে সৃজিতের বন্ধুত্ব আর সবায়ের চেয়ে নিবিড়। বিভূতির কাছে সৃজিত তার মনকে অনেকবার উন্মুক্ত করেছে। বিভূতি সৃজিতের পাশে এসে দাঁড়াল জিজ্ঞাসু চোখে।

—কে এসেছে, ভদ্রমহিলা বলছিস?

সৃজিতের সারা মুখে নিম টুথপেস্টের ফেনা। তাই কথায় না বলে হেসে এবং চোখের ভঙ্গিতে সে জবাব দিল বিভূতিকে।

—আলাপ করিয়ে দিবি?

‘না’ বলতে গিয়ে সৃজিতের গলায় পেস্টের তেতো ফেনা নেমে গিয়ে বিষাদে কঁচকে দিল মুখটাকে।

দাঁত মেজে, মুখটা সাবানে ধুয়ে সৃজিত আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে নীচে নামবার সময় বিভূতিকে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে সবিতাকে দেখার পরামর্শ জানিয়ে গেল। দেখার কথা একা বিভূতির। কিন্তু সবিতার সঙ্গে একটু হেঁটে পিছনে তাকিয়ে সৃজিত দেখল বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে তিন চারজন। তার মধ্যে রাজেনও আছে। সৃজিত তৃপ্ত হল এই দৃশ্যে।

—আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চল।

এগিয়ে যেতে যেতে কথা হল ওদের। কথা বলল সবিতাই বেশি। সৃজিত

শুধু শুনল সবিতার নরম, কোমল, ক্লান্ত, বিষাদ-মাখানো কণ্ঠস্বর, যা পথের কোলাহল, যানবাহনের কর্কশ ঘর্ষের ছাপিয়ে তার হৃদয়কে স্পন্দিত করছিল। আর সবিতার প্রত্যেকটি কথাকে সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বিচার করল সেই সঙ্গে। সত্যিই কাল অপেক্ষা করা উচিত ছিল আমার। আমি সবিতাকে আঘাত দিয়েছি অকারণে। আমি কেন ভাবতে পারি না সবিতাদির সামাজিক জগতে আমি ছাড়াও আরও অনেক স্বজন-পরিজন আছে, তাদের প্রতি দায়-দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য আছে। সবিতাদি বিরামবাবুর সঙ্গে কাল রাতে গিয়েছিল ওদের এক নিকট সম্পর্কের ভাইবির অন্নপ্রাশনে। আমার মনের মধ্যে এত পাপ বা গ্লানি কেন? আমি ভাবলাম সবিতাদি বিশ্বাসঘাতকতা করল আমার সঙ্গে? সবিতাদি কত সরল আর নিষ্পাপ। আমি যে ওকে ঠিকমত বুঝতে পারি না, ওর অন্তরের অনেক অতল বেদনা ও শূন্যতাকে উপলব্ধি করতে পারি না—সবিতাদির এ অভিযোগ কি কিছুটা সত্যি নয়? সবিতাদিকে শাস্তি দেব, সুস্থতায় ভরিয়ে রাখব, বেঁচে থাকার উৎসাহ দেবো—এই কী আমার জীবনের ব্রত বা সংকল্প নয়? অথচ আমি কেন নতুন করে সমস্তা বা কষ্টের আবর্ত তৈরি করাই তার জীবনে। না, সবিতাদি, এ ভুল আর কখনো হবে না। দেখো, আর কখনো হবে না। তোমাকে আমি নতুন করে চিনলাম। তুমি শুদ্ধ। আমি কেন চিন্তের সরলতা হারালাম? আমহাস্ট' স্ট্রীটের মোড় পর্দস্ত এসে সবিতা বললে, এবার বাসে উঠবো। তাহলে ঠিক পাঁচটার সময় ময়দানে থাকছো তো? মনুমেণ্টের নীচে যেখানে বইয়ের স্টল বাসে ওখানে থেকে।

আজ শনিবার। ১৭ চৈত্র। মনুমেণ্টে বিরাট জনসভা আহ্বান করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধে, খাদ্যের দাবিতে। সুজিত আর সবিতার মধ্যে ঐখানে বিকেলে দেখা করার কথা হল। আজ সবিতার মাইনে পাওয়ার দিন। সবিতা বাসে চাপল। সুজিত দাঁড়িয়ে থেকে দেখল সেই প্রস্থান। সবিতার আঁচলের কিছুটা অংশ বাসের জানলা দিয়ে উড়ছিল। সাকুলার রোডের প্রশস্ত সীমা আর চৈত্রের জলন্ত আকাশের মৌন, মহান বিস্তৃত পটভূমিকায় সুজিতের অহেতুক মনে হল ক্রমবিলীয়মান ঐ সাদা কাপড়ের অংশটুকু তার আত্মা। মানুষের আত্মা মৃত্যুর মুহূর্তে কী ভাবে দেহ থেকে শূন্যলোকে বিলীন হয়ে যায় সেটা স্বচক্ষে দেখার কোঁতুহল সুজিতের মধ্যে শৈশব থেকে একট।

আজ একটা সিগারেট খেলে কেমন হয়?

মহুমেন্টের নীচে বিছানো কয়েকটা বুকস্টলের একপাশে দাঁড়িয়ে সজ্জিত একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওন্টাচ্ছিল। স্টলগুলিতে রাজনীতির বই-ই বেশি। দাম কম। অধিকাংশ বই সোভিয়েট ও চীন সংক্রান্ত।

সজ্জিতের আমার কথা পাঁচটায়। কিন্তু এসে গিয়েছিল পাঁচটার আগে। তখনো ময়দানে জমায়েত শুরু হয়নি। বন্ধুতার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। মাইক পরীক্ষা হচ্ছে ‘ওয়ান টু, থ্রী, ফোর, ফ্যালো টেস্টিং’ ইত্যাদি শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তিতে। ঘাসহীন, ধুলো ভরা মাঠের কিছুটা অংশ ধন্থনে রোদে দেখাচ্ছে ধারালো ছোয়ার মত ঝকঝকে। সজ্জিত মহুমেন্টের ঘন কালো ও দীর্ঘ ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সম্বন্ধে অনুভব করছিল যেন রোদের উত্তাপে তার মাথার বন্ধতালুটা গলে যাচ্ছে। সজ্জিত বারবার নিজেকে দোষারোপ করল এই জন্তে যে তার উচিত ছিল কলেজ থেকে কিরে কলের জলে গা-ধুয়ে তবে বেরুনো। কিন্তু সবিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুনিরোধ্য তাড়নায় সজ্জিত বোর্ডিং-এ কলেজের বইগুলো রেখেই বেরিয়ে পড়েছে। তার কেবল মনে হচ্ছিল মিটিং-এর বিরাট জনসমাবেশের একপাশে সবিতাদি একা একা তার জন্ত প্রতীক্ষা করছে শূন্য ও স্বদূর দৃষ্টিতে।

পত্রিকাটি নাড়া-চাড়া করে শেষ পর্ষন্ত দেখে সজ্জিত অন্য একটা বইয়ে হাত দিল। কবিতার বই। শাস্ত্রির ওপর লেখা বাংলাদেশের একটি কবিতা সংকলন। সজ্জিত কবিতা ভালবাসে বলেই এই বইটি সম্বন্ধে তার বখেই আগ্রহ ছিল। পয়সার অভাবে কেনা এবং সময়ের অভাবে দেখা হয়নি। সজ্জিত বন্ধন কয়েকটি কবিতা গভীর মনোনিবেশে পড়ছিল, সেই সময় তার পিঠে হাত রাখল কাঁদন।

—আরে, কাঁদন……কি খবর ?

কাঁদনের দিকে তাকাতে গিয়ে সজ্জিতের চোখে পড়ল ময়দানে লোকসমাগম শুরু হয়ে গেছে।—তারপর তোর কি খবর বল। কাল বাসায় গিয়েছিলি শুনলাম। আমরা গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। গর্কির ‘মাদার’। দেখেছিস ?

—না দেখিনি। কি রকম ? ভালো ? পুডভকিনের তোলা—না ?

—হ্যাঁ। কি পড়ছিস ? ও এই বইটা। এতে তো আমারও একটা লেখা আছে। দেখেছিস ? পড়লি ?

—না রে, তাই নাকি ? বাঃ বাঃ, তুই তো নামকরা কবি হতে চল্লি রে।

সজ্জিত যতক্ষণ কবিতাটা পড়ল কাঁদন বুঁকে রইল লেখাটার ওপর। পড়া

শেষ করতেই কাঁদন জিজ্ঞেস করলে, কেমন লাগল? সত্যি করে বলবি।
—না, বেশ ভালো হয়েছে। তুই তো থাকিস শহরে, অথচ গ্রামের ইমেজগুলো
আশ্চর্য ব্যবহার করেছিস তো? বিশেষ করে এই লাইনটা আমার খুব
গভীর মনে হল।—

‘প্রেয়সী নদীর কণ্ঠ গাবে শান্তি গান
জননী ধরিত্রী দেবে শান্তি-র সুগন্ধ মাথা নবান্নের ধান
নির্ভীক স্বাধীন মুক্ত অরণ্যের বজ্রবাহু শাখা
ওড়াবে সূর্যের দিকে লক্ষ লক্ষ শান্তি-র পতাকা।’

—কিন্তু কাঁদন, তুই তো এ ধরনের লেখা লিখিসনি কখনো? তোর অন্ত লেখা-
গুলো কেমন যেন দুর্বোধ্য-দুর্বোধ্য লাগত আমার, সত্যি বলছি। এইটাকেই
তোর সবচেয়ে আন্তরিক লেখা বলে মনে হচ্ছে আমার। আগের গুলো
এলিয়টের চুরি, তাই নয় কি?

কাঁদন নৈব্যক্তিক হাসি হেসে জবাব দিলে, নারে না অত সহজ নয়। আমি যা
লিখি সেটাই লিখবো। এটা হঠাৎ লিখে ফেললাম ‘শান্তির’ জন্তে। অত
নাম-করা লেখকদের সঙ্গে আমার লেখা ছাপতে চাইল। সম্মান বা স্বীকৃতি তো
একটা! ক-দিনে লিখেছি জানিস? এক রাত্রে। যা আমি জীবনে কোনদিন
লিখিনি। গাদাগাদা কাটাকাটি না করলে আমার লেখা হয় না।

একটু মতামত দেবার সুযোগ দিতেই সৃজিত কাঁদনকে ‘এলিয়টের’ নামে বে
চিমাটি কাটল সেটার জ্বালা সহজে জুড়োল না কাঁদনের মনে। তবু অন্ত একটা
কবিতাকে প্রশংসা করার জন্তে তার বিরক্তি লাঘব হল কিছুটা। কাঁদন বেশ
নিবিড়তার ভঙ্গিতে সৃজিতের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

—দিদি আসবে?

—আমি কি করে জানবো। আমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে কাল।

—আজ সকালে তো গিয়েছিল তোর কাছে। যায়নি?

—হ্যাঁ, মিটিং-এ আসবে। কটা বাজে এখন?

কাঁদন দূরের একজনের ঘড়ি দেখে জানালে, পাঁচটা সাতচল্লিশ।

—পাঁচটা সাতচল্লিশ! তাহলে মিটিং শুরু হবে কখন? সবিতাদির ঘড়িতে কি
এগ্ননও পাঁচটা বাজেনি? এইজন্যেই রাগ হয়।

মিটিং শুরু হল ছ-টায়। লাল পতাকা আর ফেস্টনে, কালো কালো অগণিত
মাথায়, সম্মিলিত কণ্ঠের ‘জিন্দাবাদ’ ধ্বনিতে, নগ্নকায়, নৃত্যপৃষ্ঠ, রুগ্ন, কুশ

বুড়ুকু কৃষকের দূরাগত মিছিলে, মেয়েদের উজ্জল পরিচ্ছদ ও উচ্ছল চলাফেরায়, খবরের কাগজের রিপোর্টার, মধ্যবিত্ত, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কেরানীদের সমাবেশে, বিভিন্ন ফ্রন্টের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ছোটখাট জটলায়, ছাত্র ও তরুণদের ইতস্তত কাজ ও কলরবে ময়দান জুড়ে নেমে এল এক গভীর ও গাঢ় উত্তেজনা। উদ্বোধন সংগীত শুরু হল মঞ্চের ওপরে সমবেত কণ্ঠে। সজ্জিত অধীর হয়ে উঠলো সবিতার জন্তে। একা একা দাঁড়িয়ে সজ্জিত পরিচিতদের বার বার একই উত্তর দিয়ে চলল, হ্যাঁ, ওদিকে যাব, যাচ্ছি, একটু বই পত্র দেখছি। কাঁদন ইতিমধ্যে চলে গেছে। সজ্জিত লক্ষ্য করল রাজনৈতিক মহলে কাঁদন খুব পরিচিত।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, এগারো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলের গাঁট গুনলো কিছুক্ষণ সজ্জিত। একশ গুনবো। এর মধ্যে না এলে ওদিকে চলে যাব। পঞ্চাশ পর্বস্তু দ্রুত গতিতে গুনে সজ্জিত বাকিটার বেলায় গতি ধামিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের দীপ্ত ও প্রাণময় যৌবন তাকে অন্তমনস্ক করেছিল। হিসেব হারিয়ে সজ্জিত তখন পঁয়ষট্টির পর নতুন করে ষাট গোনা শুরু করেছে, সবিতার সাড়া পেয়ে চমকাল।

—অনেকক্ষণ এসেছ, না? বড় দেরি হয়ে গেল। মিন্টুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে আসতে হল। তারপর বাসটা আটকাল কিছুক্ষণ ওয়েলিংটনের মোড়ে। বড় একটা প্রেশান আসছে। অত রাগ কোরো না বাবা। চল। সবিতা ও সজ্জিত ময়দানের দক্ষিণ দিকের ফাঁকা অংশে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসল। তখন বজ্রতা শুরু হয়ে গেছে। সজ্জিত বললে, একটা বাদামগুলোকে ডাকি।

—না, ওগুলো খেয়ো না। তোমার জন্তে একটা জিনিস এনেছি।

সবিতা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কয়েকটা রঙিন চকোলেট বার করল। দুজনেই মুখে দিল দুটো।

—কাঁদনের সঙ্গে দেখা হল।

—কখন এসেছে? কোথায় গেল?

—তুমি একে চেন, শাস্তি কমিটির একজন উত্তোক্তা, ঐ যে মোটাসোটা বেশ স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, খুব উৎসাহী, ত্রিলোকেশবাবু, ত্রিলোকেশ দত্ত, উনি এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

সজ্জিত-সবিতা যেখানে বসেছিল ক্রমে সেখানেও অনেকে এসে বসতে লাগল। সজ্জিত বললে, সবিতাদি, ডানদিকে তাকাও, ঐ যে প্যাণ্ট পরা, মাথায় কোঁকড়ানো

চুল, খাড়া চেহারা, কথা কইছেন উনি কে জান? কবি উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ওর লেখা পড়েছ? ইদানীং সাংঘাতিক লিখছেন। ওর প্রোজ স্টাইল
অনবস্ত।

ওরা দুজনেই একবার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বস্তুতায় কান দিচ্ছিল আর
একবার চোখ দিয়ে দেখছিল চারপাশের লোকজনের চলাফেরা, টুকরো কথা,
বেশ-ভূষা, অঙ্গভঙ্গি। কখনো ফিরে আসছিল নিজেদের কথায়।

—তুমি আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তো? সত্যি, তিন-চারটে চিঠি ছিঁড়েছি
আমি। তোমাকে তো চিঠিতে সব লিখিনি। আমাদের বাড়ির ভেতর ভাঙন
ধরেছে নানা দিক থেকে। বাড়িতে গিয়ে আমি শাস্তি পাই না। আমার এক
এক সময় কি মনে হয় জানো সবিতাদি, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকে
পড়ি। বি, এ টা পাশ করলে আর হয়তো আমার পড়া হবে না।

সবিতা সৃজিতের ব্যক্তিগত এই সব দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শুনছিল বটে কিন্তু
হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিল না। মাঝে মাঝে ঘাসের নরম ডগা ছিঁড়ছিল
লম্বা আঙুলের নখে। সৃজিতের চোখে পড়ল সবিতার হাতে রিস্টওয়াচটা
নেই।

—তোমার রিস্টওয়াচটা কি হল সবিতাদি?

—ও সেটা খারাপ হয়ে গেছে ক-দিন, সারাতে দেওয়া হয়নি। ঘাসের শেষ এসে
গেল। এবার দোব।

সৃজিত সবিতার সাদা হাতের দিকে তাকাল। কয়েকগাছা সরু চুড়ি। অবশ্যে
সোনার চেয়ে স্নান। হাত দুটোর চেয়ে ঘাড়টা ফর্সা। ঘাড়টা এত ফর্সা
হয় কেন? খোঁপার আড়ালে থাকে বলে? ঘাড়টা ঢালু আর পিছল। সরু
হারটা ভারী সুন্দর মানায় ওখানে। কিন্তু আঙুলগুলো.....সৃজিতের অদম্য
ইচ্ছে করল সবিতার আঙুলগুলো ছুঁতে। আর এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত
হল তার মুখ, কথা খেমে গেল। মিটিঙের মাইক্রোফোন গর্জে উঠল যেন তার
কানের পাশেই।

“.....সারা দেশ জুড়ে এই যে ক্ষুধার রাজত্ব, অন্নের ক্ষুধা, বস্ত্রের ক্ষুধা, অর্থের
ক্ষুধা, শিক্ষার ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, বঙ্গগণ, আপনার প্রত্যেকে নিজের নিজের
জীবন-যাপনের কথা ভেবে দেখুন, সাত-বছরের স্বাধীনতা আপনার আমার
জীবনে কতটুকু কি করতে পেরেছে। অথচ নয়াটীনের দিকে তাকিয়ে দেখুন,
তারা.....”

সুজিত সবিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সবিতা স্থির ও মগ্ন হয়ে শুনছে। তার আঙুলগুলোও স্থির। সবিতা একবার তাকিয়ে অন্তমনস্কতা লক্ষ্য করল সুজিতের। হাসল একটু। সুজিতের মনে হল সবিতা তার ঈচ্ছার তাৎপর্য বুঝতে পেরেই হাসল। বরাভয়ের মত হাসি। তাহলে? সুজিত একঘেয়ে বসে থাকার অস্বস্তি মেটাবার জগো নড়তে গিয়ে নিজের হাঁটুটাকে চোয়াল সবিতার হাঁটুতে। কিন্তু অনুভব করল না কিছুই। হাতের আঙুলগুলো তাকে তখনো স্পর্শের আহ্বান জানাচ্ছে।

বিকেলের রোদের উগ্র উত্তাপ ক্রমশ জুড়িয়ে আসছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ওদিক থেকে গাছের সারি বেয়ে মাঝে মাঝে গা-জুড়োনো হাওয়া বয়ে গেল। ইতিমধ্যে বক্তৃতার উত্তাপও জুড়িয়ে এসেছে কিছুটা একই বক্তব্যের বারংবার পুনরুক্তিতে। সবিতার ভালো লাগছিল না বসে থাকতে। কিন্তু সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতেও বাধা পাচ্ছিল মনে। সুজিতের ঈচ্ছা করছিল ঠিক তার উল্টো। সবিতাকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরতে চায় সে। যাদের চেনে, যাদের চেনে না, তাদের সকলের কাছেই সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায়, আমাকে দেখ, দেখে, ঈর্ষান্বিত হও, এই অতুল ঐশ্বর্যে আমি ছাড়া আর কারো অধিকার নেই, আমার সুখ কি দিয়ে মাপবে তোমরা? হঠাৎ কান্দন এসে দাঁড়াল ওদের সামনে, রোদে পোড়া মুখ আর মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে। সুজিত সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

—তোমাকে মিতুদি খুঁজছে দিদি। আমি প্রায় আধঘন্টা ধরে তোমাদের খুঁজছি। তুমি কতক্ষণ এসেছ? ভাড়াটীর বক্তৃতা শুনলে? আগুন—না? কান্দনকে খুব আন্তরিক মনে হল সবিতার। কাঁচের মত স্বচ্ছ মসৃণ এখন ওর মনটা।

—দিদি, সুজিতকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। ডক্টর ধ্যানব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসেছেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে। খুব সিলেকটেড লোকদের নিয়েই একটা ঘরোয়া বৈঠক ডাকা হয়েছে ত্রিলোকেশ বসুর বাড়িতে। উনি তো আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমি যাচ্ছি, সুজিতকেও নিয়ে যাই। ধ্যানব্রতবাবুকে তো তুই কখনো দেখিসনি, সুজিত? দারুণ পার্সোনালিটি। দর্শন আর অর্থনীতি দুটোতেই জ্যায়েন্ট। ভারত সরকার ওঁকে অ্যামবাসাডর করতে চেয়েছিল। উনি রাজী হননি।

সবিতা গেল শরৎগীর্ষীর সঙ্গে দেখা করতে। সুজিত ও কান্দন বালিগঞ্জের ট্রামে

চাপল লেক মার্কেটের কাছে ত্রিলোকেশ বসুর বাড়িতে পৌঁছবার জন্যে। কাদনের কাছে পয়সা ছিল না। সুজিতই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটল দুটো।

ত্রিলোকেশ বসুর চারতলা বাড়ির দোতলায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। চারপাশের মন্থণ পরিচ্ছন্নতা ও রুচির সামঞ্জস্যে সুজিতের নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হল, দরজার সামনে পায়ের সাপেগুলটা খুলতে গিয়ে লজ্জা পেল। কার্পেট বিছানো মেঝেয় বসতে গিয়ে গা কাঁপল তার। কিছুক্ষণ সে ভালো করে তাকাতে ও আলোচনার বস্তব্য শুনে পেল না। ঘরের একাংশে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও সুরুচিসম্পন্ন বয়স্ক মহিলার দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুজিতের মনে হল সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে এখানে। আসলে নিজের স্বাস্থ্যের রুগ্নতা সম্পর্কে সুজিত ভীষণ আত্মসচেতন ও দুর্বল। ক্রমশ ঘরের সবটা চেহারা চোখে পড়ল সুজিতের। কার্পেট ছাড়াও দেয়ালের দিকে দামী সোফা ও বেতের মোড়া আছে কয়েকটা। দেয়ালে টাঙানো আছে যথাক্রমে লেনিন, স্টালিন, মার্কস, ভ্যান গগ ও যামিনী রায়ের ছবি ও রবীন্দ্রনাথের ফটো। দরজার জানলার পর্দাগুলো শাস্তি নিকেতনের। বাংলার লোকশিল্পের প্রচুর সংগ্রহ আছে একটি আলমারিতে। কোণে একটা ছোট টেবিলে বাঁশের গাঁট কেটে তৈরি, নকশা আঁকা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। উত্তরে একাঙ দুটো আলমারি সোনার জলে নাম লেখা রেজিনে বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। ক্যালেন্ডার মাত্র একটি। বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞাপন আঁকা।

কয়েকজন পরিচিত কবি সাহিত্যিককে দেখতে পেল সুজিত। সুজিত এতক্ষণে সাহস পেল ডক্টর ধ্যানব্রত যুধোপাধ্যায়ের ঘুথের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখার। পালিশ করা ঝকঝকে প্রশস্ত ললাট। আয়ত অনুসন্ধানী চোখ। বয়সের প্রোচড়কে স্পষ্ট করে তুলেছে মাথার টাক ও সাদা গৌঁফ। ঠোঁটের একদিকের ভাঁজে আজীবনের শিক্ষা-সাধনা চিন্তাশীলতার গাভীর্ষ ষতটা স্পষ্ট, চরিত্রের সহজাত রসবোধ, বৈদগ্ধ্য, অনায়াস কোতুকপ্রিয়তা ইত্যাদি ততটাই প্রতিভাত হয় অন্তরিক্তে। ছোট ছোট শব্দে গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে কথা বলেন। কিছুটা অন্তমনস্কতার মধ্যে সুজিত ছাড়া ছাড়া ভাবে কথোপকথন শুনে চলল। কাদনের মধ্যে কিন্তু আড়ষ্টতার কিছুমাত্র নেই। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে ঘরের অনেকে দরজার দিকে তাকাল। মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। হাতে চামড়ার ব্যাগ। সাদা ঢিলে হাতা পাঞ্জাবী। দেখে মনে হয় অধ্যাপক।

হাসি এবং মনের উৎফুল্লতা দিয়ে সকলেই অভিযর্থনা জানাল।

ধ্যানব্রতবাবুও সুন্দর হেসে সম্ভাষণ জানালেন, আরে এস এস ক্ষিতীশ, তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

ক্ষিতীশ ভৌমিক ধ্যানব্রতবাবুর পাশে নিয়ে বসলেন। সুজিত ক্ষিতীশ-বাবুকে চেনে। অধ্যাপক নন ইনি। সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার। ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞান আছে। রাজনৈতিক মহলে একে সবাই শ্রদ্ধা করে। নির্ভীক ও হৃদয়বান পুরুষ।

আলোচনা সাহিত্যে বস্তুবাদ রোমানটিসিজমের পার্থক্য, অর্থনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ইত্যাদি বিষয় থেকে অবশেষে শাস্তিতে পৌঁছল। ধ্যানব্রতবাবুর মুখমণ্ডল আগের চেয়ে উদ্ভাসিত হল।

—পিকাসোর পায়রাকে তো তোমরা পিস-ডাভ করেছ? পিকাসোকে বোধ হয় বাংলাদেশ কিছুটা বোঝে। সোভিয়েট বুঝতে পারে না। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েট প্রাচীনপন্থী। তবু আমাদের যামিনী রায় বোধ হয় ওদের শাস্তি দেবে।

ধ্যানব্রতবাবু দেয়ালে টাঙানো যামিনী রায়ের ছবির দিকে তাকালেন।

—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরের চেয়ে যামিনী রায়ের চিত্রশালায় অনেক বেশি শাস্তি।

প্রায় স্বগতোক্তির মত শোনাল তাঁর কথাগুলো। ক্ষিতীশবাবু যখন গভীর কিছু শোনেন বা বলেন তাঁর মুখে একটা বেদনাদায়ক ভঙ্গি ফোটে। এটা সুজিত আজও লক্ষ্য করল আগেও করেছে।

শ্রোতাদের একজন প্রশ্ন করলে, আচ্ছা আপনি তো কলকাতায় এলেন প্রায় তিন বছর বাদে। কলকাতার নতুন কোন ক্যারাকটার চোখে পড়ল আপনার?

কিছুক্ষণ গভীর থেকে ধ্যানব্রতবাবু বলতে শুরু করলেন।

—হ্যাঁ, তা পড়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে আশাবিত্ত করেছে বাংলার তরুণ মেয়েরা।

পুরুষ শ্রোতাদের মুখে এবং মহিলা শ্রোতাদের শরীরে চাঞ্চল্য জাগল।

—এদের দৃঢ়ভাবে হাঁটাকে মনে হল নতুন পদক্ষেপ। এদের মায়েরা কখনো এ ভাবে হাঁটতে পারত না। এদের কথা বলায় নতুন আত্মপ্রত্যয় এসেছে। অতিরিক্তকে বাতিল করতে শিখেছে এই সব তরুণীরা। আচল বাদ দিয়ে

কাপড় পরছে এরা। এদের মায়েরা যখন দোকানে দরদস্তর করছে, এরা তখন আলোচনা করে এম-এর সাবজেক্ট সিলেকশন নিয়ে। আমার মনে হল রাজনীতির উৎসাহ কিছুটা কমিয়ে এরা এখন জ্ঞানের দিকে মন দিয়েছে। পুরো উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন যা করতে পারেনি একটা যুদ্ধের পরেকার অর্থনীতি তা করল। সমাজের কাঠামোটাকে না পাল্টালে সমাজের উন্নতি নেই। কাঠামোটাকে পাল্টানোর জন্তে চাই নতুন সমাজ-চেতনা। সেই চেতনাকে বহন করার জন্তে চাই একটা নতুন শ্রেণী। সে শ্রেণী কি ভারত-বর্ষে, বাংলাদেশে জন্মেছে? মধ্যবিত্তই মরে বেঁচে আছে এখনও। এখন তো তোমাদের মজুর নেতা মধ্যবিত্ত। তবে মনে হয়, বাংলার তরুণ মেয়েরা কিছু করতে পারবে অচিরে। তাদের পক্ষে শ্রেণীচ্যুত হওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা। তারা জাত প্রলেটারিয়েট। অন্তত ভারতবর্ষের সমাজে এটা সত্য।

সুজিত আকৃষ্ট হয়ে শুনল। ধ্যানব্রতবাবুর এই পর্ববেষ্টিত ক্ষমতা তার মনে প্রবল শ্রদ্ধা জাগাল। শুনতে শুনতেই সুজিতের মনে পড়ল সবিতার কথা। সবিতাদির এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। এগুলো শুনে সবিতাদির আত্ম-সংকোচ কিছুটা দূর হত। সবিতাদি অন্তরে এত দৃঢ়, অনমনীয় অথচ বাইরের জগতের মেলামেশার ভীষণ রকম দ্বিধা-কাতর। এগুলো ভাঙতে হবে।

বড় ট্রেতে সাজানো চায়ের কাপ এল ঘরে।

মিক্টুর ভাবনায় সবিতা দ্রুত পারে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে একজন অচেনা ভদ্রলোককে ঘরে বসে থাকতে দেখল। মিক্টু ঘুমিয়েছে দেখে ভদ্রলোকের দিকে একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তারপর আকস্মিক বিহ্বলতার জের সামলাতে না পেরে দৌড়ে জড়িয়ে ধরল।

—মণিকাকা তুমি কখন এলে? ইস্, তোমাকে দেখতে পাব কখনো ভাবিনি। কতদিন ভেবেছি তুমি আসবে। কখন এলে এখানে। একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। ময়দানে। বেড়াতে মানে, মিটিঙে। কবে এসেছ কলকাতায়? কাকিমা সুস্থ? এঁ্যা, পরশু এসেছ? আর আমার এখানে এলে আজ? তাতো আসবেই, তোমরা কি আর মনে রেখেছ আমাকে? আমাকে সবাই ভুলে গেছে। তোমাদের ভুলে যাবার মত ক্ষমতাও আমার আছে। কাকিমাকে নিয়ে এলে না

কেন? আমার ছেলেটাকে দেখলে? চা খেয়েছ? দাঁড়াও চা বসাই। আর কি থাকে?

দোকান থেকে সিঙাড়া এল। বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে বসল দুজনে। সবিতার কণ্ঠস্বর শুনতে আর অনর্গল কথা বলার আবেগে থরথর করে কাঁপছিল। মণিকাকার আঙুলগুলো দু-হাতে অস্থির ভাবে নাড়তে নাড়তে সবিতা বলল, জান মণিকাকা, শুনতে আমি এখন মরে যেতে পারি।

—কেন রে? তুই দেখছি এখনও ঠিক সেই আগের মতই আছিস। একটুও বদলাসনি।

—না, বদলাইনি। মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখ। অর্ধেক নেই। মুখ দেখে আমাকে চিনতে কষ্ট হয় না তোমার। সে আমি আর নেই মণিকাকা। মরে যাচ্ছিলাম, মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি।

—কি হয়েছিল রে? অসুখ বিসুখ?

—সে তুমি বুঝবে না। বুঝলেও বিশ্বাস করবে না। বলবো, তোমাকে সব বলবো।

—কাঁদন কোথায়? ঘরে ঐ মেয়েটি কে? ওর বোধ হয় পড়ার অসুবিধা হল আমার আসাতে। এখানে বসে পড়ছিলেন।

—কাঁদন। কাঁদনের কিছু হল না মণিকাকা। পড়াশোনা করলো না আর। রাজনীতি করছে, কবিতা লেখে, এই সব। মেয়েটি আমার ছাত্রী। চিত্রা, ওর বাবা মা থাকে লক্ষ্মী-এ। এখানে এক দূর সম্পর্কের মাসীমার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছিল। তারা হঠাৎ তাড়িয়ে দিলেন। আমি এখানে এনে রেখেছি। পড়াশোনায় ভালো।

—বিরাম ফেরে কখন? সেইখানেই কাজ করছে নাকি?

—তার ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা। হ্যাঁ, সেই সাপ্তাহিকেই। তবে বাইরের আরও নানা রকম কাজ করতে হয়। এখন ওর খাটনিটা অনেক বেড়েছে।

—বেশ তো আছিস। দুজনেই উপায় করছিস। একটা ছেলে। বাচ্চা-কাচ্চা নইলে সংসার মানায় না। আমার কটা হল জানিস তুই। চারটে।

—তুমি স্বপ্নের দেশে আছ মণিকাকা। আমি কোথায় নেমে এসেছি জান? পাতালে, নরকে। আমি এখন এক পয়সার হিসেবে গণ্যগোল হলে গলা ফাটাই জান?

মণিকাকা অট্টহাস্তের মত হেসে উঠল। সবিতার পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড়

মেয়ে বলল, তোর চেহারাটা আগের চেয়ে বেশ খানিকটা পাল্টেছে বটে, ডালিয়া কিন্তু তোর চরিত্রটা নেচারটা এখনো সেইরকম রয়ে গেছে। স্ট্রাগল করাটাও লাইফ। আমার জীবনটাকে তো তুই দেখেছিস। কত ঝড়-ঝাপ্টা সামলে আজ দাঁড়াতে পেরেছি। কষ্টে পড়লেই আমার হাসি পায়। আমার এই হা হা করা হাসিটাকে তোর কাকিয়া আবার সহ্যেতে পারে না। দিনে রোজ দু-ঘণ্টা হাসবি দেখবি মনে কোন রোগ নেই।

মণিকাকা আবার বারান্দা কাঁপিয়ে হাসল। নীচের মুদিখানা দোকানের বয়স্ক ছেলেটা ওদের দিকে তাকিয়েছিল।

চলে যাওয়ার আগে মণিকাকা সবিতাকে বুকের দিকে টেনে নিয়ে পোষা পাশুর মত আদর করলে। পাঁচটাকার একটা নোট জোর করে গুঁজে দিলে সবিতার হাতে মিন্টকে কিছু কিনে দেবার জন্তে।

মণিকাকা চলে যাবার পরও সবিতার বুকে অনেকক্ষণ তোলপাড় করল হাসিটা। মণিকাকা এমন একটা অস্তিত্ব যে চলে গেলে কাঁকা লাগে। পৃথিবীতে মণিকাকার মত খাটি মানুষ ক'জন জন্মেছে কে জানে?

সবিতা বারান্দায় বসে রইল চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে চিত্রা এসে মণিকাকার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে সবিতা তার সঙ্গে গল্প করল। মণিকাকাই বিয়ে দিয়েছিল ওদের। সবিতার বাবা রাজি ছিল না রেজিস্ট্রী করা বিয়েয়।

নীচের তলার হরিসাধনবাবুর ছোট মেয়েটা এল বারান্দায়।

—সবিতাদি, বাবা আপনার কাছে একটা টাকা ধার চাইলেন, দেবেন?

—এক টাকা? খুচরো টাকা তো নেই। সব দশটাকা পাঁচটাকার নোট। মাইনে পাওয়ার পর ভাঙানো হয়নি। ভাঙিয়ে দোব।

মেয়েটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল আবার।

—আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে লোক। চা চিনি এসব আনতে হবে। বাবা বললেন, পাঁচ টাকার দিন, ভাঙিয়ে ফেরত দেবেন।

সবিতা চিত্রাকে বলল, স্ট্রটকেশ থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার করে দিতে। একটু পরে বারান্দায় এল পাশের বাড়ির গর্ভবতী মেয়েটি।

—জান দিদি ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। পেটের ছেলেটার কাল থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। কেন এমন হল বলতো? উনি যে কেন আসছেন না। আমার মনে হয় সামনের সপ্তাহে মাইনে পেয়ে আসবেন আমাকে নিয়ে যেতে।

সবিতা মেয়েটির শিশুসুলভ শাস্ত্র সহাস্ত নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনা

বোধ করল। ও জানে না যে ওর স্বামী ওকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছে। ওকে গোপন রাখা হয়েছে কথাটা গর্ভের সন্তানটির প্রতি দৃষ্টি রেখে। অভাগী। প্রত্যেক দিন মিথ্যে স্বপ্ন রচনা করছে স্বামীকে নিয়ে।

কিন্তু, আমি, আমি আজ সুখী, তৃপ্ত তাই নয় কি? সৃজিতকে পেলাম। মণিকাকা এল কতদিন পরে, মণিকাকা হাসতে বলল। ইঁ্যা, আজ অন্তত আমি প্রাণভরে হাসতে পারি। বিরাম বাড়ি ফিরতেই সবিতা তার কাছ বেঁধে দাঁড়িয়ে বললে, এই জানো, মণিকাকা এসেছিল আজ।

—তাই নাকি? কখন?

—এই তো একঘণ্টা হবে চলে গেল। কলকাতায় আছে চার-পাঁচ দিন। একদিন যেতে বলেছে আমাদের দুজনকে, যাবে?

—দেখবো।

বিরাম খেয়ে উঠে টেবিলে বসতে যাচ্ছিল কাগজপত্র নিয়ে। সবিতা তার হাত চেপে ধরে বারান্দার দিকে টানলে। বারান্দায় সতরঞ্চি পাতা ছিল। বিরামকে প্রায় জোর করে বসালে সেখানে। বিরাম বলল,—কী হচ্ছে এসব ছেলেমানুষি।

—না তুমি বোসো এখানে। বল, তুমি খুশি হয়েছে কি না?

—কিসে?

—মণিমাকার ধবর শুনে?

বিরাম সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসল। সবিতা বিরামের হাতের আঙুলে নিজের আঙুল গলিয়ে কাঁস গড়ল।

—তোমার মনে আছে মণিমাকার যোগলসরাইয়ের কোয়ার্টারে বিয়ের আগেকার জীবনের দিনরাত্রিগুলোকে।

—কেন থাকবে না।

—কখনো মিলিয়ে দেখেছ সে সব দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনগুলোর তফাৎ কতটা?

—আমাদের বয়সটা কি ঠিক সেইখানে আটকে আছে?

—বিরাম, তুমি সত্যি করে বল তো তিনটে বছরে কতটা বয়স বাড়তে পারে মানুষের। সমস্যাটা বয়সের নয়, মনের। তুমি কি নিজেকেও ভালবাস না?

—কী হচ্ছে, এসব। বাড়িতে আরো লোকজন আছে।

—যারা আছে, তারা আমার স্বপ্নের-শাওড়ী নয়। ভাইবোন। এবং সাবালক।

—শোনো, আমার দরকারী কাজ আছে। কাজটা সেবে নিয়ে কথা বলবো।

—না, এখন আমি আছি, তোমার কিছু কাজ নেই। তোমাকে বসতে হবে এখানে। মণিকাকা হাসতে বলেছে। আজকের রাতটা আমি হাসবো।

সবিতা বিরামের কোলের ওপর মাথা লুটিয়ে দিল। বিরামের অন্তমনস্ক আড়ষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

—শোনো, এদিকে তাকাও। মণিকাকা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—তোমার মণিকাকা কি সেই রকম আছেন? না, বিয়ে-থা করে ছেলেপুলে হবার পর পাল্টেছেন। চাচারেলি সেই হাসি-খুশি মানুষটি আর নেই নিশ্চয়।

সবিতার গলার স্তরে রুদ্ধতা এসে গেল।

—কি করে বুঝলে তুমি? মানুষকে এত চমৎকার করে বোঝো কি করে বল তো? পৃথিবীতে তুমিই সুখী, জানো সত্যি, তুমিই সবচেয়ে সুখী।

বিরামের হাত থেকে আঙুলের কাঁসটা খুলে নিল সবিতা।

সবিতা আজ তার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রত্যাশা করছিল বিরামের সঙ্গ-সুখ।

বিরামের চোখের সামনে অতীত স্মৃতির আয়নাটাকে এমন ভাবে তুলে ধরবে যাতে বিরাম বুঝতে পারে আজ সে কত জীর্ণ, পঙ্কু, স্থবির, প্রাণহীন। কিন্তু আয়নার কাঁচের মত অসংখ্য টুকরোয় ভেঙে গেল সব সম্ভাবনা। সবিতা অবরুদ্ধ ক্ষোভে ও আক্ষেপে মুখটাকে বিরামের দিক থেকে ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটেছে। চোখের জলের মত। কেবলই মনে হচ্ছে এঙ্কুনি কিংবা একটু ধাক্কাই টস্টস্ করে ঝরে পড়বে মাটিতে।

তার আগেই সবিতা আকস্মিকভাবে উঠে গেল শোবার ঘরে।

সমাপ্ত

[এই উপন্যাসের স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সময়ের চরিত্রকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। পাঠক যাত্রেরই চোখে পড়বে সমগ্র রচনার মধ্যে এক আপাত অসংলগ্নতা, প্রধান চরিত্রগুলি ঘটনা সৃষ্টি না করে বাইরের ঘটনাস্রোতে ভাসছে, ব্যক্তির জীবন সময় ও সমাজের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বিরোধ, এগুলি ইচ্ছাকৃত, ঐ বিশেষ সময়ের চরিত্রানুযায়ী। আরও একটি কথা, কয়েকটি বছরের দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাসকে ভিত্তি করে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা, এখানে তার আংশিক সমাপ্তি ঘটলো মাত্র। বলা বাহুল্য, এটুকু নিছক মুখবন্ধ, সমালোচনার মুখ বন্ধের উদ্দেশ্য নয়। —লেখক]

আপস ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ছেঁড়া চট ছেঁড়া মাদুর নয়তো কাঠের বাকল কি তালপাতার তৈরি তিনহাত পাঁচহাত খুপরির অন্ধকারে ওরা কতক্ষণ আটক থাকতে পারে? দাঁড়ানো দূরে থাক পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসতে গেলেও শুকনো পাতার চালে মাথা ঠেকে, পাতা মচমচ করে ওঠে, গোটা ছাউনিটা কাঁপতে থাকে। একটু জোরে ধাক্কা লাগলে ভেঙে পড়তে কতক্ষণ! ভালো করে হাত-পা টান করে শোবার উপায় নেই। পচা চটের বেড়া ফুটো হয়ে পা বেরিয়ে পড়ে হাত বেরিয়ে পড়ে। হয়তো পায়ের গোড়ালি কি হাতের তেলো গিয়ে ঠেকে রোদে পোড়া পেভমেন্টের গরম সিমেন্টে। তখন পায়ে ছেঁকা লাগে হাতের আঙুলে ছেঁকা লাগে। আরাম করতে গিয়ে আরাম করা হয় না। তাড়াতাড়ি হাত-পা গুটিয়ে আবার খুপরির ভিতর টেনে আনতে হয়। এমন একটা না, রাস্তার দু-ধারে ছেঁড়া চট আর পাতার তৈরি দেড়শ ছাউনি চৈত্রেয় আগুনঝরা রোদ, কার্তিকের হিম, শ্রাবণের পচা আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। বছর যুগে গেছে। ছাউনি গুটিয়ে এরা এখান থেকে সরে যাবে দূরে থাক আর একদল এসে ওধারের রাস্তায় ঘর বেঁধেছে। আরো দু-শ। এরা ঢাকার ওরা বরিশালের। ওরা ঘর বেঁধেছে মানে সেই চট আর শুকনো পাতা আর কাঠের বাকল আর আধখানা উইরে খাওয়া আধখানা পুড়ে যাওয়া বাঁশের খুঁটি একত্র করে ডেরা তুলেছে। তা হলেও তো আশ্রয়। কিন্তু সারাক্ষণ যেখানে কাঠের ছাল বাকল, কাগজ, ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা শালপাতা আর পচা তুলো আর কাকড়া জ্বলে তিন ইন্টের উত্তানে এই পরিবারের চালের খুদ, ঐ পরিবারের হলদে শুকনো কপির ডাঁটার সঙ্গে কিছু পোকায় খাওয়া বেগুন ও পাটখড়ির মত সরু ঝনঝনে পাকা সজনে ডাঁটার মিশেল তরকারী, কি আর এক পরিবারের জলের মত পাতলা টলটলে বিউলি বা খেসারি ডাল সিদ্ধ হচ্ছে সেখানে সারাক্ষণ কী পরিমাণ ধোঁয়া সৃষ্টি হতে পারে তা কল্পনা করা একটুও কষ্টকর না। কাঠ গোলা থেকে কুড়িয়ে আনা গাছের ভেজা ছাল বাকল অথবা রাস্তার জঞ্জাল থেকে তুলে আনা পচা তুলো কাকড়া শালপাতা যতটা আগুন দেয় ধোঁয়া ছড়ায় তার আটগুণ বেশি এ তো জানা কথা। আর সেই ধোঁয়া এই ডেরার

ছেঁড়া চট্টের বেড়া ডিঙিয়ে ঐ ডেরায় গিয়ে ঢোকে। ওদিকের ধোঁয়া এদিকে আসে। সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কারোর না কারোর তিন ইটের উত্তনের ঝিকিঝিকি আঙনে এটা ওটা সিদ্ধ হচ্ছে। উপায় কি। এটা তো আপিসের বাবুদের কি এক সময় দোকানপাট গুটিয়ে ফারা ঘরে ফিরে ধীরেস্থে ‘খাওয়াদাওয়া’ সারে তাদের সংসার ঘরবাড়ি নষ্ট। এখানে কাঠ থাকলে চাল থাকে না, তেল থাকলেও হলুদ লঙ্কার জোগাড় হতে সময় নেয়—গাদা গাদা সজনে আর কপির ডাঁটা এসে গেল তো কেবল তাই এখন সিদ্ধ করে উত্তন নিবিয়ে রাখো - যখন চালের জোগাড় হবে আবার উত্তন ধরাবে। এই পরিবার যখন খেয়ে ঘুমোবার উজ্জোগ করছে তখন সেই পরিবারের সবে কাঠ এসে ডেরায় পৌঁচেছে। কাজেই—

চব্বিশ ঘণ্টা এদিকের ধোঁয়া আর ওদিকে দু-মিনিট অন্তর রাশি রাশি কাঁচা কয়লার ধোঁয়া ছড়িয়ে হুইসেলের তীব্র আর্তনাদ তুলে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে একটা প্র্যাটফর্ম ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে। কাজেই এ তল্লাটে আকাশ বাতাস সারাক্ষণ কালো বিষম। মনে হয় এখনি একটা ঝড় উঠে প্রলয়কাণ্ড ঘটবে কি জোরে বৃষ্টি নামবে। এমন বিজ্রী এমন বিদ্যুটে আবহাওয়া। এমন যে ফাল্গুনের কুরফুরে সকাল তা শেয়ালদা স্টেশনের ধোঁয়াটে অপরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে কারো মনে হবার কথা না। কেমন একটা গা-বমি করা গুমোট ভাব চার দিকে ছড়িয়ে আছে। বাইরেই এমন, তো তিন হাত পাঁচ হাত খুপরিগুলোর ভিতরের অবস্থা যে আরো ভয়ংকর হবে তা কে না বোঝে। কাজেই কাক না ডাকতে পূবের আকাশে ভালো করে আলোর ইশারা না জাগতে ওরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে দল বেঁধে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, বয়সের দিক থেকে ওরা প্রায় সমান। তাই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটা বেশি। বারো থেকে চোদ্দ, বড়জোর পনেরো বছর। তার ওপর কারও বয়স না। বয়সের দিক থেকে তো বটেই সময় ও অবস্থার দিক থেকেও আজ ওরা পাঁচটি ছেলে সমান হয়ে গেছে। তেমনি শরীর, বুঝিবা মুখের আকৃতির দিক থেকেও। ফরিদপুরের অনন্ত চক্রবর্তীর মোটাসোটা নাহুসহুস ফর্সা ধবধবে চেহারার কাছুর সঙ্গে বরিশালের বিনোদ কর্মকারের কালো রোগা ঢাঙ্গা চেহারার নিমাইয়ের আজ আর তেমন একটা অমিল নেই। ঢাকার মদন তুলির ছেলে পলাশ বিক্রমপুরের বিধু আচার্যের ছেলে সুরেন্দ্র সর্ব—সবাই এখন এক রকম দেখতে। ছেঁড়া ময়লা হাফ প্যান্ট পরনে, গায়ে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই,

চোখগুলো গর্তে ঢুকেছে, চলগুলো বড় হয়ে কানের ওপর এসে নেমেছে। চল পোশাক গায়ের রং যেমন এক হয়ে গেছে তেমনি ওদের চাউনি হাবভাব কথা হাঁটা। পর্বস্তু হাসিটা। ভীকু বিষণ্ণ চোখ মেলে পঞ্চানন যখন সেই কাক ভোরে স্টেশনের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে আলো-জ্বালা ট্রামের পাশে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তখন কেউ যদি দয়াপরবশ হয়ে এক আঁধাটা পয়সা কারো দিকে ছুঁড়ে দেয় তখন সবাই ছাতাপড়া হল্‌দেটে দাঁত বার করে একরকম করে হাসে। পেভমেন্টের শানের ওপর ঠুন্ করে পয়সাটা ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তারা হাসি বন্ধ করে যুদ্ধে নেমে যায়। ধবস্তাধবস্তি ঠেলাঠেলি মারামারি কে পয়সা আগে কুড়িয়ে নেবে। একটা মুদ্রা, মাত্র একটা ডবল পয়সা। কাজেই একজন শেষ পর্বস্তু পয়সাটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে উঠে দাঁড়ায়। তখন বাকি চারজন আর ধবস্তাধবস্তি কাড়াকাড়ি বা মারামারি করে না। স্থির হয়ে যায়। এমন কি নিমাই পয়সাটা কুড়িয়ে পেল বলে তারা যে তাকে ঈর্ষা করবে বা তার দিকে তাকিয়ে রাগ করে ভেংচি কাটবে তা-ও না। বরং ভীকু বিষণ্ণ চোখ মেলে দূরের বাসটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাস এসে দাঁড়াবামাত্র ওরা জানলার কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার সেই একটা মুদ্রা—একটা ফুটো পয়সা। হল্‌দেটে বিবর্ণ দাঁতে পাঁচজন একসঙ্গে হাসে। শানের ওপর ফুটো পয়সার করুণ মূহু আওয়াজ। ধবস্তাধবস্তি ঠেলাঠেলি। তারপর শান্ত সব, স্থির। এবার কাছ কুড়িয়ে পেয়েছে। ওঠে একটা ডবল কি ফুটো পয়সা। তার বেশি এখন এখানে আশা করা পাগলামি। ‘চ—চ—’ বিরক্ত হয়ে একজন আর একজনের হাত ধরে টানে।

ইঁয়া, বরিশালের কথার একরকম টান, খুলনার আর এক রকম। ফরিদপুরের কথার অন্য সুর অন্য টান। আজ কিন্তু পাঁচজনের কথার সুর একরকম হয়ে গেছে, এক হয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না যদিও। কেবল এটুকু ওরা বুঝেছে এর নাম কলকাতা। এখানে মানুষ ‘খাইতিছি’-কে খাচ্ছি বলে ‘যেতেছি’-কে খাচ্ছি বলে। তাই ওরাও এখানকার রাস্তা দোকান বাজার ফেরিওয়াল ট্রামের লোক বাসের লোক ট্যাক্সির লোকের কাছাকাছি থাকার সুবিধা ভেবে এবং পরিষ্কার করে হট্‌হাট্‌ ‘খাচ্ছি’ ‘যাচ্ছি’ গুলো বলতে না পেরে ‘খাইচ্ছি’ ‘যাইচ্ছি’ ‘বইসছি’ ‘রাস্তা মেড়ানো’ এবং ‘চল্’—কে ‘চ’ বলতে আরম্ভ করেছে। নিজেদের মধ্যে যখন কথা হয় তখনও। তা না হলে তাড়াতাড়ি এই শহরে চলবার বসবার দাঁড়বার বুঝি বা টিকে থাকবার ছাড়পত্রও পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কা কি? হয়তো তাই।

না হলে কান্নুর বাবা অনন্ত বধন চাটাইয়ের ছাউনির ভিতর গালে হাত দিয়ে বসে দেশের ক্ষেতখামার পুকুর ভিটে গোরুবাছুর হাঁস ছাগলের কথা চিন্তা করছে তখন কান্নু কেন এই শহরের ট্রামবাস রাস্তা বাজার দোকান আর চারদিকে ছড়ানো লাখ লাখ মানুষের চলাফেরা কথা এমন খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য করছে। তেমনি নিমাই। বিনোদ কর্মকার পেভমেন্টের ছাউনির তলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে তার দেশের ছেড়ে আসা দোকানটার কথা ভাবছে। আজ হাটবার। পাঁচটা গায়ের লোক এসেছে বিনোদের দোকানে। সব গোল হয়ে বিনোদের হাপরের কাছে বসে গল্প করছে। বিনোদের দুজন কর্মচারী। বাবলার কাঠ চেঁছে তাতে লাঙলের ফলা জুড়ে দেওয়া নয়তো গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড়ি পরানো। তা ছাড়া বঁটি খুস্তি গড়াপেটার টুকটাক কাজ আছে। ছিল। আজ সেসব কোথায়। বিনোদ ভুলতে পারছে না, কিন্তু তার ছেলে চোদ্দ বছরের নিমাই আঠারো মাসে সব ভুলে এখন কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে ওধারের বড় রেস্টুরেন্ট দেখছে। এই মাস্তুর বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোটা লোকটা দোকানে ঢুকে কেমন মজা করে ডিম কুটি চা খাচ্ছে। যদি এই শহরেই এসে গেল তো নিমাই কবে ওখানে ঢুকে এমন মজা করে খেতে পারবে এই চিন্তা তার মাথায় ঢুকে তাকে বড় বেশি অস্থির করে তুলছে কটা দিন। বিধু আচার্য অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছে। দাদা আর বিধবা মায়ের সঙ্গে স্কুমার দেশ ছেড়ে চলে এল। স্কুমারের দাদা জগদীশ দেশ বাড়ির কথা যে না ভাবে তা না। আবার এখানকার কথাও ভাবে। পঁচিশ বছরের যুবক মাথায় হাত দিয়ে বসে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে না। এখানে কোথায় ‘অকল্যাণ্ড’ কোথায় ‘রাইটাস-বিল্ডিংস’ এবং সেসব জায়গায় তদ্বির-টদ্বির করিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কিনা কুমিল্যার নগেন ফরিদপুরের অমূল্য বরিশালের ভুবন সরকারের শালা নিত্যানন্দর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করছে। হয়তো পনেরো দিন সমানে ওরা হাঁটাইটি করল। ওখান থেকে বাবুরা এসে নামধাম নিয়ে গেল ‘বর্ডার সিলিপ’ পরীক্ষা করল। তারপর আবার সব চূপচাপ। তারপর দীর্ঘসময় বেকার থেকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখন এই স্টেশনের চৌহদ্দির ভিতর জগদীশ বিড়ির দোকান খুলে বসেছে। এই দোকানের খন্দের চট চাটাই মাদুর আর পাতার ছাউনির লোকেরা। দেখাদেখি নিত্যানন্দ ওধারে পানের দোকান খুলেছে। অমূল্য কি করে সন্ধান পেয়ে আজ চার-পাঁচ দিন ধরে সেই কাকভোরে মেটিয়াবুরুজ চলে যায়। সেখানে মাটি খোঁড়ার

কাজ পেয়েছে। অমূল্য নিত্যানন্দ জগদীশ নগেন এরা প্রায় সমবয়সী। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বয়স। কচি বৌ, একটা দুটো তিনটে করে বাচ্চা, বুড়ো বাপ মা কি বয়স্কা বোন এদের ঘাড়ে ঝুলছে। কাজেই এরা কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। নগেন অগত্যা কিছু করতে না পেরে চীনাবাদাম ফেরি করে বিক্রি করতে লেগে গেছে। তা ছাড়া এখানে পাঁচশো পরিবারের মধ্যে না হলেও তিনশো পরিবারে বয়স্কা মেয়ে, যুবতী স্ত্রী আছে। হয়তো আরো বেশি। স্টেশনের বারোয়ারী পায়খানা প্রস্রাবখানা জলের কলে এদের না গিয়ে উপায় নেই। স্টেশনের কলে ভিড় লেগে গেলে কলসী ডেকুচি নিয়ে ওদের রাস্তার কলে জল ধরতে যেতে হয়। আর তার সুযোগ নিতে দিনরাত এখানে গুণ্ডা বদমায়েশরা মাছির মত ঘোরাঘুরি করে। অমূল্য টের পেয়েছে, নগেন টের পায়, জগদীশ টের পাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের তো বটেই ভিন্ন পরিবারের মেয়েছেলের ওপর যতটা পেরেছে চোখ রেখে চলেছে। এসব নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে অনেকদিন কথা হয়েছে। কেউ বিপদে পড়লে কোন গুণ্ডা বদমায়েশ কারো বৌ-ঝির গায়ে হাত তুলেছে দেখলে বা খবর পেলে ওরা সব দল বেঁধে ছুটে যাবে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বদমায়েশের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। জোয়ান বয়স। ওরা যদি একাজে এগিয়ে না যায় তবে কে যাবে।

কাল এই ধরনের একটা গণ্ডাগোল পাকিয়ে উঠেছিল। বীরভূমের কোন কলোনি থেকে পরিবারটা শেয়ালদা ফিরে এসেছে। সেখানে এবার বর্ষার সময় ঘরে জল উঠেছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সেঘরে বাস করা মানুষের 'অসাধ্য'। সুতরাং আবার যে-কে-সে। আবার শেয়ালদার প্র্যাটিকর্ম। চট চাটাই মাদুর ঝাকড়ার ডেরা। বিশ্বস্তর কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বলে : 'আমাগো কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়—না অইলে চৌদ্দ মাস এখানে হুকাইয়া থাইকা শেষে যখন টিন বাধারি ঘরে যাইয়া উঠলাম ভাবলাম হুঃখু সারা অইল। ঘর পাইছি চাষের জমি পাইছি, আর কি চাই। হা, ভগমান আষাঢ় মাইস্তা বাদলা শুরু অইতে না অইতে ঘরে কোমর হমান পানি। এই দেশে জল নাই, এই দেশে হুকনা টান। তয় এই বছর জল ক্যান—না আমাগো কপালের দোষে। কেমন?' লোকটা সরল। চুল পেকেছে দাঁত পড়তে আরম্ভ করেছে। স্টেশনে ফিরে এসে অনেক নতুন মুখ এবার দেখতে পোয়ে বিশ্বস্তর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চায়। কিবা বরিশাল কিবা ত্রিপুরা।

‘কয়েন আমরা পূব বাংলার পোড়া কপাইল্যার দল। হুঁ, ঐ হানে আমাগো পরিচয়—’ বলতে বলতে বিশ্বস্তরের মরা মাছের চোখের মত ফ্যাকাশে ডাবডাবের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। আর এমন ভালো মানুষের মেয়ে সন্ধ্যা কিনা এমন একটা কাজ করল। ওর জন্মই তো গণ্ডগোল পাকাত। এমন চাঁদের আলোর মত গায়ের রং কিন্তু ওর ভিতরটা যে এত কালো কুৎসিত তা বাইরে থেকে বুঝবে কে! শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেল যে ‘ভদ্রলোকের’ দোষ নেই, সন্ধ্যার দোষ, তখন জগদীশের দল লোকটাকে ছেড়ে দিল। কি ব্যাপার? না ‘ভদ্রলোক’ আপিস ফেরত নিয়ে যখন বালিগঞ্জের ট্রেন ধরতে যাচ্ছে তখন সন্ধ্যা তার পিছু নিয়েছে। কলে জল ধরতে যাচ্ছিল। জল ধরবে কি, সেই বারোয়ারী কলতলার ঘড়া ফেলে রেখে সন্ধ্যা ‘বাবুর’ পিছু নিয়েছে। ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল নগেনের বোন কুস্তলার। কুস্তলা জল নিয়ে নিজেদের ডেরার ফিরে গিয়ে নগেনের কানে কথাটা তোলে। নগেন ছুটে এসে জগদীশকে বলে। জগদীশ আর এক সেকেণ্ড দেরি না করে নগেনের হাত ধরে প্র্যাটফর্মের ভিতর ঢুকে পড়ে। ট্রেন সিটি মেরেছে। ‘আর ধরা গেল না আর ধরতে পারলাম না সেই রংপুরের বাসনাকে যেমন সেদিন একটা লোক ফুসলিয়ে স্টেশন থেকে বার করে নিয়ে গেল তেমনি সন্ধ্যাকেও আজ নিয়ে গেল। হা-রে কপাল! আমরা এতগুলি জোয়ান ছেলে থাকতে—’ বলাবলি করছিল দুজন। ভাবছিল। কিন্তু ট্রেনটা প্র্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওপাশের কাঁকা জায়গায়—নিচে ঘাসের জমিতে দুজন কে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখতে পেয়ে জগদীশ আর নগেন বিদ্যুৎবেগে সেখানে ছুটে যায়। গিয়েই নগেন লোকটার গলা চেপে ধরে। জগদীশ হাত চেপে ধরে। সন্ধ্যার মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। ‘কি ব্যাপার!’ জগদীশ লোকটার চোখের কাছে চোখ নিয়ে হংকার ছাড়তে লোকটা, আশ্চর্য, ভয় না পেয়ে বরং অল্প একটু হাসল। ‘আগে আমার কথা শুনুন, তারপর বিচার করুন।’ ‘কি আবার কথা শুনুন।’ নগেন চোঁচিয়ে উঠছিল, জগদীশ চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। তখন ভদ্রলোক যা বলল : আপিসে যেতে আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে রোজ দু-বেলা তাকে শেয়ালদা আসতে হয়। উপায় নেই। দিন চার-পাঁচ আগে টিকিট ঘরের কাছে সে যখন টিকিট কাটছিল তখন মেয়েটা তার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়। রিকুইজিট মেয়েটার মলিন বেশভূষা চেহারা দেখে তার কষ্ট হয়। পকেট থেকে

একটা ছ-আনি বের করে মেয়েটার হাতে তুলে দেয়। ছ-আনি পেয়ে মেয়েটা
 এত খুশি হয় দেখে ভদ্রলোক অবাক হয়। ছ-আনিটা চোখের সামনে তুলে
 ধরে মেয়েটা বার বার নাড়াচাড়া করছিল। ঐ থেকে ভদ্রলোক এই অনুমান
 করে যে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে কারো কাছ থেকে মেয়েটা এর আগে একসঙ্গে
 ছ-আনা পায়নি। পরদিন বিকেলে টিকিট ঘরের কাছে পৌঁছে ভদ্রলোক
 মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সেদিন তার সঙ্গে 'রেলু' কম ছিল।
 মেয়েটাকে এড়াবার জন্য সে একটু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু খুঁজে খুঁজে
 মেয়েটা তাকে ঠিক বার করে। চোখাচোখি হতে মেয়েটা আঁচল দিয়ে নিজের
 চোখের কোনা মুছে বলল, আজ আবার হাত পাততে লজ্জা করছে, কিন্তু উপায়
 নেই ;—তার মা জরে আশায় ভুগছে। কিন্তু পয়সার অভাবে ওষুধ কিনতে
 পারছে না—শুনে অগত্যা ভদ্রলোক তার টিকিটের পয়সা রেখে শেষ সম্বল
 ছ-আনিটা মেয়েটার হাতে তুলে দেয়। পরদিন আবার দেখা। সেদিন বিরক্ত
 হয়ে ভদ্রলোক বলেছিল স্টেশনে তো আরো কত শত প্যাসেঞ্জার আসছে যাচ্ছে
 তাদের কাছে গিয়ে ও সাহায্য চাইলে পারে—একলা রোজ সে কত পয়সা
 দেবে। শুনে মেয়েটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে—কেউ দেয় না, দিলেও
 ফুটো পয়সা ডবল পয়সার বেশি কারো হাত দিয়ে গলতে চায় না। শুনে
 ভদ্রলোক বিব্রত বোধ করল। ভাবল একসঙ্গে পর পর দু-দিন দুটো ছ-আনি
 দেওয়াতে মেয়েটা তাকে খুবই দয়াবান বলে ধরে নিয়েছে। আজ তার
 ছ-আনার পয়সার দরকার। বুড়ো বাপের চোখদুটো কাল রাত থেকে ফুলে
 লাল হয়ে আছে, জল পড়ছে, পিচুটি গলছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। একজন
 কি একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়েছে। বউবাজারের মোড়ে বড় মনোহারী
 দোকানে পাওয়া যায়। এক শিশির দাম ছ-আনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েটা
 এ-ও বলল, খাওয়া পরা যেমন তেমন করে চলছে বা চলছে না এ নিয়ে তার
 ভাবনা নেই—ঈশ্বর যখন যা জোটাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছে।
 কিন্তু বুড়ো বাপ মার অসুখ-বিসুখ হলে তার মন খারাপ হয়ে যায়—তখন সে
 লোকের কাছে একটু ওষুধ পথ্য কিনতে হাত না পেতে পারে না। কি আর
 করে—ছ-আনা সঙ্গে নেই, কলমপেয়া করানী। মাস গেলে তবে মাইনে।
 অতিরিক্ত পয়সা পকেটে নিয়ে রোজ চলাফেরা করার অবস্থা না। তা হলেও
 মেয়েটার কান্না দেখে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে তার হাতে তুলে
 দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আর সে সাহায্য করতে পারবে না—অস্তুত এ-মাসে

না সামনের মাসে মাইনে পেলে আর ছ-চার আনা দিয়ে যদি সাহায্য করতে পারে দেখা যাবে।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক চুপ করল। জগদীশ নগেনের মুখ দেখে, নগেন জগদীশের মুখ দেখে। তারপর দুজন একসঙ্গে সন্ধ্যার দিকে তাকায়। দুজন তার দিকে এভাবে কটমট করে তাকাতে সন্ধ্যা ভয় পেয়ে বেত ডগার মত কাঁপছিল।

তারপর জগদীশ ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেছিল ভদ্রলোকের কি নাম, কোন আপিসে চাকরি ইত্যাদি। কিন্তু নগেন তখনও কটমট করে সন্ধ্যাকে দেখছে। তারপর ধপ করে ওর হাত ধরে একটা বাঁকুনি দিয়েছে। ‘মিছা কথা কইতে শিখলি, মিছা কথা কইয়া বাবুর কাছ ধন রোজ পরমা চাওয়ার অভ্যাস তোর কেমনে অইল।’ শুনে মুখটা আরো নিচু করেছে সন্ধ্যা। নগেন চিৎকার করে বলছিল, ‘বিশ্বস্তরদার সাথে আজ কমসে কম চাইরবার আমার দেখা—কই চক্ষু তো লাল দেখলাম না, কোলা দেখলাম না—একবার তো কইল না আমার চক্ষুর অশ্রু।’

শুধু মিছে কথা বলে ছ-আনা চাওয়া নয়, যেন আরো কিছু চাইছিল সন্দেহ করে জগদীশ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করল ‘তয় এইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে ও কি কইছিল। ট্রেন ছাড়ল, ট্রেন চইলে গেল, আপনি তো উঠলেন না।’

সেটাই তো কথা। প্রথম দিন একটা ছ-আনি দিয়ে তার বিপদ হয়েছে। মানুষ নরম হলে তার ওপর শুধু দাবি নয় জ্বরদস্তি করতেও সাহস পায় লোকে, পৃথিবীতে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। চার আনা দিয়ে কিছুতেই ওষুধ কেনা চলবে না। আর ছ-আনা না পেলে সে স্টেশনের ডেরায় কিরে যাবে না। বাপের সামান্য চোখের অশ্রুধের ওষুধ কিনতে না পারার দুঃখে ট্রেনের তলায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জীবন শেষ করতে হবে। ‘এতক্ষণ ধরে তাকে আমি বোঝাচ্ছিলাম। আর ছ-আনা সে অন্য কারো কাছ থেকে জোগাড় করুক—হয়তো রিফুইজি বলে বউবাজারের দোকানদারও চার আনায় ওষুধের শিশিটা তাকে ছেড়ে দিতে পারে, একবার গিয়ে না হয় চেষ্টা করে দেখুক—কিন্তু কার কে, আর ছ-আনা না পেলে সে কিছুতেই আমার পিছ ছাড়বে না।’

‘সন্ধ্যা! সন্ধ্যা! এ সকল কথা কী শুইনছি।’ এবার জগদীশ হংকার ছাড়ল। আর নগেন ভদ্রলোককে বলল, ‘আচ্ছা আপনি চইলে যান মশাই,—আর একদিন একটা কানাকড়ি ওর হাতে তুইলা দিবেন না। আমরা ইন্সটেশনে থাকি,

এক লম্বর গেইটের ধারে আমাগো ডেরা, দরকার অইলে ধবর দিবেন।’

মাথা নেড়ে যেন স্তির নিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ প্র্যাটফর্মের দিকে ফিরে গেল।

আর জগদীশের শক্ত হাতের বাঁকুনি ধ্যে সন্ধ্যা কাঁদছিল। নগেন বলছিল, ‘তোগ মত মাইয়া বাস্বেহারাগো নাম ডুবাঁতাছে। জুগুম কইরা মান্দের কাছে পইসা আদার করতে কবে থাইকা শিখলি হারামজাদি। চল ইন্টিনে, মিছা কথা কইয়া তুই পইসা চাছ বাবুগো কাছে তোর বাপকে গিয়া কই— দেহিছ তোর পিঠে চেলা ভাঙে কিনা।’

সন্ধ্যা কাঁদতে কাঁদতে নগেনের পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল। মিছা কথাই বটে। বাপ-মার অসুখ না। কিন্তু পয়সা জোগাড় করছিল, ভিক্ষে করে পয়সা জমাচ্ছিল ও একটা শায়া কিনবে বলে। একটা পাতলা ছেঁড়া কাপড় পরে সে রাস্তায় বেরোতে পারে না। যদি সে তার মায়ের মত বুড়িয়ে যেত তবে সে শায়া কিনতে চাইত না। দরকার হত না। পনেরো-ষোল বছর বয়সের মেয়ের কি এভাবে রাস্তায় বেরোনো চলে। কারা শুনে এবং সব কথা সরলভাবে স্বীকার করছে দেখে জগদীশ ও নগেন চূপ করে ছিল। নগেনের পা ছেড়ে মেয়েটা জগদীশের পা জড়িয়ে ধরতে এসেছে জগদীশ পা সরিয়ে নিয়েছে। ‘ঠিক আছে ঠিক আছে বিশ্বস্তরদার কানে আজ কথাটি তুলুম না। কিন্তু ধবরদার এভাবে বাবুদের কাছে আর কখনই পইসা চাইবা না। আমরা সাবধান কইরে দিলাম। সমথ বয়সের মাইয়া তুমি। অনেক কালেক্কারি ঘটতি পারে বুঝলা?’

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে প্র্যাটফর্মের দিকে চলে গেছে। জগদীশ নগেনের মুখ দেখছিল, নগেন জগদীশের মুখ দেখছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টেশনের সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।

‘দোর দেওয়া যায় না। পরনের শাড়িখানা কেমনতর স্নাতার মতন হইয়া গেছে দেখছ নগেন।’

নগেন চূপ থেকে পরে বলল, ‘হঁ, অভাবে স্বভাব নষ্ট শাস্ত্রের বাক্য।’ তারপর কি ভেবে নগেন আবার বলল, ‘স্নাতার সব মাইয়া সমান না সকলের মন এক না। আমাগো কুস্তলার যদি গামছা পইরা থাকতি হয় তবু অমন বেসরম অইয়া ইন্টিনের বাবুগো কাছে হাত পাততি আইব না।’

জগদীশ বলল, ‘তার মাইঝে আর একখানা কথা আছে নগেন। এই যে সন্ধ্যার

ছুই আনা পাইয়া লোভ অইল, তারপর আবার হাত পাতল, আবার পাতল, এইডা খুব ধারাপ। লোভ করলে বিপদ ঘটে। রংপুরের বাসনার কি অইল। একটা টাঙ্গা দিল বাবু পইলা দিন পরদিন আবার হাত পাতল হেই বাবুর কাছে। পাইল ছুই টাঙ্গা। তারপর তো ছনলাম শাড়ি বেলাউজ আদায় করছিল বাসনা। তারপর তো একদিন বাসনারে ট্যাঙ্কি গাড়িতে তুইলা লইয়া পলাইয়া গেল।’

‘গেছে মরুক। সব মাইয়া সমান না আবার সকল বাবু একরকম না। এই বাবুটা ভালো। অই শালা আছিল নুইচ্যা—তাই তো টাঙ্গা-পইসার লোভ দেখাইয়া বাসনারে গাড়িতে তুইলা হাওয়া হইয়া গেল।’

বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে জগদীশ এসব কথা ভাবছে আর জগদীশের ষাট বছরের বুড়ি মা পোকায় ঝাওয়া তিনটে শুকনো বেগুন হাতে করে বসে চিন্তা করছে এখন উন্ন খরিয়ে বেগুন তিনটে পুড়িয়ে নিয়ে ভাত চাপিয়ে দেবে কিনা এবং এবেলা কেবল বেগুন পোড়া আর ভাত খেয়ে ছেলে দুটো সন্তুষ্ট হবে কিনা। চিন্তা করতে করতে বুড়ির মন শেয়ালদা স্টেশনের নোংরা গুমোট পরিবেশ আর তিন হাত পাঁচ হাত চটের ছাউনি ছেড়ে সাঁ সাঁ করে কখন উড়ে গেছে বনভুলসী আর বাবলার বনের পাশ কাটিয়ে চলা আঁকা বাঁকা এক মাটির রাস্তায়। পিছনে একটা রাংচিতা গাছে সেই সাতসকালে বেনেবউ পাখি ‘সতীন ঝি সতীন ঝি, সতীন ঝি’ করে ডেকে হযরান হচ্ছে। কিন্তু সেই ডাকের দিকে মন নেই বুড়ির। বুড়ি দেখছিল ফাল্গুন মাস না পড়তে কর্মকারদের সজনে গাছটায় ঝাঁটার কাঠির মত সরু চিকন অগুনতি ডাঁটা নেমে পাতা ঢেকে ফেলেছে। আর দু-দিন আর তিনটে দিন গেলে ডাঁটাগুলো রসে মাসে একটু মোটা হবে, তখন মর্টার ডাল কি এমনি শীস দিয়ে চচ্চড়ি রেঁধে ঝাওয়া চলবে। কর্মকারদের সজনে গাছ দেখতে দেখতে বুড়ি বামুনদের নতুন দীঘির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। দীঘি কেটে এখানটায় মাটি ফেলা হয়েছে আর নতুন মাটির রস পেয়ে বামুনদের কলাবাগান মোটা মোটা ডগা, সবুজ পাতা, অগুনতি মোচা, মোচার কুড়ি আর নখর পুষ্ট সব কলার ছড়ি নিয়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখে বুড়ির চোখের পলক পড়ে না। পাতার গন্ধে মোচার গন্ধে কাঁচা কলার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে।

এখন এখানে শেয়ালদা স্টেশনের প্রাটফর্মের বাইরে শুকনো শক্ত ঠনঠনে

সিমেন্টের ওপর উবু হয়ে বসে কানুন সকালের বায়ুনের সেই কলাবাগানের কচি কাঁচা গন্ধভরা বাতাসের কথা মনে পড়ে বুড়ির চোখে জল এসে গেল। জলে চোখে পিচুটি গলে বুড়ির নাকের ডগায় এসে ঝুলতে থাকে। ঘাড় কিরিয়ে জগদীশ বুড়িকে কাঁদতে দেখে বিরক্ত গলায় ধমক দেয়। ‘আবার! তা কেবল চক্ষুর জল ঝরালে কি গবনিমেন্ট তোমারে এখান খাটকা তুইলা নিয়া ঘর দিবে জমি দিবে টাহা দিবে লাঙল গোরু কিনবার লাইগা! তুমি একলা না। পাঁচশ ঘর এখানে ইট কামড়াইয়া পইড়া আছে। রাতদিন কাঁদলে চলবে কেনে। কষ্ট করছ আরো কর। ঠাকুরের যদি বাচাইবার মন থাকে বাচয়—মন না থাকলে এই ইন্সটানে শেষ অইয়া যায়।’

বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে জগদীশ যখন বুড়ি মাকে সান্থনা দেয় আর আজ আবার হঠাৎ ‘অকল্যাণ্ড’ ‘রাইটাস’ বিল্ডিং’এর কথা ভেবে চুপ করে থাকে তখন তার ভাই সুকুমার বন্ধুদের নিয়ে ট্রাম রাস্তা পার হয়ে বৈঠকখানার বাজারে ঢুকে পড়েছে।

অন্য দিন আরো সকালে তারা বাজারে চলে আসে। দোকানপাট না খুলতে ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল বাজারের ভিতরের গলিঘুঁজির আবর্জনা তুলে ময়লা ফেলার গাড়ির কাছে এনে জড়ো না করতে। কপির ডাঁটা, কপির পাতা, পচা পান, আধ পচা খঁয়াতলানো টমেটো, আলুকাবলি কি মেটুলি চচ্চড়ির শুকনো ঝালমশলার দাগ লাগা শূন্য শালপাতার ঠোঙা, পোড়া বিড়ি, ছেঁড়া কাগজ, রসুন পেরাজের খোসা, ডিমের খোসা ইত্যাদি ছাড়াও ওরা এখানে ওখানে একটা বড় নলতে আলু বা বেগুন বা শশা কুড়িয়ে পায়। নিমাই সেদিন এক পাতা সেফট-পিন কুড়িয়ে পেল। কান্ন একদিন মাংসের দোকানের নর্দমার কাছে একটা লাল ছ-আনি পেয়েছে। আনাজ তরকারীর বাজার মাংসের দোকানের সামনেটা মাছের বাজার কাপড়ের পট্টির অন্ধকার গলিগুলি ওরা রোজ ভোর না হতে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে, যদি কিছু পেরে যায়। কিন্তু আজ একটু দেরিই হয়ে গেছে। বাস ট্রামের সামনে দাঁড়িয়ে অতটা সময় নষ্ট করা তাদের উচিত হয়নি বুঝতে পেরে তারা এখন অসুখাপ করছিল। বাজারের সব কটা গলিঘুঁজি ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে। এক টুকরো কাগজ আর এখন কোথাও পড়ে নেই। সুতরাং আজ আর কিছুই জন্ম খোঁজাখুঁজি করা বুখা। অগত্যা হাত ধরাধরি করে ওরা মাংসের দোকানের উন্টোদিকে ময়রার দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

গরম মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। কালু নিমাইয়ের পিঠে ছোট্ট একটা চিমটি কাটল। নিমাই সুকুমারের হাতে আন্তে চাপ দিল। হ্যাঁ, কাল বিকেলে ওরা ঠিক করে রেখেছে আজ সকালে এসে ওরা ময়রার দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে কাল ওদের সঙ্গী পলাশের ওপর সে কেন এমন অবিচার করল। দুপুরবেলা পলাশ একলা বাজারে ঢুকে ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছানাবড়া ভাজা দেখছিল। ‘তুই কি বাস্তহারা, শেয়ালদা স্টেশনে থাকিস?’ ময়রা প্রশ্ন করতে পলাশ ঘাড় নেড়েছে। ‘একটা কাজ করে দিবি আমার?’ ময়রা বলছিল, ‘আমার হাত এখন জোড়া। কর্মচারীটার অসুখ। কলে জল এসে গেছে। এই বালতিটা নিয়ে কল থেকে আমার জন্য দু-বালতি জল ধরে নিয়ে আয়—দুটো ছানাবড়া খেতে দেব তোকে।’ বোধ করি ছানাবড়ার লোভে পলাশ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। দোকানের বালতি তুলে নিয়ে সে রাস্তার কলে চলে যায়। এক বালতি দু-বালতি তিন বালতি চার বালতি জল পলাশ টেনে টেনে দোকানে নিয়ে গেছে। একটা বড় ড্রামে সেই জল ঢালতে হয়েছে। আর বালতি কি একটুখানি। এত বড় বালতি! চার বালতি জল টেনে নেওয়ার পর পলাশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ময়রা বলছিল, আর দু-বালতি জল ধরে নিয়ে আয়—ড্রামের আধখানাও ভরল না যে। অগত্যা পলাশ আরও দু-বালতি জল টেনে নিয়ে গেছে। তারপর—

তারপর ছোটলোক ময়রাটা একটা ডবল পয়সা পলাশের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে, ‘বা চীনাবাদাম কিনে খা গে।’ কিন্তু পলাশ তাতে আপত্তি করেছে এবং চটে গিয়ে বেশ একটু কড়া সুরে বলেছিল, ‘আমায় ছানাবড়া দিবেন না—এখন ডবল পয়সা দিয়া বিদায় করবার চাইছেন কেন? আট বালতি জলের লাইগা আমার চারখানা ছানাবড়া পাওনা হইছে।’ যেই বলা অমনি পলাশের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছে ময়রা। ‘ছানাবড়া দেবে—একটা ছানাবড়ার দাম চারটে পয়সা—আট বালতি জল এনে দিয়েছেন কর্তা তার জন্যে চার গুণা পয়সা দাও—লাট সাহেব আমার।’ ভেংচি কেটে ময়রা বলছিল, ‘শেয়ালদা পড়ে থাকিস—রাস্তার খুদক্কা কুড়িয়ে খেয়ে দিন চলছে,—এই জিতে আর ছানাবড়া ওঠে না—যাঃ যাঃ।’ কাদতে কাদতে পলাশ স্টেশনে ফিরে গেছে। সব শুনে পলাশের সঙ্গীরা তো বটেই বড়রা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পলাশের বাবা চিৎকার করে বলছিল, ‘তুই শালাকে জল তুইলে দিতে গেইলি ক্যান—তুই, তুই কি ভিক্ষুক। তুই কি রাস্তার লোক। তুই শালাকে বলবার

পারলি না ক্যানে আমাগো ঘরবাড়ি গোয়াল পুকুর আছিল—আইজ দেশবিভাগের জন্তু আমাগো এই দুরবেস্থা। আমরাও দ্যাশের মানুষ। আমাগো এই দুর্দিনে—’ মদল তুলি কথা শেষ না করতে নগেনের দল বলছিল, ‘ছাইলা-পাইলাদের আপনারা সাবধানে রাখেন—ছাইলাপাইলারা ভিক্ষুকগো মত এইখানে সেইখানে হাত পাতছে বউলা যত শালা দোকানদার মহাজনের দল এমন অত্যাচার করবার সাহস পাউতেছে। কি দরকার আছিল ছানাবড়া খাইবার। কপালে থাকলে আবার আমরা ছানা খামু দুধ ঘি খামু—কপালে না থাকলে এই ইন্সটিশনের ডেরায় পইচা পইচা মরমু।’ বুড়ো বিশ্বস্তর বলছিল, ‘খাক, খাক—এখন এউটা নিয়া আর গুগোল পাকাইয়া লাভ নাই। আমাগো সময় ধারাপ। এখন গুগোল পাকাইতে গেলে বৈঠকখানার বাড়ার খাইকা সাহুটাছ আর কিছু পামু না। ওহানে ভালো লোকও আছে।’ বিশ্বস্তরের কথায় অনন্ত সায় দিয়ে বলেছে : ‘না এখন গুগোল পাকাইতে গেলে আমাগো যাও ডোল-ফোল পাইবার সম্ভাবনা আছে বন্ধ হইয়া যাউতে পারে। এখন তো পাবলিকের কথা গভর্নমেন্টে কিছু কিছু শুনবার আরম্ভ করছে। ময়রার সাথে গোলমাল করতে গেলে বাজারের ওরা বাস্তহারাদের বিপক্ষে যাউতে পারে।’ কাজেই পলাশের ব্যাপারটা সেখানে চাপা পড়ে যায় কাল। কিন্তু পলাশ আর তার সঙ্গীরা ময়রার দুর্ব্যবহারের কথা ভোলেনি। আজ সাহস করে পাঁচজন দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

‘কি চাস তোরা, কি চাইছিস!’ পলাশকে দেখে চিনতে পেয়ে যেন ময়রা হাসল, হেসে পলাশের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ‘তোরাও কি রিফুজি?’

কানু ও নিমাই মাথা নাড়ল। বস্তুতঃ কানু নিমাই আর সুকুমার আশা করছিল পলাশকে তাদের সঙ্গে দেখতে পেয়ে ময়রা সকলের ওপর চটে গিয়ে হয়তো যা-তা একটা বলবে নয়তো ভেংচি কাটবে—কিন্তু সেসব কিছু না করে দোকানী হেসে ফেলতে সব কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল, গরম হয়ে লোকটাকে দু-কথা শোনাতে পারল না। ‘কথা কইছিস না কেন, জিলিপি চাই—একটা দু-পয়সা, সঙ্গে পয়সা আছে?’ ময়রা আবার প্রশ্ন করে।

প্যান্টের পকেটে একটা ডবল পয়সা থাকা সত্ত্বেও কানু মাথা নাড়ল। সুকুমার টোঁক গিলে ময়রাকে বলল, ‘আমরা বাস্তহারা, আমরা পয়সা পামু কুথায়।’

শুনে ময়রা চুপ করে থাকে। চুপ করে জিলিপি ভাজে। মোটা মানুষ। উল্লুনের

তাপে সকাল থেকে ঘামতে আরম্ভ করেছে। সারা দিনে চৰ্বি-জমা চামড়া বেয়ে কত ঘাম ঝরবে স্কুমার আর তার সঙ্গীরা যেন তাই ভাবছিল। একটা মাছি নাকের ডগায় বসতে ওটাকে তাড়াতে গিয়ে ময়রা মুখ তুলল।

‘তা এক কাজ কর না তোরা—আমার কর্মচারীটার অস্থখ করেছে। দোকানের ড্রামে এক ফোঁটা জল নেই। তোরা পাঁচজন, রাস্তার কল থেকে আমার পাঁচ বালতি জল এনে দে না।’

কারু নিমাইয়ের মুখ দেখে নিমাই স্কুমারের মুখ দেখে। পলাশ কারো দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে থাকে। ‘পারবি, বালতি বার করে দিই, দুটো বালতি আছে। ভাগা ভাগি করে পাঁচজন পাঁচ বালতি জল ধরে নিয়ে আয়।’

‘হু, জল এনে দেব।’ স্কুমার বলল ‘তা বালতি পিছে কত কইরে পাব আমরা?’ যেন উত্তর তৈরি ছিল ময়রার মুখে। ‘একটা করে গরম জিলিপি। পাঁচ বালতি জল পাঁচটা জিলিপি—যানে দশ পয়সা রোজগার হয়ে গেল তোদের, মন্দ কি।’ মন্দ না। প্রস্তাব শুনে এরা আবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর চারজন এক সঙ্গে পলাশকে দেখে।

‘পলাশ রাজী আছিস? বালতি পিছে একটা গরম জিলিপি? নিমাই প্রশ্ন করে। হলদে দাঁত বার করে পলাশ হাসে। ‘তব্ব তোরা যদি সকলে রাজী হছ আমিও রাজী—আমিও এক বালতি আনয়। কেন আনয় না।’

পলাশের কথা শুনে সঙ্গীরা খুশি হয়।

‘দিন, বালতি বার কইরে দিন।’ ওরা ময়রার দিকে তাকায়।

ময়রা এক সঙ্গে দুটো শূন্য বালতি এনে দোকানের দরজায় রাখে। বালতি তুলে নিয়ে ওরা রাস্তার কলে ছুটে যায়।

পাঁচ বালতি জল ড্রামে তোলা হয়ে যেতে ওরা বালতি নামিয়ে রেখে হাত পাতে। ‘দিন আমাগো জিলিপি দিয়া দিন।’

কথা না করে ময়রা একটা ঠোঙায় পাঁচটা গরম জিলিপি তুলে ওদের হাতে দেয়। কথা না করে পাঁচজন দোকানের রক ছেড়ে রাস্তায় নামে। পাঁচটা জিলিপি পাঁচজন এক সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খায়। শূন্য ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর রাস্তার কল থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নিয়ে ওরা হাত ধরাধরি করে হুটু মনে বৈঠকখানা বাজার ছেড়ে বউবাজার স্ট্রীটে এসে দাঁড়ায়। একটা ট্রাম আসছে দেখে সবাই কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাঁচজন তৎক্ষণাৎ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

আধুনিক চলচ্চিত্রের সমস্যা ॥ বিমল ভৌমিক

শিল্পই সমাজ-মানসের দর্পণ। একটা দেশের সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিকলিত হয় তার শিল্প-সাধনায়। বিশেষ কালে বিশেষ দেশের সাংস্কৃতিক চেহারাটা কেমন, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকের বাঙলা দেশে, এই উনিশশো-আটাল সালের বাঙলা দেশে, সমাজ-মানসের বিচিত্র সংবাদগুলো তথ্যদ্রবী সাংবাদিকের চেয়েও বিশ্বস্তভাবে পরিবেশন করতে পারে একালের শিল্পপ্রয়াস। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে আধুনিক মনের নিরন্তর আত্মপ্রকাশ ঘটছে। চলচ্চিত্রও যেহেতু শিল্প, সেই হেতু অনিবার্হ ভাবেই প্রত্যাশা জাগে, আধুনিক মনের যে জটিল জীবন-জিজ্ঞাসা এর বহুতর শিল্প-সাধায় বিস্তৃত, চলচ্চিত্রেও তার ছায়াপাত ঘটবে। যদি না ঘটে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, রুগ্নতার লক্ষণ।

লোকপ্রিয় শিল্প-মাধ্যম হিসাবে ছায়াচিত্রের প্রতিষ্ঠা অতি সাম্প্রতিক। কিছুদিন আগেও অবস্থা ছিল অগুরুকম। জনপ্রিয়তা হয়তো ছিল কিন্তু শিল্প-মাধ্যম হিসাবে আভিজাত্য বা মূল্য কোনটাই ছিল না। আজো যে সম্পূর্ণ আছে সে কথা বলা চলে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রমোদ পরিকল্পনা ছাড়া যে আরো কোন শিল্পকর্তব্য থাকতে পারে, এ ভাবনা ইদানীং কালের। অবশ্য এমন লোক আজও বিরল নয় যারা সিনেমাকে শিল্পমর্যাদা দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কেননা আজো দুর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে, যে অন্তর্নিহিত প্রকাশের প্রেরণা কবিতাকে কবিতা করে তোলে, গল্পকে গল্প, উপন্যাসকে উপন্যাস, সেই সৃষ্টি প্রেরণার ছিঁটে কোঁটাও এতকাল দেখা যায়নি সিনেমা ক্ষেত্রে। এতকাল সিনেমাকে আমরা ইণ্ডাস্ট্রি বলেই জেনে এসেছি, শিল্প বলে নয়। কারণ বিস্তর, অক্ষুলিমেয় ব্যতিক্রম বাদে বাঙলা দেশের সিনেমা আজো চিত্রনাটক মাত্র, মঞ্চ থেকে পর্দায় স্থানান্তরিত হল বটে, কিন্তু ভাষান্তরিত হল না কিছুই। এমন অবস্থায় বুদ্ধিমান দর্শক মাত্রের মনেই সংশয় জাগে, আসলে চলচ্চিত্র কি যথার্থই শিল্প-মাধ্যম, যে অর্থে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে শিল্প হিসাবে স্বীকৃত, সেই অর্থে?

একথা ভুলে গেলে চলবে না, এদেশে কেন সারা পৃথিবীতেই সিনেমা শিল্প অগ্ন্যান্ত শিল্পের তুলনায় স্বল্পবয়স্ক। এর ঐতিহ্য কতটুকুই বা। তবু শিল্প হিসাবে সিনেমাকে আর অপাণ্ডেক্ত্য করে রাখা চলে না। কেননা বিদেশী ছবির

সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, একথা তাঁদের স্বীকার করতেই হবে, যে আধুনিক কালে প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে সিনেমার কাছে একান্ত বড় প্রত্যাশাও আর অবাস্তব নয়। শুধু মাত্র বাঙলা দেশের দিকে চেয়ে এ প্রশ্নের একপেশে সিদ্ধান্ত টানলে ভুল হবে। আগেই বলেছি ব্যতিক্রম আছে। এবং ভাগ্যের কথা এদেশেও আজ এ ব্যতিক্রমের জন্মহার বাড়ছে। চোখ-ধাঁধানো নায়ক-নায়িকার সংঘাতময় সংলাপকেই চলচ্চিত্র আখ্যা দিতে আজ অনেকেই কুণ্ঠিত। নেহাৎ বালধিল্য রুচির সাকরেদি করেন ধারা, কেবল তাঁরাই ছবিতে খোঁজেন শুধু গল্প, শুধু নাটক, শুধু অভিনয়, শুধু তারকা-সমাবেশ। কিন্তু এ নাবালকত্ব ঘুচতে শুরু করেছে, আজ আমরা বলতে শুরু করেছি, এ হল বাহু। চোখের অশিক্ষা একদিনে ঘোচে না, সময় চাই, অল্পশীলন চাই। চিত্রভাষা পাঠে নিরক্ষর বাঙলা দেশে সাক্ষর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এবং পুরোপুরি শিল্প-সম্মান না মিললেও একথা প্রতিদিনই প্রমাণিত হচ্ছে, আধুনিক কালের সবচেয়ে শক্তিমান শিল্প-মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাকে আজ আর কোন উঁচকপালে সমালোচনা দিয়েই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এই কারণেই আজ পক্ষপাতহীন মন নিয়ে বিচার করা দরকার, বাঙলা দেশে সিনেমা কি হয়েছে, কি হচ্ছে এবং কি হতে যাচ্ছে। আধুনিক মানসের যে বিচিত্র জটিল চেহারা আমরা কবিতায় পাচ্ছি, গল্পে পাচ্ছি, উপন্যাসে পাচ্ছি, চলচ্চিত্রে তা পাচ্ছি কি না এবং শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্র তার শিল্পবর্তব্য পালন করতে পারছে কি না।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘পথের পাঁচালী’ ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে একদা বলেছিলাম, ‘পথের পাঁচালী’ই বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রের পথ বদলের পাঁচালী। সেদিন কথাটায় যতটা শুভ ইচ্ছা ছিল, ততটা জোর ছিল না। কেননা ছবির জগতে সেদিনও যথার্থ শিল্পীরা ছিলেন অনাছত। ব্যবসায় বুদ্ধির পাকচক্র চারদিক থেকে এমন আটো সাঁটো থাকতো যে, অপরিচিতের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল কোন সংকর্মের প্রয়াস। ‘পথের পাঁচালী’র মত নিরীহ শিল্প প্রয়াসকে সেদিন দুয়ো দেবার মত লোকের অভাব ঘটেনি। সত্য সত্যই ‘পথের পাঁচালী’ যে পথ বদলের পাঁচালী হয়ে উঠবে, এ সন্দেহনা ছিল অকল্পনীয়। চলচ্চিত্রের অচলায়তনের নিষিদ্ধ জানলা যে সত্যি খুলে যাবে, একথা কেউ ভাবেনি। ‘পথের পাঁচালী’ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অনেকেই করেছেন, এখানে সে সব আলোচনার পুনরাবৃত্তি অবাস্তব। আমার শুধু একটুখানি সংযোজনা আছে, সেইটুকু বলি।

‘পথের পাঁচালী’তে চিত্রভাষার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটল। এ ছবি দেখার পর সবচেয়ে সন্দেহবাদ সমালোচককেও মানতে হল, ছবির ভাষা একটা আলাদা জিনিস, এবং ‘পথের পাঁচালী’তে যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সে-ভাষা আমাদের সিনেমা জগতে নতুন। কিন্তু শুধু এই কারণেই ‘পথের পাঁচালী’ অমরীয় নয়। ‘পথের পাঁচালী’র সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধ করি এইটিই যে আধুনিক সমাজমানস এতে প্রতিফলিত হয়েছে। বহিরাবরণের গীতিময়তা সত্ত্বেও ‘পথের পাঁচালী’তে যুদ্ধপরবর্তী জীবন-বিজ্ঞাসের দ্রুত ক্ষীণমান চেহারাটাই ধরা পড়েছে। সঙ্কীর্ণতম মুহূর্তগুলো ছুঁড়ে মুচড়ে একটা ধ্বংস-স্তূপের মত নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে,—সুন্দর ও কদম্বের, ত্যাগ ও স্বার্থের, মনুষ্য ও দানবের জটিল সংমিশ্রণে মনুষ্যচরিত্রের কেন্দ্রচ্যুতির অভিজ্ঞতা একেবারেই আধুনিক। এবং আমার বিশ্বাস, শিল্পী সমসাময়িক জীবন-ভিজ্ঞাসার আর্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পেরেছিলেন বলেই ‘পথের পাঁচালী’ পথের পাঁচালী হয়ে উঠল।

গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশে অনেক ছবিই তো উঠেছে। তবু ‘পথের পাঁচালী’র গ্রাম তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিভূতিভূষণের চোখে গ্রাম ও গ্রামপ্রকৃতির যে স্বপ্নময়তা, ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে তা অল্পপস্থিত। স্বপ্ন আছে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গটাই এখানে বড়। জীবনের রূঢ়তাগুলি রূঢ়ভাবেই প্রকাশিত। চিত্রনাট্যকার এ ছবিতে যে দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম এনেছেন, তা নিরবিকার। জীবন সম্পর্কে কোন মন্তব্য নয়, কোন সিদ্ধান্তও নয়, ‘পথের পাঁচালী’ এক জীবনযাত্রারই প্রতিক্রম। সামস্ত সমাজের স্থায়ী বিশ্বাসগুলোর ভিত ক্ষয়ে গেছে, বাস্তবতার প্রতি একান্ত আকর্ষণও আর বড় বেশি মূল্যবান বলে মনে হয় না। জীবনের নির্ভর চাহিদাগুলো মিটাতে গিয়ে জীবন কি ভাবে দেউলে হয়ে যাচ্ছে, তার ভয়ংকর চেহারাটাই ছবিতে স্পষ্ট। যে গ্রাম-রোমান্টিক কবির ভাবনা বিলাসকে তৃপ্ত করে, সৌভাগ্যক্রমে ‘পথের পাঁচালী’ সে গ্রামের পাঁচালী নয়, ‘পথের পাঁচালী’ হচ্ছে এমন এক জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত, যার প্রত্যেকটি বাক্যে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আর্তি। আশা ও হতাশার ধন্দ, জীবন ও মৃত্যুর সংঘাত। জীবনের এই মিশ্র ও জটিল বিজ্ঞাস থেকে জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক উপলব্ধিতে পৌঁছনোই আধুনিকতার অঙ্গিষ্ট। এবং যেহেতু ‘পথের পাঁচালী’তে এই অন্বেষণ প্রতিফলিত, সেই হেতু ‘পথের পাঁচালী’ গ্রামকেন্দ্রিক হয়েও আধুনিক

মানুষকে তৃপ্ত করতে পেরেছে। আধুনিক মনকে ছুঁতে পেরেছিল বলেই ‘পথের পাঁচালী’ আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের দ্বিতীয় ছবি ‘অপরাজিত’। বহুনির্দিষ্ট এই ‘অপরাজিত’র বিশ্ববিজয়ে বিশ্বস্ত হল সেই সব নিদ্রুকদের দুর্গ, যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের মত শিল্পীকে, সিনেমা-চত্বরের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিতে রাজী হননি। ‘অপরাজিত’র সিংহ-সম্মানে আমরা সকলেই সম্মানিত হলাম। প্রমাণিত হল, চিত্রভাষায় আশ্চর্য পারদর্শী এক শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। আজিকে সত্যজিৎ রায়ের সিঁদিকে নেহাৎ অসুখ ছাড়া আর কোন কারণেই অস্বীকার করার উপায় নেই আজ। ‘অপরাজিত’ সম্পর্কে সমালোচকেরা যাই বলুন আমার বিশ্বাস, অপরাজিত আসলে অপূর জয়যাত্রার কাহিনী নয়, ‘অপরাজিত’ হচ্ছে সর্বজয়া ও অপূর ব্যক্তি-সম্পর্কের স্বন্দর করণ কাহিনী। এখানে ভাঙন-ধরা সমাজ সম্পর্কে শিল্পবাস্তবতায় উপস্থিত করা হয়েছে। মা ও ছেলের মধ্যখানে বৃহৎ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল আবর্ত ও স্বন্দসংঘাতের হৃদয়হীন ঘূর্ণি—সর্বজয়া অপূরকে দুই পৃথিবীর দিকে ঠেলে দিল। সর্বজয়ার অন্ধ পুত্র-স্নেহ, আর অপূর চোখের সামনে স্পন্দমান পৃথিবী। অনিবার্য নিয়মে পুরনো সম্পর্ক ভাঙতে লাগল। এইখানে বলে রাখি, সর্বজয়ার অসুস্থ স্বন্দ বতটা যথাযথ, অপূর স্বন্দ ততটা নয়। কেননা ছবিতে অপূর জগৎ-কে আমরা তেমনভাবে পাইনি। অপূর জীবনকেন্দ্র ছিল মা, নগর জীবনে এসে সেই জীবনকেন্দ্র ক্রমে ক্রমে পালটে যেতে লাগল। এই বদলে যাওয়াটা হৃদয়হীন ভাবেই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু যে-জগৎ, যে-জীবন, যে-আকর্ষণ অপূর জীবনকেন্দ্রের বিপর্যয় ঘটালো, ছবিতে তা অনুপস্থিত। এবং ‘অপরাজিত’র আন্তর্জাতিক সম্মান সত্ত্বেও এ অভিযোগ আমার থাকবেই, ছবিতে অপূর প্রতি পরিচালকের ওঁদাসীত্ত্ব ঘটেছে। অপূর দোষে নয়, জীবনের স্বাভাবিক নিষ্ঠুর নিয়মে মানুষের সম্পর্ক-গুলি জটিল হয়ে উঠছে, এ অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি থাকলেই ‘অপরাজিত’ আমার আরো ভালো লাগতো। আজিকানিপুণ সত্যজিৎ রায়ের ‘অপরাজিত’র অপূ সত্যসত্যই অপরাজিত কিসে, আমি তা আজও বুঝি না।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য ‘অপরাজিত’ই হচ্ছে বাংলা দেশের দ্বিতীয় ছবি যা আধুনিক মনকে ছুঁতে পেরেছে। এবং সেই জন্যই এ কথা অকুণ্ঠভাবে বলা চলে ‘অপরাজিত’ই দ্বিতীয়বার প্রমাণ করল যে চলচ্চিত্র

শুধু ইতর রুচির তৃপ্তিবিধান করে না, চলচ্চিত্রও শিল্প এবং শিল্প-মাধ্যম হিসাবে এর সার্থকতা সংশয়াতীত।

‘পরশ পাথর’ সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় ছবি। বর্তমান নিবন্ধে ‘পরশ পাথর’সহজে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ স্বল্প। বিশেষতঃ এ ছবি সম্পর্কে যোগ্যতর সমালোচকদের বিস্তৃত আলোচনাগুলো সকলেরই স্মরণ থাকবার কথা। ‘পরশ পাথরে’ আধুনিক মানস কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটুকুই শুধু আমার আলোচ্য।

‘পরশ পাথরে’ সত্যজিৎ রায়ের আঙ্গিকসিক্তি প্রস্ফুটীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুঃসাহসী পরীক্ষার জন্য ‘পরশ পাথর’ উল্লেখযোগ্য। এ পরীক্ষা সর্বতোভাবে সফল না হলেও, এর মূল্য আছে। মধ্যবিত্ত একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক নগ্নতার মুখোশগুলো খসিয়ে দেখেছেন পরিচালক। অর্থগত, আভিজাত্যের ফাঁকা চেহারাটা দেখা দরকার, দেখানো দরকার। এতে বিজ্রপের তীক্ষ্ণতা আছে, আছে ব্যঙ্গের তীব্রতা। কিন্তু এ ছবির বিস্তার থেকে একথা ভাবা অসঙ্গত নয় যে এ সবই হচ্ছে পার্শ্বঘটনা। আসলে নিম্নমধ্যবিত্ত ছাঁটাই করানী পরেশ দত্তের দিকেই সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট। এবং সেখানে বিজ্রপ শুদ্ধ, ব্যঙ্গ নির্বাক। পরেশ দত্তের মাধ্যমে যে মধ্যবিত্ত চরিত্রটিকে পাওয়া গেল, তার সম্পর্কে আমাদের মন সহানুভূতি-স্বিগ্ধ। কোন এক ঐচ্ছজালিক ‘পরশ পাথরে’র রূপায় স্বল্পবিত্ত করানীর জীবন-প্রবাহ অগ্রমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্তই। তার স্বপ্ন খণ্ডিত, আশা স্বল্প, তার রক্তে নেই আভিজাত্যের স্পর্ধিত লিঙ্গা। তাই পরেশ দত্তের মোহভঞ্জে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। বেঁচে থাকার হিংস্র ঘন্থে সে যতই স্বার্থপর হোক, সে যে ভালো, একটি সুখী অপরিসর গলির জীবনেই যে তার সুখ, এ কথাই শেষপর্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছে ছবিতে। কিন্তু আসলে মধ্যবিত্ত সমাজের এ মনোবিশ্লেষণকে পুরোপুরি মানতে আমার বাধে। একথা কদাপি সত্য নয় যে মধ্যবিত্তের লোভ সংক্ষিপ্ত এবং মধ্যবিত্ততা তার রক্তসংস্কার। ‘পরশ পাথরে’র সুখী পরিসমাপ্তিতে স্বস্তি থাকলেও সত্য নেই। পরেশ দত্তকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, সেখানে ফেল হলেও তাকে দোষ দেওয়া যেত না। কেননা জীবনটা সমাধানের সরলাঙ্ক নয়। সমস্যার অগ্রিবৃত্ত থেকে যত সহজে পরেশ দত্ত বাইরে আসেন, তত সহজে মোহমুক্তি ঘটে না। স্বার্থের চেহারা সর্বত্রই এক এবং বীভৎস। সৌন্দর্য-

সচেতন শিল্পী একে এড়িয়ে গেলে বাস্তবতা রক্ষিত হয় না ; জীবনের অগ্নিপরীক্ষা-
গুলো কঠোর বলেই জীবন এত জটিল এবং জীবন নিয়ে এত ভাবনা। পরশ
পাথরে সমস্তা এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সমস্তার বাস্তবতা রক্ষিত হয়নি। তা
ছাড়া মধ্যবিস্ত মানসের সঙ্কটকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট বলে মানতে আমি
প্রস্তুত নই, যদিও অর্থনৈতিক কারণ থেকেই এ সঙ্কটের উদ্ভব, তবুও। মধ্যবিস্ত
মানসে যে সঙ্কট—সে হচ্ছে প্রত্যয়ের সঙ্কট। জীবনের কোন স্থির বিশ্বাসকেই
না থাকলে অস্থিরতা আসবেই, এবং একালের মধ্যবিস্ত মানস এক এলোমেলো
ঝড়ে বিপর্যস্ত। বিক্ষিপ্ত। পরেশ দত্তের চরিত্রে এই সঙ্কট প্রতিফলিত হয়-
নি। তার মূল্যবোধগুলো প্রাচীন, তার বিশ্বাসগুলো স্থির, সে নীতিবাদী।
'পরশ পাথরে' আভিজাত্যের নগ্নতা প্রকাশিত কিন্তু মধ্যবিস্ত সমাজ সম্পর্কে
সুখী মনোভাব প্রকট। ব্যঙ্গের লক্ষ্য বহিমুখী, অন্তর্মুখী নয়। ফলে স্বর্ণসঙ্কানের
পরিণাম হিসাবে মধ্যবিস্তের যে মর্যাস্তিক পতন ঘটলে বাস্তবতা রক্ষিত হত,
এখানে তা হয়নি। আধুনিক জীবন অনিবার্য ব্যর্থতাবোধ ও গ্লানি থেকে যে
মুক্তির পথ খুঁজছে, সে অন্বেষার কোনও সমাধান নেই। পরশ পাথরের
সমাধানটা সরলরৈখিক।

প্রশ্ন উঠবে, 'পরশ পাথরে' তার সুযোগ কোথায়। পরেশ দত্ত তো নেহাৎই
কেরানী, তার মধ্যে মধ্যবিস্ত মানসের সঙ্কটের প্রতিফলন প্রত্যাশা করলে,
সেই বেহিসাবী প্রত্যাশাকে ঠকতেই হবে। তবে কি বুঝবো, 'পরশ পাথরে'
নিছক একটি গল্প পেলাম, যে গল্পের বক্তব্যের কাছে আমাদের কোন ফরমাসই
ধাটবে না? কিন্তু পৃথিবীর কোন ভালো ছবিই নিছক গল্প শোনায় না।
পরশ পাথরও নিশ্চয়ই তা শোনাতে চায় না। 'মডার্ন টাইমস্', 'গোল্ড রাশ'
কিংবা 'মঁসিয়ে ভেদু' যদি শুধু গল্প হত, তবে তার কতটুকু মূল্য দিতাম আমরা।
বস্তুতঃ আমার মনে হয়েছে, 'পরশ পাথর' চিত্রায়ণে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা এ
ছবির স্রষ্টাকে উদ্ভাস্ত করেছে। তাই এ ছবিতে 'টোনে'র সমতা নেই।
'সিকোয়েন্স' বদলের সঙ্গে সঙ্গেই ছবির জাত পালটাতে থাকে। স্বচ্ছ হাসি
জলে উঠতে না উঠতেই স্টাটার তীব্র হয়ে ওঠে, স্টাটার নিভতে না নিভতেই
ঘটনা 'সিরিয়াস' রূপ নেয়, 'সিরিয়াস' হয়ে ওঠে 'কমিক', কমিক গড়িয়ে চলে
ট্রাজেডির দিকে এবং ট্রাজেডির রস ঘনীভূত হতে না হতেই পরশ পাথরের
আশ্চর্য ইঙ্গিত তার সুবর্ণ দীপ্তি হারায়। তাই ছবির পরিসমাপ্তিতে আমরা
না পেলাম কমেডি, না পেলাম ট্রাজেডি। না এল বাস্তব, না এল 'ফ্যান্টাসি'।

আমার তো মনে হয়, এ জাতীয় ছবি পুরোপুরি ক্যান্টাসি-ধর্মী হওয়াই সম্ভব। পরশ পাথর বস্তুটাই যেখানে অবাস্তব, সেখানে আগা গোড়াই একটা বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিচালক কল্পনারতির বিকাশকে অকারণেই সংকুচিত করেছে। ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলির প্রতিক্রিয়া একেবারে বাস্তবানুগ হওয়ায় ছবির সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কল্পনা ও বাস্তবের প্রতি বিধানিত আনুগত্যে ছবিটি না হয়েছে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্ত, না হয়েছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্ত। ছবিতে ঘটনা যত কোতুকাবহই হোক, তাকে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতেই হয়। কোলরিজ-উক্ত গ্রহীতার স্বেচ্ছাকৃত নাস্তিক্যবুদ্ধির অবলোপের উপর পুরোপুরি ভরসা করলে শিল্পের চলে না। এই কারণেই প্রয়োজন পুরোপুরি আবহ সৃষ্টির। ধরা যাক, 'মিরাকুল ইন মিলান' ছবিটির কথা। ইতিপূর্বে বহুবার কলকাতায় ছবিটি দেখানো হয়েছে বলেই এর উল্লেখ করা হল। ছবিটিতে ক্যান্টাসির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে,—এবং এর দৃশ্যসজ্জা থেকে শুরু করে চরিত্র-গুলোর অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত সমস্তটাই অবাস্তব। তাই শেষ পর্যন্ত পাথরের মূর্তির মাহুষ হয়ে ওঠাও অবিশ্বাস্ত হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ একটা প্রতীকী অর্থই ব্যক্ত হয়। আক্ষিক-বিশ্বাসের দিক থেকে 'পরশ পাথরে' এ রীতি গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে সুযোগ নেওয়া হলে 'পরশ পাথরে' একান্ত অবিশ্বাস্ত ঘটনাও প্রতীক ব্যঞ্জনা পেত।

'পরশ পাথরে'র পরেশবাবু নিছক কেরানী, এবং প্রাচীন মূল্যবোধগুলিতেই তার স্থিতি। 'পরশ পাথর' আসলে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসকে প্রকাশ করে না, তার সঙ্কটকে আদৌ ছুঁতে চায় না, ভ্রান্ত কেরানীর মোহমুক্তিতে এক আশ্চর্য হাসি ছাড়া এ ছবির কাছ থেকে আর কোন প্রত্যাশাই পরিতৃপ্ত হবার নয়। 'পরশ পাথর' একথাই প্রমাণ করলো যে সত্যজিৎ রায় সব্যসাচী নন, করুণ রসেই তাঁর সিদ্ধি, হাস্তরসে তিনি আজ ব্যর্থ। সমালোচক মহলে পরশ পাথরকে কেন্দ্র করে চালির সঙ্গে তাঁকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে,—বঙ্গীয় চিত্র সাংবাদিকতার এই দূরপন্থের মূঢ়তায় লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। স্বল্পবুদ্ধির কাছে চা্লি শুধু 'ফান', শুধু কোতুক। কিন্তু যিনি জীবনের গভীরার্থ খুঁজতে বেরোন, তিনিই মানবেন, শুধু জীবনের কতকগুলি কোতুককর দিককেই চা্লি প্রকাশ করেন না, তিনি হাসির মধ্যেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আনেন এবং কখনো কখনো তাঁর হাসি গভীর করুণার অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। 'গোল্ড রাশে'র প্রিয়ার আগমন প্রতীকার যে দৃশ্য তার কারুণ্য কি কখনো ভোলবার? এমন দৃষ্টান্ত

চালিতে ভুরি ভুরি। ‘পরশ পাথরে’ শুধু একবার। পরশ পাথর পাবার পর পরেশ দত্তর কাগ্না। সে কাগ্না হাসি জোগায়, অথচ সত্যিই তা করুণ। সারা জীবনের ব্যর্থতা, গ্লানি ও হতাশার বরফলুপ একটিমাত্র হাশুকর কাগ্নায় প্রকাশ পেল—এ কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এক সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এসব আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, ‘পরশ পাথরে’ আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা তার সামগ্রিকতায় প্রতিফলিত হয়নি, এবং সেই কারণেই আঙ্গিকসিদ্ধি সত্ত্বেও মস্তব্য করতে ইচ্ছে করে, সত্যজিৎ রায়ের মত প্রতিভাবান পরিচালকও তো সোজা পথই বাছিলেন।

অবশ্যই এসবই বিষয়বস্তুগত আলোচনা। বাঙলা সিনেমা পরিণত হচ্ছে বলেই এ আলোচনার প্রয়োজন ঘটেছে। এতকাল চিত্রভাষা ছিল অনায়ত্ত, আজ সে ভাষা আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু বক্তব্য বিষয়ে আজো ঔদাসীন্য দেখা যাচ্ছে। এবিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। কেননা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গি যোগেই শিল্প সার্থক শিল্প হয়ে ওঠে।

আসল কথা, শুধু ভালো ছবি, নিখুঁত ভাবে তোলা গল্প মন ভরাতে পারে না। মন ভরাতে হলে, জীবন-জিজ্ঞাসার কোন এক গভীর সত্যকে ব্যক্ত করতে হবে। অত্যাধি বাঙলা চলচ্চিত্রে জীবনবোধ আসেনি। আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সাফল্য অর্জিত, হয়েছে, তা আজো পুরোপুরি কাজে আসছে না। সত্যজিৎ রায় ছাড়াও ইদানীং কালে আরো কয়েকজন পরিচালক দেখা যাচ্ছে। ঝাঝা শিল্পকর্মের দায়িত্ব স্বীকার করেই এপথে এসেছেন। সার্থকতার দিক থেকে চিত্রশুলিতে শিল্প সাফল্য ঘটেছে, একথা অবশ্যই বলা চলে না। কিন্তু এঁদের প্রয়াসে বৈচিত্র্য আছে। কল্পনা আসছে, দুঃসাহস আসছে,—এইটাই ভরসার কথা।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিকে সচেতন হচ্ছেন অনেকেই। এক কাল ছিল, যখন ধ্যানাত্মক লেখকদের গল্পমাত্রকেই চিত্রভাষা করে চিত্রনির্মাতারা তাঁদের শিল্পকর্তব্য সমাধা করতেন। নামী লেখকের লেখা গল্প লোক টানে, এ বুদ্ধি হচ্ছে বিষয়বুদ্ধি। এই বিষয়বুদ্ধির টানে শব্দসাহিত্য উজাড় হয়ে গেল। গল্পের চিত্রানুবাদ মাত্র পাওয়া গেল, পাওয়া গেল না কোন নতুন ব্যাখ্যা, কোন বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসা। আজো নেহাৎ গল্পের খাতিরেই এসব ছবি দর্শক পায়। আমাদের দেশের চিত্রাঙ্গাদীরা আজো চিত্রভাষার স্বদীক্ষিত পাঠক

হয়ে উঠতে পারেননি। ছবির কাছে বড় প্রত্যাশা নিয়ে হাজির না হলে, বড় কিছু পাওয়া যাবে না কোন কালে। প্রতিদিন যে সব ছবি মুক্তি পাচ্ছে, এবং লোকপ্রিয়তায় যে সব ছবি প্রায় রেকর্ড সৃষ্টি করছে, সে সব ছবির মূল্যবিচার প্রায় হয়ই না। মানবচৈতন্যের গভীরে এরা কদাচিৎ ছায়া ফেলে। এসব ছবি বটতলার সাহিত্যের মত। বাজার রাখাই এদের কাজ। এই সব ছবি, যার বিষয়বস্তু প্রাচীন, মূল্যবোধগুলি স্তবির, জীর্ণ, জিজ্ঞাসাগুলো স্তিমিত, গতানুগতিক প্রেম বিরহ হাসি কান্না প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চটকদারী গল্প ছাড়া বক্তব্য যার কিছুই নেই, শিল্পকর্ম নয়। এগুলো একালে জন্ম নিলেও এসব কালানৌচিত্য দোষে দোষী।

ব্যক্তিচৈতন্যের জটিল-জিজ্ঞাসাগুলোই একালের সমাজ-মানস। আধুনিকতা হচ্ছে তাই যা এই সমাজ-মানসকে ব্যক্ত করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়। সৌভাগ্যক্রমে এদেশের সাহিত্যিকেরা সদাজাগ্রত অবস্থা আছে। ভয়ংকর অস্থিরতার আবহাওয়ার মধ্যেও সন্ধিৎসু শিল্পীরা হার মানেননি, ক্রান্ত হয়ে পড়েননি। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ও অভিব্যক্ত করার দুর্লভতম প্রয়াসে সাহিত্য ক্ষেত্রে যে জীবনস্পন্দন শোনা যাচ্ছে, চলচ্চিত্রের কাছে থেকে ততটা অবশ্যই আশা করি না। কিন্তু একথা কেন মানবো যে চলচ্চিত্রের দায় শুধু কেমন করে ছবির ভাষায় কথা বলা যায়। যে বিরামহীন প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি সব শিল্পীকেই দাঁড়াতে হয়, চিত্রশিল্পী তার থেকে রেহাই পাবেন কোন্ নিয়মে? শুধু আঙ্গিকবিন্যাসের কারুকর্মে যিনি মগ্ন থাকবেন, তাঁকে কারিগর বলবো কিন্তু শিল্পী বলবো না।

চলচ্চিত্র তো আসলে জীবন-ভাষ্য। এ জীবন প্রতিনিয়ত পলায়মান। কেউ তাকে আভাসে ছুঁতে পারে, কেউ বা তাকে ধরতেই পারে না। যিনি শক্তিমান শিল্পী, তিনি এই খণ্ডিত জীবন থেকেও এক সম্পূর্ণতর জীবন-উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেন।

কলার্টকৈবল্যবাদীরা জীবনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভঙ্গিকেই জীবনের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করেন। কিন্তু বড় শিল্পীর কাছে আমরা প্রত্যাশা করবো বড় বোধের যা চৈতন্যের বিশৃঙ্খলাকে স্থির স্থিতি দেবে, আমাদের দেখা, জানা ও অনুভবের বৃত্তকে বিস্তার করবে।

আইজেনস্টাইন প্রমুখ চিত্র-দার্শনিকদের অনুসন্ধানে চিত্রভাষার নিজস্ব আঙ্গিক আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আজও চলচ্চিত্র রাজ্য এক শেক্সপীয়ারের প্রতীক্ষা

করছে, যার শিল্পভাবনায় চিত্রশিল্পও পাবে লোকোত্তরতা। কোন এক ফ্লাহাটি বা কোন এক ডে, সিকার শ্রম সেই দিনই হয়তো পূর্ণতা পাবে।

বাঙলা দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় চলচ্চিত্র শিল্পীর কতটুকু আনুকূল্য সম্ভব — তা বিতর্কের বিষয়। এখনো এখানে গতানুগতিকতার ইলেক টানা চলছে। চিত্র সাংবাদিকতার নাবালকত্ব আজো ঘোচেনি, মূল্যায়নের বিশৃঙ্খলতায় কাচ ও কাঞ্চন এক দামে বিকোচ্ছে, দর্শক-রুচির পরিণতি ঘটেনি এবং বুদ্ধিজীবীদের উন্নাসিকতা আজো মর্যাস্তিক। এ অবস্থায় বাঙলা চলচ্চিত্র আধুনিক সমাজ-মানসকে কতটুকু ধরতে পারলো—সে বিচারের প্রকৃষ্ট সময় নয়। তবু ভাবতে হয়। কেননা বিকৃত রুচির স্রোত এমনই প্রবল যে, যে-কোন মুহূর্তে বহু যত্নের গড়ে তোলা শিল্প ঐতিহ্য একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যেতে পারে। তাই বারম্বার একথা জানবার ও জানাবার প্রয়োজন আছে, মুষ্টিমেয় শিল্প তাবুকের ভাবনায় যে স্বর্ণোজল ভবিষ্যৎ জন্ম নেবে আমরাই পারি তাকে হ্রাসিত করতে।

শিল্প ও শিল্পী ॥ তরুণ সাগ্যাল

সংঘর্ষের সনাতন পথে ছুজনে
 হাঁটতাম. আজ তুমি-আমি কতদূরে
 আমার বাতাস ভরেনি নিভৃত কুজনে
 আদি কবিদের প্রিয় কোকিলের সুরে ।
 পুরানো মলাটে বাঁধা পুরানো যে-কথা
 বলাও হয়নি, যা-ছিল পবিত্রতা
 অপাপবিদ্ধ আমার মনের বিজনে
 আজ দেখি, তাও ঝরে গেছে অঙ্কুরে,
 প্রথম চেনার বিস্ময়ে তবু ছুজনে
 চেয়েছি মিলন রূপের সমুদ্রদূরে ॥

সম্প্রতি তবু কথার মূল্য মাপে
 রক্তের দামে হৃদয়ে হৃদয় চেনা,
 প্রিয় যে আমার অঙ্গের অভিশাপে
 মানস লোকের সংবাদ জানবে না ।
 আমার বাহুতে রক্তের কল্লোলে
 সৃষ্টির জ্বালা আগুনের সাড়া তোলে,
 যে ছিল আমার নিভৃতির উত্তাপে
 তার দাম আজ নিখিল মূল্যে কেনা
 প্রিয়-যে আমার মূঢ় কামনার পাপে
 হাওয়ার প্রীতিতে মানে সে প্রেমের দেনা ॥

তবু শবাধারে ফিরি যদি, প্রিয়তমা,
 যা, ক্ষমার নামে মূল্য দিয়ে না প্রেমে
 জীবের স্বপ্ন অশিবের হাতে জমা
 জীবন সে দায় চায় নিকষিত হেমে ।

প্রজ্ঞা আমার বাঁচার অলংকার
 ছু-দিনের চাওয়া-পাওয়ার অহংকার,
 জানি যা নীতির অদিতি কোঠায় রমা,
 তার দায় কাঁধে আকাশ উঠেছে ঘেমে
 নক্ষত্রের ঝাঁক যদি অর্ঘমা
 বারেক নামায়, স্বপ্নও যাবে থেমে ॥

তোমার মন্দির শ্রাবণের সৌরভ
 অধীর হাওয়ায় অশথের ডালে কাঁদে,
 মধ্য দিনের আকাশের গৌরব
 অনাহারী চিল উড়ে উড়ে গলা সাধে ।
 শৈশবে চেনা নিরবধি স্রোত, নদী,
 রক্তে শোণায় সাগরের কথা যদি—
 বহুতা ধারায় প্রবাহের উৎসব
 বলবো, নদীকে পেয়েছি বাহুর বাঁধে
 শুনবো, শুকনো ধারার নিভৃত স্তব
 উৎসের বাঁকে ফিরবার সংবাদে ॥

এমন একটি ছন্দ বা স্পন্দন
 যা আছে, হৃদয় যাকে অনন্ত কাল
 খুঁজেছে, মেনেছে শিল্পের বন্ধন
 প্রতিদান তার স্রবণের কঙ্কাল,
 নারীর রক্তরতির অঙ্ককারে
 আঘাত করেছি মহাজীবনের তারে
 বেদনার টানে কামনার ক্রন্দন
 রক্তনদীতে সাড়া তোলে উত্তাল
 আমি জানি তবু জানি না, যা নন্দন
 যাকে রূপ দিতে জাগে অনন্ত কাল ॥

যদি ফিরে যাই আকাশ-মাটির কাছে
 সে-আকাশ-মাটি অপরিচিতার মুখ,
 রূপ অরূপের প্রতিপক্ষের আঁচে
 কবি ও কাব্য সংগ্রামে উৎসুক ।
 তৃতীয় প্রহরে তঙ্করও সাজে সাধু
 শৃঙ্গরাজ্যে মহাসাম্যের যাত্—
 বর্ণাশ্রম ভাঙার ক্ষিপ্ত নাচে
 তুমি আমি ভুলি স্মৃতি নেতাদের বুক
 যদি যেতে চাই চিরন্তনীর কাছে
 দেখি না, চেনার আদলে দেশের মুখ ॥

আকাশ-মাটি বা স্বপ্ন—সে কেউ নয়
 প্রিয়তমা, তুমি দেহের ছন্দ মিল
 তোমার ললিত শরীরের সঞ্চয়
 আমারি স্পর্শে সহর্ষে উন্মীল ।
 বঁধু, এ-জীবন মাতালের চোখে ঘোর
 শিল্পের কাছে খোলা অসীমের দোর
 যদি যৌবন, দেখি, শেষ হয় হয়
 জ্ঞানবো বাঁচায় মিল নেই এক তিল
 যে-বাঁচা আমারি ছ্যতিতে হিরণ্ময়
 সে-বাঁচার দামে আকাশ অসীম নীল ॥

একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত ॥ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ভয়ংকর রাত্রি থেকে দৌড়ে গিয়ে ভোরবেলার হাতে
ছড়িয়ে এলাম এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তের আলো।
সে-আলো দেখলো না কেউ, না তুমি, না ঐ পোড়ো বাড়ি।
কেবল বৃকের শব্দ বৃকে করে দ্রুত, দৃশ্যগান
একটি অপার ছঃখ পড়ে রইলো সুদূর হাওয়ায়।

স্বপ্নের মতন মিথ্যা সুন্দরের নিঃসঙ্গ আসনে
উদিত হলেন এই পৃথিবীর অন্ধ পুরোহিত।
তাকে আমি আমাদের নরকবাসের অভিজ্ঞতা
শোনালাম।
তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন, মানুষ
নদীর সহজ স্রোতে অবগাহনের মত আনন্দকে চায়,
এবং যা কিছু তার বাহুর বিরুদ্ধে তারই 'পরে
তাদের উদ্ভম এক উলঙ্গ ভিখারি।

মনে হল পুরোহিত স্পষ্টভাষী ; আবার ভাবলাম,
বুঝি সবই সংসারের বিপরীত সঁাকোর মহিমা।

তুমি তো নক্ষত্রলোকে আলো দাও ; এবং শুনেছি,
তোমারই রক্তের স্রোত ইদানীং ইচ্ছাপূরণের
নগ্ন স্নান : অনেকের পরিশুদ্ধ হবার প্রথম নির্ভরতা।
কিন্তু কী আশ্চর্য চাখো, আমাদেরও মৃত্যু হয়েছিল একদিন।
আমরাও রক্তের মোহ না ভুলে সেদিন
কোন এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের বিপন্ন সিঁড়িতে
দাঁড়িয়েছিলাম, যেন কেউ এসে আলো ধরবে, আর

আমাদের যাত্রা শুরু হবে ।
আরম্ভটা আদি না অনাদি, এই নিয়ে
আমাদের মধ্যে এক বিচ্ছেদের ছায়া এল, ঘূর্ণি এসেছিল
তারপর ।

সম্পূর্ণ হবার জন্ত সংগোপন হতে চেয়েছিল
সাধ ছিল, শৈশবের দু-একটা পুতুল সঙ্গী হোক ।
কিন্তু ঐ মুড়ঙ্গেই তুমি সব ভুলে
আলো চাইলে.
আর অমনি আলো হাতে একজন শিকারী
তোমাকে আড়াল করে অন্ধকার হল ।

আমি তারপর থেকে কেবলি নিশ্চিহ্ন হবো বলে
বহুদূর থেকে এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তের আলোয় এসেছি ।
পুরোহিত যা বললেন, তাতে মনে হয়,
তোমার নক্ষত্রলোকে এ-আলোর কোন ছায়া নেই ।

সমসাময়িক সাহিত্য

রত্ন ও শ্রীমতী (প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ)—অন্নদাশঙ্কর রায়।
প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরি, কলিকাতা। দাম ৩.০০ এবং ৩.৫০

‘রত্ন ও শ্রীমতী’-র ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন যে, ‘সত্যাসত্য’ লিখতে লিখতে ‘রত্ন ও শ্রীমতী’-র পরিকল্পনা তাঁর মনসে উদয় হয়। কিন্তু ‘সত্যাসত্য’র মত শেষোক্ত উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত নয়, “জীবন লইয়া অশ্রান্ত পরীক্ষার” বৈচিত্র্যও এখানে অনুপস্থিত। ‘রত্ন ও শ্রীমতী’-র theme এক কথায় বলা যেতে পারে প্রেমের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক। প্রেমের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত, নৈতিক এবং মানবিক বিভিন্ন সমস্যার কথা লেখক চিত্রিত করেছেন। ‘রত্ন ও শ্রীমতী’র অব্যবহিত পূর্বের উপন্যাস হল ‘কন্ঠা’। ‘কন্ঠায়’ অন্নদাশঙ্কর রূপকের মাধ্যমে মানসীর সঙ্গে প্রেমসীর শাস্ত্রত ব্যবধানের কথা বলেছেন। চার বন্ধু যৌবনে যথাক্রমে পদ্মাবতী, রূপবতী, কাস্তিমতী এবং কলাবতীর সন্ধানে বের হন এবং জীবনের প্রৌঢ়পর্বে তারা দেখল কেউ কেউ হয়তো তাদের মধ্যে অধিকতর সুখী, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে অন্তিষ্টকে কেউ পায়নি। কেউ ইতিমধ্যেই শ্রান্ত হয়ে অব্রেষণ বন্ধ করেছে, জীবন এবং বাস্তবের সঙ্গে সন্ধি করেছে। ‘রত্ন ও শ্রীমতী’তে অব্রেষণের চেয়ে জিজ্ঞাসা প্রবল। রত্নের ভাবনা, প্রেম কি শুধু যৌবনের ধর্ম না জীবনের মর্ম? প্রেম অর্থে কি থাকে আজ ভালোবাসি তাকে চিরকাল ভালোবাসবার অঙ্গীকার? তাহলে প্রেম বন্ধন না মুক্তি? প্রশ্নতঃ, প্রেমের পারম্পরিক সন্ধকের আলোচনা অপরিহার্য।

প্রেমের ত্রিভূজ সমস্যার একটি সহজ পরিসমাপ্তির সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত। নায়িকা একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভাই বলে সন্দোধান করল এবং তারপর সব সমস্যার শেষ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ-ধরনের পরিণতি নিয়ে একটি হাসির গল্পও লিখেছিলেন)। কিন্তু এ-ধরনের পরিসমাপ্তির পিছনে অন্ত্যন্ত লেখকদের কোন নিশ্চিত জীবনদর্শন নেই, একজন নায়িকা, তার দুজন প্রেমিক—একজনের প্রেমকে সে গ্রহণ করল এবং অবাঞ্ছিত প্রেমিকের সে বোন হল। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের পাত্র-পাত্রীরা যখন প্রেমিক প্রেমিকার সন্ধক পরিত্যাগ করে ভাই-বোন হয়, তখন সেটা শুধু প্রটের খাতিরে সংঘটিত এমন মনে করা ভাল হবে।

তার প্রথম দিকের উপন্যাসগুলির কথাই ধরা যাক। প্রচলিত অর্থে কোন ত্রিভূজ সমস্তা তো ‘অসমাপিকা’ অথবা ‘আগুন নিয়ে খেলা’য় নেই। পার্টক এট প্রসঙ্গে সূচাকর পত্র এবং সোম ও পেগীর কথোপকথন স্মরণ করুন। উপবৃক্ত দুটি উপন্যাসেই নারিকারা শেষ পর্যন্ত নায়ককে ভাঙি বলে সম্বোধন করেছে অথবা করতে চেয়েছে। ‘সুরুচির ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বটি সহজ। একদিকে প্রেমের দাবি ; অন্যদিকে বিবাহের সংস্কার। সমস্তাটি জটিল হল যখন অপ্রেমের বিবাহের মধ্যে জন্ম সুরুচির অবাঞ্ছিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। অবাঞ্ছিত হলেও সে বৈধ এবং সবচেয়ে বড় কথা আত্মজ্ঞা। সুরুচি এবং সূচাকর মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত হল। সুরুচি তার আপন, কিন্তু সুরুচির সন্তান, তার কেউ নয়। শেষ পর্যন্ত তারা একটি বোঝাপড়ায় এল। ‘আগুন নিয়ে খেলার’ সোমের তীব্র কামনা শিথিল হয়ে গেছে পেগীর নিরুত্তাপে। সে যদিও প্রতিবাদ করেছে, ‘স্ত্রীর সাধ তো বোনে মেটে না’ কিন্তু একই সঙ্গে এই সত্য স্মরণীয় যে প্রেম পারস্পরিক—কোন অবস্থাতেই এই দ্বৈতভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। রত্ন যখন শ্রীমতীকে বলে ভবিষ্যতে অথবা বর্তমানে প্রেমের প্রয়োজনে তাদের সম্পর্কবোধের বদল হবে, তখন অন্তর্দ্বন্দ্বটি অন্ত্যান্ত ক্ষেত্রের মত সহজ নয়। কেননা এখানেই প্রেমের চিরন্তনতার সমস্তা বিদ্যুত।

রত্ন জীবনে প্রেমের প্রভাবকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করে জীবন প্রেমের চেয়ে অনেক বড়। জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণায় সে ‘মুক্ত মানুষ’ হতে চায়। তাই প্রেমের বন্ধনে সে ধরা দিতে নারাজ। শুধু তাই নয়, প্রেম সম্পর্কে তার সংশয়ও প্রচুর। প্রেমের পরিণতি বিবাহে ; কিন্তু বিবাহে চিরকাল প্রেমের প্রতিশ্রুতি থাকলেও নিশ্চয়তা কোথায় ? রত্নের কথাতেই বলা যাক, “প্রেমের উপর নির্ভর করে চিরকালের সঙ্কল্প স্থাপন করা যায় না। প্রেম যেন বহুতা নদী। কোথাও একটাই আবদ্ধ থাকে না। তাকে বন্ধন দিয়ে স্থিতিবান করতে গেলে বন্ধনই সার হয়। গোরী, আমার সঙ্গে চিরকালের সঙ্কল্প যদি চাও তবে প্রেম বাদ দাও। তা বলে তোমার জীবন থেকে প্রেম বাদ দিতে বলব না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে। আর কারো ভালোবাসা পাবে (পৃ-১৩৮)।” স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া আর কোন সম্পর্কে (সে রত্নের সঙ্কল্পই হোক অথবা পাতানোই হোক) কি এ-ধরনের বন্ধন নেই ? যে কোন সম্পর্কই পরস্পরের বোঝাপড়া এবং বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে গেলে মিথ্যা হয়ে যায়।

রত্ন এক জায়গায় গোরীকে বলেছে, 'সত্যিকারের বন্ধুর মতো মহৎ কোন মিথ্যা স্বামী?' কিন্তু যে বন্ধু একপক্ষ স্বীকার করে না, সেটা বন্ধুই নয়।

রত্নের জীবনে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। মালাদি নামে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে তার ভালো-লাগার অনুভূতি সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য মালাদি এ সম্বন্ধে অচেতন, তবুও রত্ন বিশ্বাস করে যতদিন পর্যন্ত মালাদির মধুর স্মৃতি তার কাছে সত্য, ততদিন পর্যন্ত আর কাউকে ভালবাসবার অধিকার তার নেই। সে যদিও জানে 'প্রেম বহতা নদী' তাহলেও প্রেমের জন্ত আত্মবঞ্চনা বিবেকবিরুদ্ধ। কিন্তু অবশেষে একদিন সে হার মানল। এতদিন প্রভাতের মত সেও কিছুটা বিশ্বাস করত, "প্রেম অবশ্য বড় জিনিস, কিন্তু পুরুষের জীবনের পুরুষার্থ নয়। প্রেমের জন্ত অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু দেওয়া উচিত নয়। ওসব মেয়েরা পারে। ওদের তো পাবলিক লাইফ নেই। আমাদের পাবলিক লাইফ আছে। আমরা একদিন বিখ্যাত হব খশস্বী হব। কিন্তু 'মুক্ত মানুষ' রত্ন শেষকালে বলল, 'প্রেম তোমাকে আমি স্বীকার করে নিলুম। আমার এই স্বীকৃতি আমাকে মুক্তি দিল। সেই সঙ্গে নিবিড় করে বাঁধল। তাই আমার এক চোখে হাসি, এক চোখে জল।'

এবার শ্রীমতীর জীবনের সমস্যার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সে বিশ্বাস করে জীবনের পরিপূর্ণতা প্রেমে এবং প্রেমের ফাঁকি মাতৃস্নেহে পূর্ণ হয় না। জীবনের সব কিছু প্রেরণার মূলে প্রেম, জীবনের সব কিছু সার্থকতার মূলে প্রেম। সে বলেছে, 'দগ্ধ হতে হতে আমার ঘোঁষন গেল। জীবনও যাবে?' যাকে ভ্রাতৃজ্ঞানে সে রাধীবন্ধু পাঠিয়েছিল, যখন প্রত্যয় হল যে সে তাই নয়, বন্ধু নয়, প্রেমিক, তখন এই প্রেমের জন্ত সর্বস্ব পণ করল। কেননা তার কাছে প্রেমই জীবন। সোনালীর জীবনের যে সমস্যা, তা হয়তো অনেকে মিলে সমাধান করতে পারে (কেননা মুখ্যতঃ সেটা সামাজিক সমস্যা), কিন্তু রূপালীর (শ্রীমতীর) সমাধান যদি কেউ করতে পারে সে জ্যোতি নয়, ললিত নয়, এমন কি তার প্রোপ্রাইটর নয়, একমাত্র রত্ন স্বয়ং।

উপন্যাসের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে, রত্নের প্রেমের স্বীকৃতিতে। দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়েছে রত্ন এবং শ্রীমতীর প্রথম দর্শনে। নায়ক-নায়িকার দেখা না হয়েই পড়ালেখা যে প্রেম আধুনিক যুগে তা প্রায় অবিদ্যমান। অবশ্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে চিত্রপট-দর্শনে, সখীমুখ শ্রবণে এবং ভাটকীর্তনে পূর্বরাগের কথা বলা হয়েছে। তবে দর্শনের পূর্বেই প্রবল অনুরাগের দৃষ্টান্ত বিরল। 'রত্ন ও শ্রীমতী'

উপল্লাসে সাধারণভাবে বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ রত্নের জীবনাদর্শের কথাই ধরা যেতে পারে। রত্নের সংশয় পরকীয়া প্রেমের যেহেতু কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই, সেজন্য হয়তো গোরী একদিন ক্রান্ত হয়ে পড়বে। পরস্পরের অদর্শনের মধ্য দিয়ে যে অকুরাগ, প্রথম দর্শনে হয়তো মনোভঙ্গ হতে পারে। তখন রত্ন ও শ্রীমতী যুগল না হয়ে যমজ হবে। রত্নের কথায় “তুমি আমাকে যে-ভাবে চাইবে সে-ভাবে পাবে। কান্তভাবে চাইলে কান্তভাবে। পতিভাবে চাইলে পতিভাবে। যতকাল চাইবে ততকাল পাবে। এক বছর চাইলে এক বছর। দশ বছর চাইলে দশ বছর। এক জীবন চাইলে এক জীবন। জন্ম জন্মান্তর চাইলে জন্ম জন্মান্তর। তুমি আমাকে ছেড়ে না দিলে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেব না। • • তোমার সঙ্গে প্রেম আমার ভাগ্যদেবীর সঙ্গে নিষুক্তি। আমার appointment with Destiny.”

শ্রীমতীর চরিত্র-চিত্রণে বৈষ্ণব প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। পরম ভক্তের মত সে প্রেমের কাছে সর্বস্ব নিবেদন করেছে—কোন সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই। প্রসঙ্গতঃ তাদের প্রথম আলাপের কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে,—

“এর পর কথা। গোরীই প্রথম বলল। মৃদু স্বরে “তোর সঙ্গে আমার প্রণয় প্রতিযোগিতা কে বেশি ভালোবাসে? তুই না আমি?”

রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে, “তুই।” বলে লজ্জায় মিলিয়ে গেল। গোরী বলল মুগ্ধের মতো “না তুই। ক্ষীরের পুতুলের মতো তুই ভালোবাসা দিয়ে গড়া। তোর সঙ্গে আমি পারি। তবে তোর কাছেই আমি শিখেছি। আমি তোর শিষ্য।”

রত্ন ধন্ত হলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, “আজ তোর সারাদিন খাওয়া হয়নি।”

গোরী সোজাসে বলল, “প্রসাদ আসবে। তুই আমার সঙ্গে খাবি।”

রত্ন সাগ্রহে বলল, “খাব। কিন্তু তোর আরতির কী হবে?” গোরী তার চোখে চোখ রেখে মধুর হেসে বলল, “এই যে। আরতি করছি।”

এমনি করে প্রতিমাভঙ্গকারী প্রতিমায় পরিণত হলো।”

রত্ন ও শ্রীমতীর প্রেম স্পষ্টতই এখানে মানবিক অসম্পূর্ণতা এবং সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। রত্নের জীবনেও আর সংশয় নেই। ‘রত্ন ও শ্রীমতী’র শুরু মানব-মানবীর প্রেমে কিন্তু স্রষ্টার জ্ঞাতসারেই ‘হোক অথবা অজ্ঞাতেই হোক আধারের বদল ঘটেছে।

‘রত্ন ও শ্রীমতী’-আরো তিন ভাগে সমাপ্ত হবে, এ-রকম অভিনায় যখন লেখক

জানিয়েছেন, তখন সম্পূর্ণ উপন্যাসটির সার্থকতা আলোচনা করার অসুবিধা রয়েছে। তাহলেও প্রকাশিত দু-খণ্ড পাঠ্যে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, রত্ন ও শ্রীমতী দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রেমের ভিত্তি কোথায়? রূপের মোহও নয়, অথবা অতিপরিচয়ের অন্তরঙ্গতাও নয়। রত্ন উচ্চাভিলাষী পুরুষ, সে 'ক্লী ম্যান' হতে চায়। প্রেমকে সে বন্ধন মনে করে। পূর্বেই বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে যে, শ্রীমতীর জীবনাদর্শ এর বিপরীত। বিপরীত ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রেম সম্ভব নয়, এরকম কোন যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে আসতে চাই না। কিন্তু তাদের প্রেম ঘনিষ্ঠ হয়েছে পরস্পর পরিচিত না হয়েই। সোনালী নামে একজন পতিতা মেয়ের উদ্ধার প্রসঙ্গে তাদের প্রথম পতলাপ; রত্নের অন্তান্ত বন্ধুর মুখে তার খ্যাতি শুনে স্বতঃপ্রসূত হয়ে সে রত্নকে চিঠি লেখে। চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি মানুষকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করবার কতটা সুযোগ রয়েছে সে কথা বিচার্য। বিবাহের পূর্বে তার স্বামী শ্রীমতীর কাছে যতটা অপরিচিত ছিলেন, প্রেম নিবেদনের সময় রত্ন কি শ্রীমতীর সঙ্গে দেহে এবং মনে তার চেয়ে বেশি পরিচিত? তাদের পরস্পরের সম্পর্কের এই অসঙ্গতি কিছুটা এড়াবার জন্য লেখক বোধ হয় শ্রীমতীর প্রেমের পটভূমি হিসেবে ভগবদ্ প্রেমের কথা বলেছেন।

'রত্ন ও শ্রীমতী'র খুব বেশি পাঠকের প্রত্যাশা লেখকের নেই। তাহলেও মনে হয় এই উপন্যাসে লেখক তত্ত্বের তুলনায় গল্পের প্রতি উদাসীন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস করি, "লিখতে বসলুম আর লেখা আপনার বেগে আপনি চলল এমন করে কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়নি।" কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে অধিকাংশক্ষেত্রে গল্পের নামে jargon-এ ভিত্তি। দর্শন বা তত্ত্ব অন্নদাশঙ্করের সব গল্প-উপন্যাসেই রয়েছে। কিন্তু তত্ত্বালোচনা তো 'সত্যাসত্যে'র ঘটনা-প্রবাহকে রুদ্ধ করেনি। এমন কি 'রূপদর্শনে'-র মত ছোট পরিসরে তত্ত্ব এবং গল্পের মিশ্রণে যে সিদ্ধি তা বিস্ময়কর। অবশ্য 'রত্ন ও শ্রীমতী'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "আমি লিখব জনগণের জন্য নয়, বিদগ্ধ মণ্ডলীর জন্য নয়, ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের জন্য। যে পাঠক আমার চোখের সামনে নেই, কোথায় আছে আমি জানি নে।"

কোন মহৎ লেখকই নির্দিষ্ট পাঠকের কথা ভেবে লেখেন না। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, অন্তিম পাঠক অর্থে কি চিরন্তন পাঠক? কেননা তিনি অন্তিম পাঠক নামে যে অধিকারীভেদ করেছেন তাতে সাধারণ অথবা বিদগ্ধ কোন

শ্রেণীর পাঠকেরই স্থান নেই। আমাদের সব সৃষ্টিই কালের পুতুল, পাঠকের মতামত তো বটেই। তবে একথাও নিশ্চয় অনস্বীকার্য, পৃথিবীর অধিকাংশ মহৎ সৃষ্টিই সমকাল-অভিনন্দিত।

সুবীর রায়চৌধুরী

সমাজ ও ইতিহাস—সুশোভন সরকার। প্রকাশক—বাক, কলিকাতা।
দাম ৩ ৫০

বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের দুর্বল অঙ্গগুলোর মধ্যে একটা হল ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্র। ভারতবর্ষে ইতিহাসকার প্রচুর আছেন কিন্তু ষথার্থ ঐতিহাসিকের সংখ্যা খুবই অল্প। ইতিহাস শুধু ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধ বিবরণমাত্র নয় এবং ঘটনাসংগ্রহ, ঘটনানির্বাচন, বস্তুসংস্থান, বিচার, বিশ্লেষণ-অনুধাবন প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে একটি যুক্তিসঙ্গত এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তের উপস্থাপনই প্রকৃত ঐতিহাসিকের অন্তর্গত। এই সাধারণ সত্যটি আমাদের দেশের অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরা হৃদয়ঙ্গম করেন না, আর কেউ কেউ মনে মনে মেনে নিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন না। তাঁরা এখনও অবধি কেমব্রিজ ইতিহাসমালার আদর্শেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, শুধুমাত্র fact-এর পসরা সাজিয়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন এবং “প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মতনই তার জন্ত তাঁদের কোন ক্ষোভ নেই।” এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের “সমাজ ও ইতিহাস” বইখানি নিঃসন্দেহে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগদর্শনের সূচনা করবে। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধমালার সমষ্টি হলেও বইখানিতে সামগ্রিকভাবে ইতিহাস-বিচারের একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নের সন্মুখীন হই, তা হল ইতিহাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত। ইতিহাসের প্রকৃত রূপ কি? ঐতিহাসিক আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝি? ঐতিহাসিক দায়িত্ব কতটুকু? তাঁর যুক্তি বা সিদ্ধান্তের সারবস্তাই বা প্রমাণিত হয় কি ভাবে? এই প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়েছে “অতীত ও বর্তমান” এবং “আলোচনা” শীর্ষক প্রবন্ধসমষ্টিতে। অধ্যাপক সরকারের মতে ইতিহাস বিচারের তিনটি স্তর আছে, তথ্যসংগ্রহ ও

নির্বাচন, মূল্য বিচার ও নানা ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, কারণ নির্ণয় ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচার। ঐতিহাসিক সামাজিক জীব এবং তাঁর ধারণা ও যুক্তির আদর্শ তিনি যে আজ-কাল-শ্রেণীভুক্ত তার থেকেই উদ্ধৃত। সুতরাং তাঁর একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য এবং তারতম্যের মধ্য থেকেই ঐতিহাসিক বিচারের মানদণ্ডের জন্ম। অনেকের ধারণা যে ঐতিহাসিককে পুরোপুরি objective হতে হবে এবং আদালতের বিচারকের মতই তাঁকে রায় দিতে হবে, যাতে করে তাঁর সিদ্ধান্ত হয় অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। এই যুক্তির অসারতা সহজেই ধরা পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস-দর্শন থেকে উদ্ভূত এবং ইতিহাসে মধ্যযুগীয় teleology এর উৎস। এসম্পর্কে অধ্যাপক সরকারের অনূজ-কথিত মন্তব্য স্মরণীয় : *The Indian historical scholarship is still obsessed with the ghost of Ranke.*” ইতিহাসে objectivityর ধারা সমর্থক তাঁরা ভুলে যান যে, কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে objective হয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না, কারণ যে কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিই হল বিচার ও বিশ্লেষণ এবং এর মধ্যেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

ইতিহাস আলোচনায় যদি আমরা নৈব্যক্তিক বস্তুসাপেক্ষতা অবলম্বন করি, তাহলে আমাদের নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বিবরণী দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ করতে হবে। ঘটনা বিশ্লেষণ, কারণ নির্ণয় এবং ফলাফল নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের নীরবই থাকতে হবে। বলা বাহুল্য এই আদর্শগ্রহণ কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই কাম্যও নয়। সম্ভবও নয়। Thucydidesএর মত মহা-প্রতিভাশালী ঐতিহাসিকের objectivityও ততক্ষণ অবধিই সম্ভব ছিল যতক্ষণ তাঁর ব্যক্তিগত patrician আদর্শের সঙ্গে Athenian গণতন্ত্রের আদর্শের সংঘাত বাধেনি। এমন কি সভ্যতার আদি যুগে, যখন ঐতিহাস শুধু বংশতালিকার পর্যায়ে ছিল, তখনও মিশরীয় ও সূমেরীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় ধর্মীয় ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হল আজকের যুগের নানা জটিল ঘটনাবিবর্তনের মধ্যে যে-কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই জ্যোতিষীর কতোয়া জারী করবার চেষ্টা দুঃসাহসিক তো বটেই অবৈজ্ঞানিকও। তবে একটা প্রশ্ন আসে যে, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটি সর্বজনগ্রাহ্য তা কিতাবে নিরূপণ করা সম্ভব? এখানে অধ্যাপক সরকারের মত হল যে যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নানা দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে

আমরা ইতিহাসে মূল্যবিচারের শেষ স্তরে এসে পৌঁছই যদিও বিজ্ঞানের মত “ইতিহাসে সত্যের সন্ধান approximation মাত্র।” এখানেই অবশ্য উত্থাপিত হয় আসল প্রশ্নটি বা লেখকের এত সারগর্ভ যুক্তিবহুল আলোচনার পরও মনকে ঘিরে থাকে। সমস্ত সত্যই এবং ঐতিহাসিক সত্যও কি অবিভাজ্য নয়? এ প্রশ্ন শুধু ইতিহাসে ঘটনাসংগ্রহের ক্ষেত্রেই নয়, ঘটনার চরিত্রবিচার সম্পর্কেও বটে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা। এই ঘটনার তথ্যে বর্তমানে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু ঘটনার চরিত্রবিচারে ঐতিহাসিক মহল দ্বিধাবিভক্ত। একদলের মত এটা প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন এবং অপর দলের মত এটা প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এখন এই ঘটনার চরিত্র-বিচার সম্পর্কিত এই দুটি তত্ত্ব নিশ্চয় একযোগে সত্য নয় এবং এর মধ্যে একটি সত্য। এখন ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের এই স্তরটিতে কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে এবং ঠিক সত্যটিই বা কিভাবে নিরূপিত হবে? এ সমস্যার প্রাঞ্জল আলোচনা অধ্যাপক সরকারের গ্রন্থে নেই। অবশ্য এসম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা খুবই কঠিন এবং হয়তো এ প্রশ্নটি ঐতিহাসিকদের চিরকালই বিব্রত করবে। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের রূপ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে বাস্তব জীবনের নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ঘাত-প্রতিঘাতের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মাধ্যমে ঘটনাস্রোতের সাধারণ রূপ-নির্ধারণই ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য।

ইতিহাসের রূপ ও উদ্দেশ্যবিচার থেকে আমরা আসি ইতিহাসের প্রধান নির্ধারিকা শক্তিগুলির বিচারে। জড়জগতে যেমন energy বস্তুর গতিপ্রকৃতির কারণ, ইতিহাসের গতিনির্ধারণেও তেমন কয়েকটি শক্তি কাজ করে। আমরা ইতিহাসে দেখি যে একটি সভ্যতার উদয় এবং আর একটির পতন এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে চলে। কিন্তু কেন এই রূপান্তর হয়? এই রূপান্তরের পেছনে কোন্ শক্তিই বা কাজ করে? এখানে অধ্যাপক সরকারের মত এই যে সমাজের গতি ও পরিবর্তন কোনটাই যান্ত্রিক কিংবা আকস্মিক নয়। মানুষের ইতিহাস গড়ে ওঠে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেগুলি সমাজ জীবনের বাইরের কোন শক্তির সাক্ষাৎ ফল নয়। আবার তাদের আকস্মিক কিংবা ব্যক্তিবিশেষের খেলায় হিসেবেও ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের কাজের পিছনে থাকে বাস্তব অবস্থার চাপ। ইতিহাসে সেই বাস্তব অবস্থার অনুশীলনই কাম্য।

আলোচ্য গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল “টয়েনবির মতামত”। ইতিহাসে Toynbee-র অবদান অসামান্য হলেও, তাঁর রচনা আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে অপঠিত। যদিও Toynbee-কে নিয়ে পল্লবগ্রাহিতার মোটেই কমতি নেই। অধ্যাপক সরকার যে রকম সুন্দরভাবে Toynbee-র মতামত ব্যাখ্যা করেছেন তার জন্য তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসানুরাগী পাঠক সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। টয়েনবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সভ্যতার উত্থানপতন, বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে তুলনামূলক বিচার, একটি সভ্যতার জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নতুন সভ্যতার উপাদানের সৃষ্টি এইসব সম্পর্কে Toynbee ব্যাপক আলোচনা করেছেন তাঁর মহাগ্রন্থ “A Study of History”-তে। যদিও Toynbee-র সঙ্গে মূল বিষয়ে অধ্যাপক সরকারের মতপার্থক্য আছে এবং তিনি সভ্যতার গতিনির্ধারণে টয়েনবির ব্যাখ্যাকে অযথা ধর্মভাবাপন্ন এবং বস্তুনিষ্ঠ নয় বলে মনে করেন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইতিহাস বিচারের যে “tour de force” টয়েনবি সৃষ্টি করেছেন, সে জন্য তাঁর প্রতি অধ্যাপক সরকার শ্রদ্ধাশীল। অবশ্য এখানে একটা কথা আছে। সভ্যতার গতিবিচার সম্পর্কে Toynbee-র আলোচনা খুবই ব্যাপক ও মৌলিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একেবারে প্রথম এ কথা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যের দিকে ১৮৬০-৭০ সালে রাশিয়ার ঐতিহাসিক Danilevsky সভ্যতার গতি সম্পর্কে কিছু গবেষণা করেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে টয়েনবির চিন্তার পূর্বাভাস তাঁর লেখায় দেখতে পাই। এটি অধ্যাপক সরকার উল্লেখ করেননি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

বর্তমান আলোচনায় “সমাজ ও ইতিহাসে”র যেসব প্রবন্ধে ইতিহাসের প্রকৃতি ও সাধারণ সূত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সেইগুলিরই বিস্তারিত আলোচনা করা হল। অগ্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে অপেক্ষাকৃত পরিচিত বিষয় যেমন “ফ্যাসিজমের প্রকৃতি” “সমাজতন্ত্রের মূল সূত্র” প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা আছে এবং এই প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংযোজনের কারণ ভূমিকাতেই সম্পূর্ণ। এবার দু-একটি কথা বলেই এই নিবন্ধের উপসংহার করি। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীর ইতিহাস আলোচনায় “ইতিহাসে যুগ বিভাগ” সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক সরকারের সিপাহী বিদ্রোহের মূল্যায়ন এবং Spengler-এর ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রবন্ধ দুটি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলো স্থান পাবে।

পরিশেষে জানাই যে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের প্রতিভার অসামান্যতায় আমরা যতখানি গবিত, তাঁর প্রতিভার মিতব্যয়িতায় আমরা ঠিক ততখানিই ব্যথিত।

মৃগাক্ষশেখর রায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ। প্রকাশক—গ্রাশনাল 'বুক এজেন্সি লিঃ, কলিকাতা। দাম ৪.০০।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিকের লেখা পাঁচটি গল্প আছে এই সংগ্রহটিতে। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামে যে গল্পের বইটি অনেক দিন আগেই নিঃশেষ হয়েছিল সেই বইয়ের সব কটি গল্পও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের মানিকবাবুর লেখা ছোট গল্পের এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ।

সময়ের পটভূমিটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আমাদের দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনার আবর্তে বিপ্লব-কালীন সময়ের মত দেশের মানুষের চেহারাও একেবারে পালটে গেছে। মানুষের রীতি-নীতি-সংস্কার, ভয়-ভাবনা-চিন্তা—কোন কিছুই পুরনো ধারায় টিকে থাকতে পারেনি। নতুন ধরনের চালচলন, নতুন ধরনের মেজাজ এবং নতুন এক আদর্শ নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন একদল মানুষ; 'বাগদিপাড়া দিয়ে' গল্পের ছলে যাদের বলছে 'সজ্জাত'; যারা বলে, 'বস্তাও সংসার পাণ্টে গেছে, বায়নের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিধিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস্। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন? না, তারা চোর ছ্যাচড়। কেন? না, যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।' জাত-বিচারের এই নিরিখটি আমাদের দেশে বিশেষভাবে মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এই সময়কালের সব চেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে এই দুই জাতের সরাসরি লড়াই। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্প এই শ্রেণী-সংগ্রামেরই উজ্জল চিত্র।

শ্রেণী-সংগ্রামের উজ্জল চিত্র বলতে এই নয় যে মিছিল ধর্মঘট আর শ্লোগান দিয়ে গল্পগুলো তাতানো। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মানুষগুলো বেরিয়ে

এসেছে তাদের বিশেষ মানসিকতাকে এক একটি গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। আমার তো মনে হয়, পুরো একটি মিছিলের বর্ণনা দেওয়ার চেয়ে মিছিলের বিশেষ একটি মানুষের বর্ণনা দেওয়া অনেক বেশি শক্ত। মানুষটির সঙ্গে এবং মানুষটি যে মিছিলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে সেই মিছিলের ভাবধারা ও কর্মধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে এই দুর্কর কাজে সাফল্য সম্ভব নয়। তা ছাড়াও কথা আছে। গোকিকে যেমন একটি উপন্যাস শেষ করায় জন্তে বিপ্লবোত্তর কালের জন্তে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তেমনি আমাদের দেশেও বোধ হয় এই নতুন মানুষদের নিয়ে মহৎ গল্প-উপন্যাস রচনা করার জন্তে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে। সেই ঐতিহাসিক কালের সূচনা হবার আগেই মানিকবাবুর অকালমৃত্যু হয়েছে। তবুও তাঁর হাত থেকে আমরা ষতটুকু পেয়েছি তার মূল্য বড় কম নয়। আগামী দিনের সাহিত্য তাঁর গড়া এই ভিত্তিভূমির উপরেই খাড়া হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কালোস্তীর্ণ সাহিত্যিক।

এই সংগ্রহটিতে যে সব গল্প আছে তাদের পাত্রপাত্রীরা পুরোপুরি এ যুগের মানুষ। এবং সেজন্তেই নতুন মানুষ। কোন্ দিক থেকে নতুন? নতুন তাদের দুর্নিবার ঘৃণায়। ঘৃণা কেন? না ঘৃণা হচ্ছে ‘প্রচণ্ড মহৎ হৃদয়াবেগ’। এতদিন পর্যন্ত এই ঘৃণাকে ‘অনেক কায়দায় বিপথে উল্টো দিকে চালিত করে ঘরে ঘরে ভুল-বোঝা অশান্তি আর হতাশা’ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারে ঘৃণা মুক্তি পেয়েছে, ঘৃণায় উজ্জীবিত হয়েছে ‘সজ্জাত’ মানুষ। প্রচণ্ড ভাবে ঘৃণা করতে পারে বলেই প্রচণ্ড তাদের যাঁচার কামনা, ক্ষমাহীন তাদের যাঁচার লড়াই। তারা তাই অন্য ভাবে কথা বলে, অন্য ভাবে চলে, অন্যভাবে ভালবাসে। এই রূপান্তরিত মানুষেরই বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্পে।

ঘৃণায় উজ্জীবিত মানুষ বলতে এই নয় যে মানুষগুলো সব সময়ে মার-মার কাট-কাট রব তুলে বুনোমোষের মত একরোখা ছুটছে। সাধারণ মেহনতী মানুষ এবং তাদের রোজকার জীবন, যে জীবনে খাওয়া-খাকা-পরার জন্তে সব সময়ে লড়াই করে চলতে হয়। এই মানুষরাও কোথাও হান্ধামা হয়েছে শুনলে সেখানকার আত্মীয় স্বজনের কুশল সংবাদ জানার জন্তে উদ্বিগ্ন হয়, হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে রেশন আনার জন্তে ধার করতে ছোট্টে, অসুখ হলে চিকিৎসার কথা ভাবে। কিন্তু তবুও উঁচিয়ে-ধরা বেঅনেটের সামনে দাঁড়িয়েও এরা ভয়

পাওয়া যুখ বুজে মার খাওয়া মানুষ নয়। বেঁচে থাকার জন্তে কারও কৃপাপ্রার্থী নয়। নিজেদের বাঁচার দাবিতে নিজেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

ছোটবকুলপুরের যাত্রী দিবাকর যাত্রীশূন্য স্টেশনটার দিকে তাকিয়ে বোঁকে বলে, দেখলি ব্যাপার? বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কি? হাকামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি খেটার হবে? হাবার মত দাঁড়িয়ে থেকে নি, যাই চলো।' তারা দুজনে এগিয়ে চলে এবং এই চাষাভুষা ধরনের মানুষ দুটোকে ভয় না পেতে দেখে ভয় পেয়ে যায় বন্দুকধারী পাহারা ও খন্দরধারী তদারককারীর দল।

বাগদিপাড়ার মাতব্বর ছিলে যখন দেখে ছপুরের প্রচণ্ড রোদে শ-খানেক বাগদি মেয়ে পুরুষ কোদাল খস্টা নিয়ে ঠাকুরের খান খুঁড়ছে, তখন উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে সে চিৎকার করে, 'সকোনানশ হবে, সকোনানশ হবে! ঠাকুরের খানে কোদাল ছোঁয়ালি?.....পালা! পালা সব! কস্তাবাবুকে খবর দিয়ে এসেছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা! সকলে এক মুহূর্তের জন্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। ছলানী কচি বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাতধর্ম সব নষ্ট করেছে। খস্টা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়ো তোর মরণ নাই? খপর দিছিস? বজ্জাতি করে খপর দিছিস? ছলানীর খস্তার খায়ে মাথা কেটে ছমড়ি খেয়ে পড়ে ছিলে। রক্তে তার রক্ত চুল চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের খানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে ছলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

এমনি মানুষ মেজাজ গল্পের ভৈরব, প্রাণাধিক গল্পের অবনী, ঘর করলাম বাহির গল্পের পশুপতি, সখী গল্পের বিভা ও রানী, নীচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্ত গল্পের দুর্গা, এবং আরো অনেকে। মানুষগুলো অসাধারণ কোন বীরত্বের কাজ করেছে তা নয়। শুধু তাদের বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটেছে এবং যে কাজটি করা উচিত বলে বুঝতে পারছে সে কাজে পিছু-পা হচ্ছে না। এই জন্তেই নোটন মিস্ত্রীর মেয়ে দুর্গা ভাবতে পারে, 'কি আর এমন লাভ হবে এই লোকটাকে আর তার লড়াইটাকে ভেঙে দিয়ে? কোন্ স্বার্থটা বজায় থাকবে তার? তার চেয়ে কোন রকমে সেই যদি চালিয়ে নিতে পারে কিছু দিন, সেও রইল তার এই মানুষটাও রইল তাদের ভবিষ্যতটাও রইল।' এই ভেবে বিনোদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে দুর্গা স্নানালোর

আস্তানার দিকে এগোয়। যে স্তম্ভলাল কালও তাকে বড়বড় চোখে দেখেছে, নোট দেখিয়েছে। বাঁচতে হলে লড়াই না করে উপায় কি?’

আবার এর উল্টো দিকের ছবি পাওয়া যায় ‘কালো বাজারের প্রেমের দর’ গল্পে। গল্পের প্রথম লাইন হচ্ছে এই : ‘ধনঞ্জয় আর লীলার মধ্যে গভীর ভালোবাসা’। তারপর কিছু কালোবাজারের লেনদেন। তারপরে গল্পের শেষ কটি লাইন : ‘লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভাবছি। কাল আমরা বিয়ে করতে চাইলে কারো সাধ্য আছে ঠেকায়? কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ নই। বিয়ে নয় হল, তারপর? তোমার আমার দুজনেরি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কোন লাভ নেই। ধনঞ্জয়ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি লাভ নেই।’

এমনি আরেকটি গল্প ‘চিকিৎসা’। চোরা বাজারে টাকা কামিয়ে যারা বাড়ি গাড়ি করে তাদের ড্রইং রুমের হাসির ছল্লোড়ের পেছনে যে কী ভণ্ডামি ও নোংরামি লুকিয়ে থাকে তারই একটা দগদগে ছবি এই গল্পটি।

‘নীচু চোখে দু’আনা আর দুপয়সা’ গল্পটিতে ফুটে উঠেছে একদিকে দু’আনা পয়সার জন্তে বস্তির মানুষদের খোলাখুলি কথা কাটাকাটি ও গায়ে হাত তোলা আর অন্যদিকে দুপয়সার হিসেবে নিজেরই গুণ্ডগোলের জন্তে মধ্যবিস্ত বাবুর ঝাঁঝালো গৌসো ও মারাত্মক অসহযোগ। এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক গল্প এমন কি মানিকবাবু নিজেও খুব কম লিখেছেন।

গল্পগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন প্রখর ও ধারালো, বলার ধরনের দিক থেকেও তেমনি বিশিষ্ট ও অসাধারণ। কোথাও একটি কথাও ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা নেই, কোথাও ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস বা ভাবানুতা নেই। আজকের দিনের সমাজের চেহারা যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ—মানিকবাবুর গল্পও তাই। বরং জায়গায় জায়গায় যেন মনে হতে পারে যে মানিকবাবু যেন অনেক কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছেন, গল্পের সমস্ত সূত্রকে ধীরেস্থলে হাজির করার ধৈর্য তাঁর নেই। আমার মনে হয়েছে, যে সব মানুষকে মানিকবাবু তাঁর গল্পে হাজির করেছেন সেই মানুষগুলোর মধ্যেই এমন একটা অস্থিরতা রয়েছে যে তাদের নিয়ে নিটোল ও ভরাট গল্প লেখার চেষ্টা মানিকবাবু সচেতন ভাবেই করেননি। মনে হয়, মানুষগুলোর জীবনে দুঃদণ্ড জিরিয়ে নেবার অবকাশটুকুও নেই। বড় বেশি তাড়াহুড়ো, বড় বেশি ওলোটপালোট। এ অবস্থায় নিতান্ত দরকারী কথাগুলো খুব সংক্ষেপে সেরে না নিলে দ্রুত ধাবমান জীবনের সঙ্গে তাল রাখা যাবে না

যেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বস্তির মেয়ে দুর্গার শরীরে নতুন যৌবনের জোয়ার এসেছে—এমন একটা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়েও মানিকবাবু কালক্ষেপ করতে রাজি নন। মাত্র একটি লাইনে তিনি ঘটনাটিকে উপস্থিত করেছেন : ‘দুর্গার বুক পিঠ গাঙ্গা থেকে সমস্ত শরীরটা অল্পদিনে বর্ষাকালের কলাগাছের মত পুরস্কৃত ও বাড়স্কৃত হয়ে ওঠায় মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেল।’ তেমনি আরেকটি গল্প ‘প্রাক-শারদীয় কাহিনী’। সাধারণ ভাবে যাকে বলা হয় গল্পের উপসংহার তা এই গল্পে নেই। বন্টার তোড়ে ঘরের চালা ভেসে যাবার পরে নবর মা পাগলিনীর মত চিৎকার করে বলে, আয় পিসী, সবাই মিলে বন্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। মরে গেলেই তো ফুরিয়ে গেল। পিসী আরও গলা চড়িয়ে বলে, বড্ড তুই নরম মানুষ, নইলে এ দশা হয়? চালাটা পড়ে গেছে, উপায় কি! পায়ের নীচের মাটি তো সরে যায়নি।’ গল্প এখানেই শেষ। তারপরে আছে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য। সেই মন্তব্যে নিতাস্তই সাদামাটা ভাবে জানানো হয়েছে যে গল্পের মানুষগুলো সবাই সেই বন্টায় মারা গেছে। এ ধরনের গল্প পড়ে পাঠকের মনে হয়তো কিছুটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কিন্তু একথা আমরা যদি মনে রাখি যে যে-যুগে আমরা বাস করছি সে যুগে মানুষের জীবনটাই অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণতা নিয়ে আসার লড়াইয়ে সামিল হওয়ার মধ্যেই সে জীবনের সার্থকতা তাহলে স্বীকার করতে হবে মানিকবাবুর গল্পে আমাদের যুগের সত্যিকারের চেহারাটি ফুটে উঠেছে। অল্প কথায়, আমাদের যুগকে বুঝতে হলে মানিকবাবুর লেখা পড়া চাই। আর এখানেই সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি কখনো সমকালীন যুগ থেকে পিছিয়ে থাকেননি।

অমল দাশগুপ্ত

বিষের বাঁশী, পূবের হাওয়া, নতুন চাঁদ, মরু ভাস্কর, যুগবাণী।

রচনা—কাজী নজরুল ইসলাম। নবপর্ষদের শোভন সংস্করণ।

পরিবেশক—স্টাণ্ডার্ড পাবলিশাস, কলিকাতা—১২। দাম যথাক্রমে ২.৫০, ১.৫০, ২.০০ ২.৫০ এবং ২.০০

বাংলা দেশের কাব্যমোদী সমাজের কাছে নতুন করে নজরুলের পরিচয় দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। তবে নজরুলের মত কবির কাব্য সস্তারের আলোচনা

করার সুযোগ পেয়ে আনি গবিত বোধ করছি। নজরুলের মত প্রতিভাবান কবির কাব্যরাজীকে নতুনভাবে শোভন সংস্করণে প্রকাশিত করে প্রকাশক নিঃসন্দেহে বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

নজরুলের সঙ্গে বাইরের কোন কবির তুলনা করা যায় কিনা এ-কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই ইংরেজ কবি বাইরণের নাম মনে পড়ে। বাইরণের মতই তাঁর স্বাধীনতার রোমান্টিক কামনা শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব-মুক্তির চিন্তাতেই ব্যাপ্ত ছিল না, জরাজীর্ণ সমাজ-দেহের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সাধনের প্রয়োজনও অনুভব করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্যর্থতার ফলে তিনি কল্লোলীয়দের মত স্বাধীনতার চিন্তাকে এক অসম্ভব চিন্তা বলে ধরে নিয়ে তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেননি, বা শেলীর মত স্বাধীনতার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করে নিজের গোপন কল্পনা-সৌধে স্বাধীনতার এক আদর্শ মূর্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেননি। বাইরণের মতই নজরুল স্বাধীনতার বাস্তব সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেছেন, এবং রাজনৈতিক ভেদ-বিভেদের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও সৃষ্টি নীতি গ্রহণ করে কোন কঠোরতর রাজনৈতিক কর্মপন্থাকে অবলম্বন করার জন্তু দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। একটি বিধি-বহির্ভূত প্রেমের শরিক হওয়ার ফলে বাইরণ স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। বিধি-বহির্ভূত প্রেমের চেতনা নজরুলের মধ্যেও প্রবল ছিল, এবং যে সমাজ নিজে আকর্ষণ নীচাশয়তা এবং অমানুষিকতার পরিপূর্ণ সেই সমাজ তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে এই ক্ষোভ তাঁকে সমাজ বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছিল, যেমন করেছিল বাইরণকে। বাইরণের মতই তাঁর কাব্যে সঙ্গীতময়তার অভাব, যেমন অভাব রক্ত ব্যঙ্গনার এবং রূপকল্পের। তেমনি বাইরণের মত তিনি কাব্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব বীর্ষ ও পৌরুষের অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। বাইরণের একটি জিনিস শুধু নজরুলের মধ্যে পাওয়া যায় না—তীব্র শ্লেষ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজ-বিশ্লেষণ। তীব্র বিশ্লেষণ ক্ষমতার অভাবের দরুনই নজরুলের বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছে।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল আরও একটি কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি তাঁর কাব্যের একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। উভয় ঐতিহ্যের মধ্যেই যে সব জিনিস কবি-মানসে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে তা তিনি নিবিবাদে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পক্ষেই এ কাজ সম্ভবপর ছিল, কোন হিন্দু কবির পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও এ জাতীয়

প্রচেষ্টা অসম্ভব ছিল। অবশুর্গনের বেড়া ডিঙিয়ে কোন হিন্দু কবির পক্ষে কোন মুসলমানের অন্দরমহলের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু নজরুল অনায়াসে হিন্দু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসতে পেরেছেন। কোন সমাজের বর্তমানকে নিবিড়ভাবে না অনুভব করতে পারলে তার ঐতিহ্য চেতনায় ধরা পড়ে না, এবং এই নিবিড় সাহচর্যের অভাবেই হিন্দু লেখকদের কাব্যে সাহিত্যে মুসলমান সমাজের পরিচয় উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত হয়নি।

হিন্দু-মুসলিম মিলিত ঐতিহ্যকে নজরুল কাব্যানুভূতির মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি যখন ঐক্যবদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন তখন তার মধ্যে এক অসাধারণ আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই আন্তরিকতার দরুনই এ দেশের এত সাম্প্রদায়িক হলাহলের মধ্যেও নজরুল আজও উভয় বক্ষে সমানভাবে আদৃত। নজরুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই একটি দুর্লভ সম্পদ এবং উভয় ভারতের বাসিন্দাদের কাছেই তা অত্যন্ত মূল্যবান।

নজরুলের কবিতাকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দেশাত্ম-বোধক, প্রেমমূলক এবং আধ্যাত্মিক। দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির জন্মই তার ধ্যান্তি সবচেয়ে বেশি, এবং তা আদৌ অকারণ নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের পরে এতখানি জাতীয় উদ্দীপনাময় কবিতা (যে-গুলোকে গান হিসাবেও গাওয়া চলে) নজরুলের আগে বা পরে আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ভারত-বন্দনা এবং দেশ-প্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে। অধিকতর সংগ্রামশীল যুগের নজরুলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান এবং আত্মবিশ্বাসের বাণী প্রবল হয়ে উঠেছে। ‘মন্দির আজ বন্দীর ঘানি’, ‘রক্ত মদের বিষ পান করি’, ‘শিকল পরা ছল রে মোদের শিকল পরা ছল’,—প্রভৃতি রূপকের মধ্যে আমাদের বিশেষ পদ্ধতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক অভূতপূর্ব মহত্ত্ব এবং আবেগঘন রূপ দান করা হয়েছে। মরণকে তুচ্ছ করে, স্বাধীনতার কামনা যে ভগবানের আশীর্বাদ-পুষ্ট এ কথা মনে রেখে, ভীতি বিধা অবিশ্বাসকে দূর করে অগ্রসর হওয়ার জন্ম কবি আহ্বান জানিয়েছেন। রোমাঞ্চিক কবির কাছে অবিশিষ্ট স্বাধীনতার কোন স্পষ্ট রূপ নেই; স্বাধীনতার ঐকান্তিক কামনাটাই শনিবিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছে। তাঁর বিজোহী কাব্য-মানসের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তাক্ত সত্মাসবাদের পথের আকর্ষণটাই বেশি

ছিল ; কিন্তু তিনি ‘চরকার গান’ নিয়ে বা গান্ধীর কারাবরণকে (‘গান্ধী হটক বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়’) উল্লেখ করেও কবিতা লিখেছেন । মনে হয় পথের বাছ-বিচারের চেয়ে সংগ্রামের গরজটাই তাঁর কাছে বড় ছিল । একমাত্র জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে (‘জাতের বজ্রাতি’) এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্ত (‘চরকার গান’) তিনি বিশেষ সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছেন ।

তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাবলীর মধ্যে ‘অগ্নিবীণা’র কবিতাগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ । তাঁর ‘বিষের বাণী’ অগ্নিবীণারই পরবর্তী ধণ্ড, এবং উভয় বইয়ের কবিতাগুলিরই মূল সুর প্রায় একই ।

স্বাধীনতার যেমন কোন স্পষ্ট রূপ কবির মনে নেই, তেমনি বিদ্রোহের প্রকৃতি কি বা তার রূপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও কবির মনে কোন স্পষ্ট চেতনা নেই । কবি-মানস যেন সর্বধ্বংসকারী বিদ্রোহের এক ভাব-রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে ; এই আত্মপ্রকাশের তীক্ষ্ণতার মধ্যে কবি অনুভব করছেন :

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান ;

অথবা

অষ্টার বুকে আমি সেইদিন প্রথম জাগানু ভীতি ।

(অভিশাপ)

এই বিদ্রোহ চেতনার মধ্যে কবি নিজেকে ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করছেন ।

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড় ।

অথবা কবির মনে হয়েছে । —

নাগমাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্রক্ষণা নাগ ভীষণ তরুণ শিশু ! (ঝড়)

কবি যে নিজের বিদ্রোহী-সত্তাকে একবার ‘অভিশাপ’ বলে আবার ‘নাগ শিশু’ বলে বর্ণনা করছেন, এর মধ্যে কবির মনের সামাজিক অনুশাসনসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেতনাটি সংগুপ্ত রয়েছে । কবির প্রেমের কবিতাগুলি পড়লে এ ধারণা আরও স্পষ্ট হবে ।

কাব্য-ছন্দের দিক থেকে নজরুলের স্বকীয়তা তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাতে সর্বাধিক পরিস্ফুট । বীর্ষ এবং পৌরুষ এই গতিময় ছন্দের বিশেষত্ব । এবং এই নতুনত্বটুকু আমদানি করে তিনি অজ্ঞাতসারে বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র পরবর্তী রূপান্তরের পথ-সৃষ্টি করেন । নজরুলের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব নগণ্য বলেই মনে হয় । তাঁর অন্যান্য কবিতায় তিনি অনেক সময় প্রাক-রবীন্দ্র ছন্দ ব্যবহার করেছেন ।

‘পূবের হাওয়া’ কাব্য গ্রন্থে আমরা প্রেমিক নজরুলের সাক্ষাৎ পাঠি ; প্রেমের বিভিন্ন অনুভূতি, অভিসার যাত্রা, মান ভঞ্জন, মিলন, বিচ্ছেদ-জ্বালা প্রভৃতি বিভিন্ন কবিতায় কাব্যময় রূপে কবি উপস্থিত করেছেন। লক্ষ্যণীয় এই যে, কবির প্রেম সোজাসুজি শরীরী কামনায় ভরপুর, এবং এ-জন্য ‘কড়ি ও কোমলে’র রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর মনে কোন ঘানি নেই। এখানে তিনি কল্লোলীয়া লেখকদের সমগোত্রীয়। যেমন,

‘জড়িয়ে ছিলে লতার মত আলিঙ্গনে গো !

আমি চুমায় চুমায় ডুবাবো এই সকল দেহ মম—

ওগো শ্রাবণ-প্লাবন সম ! (স্নেহ পরশ)

কবির প্রেম-কল্পনায় বিরহের সুরটিই প্রাধান্য অর্জন করেছে। বিদেশ-যাত্রা বা মরণ বা আর কোন কারণে বিচ্ছেদের চিন্তায় বা ব্যথায় কবির মন ব্যথাতুর। ‘দূরের পথিক’, ‘বিদায় বাঁশী’, ‘নিরুদ্ধেশের যাত্রী’ প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

‘পূবের হাওয়া’য় কবির প্রেম ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি নিবদ্ধ, কিন্তু ‘নতুন চাঁদে’ তাঁর প্রিয়া নশ্বর দেহের সীমা অতিক্রম করে কালজয়ী ‘চিরজনমের প্রিয়া’র রূপ গ্রহণ করেছে। জন্ম জন্ম ধরে তিনি তাঁর প্রিয়াকে বারবার লাভ করেছেন এবং হারিয়েছেন :

বারে বারে মোর জীবন প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে প্রিয়া !

নেভেনি আমার নয়ন তোমাতে দেখিবার আশা নিয়া।

(চির-জনমের প্রিয়া)

তাঁর এই যুগ-যুগ সঞ্চারিত প্রেম বা বৃহত্তর প্রকৃতির মধ্যেও প্রতিধ্বনিত, তাই কবির মনে কাব্য-রস এবং সৌন্দর্য-ভূষণ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে :

যত রসধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে

তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে।

(আমার কবিতা তুমি)

প্রেমের আবেগ সৃষ্টির আবেগে রূপান্তরিত হওয়া—রোমান্টিক কবির অভিজ্ঞতায় এ অতি স্বাভাবিক ঘটনা। ‘আমার কবিতা তুমি’ ‘নিরুদ্ধ’, ‘সে যে আমি’, প্রভৃতি কবিতার মধ্যে নজরুলের রোমান্টিক কাব্য-প্রকৃতি এক অসাধারণ ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কবির কল্পনার মধ্যে যুগ-যুগান্ত, ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি, সৃষ্টি-বৃহত্ত প্রভৃতি যাকে এক কথায় বিশ্বকল্পনা বলা চলে তা ধরা পড়েছে।

‘মরু ভাস্কর’ বইখানিতে কবির কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা সংযোজিত হয়েছে। কবিতাগুলির আকর্ষণ এইখানে যে এদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের দীর্ঘ ঐতিহ্যের অনেক কাহিনীকে কবি কাব্যরূপ দান করেছেন। অবিশ্রী হজরতের জীবন-কাহিনীর বর্ণনাও প্রাধান্য লাভ করেছে।

‘যুগবাণী’ বইটি কতকগুলো প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলো দেশাত্মবোধক এবং এই জাতীয় কাব্যগুলিরই সমগোষ্ঠীয়। প্রবন্ধগুলির ভিতর দিয়ে আমরা যে কবি নজরুলের ভিন্নতর প্রতিভার কোন আভাস পাই তা নয়; বরং গণের মাধ্যমে কবি তাঁর কবি-প্রকৃতিকেই নতুনভাবে উপস্থিত করেছেন। নজরুলকে পুরোপুরি বোঝার জন্য এই প্রবন্ধগুলো পড়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যের এক দিক-পরিবর্তনের সময়ে নজরুল এসেছিলেন। কল্লোল-কালীনদের তিনি সমসাময়িক। বিশ্লেষণ-বিমুখতা এবং অসহিষ্ণু রোমাণ্টিকতা, যা কল্লোলীদের বিশেষত্ব ছিল, তা নজরুলের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। আবেগসর্বস্ব, এবং যাকে careless artist বলা হয়, নজরুল তাই। নিজের সৃষ্টিকে দিনের পর দিন চেষ্টার ভিতর দিয়ে পরিমার্জিত করে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার দিকে তাঁর নজর ছিল না; তাই আধুনিক বিচারশীল সমালোচকের কাছে তাঁর ভাষার বন্ধুরতা বা তাঁর রূপকল্পের স্থূলতা মাঝে মাঝে চোখে লাগতে পারে; তবু বাংলা কাব্যে তিনি একটা নতুন স্বাদ দিতে পেরেছেন—এবং তার স্থায়ী মূল্য আছে বলে অনুমান করি। সর্বোপরি, নজরুলের সত্তা যে সর্বাংশে এক কবি-সত্তা এ কথা তাঁর কাব্য-পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারবেন।

অচ্যুত গোস্বামী

দিনগুলি রাতগুলি—শঙ্খ ঘোষ। প্রকাশক—এস রায় অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম ২.০০

দূরান্তিক—সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা। দাম ২.০০

নতুন কবির প্রথম কবিতার বই হাতে নিয়ে আজকাল কিছুটা বিপন্নই বোধ করি। কারণ বেশির ভাগ তরুণ লেখকের রচনায় যে রকম ছন্দ-স্বচ্ছন্দ্য ও ভাষা ব্যবহারের পটুতা দেখতে পাই, তাতে তাদের কবিত্বমতায় যুগ্ম হই বটে,

কিন্তু বিরল কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, এই দক্ষতা যে জীবন সম্বন্ধে নতুন কোন বোধ সংক্রামিত করতে পারে না, তাতে অতৃপ্তি জাগে আরো বেশি।

নিশ্চয়ই কবির কাছে সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা আশা করব না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন কিছু চাইব, যা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে—তার মানুষ ও প্রকৃতির বিষয়ে আমাদের মনকে জাগ্রত করে তুলবে, অভিজ্ঞতার দিগন্তকে আরো একটু প্রসারিত করে দেবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সে রকম কবিতার সংখ্যা বা সে রকম কবিতা লেখা যাদের ধ্যানে রয়েছে এমন কবির সংখ্যা খুবই কম। আর একথা শুধু নবীনদের মনে রেখেই বলছি তা নয়, প্রবীণ বা আধা-প্রবীণদের বিষয়েও সমানই খাটে। কিন্তু তাঁদের যা করার তা তাঁরা করেছেন। ভালো মন্দ তার অনেকটাই এখন ইতিহাস। আশা করতে হলে তাই তাকাতে হয় সামনের দিকেই—তরুণ কবিদের কাছে বারবার দাবি জানাতে হয়, এ যুগের নতুন কবিতা লিখুন তাঁরা। সাজানো গোছানো স্মার্টনেসের জায়গায় আস্তরিকতার জীবনরঙ্গ দেখা দিক।

সুখের বিষয়, শম্ম ঘোষের কয়েকটি কবিতায় এমন কবিমনের সাক্ষাৎ পাওয়া পাওয়া গেল যাতে আশা করা যায়, লেখা বন্ধ না করলে তিনি আজকের বাংলা কবিতার কিছু নতুনত্ব আনতে পারবেন। বিশেষ করে এ বইয়ের স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতা—যমুনাবতী, স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এই প্রকৃতি, বলো তারে, ‘শান্তি শান্তি’ ইত্যাদির মধ্যে বিষয় ও প্রকরণের যে পার্বতী পরমেশ্বর মিলন ঘটেছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। এ বইয়ে শম্ম ঘোষ অনেক রকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, পুরনো ব্যবহৃত ছন্দকে নতুন সুরে বাজাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই ছড়ার ছন্দকে যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রয়োগ করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর ‘যমুনাবতী’ কবিতাটি শুধু এই বইয়েরই নয়, সমগ্র বাংলা কবিতাতেই একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এবং তারি সমতুল্য কবিতা ‘এই প্রকৃতি’। এ কবিতায় নতুন কথা বিশেষ কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, আরো পূর্ববর্তী অনেক কবি বোধ করি এই কথাই নানাভাবে বলে গেছেন। কিন্তু শম্ম ঘোষের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর কবিতায় গভীর আস্তরিকতার স্পর্শ দিতে পেরেছেন। যখন তিনি বলেন,

ঘুরে ঘুরে এই প্রকৃতি কি কথা কয় ?

সে বলে যায় প্রেমের মতো আর কিছু নয় !

... ..

সে তো কেবল এই কথাটাই গুণগুণিয়ে নৃত্যে ধরে
 'দে তোরা দে, আমার বুকে স্নেহের আগুন জ্বালিয়ে দে রে' ।
 আকাশ-ভরা নীল টলেছে মাটির ভরা-বুকের টানে,
 একূল ওকূল দুকূল ভেঙে জল ছুটে যায় কী সন্ধানে,
 গাছ কেঁপে যায় ফুল তোলে মুখ, সন্ধ্যা ভোরের আলোর বিনয়
 সবাই মিলে গান তুলেছে, প্রেমের মতো আর কিছু নয় ।

তখন তা আর কাকা কথা থাকে না, জীবনের গভীর বিশ্বাসেরই মস্তোচ্চারণ
 হয়ে দাঁড়ায় ।

অবশ্য বইটিতে অপটু কবিতাও অনেক আছে । শব্দকে সুরেলাভাবে প্রয়োগের
 ঝোঁকে বেশি কথা বলা, নিছক কথার পিঠে কথা জুড়ে বক্তব্যের খেই হারিয়ে
 ফেলা, এসব ত্রুটি অনেক লক্ষ্য করা যাবে । বইয়ের নাম কবিতাটিও যতটা
 উচ্চাশা-প্রযোজিত ততটা সার্থক হয়নি । কিন্তু নতুন কবির ক্ষেত্রে তাঁর
 অসার্থকতার চেয়ে কতটা তিনি নতুন কাব্য যোজনা করতে পারলেন সেইটাই
 প্রধান লক্ষ্যীয় হওয়া উচিত । কেননা অমৃতের আশ্বাদ যিনি দু-একবারও
 পেয়েছেন, অসাধ্যের তিক্ততা তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না ।

'দূরাস্থিকে'র গ্রন্থকার সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত একেবারে ভিন্ন জাতের লেখক ।
 রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রভাবিত কবিতা লেখেন তিনি । নতুন বিশেষ কিছু যে
 তাঁর বলবার আছে তা মনে হল না ।

কিন্তু সেটাও জরুরী কথা নয় । রবীন্দ্রনাথে যে সংবেদনশীল মানবিক উদারতার
 স্পর্শ পাই তা নিয়ে এ যুগেও হয়তো ভালো কবিতা রচনা সম্ভব । কিন্তু ভাষার
 ব্যাপারে চিলেমি দেখা দিলে সমস্ত ইয়ারতই ধ্বসে পড়ে । আলোচ্য বইয়ের
 সবচেয়ে বড় ত্রুটি ভাষা ব্যবহারে অসীম নিশ্চিন্ততা । এত পরিচিত এবং
 ব্যবহার-মলিন ছন্দোভাষার পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন, আর যদিও
 বা পড়তে শুরু করা যায়, কিছুক্ষণ পরেই অভিভাবশ্ল কথার অরণ্যে নিজেকে
 হারিয়ে ফেলতে হয় ।

লেখক নানা রকম দার্শনিক এবং নৈতিক চিন্তা নিয়ে যে রকম ব্যাপৃত তাতে
 ভাষা ব্যবহারে যথেষ্ট কংক্রীট না হলে সবটাই ধোঁয়াটে হয়ে যেতে বাধ্য ।
 তবে সেই সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে, প্রকাশে যথেষ্ট সার্থক না হলেও
 লেখকের কবি-চিন্তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সূরুচিবান ।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

সাহিত্যের পুরস্কার

বেশি দিনের কথা নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল পর্যন্তও বাংলা সাহিত্যকে মুষ্টিমেয় পাঠকবর্গের আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। সেদিন তার ভাগ্যে 'একাধিক সংস্করণের' প্রলোভন ছিল না। পাঁচশো কি হাজার কপি বই বিক্রি হলেই সাহিত্যিকরা নিজেদের রীতিমত ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। এমন কি প্রকাশকের দোরে দোরে ধনী দিয়ে নামমাত্র মূল্যে কপিরাইট বিক্রি করতে পারাটাই সাহিত্যিক স্বধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হত। সেদিন কোন গ্রন্থই তার জন্মলগ্নে সাহিত্য আকাদেমী, রবীন্দ্র পুরস্কার বা নরসিংহ দাস পুরস্কারের মত রাজসম্মান বা পারিতোষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হত না। সেদিনকার দুর্লভ সাহিত্যমার্গের যারা পথিক—যাঁদের অনলস সাহিত্য-সাধনা এবং গভীর জীবন নিষ্ঠার উত্তরাধিকার আমরা আজও যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারিনি—তারা আমাদের নমস্কার। চরম লাঞ্ছনা ও অর্থসংকটের মধ্যেও যারা সেই সাহিত্য-মার্গের যাত্রায় অটুট ছিলেন—আজও তারা অগণিত পাঠকসাধারণের হৃদয় জয় করে আছেন। তিল তিল করে সে সম্মানের তিলোত্তমা সৃষ্টি হয়েছিল বলেই সে তিলোত্তমা আজও অহীন, ভাস্বর।

বাংলা সাহিত্যের বাজার আজ অনেক প্রসারিত, বাঙালী সাহিত্যিক আজ সংখ্যাতিত, প্রকাশকের সংখ্যাও আজ আর অঙ্কুলিমেয় নয়। প্রতিযোগিতার দাপটে সাহিত্য-শিল্প আজ প্রায় পণ্যে রূপান্তরিত। সাহিত্যের খেলা খেলতে বসে আজ কোন কোন সাহিত্য-ব্যবসায়ী রাতারাতি রাজা-উজির হয়ে যান, কোন কোন রাজা-উজির রাতারাতি পাঠকের আনুকূল্য হারিয়ে ককিরে পরিণত হন। চোরাবাজারের অন্তান্ত পণ্যদ্রব্যের মত বাংলা সাহিত্যের বাজারের একটি বড় অংশ জুড়ে আজ সাহিত্য নিয়ে ষাটকাবাজি চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের দেশে সাহিত্যের যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান কালের বেশির ভাগ লেখক ও পাঠক সে সম্বন্ধে কি পরিমাণে সচেতন সন্দেহ হয়। সমাজের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকরণ নিঃসন্দেহে পাল্টায়। কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম পাল্টায় কি? আজকের পরমাণবিক যুগে কিন্তু সর্বত্র প্রতিযোগিতা। এক রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা। সাহিত্য নিয়ে, প্রকাশনা নিয়ে, পাঠক নিয়েও আজ এক চরম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার

আসরে সাহিত্য পর্ণোৎসব, পর্ণোৎসব সাহিত্য। গভীর জীবন ও গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসাকে বিসর্জন দিয়ে সাহিত্য আজ বিদুষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই বিদুষকের নৃত্য দেখে আপনি হাততালি দিতে চান, দিন। তার স্থলরসে আপনি যদি পরিতৃপ্তি হতে চান, হোন। যে সমাজ আপনার ধাওয়া-পরার দায়িত্ব নিতে নারাজ, সে সমাজ আপনাকে অস্তুত এই স্বাধীনতাটুকু দিয়েছে। সুতরাং, মাতৈঃ !

বাংলা সাহিত্যের সামনে আজ প্রসারিত বাজার। বাঙালী সাহিত্যিকের সামনে আজ নানা প্রলোভন। পুরস্কারের প্রলোভন। সরকারী আনুকূল্যের প্রলোভন। সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, নরসিংদাস পুরস্কার। এই পুরস্কারগুলির দুলভ সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তির জন্য আজ বহু সাহিত্যিক মেঘশূন্য আকাশের দিকে চাতকের মত সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করে আছেন। কবে তাদের ভাগ্যে পুরস্কারের রাজসম্মান জুটবে কেউ জানে না। কারণ পুরস্কার কমিটির বিচারকরা কবে প্রসন্ন হয়ে বরদান করবেন তাঁরাই জানেন। আপাতত আমরা শুধু এইটুকু বুঝেছি যে সরকারী পুরস্কার সাহিত্যের জন্য ততটা নয়, যতটা সাহিত্যিকের জন্য। সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যিকের বিচারই সেখানে মুখ্য। সাহিত্যের বিচার গোণ। পুরস্কারের নামে এই অর্থদানের ঘটনা তাই যে-কোন সং ব্যক্তির বিশ্বাসের উৎস।

গত কয়েক বছরে যে সব বাঙালী সাহিত্যিক সরকারী পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের জন্যে মনে মনে গর্বিত বোধ করেও আমরা তাই একটা কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই দাবি করব : পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে সাহিত্য-কর্মের প্রতি যাঁরা অধিকতর শ্রদ্ধাশীল, বিচারের দায়িত্ব তাঁদের হাতেই অর্পিত হোক। কারণ হয়তো তাঁদের হাতেই সাহিত্যে নতুন সুর যোজনা হবে। সাহিত্য ফিরে আসবে তার আপন স্বস্তে।

মুলেখা মহলানবীশ

চিঠিপত্র

জীবন ও শিল্পের সমীকরণ

‘নতুন সাহিত্যে’-র মাঘ-চৈত্র (১৮৭৯ শকাব্দ) সংখ্যায় শম্ভু মিত্রের ‘জীবন ও শিল্প’ পড়লাম। প্রবন্ধটির উচ্চাভিলাষী শিরোনাম ও তার উপর প্রবন্ধ-লেখকের নাম আধুনিক পাঠকের মনে আগ্রহ জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর ঘটান কথাও নয়। আমি তাঁর অভিনয়ের এক গুণগ্রাহী ভক্ত। বাংলার নাট্যজগতে তিনি যে বিপুল আলোড়ন তুলেছেন তা আমাকেও স্পর্শ করেছে। বাংলার মঞ্চাভিনয়ের শীর্ণ ধারায় তিনি যে নতুন প্রাণবন্ততার সঞ্চার করেছেন, আমি তার বিমুগ্ধ দর্শক। তাই বিশেষ আগ্রহ নিয়েই পড়লাম তাঁর ‘জীবন ও শিল্প’। সামগ্রিক ভাবে নাটক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। তাঁর মত আমিও বিশ্বাস করি নাট্যকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্যাত্মসন্ধান, জীবনের গভীর কোন সত্যের রূপায়ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা নাটকে সে ধরনের কোন প্রচেষ্টা দুর্নিরীক্ষ্য। কারণ, সমাজের মৃতপ্রায়, জীর্ণ, অর্থোক্তিক অমুশাসনের চাপে সত্যদৃষ্টি আমাদের নেই। সত্য ভাষণের সংসাহস আমাদের বহুকাল অন্তর্হিত। কিন্তু তাঁর মৌল বক্তব্যটির সঙ্গে একমত হলেও তাঁর একাধিক প্রাসঙ্গিক আলোচনার অর্থোক্তিকতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি একদেশ-দর্শিতার ফলশ্রুতি বলে আমার মনে হয়েছে। এ ক্ষণ্ট সে সব ক্ষেত্রে আমার নিজের অভিমত জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি।

চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর উক্তিগুলি আমার সব থেকে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। প্রথমতঃ, চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন, “সেখানে পলকে পলকে রোমহর্ষক ঘটনা ঘটাতেই হবে। প্রত্যেক সিকোয়েন্সে একটা করে ক্লাইম্যাকস্। আর সে ক্লাইম্যাকস্ খুবই মোটাদাগের ক্লাইম্যাকস্। একেবারে রগ-রগে রান্না।” চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এ ধরনের অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য তাঁর কাছে আশা করিনি। পলকে পলকে দূরে থাক অন্তত একটিও রোমহর্ষক ঘটনা ঘটাতে হবে এমনতর পূর্বপরিকল্পিত কন্ঠা নিয়ে আজকের দিনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে—একথা কেমন করে বিশ্বাস করি? Vigor L’atalante কিছু না হলেও আজ থেকে তেইশ বছর আগে তোলা হয়েছে। Claire-এর Crazy Ray তারও আগে। Flahertyর শেষ বাস্তবধর্মী ছবি (যা কারুর কারুর মতে রোমান্টিক ডকুমেন্টারিও বটে) Louisiana Storyর বয়সও দশ হয়ে গেল।

এদের কোন্‌ যুক্তিতে শজুবাবু রোমহর্ষক ছবির তালিকাভুক্ত করেন? অবিশ্রুতি রোমহর্ষক, ভয়ংকর ব্যাপার যে চলচ্চিত্রে স্থান পায় না, এ কথা বলি না। আমেরিকার গত দশকের অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক কাজানের চিত্রেও (A Tree grows in Brooklyn, Street car named Desire) উগ্রতা ও প্রচণ্ডতা বাদ যায় না। কিন্তু সে তো ঢালের অন্তর্দিক। তেমনভাবে দেখলে আমাদের মঞ্চও এ ধরনের সমালোচনার হাত হতে রেহাই পাবে না। চলচ্চিত্রে একদিকে যেমন কাজানের ছবির উগ্রতা ও রোমহর্ষকতা বর্তমান, অন্যদিকে তেমনই জীবন-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষরবাহী ‘পথের পাঁচালী’র মত ছবিও তোলা হচ্ছে।

শজুবাবু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেতা, বাংলার নব নাট্য আন্দোলনের প্রধান পুরোধা। বোধহয় সে কারণেই মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর একটি স্বভাবজ দুর্বলতা থেকে গেছে। সে যাই হোক কোন বিশেষ একটি আর্ট ফর্মের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ অন্যতর শিল্পকর্মকে নস্যাৎ করতে হবে, একথা আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ, আমরা জানি যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অবদান চলচ্চিত্রকে আজ শুধু নিছক প্রমোদের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব। নাটকের মত চলচ্চিত্রেও যে সত্যানুসন্ধান সম্ভব এবং সেখানে যে জীবনের গভীরতম ব্যঞ্জনা প্রকাশের চেষ্টা ক্রমশই লক্ষ্য করা যাচ্ছে—এ কথা আজ অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। Viscontiর La Terra Trema, Dovzhenkoর Earth, Ford-এর How Green was my valley, Renoir-এর The Southerner ইত্যাদি ধরনের ছবিতে জীবন-জিজ্ঞাসা অতি স্পষ্ট। অন্তত রোমহর্ষক ঘটনা ঘটানোর মোহ হতে এই সমস্ত চিত্র-পরিচালকেরা মুক্ত। যে সত্যসন্ধান ‘রক্তকরবী’ ‘পথিক’ বা ‘ছেঁড়াতার’ ইত্যাদি নাটক পরিবেশনার মূল লক্ষ্য, সেই একই সত্য প্রকাশের তাড়না থেকেই জন্ম ‘পথের পাঁচালী’ ‘অপরাজিত’-র। অন্তত আমার তাই ধারণা। যেখানে জীবনের সত্যোপলব্ধি অনুপস্থিত, সেখানেই সিকোয়েন্সে সিকোয়েন্সে মোটা দাগের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করে অগভীরতা ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেটা কি নাটকে, কি চলচ্চিত্রে। কিন্তু তা থেকে এ রকম সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হওয়া যায় না যে, মানুষ ও তার গভীর কথা কেবল নাটকেরই উপজীব্য।

শজু মিত্র নাট্য-শিল্পকে তিলোত্তমা শিল্প আখ্যা দেওয়ায় খুশি হয়েছেন। কিন্তু

ব্যক্তিগত ভাবে আমার ধারণা চলচ্চিত্র শিল্পকে তিলোত্তমা শিল্প বলা বোধহয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, চলচ্চিত্রের জন্ম বহু শিল্পের সমন্বয়েই। এ নিয়ে হাঙ্গেরীয় চিত্রসমালোচক Bela Ballaz তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে (Theory of Film) যে অতুলনীয় আলোচনা করেছেন, তারপর কারুর এ বিষয়ে সংশয় না থাকাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ E. W. ও M. M. Robson-এর উক্তি উদ্ধার করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না।

“The film is in direct line with every preceding cultural expression. But it is more. It is a synthesis, a unity of all that has gone before, in song, music, dancing, painting, drama, comedy, rhetoric, costume and architecture.” (The Film Answers Back, Page-19) তবে জীবনের রংরং রোমহর্ষক ঘটনাক্রমে হয়তো আমাদের দিশি ছবিতে এখনও প্রাধান্য পেয়ে আসছে; ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অপরাজিত’র পথ ধরে ধরে বাংলা ছবির মোহমুক্তি হয়তো এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তা বলে চলচ্চিত্রকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে নস্যাৎ করা চূড়ান্ত রকমেই অযৌক্তিক।

শতাব্দীর আর একটি সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ এই, চলচ্চিত্রে খ্যাতি বা সিদ্ধিলাভ অনায়াস বা অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালোভিভারীর চলচ্চিত্রোৎসবে প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত ‘জাগতে রহো’র উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য কতকটা হল এই গোছের। প্রযোজকের সঙ্গে অনেক কিছু ব্যাপারে আপস করেও যে ছবি তিনি তৈরি করলেন সে ছবি বিশ্বের দরবারে প্রথম পুরস্কার জয় করে আনলো। অর্থাৎ নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সর্বত্র কাজ করতে না পারলেও, আর্থিক আকুণ্ঠতার খাতিরে প্রযোজকের অন্তায় নির্দেশ মেনে নিয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য চিত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। তাহলে সহজেই অস্বাভাবিক চলচ্চিত্রে সিদ্ধিলাভ কত অস্বাভাবিকই সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর যুক্তি বিস্ময়কর রকমের একদেশদর্শী। কী করে তাঁর মত ব্যক্তি চলচ্চিত্রোৎসবের সাফল্যকে শিল্পসিদ্ধির মাপকাঠি বলে গণ্য করলেন, তা বোঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, কালোভিভারীর পুরস্কার চলচ্চিত্র-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নয়। এখানে চলচ্চিত্রায়ণ ছাড়া (Cinematography) অন্ততর মাপকাঠি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এমন আশঙ্কা করাটা নেহাৎ অসঙ্গত হবে না। পশ্চিমী দর্শকের সামনে

কালোভিভারীর-ই জনৈক সাম্যবাদী চিত্র-নির্মাতার উক্তি, “you have technique and little content ; we have content and for the moment uncertain technique” এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য পূর্ব ইউরোপের চলচ্চিত্র শিল্পে সার্থক content বলতে প্রগতিশীল আবেদন বিশিষ্ট কোন কাহিনীকেই বোঝায়। ‘জাগতে রহো’র সাম্যবাদী বক্তব্য থাকার দরুনই বোধহয় Zolton Fabrier Professor Hannibal (যা নাকি অনেকের মতে কালোভিভারীর উৎসবে একমাত্র ভালো ছবি ছিল) এর উপরে ‘জাগতে রহো’কে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আসলে ‘নাটক ও চলচ্চিত্র’ এই দুই শিল্পের ভুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনাই অর্থহীন, কারণ এ দুইয়ের আবেদন স্বতন্ত্র। তবে আমি প্রতিবাদ জানালাম, কারণ নাটকের প্রতি শত্রুবাবুর পক্ষপাতিত্ব এ বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে।

প্রবন্ধটির কোন কোন জায়গায় শত্রু মিত্র categorical উক্তি করেই চলে গিয়েছেন ; তাঁর উক্তির যথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করার কোন চেষ্টা করেননি। ফলে বক্তব্যের মধ্যে রীতিমত অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে। ভালো নাটক অভিনয় করার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যায় শেক্সপীয়র, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বা গ্রীকযুগের সোফোক্লিসে আমরা উদ্ধৃত্ত হচ্ছি, তাহলে সে কথা ভুলে গালাগালি না দিয়ে সাহিত্যিকদেরই ভাবা দরকার যে কি আমরা চাচ্ছি।” এখানে ‘দুর্ভাগ্যক্রমে’ শব্দটির প্রয়োগ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। শেক্সপীয়র, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বা সোফোক্লিসের নাটক দ্বারা উদ্ধৃত্ত হবার মধ্যে দুর্ভাগ্যের কিছু থাকতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কিছু পরেই সাম্প্রতিক নাটকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “শরৎচন্দ্রের নাট্যিকার অভিমান, নিয়মধ্যবিশ্বের দারিদ্র্যের কাতরানি, দু-একটা লিয়রের হাহাকার আর কিছু আধা-সাম্যবাদী বুলি এই নিয়েই বহু নাটক লেখা হয়।” কথাটি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারিনি। লেখক কি বলতে চান, নিয়মধ্যবিশ্বের দারিদ্র্যের কাতরানি সার্থক নাটকে উপস্থিত করা চলবে না? যদি তাই তাঁর বক্তব্য হয়, তা হলে তার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, এ কথার সত্যতার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। আর ‘লিয়রের হাহাকার’ বলতেই বা শত্রু মিত্র কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বোধগম্য হয়নি। মনে হয়, নাটকে কী থাকবে

আর কী থাকবে না, এ ধরনের কোন পূর্বনির্দিষ্ট ফর্মুলা নিয়ে নাটক লিখতে বসা অসম্ভব। তাই সাম্প্রতিক নাটকে শুধু আধাসাম্যবাদী বুলি, নিম্নমধ্যবিত্তের দারিদ্র্যের কাতরানি থাকার জন্তই তাকে উড়িয়ে দিতে হবে, এ সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয় না। কারণ তা মেনে নেওয়ার অর্থ হল নাটকের বিষয়বস্তুকে অনাবশ্যকভাবে সীমাবদ্ধ করা।

শলু মিত্রের 'জীবন ও শিল্প' প্রবন্ধে একটি স্ববিরোধী মন্তব্য চোখে পড়লো। ঐ প্রবন্ধের এক জায়গায় গভীর প্রত্যয়ের সুরে তিনি বলছেন, 'আমাদের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আমরা একদিন নেশায় পেশায় মিল করাবো। কিন্তু তার মানে এই নয় পেশার কাছে আমরা নেশাকে বলি দেবো।' সঙ্কল্প সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, কাঞ্চন মূল্যে তিনি নিজের আদর্শবাদ বা মতামতকে বিক্রি করে তাঁর সততার লড়াইয়ে আমাদের আস্থান জানিয়েছেন। ব্যাপারটা আর একটু খুলেই বলতে হয়। ঐ প্রবন্ধেরই অন্তর্ভুক্ত লিখেছেন যে, ছবি করার কোন সঙ্গতি নেই বলে প্রযোজকের সমস্ত অন্তর আবদার সোনামুখ করে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ পেশার যুগকাষ্ঠে নেশাকে তিনি বলি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবিশিষ্ট শলুবাবু বলতে পারেন যে, নাটক করা তাঁর পেশা, ছবি করা নয়। তাতে অবিশ্যি তিনি স্ব-বিরোধী মন্তব্য করার দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন, কিন্তু আমাদের মূল অভিযোগের কোন সম্ভোষজনক উত্তর দেওয়া হবে না। কারণ মঞ্চাভিনেতাই হোন আর চিত্র পরিচালকই হোন, শলু মিত্রের মুখ্য পরিচয় তিনি শিল্পী। একটি শিল্প-মাধ্যমে গভীর নিষ্ঠা বজায় রাখবেন, কিন্তু অন্ততর শিল্পকর্মে অন্তায়ের সাথে আপস করায় দ্বিধাবোধ করবেন না, এ কেমন যুক্তি? অস্বত যে সততার লড়াইয়ের জন্ত সর্বদা প্রস্তুত, তাঁর পক্ষে অন্ততর শিল্পক্ষেত্রে এ ধরনের আপস অশোভন।

প্রসঙ্গতঃ শলু মিত্র মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে Visual art কথাটি প্রয়োগ করা হয় না বলে ক্রোভ প্রকাশ করেছেন। Visual art কথাটির বথেচ্ছ প্রয়োগও তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান আপত্তিটি কোথায়, মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে visual art কথাটি না বলার দরুন, না visual art কথাটির বথেচ্ছ প্রয়োগের দরুন, তা বোঝা গেল না। প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি ভাবে তাঁর সঙ্গে একমত অর্থাৎ এ কথা মানি যে মঞ্চাভিনয় রেডিওর মত শুধু শোনার জিনিস নয়, দেখার জিনিসও বটে। আর Visual art কথাটির প্রয়োগ বতদূর জানি চলচ্চিত্র সম্বন্ধেই করা হয়ে থাকে। সেটাতে লেখকের

আপত্তির কী থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। কারণ এ কথা সত্যি যে মঞ্চাভিনয় রেডিওর তুলনায় Visual art বলে পরিগণিত হবার যোগ্য হলেও, চলচ্চিত্রের তুলনায় একমাত্র Visual art বলে বিবেচিত হবার দাবি তার খুবই কম। কারণ চলচ্চিত্রের তুলনায় মঞ্চের একাধিক অঙ্গবিধা। চলচ্চিত্রের মধ্যে গতি আছে; ফলে স্থির দৃশ্যসজ্জার সীমাবদ্ধতা থেকে চলচ্চিত্র মুক্ত। সেখানে Sense of details এর পরিচয় দেওয়া যায়। ফলে তার চিত্রগত আবেদন বহুগুণে বাড়ে। শোনার থেকে দেখার প্রবৃত্তি অনেকগুণে সেখানে প্রবল। তাই কথা না বলেও ছবি উঠেছে এবং সে ছবির তালিকায় Battleship Potemkinও আমরা পেয়েছি কিন্তু শ্রবণ বাদ দিয়ে মঞ্চাভিনয় হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ Flahertyর Louisiana Storyর উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেখি আলো আধারের chiaroscuro। জলের দু'পাশের ছায়া ছায়া বনানীর কঁকে কঁকে সূর্যকিরণ; আর তারই মধ্যকার ছোট ছোট খাড়িতে উদভ্রান্তচোখ কাজুন কবি কিশোর নৌকা চালিয়ে বেড়ায়। আমার বক্তব্য চলচ্চিত্র বলে মঞ্চের দৃশ্যপট বদলানোর অঙ্গবিধা হতে এখানে আমরা মুক্ত। আমরা দেখি ছবি সরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা এগিয়ে যায়। দু'পাশের গাছের কঁকে কঁকে সূর্যকিরণ নেচে ওঠে। মঞ্চে নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখানো সম্ভব হত না। কাজেই একরকম অভিনয়ের জোরেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের, মঞ্চের উপর আমাদের দৃষ্টিকে ধরে রাখতে হয়। চলমান চিত্রের যে সহজ সঙ্গীতা আছে, তা থেকে মঞ্চের স্থির দৃশ্যসজ্জা বঞ্চিত। ফলে একথা বোধহয় বলা চলে, মঞ্চাভিনয় মুখ্যতঃ visual art নয়।

অবিশ্যি 'রেডিও' যেখানে পুরোপুরি শ্রবণনির্ভর, মঞ্চ সেখানে দর্শন ও শ্রবণ দুইয়ের পরেই নির্ভরশীল। কাজেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে (মঞ্চ সম্বন্ধে নয়) যে Visual art কথাটি ব্যবহৃত হবে, এতে অন্যায়ের কী আছে? অবিশ্যি শব্দবানু স্পষ্টতঃ চলচ্চিত্রের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে করেননি। কিন্তু আমরা জানি Visual art চলচ্চিত্র ছাড়া অন্ততঃ শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রয়োগ করা হয় না। সেইজন্যই এ কথার অবতারণা। অবিশ্যি “আমি এই visual art কথাটার যথেষ্ট ব্যবহার বুঝতে পারি না”—এ লাইনের যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, তাহলে আলাদা কথা।

সর্বশেষে একটি কথা বলে এ লেখার উপসংহার টানতে চাই। সে হল 'জীবন ও শিল্প'র মৌল বক্তব্যটি এমন অবিসংবাদিত ভাবে সত্য, যে সেটাকে এত ঘটা

করে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। জীবন বা reality সম্বন্ধে আমাদের বোধকে উন্নত করা যে নাটকের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মানবজীবনের গভীর কথাই যে তার উপজীব্য হওয়া উচিত, বা মনের কোন গভীর কথা বলার প্রেরণাতেই শুধু যে নাট্যকারের কলম ধরা উচিত, এ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। আর যে কথাটি শব্দবাবু বলেছেন, আমাদের সত্যদৃষ্টি, সত্যভাষণের অভাব থেকে গেছে বলেই আমরা অপ্রিয় সত্যভাষণে কুণ্ঠিত হই, এটিও একটি অবিসংবাদিত সত্য। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অভিনয় রীতির হাশুকের বাড়াবাড়ির প্রতি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি, (যেমন, হতাশ মানুষ চেয়ারের পিঠ ধরে কুঁজো হয়ে হয়ে চলে, বা অশুধ হলেই হাঁপিয়ে কথা বলে, বা প্রেমের দৃশ্য হলে গাঢ়ভাবে তাকানোর চেষ্টা করে) তার জন্তে তিনি ধন্যবাদার্থ। কিন্তু যখন তিনি নাট্যকারদের সংলাপগত মোহের উল্লেখ করেন, তখন মনে হয় তাঁর উল্লেখ না করলেও চলতো। ভালো নাটক মানে যে ভালো ভালো একটানা কৃত্রিম ক্লাস্তিকর সংলাপ নয় তা বোধহয় আজ আমরা সবাই বিশ্বাস করি। অর্থাৎ আমার ধারণা এটি একটি তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত সত্য। বরং শব্দ মিত্র জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতর গ্রন্থিগুলি উন্মোচিত করার চেষ্টা করলে আমরা বেশি উপকৃত হতাম।

কলিকাতা-১২

করুণাশঙ্কর রায়

লেখকের বক্তব্য

শ্রীকরুণাশঙ্কর রায়ের প্রথম আপত্তি আমি চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য করেছি। আমার মনে হয়, তিনি ভালো করে আমার লেখাটা পড়েননি। তাতে আছে ‘লেখকরা জীবিকার জন্য বায়স্কোপ মহলে যুক্ত’। তার একটু পরেই লেখা আছে ‘বাজারের এই হালচাল দেখে লেখক তার বন্ধু শ্রীঅমিত মৈত্রের সঙ্গে...’ ইত্যাদি। এতে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না যে, আমার অভিযোগ ‘বাজারিক’ ফিল্ম সম্পর্কে, ফিল্মফর্ম সম্পর্কে মোটেই নয়। এবং ফিল্মের বাজারে যে এই নিয়ম চলে তাতে কি কোনও সংলোকে সন্দেহ আছে?

তাছাড়া আমার লেখার শেষ দিকে আছে, ‘আমি শিল্পের এই ছোটো কর্মের সঙ্গেই সামান্ত সামান্য ভাবে পরিচিত, কেবল পেশার জন্য নয়, নেশার জন্যও!’ এটা কি করুণাশঙ্করবাবুর চোখে পড়েনি? আমার অন্যান্য কিছু

লেখাতেও আমি ফিল্মফর্ম সম্পর্কে আমার অনুরাগের কথা বেশ ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছি।

তাঁর অনুরোধে আমি যেন ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অপরাজিত’র মত ছবিকে ছোট করতে চেয়েছি। এ সম্পর্কেও আমার অন্য লেখার কথা উল্লেখ করব। আমার একটা সামান্য বই আছে তাতেও ‘পথের পাঁচালী’র কথা আছে।

তারপর তাঁর আর একটা অনুরোধ : মঞ্চাভিনয়কে তিলোত্তমা শিল্প বলায় আমি খুশি হয়েছি কেন ? তার ব্যক্তিগত ধারণা যে চলচ্চিত্রকেই তিলোত্তমা শিল্প বলা অধিকতর সঙ্গত। আমি কি কোথাও বলেছি যে ফিল্মও তাই নয় ?

তারপরে তিনি একটা ইংরেজি কোটেশন দিয়েছেন। কিন্তু কোটেশন তো প্রমাণ নয়। নিজের মত নিজের বোধমতই বলা ভালো। অপরের কোটেশনে ল্যাব কী ? তাতে বরং ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। যেমন তাঁর কোটেশনে আছে : The film is in direct line with every preceding cultural expression. But it is more. এইটুকু বললে কি মুশকিল হয় দেখুন, এর মানে হয়—জগতে যা কিছু শিল্পচর্চা হয়েছে তার প্রত্যেকের উত্তরাধিকার তো চলচ্চিত্রে আছেই, এমন কি এটা তার চেয়ে কিছু বেশি। তাহলে কি ধরে নেব যে আজ যামিনী রায় বা পিকাসো বা অন্ত আর কোনও শিল্পী যদি কোনও ছবি আঁকেন, বা কোনও বড় composer যদি নতুন সিমফনি সৃষ্টি করেন বা মহৎ লেখকরা যে-সব বই লিখেছেন বা লিখতে পারেন, তার চাইতে চলচ্চিত্র is more ? কি জানি ! আজ পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রও শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার চেয়ে বিরাটতর বা মহত্তর হতে পেরেছে আমি তো শুনিনি, নিজেও ভাবিনি। আমার এখনও টেলিস্টর, বালজাক, শেকসপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ পড়ে বেশি গভীর, বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনে হয়।

তারপর তাঁর একটা অভিযোগ—‘কী করে তাঁর মত ব্যক্তি চলচ্চিত্রোৎসবের সাফল্যকে শিল্পসিদ্ধির মাপকাঠি বলে গণ্য করলেন? তা বোঝা কঠিন।’ চলচ্চিত্রোৎসবের সম্মান শিল্পসিদ্ধির মাপকাঠি নয় এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত বলেই এখন এই নিয়ে লোকে congratulate করে টেলিগ্রাম পাঠায় বা সংবাদপত্রে সংবাদ বেরোয় তখন আমার হাসিই পায়। এতে দোষটা কী হল ?

তারপর ‘দুর্ভাগ্যক্রমে’ কথাটা আমি কেন ব্যবহার করেছি তা তিনি বুঝতে পারেননি। কারণটা কিন্তু ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। একজন বিশিষ্ট নাট্যকার আমাদের সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেছেন, তাই নিষেই কথাটা উঠেছে।

তারপর ‘শরৎচন্দ্রের নায়িকার অভিমান, নিম্নমধ্যবিত্তের দারিদ্র্যের কাতরানি, হু-একটি লিয়রের হাহাকার আর কিছু আধা-সাম্যবাদী বুলি নিয়েই বহু নাটক লেখা হয়’—এই কথা বলে আমি যেন অন্তায় করেছি।

প্রথমেই বলি, লেখাটা তিনি আবার পড়লে ভালো করবেন। কারণ ওখানে রেডিমেড স্টেনসিলের কথা লিখেছি। স্টেনসিল যে শিল্পের ক্ষেত্রে অশিল্পকে প্রশংসা দেয়, একথাটাই বলা হয়েছে। আর তা ছাড়া আধুনিক অনেক নাটকের অভিনয় আমাদের দেখতে হয়। অনেক নাটকের পাণ্ডুলিপি বা ছাপানো বই আমাদের কাছে আসে, তাছাড়া নাটক রচনা পুরস্কারের যারা বিচারক তাঁদের কাছে শুনেছি—এইসব শুনে দেখে স্টেনসিলের একটা general চেহারা মনে হয়েছে। এতে যদি আপত্তি করতে হয় তাহলে আমাদের মত বেশির ভাগ সময়ে নাটক নিয়ে থেকে, সেগুলো পড়ে বিচার করে বলতে হয়। আমরা চেয়েছি সত্যতা, জীবনবোধ ইত্যাদি। তাতে ফর্মুলা বেধে দিচ্ছি একথা আসে কী করে ?

এরপর তিনি বলেছেন যে, আদর্শবাদ সহজে আমি বহু কথা বলি কিন্তু ফিল্মে গিয়ে যে আত্মবিক্রয় করেছি সে কথা তো আমার লেখাতেই আছে। আবার লিখেছেন, ‘এক্ষেত্রে অবিশ্রি শত্রুবাবু বলতে পারেন যে নাটক করা তাঁর নেশা কিন্তু ছবি করা নয়। তাতে অবিশ্রি তিনি……’ ইত্যাদি।

প্রথমতঃ, তাও বলা যায় কিন্তু যে, আমার আসল কাজ নাটক করা। এবং সেটা কথার পাঁচ কষার জন্ত নয়। নিজের অভিজ্ঞতায় এটুকু জানি যে মানুষ যখন সহায়সম্বলহীন হয়েও একটা জিনিসকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে তখন তাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জিনিস মেনে নিতে হয়, অনেক আত্মত্যাগ করতে হয় যাতে সেই প্রাণের জিনিসটা দাঁড়ায়। আজ যদি আমাদের নাট্যান্দোলনের কোনও লোককে অর্থের জন্ত যে কাজ করবার নয়, যা তার মন চায় না সেই কাজই করতে হয়, তাহলে তার কোনও লজ্জা নেই। কারণ নিজের কাজকে ভালবাসে বলেই তাকে বাঁচতে হবে। এই কষ্ট পাওয়ার পথে সে বরঞ্চ মহৎ হয়। তাছাড়া একটা কথা বলি। একটা চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়বার পরই লোকের একটু একটু করে বোধ হয় যে চক্রটা কতটা vicious। তখনই যদি বেরিয়ে পড়বার সুবিধা না থাকে, তাহলে মানুষ তারই মধ্যে চেষ্টা করে যাতে নিজের জিনিসটাকে যতটা সম্ভব বাঁচাতে পারে। আমরাও তাই করেছি।

‘একদিন রাতে’র ব্যবসায়িক সাক্ষ্য ও চলচ্চিত্রোৎসবের পর আমাদের পক্ষে

একসঙ্গে দু-তিনখানা ছবি আরম্ভ করা শক্ত ছিল না। অথচ আমরা তা করিনি। ফের যাতে পয়সা নেই বলে compromise করতে না হয় তাই চুপ করে বসে থেকেছি, গল্পও তৈরি করেছি, তবুও ফাঁদে আবার পা দিইনি। আশা করছি, কোনও দিন হয়তো মনের মত করে ছবি করার সুযোগ হবে। আশ্চর্য যে করুণাশঙ্করবাবু ফিল্মের বাজার থেকে আমাদের এই অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেননি। এটা কিন্তু অন্য অনেকের লক্ষ্য এড়ায়নি।

আমি তো লেখক নই। আমি হাতে কলমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা কাজ করে থাকি। তাতে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়। আমার লেখাগুলো সেই অভিজ্ঞতার নোট মাত্র। জীবন ও শিল্পে যে বিরোধ বা কেমন করে সমন্বয় সম্ভব সে সম্পর্কে শেষ কথা পৃথিবীতে কারুর বলবার ক্ষমতা নেই। আমার তো নেইই।

কলিকাতা—১৭

শম্ভু মিত্র

‘নতুন সাহিত্য’র নিয়মাবলী

- ১। ‘নতুন সাহিত্য’ ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্র। প্রতি তিন মাসে একবার অর্থাৎ বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ-কাল বৎসরক্রমে : বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, ও মাঘ। বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা। বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা। শারদীয় অর্থাৎ কার্তিক সংখ্যা বাদে প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়। পয়সা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বর্ষারম্ভ বৈশাখে।
- ২। বার্ষিক ও বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্ত্যায় প্রথম সংখ্যা ভি-পি ডাকে পাঠানো হয়। গ্রাহকদের কপি স্বত্বসহকারে, ‘সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং’ নিয়ে পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও যদি কোন গ্রাহক পত্রিকা না পান, তিনি ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে ‘নতুন সাহিত্য’ কার্যালয়ে সংবাদ দেবেন। তবে সাধারণভাবে দ্বিতীয় বার পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না।
- ৩। তরুণ লেখকদের উচ্চ মানের ভালো রচনা সাদরে গৃহীত হবে। রচনা পাঠানোর তিন মাসের মধ্যে যদি লেখক কোন মনোনয়ন সংবাদ না পান তিনি ধরে নেবেন, রচনাটি অমনোনীত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ডাক টিকিট পাঠানোর প্রয়োজন নেই। অমনোনীত পাণ্ডুলিপি সাধারণতঃ ফেরত দেওয়া হয় না।
- ৪। পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি নতুন সাহিত্য ভবন, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সমালোচনার সূত্র ॥ সরোজ আচার্য

“যুগে যুগে বারবার লিখে লিখে
বারবার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে,
.....

তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আশ্রয়ে লেখো নূতন ভাষায় ।
যুগ যুগান্তর চলে যায় ।”

সাহিত্য সমালোচনার সূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ক-লাইন কবিতার সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে । সম্পর্ক যে কী তা বুঝিয়ে বলা সহজ নয় । তবু সাহিত্যের কথা, তার মূল্য বিচারের কথা ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে ঐ কটি লাইন গুন্ গুনিয়ে উঠছে ; অনেক বিচার এবং ব্যাখ্যা, তত্ত্ব আর তর্ক যুগে যুগে বারবার লিখে লিখে বারবার মুছে ফেলা হল । এখনও হচ্ছে । আর বিস্ময়ে, সংশয়ে অসন্তোষে, আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জর হয়ে তাই বার বার প্রশ্ন উঠছে,

“হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো কিরে কিরে ?”

এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন । সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে যুগে যুগে অনেকই তো লেখা হল, আরো অনেক হবে । তবু তৃপ্তি নেই ; সৃজন রহস্যের সব কিছু জানা হয়েছে, বেশ সাজান-গোছান ছক তৈরি করা গেছে এমন কথা বলবার মত মুঢ় দুঃসাহস নেই । নেই যে তাই বা বলি কী করে ? সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সাহিত্যের বাইরে, না ভেতরে, এ নিয়ে তর্কের লড়াই কম হয়নি ; সে লড়াই রাজনৈতিক এবং ভাবনৈতিক বিরোধের রং-ও কম চড়ানো হয়নি । প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া নামে দুটি মোটা দাগ টেনে সাহিত্যিক মূল্য যাচাইএর চেষ্টা চলছে এখনও ; সাহিত্য স্রষ্টার রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক শ্রেণীসংস্থান ইত্যাদিকে সমালোচনার সূত্র হিসেবে নেওয়া

হয়েছে। অনেক সময়ে গোঁণ হয়েছে রসের আশ্বাদন এবং উপলক্ষি। প্রাধান্য পেয়েছে সাহিত্যের বিষয় অথবা তত্ত্বের সামাজিক মূল্য-বিচার। এ অবস্থা নতুন নয়, প্রেটোর আমল থেকেই সাহিত্যকে বিশেষ কোন একটি দর্শন, ধর্ম কিম্বা নীতির মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা চলে আসছে। প্রগতিবাদের নামে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনাও অনেকটা এই তত্ত্বাত্মক ধারাকে অনুসরণ করেছে। তাতে সাহিত্য বিচারে অনেক নতুন, অর্থপূর্ণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু সমালোচনার সূত্র নানা মতবাদের চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে। অবস্থা হতবুদ্ধিকর হয়েছে বিশেষ করে কতকগুলি প্রগতিবাদী দেশের সাহিত্য বিচারপদ্ধতির হাকিমী কায়দার ফলে।

সাহিত্য বিচারে হাকিমী কায়দা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ধর্ম অথবা সুনীতির শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে চোখ রাঙানী আগের অনেক যুগেও ছিল, এখনও আছে। বিলেতে জেক্সীস এবং জন্সন আর এদেশের সাহিত্যিক সমাজপতিদের জবরদস্ত মতামতের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। তবে এইসব বনেদী সাহিত্য শাসকদের পেছনে রাষ্ট্রশক্তির কিম্বা কোন রাজনৈতিক দলের জোর ছিল না। এঁরা যা বলতেন নিজেদের জোরেই বলতেন এবং এঁদের অভিমত বতই সংকীর্ণ হোক না কেন, কোন সাহিত্যিকের উত্তমকে এঁরা দম বন্ধ করে মারতে পারেননি, সেরকম কোন উদ্দেশ্যও এঁরা পোষণ করতেন না। কীট্‌স “কোয়ার্টালির” সমালোচকের আক্রমণে মারা যাননি, লেখাও বন্ধ করেননি। চরম বিদ্বেষপূর্ণ বিরূপ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের অথবা কল্লোল গোস্বামীর সাহিত্যিক স্বকীয়তাকে, উত্তমকে বিনষ্ট করতে পারেনি। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মোটা দাগ-কাটা সাহিত্য বিচার পদ্ধতির নতুন যে ছক আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেছে, রসোপলক্ষি ব্যাহত করেছে, মূল্য বিচারে বিপর্যয় আনছে তার জুড়ি নেই আগের কোন যুগে।

কথাটা এবার আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার। সামাজিক তত্ত্বই কি সাহিত্য বিচারের প্রথম এবং শেষ কথা? জানি, একথার জবাবে ক্রুদ্ধ, মাও সে তুং নেহেরু এবং বিধানচন্দ্র রায় সকলেই একবাক্যে বলবেন, না, না, শিল্পকৌশল সাহিত্যে থাকাই চাই। কিন্তু এ হল যাকে বলা যায়, “কন্‌শেসন”, কিছুটা ঢিল দেওয়া, তবে অনিচ্ছার সঙ্গে ঢিল দেওয়া অর্থাৎ “গ্রাড্জিং কন্‌শেসন” (grudging concession)। সোভিয়েট দেশে গত চল্লিশ বছরে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং উপকরণ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার মোদা

কথা হল বিষয়বস্তুর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব মানতেই হবে। আবার মাঝে মাঝে যখন এই গুরুত্ব মানতে গিয়ে সাহিত্যের জীবনীশক্তি একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন দেওয়া হয়েছে ‘কনশেশন’। আমরা সোভিয়েট সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগ্রহের সঙ্গে, ধৈর্য এবং সহানুভূতির সঙ্গে অনেক আশা নিয়ে, মনোযোগ নিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্য বিচার ও সমালোচনার নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারা যাবে ভেবেছি তারা শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই চূপ করে গেছি। কী যে হচ্ছে তার তাৎপর্য বার করতে পারা যেন আমাদের সাধের বাইরে চলে গেছে। একমাত্র যা সাধের মধ্যে সে হল ক্রুশ্চেভের অথবা মাও সে তুং-এর সর্বশেষতম সাহিত্যিক নির্দেশ প্রস্বাদিতভাবে যেন নেওয়া অথবা না মেনে নেওয়া। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সাহিত্যিক আদর্শ এবং উদ্ভবের এই কঠিন বন্ধন কখনও কখনও অনিবার্য হতে পারে, তার ফল ভালো বা মন্দ হতে পারে। সে বিচার পরে হবে। আপাতত আমাদের ইতবুদ্ধির চিন্তাসংকটের কারণ হল এরকম বন্ধন আমাদের সাহিত্যিক রুচি এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলান কঠিন, অসম্ভবপ্রায়—সম্ভব কেবল অনুশাসনে অন্ধ বিশ্বাসী হতে পারলে। তা পারা সম্ভব নয়; মার্ক্স-এঙ্গেলসও সহজে পারতেন মনে হয় না।

সাহিত্যসমালোচনার যে প্রগতিবাদী সূত্র ত্রিশ দশক থেকে আমরা সন্ধান করছি তার প্রথম রচনাকার হিসেবে মার্ক্স-এঙ্গেলসকে স্বরণ করা করে উপায় নেই। সাহিত্যের সামাজিক উৎস এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্স-এঙ্গেলসের অভিমত সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা কখনও সাহিত্যিককে অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির বশব্দ ভৃত্য মনে করেননি। সাহিত্য-সৃজন প্রতিভাকে রাজনীতি-অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে তাঁরা দেখেননি। জার্মান সাহিত্যের একটি বিপুল ঐশ্বর্যময় যুগের অবসান কাল মার্ক্স-এঙ্গেলসের মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনায় রসবোধের অভাব ছিল না। গায়টের অসাধারণ সৃজনশক্তি ও স্বকীয়তাকে তাঁরা অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন শিল্পগত উৎকর্ষ বিচার করে। প্রচারধর্মী লেখার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাও ছিল সুস্পষ্ট। রাজনীতির বিচারে কবি হাইনের উপর মার্ক্স-এঙ্গেলস প্রসন্ন ছিলেন না, তবু তাঁর সাহিত্য-কৃতির মূল্য তাঁরা অস্বীকার করেননি। সেক্সপীয়র মার্ক্সের কণ্ঠস্থ ছিল; মার্ক্সের লেখায়ও দেখা যায় সেক্সপীয়র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। তা বলে সেক্সপীয়রকে অথবা গায়টেকে

কোন আটসাঁট সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ছকে ফেলবার চেষ্টা করেননি। এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য-শিল্পকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করতেই হবে, এমন কোন ইচ্ছিত মাস্ক-এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যায় না। তবে মানুষের অথবা সমাজের জীবনে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যখন একটিমাত্র চিন্তা, একটি মাত্র সংকল্প সবকিছু ভাবনা ধারণা উত্তম এবং উত্তোষকে কেন্দ্রীভূত করে। সে হল সংকটের বা আপৎকালের দাবি। ধরা যেতে পারে সে রকম সময়ে সাহিত্যের ধর্মও সে-ই একমাত্র লক্ষ্যে সমর্পিত হয়। তবে এরকম অবস্থা স্বাভাবিক নয়; সমস্ত মানবিক অল্পভূতিকে একটিমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ-বৈচিত্র্যের পথ রুদ্ধ করা হয়। সাহিত্যকে রাজনীতির অথবা বিপ্লবের হাতিয়ার করতে হবে এরকম দাবি কোম কোন সময়ে এবং অবস্থায় সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু এই দাবিকে সাহিত্যধর্মের পরম ও চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া মানে সাহিত্যের অপঘাত মৃত্যু। মাস্ক-এঙ্গেলস এমন কিছু যে চাননি তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এমন কি লেনিনও রাষ্ট্রবিপ্লবে অনন্তচিন্তা হলেও ভুলতে পারেননি যে সাহিত্য সৃজনের মানবিক সত্য রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মাস্ক-এঙ্গেলস দেখেছিলেন ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শ্রেণী আধিপত্যের ফলে মানুষের জীবন ঋণ্ডিত হচ্ছে, টুকরো টুকরো যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। তাঁরা মানুষের সর্বাত্মক মুক্তিই কল্পনা করেছিলেন। রেনেসাঁর পূর্ণাঙ্গ মানুষ, ও তার বহুমুখী স্ফুর্দ্দ প্রকাশ—লেনার্ডো ডাভিঞ্চির মত এই ছিল মাস্ক-এঙ্গেলসের আদর্শ। বেটোফেনের সোনাটা শুনে লেনিন একদিন বলেছিলেন, “রোজ এই সঙ্গীত শুনেতে পারলে আমি খুশি হতাম। অপূর্ব অতিমানবীয় সঙ্গীত এ; সব সময়ে গর্বের সঙ্গে আমি তাবি মানুষ কত পরমাস্চর্য কাজই না করতে পারে।” সাহিত্যে শিল্পে এই পরমাস্চর্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিকাশকে “বুর্জোয়া বিকার” মনে করেননি, মাস্ক-এঙ্গেলস লেনিন। তবে অবস্থা-ক্রমে লেনিন বোধ হয় নিছক সাহিত্যিক আবেগকে চিত্তবিক্ষেপকারী দুর্বলতা মনে করে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে হল আপৎকালের নিরুপায় সমাধান, সংকটের দাবি পূরণ। যার জন্ত লেনিন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিপর্যয় সুরে বলেছিলেন, “এসব সঙ্গীত বেশি শুনেলে মনকে অভিভূত করে, নিবোধের মত অনেক মিষ্টি কথা বলতে ইচ্ছে করে, যারা এই জঘন্য নরকে বাস করেও এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাদের আদর করতে ইচ্ছে করে।”

প্রেটোর দর্শনেও কবি, সৌন্দর্য্যস্রষ্টার উপরে এই রকম ভয় ; কবির মন ভোলায়, উন্মাদনা সৃষ্টি করে, বিস্ময়কর তত্ত্ব-চিন্তায় একাগ্রতা নষ্ট করে। দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মবাদী প্রেটো এবং মার্ক্সীয় বস্তুবাদী লেনিনের মনোভঙ্গির মধ্যে এখানে বিশেষ তফাৎ নেই। দু-পক্ষই সৌন্দর্যের বিস্ময়কর ক্ষমতায় মুগ্ধ, এবং সেজন্যই সাহিত্য শিল্পের মনোহারিনী প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার, সংযত করবার পক্ষপাতী। লেনিনের সময় থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্য এবং শিল্পকলাকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রলেটেরিয়ান ছকে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। তবে লেনিন নিজে এতে খুব উৎসাহ দেননি। পুস্কিন বুর্জোয়া কবি অন্তএব অপার্ট্য, এবং তার চেয়ে মায়াকভস্কি অনেক ভালো, এরকম উদ্ভট সাহিত্যিক মূল্য বিচারে লেনিন সাহিত্য দেননি। তবুও ধীরে ধীরে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্যিক মূল্য-বিচারের পদ্ধতিকে দলগত এবং শ্রেণীগত রাজনীতির নির্দেশে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হল। কেন এরকম হল তা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন নয়।

আমাদের দেশে যেমন পরাধীনতার যুগে তেমন রাশিয়ায় জারের আমলে সাহিত্যিক আবেগ কল্পনা ও স্বজনের একটা বৃহৎ ও মহৎ অংশের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল। সাহিত্যই ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের প্রধান বাহন। তার নিদর্শন অজস্র এবং অপূর্ব উনিশ শতকের বিপুল স্বজনশীল রাশিয়ান সাহিত্যে, পুস্কিনের, টুর্গেনেভের, টলস্টয়ের, গর্কির এবং আরো অনেকের লেখায়। কাজেই রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তফাৎ হল এই যে বিপ্লবের আগে যারা জনজীবনের উপাদান নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা তা করেছিলেন স্বচ্ছায়, জীবনের নিবিড় অনুভব থেকে প্রেরণা নিয়ে। এই সাহিত্য সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সমাজনির্ভর, জনমনের রূপকার। মার্ক্স এঙ্গেলস সাহিত্যকে এই স্বাভাবিক অর্থেই পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত দেখেছিলেন। “ডিক্টেটারশিপ অফ দি প্রলেটেরিয়েট” অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্বে সাহিত্যকে সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের কাছে সর্ব সমর্পণ করতে হবে, মার্ক্স এঙ্গেলস এতদূর পর্যন্ত বোধহয় কল্পনা করেননি। সোভিয়েট বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এরকম ঘটল তার কারণ মনে হয় প্রধানতঃ দুটি। এক হল, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, জারের আমলেও স্বজনশীল সাহিত্য রাজনীতিকে সহজভাবে আত্মস্থ করেছিল। বিপ্লবের পর নতুন সমাজ গঠনে সাহিত্যের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাই একনিষ্ঠ বলশেভিকদের মনে কোন দ্বিধা

ঘটেনি। সহজেই মার্ক্সবাদী সূত্রকে সরাসরি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত হল সাহিত্য তথা আর্ট একেবারে পুরোপুরি রাজনৈতিক হাতিয়ার। এর ফলে অতীতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তির সমালোচনায় দেখা দিল নানারকম উগ্র বিকার যার অনেকখানি হাশুকের, অর্থহীন; কিছুটা মাত্র সাহিত্যের পটভূমির সামাজিক তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কার করে সমালোচনার নতুন মূল্যবান একটি সূত্র সন্ধান করতে পারল। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অবশ্য নতুন নয়; প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক টে'নও এই ধরনের সমালোচনার একটি ধারা প্রবর্তন করেন। সে ধারাটির আংশিক মূল্য এখনও স্বীকার করতে হয়। তবে যেমন টে'নের সূত্র তেমনি মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বাস্তববাদী সূত্র, দুই-ই সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ও প্রকরণের সব নয়, কয়েকটি মাত্র দিকের উপর আলোকপাত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কোন্ সমাজে, কী অবস্থায় বর্ধিত, বিকশিত হয়েছে তা আবিষ্কার করলেই সব কিছু জানা বা বলা হয় না। সমালোচনার সূত্র তাই এক এবং অস্থিতির নয়। এঙ্গেলসও তার ঈর্জিত করেছিলেন। সামাজিক প্রতিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব সমালোচনার ভিত্তিভূমি হলেও সাহিত্যের স্বরাজ্য, প্রতিভার স্বকীয়তা এবং শিল্পকর্মের নিজস্ব বহুমুখী রীতি নীতি, এসবও সমালোচনার সূত্র রচনা ও প্রয়োগে একটা প্রধান অংশ দাবি করতে পারে।

গোড়ায় যে প্রশ্নের উল্লেখ করেছি—সাহিত্যের রসোপলব্ধি এবং মূল্যবিচারের ক্ষেত্র কি সাহিত্যের বাইরে না ভেতরে? এক কথায় এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, বাইরে এবং ভেতরে উভয়তঃ, তবে দুটোই পরস্পর-নির্ভর, একটি অণুটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। টি, এস, এলিয়ট এক জায়গায় বলেছেন, সাহিত্য সমালোচনার দুই প্রান্তে দু'রকম ভাস্কির ঝোঁক আছে। একটি ঝোঁক হল লেবরেটরীতে বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে সাহিত্যের সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি অথবা ধর্মের মালমশলা আবিষ্কার করা। আর একটি হল, বাক্যে বলা যায় লেবু নিংড়ে সবখানি রস বার করার চেষ্টা অর্থাৎ কোন লেখার ভাবানুবাদ করে, রকমারি ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যে ভাষ্যক্রান্ত করে সাহিত্যকে জীবন সম্পর্কচ্যুত ভিত্তিসর্বস্ব করা। প্রথম ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোল আনা বাইরে থেকে বিচার করবার যার বিষম পরিণতি দেখা যায় সর্বত্রাসী সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনায়। দ্বিতীয় ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোল আনা ভেতর থেকে দেখা যার পরিচয় মেলে শোষণী অস্তঃসারহীন কলাসর্বস্ব ভাববিলাসে।

একথা প্রত্যেক রসপিপাসুকে মানতেই হবে যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং আবেদন কেবল বাইরে থেকে সমাজতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করে কিম্বা কেবল ভেতর থেকে মাথুলী ব্যাখ্যার পদ্ধতি দিয়ে বোঝা যায় না। কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিই সূক্ষ্মমাত্র কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়। তার রূপ এবং মর্মগত রহস্য এমন জটিল যে উপাদানগুলো ভেঙে ভেঙে বার করলেই সমালোচনার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কিম্বা শেলীর “ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড”কে ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করলে কিম্বা সারার্থের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য বিচার করলে ওই অপূর্ব কবিতা দুটির সৌন্দর্য এবং শক্তির বিন্দুমাত্র স্পর্শ পাওয়া যায় না।

এখন আবার সাহিত্যকে রাজনীতি কিম্বা বিশিষ্ট কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠার গণ্য করার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, জারের আমল থেকেই রাশিয়ায় সাহিত্যের একটা প্রবল রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বিপ্লবের পর সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি প্রবলভাবে অনুভূত হল। প্রেটো থেকে লেনিন পর্যন্ত সাহিত্যের যে মনোহরণ ক্ষমতা অনুভব করেছিলেন তাকে নতুন সমাজগঠনে প্রচারধর্মী কাজে লাগানোর তাগিদ না এসেই পারে না। এরপর একদলীয় একনায়কত্বের অধীনে সাহিত্য সৃষ্টির হুকুমত বেশ করে এঁটে বসল “সমাজবাদী বাস্তবতা”র নামে। ত্রিশ দশকে “সমাজবাদী বাস্তবতা”র ফরম্যুলাস বা ফরমান কীরকম ছিল তার ২১টি সূত্র উল্লেখ করা অনায়াস হবে না। নীতি নির্দেশে বলা হল, আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্যের কর্তব্য হবে—

প্রলেটেরীয় পাঠককে শ্রেণী সংগ্রামে তার ভূমিকাটি বুঝতে সাহায্য করা। অতএব আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্য (১) প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা প্রকারান্তরে শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব ফলাফল দেখিয়ে দেবে; (২) লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সর্বহারা শ্রেণীর পুরোধার উপযুক্ত। এরকম নির্দেশের একাধি আদর্শনিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে মুশকিল এই যে, এমন কঠিন টাচে ঢালা সাহিত্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র জটিল ও বিপুল প্রবাহকে ধরা যায় না। সাহিত্যের দাবি এবং আবেগ সমগ্র জীবনের সমাস্তুরাল। সাহিত্যিকের সৃজনকর্ম সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হোক কেবল বাস্তব প্রয়োজনে নয়, মানবিক কল্পনার অবাধ সঞ্চরণের তাগিদেও, এ অস্বীকার করলে সাহিত্য প্রাণহীন বিকলাঙ্গ না হয়ে পারে না। ফর্মুলার এবং ফরম্যুলাসের

সাহিত্যকর্ম আজকের একদিনের ছোটোবড়ো প্রয়োজনের দাবি হয়তো পূরণ করতে পারে। কিন্তু তার স্থায়ী মূল্য সামান্যই। পেশাদার লেখা, প্রচারধর্মী লেখা, এর দরকার আছে, এরও ভালো-মন্দ বিচার আছে। কিন্তু এর দরকার এবং বিচার দিয়ে সমালোচনার সেই সূত্র পাওয়া যাবে না যা দ্বারা সামগ্রিক জীবনের পটভূমিতে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব।

প্রয়োজনের সাহিত্য এবং অপ্রয়োজনের সাহিত্য—এভাবে কখনো কখনো সাহিত্যকে ভাগ করা হয়। তার চেয়ে স্বীকার করা ভালো মানুষের জীবনে প্রয়োজনের বিচিত্র সমারোহে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়; প্রয়োজনের মাত্রা-ভেদ থাকতে পারে, সময় এবং অবস্থা বিশেষে কোন প্রয়োজন বিশেষ প্রাধান্য পেতে পারে। অনেক আকাজক্ষা এবং আবেগ কল্পনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হয়তো জমাখরচের হিসাবে ধরাই যায় না। মানুষ যন্ত্রও নয় আবার দেহহীন আইডিয়া মাত্রও নয়। তাই মানবিক সত্তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম সব প্রয়োজন মিলিয়েই জীবনপ্রবাহ। এই প্রবাহ থেকে যে কোন একটি মাত্র ধারাকে পৃথক করে নিয়ে বাঁধ দিলে মানবধর্মকে বিকৃত করা হয়। এককালে শাস্ত্র ও ধর্মের অনুশাসন এরকম কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল মানুষের ভাবনা ধারণা কল্পনা ও আচরণকে। তার প্রতিবাদেই পূর্ণাঙ্গ মানববাদের স্বপক্ষে লোকায়ত চিন্তা ও কর্মধারা গড়ে উঠেছিল দেশে দেশে রেনেসাঁ ও রেকরমেশনের যুগ থেকে। কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদ সেই সুদূর-প্রসারী বলিষ্ঠ মানববাদের ঐতিহ্যবাহী বলেই জেনেছিলাম। শ্রেণী সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজ হবে, স্বচ্ছন্দ হবে, মার্ক্স-এঙ্গেলস এই কথাই বার বার নানা ভাবে বলেছেন। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির কঠিন বন্ধন ও অনুশাসন মানুষের বহুমুখী সৃজনী আবেগকে একটিমাত্র কাটা খালে ঠেলে দেবে, এ যেমন অসহনীয় তেমনি অস্বাভাবিক।

সাহিত্য শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, স্পষ্ট কিম্বা অস্পষ্ট প্রভাব সব যুগেই থাকে এবং থাকবে। তা স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য। ‘ডিসিপ্রিন’ বা অনুশাসন তা নয়। রসসৃষ্টি এবং রসভৃগ্গির সঙ্গে “ডিসিপ্রিন” স্বাভাবিক ভাবে খাপ খায় না। ‘ডিসিপ্রিন’ আইনের মত এককাটা, ব্যতিক্রম মানে সেখানে ব্যতিচার। “ডিসিপ্রিনের” কড়া ব্যবস্থায় চমৎকারিছের কোন স্বাভাবিক স্বীকৃতি নেই। রসসৃষ্টি ও রসভৃগ্গি অন্য পাঁচটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্য রেখে চলবে এমন কোন কথা

নেই। ফ্রান্সিস টমসন লণ্ডন ব্রিজের তলায় শীতে অনাহারে জীবনমৃত অবস্থায় যে কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর ক্ষুধার নিরুত্তি হয়নি।

তবু কে বলতে পারবে যে ক্ষুধার নিরুত্তিটাই সব সময়ে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন? কোন আদর্শনিষ্ঠ মার্ক্সবাদীই এমন কথা বলতে পারে না; মালয়ের যে স্কুলমাস্টার ফাঁসির মধ্যে উঠে “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক” ধ্বনি দিয়েছিল সে তার নিজের ক্ষুধা নিরুত্তির কথা ভাবেনি। সাহিত্য সৃষ্ণনের সচ্ছন্দ আবেগকেও তেমনি কোন কঠোর একদেশদর্শী অনুশাসনের অধীনে ভাবা চলে না। একথা ঠিক যে, জীবনবিমুখতা, ভক্তিসর্বস্ব শোখীন কলাকৌশল সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতাকে নষ্ট করে। আবার অক্ষরে অক্ষরে সমাজ সচেতন হয়েও সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে নিতান্ত সাময়িক বক্তব্যের বাহন হয়ে পড়তে পারে।

কথা হল এই যে, সাহিত্য সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হলেও তার সামগ্রিক মানবিক সত্তা সব শ্রেণীর মানুষই অল্প বিস্তর অনুভব করে। “শেষের কবিতা”র কল্পনাময় রসোচ্ছল ভাবানুষ্ঙ্গ অথবা “হামলেটের” চিন্তাস্বন্দ্র শ্রেণীগত গণ্ডি ছাড়িয়ে মনকে অভিভূত করতে পারে, দল বা দর্শন বা রাষ্ট্রীয় নেতা তা ঠেকাতে পারে না। এর একটি কারণ কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি সর্বজনীন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সেগুলি একেবারে আলাদা আলাদা শ্রেণীর গণ্ডি বাধা নয়। তেমনি ভাষাও সামাজিক। তাকে কঠিন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না, যেমন যায় না প্রকৃতিকে, নিসর্গ সৌন্দর্যকে। সাহিত্য যেহেতু সমাজনির্ভর এবং অনেক বিকৃতি ও শ্রেণী সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, তাই সাহিত্যকে শেষ পর্যন্ত সমাজ সত্তার সঙ্গে কিছুটা সর্বজনীন সন্ধন্ধ রাখতেই হয়। রাষ্ট্র লুপ্ত হলে, পরিবর্তিত হলেও ব্যক্তি বা সমাজ লুপ্ত হয় না। তেমনি শ্রেণী বা দল বা মত লুপ্ত কিছা পরিবর্তিত হলেও সাহিত্য লুপ্ত হয় না। রাষ্ট্রবিচারে যে নায়ক, সাহিত্য বিচারে সে নায়ক না হওয়াই সম্ভব। রাষ্ট্রের কাছে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গান হচ্ছে “জনগণমন”। ব্যক্তির কাছে, সে ব্যক্তি যে কোন শ্রেণীরই হোক না কেন, বিশেষ একটি ক্ষণে হয় তো সবচেয়ে মধুর, গভীর, অর্থপূর্ণ হৃদয়ের ভাষা হল,

“ভালবাসি,

এই কথাটি জলে স্থলে কাছে দূরে

বাজায় বাশী।”

মূল্যবোধ ও সমাজ-ক্রান্তি ॥ অরবিন্দ পোদ্দার

॥ ১ ॥

সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রচলিত বস্তুবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যে, আমাদের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মনে স্নগভীর সন্দেহ। ভবিষ্যৎ কাল এবং সেই কালের মানুষ এই পরিবর্তনকে কোন সৃষ্টিশীল কর্মপ্রবাহে নিয়োজিত করতে পারবেন কিনা, সে জিজ্ঞাসার বিচার ভাবীকালের জন্ত নির্দিষ্ট থাক ; কিন্তু আমরা যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাঙ্কে আমাদের কৈশোর অতিবাহিত করেছি এবং তৎকালীন যুগমানসে ভিন্নতর আদর্শ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি, তারা এই পরিবর্তনের জন্ত অন্তরে কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ করি না, এমন নয়। বরং কোন কোন সময় একটু অধিক মাত্রায়ই করি এবং সেই দুর্ভাবনার বেদনাই পত্র-পত্রিকার আশ্রয়ে জীবন-সংকটের আলোচনারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনটা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যশ্রয়ী হয়নি, হলে ব্যথিত হওয়ার কারণ থাকত না। সেই ঐতিহ্যই আজ বিপর্যস্তপ্রায়। কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্ঘটনার আক্রমণে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি, তাও নিত্য অভিজ্ঞতায় আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল। তাদের মধ্য থেকে আমি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ এবং প্রভাবে চিরস্থায়ী দুর্ঘটনা দুটিকে—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালীন বঙ্গবিভাগ—আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করব, তাদের ধ্বংসের স্বরূপটিকে পুনরায় স্মৃতিপটে জাগরুক করার জন্ত নয়, এর অভিঘাতে ব্যক্তি-চেতনা কীভাবে আহত হয়েছে এবং সেই আঘাত তার জীবনদর্শনে কী রূপান্তর এনে দিয়েছে তা নির্ধারণ করার জন্ত। কেননা, এই রূপান্তরের মধ্যেই মূল্যবোধের পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করা বাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বঙ্গবিভাগ, বর্তমান বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমিতে, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার নিকষে দুটি দুঃপনের কলঙ্ক-রেখা। এই দুটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের যে বেদনা-বিক্ষত বিবর্তন, তা মানুষকে পরিচিত জগৎ, অভ্যাস, জীবনের প্রচলিত প্যাটার্ন ও নির্ভরশীল আশ্রয় থেকে উৎক্ষেপ করে তাকে এক ঘূর্ণাবর্তের ভরস্বে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই তরঙ্গ অনিশ্চয়তায় যেমন বিগ্নুক, ধ্বংসের দাপটে তেমনি ভয়ংকর ; তা অভিব্যক্তিতে

যেমন ব্যাপক, ব্যক্তির মানস-উপলব্ধিতে তেমনি তীব্র বেদনাদায়ক। এই তরঙ্গের আঘাতে উৎক্লিষ্ট হয়ে, জীবনের সমস্ত বাঞ্ছনীয় প্রিয়কে হারিয়ে, ব্যক্তি অনুভব করল যে, তার সমাজ, তার যুক্তিমর্ষাদাশীল মানবিক অস্তিত্ব, তার ব্যবহারিক শ্রেয়বোধ, সমস্ত কিছু থেকে তাকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে পৃথিবীতে তার বাস, এবং যে ঘটনাচক্রে তার জীবন বিঘ্নিত, তার সঙ্গে সমন্বিত বা অনুবন্ধ করে তার অস্তিত্বের কোন গ্রহণীয় ব্যাখ্যা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, হয়তো বা এটা তার সহজ উপলব্ধিরও অতীত। তাছাড়া, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় যে পৃথিবী এবং যে সমাজ-সত্য তার নিকট প্রতিভাত, তার আপন অস্তিত্বের সঙ্গে সেই পৃথিবী ও সমাজ-সত্যকে সমন্বিত করতে পারাও যেন তার পক্ষে একান্তই দুর্বল। সুতরাং, এক মনুষ্য-সমবায়ের অন্তর্গত থেকেও ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন, তার অস্তিত্ব ও দায়িত্ব-বোধ নেতিবাচক। প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতা তাকে নতুন করে একথা স্মরণ করায়। ফলে, তার পক্ষে এ-অনুভব অপ্রত্যাশিত নয়, সে যেন পৃথিবী চক্রের আবর্তনে বিচ্ছিন্ন নিষ্প্রয়োজনীয় এক কণামাত্র। সেই চক্রের আবর্তন, তার উদ্দেশ্য ও পরিণতি (যদি কিছু থেকে থাকে) তার নিকট গ্রহণীয় নয়, এমনকি বোধগম্যও নয়। এই অনির্দেশ্য অনমনীয় ঘটনা-স্রোতের প্রভাবে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা অত্র এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য।

বলা যেতে পারে, যে দুটো ঘটনাকে এই আলোচনায় টেনে এনেছি, বাংলা দেশের সর্বত্র এবং বাঙালী সমাজের সর্ব স্তরে তার প্রভাব সমান নয়, সুতরাং তার পরিণতিও সর্বত্র একরূপ নয়। স্বীকার্য, কিন্তু আমাদের আলোচনা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা স্তর সম্পর্কিত নয়। মনোভঙ্গির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। অধিকন্তু, কথাটা যুগধর্মের।

যদিও বহু কাল পূর্ব থেকেই অবক্ষয়ের চেতনা মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়ে চলছিল, তথাপি বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বঙ্গবিভাগকে আশ্রয় করেই, তার প্রহারে উৎক্লিষ্ট হয়েই, সেই চেতনা একটা সুস্পষ্ট পরিণতিতে এসে পৌঁছায়। সমাজ সম্পর্কে আমাদের যে পূর্বতন ধারণা—এখানে আমরা উদ্দেশ্যের সমগ্রতায় পরস্পরের প্রতি যমত্ববোধে এবং কর্তব্যের বিশিষ্টতায় মিলিত—সে ধারণা বর্তমানে অবলুপ্ত। এখনকার সমাজ অজস্র উদ্দেশ্যহীন, বিচ্ছিন্ন, কোন সামগ্রিক প্রেরণায় অনুরূপাণিত কণার সমবায়মাত্র, শৃঙ্খলাহীন, অনৈক্যবদ্ধ; সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধ বা বন্ধন এখানে অনুপস্থিত। এককভাবে

ঐ একেকটি কণা বা ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, শক্তিহীন, তার অস্তিত্ব অণু কারও কাছে অভিপ্রেত নয়, এমন কি, সম্ভবতঃ, নিজের কাছেও নয়। এ তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ফসল। এ থেকে ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে—ব্যক্তি ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীন প্রাণী মাত্র। প্রাণী না বলে বস্তু বলাই শ্রেয়। তার অস্তিত্ব উপেক্ষিত, অঙ্গীকৃত অতএব নিরর্থক। বহুকাল আগে বর্তমানের যুগবৈশিষ্ট্য আলোচনায় ই. এম. ফরমস্টার বলেছিলেন “Everything exists, nothing has value.” এই একটি উক্তিই আধুনিক যুগমানসের সার্থক পরিচয়। বর্তমান বাংলার সমাজ পরিবেশেরও। যুদ্ধ, বিপ্লব, মানবিক চেতনার ক্রম-অবনতি, ইত্যাদির ফলে অন্যান্য দেশে এই বোধের জন্ম বহু আগে হয়ে থাকলেও বাংলা দেশে এই বোধের স্বাক্ষর খুব বেশি দিনের নয়। যুদ্ধ ও দেশবিভাগ এই বোধকে অধিকতর গাঢ় করেছে। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এখনকার মানুষ-সমবায়ের কণাগুলোও অস্তিত্বশীল, কিন্তু শিল্পে প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য থাকলেও মানুষ-কণার কোন মূল্য নেই।

বাংলার অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের সহিত একদা সম্পৃক্ত, বাংলার ভৌগোলিক সীমানায় বিচরণশীল, বাঙালীর মানসপট এই নিরর্থকতার বোধে অপহত।

ব্যক্তিচিন্তে এই চেতনার উদ্‌বোধন সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের প্রধান অবলম্বন। তাই এই একটি সূত্রের মধ্যেই প্রায় সমস্ত রূপান্তরের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ, সমাজ যখন বিপর্যস্ত, আর কোন মানুষেরই আপন মূল্য যদি স্বীকৃত না হয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার জীবনের বা অস্তিত্বের যদি কোন মর্যাদা না থাকে বা তা যদি কোন উদ্দেশ্যের প্রভায় উজ্জীবিত না হয়, তাহলে মূল্যের জন্ত আমরাই বা শিরঃপীড়ার হেতু কি, অথবা আমার পক্ষে মূল্যবোধের ঐতিহ্য অন্বেষণের প্রেরণাই বা কোথায়! স্মরণ্য ঐ একটিমাত্র মানসিক পরিস্থিতি আধুনিক কালের অনেক আচরণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক।

মূল্য অথবা মূল্যবোধ নির্বন্ধক বা জীবন-নিরপেক্ষ নয়। বিশেষ মূল্যবোধে আস্থা বা ব্যক্তির চিন্তায় ব্যবহারে বিশেষ মূল্যের প্রকাশ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত এষণার পরিচায়ক, তেমনি তার বিচার বিশ্লেষণও সামাজিক ক্রম-সম্পৃক্ত। মানহাইম মূল্যবোধকে বলেছেন “traffic lights in the regulation of human behaviour.” কথাটি প্রাধান্যযোগ্য। মানব

সভ্যতাকে এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষের ভাবনা-মনন-আচরণকে বিশেষ ঐশ্বর্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল রাখতে হয়, এবং সেজন্যই মূল্যের চেতনা ব্যক্তিক পৃথিবীর ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে সমাজ-সীমায় পরিব্যাপ্ত হয়।* অবশ্য, একথা সৃষ্টিশীল মূল্যবোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশে আমরা সাধারণতঃ যে মূল্যবোধের প্রকাশ দেখতে পাই, সে সম্পর্কেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে আনন্দিত হতাম ; কিন্তু, বর্তমান সময়ে মানুষের বিচরণভূমি অর্থাৎ তার সমাজ এতটা পশুদন্ত যে এই অরণ্যে আলো বিকীরণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সুব্যবস্থিত স্পষ্ট আলো এখানে অনুপস্থিত। আমার মনে হয়, পূর্বে ব্যক্তিচিন্তে যে চেতনার উদ্‌বোধনের কথা উল্লেখ করেছি, এজন্য সেটাই বহুলাংশে দায়ী। সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে আকৃত ও অস্বীকৃত ব্যক্তি সেই আঘাত এবং অস্বীকারকে ফিরিয়ে দিতে উৎসুক, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণায় ততটা নয় যতটা জীবনাচরণের স্বাভাবিক প্রেরণাক্রমে। কারণ, এই “মূল্যবান” “বিশেষ” বলে স্বীকৃত হওয়ার আকৃতিতে তার মুহূর্তগুলো চঞ্চল। এই আকৃতি আত্যন্তিকতায় এতটা উদ্ভাস্ত যে ভালো-মন্দ ছায়-অছায় সুন্দর-কুৎসিত মর্যাদা বা মূল্যের প্রশ্ন তার চিন্তাকাশে প্রবেশ করার কোন অবকাশ পায় না। উপস্থিত মুহূর্তের চেতনা, এই মুহূর্তের কর্মোচ্ছোবে তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন। তাই, তার প্রত্যাখ্যাত সত্তা বিভিন্ন পথে অভিব্যক্তি খুঁজছে, যেমন কখনও কখনও ব্যক্তিক আচরণে ঔদ্ধত্য, যা শ্রদ্ধেয় বা মূল্যবান বলে একদা স্বীকৃত ছিল তার প্রতি অবজ্ঞা অবহেলার মাধ্যমে, কখনও বা রুচির স্থলতা, অপরিমার্জিত ইঙ্গিয়ানুভূতি ও ইঙ্গিয়াভিজ্ঞতার প্রতি অতিশয় আগ্রহের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি তার সর্ব প্রাপণীয় মূল্যের সাধনায় নিরত।

* “.....it is futile to discuss values in the abstract ; their study must be linked up with the social process. To us values express themselves first in terms of choices made by individuals ; by preferring this to that I evaluate things. But values do not only exist in the subjective setting as choices made by individuals : they also occur as objective norms, i. e. as advice ; do this rather than that.....Owing to this dual origin, valuations are partly the expressions of subjective strivings, partly the fulfilment of objective social functions.” Karl Mannheim — A Diagnosis of our Time.

বাংলা তথা ভারতবর্ষের মত অল্পবয়স্ক দেশের পক্ষে সম্ভবতঃ নিজেকে বৈদেশিক প্রভাবের নিকট উন্মুক্ত করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা সে প্রভাব কল্যাণকরই হোক অথবা অশুভই হোক। জীবন-পরিচালনার কোন ক্ষেত্রেই আমরা যৌবনের আশ্বপ্রত্যয় লাভ করিনি। সেজন্য বোধ-বুদ্ধি-মনন, এমন কি, ক্রটির ক্ষেত্রেও আমরা এ পর্যন্ত অনেকটা পরনির্ভর। আধুনিককালে এই পরনির্ভরতা স্তম্ভ মূল্যবোধের ওপর একটা দুর্বোলের আক্রমণ ডেকে এনেছে।

এ কথা বলছি একারণে যে, অনেকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করে থাকবেন কিছু সংখ্যক বাঙালীর অশনব্যসন ও পারিবারিক জীবনে ইয়াক্কি প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই এর সূত্রপাত। শুনতে পাঠ, অমৃত শিল্পসভারে সমৃদ্ধ আমেরিকা এ কালের বিশ্বয়; কিন্তু, সৃষ্টির মূল্যবোধ এবং পরিমার্জিত ক্রটির প্রকাশে সে যে এখনও অর্বাচীন তাও সন্দেহাতীত। মনে পড়ে, কোন একটি গ্রাহে মার্কিনী সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে একটি মজার গল্প পড়েছিলাম। একটি ক্রতগামিনী মহিলার দিকে তাকিয়ে একজন দর্শক আরেকজনকে বলছে, দেখেছ, মহিলাটি কী সুন্দর দেখতে! প্রশ্ন, কি করে বুঝলে যে তিনি সুন্দরী? উত্তর, Oh! she has excellent legs! বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য-নিরূপণের এই দৃষ্টিকোণ প্রশংসনীয় নয়। একে অমার্জিত বা স্থূল বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না; মনে হয়, আদিম অরণ্যের দেহ-অন্বেষণ অতিক্রম করে স্তম্ভ মানবিক রসানুভূতির মার্গে এর উত্তরণ আজও সংঘটিত হয়নি। অথচ, এবস্থিধ ক্রটি বাঙালীসমাজেও বেশ কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছে। কিছুকাল পূর্বে একটি প্রবন্ধে বাঙালীর শালীন ক্রটিবোধের ওপর পশ্চিম ভারতীয় philistinism-এর আক্রমণের উল্লেখ করেছিলাম; মেয়েদের পোশাক-আশাকের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা একটু অধিকমাত্রায় চোখে পড়ে। এর মূল প্রেরণা সম্ভবতঃ বহিঃপ্রিয়তা; কিন্তু বাইরের প্রতি অত্যধিক নজর যে অচিরেই একটা উৎকট বর্ণ-সমারোহে পরিণতি লাভ করে তা বলাই বাহুল্য। এখানেও যে ইয়াক্কি সৌন্দর্যভিলাষীর মনোভঙ্গি সক্রিয় নয়, তা কে জোর করে বলতে পারে।

ছেলেদের অঙ্গাবরণে তা অনায়াসলক্ষ্য। কোন বাঙালী যুবককে যখন গোরু-গর্দভ, চিত্রিত বিচ্ছিন্ন রঙীন হাওটোয়ান শার্ট পরে ডান কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে হন্ হন্ করে পথ চলতে দেখি, তখন যেন একজন ইয়াক্কি সৈনিককেই নবতরুপে পুনরাবিষ্কার করি, তার অপরিচীত ঐক্যতা যেন যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়ার জন্ত

উদ্ভূত। ব্যবহারিক দিক থেকে একরূপ পোশাকের উপযোগিতা বা অসুপযোগিতার প্রশ্ন উত্থাপন করছি না, শুধু বলার উদ্দেশ্যে, রুচির বিচারে এটা স্থূল, অশালীন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় প্রত্যেকটি বাঙালী পরিবারেই রুচির এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ পিতামাতাই, সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে, এই রুচিবোধের পরিপোষণ করে চলেছেন, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের পরিধেয় নির্বাচনে। অসুস্থরূপ পোশাকের প্রতি তাঁদের মধ্যে এক অকারণ পক্ষপাত।

এই সব সামান্য ঘটনার উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, তার মধ্য দিয়ে একটা মনোভঙ্গি, বিশেষ বস্তু বা বিচিত্র বর্ণ-সমারোহের প্রতি আকর্ষণ, অভিব্যক্ত। এবং সেই আকর্ষণই সম্ভবতঃ গোপনে তাদের নিজের এবং ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধকে এক দুর্বীর প্রলোভনে সেই স্থূলত্বের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, যেখানে অস্তুর সম্পদের চেয়ে বাইরের অজ্ঞাবরণের প্রতি, লাবণ্য থেকে দেহের প্রতি, সুসমার পরিবর্তে পরিমাণের ওপর নজর বেশি। উপস্থিত মুহূর্তের কর্মচাকল্যে, এই ক্ষণের অর্থ-মর্যাদা লাভের অতিশয় আকৃতিতে, ব্যক্তি-চেতনার রুচির পরিমার্জনার প্রশ্ন দাগ কাটে না; তার কাছে তা-ই মূল্যবান বা ঐ পথের সহায়ক। অথচ, কে না জানে, মূল্যবোধের এই পরিবর্তন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুকূল নয়, ধারাত্রয়ীও নয়। কে না জানে যে, এই স্থূলত্বের প্রতি অসুস্থরূপ বাংলার নিজস্ব শিল্পবোধ, তার মার্জিত জীবনচারণ, সামাজিক বিনয়, যুগযুগান্তরলব্ধ শ্রেয়স, ইত্যাদির পরিপন্থী! বাংলার সংস্কৃতি এ পথে নতুন পত্রপল্লবে বিকশিত হবে না, ঐশ্বর্যশালী হওয়া তো কল্পনাতীত। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যুদ্ধকালীন পরিবেশ থেকে ক্রমবর্ধমান ইয়াক্সি প্রভাব এর জন্মে কিঞ্চিদধিক দায়ী।

আর, এও নিশ্চিত যে, এই ধরনের বিশেষ বস্তুবোধ কদাচ সামাজিক মূল্য বলে স্বীকৃত হবে না। কারণ, মূল্য তো তখনই গড়ে ওঠে যখন সে ঐতিহ্যাত্মক, যখন সেই ঐতিহ্যেরই নবতর বিকাশ, সৃষ্টি ও বিবর্তনের পথে সে সহায়ক, যখন সে মানহাইম কথিত 'objective social functions,'-এর পরিপূরক। কিন্তু, একালের মনুষ্য-কণার সে দায় নেই; কারণ, পূর্বেই বলেছি, মনুষ্য-সমবায়ের ব্যক্তির অস্তিত্ব একরূপ অনভিপ্রেত। সুতরাং, তার মূল্যের বোধও কোন শ্রেয়সের চিন্তায় উদ্ভিন্ন নয়। ফলে, আমরা—একালের অধিকাংশ বাঙালী—এমন এক জীবনশ্রোতে ভাসমান, এমন এক বস্তুবোধে আশ্রিত যে, আমাদের জীবনে আমাদের জাতীয় সত্তা বিলুপ্তপ্রায়। আমাদের

ব্যবহারে, মননে, রুচির পরিচয়ে, শ্রেয়সের অন্বেষণে সে সস্তার কোন স্বাক্ষর নেই, কোন অভিব্যক্তি নেই। একটি উদাহরণ দিই। কলকাতা যে বাংলা-দেশেরই অন্তর্গত, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমি, একথা একমাত্র ভৌগোলিক অর্থে ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে প্রমাণ করা দুক্ল। অন্যান্য শহর সম্পর্কেও এ কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। বাঙালী যেন জনপ্রবাহের কলরবে বিম্বৃত ; তার শিল্পবোধ ধার-করা বহিরঙ্গপ্রিয়তায় মুগ্ধ ; জাতীয় সস্তা কপটাচারের অতিশয়তায় হতশ্রী।

পূর্বেই বলেছি, এ আচরণ অনেকটা নেতিবাচক, যেন একটা প্রত্যাঘাতের অভিব্যক্তি। আমার অস্তিত্বের মূল্য যখন স্বীকৃত নয় তখন মূল্যের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই—অনেকটা এই অসুভবের প্রকাশ। এটা জীবনের অন্যান্য প্রাঙ্গণেও লক্ষ্যণীয়। এ ক্ষেত্রে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে চাই। সম্ভ্রতি একটি সাহিত্য বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। বৈঠক ঘরোয়া, কিন্তু বৈঠক। নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন। আহূত ব্যক্তিদের প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েকজন বিদগ্ধ বলে অধ্যাত্ত তরুণ সাহিত্যিক আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রবন্ধ পাঠকদের স্পষ্টতঃ একথাই বললেন, “আপনাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই জানাতে পারি না।” কথাটা যত সত্যই হোক না কেন, ‘জনসভায় বলার মত কথা এটা নয় ; বাংলার শিষ্টাচারবিরোধী। যেমন শিষ্টাচারবিরোধী বৈঠকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সিগারেট ছুঁড়ে মারা। কিন্তু এই অশিষ্টাচারেরও সাক্ষাৎ পেলাম, এবং এমন সব লোকের মধ্যে যাদের শ্রেয়সের বোধ অমলিন বলে আমরা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়? উত্তরে, ব্যক্তির মানস-সংগঠন সম্পর্কে যে কথা বলেছি, সে কথাই পুনরায় স্মরণ করতে হয়।

এই অপ্রত্যাশিত আচরণের পশ্চাদবর্তী নীতিবোধগত প্রশ্ন অথবা উচিত-অনুচিতের সমস্তা উত্থাপন করতে চাই না। আমার বক্তব্য, যারা মূল্যের স্রষ্টা এবং যাদের বোধ-বুদ্ধি-মনন মূল্যের আশ্রয় তারা যদি অবক্ষয়ী চেতনার নিদর্শন হয়ে পড়েন, তাহলে সামাজিক অর্থে উপযোগী ও সৃষ্টিশীল মূল্যের নবরূপায়ণ কিরূপে সম্ভব? তাছাড়া তাদের মধ্যে এই ঔদ্ধত্যের অভিব্যক্তিই বা কেন? তা কি এ কারণেই নয় যে, একদা যা শ্রদ্ধেয় বা মূল্যবান বলে স্বীকৃত ছিল, সামাজিক শিষ্টাচারে বা নির্দেশিত ছিল, তা আজ অশ্রদ্ধেয়

বলে অনুমিত ? তা কি এ কারণেই নয় যে, ব্যক্তি সেই অশালীন অবজ্ঞায় উৎসাহী যে অবজ্ঞা তারই সামাজিক বিধিলিপি ? অবক্ষয়ী সমাজ, পারিবারিক জীবনে ভাঙন, পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্রম-বিলুপ্তি, সব মিলে যেন ব্যক্তিকে ঐ পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে যাকে আমরা নৈরাজ্য বলেই অভিহিত করতে পারি। সেখানে সে সর্বময় কর্তা, শ্রেয়সের চিন্তার সেখানে অনধিকারপ্রবেশ। নিঃসন্দেহ যে, সার্থক মূল্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ এ নয়।

সমাজ-পরিবেশে বিচরণশীল এই মনোভাবটি সাহিত্যের পাতারও তার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। এখানেও সাহিত্যের চাইতে অর্থের সম্মান বেশি, সাহিত্য সাহিত্যিকের ধ্যানবস্তু নয়, তাঁর স্বপ্ন অন্য এক আকাশের অভিসারী। কলে সাহিত্যকৃতির অবনতি। এখানেও বাইরের রূপসজ্জা ও চমক—সেটা বর্ণালী প্রচ্ছদেরই হোক বা লেখন-ভঙ্গিরই হোক—দিয়ে হৃদয় ভোলানোর প্রচেষ্টা, অন্তরের অতলে প্রবেশ করে হীরকখণ্ডের মত জলে-ওঠা নয়। অর্থাৎ, একপ্রকার নিষ্প্রাণ পাণ্ডুর সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস, যা ক্ষণিকের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসে, হৃদয় জুড়ে স্থায়ী আসন পাততে চায় না।

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রসারের দৌলতে সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা আয়তনে বিপুল হয়েছে, কিন্তু, এর অধিকাংশই জীবনচক্রের আবর্তনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কণামাত্র, যাদের অস্তিত্বের মূল্য স্বীকৃত নয় এবং সেই হেতু গভীর মনন উপলব্ধিতে উদ্বিগ্ন হওয়া যাদের মানস প্রকৃতি নয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাদের আবির্ভাব হালকা তরল রসপানের দাবিতে। দারুণ গ্রীষ্মে একটু আইসক্রীম বা এক গ্লাস সরবত পান করার মত। আইসক্রীমের ব্যবসায় ফেল করার সম্ভাবনা কম, তেমনি জলো হৃদয়রসের কারবারে নগদ প্রাপ্তিযোগ সুরক্ষিত। ব্যবসায়ীরা তো বটেই, সাহিত্যিকরাও চলতি বাজারের হুৎস্পন্দন অনুভব করে তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র লিখতে লাগলেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কয়েক বৎসর আগে “রম্য রচনার” ছদ্মগ এসেছিল। ইংরেজি রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনীর মত এসব গ্রন্থেরও যেখান থেকে খুশি পাঠ আরম্ভ করা যায়, আবার যেখানে খুশি থেমে পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করা সম্ভব ; তাতে রসের ইতরবিশেষ বা ঘাটতিও হয় না।

সম্প্রতিকালে যে দু-একটি গ্রন্থ অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে যাদের অনেকগুলো সংস্করণ নিঃশেষিত, তাদেরও ইতিহাস এই। হয় তারা ক্ষণস্থায়ী তরল ভক্তিরসের অতিশয়তায় ও

অলৌকিকতার আর্জ (‘পরমপুরুষ’ ইত্যাদি), নয়তো যৌন রোমাঞ্চ ও বৌভৎসত্য বিহীন (‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ ইত্যাদি)। একজন প্রবীণ ও প্রখ্যাত বাঙালী কবি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে একদিন বলেছিলেন, “হিংলাজ কারা বেশি পড়ে জান? যারা পরমপুরুষ পড়ে।” কথাটা আপাত বিসদৃশ এবং অসত্য প্রতীত হলেও বিষয়গত ঐক্য ও আবেদনের সমতায় অত্যন্ত খাঁটি। ঐ ছুটি গ্রন্থ, প্রকৃতপক্ষে ঐ দুই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থই, স্থির মূল্যবোধে অনাশ্রিত মনুষ্যকণার ক্ষণকালের আশ্রয়, অনবসর-বিক্ষুব্ধ মুহূর্তের আনন্দের উৎস ও সঞ্চয়; নিরর্থক অস্তিত্বের বিষণ্ণতায় এরা সরবতের স্বাদ এনে দেয়, পূর্বোক্ত শ্রেণীর পাঠকের চাহিদার এরা যোগানদার। সামাজিক মূল্য চেতনার বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রসার অবশ্যস্বাভাবী ও অরোধ্য, কিন্তু পণ্ডিত বলে খ্যাত ব্যক্তিরা এদের “মূল্যবান” বলে সার্টিফিকেট দেন, সেটাই সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। সম্ভবতঃ এটাও সমাজ-ব্যথির লক্ষণ, এবং পাণ্ডিত্য সন্দেহজনক।

তারপর চিত্রজগৎ। কোন মনুষ্যকণার পক্ষেই এর প্রভাব থেকে বিমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, কোন চিত্র উপভোগ না করলেও। আমাদের আশ্রয়হীন চিত্ত কত গভীর এক শূন্যতায় মূল্যবোধহীনতার বিবশ, আধুনিক চিত্রশিল্প তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কথাটা আমি সাধারণভাবেই বলছি, কারণ গভীর মানবিক সংবেদনার উজ্জ্বল, মূল্যবোধের অভিব্যক্তিতে ঐশ্বর্যশীল চিত্রের সাক্ষাৎ আমরা কখনও কখনও পাঠি। তাদের বাদ দিলে বাকী আর সব চিত্রের আবেদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যবস্তু অপরিপুষ্ট জৈব প্রবৃত্তি, নিয়গামিতা যার সহজ প্রকৃতি। ক্ষণিকের উচ্চকিত উল্লাসের ভেতর দিয়ে এরা ক্রমাগতই মানুষকে পেছনের দিকে টানে, সুদূর-বিস্তারী আদর্শের পথ থেকে সরিয়ে আনে। কারণ, সিনেমা শুধুমাত্র আনন্দ-নিকেতন নয়, বিশেষ কোন অভিনেত্রী মেয়েদের, বিশেষ কোন অভিনেতা ছেলেদের আদর্শপুরুষ। ব্যবহারিক জীবনে সেই আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা অনায়াসলক্ষ্য।

বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও বাংলায় কৈশোর স্বপ্ন ছিল সুভাষচন্দ্র বসু, এখন রাজ কাপুর। দুই কালের দুই আদর্শের পার্থক্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কিছু দিন পূর্বে স্কুলভবনের পাশে প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধনের প্রতিবাদে আহুত অভিভাবকদের সভার বাইরে ছেলেদের যে বিক্ষোভ হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাতেই একালের মূল্যচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। বলা বাহুল্য, এ চেতনা স্বচ্ছ নয়।

। ৩ ।

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ পরিসরে মূল্য-চেতনার স্বরূপ কি এবং কি ভাবে তার পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম ; এই আলোচনার মাধ্যমে আমার বলার উদ্দেশ্য, সৃষ্টিধর্মী মূল্যের বোধ সমাজ-মানসে উদ্ভাসিত না থাকায় এবং ব্যক্তি-চিন্তে তার অনুধ্যানের অভাবে একটা স্থূল বস্তু-নির্ভর বিবশতার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে । প্রাণস্পন্দন ও গতির প্রাচুর্য বিনষ্ট ।

তবু, আশার কথা, মূল্যবোধের এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আমাদের জীবনাচরণের কোন কোন প্রাঙ্গণে ক্ষীণ আলোর দীপ্তি লক্ষ্য করা যায় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আধুনিক কালে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনেকটা বিকশিত ও প্রসারিত, এবং সেই সৌন্দর্য-বোধকে দৈনন্দিন উপযোগিতার সঙ্গে মিলিত করার একটা প্রশংসনীয় উদ্যম দেখা যায় । স্নানের চেতনা বই-এর প্রচ্ছদ থেকে জানলার পর্দা, গৃহসজ্জা থেকে শাড়ীর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ও অভিব্যক্ত । শুনতে পাই, মাজিত শিল্পকলামণ্ডিত বিবিধ তাঁতবস্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে ; গৃহসজ্জার পরিপাটির দিকেও পূর্বাপেক্ষা সজাগদৃষ্টি । সেজন্য প্রায় বিলুপ্ত কুটিরশিল্প পুনরায় সমাদৃত হচ্ছে ; গৃহসজ্জায় কৃষ্ণনগরের পুতুল আর বিষ্ণুপুরের ঘোড়ার ডাক পড়েছে, মণিপুরী ও শাস্তিনিকেতনী ডিজাইন বিছানা ঢাকনিতে রাউজে ফুটে উঠছে । ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কুটির ও তাঁতশিল্প বাঙালীর ঘরে আদৃত ব্যবহৃত হচ্ছে । এই অনুরাগের ধারা যদি অব্যাহত থাকে এবং ক্রমে তা লোকায়ত হয়, তাহলে সৃষ্টির সৃষ্টিশীল মূল্যবোধের আবির্ভাবে তা সহায়ক হবে বলে আমার নিশ্চিত প্রত্যয় । অবশ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনঃসংগঠন—যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিক অস্তিত্ব অস্বীকৃত না হয়ে সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে স্বীকৃত হতে পারে—না হলে যথার্থ মূল্যের সৃষ্টি, এবং সেই মূল্যকে পুনরায় ঐতিহ্যশ্রয়ী করা সম্ভব নয় । জীবনের অন্যান্য দিকে মূল্যের চেতনা এই সংগঠনকেও কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করতে পারে । সেইজন্য, উদ্বোধনের মধ্যেও পূর্বোক্ত কারণে আমি আশাবাদী ।

আসল সমস্যা, পরস্পরবিচ্ছিন্ন মনুষ্য সমবায়কে সত্য অর্থে মানুষের সমাজে পরিণত করা এবং সমাজে সমন্বিত শক্তির ঐশ্বর্য, যৌবনের কর্মোদ্যম, সামগ্রিক আদর্শের উদবোধন এবং অবিচ্ছিন্ন গতির উচ্ছ্বাস ফিড়িয়ে আনা । এ প্রসঙ্গে সৃষ্টির ঐশ্বর্যশীল সমাজ-সম্পর্কে হোয়াইটহেড যা বলেছিলেন, তাও স্মরণীয় ; তিনি বলেছিলেন, “The vigour of civilized societies is preserved

by the widespread sense that high aims are worthwhile. Vigorous societies harbour a certain extravagance of objectives, so that men wander beyond the safe provision of personal gratifications. All strong interests easily become impersonal, the love of a good job well done.” অর্থাৎ, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা, সেই আদর্শকে সমাজ-মানুষের চিন্তে উজ্জীবিত রাখা, বস্তু থেকে আদর্শের অধিক মূল্য দেওয়া, ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমেই সভ্যসমাজের সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা অতিশয় বা বাহুল্য, তাকে মূল্য দিয়েই ব্যক্তিকে তার ক্ষুদ্র স্বার্থ-সীমানা থেকে বৃহত্তর সীমায় টেনে আনা হয়। সমাজ স্পন্দিত হয়। আমাদের আদর্শ সূর্য-সন্ধানী হোক, এবং ব্যক্তির চিন্তাকাশে সেই আদর্শ জলে উঠুক এক একটি উজ্জল নক্ষত্রের মত। মূল্যবোধের অরাজক স্থলত্ব থেকে মুক্তিলাভের সেই পথ। এবং আমাদের ব্যক্তিক ও সামগ্রিক অস্তিত্বকেও বোধ হয় এ পথেই মূল্যবান করা সম্ভব। সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা, শিক্ষা, রাজনীতি ও ব্যবহারিক কর্মজীবন—জীবনের সর্বক্ষেত্রের কর্মীরা যত বেশি সমস্তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন, ততই আশার কথা।

মেঘলা আকাশ ॥ অনিলকুমার সিংহ

● ● এক ● ●

কিছুক্ষণ আগে মল্লিক বাস সার্ভিসের 'ফুল্লরা' মিনিট কয়েকের বিশ্রাম নিয়ে কয়েকজন যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে পলাশতলি চলে গেছে। এখন রাস্তাটা কাকা। ধুলোর কুয়াশাও প্রায় মিলিয়ে গেছে। বাস যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে যে জায়গাটায় রেডিয়েটরের জল পড়ে পড়ে খানিকটা কাদামত হয়েছে, সেখানে দুটো রোঁয়া-ওঠা কুকুর লুটোপুটি খাচ্ছে, সোহাগ কাড়াচ্ছে। বাস-স্টপের পাশে রাস্তার ধারে টিন আর কাঠের জোড়াতালি লাগিয়ে পান-বিড়ির যে দোকানটা গত কয়েক বছর ধরে সমানে বিকিকিনি চালিয়ে আসছে সেটাও এইমাত্র বন্ধ হয়ে গেল। বিকেলের আগে আর বিশেষ বেচাকেনা হবার সম্ভাবনা নেই। এখন কিছু কালের জন্যে রাস্তাটা বিশ্রাম নেবে, ক্রান্তিতে ঝিমিয়ে থাকবে। কেবল মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে উঠবে দু-একটা মোটর বা বাসের কচিং ষাতায়াতে।

বাস-স্টপের অপর দিকে একটা খড় বোঝাই গোরুর গাড়ি গত রাত থেকে ঢাকা ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে। বট গাছের ছায়ার নিচে খড়ের ছাউনি বানিয়ে বড় বড় দুটো ঘড়া ভরতি জল নিয়ে পিপাসার্তদের তৃষ্ণা মেটায় যে লোকটা, সে ছাউনির এক পাশে বসে বসে ঢুলছে। দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথাটা যেন স্থির হয়ে আছে তার। গরমে চোখের পাতা দুটো বুকি বুজে আসতে চাইছে ক্রান্তিতে। এটা মহাবীরের জলসত্র। প্রতি বছরই গরম জাঁকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর এসে হাজির হয়। নিজের হাতেই ছাউনিটা বানায়। তিন-চার মাসের জন্যে আসর জমিয়ে বসে। আবার বর্ষার শুরুতে মহাবীর কোথায় উধাও হয়ে যায় কেউ খোঁজ রাখে না। শোনা যায় কোন এক ধনী মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর দাক্ষিণ্যে এষ্ট জলসত্রের আবির্ভাব ও অস্তর্ধান।

মহাবীরের ছাউনির ঠিক উল্টো দিকে একটা দোকান। চায়ের দোকান। টিন আর দরমার মিশ্রণে তৈরি একটা চালাঘর। চালাঘরের এক ধারে উল্লুনের

ওপর জল ফুটছে। আর তারই পাশে একটা টেবিলে পর পর কয়েকটা কাঁচের গেলাস ও বিস্কুটের বয়েম সাজানো। সাজানো আম কাঠের কয়েকটা টেবিল আর বেঞ্চি। দোকানের মালিক জগন্নাথ দাস ওরফে জগাই যে একটু কাল আগেও ব্রহ্মবাস্ত হয়ে বাসের যাত্রীদের হাতে চায়ের গেলাস তুলে দিয়েছে ও হেসে হেসে চেনা-পরিচিতদের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছে সে এখন কিসের চিন্তায় যেন ভারাক্রান্ত। মনে হয় কোন দুঃসংবাদ পেয়ে ধমকে গেছে সে। নাকি জীবনের কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

জগাইয়ের দোকানের কয়েক গজ দূরেই একটা লেভেল ক্রশিং। লেভেল ক্রশিংয়ের গেটটা খোলা। গেট কখন খোলে কখন বন্ধ হয় কেউ বলতে পারে না। এমন কি গেটম্যান দীনদয়াল তেওয়ারীও নয়। কারণ গাড়ি যাতায়াতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। শাখা লাইন স্টেশন থেকে বেরিয়ে কোলিয়ারি পর্যন্ত গেছে। কয়লা-বোঝাই ওয়াগন এই সাইডিঙে যাতায়াত করে। কখনো কখনোও একটা কি দুটো নিঃসঙ্গ এঞ্জিন হুইশল বাজিয়ে বীরবিক্রমে বেরিয়ে যায় ধোঁয়া উড়িয়ে। পথচারীরা সেই দিকে তাকিয়ে কোঁতুক বোধ করে, কোঁতুহলও। দীনদয়াল লেভেল ক্রশিংয়ের এক পাশে তার ছোট্ট এক কামরা ঘরে সর্বদা মোতায়ন থাকে। কখনও ঘরের মধ্যে বসে হিন্দী রামচরিত পড়ে, কখনও ঘরের বাইরে বসে বসে ভাং বাটে আর সুর করে গান গায়। কিন্তু তার দড়ির খাটিয়াটা সদাসর্বদা ঘরের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঐ খাটিয়াটাই দীনদয়ালের প্রসঙ্গ।

রাস্তার এক দিকে নদী। অপর দিকে প্রশস্ত মাঠ পেরিয়ে দুটো কোলিয়ারি। আসলে কোলিয়ারি একটাই। কারণ দ্বিতীয় কোলিয়ারিটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কোন এক বাঙালী ব্যবসায়ী খনিটা কেনার পর ছয় মাসও চালাতে পারেনি। অনেক টাকার লোকসান দিয়ে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি' বলে কলকাতায় পালিয়েছে। তাই কোলিয়ারি একটাই। প্রীতমসিং গ্রেবালের সিঙ্কুলিয়া কোলিয়ারি। তবে দূর থেকে কোলিয়ারি বলতে বোঝায় কিছু লোহা ও ইম্পাতের ইমারত আর কিছু ঘর বাড়ি। কালো কালো কয়লার স্তুপ আর ধোঁয়া, কিছু মানুষের ব্রহ্ম আনা-গোনা আর ব্যস্ত গুঞ্জন। অথচ এই খনির নিচে কাজ করে প্রায় অর্ধ সহস্রের মত মানুষ। তারা কখন নিচে নামে আর কখন ওপরে ওঠে আর ওপরে উঠেই ছড়িয়ে পড়ে জনপদের আনাচে কানাচে বোঝার উপায় নেই। তবে যখন ঐ কালিঝুলি-মাথা অসংস্কৃত

মানুষগুলোর জমায়েত বসে বা হৈহুল্লা হয় তখন আকাশের পর্যন্ত টনক নড়ে।
সাড়া পড়ে যায় সারা তল্লাটে।

এইমাত্র টেলিগ্রাফের তারে বসে ছোটো কাক দোল খাচ্ছিল আর ভূয়ো দার্শনিকের
মত সমস্ত প্রাস্তরটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কাক ছোটো উড়ে যেতেই
তারগুলো নড়ে উঠল একসঙ্গে। এক প্রাস্ত থেকে আরেক প্রাস্ত পর্যন্ত পৌঁছল
তার নিঃশব্দ শিহরণ।

সেই নিঃশব্দ শিহরণ আর নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঠি তুলল জগাই।
বেষ্টিতে বসে বসেই আড়মোড়া ভাঙল হাত-পা ছড়িয়ে। কেমন একটা
ক্লান্তি আর আলসেমিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার সারা শরীর। শরীর নয়,
মন। মনের রক্তে রক্তে একটা অব্যক্ত ও দুবিনীত ক্লান্তি শরীরের সমস্ত
গ্রন্থিগুলোকে যেন ক্রমেই শিথিল করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে বেষ্টি থেকে
উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জগাই মনে মনে বলল : বেলা হয়েছে।
মেঘে মেঘে অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেছে তার অলক্ষ্যে। আকাশের দিকে
নজর করলেই বোঝা যায় বেলা হয়েছে। অস্তুত যারা প্রতিনিয়ত আকাশ
দেখতে অভ্যস্ত বা আকাশ দেখতে ভালবাসে কিংবা যারা আকাশের দ্রুত
পরিবর্তনশীল রূপরেখার মধ্যে নিজেদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখে আনন্দ
পায় তারাও ঋতুনির্বিশেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঘড়ির পরোয়া না করেই,
বলতে পারে কতটা বেলা হয়েছে। নদীর বালিয়াড়ির ধার দিয়ে দিয়ে কতটা
স্রোত বয়ে গেছে এক শাখা থেকে আরেক শাখায়।

জগাই তেমনি নির্জন রাস্তা আর ধমধমে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে
পারল : বেলা হয়েছে। অর্থাৎ দোকানে ঝাঁপ ফেলার সময় হয়ে এসেছে।
আজ ছুটির বার, হাটবার। এখন আর কেউ তার দোকানে চায়ের সন্ধান
বা ছ-দণ্ড বিশ্রাম নিতে আসবে না। এখন সে অনায়াসে দোকানের সামনে
ঝাঁপটা নামিয়ে দিয়ে স্নানের জোগাড় করতে পারে। স্বৈরাচার শরীরের সমস্ত
ক্রেদ ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েও জগাই আবার বেষ্টিতে বসে পড়ল। কতুয়া থেকে
চিঠিটা বের করে আরেকবার পড়তে বসল। মনটা কেবলই খুঁত খুঁত করছে
তার।

চিঠিটা এসেছে সকালের ডাকে। নবাবগঞ্জ থেকে। এক বছর আগে যে
নবাবগঞ্জকে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছে জগাই সেই নবাবগঞ্জ। যে নবাবগঞ্জে

আর কোনদিনও ফিরে যাবে না। বনে প্রতিজ্ঞা করেছে জগাই সেই নবাবগঞ্জ। পত্রলেখক বনমালী সামন্ত জগাইয়ের সহকর্মী। নবাবগঞ্জের এক কাপড়কলে তাঁত ঘরে কাজ করে সে। আকাধিকা অক্ষরে বিচিত্র বানানের সমাবেশে চিঠিখানা সে-ই লিখেছে জগাইকে। আর তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। যতবারই চিঠিখানা পড়ছে জগাই ততবারই অন্তমনস্ক হয়ে পড়ছে। অতীতের স্মৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার মনকে। চিঠিখানা এই রকম :

শ্রীশ্রীকালিমাতা শহায়

ভাউ জগাইদা,

বহুদিন তোমার চিঠি পাঠি নাই। আসা করি সকল সন্বাদ মঙ্গল। আসা করি ইশ্বরের রূপার তোমার দোকান ভালোই চলিতেছে।

তোমাকে আজ এক সুসন্বাদ দিবার নিমিত্ত এই চিঠি দিতেছি। মোদের কোম্পানি এক বছর আগে তোমাকে অন্তায় করিঞা ভাটাই করিঞাছিল। সে সময়ে মোরা কিছু করিতে পারি নাই। প্রতিবাদ করে এমন শক্তি সে সময়ে মোদের ইউনিয়ানের ছিল না। তুমি হয়ত সেজন্ত মনে মনে কষ্ট পাইঞাছ। মোদের উপর রাগ করিঞাছ। তুমি যেদিন মনকটে নবাবগঞ্জ ছাড়িয়া গেলে সেদিনের কথা মোরা ভুলি নাই। যাহা হউক তুমি চলিয়া যাউবার পর কোম্পানির অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। সেকারণে মোরা গত মাসে সকল দাবিদাবা একত্র করিঞা ধর্মঘট করি। সেই ধর্মঘটে মোদের জিত হইঞাছে। মোদের সকলের দশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িয়াছে। মোদের ইউনিয়ান বহুগুণ শক্তিশালী হইঞাছে। মোদের আর একটি দাবি ছিল : তোমাকে কার্ষে ফিরাইঞা লইতে হইবে। কোম্পানি তাহাতে সম্মত হইঞাছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিও। দোকানের ভার আর কারো হাতে দিও। কিন্তু বিলম্ব করিও না। আসিয়াই চাকরিতে জয়েন করিবে। বোগেন, গদা, ছেদী সিং, মনসুর, অটল—সবাই তোমার নাম করে। সবাই তোমাকে কাছে পাইতে চায়। অতএব সম্মত চলিঞা আসিতে বিধা করিবে না। ইতি—বনমালী

চিঠিখানা ফড়ুয়ার পকেটে রেখে জগাই আবার ভাবতে বসল। এখন কী করবে সে? কী করা উচিত তার। নবাবগঞ্জে আর সে কোনদিন ফিরে যাবে না। এক বছর আগে ট্রেনে করে শেয়ালদা আসতে আসতে জগাই সর্বাস্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞাই করেছিল। কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞার কথা

বনমালীকে জানায় কী করে। বনমালী কি সে কথা শুনবে। যোগেন্দ্র মনস্কর
ওরা কি ক্ষমা করবে জগাইকে।

এক বছর আগেকার স্মৃতি জগাইয়ের মনের ওপর এক গুচ্ছ মেঘের মত
কালো ছায়া ফেলল।

ম্যানেজারের মুখের ওপর কথা বলার জন্তে যেদিন জগাইয়ের চাকরিতে
জবাব হয়ে গেল সেদিন ফাল্গুনের শেষ। মেঘের পাল তুলে ছরস্তু আকাশের
চারদিকে সেদিন ঝড়ের আয়োজন। হুর্ধোগের ঘনঘটা সেদিন কেতকী কটন
মিলেও। সামান্য কারণে বিস্ফোরণ হয়ে যুদ্ধের মধ্যে একটা মানুষের চাকরি চলে
গেল। ছ-বছরের পুরনো চাকরি খুঁয়ে বেকার হয়ে বসল একটা মানুষ। জগাই
সেদিন প্রতিকারের আশায় তার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়েছিল। ভেবেছিল
সবাই দল বেঁধে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। প্রতিবাদ করবে। প্রয়োজন
হলে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু যখন সামান্য গুঞ্জন তুলেই সবাই চুপ করে গেল,
এমনকি যোগেন্দ্র, অটল, ছেদী সিং, মনস্করের মত মুখর মানুষরাও মুখ খুলতে
সাহস পেল না, হতাশায় এতটুকু হয়ে গেল জগাই। সারা সন্ধ্যা রাস্তায় রাস্তায়
টহল দিয়ে বেড়াল। তারপর মহল্লার ভাটিখানায় গিয়ে একতলা সরাবের মুখোমুখি
বসে পাগলা মেহের আলির মত চিৎকার করে উঠল সে, ‘সব খুটা হ্যর’।
আর তারপর রাত যখন জমজমাট, সঙ্ক্যা যখন সাত-রঙা রামধনুর মত রঙিন
জগাই টলতে টলতে অধ্যাত বস্তির সামনে এসে দাঁড়াল উদ্ভ্রান্তের মত। যে
চাঁপালতার বিলোল কটাঙ্ককে সে বছরদিন ঘুণায় উপেক্ষা করে গেছে, যার
রঙিন কাঁচুলির আকর্ষণ তাকে এতটুকু মোহিত করতে পারেনি, তারই কাছে
স্বচ্ছায় ধরা দিল জগাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাঁপালতার রূপ-বোঁবন নিরীক্ষণ
করেও যখন জগাই নিশ্চিয় হয়ে বসে রইল, হতচকিত হল চাঁপালতা। বিস্ময়ে
বিমূঢ় হল উন্মত্ত মানুষের সংঘম দেখে। সত্যি সত্যিই মানুষটা যেন কি!
অনেক মানুষ ঘেঁটেছে চাঁপালতা। অনেক নিরুত্তাপ মানুষকে যুদ্ধে উত্তেজিত
করে উন্মত্ত পশুতে পরিণত করেছে সে। কিন্তু এমন বিচিত্র মানুষ তো কোনদিন
তার ঘরে আসেনি। চাঁপালতা জগাইয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।
তারপর মধ্যরাত্রির প্রহর ঘোষণার পর জগাইয়ের নিরুত্তাপ অক্ষম অসহায় দেহের
দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসতে হাসতে কপালে করাঘাত করল চাঁপালতা।
বলল, ‘হা রে পুরুষ! আজকের রাতটাই বরবাদ হয়ে গেল! পুরুষমানুষ
নোস তো মেয়েমানুষের কাছে এসছিস কেন?’ কথাটা শুনে বিহ্বলপৃষ্ঠের মত

চমকে উঠেছিল জগাই। তারপর কাপড়টা কোনরকমে জড়িয়ে নিয়ে পাঁচ টাকার একটা নোট চাঁপালতার বিছানায় ফেলে রেখে ঘর ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিল সে। পেছনে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল চাঁপালতা। নিরাবরণ চাঁপালতার পান খাওয়া ঠোঁটে সেই হাসির হিল্লোল দেখার সাহস জগাইয়ের হয়নি। চাবুক খাওয়া কুকুরের মত সে টলতে টলতে পালিয়ে এসেছিল।

বিকলে কারখানার ম্যানেজার তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে যতটা না অপমান করেছে, চাঁপালতার অপমান তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে বাজল তার বুকে। সেই দিন, সেই রাতে জগাই তার ছারপোকা-অধ্যুষিত বিছানায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে করতে স্থির করল : নবাবগঞ্জ ছেড়ে সে চলে যাবে। একদিন কিসের আকর্ষণে সে মৃত্তিকার টান ছেড়ে এই কারখানা অঞ্চলে কাজ করতে এসেছিল তার মনে নেই। তবে গত দু-বছরের শ্রমিক জীবন তার সমস্ত প্রাণশক্তি তিলে তিলে শুষে নিয়েছে। কারখানা এলাকার ভিড়, হৈ হুজু, বেলেপ্পাপনা, ফোর-টোয়েন্টিবাজি, দাঙ্গা, সরাবের দোকান, মালিকের জুলুম আর হাজার হাজার খেটে-খাওয়া মানুষের দৈন্ত জগাইয়ের মনে একটা উপলব্ধিই সঞ্চারিত করেছে। তা হল নগরের এই মানুষের তৈরি দীনতার চেয়ে, প্রাস্তরের প্রাকৃতিক রিক্ততা অনেক ভালো। তাই বনমালী, ছেদী সিং, মনসুর কারো সাহায্যই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। তার সঞ্চিত তিনশো টাকার সম্বল নিয়ে জগাই এই নাপিতডুবিতে এসে আশ্রয় নিল। দীনদয়াল তেওয়ারী কোলিয়ারির ম্যানেজারকে বলে কয়ে এই পরিত্যক্ত অটচালাটা জুটিয়ে দিল তাকে। চায়ের দোকান করে বসল জগাই। এতে সুখ না থাক, স্বস্তি আছে। অন্তত দশটা মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে জীবনের গভীরতর তলদেশে ডুব দেবার অবকাশ পায় জগাই।

তবু সময়ে অসময়ে বার বারই তার মনে পড়ে যায় নবাবগঞ্জের কথা। চলে আসার দিন গদা, বনমালী, যোগেন, অটল, ছেদী সিং, মনসুর ও আরও অনেকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছিল জগাইকে। বনমালী বার বারই একটা কথা বলছিল, ‘দেখো, তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে, জগাইদা। মোরা মজুর মানুষ। খেটে খাওয়াই মোদের জীবন। এ কারখানা নয় তো ও কারখানা। পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়, জগাইদা?’

মনসুর থেকে থেকে যুঁহু প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, ‘সেদিন আর নেইরে বনমালী। দিন পাল্টেছে। মোদের দিন আসছে এবার। আজ হারতে পারি। কাল

জিতবট।' মনস্কর মুহু কণ্ঠে কথা বলছিল বটে কিন্তু থেকে থেকে আকাশের দিকে কেবলি তুলে তুলে ধরছিল তার কালো শীর্ণ মুঠিটা।

জগাইয়ের কিন্তু সেসব দিকে মন ছিল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। একেবারে অন্য জগতের কথা। এতগুলি বন্ধুকে হারাতে হবে—সে কথা নয়। ম্যানেজারের জলদগন্তীর শাসানির সামনে মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল সে— সে কথা নয়। এমন কি তার অনিশ্চিত জীবনের কথাও নয়। সে ভাবছিল চাঁপালতার কথা। চাঁপালতার সেই মর্মবিদারী হাসির সঙ্গে ততোধিক মর্মবিদারী উক্তি : 'হা রে পুরুষ ! আজকের রাতটাই বরবাদ গেল ! পুরুষমানুষ নোস তো মেয়েমানুষের ঘরে এসেছিস কেন ?'

সেদিন যদি চাঁপালতাকে ধরাশায়ী করতে পারত জগাই। যদি তাকে সবল বাহুর বাধনে বাধতে পারত তাহলে খুশি হত সে। ভেঙে ধান ধান হয়ে যেত চাঁপালতার দস্ত। কিন্তু পারল না। কেন পারল না ? তা কি জগাই নিজেই জানে। নিয়তি তার সঙ্গে প্রথম দিনেই এমনভাবে পরিহাস করল কেন ? জগাই বহুবার নিজের মনকে এই প্রশ্ন করেছে। কিন্তু কোন সন্তুস্তর পায়নি।

নবাবগঞ্জের কথা ভাবতে ভাবতেই জগাই দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে ফেলল। তারপর উল্লুনের ভেতর থেকে বড় বড় আঙুরগুলো বের করে জল ঢেলে দিল। সৌন্দা ধোঁয়ার গন্ধে ভুরভুর করে উঠল চৈত্রের হাওয়া। জগাই তেল মাখতে বসল। বেলা হয়েছে। স্নানটা গাত ভাড়াভাড়া সেরে ফেলতে হবে। বনমালীর চিঠির জবাবটা এখনই দিতে পারবে না সে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাকে আরও অনেক ভাবতে হবে। আর সে নিজে একা ভাবতে পারবে না। দীনদয়ালের পরামর্শ নিতে হবে। দীনদয়াল একাধারে তার বন্ধু, গুরু এবং দার্শনিক। নদী থেকে স্নান সেরে ফেরার সময় দীনদয়ালকে একবার রাতের বেলা আসবার কথা বলে আসতে হবে। নয়তো সে নিজেই একবার রাত করে দীনদয়ালের ডেরায় হানা দেবে।

গামছাটা কাঁধে ফেলে উৎরাই বেয়ে নদীর উদ্দেশে রওনা হল জগাই। স্নান করে ধাওয়াটা সেরে একটু গড়িয়ে নেবে সে। বড় ক্লান্ত আর নিশ্বেজ লাগছে শরীরটা। দুটো বেশি জোড়া লাগিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন আর শরীর দুটোই শান্ত হবে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোলে চলবে না। একটুক্ষণ পরেই রাস্তায় লোকচলাচল বাড়বে। হাটুরে মানুষের ভিড়ে, দোকানী পসারীদের কলকাকলিতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে রাস্তা। নাপিতডুবির বীরেশ্বর জানা

ঘোড়ার পিঠে সওদা চাপিয়ে মধ্যযুগের বীরদের মত পা দোলাতে দোলাতে শীর্ণ চাবুকটা কয়েকবার হাওয়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে বীরবিক্রমে। গোরুর গাড়ির চাকায় চাকায় ধূলিধূসর হয়ে উঠবে সারা পথ। কোলিয়ারির সাঁওতাল, বাউড়ি, জোনপুহী মজুররা ছপুরের স্বান-আহার সেরে তেল-চকচকে মাথায় চুলের জটাঝাল বিস্তার করে কিংবা টিকিটা হাওয়ায় উঁচিয়ে সপরিবারে পাড়ি দেবে হাটের উদ্দেশ্যে। তৃষ্ণার্তরা দল বেঁধে দাঁড়াবে মহাবীরের জলসত্তে। পুরনো ঝরঝরে পক্ষীরাজ ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কোলিয়ারির বাবুরাও হাটে যাবে। রুগ্ন জীর্ণ ঘোড়াগুলোর পুঁতির মালা-পরানো গলায় ঘুঙুরের বোল উঠবে আর ফেনা ধসবে মুখ থেকে। তবু উঁচু জোয়াল ছটোকে কাঁধে নিয়ে পড়ি-মরি করে ঘোড়াগুলো তীরবেগে ছুটবে। আর যাবে কয়েকটা মোটর গাড়ি, কোলিয়ারির জীপ কি স্টেশন ওয়াগন। ধুলোর ঝড় তুলে বাশি বাজিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আর এদিকে জগাই ঝাঁপটা তুলে দোকান সাজিয়ে বসবে ষথারীতি। লাল-নীল লেমোনেডের মনোহারিণী বোতলগুলো সারবৈধে ঝুলবে। নাতিবৃহৎ উল্লুনের ওপর ফুটন্ত জলের টিনের মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরবে অল্প অল্প। টেবিলে শালপাতার ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকবে পেরোজের বড়া। জগাইয়ের নিজের হাতের তৈরি জিনিস। জগাইয়ের দোকানের পেরোজের বড়া এ অঞ্চলের অতি উপাদেয় খাদ্য। জগাই ত্রস্ত হাতে ঝরিন্দারদের হাতে হাতে তুলে দেবে চায়ের গেলাস, পেরোজির ঠোঙা কি গাঁজলা-ভাঙা লেমোনেডের বোতল। তৃষ্ণার্ত মানুষরা কি ভাবে মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখটা হাঁ করে রঙিন জল গলাধঃকরণ করবে তাও কাজের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে নেবে জগাই। আর থেকে থেকে খুকখুক করে হাসবে। ঝাঁঝালো রঙিন জলের প্রতি মানুষের এই অপ্রাকৃত আকর্ষণের রহস্যটা কোথায় তা আজও বুঝে উঠতে পারে না জগাই।

জগাই যখন জলে ডুব দিল, এক ঝলক সূর্যের আলো তখন মেঘের ঘোমটার আড়াল থেকে প্রগল্ভা মেয়ের মত উঁকি মারছে।

● ● দুই ● ●

সমস্ত অঞ্চলটা ঘুমোচ্ছে। কেবল দূরে কোলিয়ারির বিজলী বাতিগুলো ঝাঁক-ঝাঁকা জোনাকির মত জ্বলছে। আর জ্বলছে অনেক দূরে সিগতালার নীল

আলো। একটু আগেই একটা খালি ওয়াগন কোলিয়ারির দিকে গেছে। কোলিয়ারি ছাড়িয়েও অনেক দূরে আরও অনেক আলো জ্বলছে। সে আলো ডি-ভি-সির আলো। সহস্র নক্ষত্র যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আকাশের এক কোণে।

জগাই যখন দোকানে তালা মেরে দীনদয়ালের ডেরায় এল, দীনদয়াল তখন খাটিয়ায় বসে বসে বিড়ি টানছে। একটা ছোট লণ্ঠন টিম টিম করে জ্বলছে খাটিয়ার একপাশে।

দীনদয়াল বলল, ‘আরে এস এস বাবুজী, সন্ধ্যা থেকে তোমারই ইন্টিজার করছি। সকালে বলছিলে কি একটা চিঠি এসেছে। তা কী লিখেছে বলো দেখি।’

জগাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বোধ হয় মনে মনে তার বক্তব্যটা ঠিকমত গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল। তারপর এক সময়ে বলল, ‘তোমার তো নবাবগঞ্জের কথা সবই বলেছি। সেই নবাবগঞ্জ থেকে চিঠি দিয়েছে বনমালী। ওরা নাকি সবাই মিলে ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘটে ওদের জিত হয়েছে। কেতকী কটন মিল ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়েছে আমায়। বনমালীর ইচ্ছে আমি পুরনো চাকরিতে ফিরে যাই। বনমালীর বন্ধুরাও আমাকে ফেরৎ পেতে চায়। আমাকে না হলে নাকি ওদের চলছে না। তুমি কী পরামর্শ দাও?’

খাটিয়ায় নড়ে চড়ে বসল দীনদয়াল। বলল, ‘আরে এ তো খুব ভালো খবর আছে, বাবুজী। কোম্পানি নিজেকে থেকে নোকরি দিচ্ছে, তুমি তো জিতে গেছ। এখানে পড়ে থেকে চায়ের দোকান দিয়ে আর কত উপায় হবে? তার থেকে কারখানার নোকরিতে উন্নতি আছে। হরবছর তলব বাড়বে। কেরামতি দেখাতে পারলে আরও মোটা তলব মিলবে। কলকাতা শহর, দরিয়ার জাহাজ এসে ভেড়ে কলকাতার বন্দরে। চাই কি তোমার নসিবও ফিরে যেতে পারে।’

ভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে হাসল জগাই আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝোকার মত তারা গুনতে চেষ্টা করল। মেঘের আন্তরণের নিচে সমস্ত তারা গিয়ে আত্মগোপন করেছে।

দীনদয়াল অন্ধকারে জগাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, ‘সচ, বলছি, বাবুজী, তুমি নবাবগঞ্জে ফিরে যাও। জিন্দগীতে খুব কম লোকেরই ডাক আসে। ডাক এলে সাড়া দিতে হয়। নইলে লহমীজী রাগ করেন।’

‘লছমীজীর কথা বাদ দাও। মোরা গরীব মানুষ। লছমীজী মোদের দিকে তাকান না। আসলে নবাবগঞ্জে ফিরে যাব না বলে অনেকদিন আগেই পিতিজ্ঞে করেছি। সে পিতিজ্ঞে ভাঙতে মন চাইছে না। তুমি জানো না, কারখানা এলাকা বড় নোংরা। ওখানে গেলে মানুষ নীচ হয়ে যায়। ছোট হয়ে যায়। মাটির মায়া ছেড়ে যারা কারখানার খাঁচায় গিয়ে বন্দী হয়েছে, তারা কেউ স্ত্রী নেই। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।’

‘পেট বড় দুশমন, বাবুজী।’ দীনদয়ালের গলার স্বর কেমন ভরাট শোনাল। ‘পেট মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কারখানার দিকে। তুমি আমি কী করতে পারি? তুমি নবাবগঞ্জে ফিরে যাও, বাবুজী। আর কিছু না থাক, শহরে রূপেয়া আছে। কিছু রূপেয়া যদি জমাতে পারো, বুঢ়া বয়সে এখানে ফিরে এসো। এখানকার মাঠে ফসল আছে। আকাশে চিড়িয়া আছে। এখানকার মাটির নিচে কয়লা আছে, চিমনির মাথায় ধোঁয়া আছে। পকেটে যদি পয়সা থাকে সব ভালো লাগবে, নইলে সব ফাঁকা।’

‘পয়সা তো যা হোক কিছু পকেটে আছে, তবু তো সব কিছু ফাঁকা লাগছে, তেওয়ারীজী।’

‘তেওয়ারীজী’ কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠল দীনদয়াল। জগাই এই প্রথম তাকে ‘তেওয়ারীজী’ বলে সম্বোধন করল। দীনদয়াল হাসতে হাসতেই বলল, ‘নবাবগঞ্জে ফিরে যাও, বাবুজী। নোকরি করো, বিয়া-সাদি করো, লেড়কার জনম্ দাও, দেখবে জিন্দগী পাল্টে গেছে।’

অন্ধকারে দীনদয়ালের মুখের বিড়িটা জোনাকির মত জ্বলজ্বল করছে। আকাশে একটি কি দুটি তারা আছে। কিন্তু জগাইয়ের দৃষ্টিপথে এই সামান্য স্কুলিঙ্গটুকু হঠাৎ জ্যোতিষ্কের চেয়েও অনেক উজ্জ্বল মনে হল।

দীনদয়াল সন্ধ্যাবেলা কবে ভাং খেয়েছে। ভাং-এর নেশা চড়লে কেমন নিরাসক্ত আর দার্শনিক বলে মনে হয় তাকে। আর দীনদয়ালকে ততই ভালো লাগে জগাইয়ের।

হঠাৎ দীনদয়ালের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে আগুন ধরালো জগাই। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘কালই বনমালীকে চিঠি লিখে দেব। নবাবগঞ্জে যেতে পারব না। কারখানার চাকরি, কারখানার জীবন, কারখানার পরিবেশ, কিছুই মোর ভালো লাগে না—’

বলতে বলতে জগাই হঠাৎ থেমে গেল। নিজের মনকেই প্রশ্ন করে বলল :

সত্যিই কি তাই? নাকি চাঁপালতার কথা ভেবেই সে নবাবগঞ্জে যেতে সাহসী হচ্ছে না। যদি কোন দিন ভাটিখানার পাশের সেই অখ্যাত গলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জগাই আর চাঁপালতা তাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে, কী উত্তর দেবে সে? জগাইয়ের পৌরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চাঁপালতা যদি তার তির্যক ভ্রু দুটো জেরার ভঙ্গিতে মেলে ধরে, লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে যাবে না জগাই?

জগাইকে নীরব থাকতে দেখে দীনদয়াল বলল, ‘কোম্পানি সেধে নোকরি দিচ্ছে। এ নোকরি পায়ে ঠেলতে নেই। তুমি এক কান করো, বাবুজী। মহাবীরের ছোট ভাই বেকার বসে আছে। দোকানটা ওকে বেচে দাও। গরীব মানুষ—দু-পয়সা করে খাবে। মাঝখান থেকে তুমিও কিছু নগদ পয়সা পেয়ে যাবে।’

অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে কোন কথা নেই। অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। হঠাৎ জগাই-ই কথা বলল, ‘তোমাকে নবাবগঞ্জের অনেক কথাই বলেছি, তেওয়ারীজী, কিন্তু সব কথা বলিনি। সে কথা আজ বলব। লজ্জায় মোর মাথা হেঁট হয়ে যাবে তবু সে কথা না বলে মোর স্বস্তি নেই।’ বলেই জগাই চুপ করে গেল।

‘কী কথা, বাবুজী?’ অন্ধকারে মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ না পেলেও, গলার স্বরে দীনদয়ালের কাতর কোঁতুহল চাপা রইল না।

মাথা নিচু করে চাপা গলায় সব কথাই ধীরে ধীরে বলল জগাই। চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর কি রকম উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। ডুবন্ত মানুষের মত কি রকম অসহায় দৃষ্টিতে চোখ মেলে তাকিয়েছিল সে। সহকর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা তাকে কী পরিমাণে হতাশ করেছিল। তারপর সেই দিন সন্ধ্যায়, জীবনে সেই প্রথম সরাব খেল সে, সরাব খেয়ে মাতাল হল। আর তারপর সন্ধ্যা যখন জমজমাট, সারা কারখানা এলাকা যখন সাত-রঙা রামধনুর মত রঙিন, জগাই সেই প্রথম গেল খারাপ পল্লীতে। সেই দিন প্রথম সে একটা স্বীলোককে আবরণমুক্ত হতে দেখল।

দীনদয়ালের কাছে জগাই নিঃসংকোচে সমস্ত কথাই প্রকাশ করল। বলতে বলতে গলার স্বর ভেঙে গেল তার। জগাই ছোট ছেলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, ‘আমি বোধহয় অন্ধম, তেওয়ারীজী। মোর সমস্ত জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল।’

জগাইয়ের পিঠে ধীরে ধীরে দীনদয়াল একটা হাত রাখল। সহানুভূতির উত্তাপে

ভরা একটা হাত। বলল, 'রোও মত, বাবুজী। জিন্দগী আর ছুনিয়াদারী বড় গোলমালে জিনিস। যে লোকটা শক্ত জমিনের ওপর দিয়ে জোর কদমে হেঁটে যেতে পারল সে বেঁচে গেল আর যে একটু কমজোরি দেখাল, তার নসিবে অনেক দুখ, অনেক তফলিফ।'

জগাই কোন উত্তর দিল না দেখে দীনদয়াল আবার বলল, 'আউরত বিনা জিন্দগী চলে না। আবার আউরত নিয়েও তো কত মানুষ নাকাল হচ্ছে। তুমি ডর পেও না, বাবুজী। বিয়া-সাদি করো। জিন্দগী বদলে যাবে। চাঁপালতাকে ভুলে যাও। একটা বাজারের আউরত কি বলল না বলল তাতে কি আসে যায়। পয়লা রোজ, সেদিন নিশ্চয়ই ডর পেয়ে গিয়েছিলে তুমি, তাই সাহস হয়নি। তোমার ভেতরকার মরদানা চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। ঘরের আউরত পেলে সাহস আপনা থেকে ফিরে আসবে।'

তবু জগাই নিরুত্তর রইল। দীনদয়ালের কাছে তার জীবনের গোপন কথা বলে ফেলে লজ্জার-সংকোচে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে সে।

দীনদয়ালের কথায় আরও আন্তরিকতার সুর ফুটল। বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি, বাবুজী। বিয়ে না করলে পুরুষমানুষের যাচাই হয় না। খেয়া নৌকোর মত কেবলই সে ভেসে ভেসে বেড়ায়। বিয়া-সাদি হল মানে জিন্দগীতে নোঙর পড়ল। এই দেখ না, আমি কী ভুল করেছি, কত লেড়কির বাপ বিয়ে দেবার জন্তে জেদাজেদি করেছিল, রাজী হইনি। একজন কমজোর আউরতের কাছে নিজেকে সাঁপে দেব! এখন ভাবলে কান্না পায়, বুকের ভেতরটা হ হ করে শুঠে। কিছুই করার নেই এখন। টাইম চলে গেছে। রেল ছুটে গেছে, কাকা স্টেশনে ভূতের মত বুচবাক হয়ে বসে আছি, বাবুজী।'

দীনদয়াল কাঁদছে না বটে—তবে তার কথার প্রতিটি শব্দে চাপা কান্নার রেশ কারুণ্যের ঢেউ তুলে তুলে ঘেন মিলিয়ে গেল। জগাই ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, 'বনমালীকে কি জবাব দেব, তেওয়ারীজী?'

দীনদয়াল অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল, খানিকটা ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'লিখে দাও, নবাবগঞ্জে যাবে না। যে নবাবগঞ্জ তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। কোন মোহকব্ব নেই। জিন্দগীতে যত মুসিবৎ আসুক, খতরা আসুক, তুমি এখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে।'

জগাই খুশিতে হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'দীনের দয়াল বটে তুমি,

তেওয়ারীজী !’

লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপছে, দপ দপ করে শব্দ হচ্ছে। তেল ফুরিয়ে এসেছে।

দীনদয়াল লণ্ঠনটা নিয়ে ঘরের মধ্যে তেল ভরতে গেল।

কোলিয়ারির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ল জগাই। ঘুম পেয়ে গেছে তার। ক্লাস্তির ঘুম। অবসাদের ঘুম।

ঘরের বাইরে এসে দীনদয়াল দেখল জগাই চলে গেছে। টিং টিং করে ঘন্টি বাজছে। লেভেল ক্রশিং-এর গেটটা বন্ধ করতে হবে। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি আসছে রামগঞ্জ যাবে বলে। এ সময়ে পথে কোন লোকজন নেই, যানবাহন নেই। তবু গেটটা বন্ধ করতে হবে। রেলের নিয়ম। কোম্পানির নিয়ম।

গেটটা বন্ধ করে দীনদয়াল খাটিয়ায় এসে বসল। আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। মরা প্রাণহীন এক টুকরো চাঁদ। হাওয়া দিয়েছে একটু একটু। হাওয়ায় জামগাছের পাতাগুলো সর সর করে কাঁপছে। রূপ করে কী যেন একটা নিচে খসে পড়ল। শুকনো ডালপালা কি পাখির বাসা। গাছের তলা দিয়ে কী যেন একটা ছায়া ছায়া মত যাচ্ছে। সোজা হয়ে চলতে পারছে না, টলতে টলতে হাঁটছে। দীনদয়াল হাঁক দিল, ‘কে যায় রে?’

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, ‘মদন বাউড়ি। কেনে?’

সাঙাতের ঘরে হাঁড়িয়া খেয়ে বাড়ি ফিরছে মদন বাউড়ি। ঘরে ফিরেই ঘুমন্ত পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। মারপিট করবে, কান্নার রোল উঠবে। তারপর এক সময়ে থেমে যাবে সব। আদিম মানুষের মত জীবনরঙ্গে মেতে উঠবে মদন। একসময়ে সমস্ত উত্তেজনারও শেষ হবে। ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চৈজ মানুষটা। ঘুমিয়ে গঁ গঁ করে নাক ডাকাবে।

মনে মনে হাসি পেল দীনদয়ালের। গলার স্বর সখ্যমে ভুলে বলল, ‘ঘরে গিয়ে মারপিট করিস না যেন।’

মদন বাউড়ি বিড় বিড় করে কি বলল স্পষ্ট বোঝা গেল না। কেবল দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, ‘কেনে?’

● ● তিন ● ●

বনমালীর চিঠির জবাবটা শেষ করে জগাই নিশ্চিন্তমনে উঠুনে তেলের কড়াই চাপিয়ে পেরঁয়াজ কাটতে বসেছিল। পলাশতলির বাস আসার সময় হয়ে এসেছে। জগাই জোরে হাত চালান। তারপর তেল থেকে ধোঁয়া উঠতেই

হাতা দিয়ে খানিকটা গরম তেল বেসমে মিশিয়ে নিয়ে তাতে পেঁয়াজ-কাটা ছেড়ে দিল। এইবার পেঁয়াজির খোলা তেলে ছাড়লেই তিড়িবিড় করে শব্দ উঠবে। জগাই ঝারি দিয়ে লাল ফোলা ফোলা বড়াগুলোকে তুলে তুলে রাখবে ঘাটির পাতে। দোকানের ঝরিকাররা তাকিয়ে থাকবে সেদিকে সতৃষ্ণ নয়নে। তাই দেখে গর্বে জগাইয়ের বুক ফুলে উঠবে। তার দোকানের এই একটা জিনিস অন্তত অত্যন্ত উপাদেয়। এমন একটা জিনিস যা গরম চায়ের সঙ্গে ভালো লাগে, আবার ঝাঁঝালো পানীয়ের সঙ্গেও না হলে চলে না।

দুজন লোক বেঞ্চিতে বসে কথা বলছিল। কথা বলছিল মানে তর্ক করছিল। প্রথমজন মদন বাউড়ি, দ্বিতীয়জন সুবল গরাই। জগাইয়ের দেরি আছে দেখে তারা আপনমনে কলহ জুড়ে দিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে বসেছিল মদন। হঠাৎ সে একসময়ে কেটে পড়ল, 'কেনে? ছিদামবাবুর কথাটা অলোভ্য কিসে? খানচালের দর উঠছে, তেল-নুনের দর উঠছে, তলব বাড়াবেক নাই কেনে? ঘরে মোদের মেয়্যাছেল্যা নাই, মা-বুন নাই, না খেয়ে থাকলে মাল কাটার তাগদ পাব কুখায়? এ ভুমি কেমন কথা বলো, সুবল।'

সুবল আগের মতই গস্তীর নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'আহা, সে কথা একশো বার। জিনিসপত্রের আনাড়পাত্তির দাম বেড়েছে, কোম্পানি তো সে কথা পেত্যয় গিয়েছে। কিন্তু তার সাথে সাথে কোম্পানির অন্যান্য খরচ বেড়েছে। আসল জিনিসটার দাম না বাড়লে কোম্পানির ঘাটতি হবে। তখন কোলিয়ারি বন্ধ করে দিলে এতগুলো লোক খাবে কি?'

মদন বাউড়ির ঘন লোমশ-ভুরু দুটো বিজ্রপে ধারালো হয়ে উঠল। সে বিজ্রপ তার হাসিতেও গোপন রইল না। মদন বলল, 'বটে, ভালো কথা বুললে ভুমি, আসল জিনিসটার দর বাড়ে নাই কে বুললে? ছিদামবাবু মোদের পণ্ডিত মানুষ, অনেক লিখা-পড়া জানে। অনেক হিসাবপত্রের কর্যা ধর্মঘট করার কথা বুলছেন। তোমার মা-বুন নাই, মাগ নাই, তলব না বাড়ালি চলে, কিন্তুক মোদের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখ। প্যাটে ভাত না হলি কাম-কাজে মন লাগে!'

সুবলের আসল জায়গায় গিয়ে বিজ্রপটা বিধল। 'কথাটা মিথ্যা বলেনি মদন বাউড়ি। সুবল গরাই আর মদন বাউড়ি একই খাদে কাজ করে। কিন্তু সুবল একা মানুষ, তার ঘর সংসার নেই। তাই বা মাইনে পায় তাতে চলে যায়। মদনের চলে না। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে অধৈর্যে হাবুড়ু খায়।

রাত্রে বউয়ের কোমরের হাড়টো যখন মদনের পেটে এসে বেঁধে, তখন সে বুঝতে পারে শীর্ণ বউটার পেটে প্রয়োজনমত ভাত জুটছে না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তার শরীর। একটু আগে যে বউকে সে উন্নত অবস্থায় প্রচণ্ড গালিগালাজ করেছে, মারপিট করেছে, শুয়ে শুয়ে তার শুকনো গালে তার শীর্ণ হাড়সার কটিদেশে সে হাত বুলিয়ে দেয়। মনে হয় ম্যানেজার বাবুর বউটার মত তার বউও যদি নখর আর হুটপুট হত, মদনের মনে কোন ছঃখ থাকত না।

মদন তার দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে আছে দেখে সুবল হেসে ফেলল। বলল, ‘কথাটা মিছা বলো নি ভাই কিন্তু ধর্মঘটে বড় হাঙ্গামা। ধর্মঘট হলেই পুলিশ আসবে, মারপিট হবে। হয়তো কোলিয়ারিষ্ট বন্ধ করে দেবে। তখন ষাব কোথায়? সরকার পুলিশ সবই তো ওদের দিকে!’

‘বটে? বন্ধ করে দিবেক কেনে?’ মদন বাউড়ি ফুঁসে উঠল ‘মোরা নাই? মোরা জান দিয়া খুল্যা রাখব। তুমায় এটা কথা বলি সুবল ভাই, ছিদামবাবু বুলছেন—ধর্মঘট হবে, ধর্মঘট না হলি না খায়্যা মরব। টব প্রতি চার আনা রেট বেশি চাই। বাড়তি মাগগীভাতা চাই। তুমিই বুলো, কথাটা অলেক্য বুলছে ছিদামবাবু?’

‘নেয্য অনেক্যর কথা নয়। কথা হল জিত হওয়া চাই। জিত না হলে মরে ষাব। ছিদামবাবু বড় গরম গরম কথা বলে। শুনতে ভালো লাগে। তবু ভয় হয়। বড় ভয় হয় মদন ভাই।’

ছোটো শালপাতায় আলাদা আলাদা করে কয়েকটা পেঁয়াজের বড়া সাজিয়ে জগাই দুজনের সামনে এনে রাখল। বলল, ‘আন্তে আন্তে খাও, ভাই। জলে ফুট ধরেছে। এই চা করে দিচ্ছি। বাস এসে পড়বে এখুনি। বড় তাড়া-ছড়া এ সময়টা।’

মদন একটা বড়া তুলে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল। দেখলে মনে হবে বড়ুটা খুব ভালো লেগেছে তার। তাই চেখে চেখে খাচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষটা মদন বাউড়ি। পাকানো দড়ি দড়ি শরীর। কথা বললে মনে হয় গাঁক গাঁক করে চোঁচাচ্ছে। বসে থাকলে মনে হয় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাবর কাটছে। হাঁটলে মনে হয় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে ব্যাঙের মত।

দ্বিতীয় বড়াটা কঁৎ করে গিলে ফেলে মদন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি মোদের সাথে আছো তো সুবল ভাই? একসাথে থাকো, লড়ি তো একসাথে

লড়ব, মরি তো সবাই একসাথে মরব। জ্ঞান থাকতি আপস করব না।
হু-নম্বর খাণ্ডার জোনপুরী মজুররা দালালি করবে মন কয়। খুন জখম
মারপিট করবের চায়।’

সুবল হাসতে হাসতে বলল, ‘শেষবেশ কী একখানা কথা বললে তুমি। আমি
তো পঞ্চম থেকেই তোমাদের সাথে আছি। একা মানুষ, খাই দাই কাঁসি
বাজাই।’

‘হাঁ, তাই বেলো। ছিদামবাবু দেবতা মানুষ। তার কথা শুনলি নিচ্ছ ভালো
হবে।’ ভালো হবে—কথা দুটো হু-বার আবৃত্তি করে মদন বাউড়ি কেমন
যেন উন্মনা হয়ে গেল।

পলাশতলির বাস মাথায় একরাশ মালপত্তর চাপিয়ে ছলতে ছলতে এল।
কয়েক মিনিটের গুঞ্জন ভুলে আবার রওনা হয়ে গেল রামগঞ্জ। রামগঞ্জ
হয়ে বৈষ্ণানাথপুর, ভৈরবগঞ্জ, সীতাকুণ্ড। সস্ত-বিয়ে-করা বর বউ ষাচ্ছিল
বাসে। জগাইয়ের দোকানে মিষ্টি জল খেতে নেমেছিল হু-দণ্ডের
জন্তে। ঝাঁঝালো জল গলায় যেতেই বিষম খেয়ে অস্থির হয়ে
পড়েছিল কচি বউটা। সেই ঝাঁকে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল
জগাই। কচি মিষ্টি মুখ আর চকচকে এক জোড়া চোখ। যেমে নেয়ে মাথার
সিঁদুরে গাল দুটো পর্যন্ত টুকটুকে লাল। স্বামীর চোখে চোখ পড়তেই মুখটা
ঘুরিয়ে নিয়েছিল জগাই আর বুকটা হ হ করে উঠেছিল একটা ভোঁতা
বস্ত্রগায়।

বাস আসতেই মদন বাউড়ি উঠে গিয়েছিল। একা বসেছিল সুবল। একটু
নিরিবিলা পেয়ে সে বলল, ‘তোমার ঠেঙে একটা কথা ছিল জগাইদা।’

‘কী কথা?’ জগাই অন্তমনস্ক হয়ে জবাব দিল।

‘রাধানাথ আর সবুর সইতে রাজী নয়। তুমি কথা দাও তো দাও, নইতো
রাধানাথ অন্তধানে বিয়ের চেষ্টা করবে। সেই কার্তিক মাসে মেয়ে দেখেছ
আজও মনস্থির করতে পারলে না। তোমার মনের বলিহারী বাই,
জগাইদা।’

‘কেন, দু-দিন সবুর করলে কি আমি পালিয়ে যাব?’ জগাইয়ের উত্তরে কেমন
একটা নিস্পৃহ সুর ফুটল।

‘তুমি না পালিয়ে যেতে পার কিন্তু মেয়ের বয়স পালিয়ে যাচ্ছে। অত বড়
আইবুড়ো মেয়ে এ তল্লাটে নেই। সেইজন্নি তো রাধানাথের ভাবনা। গরীব

মানুষ । সস্তা কাঠের চেয়ার টেবিল বানিয়ে নিজেরটা কোন রকমে চলে যায় ।
মেয়ের বোঝা বইবার ক্ষমতা রাখানাথের নেই ।’

‘মোর আছে ?’ প্রায় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল জগাই ।

‘খুব আছে । এত বড় দোকানের মালিক । লক্ষ্মীকে একবার ঘরে এনেই
দেখ না । দোকান আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে ।’ সুবল হাঁ করে জগাইয়ের
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল ।

জগাই বলল, ‘না ভাই দোকানের অবস্থা ভালো নয় । চারদিকে ষত জিনিস
পত্রের দাম বাড়ছে, বেচা-বিক্রি তত কমে আসছে । এই দেখ না, দু-পয়সার
চা যেদিন থেকে চার পয়সা হল, সেদিন থেকে বিক্রি পড়তে শুরু করেছে ।
হাট বাজারের হাল দেখে মনে হয় দোকানের অবস্থা আরও পড়বে ।’

সুবল জগাইয়ের কথায় কান দিল না । বলল, ‘অত ভাবলে চলে না,
জগাইদা । আজ পড়েছে, কাল হঠাৎ উঠে যেতে পারে । মানুষের ভাগ্যের
কথা কিছু বলা যায় ?’

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জগাই বলল, ‘আর একটা কথা কি জানো সুবল, ভয়
করে । বিয়ে করতে ভয় করে ।’

‘ভয় করে ?’ হো হো হেসে উঠল সুবল । হাসতে হাসতে বেশি থেকে পড়ে
গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । ‘তুমি একটা পাগল, জগাইদা । বিশ্বের ব্যাপারে
ভীতুরা ইস্তক বীরপুরুষ হয়ে ওঠে । আর তুমি ভয় পাচ্ছ ।’

জগাই গম্ভীর হয়ে বলল, ‘সে সব তুমি বুঝবে না, সুবল । সে অনেক কথা ।
লক্ষ্মী মোর দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞপের হাসি হাসবে সে আমি সইতে পারব না ।
পারব না ।’

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল জগাই মাথা হেঁট করে । বৈশাখের ঘুনি রাস্তায়
ধুলোর ঝড় তুলে ধিতিয়ে গেল জগাই তাকিয়েও দেখল না । মেঘ আর
রোদের লোকোচুরি খেলা হয়ে গেল আকাশে আর তার প্রতিচ্ছায়া পড়ল দক্ষ
মাঠের ওপর তাও জগাইয়ের অলক্ষ্যে রয়ে গেল । বড় জটিল আর যন্ত্রণাদায়ক
এই জীবন, মনে মনে ভাবল জগাই । তারপর একসময়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে
বলল, ‘রাখানাথকে বোলো আসছে মাসে সব ব্যবস্থা পাকা করতে । যা হবার
হয়ে যাক । আমি আছি আর আছে ঐ বরাকর নদী । ও অন্তত মোর সাথে
বেইমানি করবে না ।’

নবাবগঞ্জে গঙ্গা ছিল । এখানে বরাকর । নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে বয়ে

চলেছে জগাইয়ের জীবন। একটা শ্রোত এসে ঠেলে সরিয়ে দেয়। টেনে নিয়ে যায় আরেকটা শ্রোত এসে।

সুবল চলে যেতেই ত্রিলোচন জানা কিতে-বাধা একটা খেরো খাতা বগলদাবা করে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা আগে থাকতে আঁচ করে জগাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, ‘আসুন, আসুন, পায়ে ধুলো দিন অধমের দোকানে।’

ত্রিলোচন যেন শুনতেই পায়নি জগাইয়ের কথা এমনি মুখের ভাব করে বলল, ‘কি গো জগাইবাবু, আজকাল যে আর মোর দোকানের ছায়াই মাড়াও না। কী ব্যাপারখানা বলো তো?’

টোক গিলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল জগাই, ত্রিলোচন থামিয়ে দিল। বলল, ‘নতুন সওদা না নিলে না নিলে কিন্তু তিন মাস আগের যে সওদা তার দাম তো মেটাবে। কী গো, জবাব দিচ্ছ না যে বড়।’ কপালে টান পড়তেই ঘন ক্র দুটো জুড়ে গেল।

ত্রিলোচন নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চিটা ভালো ভাবে পরীক্ষা করে তার পৃথুল দেহটা অতি সাবধানে তার ওপর রাখল। তার ময়লা তেলচিটে কতুয়ার হাতার কিনার থেকে কয়েকটা বড় বড় তাবিজ উঁকি মারছে। মাংসল পেশীর ওপর তাবিজের বন্ধনী দাগ কেটে কেটে বসেছে। ক্র-লাঙ্ঘিত চওড়া কপালের ওপর রক্ত চন্দনের বিরটি কোঁটা। বন্ধরের খাটো ধূতির নিচে ধূলি-ধূসরিত পদযুগল।

জগাই মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলল, ‘দেখুন, কয়েক মাস ধরে বড় টানাটানি যাচ্ছে। এই মাসে দিয়ে দেব ভেবেছিলাম, পারলাম কই। এই মাসেই দোকানঘর ছাইতে হল। কাঠের বাতায় ঘূণ ধরেছিল বদলাতে হল। অনেক কটা টাকা বেরিয়ে গেল সেই রাবদ।’

‘দেখ জগাইবাবু, ওসব কথা অন্য কোথাও বোলো। মোর কটা জিনিসের দাম মিটিয়ে দিলে তোমার চাল ছাওয়া আটকাতো না—একথা ভুমিও জানো, ত্রিলোচনও জানে। খারে এক পয়সার কারবার করে না ত্রিলোচন। নেহাৎ ভুমি বলে বিশ্বাস করে দিলাম। নইলে মানুষকে বিশ্বাস করতে আছে?’

‘ছি ছি এ কী বলছেন!’ জগাই মাথা হেঁট করে মুখে চুক চুক করে শব্দ করল। ‘আপনি মিছামিছি কষ্ট করে এলেন। আমি নিজে গিয়েই টাকা কটা দিয়ে আসতাম।’

‘আরে রামো: ! তোমার টাকা নিতে এতদূর আসব—ত্রিলোচন জানা সে পাশুরই

নয়। সুনলাম ম্যানেজার বাবুর মেয়ের নাকি খুব ঘটা করে বিয়ে হচ্ছে। তাই ভাবলাম যাঁই একবার দেখা করে আসি। মজ্জবে জিনিসপত্রের তো কম লাগবে না। সিজুলিয়া কোলিয়ারি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ তোমার কথা মনে হল। ভাবলাম যাঁই একবার তোমার দোকানে ঢুঁ মেরে যাঁই।’ ত্রিলোচন হেঁ হেঁ করে হাসল।

জগাই তাড়াতাড়ি এক গেলাস চা আর কাঁচের ডিশে দুটো নিমকি বিস্কুট ত্রিলোচনের সামনে এনে রাখল। ভাবল, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে লোকটা, চা পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে ত্রিলোচন বলল, ‘তা মোর দোকান থেকে কেনা-কাটা বন্ধ করেছে এ তো আর কিছু লুকোছাপা নেই। কিন্তু কার দোকান থেকে সওদা নিচ্ছ আজকাল?’

জগাই মহাকাপরে পড়ল। না বললে মুশকিল, আবার বললেও মনে মনে ভয়ানক চটবে ত্রিলোচন। জগাইয়ের ঠিক কোথায় সুবিধে-অসুবিধে তা সে বুঝবে না। ব্যবসার দাঁড়িপাল্লায় লেন-দেনের পরিমাণের দিকেই ত্রিলোচনের নজরটা নিবদ্ধ।

জগাই চূপ করে আছে দেখে ত্রিলোচন নিজেকে থেকেই বলল, ‘মোর কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। ভেতরে ভেতরে সব ধবরই আমি রাখি। আজকাল নাকি জানকীপ্রসাদের দোকান থেকেই সওদা করছ। ছি ছি, কী লজ্জা বলো তো! বাঙালীর দোকান থাকতে অবাঙালীর দোকানে হাত পাততে যাওয়া।’ ধিকারে ত্রিলোচন মুখ বিকৃত করল।

জগাই রীতিমত বিব্রত বোধ করল। এমন একটা বিলী অবস্থায় সে অনেকদিন পড়েনি। এমন কি বনমালীর চিঠি পেয়েও এতটা অপ্রস্তুত মনে হয়নি নিজেকে। তবু কী বললে ত্রিলোচন সব চেয়ে কম চটবে ভাবতে ভাবতে সে বলল, ‘দেখুন বড় বেকায়দায় পড়ে গেছি। ঠেকায় না পড়লে আর জানকীপ্রসাদ ধারে সওদা দিতে রাজী না হলে——’

জগাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই কানে আঙুল দিল ত্রিলোচন। চোখদুটো বড় বড় করে বলল, ‘ছি ছি, ও সব কথা শোনাও পাপ। যে ধার দেয় সে পাতকী। যে ধার নেয় সে মহাপাতকী। ঐ করে জানকীপ্রসাদরা ব্যবসা জমাচ্ছে। বাঙালীর দোকান বলতে তো দুটি মাত্র টিকে আছে। তাও উঠে যাবে এবার। নির্ঘাত উঠে যাবে।’ হুস করে ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

জগাই আরও অপ্রতিভ বোধ করল। তার অবস্থা ত্রিলোচন বুঝবে না। যে ঘটাই বলুক, একের অবস্থা অপরে উপলব্ধি করতে পারে না। তার অবস্থায় পড়লে ত্রিলোচনও ঠিক অনুরূপ আচরণ করত। জগাই বাঙালী-অবাঙালী বোঝে না, মাদ্রাজী-ওড়িয়া বোঝে না। যে স্ত্রীবিধা দেবে তার কাছেই যাবে সে। সাধারণ মোটা বুদ্ধিতে জগাই এই কথাটাই মার বুঝেছে।

ত্রিলোচনের গলার স্বরে এবার কান্না ঠেলে এল, ‘জানো জগাইবাবু, বাঙালীরা সব জায়গা থেকে পিছু হটে আসছে। চাকরি বেলো, ব্যবসা-বাণিজ্য বেলো, দোকান-পসার বেলো, বাঙালীরা কোথাও হালে পানি পাচ্ছে না।’

জগাই অপরাধীর মত মাথা নিচু করে বসে আছে। কী বলবে, কী বলা উচিত সে ভেবে পাচ্ছে না। ত্রিলোচন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বাকগে ওসব কথা। মোর টাকা কটা মিটিয়ে দাও। আমি এবার উঠব।’

জগাই ভ্যাবাচাকা ধ্যেয়ে জিঙ্কেস করল, ‘কত বেন ছিল আপনার?’

‘কী গো, তাও মনে নেই।’ ত্রিলোচন হেসে সহজ হবার চেষ্টা করল।

তারপর খাতার পৃষ্ঠা উন্টে বলল, ‘বত্রিশ টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।’

সিন্দুকের ডালাটা খুলে জগাই টাকার বাস্তুটা বের করল। ময়লা আর ফরসা নোট মিলিয়ে ছ-টাকা আর পয়সা-আনি-ছয়ানি মিলিয়ে এক টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা ত্রিলোচনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘এখনকার মত এই রাখুন। বাকি পঁচিশ টাকা আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। বিশ্বাস করুন, বেচাবিক্রির অবস্থা বড় খারাপ। জিনিসের দাম বাড়ছে, মানুষের হাতের পয়সাও ফুরিয়ে আসছে।’

বোকার মত কয়েক মুহূর্ত জগাইয়ের মুখের দিকে ত্রিলোচন তাকিয়ে রইল। রাগে, দুঃখে, বিষ্ময়ে বেন পাথর বনে গেছে সে। তারপর নোট আর খুচরো সবটুকু ফতুয়ার ভেতরকার পকেটে তুলে রেখে দুম দুম শব্দ করে দোকান থেকে নেমে গেল। বাস আসতে অনেক দেরি আছে, ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে জেনেও পথে এসে দাঁড়াল। ত্রিলোচন বোধহয় মনে মনে বলছে, ‘মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই, মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।’

বেতসলতার মত শরীরে সস্তা দামের রঙিন ডুরে শাড়ি আর হাতে ঝকঝকে একখানা কাঁসার ঘটি—রাখা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। জগাইকে একা দেখে রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়ল, ‘কী গো, দাস মশাই দুধ নেবে নাকি? মালবাবু দুধ আজ নিলো না তাই দু-সের দুধ বাড়তি আছে।’

জগাই নিষ্পৃহ গলায় জবাব দিল, ‘না, আজ লাগবে না।’

অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়ল রাধা। বলল, ‘কেন লাগবে না গো? খরিন্দার নেই বুঝি? মানুষজন আজকাল চায়ের পিপাসা জলে মেটায়। ষাঠি, ঘরে গিয়ে দই বসিয়ে দেব। অধরবাবুর বউ কাল দই নেবে বলেছে।’

রাধা চলে গেল। জগাঠি বসে রইল বিষণ্ণ মনে। স্রবলের কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে ত্রিলোচনের কথা। পেছনে ধু ধু করছে বরাকরের চড়া। ধু ধু করছে জগাঠির মনও। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই এতটুকু। চারদিকে এত কয়লা ধনি, এত কারখানা, এত বাঁধ বাঁধার আয়োজন তবু জগাঠির দোকানে লোক আসে না কেন। এত ধু ধু গরমে তার দোকানে হু-দণ্ডের বিশ্রাম নিতে এসে চা খেয়ে গেলে কী এমন গরীব হয়ে যাবে তারা! কে জানে, মানুষের মনের নাগাল পাওয়া ভার।

শেষ পর্যন্ত হয়তো জগাঠির দোকান চলবে না। আপনা থেকে উঠে যাবে একদিন। মহাবীর মাঝে মাঝে বলে, ‘এটা চায়ের যুগ নয়, বাবুজী, পানির যুগ। চারদিকে বেকারী আর গরীবী, কে আপনার চা খাবে, বাবুজী?’

মহাবীর হয়তো ঠিক কথাই বলে, জগাঠি মনে মনে বলল। নবাবগঞ্জে ফিরে গেলে হয়তো ভালোই হত। বাঁধা মাইনের চাকরি। মোটামুটি নিশ্চিন্ত জীবন। অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পেত সে। কিন্তু সেখানেও তো দোর আগলে বসে আছে ঠাপালতা।

কেউ তাকে ভদ্রভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না। কেউ না। যেদিন সে যুক্তিকার মায়া ত্যাগ করে বাপ-পিতামহের ক্রোক-হয়ে-যাওয়া ভিটের আশ্রয় ছেড়ে বারোয়ারী পথে পা বাড়িয়েছে সেই দিনই সে বুঝেছে কুলহীন সমুদ্রের ঢেউ গুণে গুণেই তার দিন কাটবে।

● ● চার ● ●

দোকানের চালার পেছন দিকে জগাঠি ছোটমত একটা ঘর করল। বাশ-দরমার কাঠামোর ওপর টিনের চাল। রামগঞ্জ থেকে একটা বড়ো ঘরামী ধরে এনেছিল, সেই করে দিয়ে গেল।

একটা নতুন মানুষ আসছে। তারই জন্মে এই আয়োজন। অনেক দর-দাম করে একটা তক্তাপোশ কিনল। নতুন মানুষটা আসছে। সে শোবে এই চৌকিতে। কিছু হাঁড়িকুড়ি ও বাসনপত্র—যা না হলেই নয়—জগাঠি কিনে আনল পলাশতলির হাট থেকে। নতুন মানুষটা এসব না হলে বাঁধবে কিসে।

এ ছাড়াও কিছু সস্তা কাঠের টুকিটাকি আসবাবপত্র রাখানাথ দেবে। জগাইয়ের ঘর ভরে উঠবে সেই সব আসবাবপত্রে। লক্ষ্মীর আগমনে জগাইয়ের ঘরে নতুন সুর বাজবে। দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকবে জগাই, ওদিকে ছোট্ট ঘরে একা একা ছটফট করবে লক্ষ্মী, তাকে কাছে পেতে চাইবে। লক্ষ্মীর হাতের কাঁচের চুড়িগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ঝংকার তুলে জগাইকে সেকথা জানিয়ে দেবে। কিংবা লক্ষ্মী এক সময়ে দরজায় আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে উঁকি মারবে। জগাই অস্থির হয়ে উঠবে। চাঁপালতার মতই রহস্ত্রঘেরা একটা নারীদেহ। চাঁপালতা কত পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে। লক্ষ্মী পায়নি। লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই লক্ষ্মী পবিত্র আর সুন্দর।

একটা নতুন মানুষ আসছে। যে মানুষকে দূর থেকে দেখেছে জগাই আর ভালবেসেছে। দূর থেকে যে মানুষের কথা শুনেছে জগাই আর মনে মনে অস্থির হয়েছে। সেই মানুষটা তার কাছে আসছে। একেবারে হাতের কাছে। হাতের নাগালের মধ্যে। জগাই যখন চাইবে, তাকে আয়ত্তের মধ্যে পাবে। সম্পূর্ণ একটা মানুষকে। জগাই উত্তেজনার ঘেমে নেয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল চাঁপালতার কথা। মনে পড়ল তার অসহায় অক্ষম পৌরুষকে বিজয় করে কী ভাবে হেসে উঠেছিল চাঁপালতা। সেই ক্ষুরধার হাসি এঞ্জিনের কর্ণবিদ্যারী বাশির মত আজও তাকে উচ্চকিত করে তোলে।

দীনদয়াল জগাইয়ের নতুন ঘর তদারক করতে এসেছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলল, ‘ঘর ভালো হয়েছে, বাবুজী, তবে বড় ছোট। দুজনের বেশি মানুষ আটবে না।’

জগাই মনে মনে বলল, দুজনের জায়গা হলেই হল। তৃতীয় জনের স্থান তো ওখানে নেই।

দীনদয়াল আবার বলল, ‘আজ দুজন আছো, কোনমতে চলে যাবে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তিনজন হবে। তিন থেকে চার, চার থেকে পাঁচ। এই করে মানুষের সংসার বাড়ে। ভালপালা ছড়ায়। এই তো দুনিয়ার রীত। তখন আবার ঘর তুলতে হবে।’

জগাই বোকার মত হাসল। দীনদয়ালের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সে নয়। সে কেবল দ্বিতীয় মানুষটার কথা ভাবছে। তৃতীয়-চতুর্থ মানুষ যারা নিরাকার অবস্থায় ভবিষ্যতের জঁঠরে জন্ম নেবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তাদের কথা মনেই নেই তার।

দীনদয়াল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বাবুজী, তোমায় দেখে আমারও সাদি করার সাধ হচ্ছে। তবে একটা কথা—দু-দিন সব কুছ ভালো লাগে, তারপর পুরনো হয়ে যায়। মনে হয় ঘষা পয়সা। হোক ঘষা পয়সা, তবু তার দাম কমে না। আউরত আর দরিয়ার পানি এক রকম। ছোটোই কুলকিনারা নেই। যতই জল তোলো তার আর শেষ নেই। মানুষের ভুখ আর পিয়াস কোনদিন মিটবার নয়। ভুখ মিটে যায়, আবার ভুখ তৈরি হয়। জীবনের আখরি দিন तक তাই ঘষা পয়সার দাম কমে না।'

জগাই কান খাড়া করে কথাগুলো শুনল। আর মনে মনে দীনদয়ালের জন্তে নিরবয়ব বেদনা অনুভব করল। লোকটার বুকের মধ্যে কোথায় যেন আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে তার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। দীনদয়াল নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে জগাইকে—কিন্তু সব কথা বলেছে কি? তার সম্পর্কে একটা জনরব চালু আছে : মাঝে মাঝে রাত্রে কে যেন গুতে আসে দীনদয়ালের ঘরে। স্বীলোকটাকে জগাই দেখেনি। তবে লোকে বলে, অনেক দূর থেকে আসে নাকি সে। রাত্রে আসে আর ভোরের আলো কোটার আগেই চলে যায়। কেউ কেউ বলে, মেয়েটার স্বামী নাকি অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোন এক ধান কলে কাজ করে তার পেট চলে। দীনদয়ালও মাঝে মধ্যে তাকে সাহায্য করে। জগাই অনেক দিন ভেবেছে, কথাটা এক কাকে জিজ্ঞেস করে দেখবে দীনদয়ালকে। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। মহানুভব মানুষের দুর্বল জায়গায় হাত দিতে বেশি ভয় হয়। সব মানুষই অনেক কথা বলেও, অনেক কথা চেপে যায়। তাদের গোপন জায়গাকে প্রাণপণে আড়াল করে রাখতে চায় তারা। মহানুভব দীনদয়ালের মধ্যে কোন দীনতাই থাকবে না এ কী করে সম্ভব?

দীনদয়াল জগাইয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, 'যেদিন সাদি করে আসবে সেদিন খুব বড় একটা দাওত দেবে। সারা মহল্লার লোককে ডাকবে সেদিন। বুঝলে বাবুজী, সবাই জামুক জগাইবাবুর সাদি হল। আর একটা কথা, দোকানে একটা লোক রাখো। একা মানুষে দোকান চলে না। তুমি বাইরে গেলে দোকান বন্ধ থাকে। খরিদাররা চটে যায়, লোকসানও হয়।'

জগাই ঘামাচি মারতে মারতে বলল, 'লোক রাখব কিছুদিন থেকেই ভাবছি, পারছি কৈ। বেচাবিজ্রি না বাড়লে লোক রাখতে পারব না। কতদিকে খরচ বাড়াব। এই দেখো না সকাল থেকে মাত্র টাকা খানেকের

মত বিক্রি হয়েছে। তিনটে আপ ডাউন বাস চলে গেল। যাত্রীরা কেউ নজরই করল না। দোকানটা বাস-স্টপের সামনে হলে স্ববিধে হত। একটু আড়ালে পড়ে গেছে।’

দীনদয়াল বলল, ‘এক কাজ করো, মল্লিকবাবুদের বলে বাস-স্টপটা একটু পিছিয়ে আনার চেষ্টা করো। নইলে ড্রাইভারদের চা-টা খাইয়ে হাত করো। বললে কইলে রাজী হতে পারে।’

জগাই মনে মনে বলল, ওরা কি রাজী হবে। বড় তিরিক্ষে মেজাজ ঐ ড্রাইভারগুলোর।

দূরে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। গুঞ্জন থেকে গজ'ন। জগাই উঠুনে কয়লা দিয়ে ভাড়াভাড়া হাত চালিয়ে গেল। রামগঞ্জ স্পেশাল ‘তুফান মেল’ আসছে। এই গাড়িতে ছোট-বড় ব্যবসাদাররা যাতায়াত করে। দেশী-বিলিতি কোম্পানির ক্যানভেসাররাও থাকে এই গাড়িতে।

গাড়ি এসে খামতেই জগাই জোর গলায় হেঁকে উঠল, ‘চা, গরম চা, পেঁয়াজের বড়া! নাপিতডুবির বিখ্যাত কড়া পাকের বরফি! আনারকলি বিস্কুট!’

পলাশতলির বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জগাই সমুপর্ণে পথ চলছিল। প্রথমতঃ, রাস্তার ঠেলা গাড়ি আর মানুষের ভিড়। রেলওয়ে শেড থেকে মাল খালাস নিয়ে ঠেলাগাড়িগুলো ব্যাপারিদের দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে একে একে। দ্বিতীয়তঃ, ত্রিলোচন জানার সেই পঁচিশ টাকা জগাই আজও শোধ দিতে পারেনি। তাই একটু ঘুর পথে যেতে হচ্ছে তাকে। ত্রিলোচনের চোখে পড়ে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে। আর হয়তো কেবল লজ্জাই নয়, লোকটা তাকে দশজনের সামনে অপমানও করে বসতে পারে।

আর কয়েকদিন বাদেই জগাইয়ের বিয়ে। কাজে কাজেই কয়েকটা বাড়তি জিনিস কিনতে হবে। জানকীপ্রসাদের দোকানের সামনের দরজাটা এড়িয়ে গিয়ে একেবারে পাশের দরজা দিয়ে জগাই ভিতরে প্রবেশ করল। দোকানে বিশেষ লোকজন নেই। যে দু-চারজন আছে তারা দাঁড়িপাল্লার সামনে বসে আছে। জানকীপ্রসাদের মেজো ভাই ওজন করছে। সোনা ওজন

করছে যেন। তিল পরিমাণ এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। জানকীপ্রসাদের ছোট ভাই ঠেলা গাড়ির মাল পাশের গুদামে রাখাচ্ছে। এক কোণে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে হিম্মী খবরের কাগজ পড়ছে জানকীপ্রসাদ। সোনার একটা সুরু হার গলায় চিক চিক করছে।

জগাই সামনে গিয়ে বসতেই জানকীপ্রসাদ চশমার কাঁক দিয়ে এক বলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, ‘আরে আইয়ে বাবুজী, আইয়ে। এখানে দেখেছেন চার দিকে আগুন লেগে গেছে।’

‘আগুন! আগুন কোথায় লাগল?’ জগাই প্রায় অগতোস্তি করল।

‘আর কোথায়? চালে ডালে, কাপড়ে চোপড়ে।’

জগাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কি বলছে লোকটা! অনেক দিন পরে এল বলে ঠাট্টা করছে নাকি?

জানকীপ্রসাদ টিকিছুক মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে হাসল। বলল, ‘বাবুজী, সব মালের দাম বেড়ে গেছে। চিনির দাম কত জানো? সাড়ে চোদ্দ আনা সের। মস্তুর ডাল সাড়ে নয় আনা। চায়ের দাম পাউণ্ড প্রতি আরও পাঁচ ছয় আনা বেড়ে গেছে। চালের দাম তো বেড়েই আছে। গম বা আটা পয়সা দিলেও মিলবে না, বাজারে নেই। মসলাপাতির কথা না বলাই ভালো। সোনা, রাতারাতি সব চিজ সোনা হয়ে গেছে, বাবুজী।’

জগাই সোজাসুজি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কেন। কিন্তু তা না করে বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘ইঠাং কী হল?’

‘ইঠাং আর কী হোবে বাবুজী? অনেক দিন থেকেই তো দর-দাম বাড়ছে। আরও বাড়ল। আরও বাড়বে। দেশে জিনিস পত্রের আকাশ। বিদেশে খুচখাচ লড়াই চলছে। বাইরে থেকে চড়া দামে মাল আসছে। এদিকে খাজনা ট্যাকসো বাড়ছে। সরকারের টাকা চাই। কত किसিমের প্র্যান সরকারের হাতে।’

জগাই ভাবল: ইঠাং কী হয়ে গেল দেশটার? দিন দিমই অভাব বাড়ছে কেন? লোকে বলে, চারদিকে কলকারখানা বসছে, বাধ বাধা হচ্ছে, চাষবাসের প্রসার হচ্ছে। তবু এত অভাব কেন? কে জানে? নাপিতডুবির জগন্নাথ দাস—নয়া দিল্লীর খবর কতটুকু পৌঁছয় তার কাছে!

জানকীপ্রসাদ নিজে থেকেই বলল, ‘জোর গোলমাল হচ্ছে তোমাদের কলকাতায়। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় বড় হুজুত করছে বাঙালীরা।’

পরশু দিন হরতাল করেছিল। পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। এই তো দেখো না আজকের কাগজেই ছবি দিয়েছে।’ জানকীপ্রসাদ হিন্দী কাগজটা মেলে ধরল জগাইয়ের চোখের সামনে।

জগাই হিন্দী জানে না কিন্তু যে ছোটো ছবি ছাপা হয়েছে, সে ছোটো স্পষ্ট বুঝতে পারলো। ব্যাটন চালাতে চালাতে দুজন অশ্বারোহী ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পালাতে গিয়ে একজন লোক পা পিছলে পড়ে গেছে ঘোড়ার সামনে।

‘তোমাদের কলকাতা বড় গোলমাল করছে।’ জানকীপ্রসাদ কথাটা দ্বিতীয়বার বলল।

‘তোমাদের কলকাতা’ শুনে মনে মনে জগাই ভয়ানক কৌতুক বোধ করল। কে জানে কলকাতা কার—কলকাতা নিজেই কি তা জানে? কলকাতা হয়তো সবার। হয়তো বা কারো নয়। হয়তো বিশেষ এক দল মানুষের। ত্রিলোচন জানা বলবে, কলকাতা জানকীপ্রসাদদের। জানকীপ্রসাদ বলছে, কলকাতা বাঙালীদের। ভবিষ্যতের নৃতাত্ত্বিককে হয়তো অনেক মাটি খুঁড়ে আর দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে বাঙালীর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু নবাবগঞ্জ থাকা-কালীন জগাই মাঝে মাঝে কলকাতায় যেত। সে বেটুকু দেখেছে তাতে তার মনে হয়েছে : কলকাতা বিরাট, কলকাতা ক্ষুদ্র ; কলকাতা অসীম, কলকাতা কুপবন্ধ ; কলকাতা সুন্দর, কলকাতা ভয়াবহ। তার মত সাধারণ সহায়হীন মানুষের স্থান সেখানে নেই।

জগাই বিজ্ঞের মত বলল, ‘কলকাতায় তো শুনি রোজই একটা না একটা হাঙ্গামা লেগে আছে। সে কথা থাক। কিন্তু জিনিস পত্রের দাম এভাবে বাড়লে মোদের মত অল্প পুঁজির মানুষরা কোথায় দাঁড়াবে বলতে পারেন?’

‘আমরা তার কী করব, বাবুজী। দিল্লীর লোকসভায় জোর আলোচনা চলছে। একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই।’ বলেই জানকীপ্রসাদ কাগজের মধ্যে ডুবে গেল। খানিক পরে বলল, ‘শোনো বাবুজী, তোমার বহু টাকা বাকি পড়েছে। সব টাকা আজ দিয়ে যাবে। দিনকাল বড় খারাপ। অত বাকি রাখলে কারবার ফেল মেরে যাবে।’

জানকীপ্রসাদের কথায় জগাইয়ের মন নেই। সে ভাবছে আজকের সন্ধ্যায় তার কত টাকা বেশি লেগে যাবে। প্রত্যেকবারই তো কিছু না কিছু টাকা বেশি লাগে। এবার অনেক বেশি লাগবে। মনে মনে হিসাব করে বা দাঁড়াল তাতে টাকা নয়েকের মত অতিরিক্ত খরচ হবে।

হঠাৎ জগাইয়ের চিন্তার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কে একজন বাঘের মত চিংকার করে উঠেছে, ‘খবরদার! ওজনে মেরোনি বাবা। জিনিসের দামও বাড়াবি, ওজনেও মারবি? গরীব মানুষে তালে দাঁড়াবি কোথায়? প্যাটে পা দিয়ে মারায় ফ্যালাবি নাকি।’

জগাই তাকিয়ে দেখল বছর ষাটেকের একটা বুড়ো লোক। রাগে দুঃখে উত্তেজনায় চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে তার।

দাঁড়িপাল্লার একদিকে একসেরি বাটখারা, অপরদিকে প্রায় সমপরিমাণ চাল। জানকীপ্রসাদের ভাই জগাইকে সালিস মানল। বলল, ‘আপনিই দেখুন বাবুজী, কম দিয়েছি না বেশি দিয়েছি। বড় বেরাড়া এরা, যত বেশি দাও, তত গলা টিপে ধরবে।’

জগাই গলা বাড়িয়ে দেখল : জানকীর ভাই একদিকে বেশ খুঁকিয়ে ধরেছে পাল্লাটা। মনে হবে ছটাক খানিক চাল বেশিই দিয়ে ফেলেছে বুঝি। দোকানীদের এ কায়দাটা জগাইয়ের অজানা নয়। তবু কলহে অংশগ্রহণ করতে তার সাহস হল না। কী লাভ এ বিতর্কের মধ্যে গিয়ে। জানকীপ্রসাদের সঙ্গে গড়ে-ওঠা সম্পর্কটাকে অকারণে বিপর্যয় করলে তারই ক্ষতি হবে।

জগাইকে কিছু বলতে হল না, তার আগেই জানকীপ্রসাদ গর্জন করে উঠল, ‘বেরিয়ে যা হারামীর বাচ্চা, চাল বেচব না তোকে। ভারী তো একসের চাল নিবি, তার আবার অত রোয়াব!’

বুড়োটা প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর গজগজ করতে করতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে চৌকাট ডিঙোতে গিয়ে হৌচট খেয়ে পড়ল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জগাই—জগন্নাথ দাস—নাপিতডুবির চায়ের দোকানের মালিক। তারপর একসময়ে সেও সওদা নিয়ে চুপি চুপি দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল নয়, পালিয়ে এল।

পলাশতলির সীমারেখা যেখানে শেষ আর বীরপুরের প্রাস্তরেখা শুরু, ঠিক সেই জায়গা বরাবর রাখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জগাইয়ের। বীরপুরে মাসির বাড়ি এসেছিল রাখা। সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছিল। জগাই এসেছিল রাখানাথের কাছে বিয়ে সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করতে। জানকীপ্রসাদের দোকানের সওদা তার জানাশোনা একজনের গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে সে খালি হাতেই এসেছিল রাখানাথের কাছে।

জগাইকে দেখে রাধা একগাল হাসল। পানের রসে টকটক করছে তার ঠোঁট দুটো। বলল, 'কি গো দাস মশাই, এদিকে কোথায় এসছিলে?'

'একটু কাজ ছিল, তাই ঘুরে গেলাম।'

'এদিকে আবার কিসের কাজ? দেখলাম লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরুচ্ছ।' বাকানো ধনুকের মত টানটান হয়ে উঠল রাধার শীর্ণ জুগল।

জগাই লজ্জা পেয়ে বলল, 'লক্ষ্মী নয়, লক্ষ্মীর বাবার কাছে দরকার ছিল।'

'দরকারটা তো লক্ষ্মীকে নিয়ে, কি গো দাস মশাই, ঠিক বলিনি?' খিল খিল করে লক্ষ্মী হেসে উঠল। জগাই বিব্রত হয়েছে এতেই সে খুশি।

এ তল্লাটে রাধার মত চঞ্চলমতী মেয়ে জগাই খুব কমই দেখেছে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে আর স্বামীস্ব আদর পেয়ে পেয়ে আহ্লাদী হয়ে উঠেছে রাধা। তবু কেন যেন জগাইয়ের তাকে ভালো লাগে। তার গায়ে-পড়া ভাব আর খিলখিল হাসি জগাইয়ের বুকে মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার মত আলোড়ন তোলে। রাধা তার কেউ নয়, বরং অনেক দূরের মানুষ সে, তবু তাকে ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয় তার। রাধা কি তার জীবনের বেদনা বোঝে? সে কি জানে তার অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত? না কি স্ত্রীলোকের সহজাত সহানুভূতিই রাধাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে।

রাধা বলল, 'চলো ঐ কাঁড়ি অরদি হেঁটে যাই, এখানটায় বাস খামে না।'

পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। হঠাৎ একটা ইঁট-বোঝাই লরি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল হুস করে। ছড়িয়ে রেখে গেল পেট্রল আর ধুলোর গন্ধ। গাড়ি যাবার সময়ে ভয়ে সরে আসতে গিয়ে প্রায় জগাইয়ের গায়ের উপর এসে পড়েছিল রাধা। জগাইও নারীদেহের স্পর্শ পেয়ে ছিটকে সরে এসেছিল রাস্তার ধারে।

দুজনেই চূপচাপ হাঁটছিল। এক সময়ে রাধা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিয়ে করছ, দাস মশাই?'

'বিয়ে!' জগাইকে কেমন অপ্রস্তুত দেখাল।

'হাঁ বিয়ে। সব পুরুষমানুষে আর 'মেয়েমানুষে যা করে।' বিচিত্র চোখ-মুখের ভঙ্গি করল রাধা।

'আচ্ছা রাধু, বিয়ে না করলে কী হয়?' জগাই বোকার মত প্রশ্ন করল।

রাধা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চেপে বলল, 'তুমি পুরুষমানুষ হয়ে এত বড় কথাটা বললে?'

জগাই ভাবল প্রশ্নটা না করলেই ভালো ছিল। একজন পরস্ৰীৰ সঙ্গে এভাবে কথা বলাটা বোধ হয় অসমীচীন। রাধা হয়তো তাই হাসিতে লুটিয়ে পড়ে তাকে লজ্জা দিল।

জগাই সতৰ্ক হয়ে উত্তর দিল, ‘আমি সে কথা বলিনি। আমি বলেছি, বিয়ে তো কত লোকেই করে না, তারা কি সবাই পাগল?’

‘পাগল হতে যাবে কেন? আমি বলি বিয়ে না করলে পুরুষমানুষকে মানায় না। আগে বিয়ে করো দাস মশাই, তবে বুঝবে বিয়ে করে সংসার করার স্তৰ!’ রাধা মিষ্টি করে হাসল।

জগাই চূপ করে আছে দেখে রাধা আবার বলল, ‘আমি বলছি, তুমি বিয়ে করো, দাস মশাই। লক্ষ্মী বড় ভালো মেয়ে। এ বয়সে ওকে কেউ নিতে রাজী হবে না। তুমি ভালোমানুষ তাই রাজী হয়েছো। লক্ষ্মী তোমাকে সুখী করতে পারবে, দাস মশাই। পুরুষ জাতটার ওপর ওর মনে মনে ভয়ানক অভিমান। সে অভিমান ভাঙাতে পারলে তুমি ওকে পাবে।’

জগাই জবাব দেবার সুযোগ পেল না। বাস এসে পড়েছে। রাধা বলল, ‘তুমি যাও, দাস মশাই। মোর আরও কাজ আছে।’

● ● পাঁচ ● ●

বিয়ে করে জগাই দু-রাত্রি বীরপুরেই ছিল। রাধানাথ তাদের ছাড়তে চায়নি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় জগাই নাপিতডুবির জানা-শোনা কয়েকজনকে রাধানাথের বাড়িতে খেতে বলেছিল। রাধানাথের তবু একটা প্রশস্ত আঙিনা আছে। দশ বিশজন মানুষ এক সঙ্গে বসতে পারে। জগাইয়ের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। স্ততরাং ষাদের না বললে নয়, একমাত্র তাদেরই খবর দিয়েছিল জগাই। কেবল দীনদয়াল ছুটি পায়নি বলে আসতে পারেনি, তাইভে দীনদয়াল আপসোস করেছিল।

যতই তাড়াছড়ো করুক, ষাওয়া-দাওয়া মিটতে একটু সময় নিল। জগাই যখন লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে ফিরবার জন্তে তৈরি হল তখন কিছুটা রাত হয়েছে। পলাশতলি থেকে শেষ বাস সওয়া আটটার সময়ে রওনা হয়। সেই বাস ধরতে না পারলে সারা রাত তাদের বীরপুরেই কাটাতে হবে। গত তিন দিন ধরে জগাইয়ের দোকান বন্ধ আছে। নিশ্চয়ই খুলো জমেছে চারদিকে। লোকে ভাবছে দোকানটা বোধহয় বন্ধই হয়ে গেল। দোকানের কথা ভেবে জগাই কেমন

একটা উৎকর্ষা বোধ করল। একনাগাড়ে তিন দিন দোকান বন্ধ থাকাটা একেবারেই বাহনীয় নয়।

বাস স্টপ পর্যন্ত রাধানাথ পৌঁছে দিতে এসেছিল। গাঁটছড়া বাধা বর-বধূকে দেখে কি ভাববে লোকে এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করছিল জগাই। রাস্তার একটা গাছে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে নিভছে। কতদিন জোনাকি দেখেছে জগাই কিন্তু আজ কেন জানি জোনাকি দেখে রীতিমত অবাক হল সে।

বাস আসতেই হুড়মুড় করে ছুজনে মালপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। হাউহাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়ে রাধানাথ চূপ করে গেল। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটো অশ্রু দিকে ফিরিয়ে নিল। জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুকেও তুলে দিতে হল পরের হাতে। এবার কী নিয়ে কাটবে তার নিঃসঙ্গ একাকী দিন কটা! লক্ষ্মীও বোধহয় কাঁদছে। কিন্তু লক্ষ্মীর গুণ্ঠন মোচন করে কে দেখবে তার মুখের দিকে। যে দেখবে সে তো জগাই। জগাই ছাড়া আর কেউ নয়।

মুকুন্দ আর রাধাও একই বাসে ফিরল। একটু তফাতে বসে তারা উভয়েই তাকিয়ে রইল জগাই আর লক্ষ্মীর দিকে। মুকুন্দও একদিন এইভাবে রাধাকে মুচকুন্দপুর থেকে তার দীর্ঘকালের পরিচিত পরিবেশ থেকে তুলে এনে নাপিত-ডুবিতে স্থাপন করেছিল। রাধার চোখে কিন্তু সেদিন জল ছিল না। গুণ্ঠনের মধ্যে রাধা যুহু যুহু হাসছিল আর পুলক বোধ করছিল মুকুন্দের কথা ভেবে। লক্ষ্মীর গুণ্ঠনের নিচে হাসি না অশ্রু কি জমে আছে কে জানে।

রাধা এক সময়ে মুকুন্দের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীর কপাল ভালো, দাম মশাইর মত বর পেয়েছে।'

ডেরায় পৌঁছে গাঁটছড়া খুলল জগাই। তারপর চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকল। তিন দিনের বন্ধ ঘরে কেমন গুমোট তাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে কস করে দেশলাই কাঠি জালিয়ে কেবোসিনের টেমিটা জ্বালাল। বেঞ্চি আর টেবিলের ধুলো সাক্ষ করল কাপড়ের ঝাড়ন দিয়ে। তারপর বিয়ে উপলক্ষে কেনা ছোট লঠনটা জালিয়ে লক্ষ্মীর মাথার কাপড় সরিয়ে তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

লক্ষ্মী হাসছে। তার ক্রান্ত বিষাদলিপ্ত মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। জগাইও হেসে ফেলল। লঠনটা নিচে রেখে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীকে। সমুদ্রে প্রতি যুহুর্তে অসংখ্য ঢেউ ওঠে। একটা ঢেউ আরেকটা ঢেউকে

ছাড়িয়ে যায়। জগাই এই প্রথম অনুভব করল তার রক্তেও অসংখ্য ঢেউ মাথা কুটছে। লক্ষ্মীই কি ঝোড়ো হাওয়ার মত সেই ঢেউগুলিকে জাগিয়ে তুলছে?

ঘামে ভেজা কয়েকটা চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে জগাই লক্ষ্মীকে ছোট ঘরখানায় নিয়ে গেল। বলল, 'এই তোমার ঘর, এই তোমার বাড়ি, এই তোমার মাথা গোঁজবার ঠাই। এখানে থাকবে বলেই তোমাকে বিয়ে করে এনেছি। তোমার বাবার মতই আমি গরীব মানুষ। তোমাকে পেয়ে আজ মোর গরিবিআন। শুচলো।'

মুগ্ধ বিন্ময়ে লক্ষ্মী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। আঠারো বছরের মেয়ে সে। জীবনে এই প্রথম সে একটা পুরুষকে এমনি ভাবে কথা বলতে শুনল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে জগাই বলল, 'তুমি একটু বসো। বাস প্যাঁটারাগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখো। আমি কয়েকটা কাজ সারি।' বলেই জগাই বালতি হাতে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। সামনের কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে হবে।

রাত বাড়ছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে চাঁদ। একটু একটু করে মায়াময় হয়ে উঠছে সমস্ত প্রান্তরটা। ঘরের মধ্যে একটা জাকরি কাটা ফোকর। সেই ফোকর দিয়ে লক্ষ্মী বাইরে তাকাল।

সামনে ধু ধু করছে বরাকর নদী। ধু ধু করছে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। জলের শীর্ণ রেখা রূপোলি ফিতের মত বালিয়াড়ির মধ্যে মুখ গুঁজে আছে। গ্রীষ্মকালে ক্ষীতকলেবর নদী ফিতের মত সরু হয়ে যায়। জাহ্নগায় জাহ্নগায় বালির স্তূপ সরিয়ে জলের সন্ধান পেতে হয়। তা হোক, তবু নদীর নাম বরাকর। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে ক্ষীণ ও অসহায় যে জলের রেখাটি আত্মগোপন করে আছে তার নাম বরাকর। লোকে বলে—

হুনী খুনী দামোদর

তিনে মিলে বরাকর

তিন নয়, মাত্র একটিকে পেলে ধন্য হয়ে যেত মানুষ। কিন্তু একটাই বা কোথায়? গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চড় চড় করে পারা উঠতে শুরু করে। আর চোখের পলকে উধাও হয়ে যায় নদীর জল। হা জল! হা জল! করে পাগল হয়ে ওঠে এলাকার মানুষ। ভাঙা টিউবওয়েল প্রবলবেগে আন্দোলিত করেও যখন এক কোঁটা জল মেলে না, কাঁসার ঘটি নিয়ে নদীতে নেমে যায়

মানুষ। বালির স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে প্রাণপ্রতিম জলের ঝরণাকে খুঁজে বের করে। ঘোলা হোক, অস্বচ্ছ হোক। তবু জল তো। গ্রীষ্মে কী অবলীলাক্রমেই না নদী হেঁটে পারাপার হয় মানুষ। বর্ষা আসতেই তো আবার ছ-কূল ভেঙে পড়বে শ্রোতে। পানসি ভাসবে। ফেরি নৌকো মাকুর মত এপার ওপার করে বেড়াবে।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল লক্ষ্মীর। চোঁকির ওপর সে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল।

জগাই এদিকে কুঁয়ো থেকে জল তুলল। দোকানটা ভালো করে ঝাড়া-মোছা করল। কাল সকালে উঠেই দোকান খুলতে হবে, উলুনে আঁচ দিতে হবে, পসরা সাজিয়ে বসতে হবে। কাজ করতে করতে জগাই গুন গুন করে গান গাইল। জীবনে সবচেয়ে বেশি খুশি হবার দিন আজ। খুশি হবার দিন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পরীক্ষার দিনও। পরীক্ষায় জগাই উত্তীর্ণ হবে তো। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হল জগাইয়ের। কেমন একটা দুর্বোধ্য আর দুর্বৃত্ত ভয়। যে ভয় কোন পুরুষকে পেতে নেই। পাওয়া উচিত নয়। দূরে অনেকগুলো শেয়াল ডাকছে একটানা। জগাইয়ের মনে হল, তারা তাকে জিজ্ঞেস করছে, ক্যা হ্যা, ক্যা হ্যা!

ঘুমের মধ্যে লক্ষ্মী কয়েকবার ধড়ব্ধ করে জেগে উঠল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল প্রায়াক্রমিক ঘরের এক কোণে টিম টিম করে লগ্নন জ্বলছে। উঠে বসার বা পাশ ফিরে শোয়ার মত তার ক্ষমতা নেই। জগাইয়ের হুটো বাহুর মধ্যে সে বন্দী। অন্ধকারে মানুষটাকে দেখা যায় না কিন্তু তার লোঁহ বেষ্টন দেহের মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করা যায়। লজ্জায়-সংকোচে লক্ষ্মী এতটুকু হয়ে গেল। ছি ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই দিনটির জুতোই কি তপস্বী করেনি সে। দিনে বা রাত্রে কোন কোম উন্মনা মুহুর্তে সে কি এই বন্দীদশার কথা ভেবে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেনি।

আমন্দে পরিতৃপ্তিতে লক্ষ্মী পা ছটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল। ভালবাসার মানুষ ভালবাসবে এতে বাধা দেবে কেন সে। চোঁকিটা দু-একবার শব্দ করে নড়ে উঠল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লক্ষ্মী সে শব্দ শুনল। আজ সে সুখী। পরিপূর্ণ সুখী।

জগাই গরমে ঘেমে উঠেছে। মাঝে মাঝে একটু একটু হাওয়া আসছে বটে,

কিন্তু সে হাওয়ায় জগাইয়ের অস্থিরতা ও উত্তেজনা জুড়োবার নয়। বাইরের সমস্ত কিছু মুছে গেছে তার চিন্তা থেকে। এমন কি মাথার ওপর টিনের চালটা কি কার্টের তক্তাপোশটা পর্যন্ত তার কাছে লুপ্ত। তার চিন্তা তার উপলব্ধি আবর্তিত হচ্ছে লক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে। আজকের রাতে লক্ষ্মীই তার কাছে একমাত্র সত্য। একটি সমর্পিতপ্রাণ মানুষ ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে তার হাতে। জগাই তাকে ইচ্ছে মত যাচাই করতে পারে, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে। নিজেকে ঠাণ্ডা অনেক বড় বলে মনে হল জগাইয়ের।

চাঁদটা ঘুরে ঘুরে জাকরি-কাটা কোকরের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। এক ফালি আলো এসে পড়েছে লক্ষ্মীর গায়ের ওপর। চোখ বুঁজে আছে লক্ষ্মী নইলে আলো দেখে এতক্ষণে লজ্জার শিউরে উঠত সে। তলিয়ে যেতে চাইত মাটির নিচে।

জগাই চোঁকির ওপর উঠে বসল। কেমন ক্লান্ত আর অবসাদগ্রস্ত লাগছে। জল তেঁটা পেয়েছে। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। গায়ে মাথায় একটু জল দিয়ে আসবে নাকি?

একটা ভয়। একটা বিদঘুটে ভয় তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শ্রোত শির শির করে নেমে গেল। মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরল জগাই। লক্ষ্মীর বেদাক্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিল। হাত-পাখা টেনে নিয়ে হাওয়া করল কিছুক্ষণ। পিঠের ঘামাচিগুলো বড় জ্বালা করছে। লক্ষ্মী যদি একটু হাত দিয়ে চুলকে দিত।

ঘুরে ফিরে জগাইয়ের নবাবগঞ্জের কথাই বার বার মনে পড়ছে। কানে এসে বাজছে চাঁপালতার সেই বিক্রপ-শানিত হাসি। জগাই সেদিনও হেরে গিয়েছিল। আজও হেরে গেছে। লক্ষ্মী কি ভাবছে কে জানে। মনে মনে তাকে করুণা করছে না তো?

রাগে দুঃখে জগাই লক্ষ্মীর পাশে ভালো মানুষের মত শুয়ে পড়ল।

● ● ছয় ● ●

গোমড়ামুখো আকাশ গুড় গুড় করছে থেকে থেকে। আর টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাত থেকে শুরু হয়েছে। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। কখনো সোজা, কখনো বীকা। প্রথম বর্ষা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে

ভালো লাগে। ভালো লাগে মেঘাঙ্কুর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে। মেঘের ডাক শুনে মাঝে মাঝে কানে কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতি হয়। গতকাল থেকে সামনের কোলিয়ারিতে বড় হাকামা বেধেছে। ধর্মঘট হতে পারে এই ভয়ে বেছে বেছে আটজনকে চাঁটাই করেছিল কোম্পানি। চাঁটাইয়ের খবর পেয়ে মজুররা ক্ষেপে ওঠে। প্রথম শিফটের যারা নিচে নেমেছিল তারা ওপরে ওঠেনি। পরের শিফটে যাদের হাজির হবার কথা, ধাওড়ায় ধাওড়ায় খবর পৌঁছতেই, তাদের অনেকে কোম্পানির আপিস ঘরে জমারোত হয়ে ম্যানেজারকে আটক করে রাখে। কাল দুপুর থেকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়নি। সন্ধ্যায় পুলিশ এসেছিল। পুলিশ আসার পর মারপিট হয়েছে। লাঠি চলেছে। বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। মদন বাউড়ি নাকি দলের সর্দার। আটজনের মধ্যে সেও ছিল। পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেধে ধরে নিয়ে গেছে। আজ থেকে কোলিয়ারি বন্ধ। লক-আউট জারি হয়েছে। তবু উদ্বেজনা কমেনি। চাক বেধে আছে পুলিশরা। জোনপুরী মজুররা ধাওড়ার বাইরে বেরয়নি। তবে সাঁওতাল বাউড়িরা চোরাগোষ্ঠা আক্রমণ চালাচ্ছে। মারপিট চলেছে থেকে থেকে। কেবল দীনদয়ালের ছুটি। কাল দুপুর থেকে কোন মালগাড়ি যাতায়াত করেনি লাঠিন দিয়ে। লেভেল ক্রশিংয়ের ফটকও বন্ধ করার দরকার হয়নি।

দোকানের কাজে সাহায্য করার জন্যে জগাঠি একটা হিন্দুস্তানী ছোকরা রেখেছে। তাকেই তালিম দিচ্ছিল জগাঠি। কি করে চা বানাতে হয়। কতটা গুঁড়ো চা দিলে কত গেলাস তরল চা তৈরি হয়। চিনি আর দুধ সম্বন্ধে রীতিমত সাবধান হতে হবে। বেশি খরচ করে ফেললে ফেল মেরে যাবে দোকান। আবার কম দিলে খন্দেররা বিরক্ত হবে। সবই আন্দাজ। আন্দাজ ঠিক হয়ে গেলে আর কিছুতে আটকাবে না। পাকা 'বয়' হয়ে উঠবে স্বরজ। বাপ-মা-মরা ছেলে স্বরজ। চাকরি পেয়ে খুশিতে মনের ভেতরটা তার হিলহিল করছে। বোকার মত সে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে আছে রুগাঠিয়ার দিকে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে বলছে, 'হাঁ বাবুজী, সব সমঝ্ লিয়া।' জগাঠি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছাউ বুঝেছিস। তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। ঐ টিকিটা কেটে ফেললে তবে যদি কিছু বৃদ্ধি হয়।' ভয়ে টিকিটা আড়াল করে দূরে সরে দাঁড়াল স্বরজ। তারপর ডানপিটে ছেলেদের মত দাঁত বের করে হি হি করে হেসে উঠল।

মারবার ভজিতে হাত তুলে শাসাতে বাজিল জগাই। হঠাৎ থেমে গেল। দোকানের সামনে একটা জীপ এসে থেমেছে।

পুলিসের জীপ। থাকি-পোশাক পরা পুলিসে বোঝাই গাড়িটা। রামগঞ্জ থানার পুখুলকলেবর দারোগা গাড়ির সামনের দিক থেকে লাফ দিয়ে দোকানের চালার নিচে এসে দাঁড়াতেই শশব্যস্তে এগিয়ে গেল জগাই। বলল, 'চা দেব, স্থার ?'

'চা নয়, একটা ধবর দিলেই কাজ হবে।' দারোগাবাবুর গলা মোটা। পান-খাওয়া মোটা চৌঁটের ভেতর থেকে কথাগুলো আরও মোটা হয়ে বেরিয়ে এল।

'কী ধবর, স্থার ?' হাত জোড় করে নিবেদন করল জগাই।

'শ্রীদাম নন্দীকে দরকার। কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যেতে পারে ?' কথা বলতে বলতেই দারোগাবাবু একটা ক্যাপস্টান সিগারেট ধরাল।

শ্রীদাম নন্দী ! ভূত দেখার মতই জগাই চমকে উঠল। ঐ নামে কোন লোককে চেনে বলে তার মনে হল না। তবে ছিদামবাবু বলে একজন লোক তার দোকানে কয়েকবার চা খেতে এসেছে। একা আসেনি। মদন বাউড়ির সঙ্গে এসেছে। তার সঙ্গেই চলে গেছে। তার নাম শ্রীদাম নন্দী নয়তো ? কে জানে। জগাইয়ের অত খোঁজধবরে কী দরকার ?

জগাই স্বধাসন্তব বিষয় প্রকাশ করে বলল, 'ঐ নামে কোন লোককে তো জানি না, স্থার।'

'জানি না যানে ? আলবাৎ জানো।' দাঁত বের করে মুখ ভাংচালে দারোগাবাবু।

'শ্রীদাম নন্দী এ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লেবার লিডার। পাড়ার রামা শ্রামা পর্যন্ত চেনে আর তুমি চেনো না।'

'হতে পারে স্থার। আমি এখানে নতুন এসেছি। ওসব লোকের খোঁজ ধবরে আমার কী দরকার। আমি সামান্য দোকানদার। চা বেচে পেট চালাই।' মাথা হেঁট করে নখ খুঁটতে লাগল জগাই। কারণ দারোগাবাবুর রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকাবার মত সাহস তার নেই।

দারোগাবাবু হাতের বেঁটে আর মোটা লাঠিটা বেকির ওপর ঠুকে হেঁ হেঁ করে হেসে উঠল। বলল, 'ও কথা বললে চলবে কেন ? শুনি তো তোমার দোকানেই নাকি ওদের জটলা বসে।'

'না স্থার। আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকে আমার দোকানে চা খেতে আসে। চা খেয়ে চলে যায়। আমার সঙ্গে লোকেদের ঐটুকু সম্পর্ক।'

দারোগাবাবু বলল, 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রীদাম রামগঞ্জে ছিল। ওখানে বসেই কলকাঠি নাড়ছিল। রাতের বেলা কোন্ ফাঁকে নাপিতডুব এসেছে। এখন কোথায় খুঁজে বেড়াই স্কাউটগুলটাকে? যত সব বামেলা। সন্ধ্যাবেলা ওয়ারেন্টটা হাতে পেলে এভাবে দৌড়ে বেড়াতে হত না।'

জগাইয়ের দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে দারোগাবাবু গাড়িতে গিয়ে বসল। সন্ধ্যা সন্ধ্যা জীপটা হাওয়ার মিলিয়ে গেল। রাস্তার এক জায়গায় অনেকটা জল জমেছিল। গাড়ির চাকা পড়ে জলটা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। হাঁপ ছেড়ে বাচল জগাই।

জীপটা বেরিয়ে যেতেই 'তুফান মেল' এসে থামল। কয়েক মিনিট সেট এসেছে। হয়তো বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। জগাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ল। এতক্ষণ স্বরজ স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। এবার সেও তৎপর হল। যাত্রীরা এসে বেঞ্চগুলো ভরিয়ে ফেলল। আজ ভালো বিক্রি হবে, মনে মনে বলল জগাই।

শিবদাস লাহিড়ী এ লাইনের পুরনো যাত্রী। কলকাতার এক বিখ্যাত চা কোম্পানির ভ্রাম্যমান ক্যানভেসার। সে হস্ত দস্ত হয়ে এসে বলল, 'আজ শুধু চায়ে শানাবে না, জগাইবাবু। ডিম, মাখন কুটি যা থাকে দাও।'

জগাই সংকুচিত হয়ে বলল, 'ও সব হবে না, স্যার। তবে বিস্কুট আছে, দেব। পাউরুটি আছে বটে তবে দু-দিনের বাসি। সে সব তো আর আপনাদের দিতে পারব না।'

'দু-দিনের বাসি!' শিবদাস হো হো হেসে উঠল। 'তোমার দোকানের হয়ে এসেছে, এই বলে দিলাম। চা আর বিস্কুট। বিস্কুট আর চা। বড় জোর পেঁয়াজের বড়া। এতে কি আর দোকান চলে আজকাল।'

চা বানাতে বানাতে জগাই উত্তর দিল, 'এ দিকে ওসব জিনিস বড় একটা ধেতে চায় না কেউ। তা আপনারা বলছেন যখন; তখন রাখতে হবে বৈকি। সবই রাখতে হবে ধীরে ধীরে।'

কে একজন বলল, 'রামগঞ্জ আর পলাশতলির মাঝখানে এই তো একটা চায়ের দোকান। তারও এই ছাঁদ ছিরি। যখনই যা চাও, হাত উল্টে বসে আছো—নেই।'

শিবদাস চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'চা তোমার মোটেই ভালো হয়নি, জগাইবাবু। কী চা ব্যবহার করছ আজকাল? আমাদের কোম্পানির চা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছ বুঝি?'

‘তা তো জানি না, স্থার। জানকীপ্রসাদের দোকান থেকে গুঁড়ো চা আসে। কী দিয়েছে ওই জানে। তবে চায়ের দর দাম যা বাড়িয়েছেন তাতে ভালো চা কেনার উপায় নেই।’

হো হো হেসে উঠল শিবদাস। ওদিকে ডাইভার হন’ বাজাতেই যাত্রীরা ছড়মুড় করে উঠে পড়ল। বেচাবিক্রি মোটামুটি ধারাপ হয়নি। কমপক্ষে টাকা দেড়েক তো নিশ্চয়ই।

বেলা বাড়তেই বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। হাতে কাজকর্ম না থাকায় জগাই চুপচাপ বসেছিল। ওদিকে ছোট ঘরটায় লক্ষ্মীর রান্না বোধহয় হয়ে এল। হাতা-খুন্তি নাড়ার শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচকোড়নের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে পাশের গ্রামের একটা ছেলে পুঁটি মাছ নিয়ে এসেছিল। জগাই আনা চারেকের মাছ রেখেছে। সেই পুঁটি মাছের চচ্চড়ি বানিয়েছে লক্ষ্মী।

জগাইয়ের মনটা ভালো নেই। শ্রাবণের গোমড়ামুখো আকাশের মতই ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার মনটা। মেঘের দলার মত নানা চুশ্চিস্তা এসে মনের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নানা কারণে জগাইয়ের মনটা ভালো নেই। প্রথমতঃ, লক্ষ্মীকে পরিপূর্ণ ভাবে পাচ্ছে না সে। কেবলই মনে হয় লক্ষ্মীর কাছ থেকে সে পালিয়ে থাকে। একজন নপুংসক মানুষকে কতদিন আঁকড়ে থাকবে লক্ষ্মী। কতদিন আঁকড়ে থাকতে পারে। এরিমধ্যে লক্ষ্মী অনেকটা দূরে সরে গেছে। কেমন নিষ্পৃহ আর উদাসীন হয়ে গেছে জগাই সম্পর্কে। কথা বলে, হাসে। কিন্তু সে কথার মধ্যে প্রাণ নেই। হাসির মধ্যে ব্যঙ্গনা নেই। কাছে ডাকলে কাছে আসে। কিন্তু বোঝা যায় কাছে আসার জন্তে তার কোন ব্যাকুলতা নেই। তবে কি লক্ষ্মী বুঝে ফেলেছে, জগাইয়ের পৌরুষ নেই?—যে পৌরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে মেয়েরা খুশি হয়ে ওঠে। খুশি আর পরিপূর্ণ।

লক্ষ্মী যদি তাকে কোনদিন ছেড়ে চলে যায়, নিজের মনকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে জগাই? কিসের জোরেই বা ধরে রাখতে চাইবে তাকে? কী আছে জগাইয়ের। যে পৌরুষের দাবি নিয়ে পুরুষের অহংকার, সেই পৌরুষই তো নেই তার।

দীনদয়ালকে সমস্ত কথাই খুলে বলেছে জগাই। দীনদয়াল বলেছে, 'ডাগডর দেখাও। এখনই দেখাও। এ নিয়ে ছেলেখেলা করো না। কোলিয়ারির ডাগডরবাবু খুব জানে শোনে।'

জগাই বলেছে, 'লজ্জা করে।'

'সরম!' হ্যা হ্যা হেসে উঠেছে দীনদয়াল। 'সরম নিয়ে খুয়ে খাবে, বাবুজী। জরু ভেগে গেলে তুমি সরম নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে সারা জিন্দগী?'

কথাটা মিথ্যা বলেনি দীনদয়াল। ডাক্তারের কাছে একদিন তাকে বেতেই হবে। কিন্তু বড় লজ্জা করে জগাইয়ের। বড় লজ্জা করে।

তবে তার অক্ষমতাই তো জগাইয়ের দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ নয়। দোকান। দোকানটাই হয়েছে জগাইয়ের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। সে বিয়ে করেছে। দোকানের কাজে একজন সহকারী নিয়েছে। এত বড় আর্থিক দায় নেবার মত ক্ষমতা কি সত্যিই তার আছে। দোকানটা বড় করতে না পারলে, বিক্রি বাড়াতে না পারলে জগাই নির্ধাত ডুববে। কিন্তু কথা হল কি দিয়ে দোকান বড় করবে জগাই। কিসের ভরসায় করবে। লক্ষ্মীর হাতে-গলায় সামান্য কিছু গয়না আছে। সেই গয়নার টাকাটা দোকানে লাগালে কেমন হয়? কিন্তু লক্ষ্মী কি দেবে? একজন অক্ষম মানুষের হাতে কিসের ভরসায় লক্ষ্মী তুলে দেবে তার সামান্য সম্বলটুকু! ষা দিনকাল! হঠাৎ মহাবীরের কথাটা তার মনে পড়ল, 'এটা চায়ের যুগ নয়, বাবুজী, পানির যুগ। চার দিকে বেকারী আর গরীবী। তোমার চা কে খাবে, বাবুজী?'

সত্যিই তো মহাবীর কোথায় গেল। কয়েকদিন হল সে উধাও হয়েছে। তার ছাউনিটাও আর নেই। জলের বড় বড় ঘড়া ছুটোও আর দেখা যায় না। শ্রাবণ মাস পড়তে না পড়তেই মহাবীর অদৃশ্য হয়েছে। মৌসুমী ফুলের মতই এই মৌসুমী মানুষটার আবির্ভাব।

নানা ভাবনা-চিন্তায় ভারী হয়ে আছে জগাইয়ের মনটা। একটু হাওয়া, সামান্য একটু হাওয়া বইলেই ভাবনার মেঘ মনের দিগন্তে উবে যেত। কিন্তু তা বে হবার নয়।

ছোট ঘরে ঢোকবার মুখটার ময়লা ধূতির একটা পর্দা ঝোলে। সেই পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী। তার দিকে তাকিয়ে জগাই মুখটা ফিরিয়ে নিল। কেমন বিষন্ন আর করুণ লক্ষ্মীর মুখখানা।

ক্রান্তি, ক্রান্তি, ক্রান্তি। লক্ষ্মীর মনে ক্রান্তি। জগাঠয়ের দেহে ক্রান্তি। এই ক্রান্তির মেঘটো তো সূর্যোদয়ের সমস্ত সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছে।

লক্ষ্মী নিশ্চয় গলায় বলল, ‘রাধু এসছিল, বলছিল পলাশতলিতে বিনোদিনী অপেরা এসেছে। কি একটা বই দেখাচ্ছে। রাধুরাও যাচ্ছে। আজ নিয়ে যাবে একবার দেখাতে?’

‘আজই?’ এবার জগাঠ সোজাসুজি লক্ষ্মীর দিকে তাকাল।

‘হাঁ, আজই। আজই শেষ দিন। ফেরার পথে বাবার ঠেঙে দেখা করে আসব।’

প্রথমেই জগাঠ ভাবল খরচের কথা। দুজনের পলাশতলি যাতায়াতের বাস-ভাড়া, তার ওপর টিকিট খরচ। অকারণে কয়েকটা টাকা বেরিয়ে যাবে। এ সময়টা এ ভাবে অর্থব্যয় না করাটাই সমীচীন। তাছাড়া দোকান বন্ধ রাখা মানে আরও কিছু লোকসান।

কিন্তু—কিন্তু লক্ষ্মী নিজে মুখ তুলে প্রস্তাব করেছে। প্রত্যাখ্যান করাটা কি ঠিক হবে? লক্ষ্মীর কথা রাখলে যদি তার বিষাদমলিন মুখে হাসি ফোটে, সে হাসি দেখে জগাঠয়ের মনটাও কি খুশিতে ভরে উঠবে না।

জগাঠ প্রসন্ন হয়ে বলল, ‘বেশ আজই যাব। তুমি ওদিককার কাজকর্ম সেরে রাখো। রুটিটাও ধরে গেছে। বিকেলে হয়তো রোদ উঠবে।’

লক্ষ্মী ভেতরে চলে যেতেই জগাঠ সূরজকে ডেকে বলল, ‘বিকেলে একটু বাইরে যাব। দোকানটা তোর জিন্মায় থাকবে। দেখি কেমন লায়েক হয়েছিস তুই।’

সূরজ দাঁত বের করে স্বভাবসুলভ হাসি হাসল। এত বড় দায়িত্বের কথা ভেবে সূরজ যতটা না খুশি হয়েছে, মজা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি।

● ● সাত ● ●

জগাঠ আর লক্ষ্মী যখন পলাশতলি পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাস-স্ট্যান্ডের সামনের মাঠেই বিনোদিনী অপেরা আসর জমিয়েছে। মেলাই লোক জমেছে রক্তসুল্লীর আশে পাশে। টিকিট ঘরের সামনে বহু লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কে আগে এসেছে আর কে আসেনি তাই নিয়ে বিতর্ক চলেছে। প্রবেশ পথের সামনে ফেরিওয়ালারা কেরোসিন তেলের কুপি জালিয়ে হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে।

চার পয়সার ভাজা বাদাম কিনল জগাই। কয়েকটা নিজে নিয়ে বাকি সবটা তুলে দিল লক্ষ্মীর হাতে। বলল, 'নাও, খাও।'

টিকিটের হার তিন রকম। একেবারে সামনের দিকে চাটাই পাতা। জন প্রতি ছয় আনা। চাটাইয়ের পেছনে বেঞ্চি সাজানো আছে কয়েক সারি। দশ আনা করে টিকিটের হার। বেঞ্চির পরেই তিন সারি চেয়ার। দশক পিছু এক টাকা। মেয়েদের জন্যে এক পাশে পৃথক ব্যবস্থাও আছে, ছয় আনা করে টিকিট।

লক্ষ্মীকে নিয়ে জগাইয়ের দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল। আশেপাশে অনেক চেনা মানুষ। কে কখন দেখে ফেলে ঠিক নেই। যদিও লক্ষ্মী বড় করে ঘোমটা টেনেছে।

দশ আনার টিকিট কাটবে কি এক টাকার টিকিট কাটবে, লক্ষ্মীর জন্যে মেয়েদের আসনের টিকিট কাটবে না দুজনে একসঙ্গে বসবে—কিছুক্ষণ এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল সে। তারপর ভেবে চিন্তে দুটো দশ আনা দামের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ল। গেটের মুখে বেশ ভিড়। কে একজন তাড়াতাড়িতে জগাইয়ের পা মাড়িয়ে দিল। হুড়মুড় করে যে যেখানে পাচ্ছে বসে পড়ছে। জগাই আর লক্ষ্মী দ্বিতীয় সারির বেঞ্চির একধারে গিয়ে বসল। বসে পড়েও কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। এই ভাবে হাটের মাঝখানে বউ নিয়ে বসতে লজ্জা করে। হঠাৎ প্রথম সারির বেঞ্চির ওপর নজর পড়ল লক্ষ্মীর। বেঞ্চির মাঝ বরাবর রাখা আর মুকুন্দ বসে আছে। মুখ টিপে টিপে হাসছে রাখা। লোকদের দেখে হাসছে না তাদের দেখে হাসছে বোঝা যায় না।

চোখের সামনে মঞ্চের ওপর পর্দা ঝুলছে। অনেক দিনের জীর্ণ আর ব্যবহার-মলিন পর্দা। পর্দার ওপর দুজন নর্তকী কুলের সাজ নিয়ে নাচছে। মাথার ওপর উড়ে যাচ্ছে একটা ফুলপদ্মী। পর্দার এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 'বিনোদিনী অপেরা'। পর্দার অপর কোণে লেখা কোন এক স্টুডিয়ার নাম। ছিঁড়ে যাওয়ায় ভালোভাবে পড়া যায় না।

আচমকা জগাইয়ের কাপড়ে একটা টান পড়তেই সে পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই বিমূঢ় হয়ে গেল। চেয়ারে বসে আছে ত্রিলোচন জানা। চোখাচোখি হতেই ত্রিলোচন বলল, 'টাকা কটা তো খুব দিবে গেলে, জগাইবাবু!'

জগাই প্রথমটায় খতমত ধেয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'বিশ্বাস করুন এইবার

ঠিক দিবে দেব। আসছে মাসে না পারি তার পরের মাসের গোড়ায় নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।’

‘বিশ্বেস করতে আর বোলো না।’ ত্রিলোচন বিদ্রূপের হাসি হাসল। ‘মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।’

হাটের মাঝখানে এভাবে অপদস্থ হওয়াতে মনে মনে জগাঠি ভয়ানক দমে গেল। সত্যিই ত্রিলোচনের টাকাটা মিটিয়ে না দেওয়া ইস্তক তার স্বস্তি নেই।

লোকজন আসছে যাচ্ছে। উঠছে বসছে। হা হা করে হাসছে। জায়গা নিয়ে মারামারি করছে কেউ কেউ। দু-একটা ছোট ছেলেমেয়ে কারা জুড়ে দিয়েছে। বেশ কিছু অবাঙালী ব্যাপারীও বাংলা নাটক দেখতে এসেছে।

পান খাচ্ছে আর পিচ ফেলছে। চোঁচিয়ে কথা বলছে। অল্প পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে টারপলিনের নিচে। সমস্ত মিলিয়ে কেমন একটা অপ্রাকৃত পরিবেশ।

ইঠাৎ ঘণ্টি বেজে উঠল টিং টিং করে। মুহূর্তের মধ্যে আলো মিভে গেল। কনসার্ট বেজে উঠল প্যাঁ প্যাঁ করে। কনসার্ট থামতেই মঞ্চের আলো জলে উঠল। যবনিকা উঠল। পুলিশ শব্দ হল ঘড় ঘড় করে। বিবেক গান গাইছে দু-হাত তুলে। দর্শকদের গুঞ্জনও স্তিমিতপ্রায়।

বিনোদিনী অপেরা এতদিন যাত্রাই করত। কয়েক মাস হল নাটক হাতে নিয়েছে। যাত্রা দেখে দেখে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। বিশেষ করে যেখানে যত বেশি শহরে হাওয়া বয়েছে সেখানে তত বেশি মানুষের চাওয়ায় রূপ পাণ্টেছে। তাই স্টেজ বেঁধে সিন খাটিয়ে নাটক নিয়ে পরীক্ষায় নেমেছে তারা। সীতার বনবাস কি লখিন্দর-বেহুলার কাহিনী নয়, দুর্ধোখন-দ্রোপদী কি নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান নয়, এমন কি কৃষ্ণলীলা কি নিমাই সন্ন্যাস নয়, একেবারে হাল আমলের বিষয়বস্তু নিয়ে মঞ্চ অবতীর্ণ হয়েছে বিনোদিনী অপেরা। নাটকের নাম ‘দেশের ডাক’। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাংলার চাষীদের নিয়ে নাটক। দাঙ্গার কথাও বিশদভাবে বলা হয়েছে। নাটক হলেও অনেকটা যাত্রার কায়দায় লেখা। জনসমাগম মন্দ হয়নি। আজ তো লোক ভেঙে পড়েছে।

মাথার কাপড় তুলে হাঁ করে দেখছিল লক্ষ্মী। দেখতে দেখতে হাঁ হয়ে যাচ্ছিল। কয়েকবার যাত্রা দেখেছে, সিনেমাও দেখেছে বার কয়েক কিন্তু এমন নাটক কখনো দেখেনি। তাই হাঁ করে দেখছিল। খুব যে ভালো লাগছে তা নয়। আবার খুব যে খারাপ লাগছে এমনও নয়। দেশের ছরবস্ত্র, মানুষজন খেতে

পাচ্ছে না, গ্রাম গল্প উজাড় হয়ে যাচ্ছে, পরাণের বউ আত্মহত্যা করল, বিরজার ছেলেটা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করল, কেঁটের মেয়ে এক অসৎ লোকের পাল্লায় পড়ে কুলত্যাগী হল। দেখতে দেখতে চোখে জল এল লক্ষ্মীর। সত্যিই বড় নির্মম এই দুনিয়া!

জগাইও চোখ বড় বড় করে দেখছে। কিন্তু তার চোখে-মুখে এমন কোন অভিব্যক্তি নেই যার সাহায্যে তার প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করা যায়।

ষিঠীয় অঙ্ক শেষ হতেই ত্রিলোচন জানা গজ গজ করতে করতে উঠে পড়ল। নাটক দেখে তার একটুও ভালো লাগেনি। মনে মনে বেশ বিরক্তই হয়েছে সে। আগে জানলে সে এর জন্তে এক টাকা ব্যয় করত না। জগাইও উঠবার জন্তে উশখুশ করছিল। লক্ষ্মী বাধা দিয়ে বলল, 'না, সবটা দেখে যাব।'

নাটক যখন ভাঙল তখন রাত এগারোটা। মণ্ডপের বাইরে কয়েকজন সাইকেল রিক্শা চালক তারস্বরে চিৎকার করছে হন' বাজিয়ে। রাধা আর মুকুন্দ তাড়া-তাড়ি একটা রিক্শায় চেপে বসল। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে রাধা জগাই ও লক্ষ্মীর দিকে আড়চোখে চাইল একবার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল দাস মশাই?'

জগাই অন্তমনস্ক ছিল। সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভালো।'

ষাঠটা পার হয়ে তারা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আজ রাতে আর ঘরে কেয়ার উপায় নেই। বাস বন্ধ হয়ে গেছে। সাইকেল রিক্শা অতদূর যেতে রাজী হবে না। রাজী হলেও অনেক ভাড়া চাইবে। সুতরাং রাতটা বীরপুরে শুল্লরবাড়িতে কাটাতে হবে। লক্ষ্মীও খুশি হবে বাপের বাড়ি গিয়ে। বীরপুরের দূরত্ব মাইল দেড়েকের বেশি নয়। এই পথটুকু হেঁটেই যাবে স্থির করল জগাই।

পলশতলির বাজারের সীমানা ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজলী বাতির এলাকাও শেষ। তারপর অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার। আকাশে দুটো একটা তারা পর্যন্ত নেই। ঠাণ্ডর করে করে পথ চলতে হয়। বোধহয় ঘন্টা খানেক আগে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাটা তাই একটু ভিজে ভিজে। কয়েকটা গাছে জোনাকির ঝাঁক জলছে আর নিভছে দূরাস্তুর নক্ষত্রের মত।

জগাই আর লক্ষ্মী হন হন করে পথ চলছিল। বিয়ের পর এমন ভাবে কোন দিন পথে বেরয়নি তারা। জগাইয়ের পাশে এমন ভাবে পাল্লা দিয়ে কোনদিন পথ হাঁটেনি সে। লক্ষ্মী মনে মনে বেশ খুশি সে জন্তে। জগাই যদি যেতে

যেতে কাঁধে হাত রাখে তার, কিংবা হাতটা চেপে ধরে তাহলে আরও খুশি হবে লক্ষ্মী, ধন্য হয়ে যাবে জগাইয়ের দাক্ষিণ্যে। কিন্তু কী মানুষ! কোন হাঁশ নেই যেন। বিয়ের পর সেই রাত্রেই উদ্ভাদনার পর কী যেন হয়ে গেছে লোকটার—লক্ষ্মী ভেবেই পায় না। জগাইয়ের শরীরে কোন দোষ আছে, নইলে সময়ে অসময়ে কী এত ভাবে সে। রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বসে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে কেন তার। লক্ষ্মীর এক দূরসম্পর্কের মাসিমারও নাকি বিয়ে হয়েছিল এমনি এক লোকের সঙ্গে। পাঁচ বছর শব্দরবাড়িতে কাটিয়ে শেষকালে একদিন গলার দড়ি দিল তার নিঃসন্তান মাসিমা। মাসিমার কথা মনে হতেই লক্ষ্মী মনে মনে শিউরে উঠল। বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল তার। তার আঠারো বছরের শরীরটা কিসের তৃষ্ণায় যেন মাখা কুটছে।

লক্ষ্মী হঠাৎ এক সময়ে আবদারের স্বরে বলল, ‘কি গো, কথা বলছ না বে।’
‘কী বলব?’

‘যা মন চায়। যা মনে আসে। আজ মোর বড় ভালো লাগছে।’

‘পালা খুব ভালো লেগেছে তাই বলো।’ জগাইয়ের কথায় যেন প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ উঁকি মারল।

লক্ষ্মী আহ্লাদে ঢলে পড়ে বলল, ‘আজ সবকিছু ভালো লাগছে। তোমার সাথে পর চলতে ভালো লাগছে। কথা বলতে ভালো লাগছে।’

জগাই সংক্ষেপে উত্তর দিল, ‘হঁ।’

‘আর কিছু বলবে না? পালা কেমন লাগল বলবে না? আমাকে কেমন লাগছে বলবে না।’ লক্ষ্মী নাছোড়।

জগাই বুঝল লক্ষ্মীকে পাগলামিতে পেয়েছে। সহজে সে তাকে রেহাই দেবে না। তাই বলল, ‘অনেক দিন আগে বিনোদিনী অপেরার যাত্রা দেখেছিলাম—সীতার বনবাস। সেটা আরও ভালো ছিল।’

লক্ষ্মী সীতার বনবাস দেখেনি বটে তবে রামায়ণের কাহিনী তার জানা আছে। তার ভয়ানক ধারাপ লাগে সে কাহিনী। রামের নির্ধুরতার আর সীতার লাজনার তার চোখে জল আসে।

লক্ষ্মী প্রসঙ্গ পালটাল, ‘যাত্রায় সিন থাকে না। থিয়েটারে ভালো ভালো সিন থাকে। সিন দেখতে মোর বড় ভালো লাগে।’

জগাই বলল, ‘হঁ।’

লক্ষ্মী আবার বলল, ‘কেউর ঘেয়ে আসলে তো ব্যাটাছেলে। কিন্তু ঠিক ঘেয়ে

ছেলের মত লাগছিল। তাই না গো। হুবহু পরীর মত দেখতে। ওর রূপ দেখেই না বদলোকটা ভুললো। ওর মতন আমার রূপ থাকলে ভুমিও ভুলতে।’

জগাই আবার মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘হুঁ।’

ইঠাৎ কী যেন হল লক্ষীর। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ আগলে দাঁড়াল। গায়ের কাপড় মাটিতে লুটোচ্ছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঝড়ু আর অনমনীয়। মাথার কাপড় মাথায় নেই। লক্ষী উন্মাদিনী না বেপরোয়া? মরিয়া হয়ে সে কি চরম আঘাত হানতে চায়?

জগাই হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিমূঢ়তার ঘোর কাটলে দৃঢ় গলায় বলল, ‘রাস্তায় মাঝে এ তোমার কেমনধারা ব্যাভার?’

কি একটা কঠোর কথা বলবে বলে তৈরি হয়েছিল লক্ষী। কিন্তু বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। মুখে কাপড় নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। কান্দতে কান্দতে বলল, ‘ভুমি মোকে একটুও ভালবাসো না। একটুও না।’

জগাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে ভালবাসতে চায় কিন্তু পারে না। এই নির্মম সত্য কথাটুকু সে কী করে বলবে লক্ষীকে। লক্ষী কি জানে না, বোঝে না। নইলে তার পৌরুষকে এভাবে ধিকৃত করে কী আনন্দ পেল সে।

গভীর সহানুভূতিতে লক্ষীর কাঁধে হাত রাখল জগাই। লক্ষী দু-হাত দিয়ে জগাইয়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকোলো। দীর্ঘদিনের তঞ্চায় হু হু করছে তার বুকেটা। দু-হাত দিয়ে লক্ষীর কটিদেশ বেঁটন করল জগাই। গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও করল। লক্ষী যদি মুহূর্তের জন্তেও খুশি হয়, তার জন্তে প্রাণপাত করতে পারে সে।

রাস্তায় কয়েকজন মানুষের গলার শব্দ শুনে সামনে পা বাড়াল তারা। আর খানিকটা গেলেই বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। তারপরেই রাখানাথের বাড়ি। বাড়ি মানে খোলার চালাঘর। রাখানাথ হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে।

রুর রুর করে বৃষ্টি নামল। অমাবস্তার আকাশ কালো। ঘোর কালো। বোবা অভিব্যক্তিহীন আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল জগাই।

● ● আট ● ●

কয়েক দিন পরের ঘটনা। সকালে জগাই সবে উঠুনটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়েছে। সারা রাতের অনিদ্রায় চোখ দুটো তার কেমন ফোলা ফোলা।

চুলগুলো বিস্মৃত, অবিস্মৃত। দীনদয়াল বিড়ি টানতে টানতে দোকানে এসে হাজির। এসেই বলল, ‘জলদি চা বানাও, বাবুজী। মন মেজাজ ভালো নেই।’

মন মেজাজ কি জগাইয়েরই ভালো না কি। সারাটা রাত সে অসহ্যের মত বিছানায় ছটকট করেছে আর নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করেছে। ভেবেছে বিয়ে-থা না করে নবাবগঞ্জে ফিরে যাওয়াই ভালো ছিল তার পক্ষে। চাঁপালতা রাজারের স্ত্রীলোক। তার সহক্ষে সে কি ভাবল না ভাবল তাতে তার কী যায় আসে। কিন্তু লক্ষ্মী তার বিয়ে করা বউ, তার নিত্য সঙ্গী। তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে সে।

জগাইয়ের সাড়া না পেয়ে দীনদয়াল আবার বলল, ‘চারদিকে বড় গোলমাল, বাবুজী, বড় হুজুং। কোলিয়ারিতে লক-আউট চলছে, কাম-কাজ বন্ধ। আদালতের বিচারে বোধহয় জেল হয়ে যাবে মদন বাউড়ির। ছিদামবাবুকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে। কাল রাতে খাণ্ডার ঢুকেছিল। পুলিশ খবর পেয়ে হাতকড়া দিয়েছে। সুবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে।’

ছিদামবাবু! জগাই চমকে উঠেই অন্তমনস্ক হয়ে গেল। ছিদামবাবু মানে শ্রীদাম নন্দী? কোলিয়ারি শ্রমিকদের নেতা শ্রীদাম নন্দী? সেই রোগামত কালো মানুষটা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখে বিদ্যুতের মত প্রখর দৃষ্টি। জগাইয়ের দোকানে কয়েকবার চা খেয়ে গেছে যে মানুষটা। হেসে কথা বলেছে। যেন কতদিনের চেনা, কত দিনের অন্তরঙ্গ।

জগাই একটা বিলম্বিত নিশ্বাস ফেলল। বলল, ‘সবই ধারাপ খবর, তেওয়ারীজী? ভালো খবর নেই?’

অন্য সময় হলে দীনদয়াল নিরাসক্ত দার্শনিকের মত দরাজ গলায় হো হো করে হেসে উঠত। কিন্তু আজ সে হাসতে পারল না। গভীর ঔদাসীন্যভরে বলল, ‘দিনকাল ধারাপ, বাবুজী। ভালো খবর পাব কোথায়? আরো তি ধারাপ খবর আছে। শুনলে দিল ভেঙে যাবে তোমার।’

কথাটা শুনে জগাইয়ের বুকটা ছুর ছুর করে উঠল। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না তার। পাছে খবরটার ভয়াবহতায় তার বুকটা হিম হয়ে যায়।

স্বরজ আসতেই জগাই তাকে দুধের কড়াই মাজতে বলল। তারপর তিন গেলাস চা করে একটা দীনদয়ালকে দিল, আরেকটা নিজে নিল। তৃতীয়

গেলাসটা স্বরজকে দিয়ে ভেতরে লক্ষীর কাছে পাঠিয়ে দিল। দুজনের মধ্যে কোন কথা নেই। গুম মেরে বসে আছে দীনদয়াল। জগাইও কেমন গম্ভীর আর নিম্পৃহ।

এমনি সময়ে ডাউন রাস এসে ধামল তেঁতুলতলার। দুজন যাত্রী যাবে বলে দাঁড়িয়েছিল। তারা গাড়িতে উঠে বসল। কোন যাত্রী নামল না। এমন কি চা খেতেও এল না কেউ। জগাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল বাসটার দিকে। বাসের ড্রাইভার দেওকিনন্দন জগাইয়ের চেনা। সে কেবল জগাইকে দেখে হাত নাড়াল। এক সময়ে বাসটা ছেড়ে যেতেই হুঁশ হল তার। মনটা আরও বিস্বাদ হয়ে গেল। এক-আধজনও চা খেতে নামল না। এই সকালের সময়টাই তো মানুষ চা খাবার তাগিদ বেশি অনুভব করে। এই সময়ে বেচাবিক্রি ভালো না হলে দুপুরে তো আরও মন্দা যাবে। তারপর যদি প্রবলবেগে বৃষ্টি নামে তাহলে তো কথাই নেই।

দীনদয়াল আশ্তে আশ্তে জিজ্ঞেস করল, ‘ডাগডরবাবুর কাছে গিয়েছিলে, বাবুজী?’

জগাই তার চেয়েও নিচু গলায় বলল, সে যায়নি। তবে একদিন যাবে। যেতেই হবে। মনমেজাজ একদম ভালো নেই। চারদিক থেকে সব কিছু ঘেন তাকে ঘিরে ধরেছে। তার কপালে কি আছে কে জানে। এতটা ভগ্নোন্মত কোনদিন হয়নি সে।

দোকানের সামনে দিয়ে হুস করে দুটো গাড়ি বেরিয়ে গেল। প্রথমটা কোলিয়ারির ম্যানেজারের, দ্বিতীয়টা পুলিশের গাড়ি। দীনদয়াল নিজের মনে মনেই বলল, এই সাতসকালে কোথায় চললেন, বাবুরা? নিশ্চয়ই রামগঞ্জে যাচ্ছেন, এস-ডি-ও সাহেবের কোঠিতে সলা পরামর্শ করতে।

টেলিগ্রাফ পোস্টের তারে বসে দুটো কাক কা কা করে ডাকছে। সেই ডাক বিলম্বিত লয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ভেতর থেকে লক্ষী স্বরজকে ডেকে কি ঘেন বলল। একটা পাথরের হুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে কাক দুটোর প্রতি নিশানা করল স্বরজ। পাথরের হুড়ি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কাক দুটো উড়ে গিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। তারপর আশেপাশে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ডাকল—কা কা কা।

কোলিয়ারির বাবুদের একটা ছেলে কেটলি নিয়ে এসে চার কাপ চা নিয়ে গেল। বাড়িতে তাসের আসর বসেছে। চা বিনা খেলার আসর জমছে না।

মালবাবুর গিন্নী বাপের বাড়ি গেছে কাজেই জগাইয়ের দোকান ছাড়া উপায় নেই।

আজ রবিবার। আজ হাটবার। হঠাৎ জগাইয়ের মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে তাকেও আজ হাটে যেতে হবে। অনেক কিছু কেনাকাটার আছে।

একটু আগে দীনদয়াল বলেছে, কী একটা খারাপ খবর আছে। সে খবরটা জানার জন্যে জগাইয়ের মনটা কেবলই উশখুশ করছে। আবার ভয়ও করছে কম না। যদি খুব খারাপ খবর হয় তাহলে মনটা আরও খারাপ আরও বিস্বাদ হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত জগাই কোতূহল সংবরণ করতে পারল না। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে ফেলল, ‘কী একটা খবর আছে বলছিলে, তেওয়ারীজী।’

‘সে বড় খারাপ খবর, বাবুজী। বড় খারাপ খবর। তোমার কুজির ওপর হামলা আসছে। কিন্তু খবরটা পাকা। এস-ডি-ওর সঙ্গে বাতচিত সব পাকা হয়ে গেছে। বাস-স্টপটা তেঁতুলতলা থেকে আরও কয়েক গজ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ঐ জামতলায়। ম্যানেজারবাবুর এক বেরাদার জামতলার সামনের জমিনটা ভাড়া নিয়েছে। চা আর মিঠাইয়ের দোকান করবে। বহুৎ বড় দোকান। তোমার জমিন ভি কোলিয়ারির জমিন। ঐ জমিনটা ভি কোলিয়ারির। ম্যানেজারবাবুর বেরাদার দোকান করলে তোমার দোকান চলবে না, বাবুজী। বড় দোকান ছোট দোকানকে খেয়ে ফেলবে।’

আচমকা খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল জগাই। সত্যিই এমন খবর যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না। দীনদয়াল ঠাট্টা করছে না তো। তারপর মাথাটা একটু থিতিয়ে যেতেই জগাই বোকা-বোকা মুখ করে বলল, ‘সত্যি বলছ, তেওয়ারীজী?’

‘সচ্। একদম সচ বাত্ বাবুজী। তেওয়ারীজী কোনদিন মিছে কথা বলে?’ দীনদয়ালের গলার সুরে বেদনা প্রকাশ পেল।

জগাই কঁাদ-কঁাদ গলায় বলল, ‘তাহলে আমি কী করব, তেওয়ারীজী?’

‘কী করবে?’ দীনদয়াল কিছুক্ষণ এক মনে তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ‘জিন্দগীর এ বড় মুসিবৎ, বাবুজী। দোকানটা আরো বড় করো। আরো জিনিস পত্র রাখো। নইলে ম্যানেজারবাবুর বেরাদারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। তোমার বড় চুশমন আসছে।’

দুশমন ! জগাই কোনদিন কাউকে তার দুশমন বলে মনে করেনি । এমন কি কেতকী কটন মিলের ম্যানেজার যখন তাকে মুখে মুখে জবাব করার জন্যে চাটাই করল তখনও জগাই তাকে দুশমনের আসনে বসায়নি । না, তার কোন দুশমন নেই । থাকতে পারে না । সে তো কারো ক্ষতি করেনি জীবনে । কিন্তু হঠাৎ কেন জানি এখন সেই অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা ভেবে দীনদয়ালের মত তাকে দুশমন বলেই আখ্যাত করতে ইচ্ছে হল জগাইয়ের ।

জগাই অসহায়ের মত বলল, ‘দোকান বড় করতে বলছ কিন্তু টাকা কোথায় পাই ।’

‘ঐটে নেই বলেই তো আমাদের কিছু হল না জিন্দগীতে । নইলে আমি আর মহাবীরপ্রসাদ এক মুলুকের লোক । মহাবীর রামগঞ্জের মস্ত বড় ব্যাপারী । কত লোককে রূপেয়া উधार দেয় । লাখ টাকা কামিয়েছে লোকটা । মোটর গাড়ি কিনেছে । ঐ তো জানকীপ্রসাদ পলাশতলিতে আড্ডা গেড়ে বসেছে । ও তো গায়ের সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই হয় আমার । এক জেলায় বাড়ি । দোকানে সওদা নিতে গেলে চিনতেও পারে না । আমি শালা এখানে রেলের ফটক খুলি আর বন্ধ করি । রূপেয়া থাকলে কবে নোকরিতে লাখি মেরে চলে যেতাম ।’ দীনদয়াল জলন্ত বিড়িটা ক্লে দিয়ে ধৈনি টিপতে বসল ।

ধৈনিটা মুখে ক্লে আবার বলল, ‘আমার নিজের রূপেয়া থাকলে তোমায় দিতাম, বাবুজী । তোমার আমার দুজনের হিসসা থাকত দোকানে । কিন্তু তা হবার নয় । আমার তলব থেকে যা বাঁচে সবই দেশে পাঠিয়ে দিই বুড়ী মার কাছে । এক কাজ করো, স্বপ্নের কাছে টাকা উधार নাও । পরে ফিরিয়ে দিও ।’

জগাই মনে মনে বলল, রাধানাথের যদি দেবার ক্ষমতা থাকত, সবার আগে তার কাছে হাত পাতত সে । আর রাধানাথ কখনই তাকে শূণ্য হাতে ফেরৎ দিত না । দিতে পারত না ।

স্বপ্নের হাতে দোকানের ভার দিয়ে জগাই হাটে গেল । রাস্তায় তখন সবে ভিড় বাড়ছে । দোকানী পসারীরা হন হন করে হাটমুখো চলেছে । মেঘলা আকাশের ঘোমটা সরিয়ে সূর্য উঁকি মারছে থেকে থেকে । নদীতে খেয়া পারাপার হচ্ছে লোকেরা । একটু আগেই মল্লিক বাস সার্ভিসের ‘মাতঙ্গিনী’ সর্বদে যাত্রী বোঝাই হয়ে তেঁতুলতলা ছেড়ে গেল । বাসে এতগুলো যাত্রী

নেওয়া এস-ডি-ওর বারণ। কিন্তু বাসওয়ালারা সে বারণ মানে না। পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে।

লক্ষ্মী ঘরে বসে বসে জাকরি-কাটা ফোকর দিয়ে নদীর দৃশ্য দেখছিল। কখনও ঠাকুরদার আমলের কাশীদাসের জরাজীর্ণ রামায়ণখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। হাতে করার মত কোন কাজ নেই। ধারে কাছে কথা বলার মত কোন মানুষ নেই। লক্ষ্মীর মাঝে মাঝে মনে হয় বিয়ে না করলেই ভালো ছিল। বিয়ে করে মানুষ নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে করে লক্ষ্মী কোনদিন কল্পনাও করেনি। বিয়ের আগে রাধানাথ বখন ছপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে একঘুম ঘুমিয়ে জারুল কাঠের ওপর বেঁটা ঘষতে বসত, কেমন একটা ভোঁতা আওয়াজ হত ঘষঘষ করে আর রাস্তার কুকুরগুলো ধুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেকার আলস্তে হাই তুলত, লক্ষ্মী এক ঝাঁকে বেরিয়ে যেত পাড়া বেড়াতে, সন্ডয়ের বাড়িতে গিয়ে তাম পিটতে বসত। তাসের পিঠ তুলতে তুলতে জীবনের গুচ কথা বলত দু-একটা আর তারপরে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত দুজনে। তাস খেলা মাথায় উঠত, সই মুখ চেপে ধরত লক্ষ্মীর, পিঠে কিল মারত কয়েকটা। বিকেল গড়িয়ে যেতেই লক্ষ্মী বাড়ি ফিরে আসত। রাধানাথ তখন কানে বিড়ি গুঁজে দুটো কাঠের জোড় মিলিয়ে ঘর ঘর করে তুরপুন চালাচ্ছে। লক্ষ্মী ভাবত, ওর জীবনে বোধহয় কোনদিনই এমনি জোড় লাগবে না।

দরজার আড়াল সরিয়ে ঘরে ঢুকল রাধা। বলল, 'বলি কি গো, একা বসে বসে কী হচ্ছে?'

'কিছু না। চুপচাপ বসে আছি। ভালো লাগছে না।'

'এই তো সিদিন বিয়ে হল। এরি মধ্যে ভালো লাগছে না, কি গো? বর ভাল-বাসে না বুঝি?'

লক্ষ্মী পেল লক্ষ্মী। একটু নড়ে চড়ে বসল। তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে শোনা-যায়-না এমন গলায় বলল, 'ভালবাসতে পারে না।'

ঠাটা করছে ভেবে রাধা বলল, 'মস্করা করছিস?'

'আমি মস্করা করব দিদি? ভালবাসার কাণ্ডাল আমি। আমি মস্করা করব?'

লক্ষ্মীর চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল দেখা দিল।

চোখে জল দেখে রাধা কেমন যেন বিমূঢ় বোধ করল। লক্ষ্মীর মনে কি কোন দুঃখ আছে? কিসের দুঃখ?

লক্ষ্মী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মুকুন্দদা তোমার খুব ভালবাসে, না দিদি?'

স্বামী-সোহাগিনী রাধা গরবিনীর মত জবাব দিল, ‘খু-উব। এত ভালবাসে যে কাছে যেতে ভয় করে। মানুষটা পাগল, বুঝলি লক্ষ্মী, মোকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। বলে কারখানায় কাজ করতে করতে নাকি মোর কথা ভাবে।’

লক্ষ্মীর চোখ ছুটো ঠকচক করে উঠল। বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল চিন চিন করে। বলল, ‘মানুষটা ভালবাসতে পারে না, দিদি। ওর শরীরে ভালবাসা নেই।’ বলেই লক্ষ্মী হু হু করে কঁদে ফেলল। কঁদতে কঁদতে বলল, ‘আমি ঠিক পালিয়ে যাব, দিদি। এখানে থাকতে পারব না। নইলে গলায় দড়ি দেব। যে মানুষটা ভালবাসতে পারে না তাকে নিয়ে আমি কী করব, দিদি?’

লক্ষ্মীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রাধা। তার একটা হাত তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, ‘কী হয়েছে বল, বোন। আমি দাস মশাইকে বলব। বিশ্বাস কর, দাস মশাই মাটির মানুষ, ওকে তুল বুঝিস না।’

‘সে তুমি বুঝবে না, দিদি। সে তুমি বুঝবে না।’ চৌকিতে শুয়ে লক্ষ্মী ফুলে ফুলে কঁদতে লাগল।

হাট থেকে ফিরে এসে জগাইয়ের সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি লক্ষ্মীর। লক্ষ্মী রান্না নিয়ে ছিল। জগাইও দোকানের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত ছিল। হাট থেকে সে লক্ষ্মীর জন্তে চার গাছা কাঁচের চুড়ি আর গন্ধ তেলের একটা ছোট শিশি কিনে এনেছে। রাত্রে শোবার সময়ে জগাই চার গাছা চুড়ি লক্ষ্মীর হাতে পরিয়ে দিল। তারপর লষ্ঠনটা তুলে ধরল হাতের সামনে। আলো পড়ে ঝক ঝক করছে রঙিন কাঁচ। লক্ষ্মীর গুমোট মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

তেলের শিশিটা লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘নাও, চটপট মাথো দিকিন।’

‘এত রাতে তেল মাখব কি?’ বিস্ময়ে ভুরু বাঁকাল লক্ষ্মী।

‘হাঁ, এত রাতেই তেল মাখবে। শুয়ে শুয়ে ফুলেল তেলের গন্ধ নেব। দেখছ না, কেমন ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে।’

লক্ষ্মী আর কোন কথা বলতে সাহস পেল না। মাথার চুল খুলে তেল মাখতে বসল। ঘরটা ভুর ভুর করে উঠল তেলের উগ্র গন্ধে। হাওয়ার দাক্ষিণ্যে সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। অনেক দূরে। মাঠের গাছগুলো শাঁ শাঁ করছে হাওয়ায়। ডালপালাগুলো প্রবলবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। টিনের চালের ওপর একটা শুকনো ডাল আছড়ে পড়ার শব্দ হল।

স্বামী-সোহাগিনী রাধা গরবিনীর মত জবাব দিল, ‘খু-উব। এত ভালবাসে যে কাছে যেতে ভয় করে। মানুষটা পাগল, বুঝলি লক্ষ্মী, মোকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। বলে কারখানায় কাজ করতে করতে নাকি মোর কথা ভাবে।’

লক্ষ্মীর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল চিন চিন করে। বলল, ‘মানুষটা ভালবাসতে পারে না, দিদি। ওর শরীরে ভালবাসা নেই।’ বলেই লক্ষ্মী হু হু করে কঁদে ফেলল। কঁদতে কঁদতে বলল, ‘আমি ঠিক পালিয়ে যাব, দিদি। এখানে থাকতে পারব না। নইলে গলায় দড়ি দেব। যে মানুষটা ভালবাসতে পারে না তাকে নিয়ে আমি কী করব, দিদি?’

লক্ষ্মীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রাধা। তার একটা হাত তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, ‘কী হয়েছে বল, বোন। আমি দাস মশাইকে বলব। বিশেষ কর, দাস মশাই মাটির মানুষ, ওকে ভুল বুঝিস না।’

‘সে তুমি বুঝবে না, দিদি। সে তুমি বুঝবে না।’ চৌকিতে শুয়ে লক্ষ্মী ফুলে ফুলে কঁদতে লাগল।

হাট থেকে ফিরে এসে জগাইয়ের সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি লক্ষ্মীর। লক্ষ্মী রাগা নিয়ে ছিল। জগাইও দোকানের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত ছিল। হাট থেকে সে লক্ষ্মীর জন্তে চার গাছা কাঁচের চুড়ি আর গন্ধ তেলের একটা ছোট শিশি কিনে এনেছে। রাতে শোবার সময়ে জগাই চার গাছা চুড়ি লক্ষ্মীর হাতে পরিয়ে দিল। তারপর লঠনটা তুলে ধরল হাতের সামনে। আলো পড়ে ঝক ঝক করছে রঙিন কাঁচ। লক্ষ্মীর গুমোট মুখে হাসির ঝিলিক খেল গেল।

তেলের শিশিটা লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘নাও, চটপট মাথো দিকিন।’

‘এত রাতে তেল মাখব কি?’ বিশ্বরে ভুরু বাঁকাল লক্ষ্মী।

‘হাঁ, এত রাতেই তেল মাখবে। শুয়ে শুয়ে ফুলেল তেলের গন্ধ নেব। দেখছ না, কেমন ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে।’

লক্ষ্মী আর কোন কথা বলতে সাহস পেল না। মাথার চুল খুলে তেল মাখতে বসল। ঘরটা ভুর ভুর করে উঠল তেলের উগ্র গন্ধে। হাওয়ার দাক্ষিণ্যে সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। অনেক দূরে। মাঠের গাছগুলো শাঁ শাঁ করছে হাওয়ায়। ডালপালাগুলো প্রবলবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। টিনের চালের ওপর একটা শুকনো ডাল আছড়ে পড়ার শব্দ হল।

জগাইয়ের দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। তাকিয়ে দেখল আর কতটা হল। সারা জীবনই কি লক্ষ্মীকে এই অক্ষম যাহ্নুঘটার জন্তে করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রাখতে হবে। জগাই কি কোনদিনই তার পৌরুষের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না?

জল ধেয়ে আবার শুয়ে পড়ল লক্ষ্মী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগাই পাশ ফিরল এক সময়ে। শরীরের চাপ পড়ে লক্ষ্মীর ডান হাতের হাট থেকে সজ-কেনা সবকটা কাঁচের চুড়ি মড় মড় করে ভেঙে গেল।

‘উঃ’ বলে যন্ত্রণায় আর বিরক্তিতে লক্ষ্মী হাতটা সরিয়ে নিল। অন্ধকারেও চোখে জল এসেছে তার।

● ● নয় ● ●

কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ লক আউট ভুলে নিয়েছে। শ্রমিকরা প্রায় সকলেই কাজে বোগ দিয়েছে। যাদের গ্রেকতার করা হয়েছে তাদের সবাইকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে। কেবল ছাড়া পাবে না শ্রীদাম নন্দী। মহকুমা আদালতে তার বিচার চলছে।

বর্ষার শেষ। মাঠের জল শুকিয়ে আসছে। খানা-ডোবাগুলো কানায় কানায় ভরপুর হয়ে গিয়েছিল, ক্রমেই তার জল নেমে যাচ্ছে। ব্যাঙের শুদিনও প্রায় শেষ হয়ে এল। তাদের প্রাণ-খোলা ডাক আর শোনা যায় না। কেবল দু-কূলপ্রাণী বরাকর আপনার নিয়মে কলকল করে বয়ে চলেছে। দু-পাশের ধু ধু বালিয়াড়ি জলের নিচে তলিয়ে গেছে। মাঠের এদিকে সেদিকে ফসলের বান ডেকেছে—সবুজ, ঘন সবুজ।

মনের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সংকোচ অতিক্রম করে জগাই এসে হাজির হল রামকিঙ্করের ডাক্তারখানায়।

ডাক্তারখানার চত্বরে তখন অনেক রোগী এসে অপেক্ষা করছে। দুটো জোয়াল-যুক্ত বলদ গাড়ির পাশেই চরে বেড়াচ্ছে। চড় চড় করে শব্দ হচ্ছে ঘাস ছেঁড়ার। বলদদুটোর পিঠে কয়েকটা কাক কি ঘেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সামনের পুকুরে কয়েক জোড়া হাঁস সস্তরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত।

একে একে সমস্ত রোগীকে বিদায় দিয়ে রামকিঙ্কর জগাইকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটার ঢুকল। লম্বা টেবিলটার ওপর শুইয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। তারপর জগাইয়ের কাছে সমস্ত বিবরণ জানতে চাইল। লুকিয়ে রাখলে চলবে না। সমস্ত কিছুই অকপটে বলতে হবে ডাক্তারের কাছে।

প্রথমে দমে গেল জগাই। তারপর ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে সমস্ত কথাই সে প্রকাশ করল। নবাবগঞ্জের কথা, চাকরি থেকে ছাটাই হওয়ার কথা, চাঁপালতার কথা, লক্ষীকে নিয়ে তার নিদারুণ ব্যর্থতার কথা। কোন কিছুই সে চেপে রাখল না। পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর বাইরের বড় ঘরটায় বেরিয়ে এল দুজনে।

রামকিঙ্কর জীবনে অনেক রোগী ঘেঁটেছে। স্ত্রী-পুরুষের অনেক গোপন ব্যাধির চিকিৎসা করেছে। তবে জগাইয়ের মত রোগী তার কাছে বড় একটা আসে না। ওরকম রোগীর সংখ্যা কম হলেও একেবারে নেই তা নয়। তবু তারা সহজে ডাক্তারের কাছে আসতে চায় না। আসতে লজ্জা পায়।

জগাই স্থির হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রামকিঙ্কর বিরস মুখে বলল, 'তোমাকে খুলেই বলি, এ রোগের চিকিৎসা আপাতত করতে চাই না। কিছুদিন দেখতে চাই। তোমায় কয়েকটা উপদেশ দেব, সেইগুলো মেনে চলবে। এ বড় জটিল মানসিক ব্যাধি। কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক ব্যাধিও। হয়তো তোমার ক্ষেত্রে কোন ওষুধ পত্রের দরকারই হবে না। মনের শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে, মনের ভয় দূর করতে পারলে তুমি হয়তো আপনা থেকেই সেরে উঠবে। আমার মনে হয় জীবনের প্রথম দিনে তুমি সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলে। সেই ভয়টা আজও তোমার মধ্যে কাজ করেছে। তোমার মনের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা ছিল, সেই অবস্থায় তুমি চাঁপালতার ঘরে গিয়েছিলে। চাঁপালতাকে ঠিক ঐ অবস্থায় দেখবার জন্যে তোমার মনে কোন প্রস্তুতি ছিল না। তাই ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলে তুমি। চাঁপালতার দুর্জয় প্রলোভন তোমাকে আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মিল ম্যানেজারের অপমান আগেই তোমার পৌরুষকে বড় রকমের আঘাত দিয়েছিল।'

স্থির হয়ে সমস্ত কথাগুলো শুনলো জগাই। যদিও খুব কম কথাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারল সে। তারপর পকেট থেকে দুটো রূপোর টাকা ডাক্তারের টেবিলের ওপর রেখে রামকিঙ্করের পা দুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আমার বাচান ডাক্তারবাবু, আমি বড় অক্ষম।'

অনেক দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল রামকিঙ্করের। হাসতে হাসতে বলল, 'দূর পাগল, আমি কী করব? এখন এখনই কিছু করা সম্ভব হলে, চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা হবার নয়।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জগাই বলল, 'লোকে বলছে, একবার জয়হরি

কবিরাজকে দেখাতে । যাব তার কাছে ?

‘সে আমি কি বলব ? ইচ্ছে হয়, যেতে পারো । বুড়োর তো শুনি খুব হাতবশ আছে । গেলে যদি মনে শাস্তি পাও, যাও । তোমার কপাল আর বুড়োর হাতবশ । তবে আমি যা বললাম সেটা মনে রেখো । তুমি যতদিন না মনে মনে সাহস আর শক্তি সঞ্চয় করতে পারছ ততদিন একা কবিরাজ কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না ।’

জয়হরি কবিরাজের কাছে অন্য একসময় যাবে ভাবতে ভাবতে জগাই দোকান-মুখো রওনা হল । ভাদ্রের রোদ তখন চড় চড় করছে আকাশে ।

দোকানে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসল জগাই । স্বরজ বলল, ‘মাইজীকে পাওয়া যাচ্ছে না ।’ লক্ষ্মী নাকি নদীতে স্নান করতে যাচ্ছে বলে বেরিয়েছিল । তারপর আর ফেরেনি ।

লক্ষ্মী সচরাচর নদীতে স্নান করতে যায় না । কুয়ো কিংবা টিউবওয়েলের জলে স্নান সারে । আজ হঠাৎ নদীতে গেল কেন ? ডুবে যায়নি তো ? পাগল ! বরাকরে কেউ ডোবে না । ডুবেছে শুনলে লোকে নাকি হো হো করে হাসে ।

তাহলে কোথায় গেল লক্ষ্মী ? কোথায় যেতে পারে ? যতই ভাবল জগাই ততই হতাশায় ভেঙে পড়ল । হৃদিস্তায় হিম হয়ে এল শরীরের সমস্ত স্নায়ু । লক্ষ্মী রাগ করে বাপের বাড়ি যায়নি তো ? কিংবা রাধার বাড়ি ? না এভাবে না বলে কয়ে তো কোনদিন একা বেরোয় না সে ।

শোবার ঘরে ঢুকে আরও অবাক হয়ে গেল জগাই । রান্না-বাগ্না করে যায়নি লক্ষ্মী । এমন কি উতুনটা পর্যন্ত ধরায়নি । তার টিনের তোরঙ্গ, তার কাপড় জামা যেখানে রাখা ছিল ঠিক সেইখানেই পড়ে আছে । কেবল লক্ষ্মী নেই । তার চপল পায়ের লম্বা পদক্ষেপ নেই । তার কাঁচের চুড়ির মিষ্টি মৃদু শব্দ নেই । অথচ তার গলার পুঁতির মালাটা চৌকির এক কোণে পড়ে আছে । আলতার শিশি, সিঁদুরের কোঁটো, চুল বাঁধবার ফিতে, এমন কি ছোট্ট আয়নাটা পর্যন্ত সবই ছড়িয়ে রেখে গেছে ঘরের আনাচে কানাচে । কেবল সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে । চৌকির নিচে জরাজীর্ণ রামায়ণখানা পর্যন্ত মুখ খুবড়ে পড়ে আছে ।

জগাই বোবা হয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল । তার যেন কিছু করার নেই, কিছু বলার নেই । জগাই যেন আগে থাকতে জানত লক্ষ্মী চলে যাবে । লক্ষ্মী চলে গিয়ে যেন তার প্রত্যাশাকেই পূরণ করে দিয়ে গেছে ।

ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আঘাত পেল জগাই। লক্ষ্মী তো কেবল চলেই যায়নি, চলে গিয়ে তার পৌরুষকে প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে গেছে। জগাইয়ের বেদনাটা এইখানে। লক্ষ্মীর চলে যাওয়াতে সে ততটা হুঃখিত নয়, বতটা সে বিচলিত তার ভৎসনায়। লক্ষ্মী যদি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে নিদারুণ অপমানে লাহিত করত এতটা মর্মান্বিত হত না সে। কিন্তু এ যেন পরোক্ষে অথচ প্রকাশে লক্ষ্মী প্রচার করে দিয়ে গেল : জগাই অক্ষম, জগাই কাপুরুষ।

বিকেলে খবরটা শুনে হাতের কাজ থামিয়ে রাধানাথ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। তারপর নিশ্চিন্ত গলায় বলল, ‘কই, এদিকে আসেনি তো !’

জগাই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল, ‘তাহলে আর কোথায় যেতে পারে ?’

ধানিকটা ভেবে রাধানাথ স্নান হাসল, ‘আর কোথাও তো যাবার কথা নয়, বাবা। হয় তোমার ওখানে, নয় এখানে। আর কোথায় যাবে ?’

বোকার মত জগাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘষ ঘষ করে মাথা চুলকাল একবার।

বা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

রাধানাথ জিজ্ঞেস করল, ‘ঝগড়া হয়েছিল ? মনাস্তর হয়েছিল ?’

জগাই বলল, ‘কই না তো, ঝগড়া হতে যাবে কেন ? মনাস্তরই বা কিসের ? সকালে একটু কাজে গিছলাম। ফিরে দেখি ঘরে নেই।’

‘ঝগড়া হল না, মনাস্তর হল না, এমনি এমনি ঘর ছেড়ে চলে গেল ? এ তো বড় আজব কথা, বাবা।’ রাধানাথ রীতিমত চিন্তিত হল। তারপর বিরসমুখে হাতের কাজকর্ম ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাই একবার পাড়ান্ন খোঁজধবর করে দেখি।’

দরজায় তাল দি়ে রাধানাথ হন হন করে বেরিয়ে গেল।

জগাই এল পলাশতলির ধানায়। সমস্ত খবর দারোগাবাবুর কর্ণগোচর করল।

পান চিবোতে চিবোতে দারোগাবাবু হেসে ফেলল। বলল, ‘একবার যখন গেছে আর ফিরে আসবে না। এমন তো আকছার ঘটছে। মেয়েছেলের ব্যাপার— স্বয়ং ভগবানেরও বোঝার অসাধ্য। কে জানে হয়তো কোন বদ ছোকরার সঙ্গে ভেগে পড়েছে।’

লজ্জায় জগাইয়ের মাথা হেঁট হয়ে এল। বুঝি বা বিপন্নও বোধ করল একটু।

বলল, ‘দেখবেন একটু খোঁজধবর রাখবেন। তবে যা ভাবছেন সে রকম কিছু নয়। ছেলেমানুষ, হয়তো সখ করে কোথাও চলে গেছে।’

গোঁফে চাড়া দিয়ে মুচকি মুচকি হেসে দারোগাবাবু বলল, ‘সে যা করবার তাতো করবই। রামগঞ্জ খানায়ও একবার খবরটা দিও।’

পাশে দাঁড়িয়ে জমাদার ছমিকুদ্দি কান খাড়া করে জগাইয়ের কথা শুনছিল। চতুর্থবার নিকেয় বসেছে সে। তার কেবলই ভয় কামরুন্নেসা কবে তার খাঁচা ছেড়ে উখাও হয়ে যাবে। জগাইয়ের কথায় একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। সেও মনে মনে বলল, ‘বড় বেদরদী এই মেয়ে জাতটা! কী চায় আর কি না চায়, খোদাই জানে। সারা বিশ্বত্রকাণ্ড পায়ের নিচে এনে দিলেও তাদের মন মোলে না।’

খানা থেকে বেরিয়ে জগাই কিছুক্ষণ রাস্তায় এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। এখন কী করবে সে, কোথায় যাবে। স্বরজের হাতে দোকানটা ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সে কী করছে না করছে কে জানে। মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত বোধ করল জগাই। সত্যিই তার বড় দুর্দিন যাচ্ছে। এই দুর্দিনে লক্ষ্মী তাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল কেন? অসুস্থ রুগ মানুষকে কি ছেড়ে চলে যায় কেউ? অসুস্থ রুগ মানুষ কি সুস্থ হয় না কোনদিন?

পলাশতলির প্রকাণ্ড মাঠের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিগন্তের একটা বড় অংশ জুড়ে আগুন লেগেছে যেন। লালচে-হলুদে আভাষ মাঠটাকে বিচিত্র লাগছে। অভিনব সাজে সেজেছে প্রকৃতি। তবু জগাইয়ের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ব্যথায়। জগাই নিঃসঙ্গ। জগাই একাকী। এই জনসংকুল পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কেউ নেই।

মাঠ পার হলেই বাজার। বাজারের মাঝখানে সোনা-রূপো পটি। সারবন্দী শাকরাদের দোকান। দোকানগুলোর এক পাশে ছোট সড়ক গলি। সেই সড়ক গলিতে ভিষগরত্ন জয়হরি কবিরাজের ঔষধালয়। প্রবেশপথের দু-পাশে দেওয়ালের গায়ে মকরধ্বজ, চ্যবণপ্রাশ, দশমূলারিষ্ট, সঞ্জীবন ঘৃত, সালসা, মোদক, অষ্টাঙ্গ লবণ, বহরের ননী, ইত্যাদির বিজ্ঞাপন। দরজার মাথায় বড় বড় আকাবাকা অক্ষরে লেখা “হতাশের আশা”।

জগাই ভাবল পলাশতলিতে এসেছে যখন তখন একবার জয়হরি কবিরাজের সঙ্গে দেখা করে গেলে হয়। আবার কবে আসবে ঠিক নেই। আজ দেখা করে গেলে অর্থ এবং সময় দুটোই বেঁচে যায়। যদিও আজ কবিরাজের বাড়ি যাবার মত মনের অবস্থা তার নয়। কী হবে জয়হরি কবিরাজের বাড়ি গিয়ে লক্ষ্মীই যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল। লক্ষ্মী নেই বটে, তবে সে একদিন ফিরে

আসতে পারে তো । সত্যিই তো লক্ষী কোথায় গেল ? গেল-যদি তো বলে গেল না কেন ?

নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাঠ পেরিয়ে জগাই বাজারের জনাকীর্ণ রাস্তায় এসে পড়ল ।

জগাইয়ের সব কথা শুনে জয়হরি কবিরাজ খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল । তারপর বিরলকেশ মাথাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, ‘এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই হে, ঘাবড়াবার কিছু নেই । কত রোগী সারিয়ে দিলাম আর তোমায় সারাতে পারব না । তবে হ্যাঁ, সময় লাগবে । এমন নয় যে এক দল ভৈরবানন্দ মোদক খেলাম আর শরীরটা চাক্ষু হয়ে গেল । আমার কথামত চলতে হবে । আজ্ঞে-বাজে ওষুধ খাওয়া চলবে না । অনুপানগুলো ঠিক ঠিক সেবন করবে ।’

জয়হরির মুখের দিকে তাকিয়ে জগাই তবু অসহায়ের মত প্রশ্ন করল, ‘সারব তো ?’

‘সারবে না মানে ? আলবৎ সারবে ।’ জয়হরি সামনের ডেস্কের ওপর সজোরে ঘুষি মারল । ‘আরে কত কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে দিলাম আর তুমি এমন কে পীর পয়গম্বর যে সারাতে পারবো না । তবে হ্যাঁ, আগেই বলেছি, সময় লাগবে । সাত তাড়াতাড়ি কিছু হবে না । আজ এক কোঁটো শুক্রসঞ্জীবন দিচ্ছি । নিয়মমাত্তিক সেবন করবে । কষে শিমূল-মূল চূর্ণ ও মধু খাবে । সাত দিন পরে দেখা কোরো । কতদূর কি উন্নতি হল দেখে সিদ্ধ মকরধ্বজ দেব ।’

জগাই কি যেন একটা বলবে বলে তৈরি হল, ‘দেখুন, মানে রামকিঙ্করবাবুর কাছে গিছলাম । তিনি—’

জয়হরি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কথা বাড়িয়ে না হে । ওসব রামকিঙ্কর-টামকিঙ্করের কন্মো নয় । জয়হরি ভিষগরত্ন মরা মানুষকে বাঁচিয়েছে । তুমি তো সেখানে একেবারে জলজ্যান্ত মানুষ হে ।’

জগাই আর কোন কথা বলার সাহস পেল না । কাঠের আলমারি হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে জয়হরি একটা ছোট্ট কোঁটো বের করল । বলল, ‘এই নাও । আর শোনো, একটা মোদক দিচ্ছি, কড়া মোদক, নিয়মিত খেলে ভীমের মত বল পাবে । তবে আগে থাকতে বলে রাখছি, বাড়াবাড়ি কোরো না, বিপরীত ফল হবে ।’ বলেই ফোকলা দাঁতে হ্যা হ্যা করে বিচিত্র হাসি হাসল জয়হরি ।

ঘরের এক কোণে একটা নড়বড়ে তক্তপোশ । তক্তপোশের ওপর একটা তেলচিটে তোষক পাতা । তোষকের একধারে একটা হলো বেড়াল ঘুমুচ্ছে ।

জয়হরি সেই ধুমস্তু বেড়ালটাকে দু-হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নিবিড়ভাবে আদর করতে করতে বলল, ‘পরিবার মারা গিয়ে অবধি আমার সঙ্গে আছে। একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে ঘুমোয়। কখনও কাছছাড়া হয় না।’

জগাই জয়হরিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বাস-স্ট্যাণ্ডে দেখা হয়ে গেল মুকুন্দ আর রাধার সঙ্গে। রাধা বলল, ‘কি গো দাস মশাই, তুমি লক্ষ্মীর নাকি খোঁজ মিলছে না।’

জগাই বলল, ‘হাঁ।’

মুকুন্দ হাসতে হাসতে বলল, ‘নিশ্চয়ই গোঁসা করে বাপের বাড়ি গেছে।’

জগাই মাথা নাড়ল, ‘না সেখানে যায়নি। সেইটাই তো ভাবনার কথা।’

রাধা কি বলতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে বাসটা স্টার্ট দিল। তিনজনে উঠে পড়ল হড়মুড় করে।

বাস চলছে। চলার বেগে গা-মাথা ছলছে সকলের। রাধা জিজ্ঞেস করল, ‘এখন কী করবে, দাস মশাই?’

‘কী আর করতে পারি? খোঁজ নেব নানান খানে। খানার ডায়েরি করিয়েছি। আমার কপালটাই বোধ হয় মন্দ। কোথাও গিয়েই মুখ পাই না।’

লক্ষ্মীর সম্বন্ধে কিছু গুচ কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল রাধার। কিন্তু দশজনের মাঝে মুখ খুলতে সাহস হল না। তাছাড়া জগাইয়ের মানসিক অবস্থা এখন তার অনুকূল নয়। তার চিন্তাগ্রস্ত অস্থির মুখের দিকে তাকিয়ে রাধা তা টের পেয়েছে। বাসের স্বল্পালোকে দেখা যাচ্ছে অবসর জগাইয়ের চোখে ক্লান্তির ঝিমুনি এসেছে।

বাস থেকে নামবার সময় মুকুন্দ বলল, ‘দরকার হলে খবর দিও ভাই। মোদের সাধ্যে যতদূর কুলোয় করব।’

● ● দশ ● ●

লক্ষ্মী যাবার পর দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন হয়েছে। তেঁতুলতলা থেকে বাস-স্টপ সরে গেছে জামতলায়। বিপুল-কলেবর তেঁতুল গাছের নিচে যে পরিমাণ ছায়া ছিল, জামতলায় ততটা ছায়া নেই। এমন কি বাতীরাও এই জায়গা-বদলে খুশি নয়। তবু কতৃপক্ষের নির্দেশে এটাকে সবাই মেনে নিয়েছে। নতুন বাস-স্টপের সামনে বেশ প্রশস্ত একটা কাঠের ঘর উঠেছে। সেই কাঠের ঘরে চা আর খাবারের দোকান দিয়েছে

ভূতনাথ। সপ্তাহ খানেক আগে খুব ঘটা করে তার উদ্বোধন হয়ে গেল। দোকানের মাথায় ভূতনাথ টিনের একটা বড় সাইনবোর্ড বসিয়েছে। সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা ‘লক্ষী কাফে’। অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা ‘প্রোপ্রাইটার শ্রীভূতনাথ ঘোষ’।

দোকানটা বেশ সাজানো গোছানো। মহকুমা শহর থেকে বেছে বেছে নাম-করা চিত্রতারকাদের এক ডজন রঙিন ছবি কিনে এনে ভূতনাথ দোকানের দেওয়ালে দেওয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। নয়নাভিরাম আর মনোহারী সব ছবি। লোকে বলছে, ভূতনাথের রুচি আছে। কারণ ছবিগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আশ মেটে না। বার বার তাকাতে ইচ্ছে যায়। একদিন দেখলে পরদিন দেখার প্রলোভন জাগে। জগাইয়ের দোকানেও কয়েকটা ছবি আছে। সবই ক্যালেন্ডারের ছবি। শিবের বুকের ওপর ধেই ধেই করে নৃত্য করছে পার্বতী, শত নরমুণ্ডের মালা পরে ধলধল করে হাসছে শক্তিরূপিনী কালী, গন্ধমাদন পর্বত হাতে উড়ে চলেছে হুমান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছবিগুলির আকর্ষণও কম নয়। তবে ছবিগুলি অনেক কালের পুরনো, দীর্ঘকাল ধরে এসব ছবি দেখে আসছে লোকে। ভূতনাথ তাই হাল আমলের ছবি লাগিয়েছে। পুরনোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে মানুষ, নতুনকে কাছে টেনে নিচ্ছে। নতুনের প্রতি মানুষের এই মোহের কথা ভূতনাথের অজানা নয়।

এছাড়া লক্ষী কাফের আসবাব পত্রের আকর্ষণও কম নয়। সেগুন কাঠের ছোট ছোট টেবিল চেয়ার দিয়ে দোকান সাজিয়েছে ভূতনাথ। যারাই দেখছে তারাই অবাক হয়ে যাচ্ছে। নাপিতডুবিতে এরকম সাজানো গোছানো দোকান একটাও নেই। জগাইও দূর থেকে প্রমাদ গণেছে। সে দীর্ঘদিন ভেবেও যা করতে পারল না, ভূতনাথ কয়েকদিনের মধ্যে তা করে ফেলল। টাকার যুগ এটা। টাকায় সব করে।

লক্ষী কাফের দুটো বিভাগ। একটায় কেবল ছানার মিষ্টি বিক্রি হয়। রসগোল্লা, ছানাবড়া, চমচম। অন্যটায় চা আর ভাজা খাবার। ডিমের অমলেট, চপ, কাটলেট, মাখন রুটি। নাপিতডুবির মানুষ এতকাল এই সব জিনিসের অভাব বোধ করলেও হাতের কাছে পেত না। এবার থেকে পাবে। জগাইয়ের দোকানে লোকে যেত নেহাৎ প্রয়োজন পড়লে, ভূতনাথের দোকানে প্রয়োজন না থাকলেও সখ করে যাবে। যেতে প্রলুব্ধ হবে। জগাইয়ের দোকানের চা, সস্তা বিস্কুট কি পের্নাজের বড়া সে প্রলোভন জাগাবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল

না। লক্ষ্মী কাকের কাঁচের শো কেসে সাজানো খাবার দেখে যে কোন মানুষের রসনা চঞ্চল হয়ে উঠবে।

বিকেলে দুজন চা খেতে এসেছিল। চা খেয়ে তারা যা-তা বলে গেল জগাইকে। জগাইয়ের চায়ে কোন স্বাদ নেই। সস্তা চায়ের কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ আছে। তার ওপর দুধ আর চিনির কার্পণ্য করছে আজকাল জগাই। পয়সা দিয়ে এমন চা তারা আর খাবে না।

রাগের মাথায় কড়া কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল জগাইয়ের কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।

তারা চলে যেতেই জগাই বিরসমনে নড়বড়ে বেঞ্চির পায়াটা মেরামত করতে বসেছিল। অনেকদিনের ব্যবহারে জোড়ের জায়গাগুলো ঢিলে হয়ে এসেছে। পেরেক ঠুকে সেগুলোকে মজবুত করা দরকার।

ধন্দের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এমন কি যারা তার পুরনো বাধা ধন্দের—যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—তারাও ধীরে ধীরে তার দোকান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর যারা উটকো ধন্দের—পথ চলতে চলতে বিশ্রাম নেবার মানসে জগাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ত তারাও আর তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না। লক্ষ্মী কাকে তাদের টেনে নিচ্ছে।

হাতুড়িটা হাতের মুঠোর চেপে ধরে জগাই রুদ্ধ আক্রোশে ভূতনাথের দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল। সত্যিই দোকানটা অল্প দিনের মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। জগাইয়ের ধন্দেররা অনেকেই যাতায়াত করছে সেখানে। এমন কি যারা কোনদিনও জগাইয়ের দোকানে আসত না, তারাও গিয়ে ভিড় করেছে লক্ষ্মী কাকেতে।

জগাই মনে মনে ভাবল : তার দোকানটাও সাজানো গোছানো দরকার, আসবাব-পত্র পাতিটানো দরকার। দিন দিনই মানুষ বদলে যাচ্ছে, মানুষের রুচি বদলে যাচ্ছে, মানুষের চালচলন বদলে যাচ্ছে, গ্রাম-নগরের চেহারা বদলে যাচ্ছে। তাকেও সেই সঙ্গে বদলাতে হবে নইলে বাতিল হয়ে যাবে সে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারবে না।

এই উপলক্ষের সবটাই তার নিজের নয়। দীনদয়াল তাকে ধরে ধরে বুঝিয়েছে। জগাইয়ের অসহায় অবস্থা দেখে দীনদয়াল গত কয়েকদিন ধরে কেবলই বলছে, 'নয়া চিজ এসে পুরনো চিজকে বাতিল করে দেয়। যেমন জোয়ান বাতিল

করে দেয় বুটাকে। ভূতনাথ নতুন, তুমি পুরনো। তোমার দোকানের হালচাল বদলে না ফেললে তুমি টিকতে পারবে না। তুমি কাঁচের গেলাসে চা দাও, লক্ষ্মী কাফে ফুল-তোলা কাপ পেলেটে চা দেয়। তোমার নিমকি-বিস্কুট কেউ ছোঁবে না। ভূতনাথ কত কিসিমের জিনিস রেখেছে দেখে এসো। তোমার ঘরের লছমী আজ ভূতনাথের ঘরে। বাবুজী, এ হল নসিবের কথা।' জগাই এর কোন উত্তর দিতে পারেনি বটে তবে কথাটাকে তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে। সত্যিই, কথাটা মিথ্যে বলেনি দীনদয়াল। নতুন আর পুরনোর এই সংঘর্ষ তো জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সত্য।

তার জীবন থেকে লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি তার দোকানের লক্ষ্মী বিদায় নিতে বসেছে। তবে কি ভূতনাথ ইচ্ছে করেই তাকে বিক্রপ করার জন্তে দোকানের নাম লক্ষ্মী কাফে দিয়েছে? তাই বা কেন হবে। জগাই তো ভূতনাথের কোন ক্ষতি করেনি।

আচ্ছা, পনের দিন ধরে লক্ষ্মীর কোন খোঁজ নেই। কালও রাধানাথের বাড়িতে খবর নিতে গিয়েছিল জগাই। না, লক্ষ্মী কোন খবরই সেখানে দেয়নি। তবে কি সে আত্মহত্যা করল? নইলে এত দিন আত্মগোপন করে থাকবে লক্ষ্মী— এমন মনের জোর তো তার থাকার কথা নয়। থানায়ও খোঁজ নিয়ে দেখেছে জগাই। সেখানেও কোন সংবাদ নেই। কেবল দারোগাবাবু হেসে হেসে জগাইকে লক্ষ্মীর সমস্ত আশা ত্যাগ করতে বলেছে।

দূর ছাই, জগাই আর লক্ষ্মীর কথা ভাববে না। ভেবে ভেবে কেবল মনটাই ধারাপ হয়। তা ছাড়া যে মানুষটা তার কথা ভাবে না, সে কেন ভেবে ব্যাকুল হবে তার কথা?

দোকান। দোকানের কথাই তাকে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। তার জীবন-মরণ সমস্তা এই দোকান। দোকান না চললে তার জীবনও অচল হয়ে পড়বে। তারপর আবার কোন্ ঘাটে গিয়ে দাঁড়াবে সে। নবাবগঞ্জে আর সে ফিরে যাবে না কোনদিন। দোকান যদি উঠে যায় তবুও না। মহকুমা শহরে গিয়ে বাড়ি বাড়ি জিনিস ফেরি করবে তবু শহরে যাবে না। বনমালী রাগ করে অনেকদিন চিঠি দেয়নি তাকে। না দিক, কী করতে পারে সে। জীবন সংসারের একদিকে বনমালী, অপর দিকে জগাই। আর কোন দিন হয়তো দেখাই হবে না দুজনের মধ্যে।

আবার দোকানের চিন্তায় ফিরে এল জগাই। দোকানটাকে নিয়ে কোমর বেঁধে

লাগতে হবে। হোক ভূতনাথ নতুন, সে পুরনো, পুরনোকে কি একেবারে বাতিল করে দিতে পারে নতুন? পারে না। পারলে তো সারা বিশ্বসংসারটাই উল্টে পাণ্টে যেত।

স্বরজকে বোধহয় শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়েই দিতে হবে। খরচ না কমাতে দাঁড়াতে পারবে না সে। তাছাড়া তাকে পরিশ্রমী হতে হবে। সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাতে হবে, সহানুভূতির জন্তে আহ্বান জানাতে হবে। জগাই গরীব, জগাই নিঃস্ব। ভূতনাথ কোলিয়ারি ম্যানেজারের ভাণ্ডে। সে অর্থবান, সে নানা স্বেযোগের অধিকারী। বাস-স্টপ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রবল অন্তায় করা হয়েছে তার প্রতি। কে তার প্রতিকার করবে? প্রতিকার করবে তারাই যারা এতদিন তাকে আহুত্ব দেখিয়েছে। ছিদামবাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করলে হত। কিন্তু তাও তো হবার উপায় নেই।

লক্ষ্মী কাকেতে হিন্দী রেকর্ড বাজছে। সুরেলা গান ঘুরপাক খাচ্ছে বিচিত্র সুরের আবর্তে। একবার পুরুষ কণ্ঠ, আর একবার নারীকণ্ঠ—দুটি ভিন্ন কণ্ঠের বৈত সঙ্গীত। ভূতনাথ লম্বা পারজামা পরে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে গানের তালে তালে বিভোর হয়ে মাথা দোলাচ্ছে সে। দোকান ঘরে দুটো ছাজাক বাতি জলছে ঝক ঝক করে। দোকানের দোরগোড়ায় দুটো প্রাইভেট মোটর এসে থেমেছিল। কি বেন কিনে আনল তারা ভেতর থেকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

লণ্ঠনটা উল্কে দিয়ে জগাই সামনে এসে দাঁড়াল। কে একজন অপরিচিত লোক এসে থেমেছে তার দোকানের সামনে। লোকটি বয়সে প্রবীণ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত মোটা ধুতি, গায়ে খন্দরের ফতুয়া। শীর্ণ মুখে বিরাট এক জোড়া গৌর। জগাই তার বৈচিত্র্যহীন মুখের দিকে তাকাতেই সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি জগন্নাথ দাস?’

‘আজ্ঞে হাঁ।’

লোকটি কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জগাই প্রশ্ন করল, ‘আপনি?’

‘মোর নাম রাইচরণ সরথেল। ভৈরবগঞ্জ থেকে আসছি।’

লোকটির কথা শুনে জগাই রীতিমত কোঁতুহলী হয়ে উঠল। বলল, ‘আমুন, ভেতরে আমুন।’

রাইচরণ দোকানের ভেতরে এসে বেঞ্চি টেনে নিয়ে বসল। তারপর দোকানের

ভেতরটা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কালীঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। কতুয়ার ওপরকার বোতামটা খুলে গলার চারপাশে হাত বোলাল। তারপর পকেট থেকে টিনের কোঁটো বের করে বিড়ি ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জলন্ত উলুনটার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। স্বরজ কাঁচা কয়লা দিয়েছে উলুনে, তারই ধোঁয়া উঠেছে।

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে জগাই। সে নিজে কথা বলতে সাহসী হচ্ছে না বলে আগন্তকের জন্তে অপেক্ষা করছে।

বিড়িতে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে রাইচরণ ঘাড় তুলে জগাইয়ের দিকে তাকাল। বলল, 'শোনো বাবাজী, আমি লক্ষ্মীর কাছ থেকে আসছি। মানে লক্ষ্মী তোমার কাছ থেকে গিয়ে অবধি মোর ওখানে আছে। মোর পরিবারের সাথে লক্ষ্মীর অনেক দিনের জানা-শোনা, মাসী বলে ডাকে।'

কথাটা শুনে মনে মনে লাফিয়ে উঠল জগাই। লক্ষ্মী ভালো আছে, লক্ষ্মী নিরাপদে আছে! এর চেয়ে বড় সংবাদ আর কী হতে পারে। এই ধবরটুকু অনেক দিন আগেই তো চিঠি লিখে জানাতে পারত লক্ষ্মী। তাহলে এতখানি উদ্বেগ বোধ করত না জগাই। পাগলের মত উতলা হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে রাখানাথ।

রাইচরণ চোখ দুটো ঘোঁচ করে বলল, 'শোনো বাবাজী, আমি পেন্থমটার আসতে চাইনি। লক্ষ্মীর মাসীই মোকে জোর করে পাঠাল। একবার ভাবলাম লক্ষ্মীর বাপের কাছে যাই। কিন্তু মোর সাহস হল না। আমি বাপু কারো বুট ঝামেলায় থাকি না। ওসব মোর খাতে পোষায় না। নিজের খাউ দাই, নিজের নিয়ে থাকি। পরের ব্যাপারে নাক গলাতে বাব কেন? তুমিই বলো, বাবাজী।'

জগাই সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লক্ষ্মী কেমন আছে?'

'কেমন আবার থাকবে? ভালো আছে।' ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ফেলল রাইচরণ। 'দিব্যি আছে, খাসা আছে। দিন রাত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, নয় তো চুপটি করে দাওয়ায় বসে থাকে। কি যেন ভাবে।'

একটু থেমে আবার বলল, 'লক্ষ্মী ভালো নেই, বাবাজী, একেবারে ভালো নেই। মাঝে মাঝে বড় কাঁদাকাটা করে, কঁদে কঁদে মাসীর বুক ভাসিয়ে দেয়। বলে মোর জীবন নষ্ট হয়ে গেল, মাসী। আমি গলায় দড়ি দেব।'

গলায় দড়ি দেবে লক্ষ্মী? জগাই বিহ্যৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল। গলায়

দড়ি দিয়ে কি লক্ষী কেবল তার হতভাগ্য জীবনের অবসান ঘটাতে চায় ? নাকি আর একবার প্রকাশ্যে অপমানিত করতে চায় জগাইকে ? বুকের ভেতরটা ব্যথায় চিন চিন করে উঠল জগাইয়ের ।

সে অসহায় গলায় বলল, 'গলায় দড়ি দেবার মত কী হয়েছে লক্ষীর ? ঘর ছেড়ে চলে গেল, একটা ধর পরিস্থিতি দিল না । এই অপরাধের জন্যে অনুশোচনা নেই লক্ষীর মনে ?'

'আর বলো কেন, বাবাজী । যত বামেলা মেয়েদের নিয়ে । পেখমটায় তো কোন কথা বলতেই চায়নি । জিজ্ঞেস করলে বলত : মোর বন্ধিন খুশি থাকব, মাসী, না বলতে পারবে না । শেষটায় মাসী জেরা করে করে কী সব জেনেছে । মোকে কিছু বলেনি, বাবাজী, বলতে চায়নি । তবে মোর মনে হয়েছে লক্ষী খুশি নয় তোমার ওপর ।'

খুশি নয়—একথা জগাইও জানে । জগাইও তো খুশি নয় এই ছনিয়ার ওপর । তার আর কি করা বাবে । ক-জন মানুষ খুশি হয় এ ছনিয়ার ? কে তার হিসেব দেবে । অনেক দিন পরে হঠাৎ আবার অত্যন্ত নির্জন আর একাকী মনে হল নিজেকে ।

দূরে ভূতনাথের দোকানে হাজারক বাতি জ্বলছে একশোটা লণ্ঠনের জ্যোতি নিয়ে । ঝলমল করছে চারদিক । জগাইয়ের হারিকেন বাতির চিমনিটা শিষ জমে জমে কালো হয়ে গেছে । পলতেটা তেরছা হয়ে জ্বলছে ।

স্বরজ চা এনে রেখেছিল রাইচরণের সামনে । রাইচরণ সেদিকে জ্রফ না করে দার্শনিকের মত চোখ দুটোকে প্রসারিত করে বলল, 'তোমার একটা কথা বলি, বাবাজী । কোলিয়ারির রামকিঙ্কর ডাক্তারকে চেনো তো । খুব নাম ডাক তাঁর । সবরকম গোপন ব্যাধির চিকিৎসা করে হাত পাকিয়েছেন তিনি । আমি বলি কি বাবাজী, তুমি একবার তাঁকে দেখাও । তিনি নিশ্চয়ই তোমায় নিরাময় করতে পারবেন ।'

জগাইয়ের মুখের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখল রাইচরণ ।

জগাই বিচলিত বোধ করলেও আত্মপক্ষ সমর্থনের মানসে বলল, 'রামকিঙ্কর-বাবুকে বিলক্ষণ চিনি । তাঁর কাছে কেন ? মোর কোন ব্যাধি নেই ।'

রাইচরণ গৌর পাকাতে পাকাতে খুব একটা বিজ্ঞতার ভান করল । বলল, 'এ বড় আজব জগৎ, বাবাজী । কার মধ্যে কি আছে না আছে তা কেউ জানে না । কেউ বলতে পারে না । জানেন কেবল তিনি যিনি দূরে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে

ঘোরাচ্ছেন, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন। নাকে টান লাগলে টের পাঠি ব্যথা লাগছে। তবু ডাক্তার বস্তির কাছে গেলে অনেক ব্যথার ভিল্পে হয়। এ তো প্রকৃতির নিয়ম বাবাজী, তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। লক্ষী কোনদিন গর্ভধারিণী হতে পারবে না, এও কি একটা কথা হল, বাবাজী?’

জগাইয়ের হঠাৎ মনে হল সে নেই। ফাঁসির রশির চাপে তার প্রাণপাখি অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে, এখন কেবল তার প্রাণহীন ভারহীন দেহটা নিরালস্য হয়ে হাওয়ায় দুলছে। দুলছে, কেবলই দুলছে। আশেপাশে দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ তলব করছে একটা মানুষ—যে কৈফিয়তের কোন সন্দেহ নেই। অন্তত জগাইয়ের কাছে নেই।

এমন সময় একটা লোক এসে ঢুকল জগাইয়ের দোকানে। চা আর পেঁয়াজের বড়া চায় লোকটা। একটা শাল পাতার ঠোঙায় কয়েকটা পেঁয়াজের বড়া লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জগাই বলল, ‘চার দেরি হবে, জল গরম নেই। এই বড়া কটা নিয়ে যাও। ভূতনাথের দোকানে চা পাবে।’

চকচকে চোখ দুটো মেলে লোকটা বলল, ‘কেনে? ভূতাবাবুর দোকানে যাবে কেনে? ভূতাবাবু ম্যানেজারবাবুর ভাগিনা বটে। তুমার দোকানে চা নাই তো চা নাই, রামলালের দোকানে সরাব আছে।’

জগাই তাকিয়ে দেখল লোকটা মদন বাউড়ি। ঝাঁকড়া-চল মাথাটা অনেকটা কামিয়ে ফেলেছে। তাই চিনতে কষ্ট হয়। সবে বোধহয় জেল খেটে বেরিয়েছে। মুখটা কেমন বিষন্ন আর শীর্ণ। জগাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলল, ‘ছিদামবাবুর খবর জানো?’

‘ছিদামবাবু!’ দূর আকাশের দিকে কিছুক্ষণ আশ্রয়ের মত তাকিয়ে রইল মদন, তারপর বলল, ‘ছিদামবাবুর এক বছর জেল হয়্যাছে বটে। সুবল আজ আদালতে গিছিল, সে বুলল। সুবলের চাকরি নাই, মোর চাকরি নাই। ছেলেপিলাগুলো না খাওয়া মরব। হেই জগাইবাবু, তুমার দোকানে এটা কাম-কাজ দিবে?’ জগাইকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মদন বাউড়ি, তারপর শাল পাতার ঠোঙাটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে টলতে টলতে লেভেল ক্রিশিংয়ের ওপারের ভাটিখানার দিকে চলে গেল।

জগাই বেঞ্চিতে এসে বসতেই রাইচরণ বলল, ‘রাগ কোরো না, বাবাজী। মোর কথাটা ভেবে দেখো। তোমাদের দুজনের মঙ্গলের জন্যই বলছি।

আর শোনো, কাল-বাল যেদিন সুবিধে হয়, লক্ষ্মীকে নিয়ে এসো। তুমি গেলে লক্ষ্মী না বলতে পারবে না। বেচারী মনে বড় আঘাত পেয়েছে। তোমায় দেখতে পেলে খুশি হবে।’

জগাই চপ করে আছে দেখে রাইচরণ আবার বলল, ‘কী বাবাজী, কথাই বলছ না? যাবে তো লক্ষ্মীকে আনতে?’

জগাই প্রথমটায় ভাবল, না সে যাবে না। কেন যাবে? লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় গেছে। ফিরে যদি আসতে চায় স্বেচ্ছায় ফিরে আসুক। জগাই কেন নিজেকে থেকে পায়ে ধরে সাধতে যাবে? আবার ভাবল, রাইচরণ যখন নিজেকে থেকে এসেছে তখন না বলাটা ঠিক হবে না। এমনও তো হতে পারে যে লক্ষ্মীই নিজের ভাল বুঝতে পেরে রাইচরণকে পাঠিয়েছে। জগাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাক এটাই মনে মনে কামনা করছে লক্ষ্মী।

জগাই ঢৌক গিলে বলল, ‘যাবো।’

‘তা-লে আজ উঠি।’ রাইচরণ উঠে দাঁড়িয়ে কালীঠাকুরের ছবিকে করজোড়ে প্রণাম করল। তারপর গলার বোতাম বন্ধ করতে করতে বলল, ‘রাত হয়েছে। কখন বাড়ি পৌঁছব ঠিক নেই। ভালোয় ভালোয় বাস পেলো হয়। বুঝলে বাবাজী, আজকাল সব তাতেই ঝামেলা। বাস বলো, রেল বলো, ইন্সটিমার বলো—সবখানেই ভিড়। শান্তিতে যাবার আসবার উপায় নেই।’

রাস্তায় নেমে জগাইয়ের কাঁধে হাত রাখল রাইচরণ। বলল, ‘মন ধারাপ কোরো না, বাবাজী। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রকৃতির কাণ্ডকারখানা, ওকি ঠিক না হয়ে পারে?’

হাসতে হাসতে রাইচরণ লক্ষ্মী কাকের সামনের বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়ালো, জগাই ঝানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তা লক্ষ্য করল।

লেভেল ক্রশিংয়ের গেটটা বন্ধ। দুটো খালি গোরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে গেটের সামনে। কোলিয়ারির মালগাড়ি যাচ্ছে হাজারটা মলের শব্দ ভুলে—ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড়। জগাইয়ের মনে হল লক্ষ্মী যেন একাই তার ঘরে ফিরে আসছে মল বাজিয়ে—ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম।

● ● এগারো ● ●

সকালে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল লক্ষ্মী কাকেকে নিয়ে। জগাই সূরজকে বাস-স্টপে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ‘তুফান মেল’ এসে ঝামতেই

কয়েকজন বাতী গাড়ি থেকে নেমে লম্বী কাকিতে ঢুকতে যাচ্ছিল, হরজ পথ আটকে দাঁড়াল। জগাই ঠিক যেমনটা শিবিরে দিয়েছিল সেই রকম হাত জোড় করে বলল, 'এ দোকানে যাবেন না, বাবুজী। আমাদের দোকানে চলুন। আমাদের দোকান অনেক দিনের পুরনো দোকান। আপনারা দয়া না করলে আমরা গরীব মানুষ মরে যাব।'

হরজকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাতীর লম্বী কাকিতে গিয়ে ঢুকল। একজন বিক্রপ করে বলল, 'যা যা ভাগ!' দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

আরও দুজন ঢুকতে যাচ্ছিল দোকানে। হরজ লাকিয়ে এসে তাদের পথরোধ করল। মিনতি করল, অনুনয় বিনয় করল। অসংস্কৃত চেহারার দুটি মানুষ থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর হরজের পিছু পিছু জগাইয়ের দোকানে এসে ঢুকল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ। জগাইয়ের এতখানি সাহস হবে সে কল্পনাই করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে জগাই? নাপিতডুবির সামান্য মানুষ জগা দাস? মনে মনে হেসে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল ভূতনাথের।

'ভূফান মেল' চলে গেল। আধ ঘণ্টা বাদে এল ডাউন বাস 'শুকতারা'। হরজ জামগাছ তলায় দাঁড়িয়েই ছিল। বাস থামতেই হরজ হাঁকডাক শুরু করল, 'চলে আসুন, বাবুজী, চলে আসুন। নাপিতডুবির বিখ্যাত পেরোজের বড়া খেতে চান তো চলে আসুন আমাদের দোকানে। এইমাত্র গরম গরম নামানো হয়েছে। আসুন বাবুজী, চটপট চলে আসুন। রং ঢং দেখে ভুলবেন না, বাবুজী। টেবিল চেয়ার দেখে ভুলবেন না। গরীব মানুষের ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু মানুষটা সাচ্চা।'

পেরোজের বড়ার গরম খোলা নেমেছে শুনে একজন দেহাতী মানুষ টুক টুক করে জগাইয়ের দোকানের দিকে অগ্রসর হল। হরজের হাঁকডাক শুনে হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল 'শুকতারা'র ড্রাইভার জানকীবল্লভ। দোকানের সামনে চেয়ার পেতে বসেছিল ভূতনাথ। জানকীবল্লভ সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'খেল জমে গেছে, ভূতনাথবাবু। এবার দর্শক জমবে। ভারী মজা হবে।'

কথাটা গিয়ে বিঁধল ভূতনাথকে। ভূতনাথ চেয়ার থেকে উঠে এসে ঠাস করে চড় মারল হরজের গালে। হরজ কেন্দ্রে উঠল চিৎকার করে। জগাই দোকান থেকে উঁকি মেরে দেখল ঘটনাটা। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা

এতদূর গড়াবে তা সে কল্পনাও করেনি। তার পক্ষে এখন আর এর মধ্যে নাক গলাতে যাওয়া সমীচীন হবে না। ভেবে জগাই আর অগ্রসর হল না।

‘ভুক্তারা’ চলে যাওয়ার পর ভূতনাথ স্বরজকে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল জগাইয়ের দোকানে। চিৎকার করে ভূতনাথ বলল, ‘এই মাত্র তোমার লোকটা পাথর মেরে আমার শো কেসের কাঁচ ভেঙে দিয়েছে। আজ বিকেলের মধ্যে কাঁচটা বদলে দেবার ব্যবস্থা করবে নয়তো পাঁচ টাকা জরিমানা জমা দেবে।’

জগাই বিমূঢ় হয়ে কয়েক মুহূর্ত ভূতনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তুমি নয়, আপনি।’

ভূতনাথ তড়পে উঠল, ‘রাস্তার ধারের আটচালার দোকানদারকেও আপনি বলতে হবে?’

স্বরজ তখনও স্তব্ধ করে কাঁদছিল। সে চোঁচিয়ে উঠল, ‘আমায় মারল কেন বুটমুট। আমি তাই ঢিল মেরে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছি। বেশ করেছি। আবার মারলে, আবার করব।’

ভূতনাথ মারবার জন্তে হাত উঠিয়েছিল। জগাই বলল, ‘খবরদার, মোর লোকের গায়ে হাত তুলবেন না। আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন, আমি বাদ সাধছি না। আমি গরীব মানুষ, একধারে পড়ে আছি। মোর লোক রাস্তায় গিয়ে যাত্রী ডেকে আনবে, তাতে বাধা দিতে পারেন না আপনি।’

‘আলবৎ দেব। আমার দোকানের সামনে আপনার লোক চেঁচামেঁচি করলে, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। আগে থাকতে বলে রাখছি, সাবধান না হলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।’ ভূতনাথ তার ডান পা-টা সজোরে মাটিতে ঠুকল।

মনে মনে প্রমাদ গণলো জগাই। শাস্ত হয়ে বলল, ‘দেখুন, খুনোখুনি করে তো কারো কোন লাভ হবে না। বরং ক্ষতি হবে। পেটের জন্তে আপনিও দোকান দিয়েছেন, আমিও দিয়েছি। আপনার পুঁজি আছে, খাটিয়েছেন; মোর পুঁজি নেই, আটচালা বেধে বসেছি। যার যা ভাগ্যে আছে হবে।’

ভূতনাথ গলার জোর এনে বলল, ‘সে তো হাজার বার। পরস্যা ঢেলে দোকান করেছি, ভিক্ষে চাইতে বসিনি। ভদ্র ঘরের লোকজন আমার দোকানে আসে। আপনার লোকের চেঁচামেঁচি আমি বরদাস্ত করব না।’

রাধা দুধ বিলি করে ফিরছিল। হৈচৈ শুনে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। ভূতনাথের কথা শেষ হতেই রাধা আহ্লাদে হাসি হেসে বলল, ‘এবারকার মত ছেড়ে দিন,

ভূতনাথবাবু। ছেলেমানুষ। অত জ্ঞান নেই, ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছে। দাস মশাই পুরনো লোক। গরীব মানুষ, এটো দোকান মাত্র সম্বল। আপনার লোক ভেবে একটু ক্ষমা-ঘেরা করে নেবেন।’

রাধার হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে জল হয়ে গেল ভূতনাথ। বলল, ‘কথাটা তা নয়, রাধা। আমার কথা হল ঝগড়া যদি করতে চাও, আমিও কম যাব না। খানার দারোগা আমার হাত ধরা। আমার সঙ্গে হুমুনি করলে এ তল্লাটে করে খেতে হবে। কী বল রাধিকা, ঠিক বলিনি?’

ভূতনাথ মুখ তুলতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বুকের কাপড় টানল রাধা।

চলে যেতে যেতে ভূতনাথ বলল, ‘যাঠি হোক, শো কেসের কাঁচটা বদলে দেবার ব্যবস্থা করবেন। নইলে আমি ছেড়ে কথা কইবো না।’

কথাটা শুনে পরাভূত প্রতিদ্বন্দীর মত দাঁড়িয়ে রইল জগাই। কথা বলতে আর সাহস হল না। জীবনের জলাশয়ে ঢিল ফেলে ফেলে সে অনেক ঢেউ সৃষ্টি করেছে। আর কত ঢেউ তুলবে?

ভূতনাথের প্রশ্নানের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে রাধা মুখ-চোখের অভিনব ভঙ্গি করল।

জগাইকে জিজ্ঞেস করল, ‘কি গো দাস মশাই, লক্ষ্মীর খবর পেলে?’

‘পেয়েছি। লক্ষ্মী ভৈরবগঞ্জে তার মাসীর বাড়ি আছে।’

খুশি-খুশি গলায় রাধা বলল, ‘তাঠি নাকি? এবার তবে লক্ষ্মীকে ঘরে আনো।’

‘আনব। কালই আনব। না এনে পারব কেন? লক্ষ্মী বিনা মনটা কেবলই পোড়ে, কেবলই পোড়ে।’

জয়হরি কবিরাজের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। মাঝে একবার গিয়েছিল জগাই। জয়হরি আরও খানিকটা ওষুধ দিয়েছিল। জগাইয়ের ধারণা সে সেরে গেছে, সম্পূর্ণ সেরে গেছে। ওষুধ খেয়েই হোক বা মানসিক শক্তি সঞ্চয় করার ফলেই হোক, সে তার লুপ্ত পৌরুষ ফিরে পেয়েছে। প্রচণ্ড ঘা খেয়ে যে পৌরুষ একদিন কুঁকড়ে ছুঁড়ে গিয়েছিল বা কোন কারণে একেবারেই ক্ষুরিত হবার অবকাশ পায়নি, সেই পৌরুষ ফিরে এসেছে তার দেহে। বা একেবারে নতুন করে ক্ষুরিত হয়েছে। জগাইয়ের কেবলই মনে হচ্ছে, এবার সে লক্ষ্মীর সামনে চাঁপালতার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

জগাই আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেছে। আপন মনেই সে কথা বলছে। আবোল তাবোল নানা কথা, যে কথা সে সাধারণতঃ ভাবত না সেই কথা। যে কথা

সে কোনদিন ভাববে বলে ভাবেনি সেই কথা।

হুপুরে পলাশতলির বাস-স্ট্যাণ্ডে নেমে সে হন হন করে জয়হরি কবিরাজের বাড়ির দিকে রওনা হল। সে যেন হাঁটছে না, লাফিয়ে চলছে। লাফিয়ে চলছে না, দৌড়চ্ছে।

জয়হরি বেড়ালকে পাশে বসিয়ে আহারে বসেছিল। জগাইকে দেখে সাদরে আহ্বান জানাল, 'এস হে এস, তারপর কী খবর?'

জগাই প্রথম দিনের মত লজ্জায় মুখে পড়ে বলল, 'আমি সেরে গেছি। একদম সেরে গেছি। মোর আর কোন রোগ নেই।'

খেতে খেতে লাফিয়ে উঠল জয়হরি। বলল, 'সেরে গেছ? একদম সেরে গেছ? এ তো বিলক্ষণ সুসংবাদ। জয়হরির হাত-যশটা তাহলে মিছে নয়, কি বলো। আসলে কথাটা কি জানো, এসব অসুখ যতটা না দেহের ততটা মনের। তুমি নিজেকে যত দুর্বল ভাববে, তত পৌরুষ হারিয়ে অক্ষম হয়ে পড়বে। যত ভাববে শক্তিমান, তত শক্তি সঞ্চয় করবে। আমার শুধু তো আর ভগবান নয় যে ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বীর্যবান হয়ে উঠবে।'

জগাই দূর থেকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন মোর সাহস যেন ঠিক থাকে।'

সূর্যের আলো কাঠের জাকরির মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতরে এসে পড়েছিল। সেই ডোরা-কাটা রোদের একধারে বসে ভাত খাচ্ছিল জয়হরি। মাঝে মাঝে কয়েকটা গ্রাস বেড়ালের জন্তে সরিয়ে রাখছিল। জগাইয়ের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে জয়হরি বলল, 'তোমায় একটা গল্প বলি শোনো। আমি তো বুড়ো। আমার চেয়েও এক বুড়ো এসে হাজির একদিন। এ অঞ্চলেরই লোক। চাষবাস করে সংসার চালায়। কিছু জমি-জিরেত আছে, গোরু-বাছুর আছে। এক রকম চলে যায় আর কি। সারা জীবনের সঞ্চয় সামান্য কটা টাকা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে এসেছে ও। পা ছটো জড়িয়ে ধরে বুড়ো বলে কি, তাকে যৌবন দিতে হবে। বোঝ একবার ব্যাপারটা। আমি যত বলি, আমি কি যৌবন দেবার মালিক। সময় হলে যিনি যৌবন দেন, সময় হলে তিনিই আবার যৌবন ফিরিয়ে নেন। জাগ্রত মা কালীর থানে গিয়ে হত্যা দাও গে। বুড়োর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ নিয়ে হয়েছে বিপত্তি। সেই বিপত্তি ঠেকাবার মতলবে বুড়ো আমার দোরে ধর্না দিয়েছে। একেবারে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা তার চিকিৎসের ভার

নিত্যে হল। কোবরেজী যখন করতেই বসেছি তখন বুড়ো যুবো এসব দেখলে চলবে কেন। ধনস্তুরি ওষুধ দিলাম ঠুকে। তিন মাস এক নাগাড়ে ওষুধ খেয়ে গেল। হঠাৎ দেখি একদিন খুব ভোরে বুড়ো এসে হাজির। সবে ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করছি। বুড়ো বলল, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। আমি যৌবন ফিরে পেয়েছি। বুড়োর দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গে এসেছিল। এক মাথা ঘোমটা টেনে সেও পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বুঝলে হে, এমনি আমার 'ওষুধের গুণ'। আর 'ওষুধটা' কি জানো তো? 'ওষুধ হল মড়গুণবলিজারিত মকরদ্বজ'। জয়হরি কড়িকাঠ ফাটিয়ে হা হা করে হাসল।

জয়হরির গল্প শুনে মনে মনে ভয়ানক খুশি হল জগাই। ভাবল, আর একবার পা ছুঁড়ে জয়হরিকে প্রণাম করে। কিন্তু বিড়ালটা পায়ের কাছে বসে আছে দেখে আর অগ্রসর হল না।

জগাই যখন ভৈরবগঙ্গা পৌঁছল তখন অনেকটা বেলা গড়িয়েছে। আশ্বিনের ঝকঝকে আকাশে পঞ্চম মেলেছে বাহারী মেঘ।

রাইচরণ বাড়ি ছিল না। কি একটা কাজে পাশের গ্রামে গিয়েছিল। রাইচরণের পরিবার জগাইকে আদর-ষত্রু করে ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরটায় বসাল। খালায় করে চিড়ে ভাজা আর নারকেল নাড়ু এনে দিল।

লক্ষ্মী খুশি ছিল। মাসীর হাঁক ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। মাসী বলল, 'চোখে যুখে জল দিয়ে একবার বাইরের ঘরটায় ঘুরে আয়। দেখ গে কে এসেছে।'।

ঘুম চোখে বাইরের ঘরে ঢুকেই লক্ষ্মী লজ্জায় জিভ কাটল। জগাই এসেছে সে ভাবতেই পারেনি। সংকোচ, ভয় আর ঘূমে আবিষ্ট তার চোখের চাউনি। চোখের পাতা জলে ভেজা। দরজার পালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী জগাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'এলে যে বড়। আমি তো যাব না।'।

'কেন?' জগাই ছোট্ট একটা ঢৌক গিলল।

'যেতে মন নেই। কী হবে গিয়ে?' লক্ষ্মীর কথায় অভিমানের রেশ।

জগাই শ্রান হেসে বলল, 'যা হবার তাই হবে। বিয়ে করেছ, ঘর করবে না—এ তোমার কেমন ধারা কথা! মাসীর ঘরে থাকবে বলে কি আমার বিয়ে করেছিলে?'।

একটা নিশ্চয় হাসিতে টোল খেল লক্ষ্মীর গাল দুটো। মনে মনে বলল : আ মরণ!

জগাই আবার বলল, ‘কেমন আছো?’

‘ভালো আছি। খুঁউব ভালো আছি। ভালো থাকব বলেই তো হেথায় চলে এসেছি। তোমার আদর পাইনি। মাসীর আদর পেয়ে মনটা কান্না অবদি ভরে আছে।’

জগাই প্রসন্ন পালটে বলল, ‘তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও। আমি এখনই ফিরব।’

‘তুমি একাই ফিরে যাও। আমি যাব না।’

‘তা হয় না লক্ষ্মী, তোমাকেও যেতে হবে।’

‘জোর করে নিয়ে যাবে?’

‘দরকার পড়লে জোর করেই নিয়ে যাব।’ জগাইয়ের কথায় এই প্রথম আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেল।

মুখে কাপড় দিয়ে ঝিল ঝিল করে হেসে উঠল লক্ষ্মী। বলল, ‘তোমার জোর খুব দেখা আছে। জোরের বড়াই কোরো না।’

লক্ষ্মীর কটাক্ষে জগাই কেমন যেন নিরস্ত্র বোধ করল। মনে মনে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করার উপায় নেই। একবার ভাবল, তার শারীরিক রোগহীনতার কথা বলে লক্ষ্মীকে বোকা বানিয়ে দিলে কেমন হয়। মেয়েছেলের এত গুমোর ভালো নয়। আবার ভাবল, না, সে কথা লক্ষ্মীর কাছে গোপন থাকি ভালো। তাতে লক্ষ্মী আরও বিমূঢ় হবে, বিমোহিত হবে।

লক্ষ্মী এবার মিষ্টি হেসে বলল, ‘আজ আমি যাব না। তুমি ফিরে যাও। যদি কোনদিন গায়ের জোরে নিয়ে যেতে পার, সেদিন যাব। আমি মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষের জোরের সাথে পারব কেন?’

জগাই বুঝল, লক্ষ্মী বারবার তার দুর্বল জায়গাটায় হাত দিতে চাইছে। এমন জায়গায় আঘাত করতে চাইছে যেখান থেকে, লক্ষ্মীর ধারণা, প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা জগাইয়ের নেই।

জগাই তাই ভিন্ন সুরে কথা বলল, ‘তোমায় ছেড়ে থাকতে মন চায় না, লক্ষ্মী। আজই তোমায় মোর সাথে নিয়ে যাব। তুমি না গেলে রাতে শুয়ে শুয়ে মোর গায়ে কাঁটা বিধবে।’

অনেক হুঃখেও লক্ষ্মীর হাসি পেল। হাসতে হাসতেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এ বড় অমোঘ অস্ত্র পুরুষের হাতে—এ অস্ত্রে যে কোন মেয়ে ঘায়েল হবে, যন্ত্রণায় টনটন করে উঠবে তার বুক।

লক্ষ্মী হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে গেল বটে কিন্তু গিয়েই কেঁদে কেলল। বালিশের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। মানুষটা সেধে নিয়ে যেতে এসেছে তাকে। তবু তো সে যেতে পারবে না। নাপিতডুবির সেই নিঃসঙ্গ ক্রান্তিকর পরিবেশে ফিরে গিয়ে সে কী করবে? জগাইয়ের জন্তে তার মনের কোণে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে করুণাও সঞ্চিত আছে। তার কথা মনে করে তার চোখে জল আসে, অবদমিত কামনা ডানা মেলে আকাশে উড়তে চায়। কিন্তু লক্ষ্মী নিরুপায়। অসহায় মানুষটির জন্তে মাথা কুটেও তো কিছু করতে পারবে না সে। আর কিছু করতে পারবে না বলেই সে নাপিতডুবিতে ফিরে যাবে না। যেতে পারবে না। জগাই মনে মনে অত্যন্ত আহত হবে জেনেও পারবে না। লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠল।

মাসী অনেক বোঝাল লক্ষ্মীকে। জগাইয়ের সঙ্গে ফিরে যাবার জন্তে অনেক অত্যাচার-উপায় করল। তবু লক্ষ্মী অটল হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে। না, সে আর কোনদিন নাপিতডুবিতে ফিরে যাবে না। যেখান থেকে সে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে, সেখানে আবার ফিরে যাবে কিসের প্রলোভনে?

রাইচরণের পরিবারের মুখে লক্ষ্মীর সিদ্ধান্ত জেনে জগাই কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। তারপর যাবার জন্তে উঠে দাঁড়াল। মুখের শিরাগুলো যেন রাগে আর অস্থিরতায় কাঁপছে।

রাইচরণের পরিবার জগাইকে রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবার জন্তে অনেক অত্যাচার করল। জগাই রাজী হল না। দোকানটা স্বরাজের হাতে ছেড়ে এসেছে সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে—এই অজুহাতে জগাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চাইল না।

রাইচরণের বাড়ি থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। এই পথটুকু জগাই হনহনিয়ে এগিয়ে চলল। মাথার ওপর ইম্পাতের মত ঝকঝকে আকাশ। পথের দুধারে আশ্বিনের হলুদ রোদ হান হয়ে এসেছে। ঘোর বাদামী রঙের সূর্যটা দেখতে দেখতে দূর দিগন্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

লক্ষ্মী এল না। তার কাতর অত্যাচার পর্যন্ত রাখল না। এমন কি চলে আসার সময়ে দেখা পর্যন্ত করল না তার সঙ্গে। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে লক্ষ্মী জগাইকে অপমান করেছে। সেই অপমানে রুদ্ধ আক্রোশে জগাই ফুলছে। চাপা উত্তেজনায় দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। একা পথ চলতে চলতে জগাইয়ের চোখে জল এল। জীবনে বহু উপেক্ষা তাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। যেদিন

চাঁপালতা তাকে আঘাত করেছিল সেদিন বেতাহত কুকুরের মত জগাই চলে এসেছিল। যেদিন কেতকী কটন মিলের দরওয়ান তাকে ফটকের বাইরে রেখে এসেছিল সেদিনও অত্যন্ত নিঃসঙ্গ আর দুর্বল মনে হয়েছিল। কিন্তু সেদিনও নিজেকে এতটা অসহায় আর নিঃস্বল মনে হয়নি। ভালবাসার মানুষ যখন আঘাত করে, আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ করে দেয়, তখন সে আঘাত সহ্য গুণ হয়ে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। পাথরে মাথা কুটবার জন্তে মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। যাক্ লক্ষ্মী যদি না আসে, নাই আশুক। জগাই একাই পাড়ি দেবে। মনটা যেদিন ঝাঁকা ঝাঁকা ঠেকবে, রাতে চৌকিতে শুয়ে শুয়ে যেদিন চোখে ঘুম আসবে না, সেদিন লক্ষ্মীর কথা ভাববে সে—যে মানুষটা থেকেও নেই, যে মানুষটা আপনার হয়েও পর, যে মানুষটা কাছে থেকেও দূরে—অনেক দূরে।

বাসের দেরি দেখে একটা ছোট পুলের ধারে বসে বসে জগাই নানা এলোমেলো কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে কেমন বিষন্ন আর উদাসীন হয়ে পড়ল। বাসের আওয়াজ শুনে জগাই এক সময়ে উঠে দাঁড়াল। নাঃ, জীবনে কোন সুখ নেই, শাস্তি নেই। ভৈরবগঞ্জে আসার সময়ে সে ভেবেছিল লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে। সে কথা ভেবে এখন কেমন একটা ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে।

জগাই যখন নাপিতডুবি পৌঁছল তখন ঘোর সন্ধ্যা। স্বরালোকিত দোকানে সুরজ ভূতের মত একা বসে আছে। উলুনটা নিভে এসেছে। ভূতনাথের দোকানে লীলায়িত সুরে হিন্দী রেকর্ড বাজছে : জিঞা বেকরার হায়, হাঁসি আধার হয়।

রাতের খাওয়াদাওয়া কোনমতে সেরে জগাই বিরস মনে সুরজকে নিয়ে সারা দিনের হিসাব মেলাতে বসল। লক্ষ্মীর কথা কেবলই বার বার মনের মধ্যে উঁকি দেবে যাচ্ছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা-টাকে রক্তাক্ত করে তুলছে। দানোয় পাওয়া মানুষের মত জগাই ধপাস করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। তারপর লঠনটার সামনে খাতাখানা টেনে নিয়ে বলল, 'দে দিকি, টাকা পয়সা কি আছে বের কর।'

সারা দিনে মাত্র টাকা দুয়েকের মত বিক্রি হয়েছে। পয়সা, আনি, দু-আনি ভর্তি মাটির ভাঁড়টা সুরজ জগাইয়ের সামনে উপুড় করে ধরল।

খুচরো পয়সাগুলো গোনা শেষ করেই জগাই দপ করে জলে উঠল। বলল, 'মানুষ হু-টাকা? কী বলতে চাস তুই? তুই নিশ্চয়ই পয়সা সরিয়েছিস? সত্যি কথা বল।'

'গঙ্গা মাইর কসম, বাবুজী, আমি একটা পয়সায়ও হাত দিইনি।' স্বরজ আহত হয়ে উত্তর দিল।

'আলবৎ তুই পয়সা চুরি করেছিস। নইলে এত কম বেচাবিক্রি কোনদিন হয়? তুই রোজই তো নিজের চোখে দেখছিস। পরশুদিনও চার টাকা বিক্রি হয়েছে। কাল তিন টাকা সাড়ে এগার আনা। আর আজ মাগুর হু-টাকা! তুই নির্ধাত পয়সা সরিয়ে এখন মিছে কথা বলছিস।'

স্বরজ মরিয়া হয়ে আবার গঙ্গা মাইর কসম খেল। বলল, 'বেচাবিক্রি না হলে আমি কী করব, বাবুজী? আজ দোকানে খুব কম লোক এসেছে। সবাই গেছে ভূতনাথবাবুর দোকানে। অহীর বংশের ছেলে আমি। আমাদের বংশ কেউ চোর হয় না।'

'চপ কর। ঢের সাউখুড়ি হয়েছে। উনি আমার ধন্যপুত্রের বুদ্ধিতির এলেন। ওঁদের বংশে কেউ চোর হয় না! বড় সাউকারের বংশ আমার।' স্বরজের টিকিসুদ্ধ মাথাটায় একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেবে বলে জগাই হাতের খাবা বাড়াল।

এক লাফে স্বরজ দূরে সরে গেল। বলল, 'গায়ে হাত তুলো না, বাবুজী। গরীবের ছেলে—খেটে খেতে এসেছি, মার খেতে আসিনি।'

গতকাল সকালে ভূতনাথ চড় মারতে এসেছিল। আজ রাতে গায়ে হাত তুলবে বলে জগাই মারমুখো হয়ে এসেছে। সবাই মারে। একটু অসুবিধা হলে সবাই মারে। মেরে নিজের সুবিধা করে নিতে চায়। গতকালকার ভূতনাথের মুখের তুলনায় আজকার জগাইয়ের মুখটাও কম হিংস্র আর প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেখাচ্ছে না।

গোবর নিকোনো মেঝের ওপর খুচরো পয়সাগুলো ছড়িয়ে আছে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জগাই। স্বরজ দূরে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। মাঝে মাঝে নখ দিয়ে মেঝের ওপর আঁচড় কাটছে। চোখের পাতা দুটো জলে ভিজে ভারী। পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখবার মত সাহস বা মনোবৃত্তি স্বরজের নেই। ঐ পয়সাগুলোই যত অনর্থের মূল। একটু কমে গেলেই মানুষ কেপে ওঠে, একটু বাড়লেই খুশি হয়, মুখে হাসি ধরে না।

জগাই গজগজ করতে করতে বলল, ‘বুঝতে পেরেছি, তোকে দিয়ে মোর কাজ চলবে না। মোর দোকান মোকে একাই চালাতে হবে।’

যারমুখো জগাইকে দেখে যতটা না মর্মান্বিত হয়েছিল স্বরজ, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্বিত হল জগাইয়ের এই কথা শুনে। কঁাদ কঁাদ মুখে স্বরজ বলল, ‘আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন, বাবুজী?’

‘হাঁ, ছাড়িয়ে দেব। তোকে দিয়ে মোর কাজ হবে না। আমি দোকানে না থাকলেই পরস। সরাবি, তোকে রাখব কোন্ ভরসায়?’

স্বরজ চোখ মুছে বলল, ‘বেশ ছাড়িয়ে দিন। আমিও আর এখানে কাজ করতে চাই না। বিকেল বেলা ভূতনাথবাবু এসেছিল। বলছিল, ওর দোকানে কাজ দেবে। তলবও দুটাকা বেশি দেবে। আমি রাজী হইনি। বলেছি, বাবুজীর দোকান ছেড়ে যাব না। তা আপনি যখন জবাব দিয়ে দিচ্ছেন, তখন তো যেতেই হবে।’ স্বরজের মুখে চোরা হাসির রেখা ফুটল।

হাসি দেখে জগাই চূপ করে রইল। সত্যিই স্বরজের কথা শুনে সে হাঁ হয়ে গেছে। এই সময়ে দীনদয়াল এল গুটি গুটি। বলল, ‘তোমার কাছে মাথাব্যথার বড়ি আছে, বাবুজী?’

‘মাথাব্যথার বড়ি? হঠাৎ এত রাতে কার মাথা ধরল?’

‘আমার নয়, বাবুজী।’

‘তবে কার?’

দীনদয়াল খানিকক্ষণ চূপ মেরে রইল। তারপর ঢোক গিলে বলল, ‘একটা জেনানা রামগঞ্জের খানকলে কাজ করে। ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ শরীর খারাপ করে আমার ডেরায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভয়ানক মাথা ধরেছে বেচারীর। একটা দুটো বড়ি খেলেই সেরে যাবে।’

জগাই ভাবল : সেই মেয়েটি নয় তো? যে মেয়েটির কথা দীর্ঘদিন ধরে দীনদয়ালের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

জগাই প্রশ্ন করল, ‘মেয়েটার মরদ নেই?’

দীনদয়াল দু-বার ঢোক গিলে বলল, ‘কি জানি হয়তো আছে। হয়তো নেই। তবে জেনানাটা একাই থাকে। একেবারে একা আর অসহায়।’

জগাই হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোমায় তো দেখছি বড় বেকায়দায় ফেলেছে, তেওয়ারীজী। দাঁড়াও দেখি, আছে বোধ হয় একটা এনাসিনের প্যাকেট।’

বাস্কের ডালাটা খুলে হাতড়ে হাতড়ে জগাই একটা অর্ধব্যবহৃত এনাসিনের প্যাকেট বের করে আনল। বলল, 'তোমার কপাল ভালো তেওয়ারীজী, পেয়েছি।'।

দীনদয়াল এক গাল হেসে বলল, 'মহাবীরজীর কৃপা।'।

দীনদয়াল চলে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাস করল 'জরুরে এনেছ, বাবুজী?'

'না। লক্ষ্মী এল না।'।

'এল না? এ কী বলছ, বাবুজী!'

'সত্যিই বলছি, লক্ষ্মী এল না। অনেক করে বললাম তবু আসতে রাজী হল না।' জগাইয়ের মুখটা কেমন অস্বাভাবিক রকম হাল দেখাল। 'লক্ষ্মী এল না। আমিই বা এখানে একা একা কী করব? আমিও চলে যাব। চলে যেতেই হবে। ভূতনাথবাবুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না, তেওয়ারীজী। এ দেশে রুজি আর চলবে না। মোর দোকান তুলে চলে যেতে হবে। ভূতনাথবাবু বড় জবর দুশমন।'।

'দুশমন' কথাটা দীনদয়ালই একদিন জগাইকে বলেছিল। সেদিন চমকে উঠেছিল জগাই। আজ কথাটার মর্মার্থ অনেক স্পষ্ট অনেক স্বচ্ছ হয়ে এসেছে তার কাছে।

দীনদয়াল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'এ বড় খারাপ খবর, বাবুজী। তুমি নিজে থেকে হার মানবে কেন? তোমাকে একদিন বলেছিলাম, জিন্দগী আর দুনিয়াদারি বড় গোলমালে জিনিস। যে লোকটা শত্রু জমিনের ওপর দিয়ে জোর কদমে হেঁটে যেতে পারল সে বেঁচে গেল আর যে একটু কমজোরি দেখাল, তার নসিবে অনেক দুখ, অনেক তকলিফ।'।

'অনেক দুখ, অনেক তকলিফ' কথাগুলো মনে মনে কয়েকবার আবৃত্তি করে জগাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দীনদয়াল যেতে যেতে বলল, 'অত সহজে ভেঙে পোড়ো না, বাবুজী। মনের মধ্যে তাকৎ সঞ্চয় করো। দেখবে তাকতের সামনে সব দুশমন হটে গেছে।'।

দোকান বন্ধ করে জগাই শুতে যাবার জোগাড় করল। ক্রান্তিতে সমস্ত শরীরটা ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখের পাতা দুটো কেমন ভারী ভারী ঠেকেছে। তবে ঘুম আসবে কি না কে জানে। হয়তো সারা রাতই অনিদ্রায় এপাশ ওপাশ করবে সে। স্বরজ দোকানের একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার

নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে জগাইয়ের কেন জানি মায়া হল। করুণা হল বাপ-মা
মরা নিঃশ্ব ছেলেটার ওপর।

ভূতনাথের দোকান অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ বাসও চলে গেছে
অনেকক্ষণ হল। এখন রাস্তাটা জনহীন, নীরব।

লক্ষ্মীর কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে শুয়ে হাই তুলল জগাই।

সকালে উঠতে বেশ দেরি হল জগাইয়ের। দোকান খুলে বসল যখন তখন
বেশ চড়চড়ে রোদ উঠেছে। শরতের রোদ। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের দিকে
তাকিয়ে বেশ বোঝা যায় বর্ষা শেষ হয়েছে। এবার শীতের পালা।

স্বরজ উনুনে আগুন দিয়েছিল। জগাই হাত-পাখা দিয়ে খানিকটা হাওয়া দিতেই
আঙুরগুলো জ্বল জ্বল করে উঠল। জলের পাত্রটা উনুনের ওপর চাপিয়ে মুখ
ধুতে বসল জগাই। রাতে ভালো খুম হয়নি। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে।

আপ ডাউন দুটো বাস এল, চলে গেল। জনকয়েক যাত্রী জগাইয়ের দোকানে
এল বটে তবে তারা কথায় কথায় পঞ্চমুখে ভূতনাথের দোকানের প্রশংসা করে
গেল। বলল, ভূতনাথ মানুষের হৃদয়কে জয় করার কৌশল জানে।

তারা চলে গেলে জগাই 'ভুফান মেল'-এর অপেক্ষা করতে লাগল। ভুফান
মেল'-এ নিশ্চয়ই কিছু খন্দের আসবে। তার যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ জগাইয়ের
অত্যন্ত পরিচিত। তাদের অনেকেই তার দোকানে না এসে পারবে না।

এনামেলের খালায় এক রাশ পেরঁয়াজ কেটে স্বরজ জগাইয়ের সামনে এনে রাখল।

বলল, 'এটুকুতে হবে তো, বাবুজী?'

'খুব হবে। এতটাই বা কী কাজে আসবে। বরং আর একটু কম কাটলেই
পারতিস। বাসের যাত্রীদের অনেকেই তো আজকাল এসব খেতে চায় না।'

স্বরজ বলল, 'কতটা বেশি নেব?'

'দাঁড়া, আমি দিচ্ছি। তাড়াছড়ো করিসনি।'

স্বরজ আবার বলল, 'তেল কিন্তু বেশি নেই বাবুজী। কম পড়বে। মাটির তেলও
আনতে হবে। নইলে রাতে আলো জ্বলবে না।'

জগাই বলল, 'এক কাজ কর। নাথুর দোকান থেকে খানিকটা নিয়ে আয়। কাল
একবার পলাশতলি যাব! তখন কিনে আনব।'

স্বরজ অকারণে ফিক করে হাসল।

এই স্বরজকেই জগাই কাল কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ কিন্তু

কারো সে কথা মনে নেই। না জগাইয়ের, না সুরজের।

শরতের সূর্য মাঝ আকাশে উঠল। তবু ‘তুফান মেল’ এল না। অনেক আগেই তার আসার সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। কোন কোন দিন তো নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগেই এসে যায়। আজ এত দেরি হবার কারণ কি?

দেড় ঘণ্টা বাদে ধুলোর ঝড় তুলে ‘মেনকা’ এল ছলতে ছলতে। জামতলায় লোকের ভিড় জমে গেল। উৎসুক কোঁতুহলী মানুষের ভিড়। ‘তুফান মেল’-এর খবর রটে গেল মানুষের মুখে মুখে। রামগঞ্জ থেকে বেরিয়ে আধ মাইল পথও আসেনি ‘তুফান মেল’ উত্তিমধ্যে জগজিৎ ট্রান্সপোর্টের মালবোঝাই লরি এসে প্রচণ্ড বেগে তাকে ধাক্কা মারে। মুখোমুখি সংঘর্ষে ‘তুফান মেল’ গুরুতর রকম ঘায়েল হয়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। বহুলোক হতাহত হয়েছে। পাঁচ-ছয়জন ঘটনাস্থলে মারা গেছে।

খবরটা শুনে জগাই দোকানে এসে বসল। মনে মনে ভাবল, যাক ‘তুফান মেল’-এর ইহলীলা সাক্ষ হল। সে আর এ পথে কোনদিন যাতায়াত করবে না। জামতলার ছায়ায় এসে আর কোনদিন আশ্রয় নিতে হবে না তাকে। তার বদলে নতুন একটা বাস চাপু হবে এ লাইনে। নতুন একটা নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। ‘তুফান মেল’ ততদিনে চালান হয়ে যাবে পুরনো লোহা-লকড়ের দোকানে। সেখান থেকে ঢালাইয়ের কারখানায়। পরিণতির কথা ভেবে হতাশায় জগাইয়ের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল।

কোলিয়ারির পিয়ন এসে দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে। জগাই চোখ খুলতেই সে বলল, ‘বাবু, চিঠি আছে।’

‘চিঠি!’ খতমত খেয়ে জগাই উঠে দাঁড়াল।

‘হাঁ, কোম্পানির চিঠি।’ বলেই উদ্দিপরা বেয়ারা চিঠি আর পিয়ন-বই জগাইয়ের সামনে মেলে ধরল।

পিয়ন-বইয়ে সই করিয়ে নিয়ে মস্ত বড় ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে লোকটা চলে গেল। চিঠিটা হাতে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জগাই। কিসের চিঠি? কোলিয়ারি তাকে চিঠি দিল কেন? কোনদিন তো তার নামে এরকম চিঠি আসে না।

জগাই খাম ছিঁড়ে চিঠিটা অতি সন্তুর্পণে বের করল। ইংরেজিতে টাইপ করা একটা কাগজ। নবম শ্রেণী পর্যন্ত জগাইয়ের পড়া আছে। স্মরণে, পড়ে বুঝতে অসুবিধা হল না। তবে চিঠির উত্তাপে মুখটা ঝলসে এতটুকু হয়ে গেল।

সিঙ্গুলিয়া কোলিয়ারির ম্যানেজার স্বয়ং চিঠিখানায় সই করেছে। দীর্ঘ চিঠিখানায় মর্মার্থ হল :

তোমাকে এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে সিঙ্গুলিয়া কোলিয়ারি আজ হইতে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তোমাকে দয়াপরবশ হইয়া নাপিতডুবি মৌজার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের একখণ্ড জমি বিনা খাজনার ব্যবহার করিতে দিয়াছিল। সে সময়ে জমিটি কোম্পানির কোন কাজে আসিতেছিল না। বর্তমানে বিশেষ কারণে জমিটি কোম্পানির আয়ত্তে আনার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সুতরাং এই নোটিশ পাইবামাত্র পনের দিনের মধ্যে তুমি এই জমি ছাড়িয়া অন্তত উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে। অন্তথায় কোম্পানি তোমার নামে মহকুমা আদালতে মামলা রুজু করিতে বাধ্য হইবে।

চিঠিখানা পড়ে জগাই গালে হাত দিয়ে বসল। যাক্ দোকানটা তাহলে তাকে নিজের হাতে তুলে দিতে হল না। আপনা থেকেই উঠে গেল। ভূতনাথের জমিটাও কোলিয়ারির জমি। তবে ভূতনাথ বোধহয় থাকবে। আর ও থাকবে বলেই উঠে যেতে হবে জগাইকে। এ জগতে স্থান বড় সংকীর্ণ। একজনকে না তুললে আরেকজনের জায়গা হয় না। কিন্তু পনের দিন মাত্র সময়। এই ক-দিনের মধ্যে কোথায় উঠে যাবে সে। কোথায় উঠে যাওয়া সম্ভব? লক্ষ্মীও নেই। এ অবস্থায় চলে যাওয়া মানে লক্ষ্মীকেও ছেড়ে চলে যাওয়া। লক্ষ্মীকে কোন কথা না জানিয়ে চলে যাওয়া কি সম্ভব হবে?

জগাই আপন মনে বিড় বিড় করে বলল : চলে যাব। সব কিছু ছেড়ে চলে যাব।

সূরজ জগাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেছিল। এক সময়ে চোখ তুলে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চলে যাবে, বাবুজী?'

'যে দিকে দু-চোখ যায়।' জগাইয়ের চোখের কোণেও চু-কোঁটা জল জমেছে।

সন্ধ্যাবেলা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে জগাই দীনদয়ালের ডেরায় গিয়ে হাজির হল। যে কোন সংকটমুহুর্তে দীনদয়ালই তার একমাত্র পরামর্শদাতা। দীর্ঘদিন ধরে জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে বলেই বোধহয় সে জীবনের গভীরতর কথা বলতে পারে।

জগাই বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তেওয়ারীজী, পরোয়ানা এসে গেছে।'

'কিসের পরোয়ানা?' ভাঙ বাটতে বাটতে দীনদয়াল পেছন ফিরে তাকাল।

‘পনের দিনের মধ্যে নাপিতডুবি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোম্পানি আজ নোটিশ দিয়েছে। তুমিই একদিন ম্যানেজারবাবুকে বলে জমিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলে, আজ তাই তোমারই পরামর্শ নিতে এলাম।’

‘পনের দিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে বলেছে, কী বলছ বাবুজী!’

‘হাঁ, এই দেখ।’ খামস্বদ্র চিঠিখানা পকেট থেকে বের করল জগাই।

দীনদয়াল বলল, ‘খাক, বুঝেছি। এ হল ভূতনাথবাবুর যোগসাজস। তোমার তো আগেই বলেছি, বাবুজী, ভূতনাথবাবু তোমার দুশমন। নিজের পার্থক্য জন্মে সে তোমাকে তুলে দেবার মতলব এঁটেছে।’ সত্যিই তো তোমাকে বড় বিপদে ফেলল।’

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘এক কাজ করো, বাবুজী, দোকানটা বীরপুরে তুলে নিয়ে যাও।’

‘পাগল হয়েছ? বীরপুরে কোলিয়ারি নেই, কারখানা নেই। বাস আধ মিনিট খামে কি খামে না। ওখানে দোকান চলে?’ জগাই প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল।

‘তবে, কোথায় যাবে ভাবছ?’

‘কোথাও না। দোকান তুলে দিয়ে নাপিতডুবি ছেড়ে চলে যাব। যেখানে যাব সেখানেই গতির খাটিয়ে যেতে হবে। নাপিতডুবির সঙ্গে মোর কিসের পীড়িত?’

‘মোহক্বতের কথাই যদি বললে বাবুজী, তবে বলি গরীব মানুষের কারো সাথেই মোহক্বতে নেই। তবে রুজি তো চালাতে হবে। পেট তো শুনবে না। তোমার কত পুঁজি আছে?’

জগাই অনেক দুঃখে হাসল। বলল, ‘পুঁজি যা আছে তাতে দু-মাসও চলবে না।’

‘তবে?’ দীনদয়াল চিন্তিত হল মনে মনে।

জগাই ঢৌক গিলে বলল, ‘ভাবছি, নবাবগঞ্জে ফিরে যাব। সেখানে গেলে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না। বনমালী একদিন অনেক করে যেতে লিখেছিল। সেদিন ঘাইনি। এবার নিজেকে থেকে যাব।’

দীনদয়াল নিজের জন্মে ভাঙ বানিয়েছিল। সেটাকে ছোটো পাত্র ভাগ করে একটা পাত্র জগাইয়ের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, ‘বাবুজী, আজ খোড়া খেয়ে দেখ। মাথা সাক হয়ে যাবে।’

জগাই না করতে পারল না। কাঁসার ঘটিটা যুথের কাছে নিয়ে গিয়ে সবটুকু একসঙ্গে ধরে ফেলল। তারপর গুম মেরে বসে রইল। কিছুদিন বাদেই নাপিতডুবি ছেড়ে চলে যাবে সে। নাপিতডুবি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীনদয়ালের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন হবে। আর কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে। একদিন ঠিক এই ভাবেই নবাবগঞ্জে গড়ে ওঠা সমস্ত সম্পর্কের স্মৃতিকে সে নির্মম হাতে ছিঁড়ে চলে এসেছিল। বনমালী, ছেদী সিং, মনসুর, অটল—মানুষগুলো মিলিয়ে গেছে তার চোখের সামনে থেকে। এই ভাবেই মানুষ সম্পর্ক গড়ে আর ভাঙে। পড়ে থাকে স্মৃতিটুকু। ঐটাই মানুষের পুঁজি। ঐ পুঁজিকে মানুষ সহজে ছাড়তে চায় না। ছেড়ে দিলে তার আর কী থাকল।

শরীরটা কেমন গরম গরম বোধ হচ্ছে। ভেঁ। ভেঁ। করছে কান দুটো। জগাই বলল, ‘আজই একটা চিঠি লিখব বনমালীকে। কালকের ডাকে ছাড়ব। বনমালী চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।’

দীনদয়াল মাথা নেড়ে বলল, ‘জরুর হবে। তবে কেত ক কটন মিলের নোকরিটা যদি খালি না থাকে, বাবুজী, কী করবে তুমি? আবার একটা মুসিবতে পড়বে।’

জগাই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, ‘নবাবগঞ্জ নাপিতডুবি নয়। ওখানে অলিগলিতে কারখানা। শুধু কি কাপড় কল, পাটকল আছে নবাবগঞ্জে, কাগজ কল, লোহা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। ছোটখাটো অনেক কলকারখানা ছড়িয়ে আ. পথের দু-পাশে। একটা না একটা চাকরি জুটেই যাবে।’

কথাটা শেষ করেই জগাই ভাবল : চিমনির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নবাবগঞ্জের আকাশ কালো। মানুষের ভিড়ে ভিড়ে নবাবগঞ্জের পথঘাট নরক-গুলজার। গগন-বিদারী হাহাকার আর আর্তনাদে নবাবগঞ্জের শাস্তি ছিন্নভিন্ন। সেখানে কিসের লোভে আবার ফিরে যেতে চাইছে জগাই? রুজির লোভে। কথা কয়টা জগাই মনে মনে আবৃত্তি করল। কেমন নেশাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। নেশাচ্ছন্ন আর নিরালস্য।

দীনদয়ালের খাটিয়ার ওপর এক সময়ে নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল জগাই। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি শব্দের ঝড় তুলে রাস্তাগঞ্জে চলে গেল। জগাই টেরও পেল না।

দীনদয়াল যখন জগাইকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল তখনও তার নেশা ভাঙেনি। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে সে প্রলাপ বকছে। আর বিন বিন করে ঘামছে।

নেশা যখন ভাঙল তখন বোধহয় মাঝ রাত। স্বরজ বোধহয় না খেয়ে-দেয়েই দোকানের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়েছে। জগাইয়েরও খিদে নেই। হুড়হুড় করে এক বালতি জল ঢেলে মাথাটা ধুয়ে ফেলল জগাই। তারপর খানিকটা ধোলা হাওয়ায় বসে থেকে ঘরের মধ্যে উঠে এল। লঠনটা টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। দূরে কয়েকটা কুকুর পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিকে প্রাণপণে চিৎকার করছে। জগাইয়ের মন তখন ডানা মেলেছে নবাবগঞ্জের আকাশে।

আধ-ময়লা দোমড়ানো একটা পোস্টকার্ডে কাঁপা কাঁপা হাতে জগাই লিখল :

ভাই বনমালী,

ভাগ্যের অভিশাপে মোর দোকান তুলিয়া দিতে হইতেছে। পনের দিনের মেয়াদে মোদের নাপিতডুবি ছাড়িয়া চলিয়া যাউতে হইবে। আমি বর্তমানে নিঃসহায়, নিঃসম্বল। অতএব, নবাবগঞ্জে ফিরিয়া যাউব বলিয়া গনস্ত করিয়াছি। একদা তুমি নবাবগঞ্জে যাউতে লিখিয়াছিলে, যাউ নাউ। তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করিও না। এক্ষণে ভাগ্য মোকে তথায় যাউতে বাধ্য করিতেছে।

আশা করি কেতকী কটন মিলের চাকরি খালি আছে। তুমি মোর কথা ম্যানেজার বাবুকে বলিও। যদি চাকরি খালি না থাকে, অগত্যা ব্যবস্থা করিও। আমি অসহায়। তুমি মোর দুর্দিনের বন্ধ। তুমি বিমুখ করিলে পথে দাঁড়াইব। রওনা হইবার আগে সম্বাদ দিব। তোমার উত্তরের আশায় রহিলাম। পত্রপাঠ জবাব দিও। কারখানার বন্ধুদের মোর কথা বলিও। ইতি—জগাইদা।

চিঠি লেখা শেষ হলে জগাই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। কপালের রগ দুটো এখনও নেশার ঘোরে দপ দপ করছে।

● ● বারো ● ●

বনমালীকে চিঠি লিখে অবধি জগাই অস্থির হয়ে ছটফট করছে। কবে জবাব আসবে? কী জবাব আসবে? জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি নেই। প্রথম চারটে দিন দ্রুত বেগে চোখের সামনে দিগ্বে বেরিয়ে গেল। পঞ্চম দিনও পার হল। ষষ্ঠ দিনও যাঁই-যাঁই করে চলে গেল। সপ্তম দিনে জগাই আর থাকতে পারল না। বিকেল বেলা হস্তদস্ত হয়ে নাপিতডুবির ডাকঘরে গিয়ে হাজির হল। ডাকঘরের ছোট আঙিনাটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে অবশ্য কোলিয়ারির কেয়ানী আর পিয়নদের সংখ্যাই বেশি। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে পোস্টমাস্টার শিবু গাঙ্গুলী নাম ডেকে ডেকে চিঠি বিলি করছে। মাঝে

মাঝে দু-তিনবার করে নাম ডাকছে। যারা উপস্থিত নেই বা যাদের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত নেই তাদের চিঠি রেখে দিচ্ছে। পরদিন সকালে পিঙ্গন বিলি করবে।

সবাই যে-যার চিঠি নিয়ে চলে গেল। জগাইয়ের নামে একবারও ডাক পড়ল না। সে স্থির হয়ে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সব লোকজন চলে গেলে জগাই দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘মোর নামে চিঠি আছে, মাস্টারবাবু?’ ‘কী নাম?’ শিবু গাঙ্গুলী টেবিলে বসে পা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল।

‘জগন্নাথ দাস।’ অত্যন্ত করুণ আর অসহায় শোনাল জগাইয়ের কণ্ঠস্বর।

পোস্ট মাস্টার অবশিষ্ট চিঠির ভাড়া হাতড়ে হাতড়ে বলল, ‘না, ও নামে কোন চিঠি নেই।’

ভাঙা দোমড়ানো মন নিয়ে জগাই বাড়ির পথ ধরল। মনে নানা দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বনমালী কি তাহলে চিঠিটা পায়নি? নাকি চিঠিটা পেয়েও জবাব দিল না। না, তা হয় না। বনমালী সেরকম মানুষই নয়। জবাব সে একটা দেবেই। তবে চিঠিটা যদি একান্তই তার হাতে না পৌঁছে থাকে। এমন তো হওয়া সম্ভব। কত চিঠিই তো ডাকে মারা যায়, শেষ পর্যন্ত কোন হৃদিশই মেলে না। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো নবাবগঞ্জে পৌঁছে বিপদে পড়বে জগাই। আর যদি বনমালী চাকরি ছেড়ে দিয়ে থাকে? আর অটল, মনসুর, গদা কেউই যদি না থাকে নবাবগঞ্জে? তাহলে? জগাই ভাবতে ভাবতে দিশা হারিয়ে ফেলল। অনিশ্চয়তায়, আশঙ্কায় তার হাঁটু দুটো কাঁপছে।

বিরিচি এক অশথ গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে বিকেলের রোদ মাটিতে নেমে লুটোপুটি খাচ্ছে। শরৎকালের লাস্তময়ী আকাশের মত রোদটাও লোভনীয়। দু-পাশের সারিবদ্ধ গাছের মাঝখান দিয়ে অসমান রাস্তাটা অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। জগাইয়ের দোকান, ভূতনাথের দোকান ছাড়িয়ে অনেক দূর। বীরপুর, পলাশতলি, পীরবাজার, মুচকুন্দপুর ছাড়িয়েও অনেকদূর। কোলিয়ারি, ঘর বাড়ি, কলকারখানা, দোকানপাট, ডি-ভি-সি বাঁধ ছাড়িয়েও অনেকদূর। একটা গাছের নিচে বছর তিনেকের একটা ঝাংটো মেয়ে কুকুর ছানার সঙ্গে খেলা করছে। ঝানিকটা তফাতে একটা গোরু তার সস্ত-বিয়োনো বাছুরের গা-টা জিত দিয়ে চেটে দিচ্ছে। কোলিয়ারির সামনের মাঠটায় সামিয়ানা ষাটানো হচ্ছে। দুর্গাপূজা হবে, ছেলে মেয়েদের গানের জলসা হবে, কোলিয়ারির বাবুরা ‘টিপু সুলতান’ অভিনয় করবে। হঠাৎ জায়গাটাকে কেন যেন ভালো লাগল জগাইয়ের।

এতদিন নাপিতড়বিতে আছে অথচ কই এভাবে তো সে মুগ্ধ হয়নি তার চারপাশে তাকিয়ে। এখানেই যদি সে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত!

হঠাৎ জগাইয়ের মনে হল : নবাবগঞ্জ নাপিতড়বি থেকে কত দূর?

সত্যিই দূরের কথা তো সে কোনদিন ভেবে দেখেনি। একশো মাইল? দুশো মাইল? নাকি তারও বেশি, তিনশো মাইল। না, না, অতদূর নয়। পুরো দুশো মাইলও নয় বোধ হয়। একটা চিঠি এতটা পথ পার হতে কতটা সময় নেয়? দু-দিন, বড় জোর তিন দিন। তাহলে তো বনমালীর জবাব এতদিনে আসা উচিত ছিল। জগাই আবার চিন্তিত হল। বৃকের ভেতরটা টিপ টিপ করতে লাগল।

দোকানে ফিরে দেখল উরুনে কয়লা দিয়ে সুরজ বেকির ওপর শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আর একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছে মদন বাউড়ি। একা বসে আছে। বসে বসে ঝিমোচ্ছে থেকে থেকে। চুলে তেল পড়েনি অনেক দিন। মুগাটাও শুকনো। কেমন নিশ্চিন্ত আর জরাগ্রস্ত।

জগাইকে দেখে মদন বোকা বোকা মুখ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর জগাইকে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ না দিয়ে বলল, ‘জগাইবাবু, আমি তুমার সাথে যাব।’

‘কোথা যাবে মোর সাথে?’

‘কেনে? তুমি নবাবগঞ্জ না কুখায় বেতেছ। আমিও সাথে যাব। বউটো যাবেক, ছেল্যা-মেয়্যা দুটাও যাবেক।’

‘সেখা গিয়ে কী করবে? তার চেয়ে এদিকে কত খাদ আছে। চেষ্টা-চরিস্তির করে দেখ। একটা না একটা কাম-কাজ জুটে যাবেই। নবাবগঞ্জে তো কোন কয়লা খাদ নেই।’

‘সব জাগা খুর্যাছি। কুখাও কাম-কাজ নাই। টাটাঠ মজুরকে কেউ কাম দিবে না। নবাবগঞ্জে কয়লা-খাদ নাই তো কি হয়্যাছে, কারখানা তো আছে।’

জগাই মনে মনে বলল, কলকারখানা আছে বটে। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে চাকরি না পেলে মদন বাউড়ি কোথায় দাঁড়াবে মাগ ছেলে নিয়ে? একে তো তার নিজের ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত তার ওপর মদনকে সঙ্গে নেওয়া কি উচিত হবে তার?

মদন বলল, ‘কাম-কাজ নাই তো প্যাটে ভাতও নাই, জগাইবাবু। একবেলা খায়্যা আছি কতদিন।’ বলেই মদন তার হাতের শীর্ণ মাংসপেশী তুলে ধরল

জগাইয়ের চোখের সামনে । সতিাই চাকরি যাবার পর অনেক রোগা হয়ে গেছে মদন । শরীরটা তার আরও পাকিয়ে গেছে । শিরাসুলো উঁচু হয়ে উঠেছে গায়ের চামড়া ভেদ করে ।

জগাই চূপ করে ভাবতে লাগল কি বলে সাহুনা দেয়া যায় মদন বাউড়িকে ।

নিরুত্তর জগাইয়ের মুখের দিকে মদন খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল । তারপর তার গায়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘হেই, জগাইবাবু, মোকে লিয়ে চলো তুমার সাথে । মাঠেরি বলছি, হেথায় থাকলে না খায়্যা মার্যা যাব সবস্বস্ত । মোর প্যাটে ভাত নাই, মোর বউটোর প্যাটে ভাত নাই, মোর ছেল্যামেয়ার প্যাটে ভাত নাই । হেই জগাইবাবু !’ বুড়ো মিনসে মদন বাউড়ি হাউমাউ করে কঁদে উঠল ।

মদনকে কান্দতে দেখে জগাই বিচলিত বোধ করল । তার চোখের জল দেখে আর স্থির থাকতে পারল না । আপন মনে বলে উঠল, হাঁ, মদনও চলুক তার সঙ্গে । নবাবগঞ্জ যদি হাজার হাজার মানুষকে তার জঠরে স্থান দিয়ে থাকে, মদনের স্থানও সেখানে হবে । হতেই হবে ।

কয়েকদিন পরের কথা । জগাই দুপুরের দিকে বীরপুরে গিয়েছিল রাধানাথের কাছে । দিন দু-তিন পরেই তাকে নাপিতডুবি ছেড়ে চলে যেতে হবে । যাবার আগে একবার রাধানাথের সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার । লক্ষ্মী না থাক, রাধানাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক তো ছিল হবার নয় । তার জন্তে জগাইয়ের মনে প্রকার আসন পাতা আছে ।

জগাইকে দেখে রাধানাথ কঁদে ভাসল । বলল, দিন কয়েক আগে সে ভৈরবগঞ্জ গিয়েছিল । মেয়েকে বলেছিল, জগাইয়ের কাছে না যাক, সে অন্তত তার বাপের বাড়িতে ফিরে আসুক । লক্ষ্মী রাজী হয়নি । বড় অভিমানী তার মেয়ে । তবে লক্ষ্মীকে একদিন ফিরে আসতেই হবে একথা রাধানাথ মনে মনে বিশ্বাস করে । জগাই নবাবগঞ্জে থাক আর যেখানেই থাক, লক্ষ্মীকে তার কাছে যেতেই হবে । না গিয়ে উপায় নেই । ‘ভেঙে পোড়ো না, বাবা, লক্ষ্মী একদিন তোমার ফিরে যাবেই ।’ কাপড়ের খুঁট দিয়ে রাধানাথ চোখের জল মুছল ।

বিকেলবেলা জগাই ভাঙা মন নিয়ে বীরপুর থেকে ফিরল । তার মনে মনে একটা অস্পষ্ট আশা ছিল : লক্ষ্মীর সঙ্গে হয়তো রাধানাথের বাড়িতে দেখা হয়ে যেতে

পারে। সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় জগাই একেবারে ভেঙে পড়েছে। যাওয়ার আগে তাহলে লক্ষীর সঙ্গে আর দেখা হত না। ভৈরবগঞ্জ সে যাবে না। ব্যথায় ব্যথায় দীর্ঘ হয়ে যাক হুংপিও, তবু সে ভৈরবগঞ্জে যেতে পারবে না। দোকানে আসতেই স্বরজ একটা চিঠি দিল জগাইয়ের হাতে। বনমালীর চিঠি। ভয়ে ভয়ে চিঠিটা লগ্ননের আলোর সামনে মেলে ধরল জগাই। বনমালী লিখেছে :

শ্রীশ্রীকালিমাতা শশায়

ভাই জগাইদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি নবাবগঞ্জে আসিতে চাও জানিও। চিন্তিত হইলাম। বর্তমানে এখানে কোনো কারখানা নতুন লোক নিবে না। চারিদিকে রাশনালাইজেশনের রব উঠিয়াছে। অল্প লোকে বেশি কাষ চায়। সর্বত্র ছাটাছুটি চলিতেছে। ইহার মাঝখানে তুমি আসিলে বিপদে পড়িবে। ছেদী সিং-এর চাকরি গিয়াছে। অটল বর্তমানে হুগলীর এক পার্টকলে কাজ করে। মনসুর পাকিস্তান চলিয়া গিয়াছে। মোর চাকরি যে কোনো মুহূর্তে যাইতে পারে। ইউনিয়ানের সাথে কোম্পানির সংঘর্ষ চলিতেছে। এতএব তুমি এখন আসিও না। কাযকর্মের ব্যবস্থা করিতে পারিলে যানাইব। রাগ করিও না। বউঠাকুরানীকে শতকোটি প্রণাম দিয়ো। উত্তি—বনমালী

চিঠিটা মুড়ে রেখে জগাই চোখ মুছল। একদিন নবাবগঞ্জে নিয়ে যাবার জন্যে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল বনমালী। আজ সেই বনমালী একথা লিখল কেন? তবে কি নবাবগঞ্জ পালটে গেছে? যে নবাবগঞ্জে হাজার হাজার মানুষের অন্নের সংস্থান হয় সেই নবাবগঞ্জ কি আজ তার দোর থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে? তা কি করে সম্ভব? তবে কি পৃথিবী স্থির হয়ে নেই? কেবলই পাণ্টাচ্ছে। কেবলই পাণ্টে যাচ্ছে।

জগাইয়ের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। বনমালীর চিঠিখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে জগাই উল্লুর মধ্য ফেলে দিল। তারপর দোকানের সামনে পায়চারি করতে লাগল উদ্ভ্রান্তের মত। বনমালী যাই লিখুক, জগাই নবাবগঞ্জে যাবেই। নবাবগঞ্জের জঁঠরে যদি হাজার হাজার মানুষের ঠাই হয়, জগাইও সেখানে তার স্থান করতে নিতে পারবে। কেউ তার পথরোধ করতে পারবে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। কোলিয়ারির মাঠ থেকে কাঁসর আর ঢাকের আওয়াজ ভেসে

আসছে। অষ্টমী পূজার আরতি হচ্ছে বোধ হয়। ভূতনাথের দোকানে জোরালো হাডাক বাতি জলছে। হঠাৎ গ্রামোফোনে হিন্দী রেকর্ডের গান বেজে উঠল :

লাল দোপট্টা মনমলকা
হো জী, হো জী

ভূতনাথ গানের তালে তালে নাচছে আর হাত দিয়ে বিচিত্র শব্দ করছে। জগাঠি আচ্ছন্নের মত সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

মল্লিক বাস সার্ভিসের ‘ফুল্লরা’ এসে থামল একটু বাদে। জামতলায় কয়েকজন যাত্রী নামল। জগাঠি সেইদিকে ক্রক্ষেপণও করল না। যাত্রী উঠুক-নামুক, তার জন্তো তার কোন ব্যস্ততা নেই। কোন ব্যাকুলতা নেই। কারণ কয়েক দিন ধরেই খন্দেরের কোন আনাগোনা নেই তার দোকানে। জগাঠিও ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে আনছে। দোকানের জন্তো তার আর কোন মমতা নেই। দিন কয়েক বাদেই তো তাকে চলে যেতে হবে।

লক্ষ্মী আর রাইচরণ যখন বাস থেকে নেমে জগাঠিয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল জগাঠি তখন নিজের চিন্তায় আত্মহারা হয়ে আছে। হঠাৎ মুখ তুলতেই সে বিস্ময়ে আর আনন্দে কয়েক মুহূর্ত নিম্পন্দ হয়ে বসে রইল। মুখে কোন কথার স্ফুরণ ঘটল না। লক্ষ্মীও রাইচরণের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জা ও সংকোচ, দ্বিধা ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য অনির্বচনীয় প্রসন্নতা।

রাইচরণই প্রথম কথা বলল, ‘এই নাও বাবাজী, তোমার জিনিস তোমায় দিয়ে গেলাম। এবার মান-অভিমান ভুলে গিয়ে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করো।’

গলা কাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠল জগাঠি। তারপর উভয়কেই ভেতরে আসার জন্তো আহ্বান জানাল। জগাঠিয়ের মনের মধ্যে আনন্দের বান ডাকছে। সে ভাবতেই পারেনি লক্ষ্মী এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চলে আসবে। আর ঠিক তার নাপিতডুবি ছেড়ে চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে।

রাইচরণ বেশিক্ষণ বসল না। অনেকটা পথ যেতে হবে বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। জগাঠি আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবার জন্তো অনেক জেদাজেদি করল। রাইচরণ শুনলো না। লক্ষ্মীর মাসী একা আছে বাড়িতে।

রাইচরণকে বাসে তুলে দিয়ে জগাঠি লক্ষ্মীর কাছে ফিরে এল। বলল, ‘এলে যে বড়?’

‘না এসে পারলাম না। মেয়েমানুষের মন। তোমার কথা ভেবে ভেবে মনটা কেবলই থা থা করে। তুমি পুরুষমানুষ। ভুলে থাকতে পারো। মোর চোখে রাতে ঘুম আসে না। মনটা কেবলই পোড়ে, কেবলই পোড়ে।’

অনেক দিন পরে লক্ষ্মীর মুখে এরকম কথা শুনে জগাইয়ের মনের সঞ্চিত আবেগ উথলে উঠল। জগাই তবু লক্ষ্মীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, ‘আবার চলে যাবে না তো?’

লক্ষ্মায় লাল হয়ে উঠল লক্ষ্মীর মুখখানা। কপট অভিমান প্রকাশ করে বলল, ‘তুমি না ভালবাসলে আবার চলে যাব।’

জগাই লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ‘ভালবাসব, খুউব ভালবাসব। পারি তো তোমার মাথায় তুলে রাখব। তবে এদিকে বড় গোল বেধেছে। মোদের কপালে কী আছে কে জানে। এখানকার বাস তো উঠল। সব কিছু তুলে দিয়ে চলে যেতে হবে।’

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল লক্ষ্মী। জগাই একে একে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত কাহিনীই লক্ষ্মীর কাছে ব্যক্ত করল। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক সে। লক্ষ্মীর উপস্থিতি হয়তো তাকে আবার বৃহত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার প্রেরণা যোগাবে।

সমস্ত কথা শুনে লক্ষ্মীর বিস্ফারিত মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। সে নীচু গলায় বলল, ‘মোদের কী করে চলবে?’

জগাই গম্ভীর হয়ে বলল, ‘হয়তো চলবে না। হয়তো আরও বিপদে পড়তে হবে। মোদের জীবনটাই এমনি ভাঙা আর দোমড়ানো।’

কোলিয়ারির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সেই শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে এসে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। রুদ্ধশ্বাস জগাই লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল। এবার সে মনের আনন্দে প্রাণভরে নিশ্বাস নেবে। ফুসফুস দুটোয় হাওয়া টেনে নেবে, আবার ছেড়ে দেবে। আবার টেনে নেবে, আবার ছাড়বে। আজ সে সুখী, পরিপূর্ণ সুখী। আজ তার জয় হয়েছে। আজ সে জীবনকে জেনেছে, পরিপূর্ণভাবে জেনেছে, গভীরভাবে জেনেছে, নিশ্চিদ্রভাবে জেনেছে। আজ সে নিঃসংকোচে চাঁপালতার সামনে গিয়ে বলতে পারে : তোমার কি উপকরণ আছে নিয়ে এস, আমি পৌরুষ দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলব, ফুটিয়ে তুলব। হি, হি, চাঁপালতার কথা কেন ভাবছে সে। জগাই মনে মনে ধিক্কার দিল

নিজেকে। তার অপরাধী মনকে। আজ তার পাশে যে মানুষটা শুয়ে আছে সে চাঁপালতা নয়, লক্ষ্মী। থাকে সে জীবনের অধিক শরিকানা দান করেছে, তার পাশে দাঁড়াবার মত ঐশ্বর্য চাঁপালতার নেই। চাঁপালতার আত্মসমর্পণের মধ্যে নিস্ত্রাণ দেহটুকু ছাড়া আর কী আছে? লক্ষ্মী সেখানে এক মহৎ আত্মার অধিকারিণী।

জগাইয়ের হঠাৎ মনে হল : লক্ষ্মীর সঙ্গে আজই বিয়ে হয়েছে তার। আজ থেকে তার জীবনের শুরু। যত বন্ধুর হোক সে জীবন, জগাই শক্ত হাতে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে। তার জীবন আর জীবিকা অনিশ্চয়তার আগাছায় ভরা, তবু আজকের সাফল্য অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দেবার সময়ে অকুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। জগাই আনন্দের আতিশয্যে হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

জানলার বাইরে নিস্তরক প্রান্তর চাঁদের স্নান আলোয় অল্প অল্প চোখে পড়ে। রূপোলী রেখার মত নদীটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে ধূসর কুয়াশায়। কোথায় একটা অনাথ কুকুর ডেকে ডেকে চূপ করে গেল। চূপ করে ভোঁতা শব্দ হল গাছের ডালে। বাসার মধ্যে পাখির ছানা কিসের অস্বস্তিতে বোধ হয় নড়ে চড়ে বসল।

না, আজ সারা রাত জেগে কাটাবে জগাই। লক্ষ্মীকেও ঘুমুতে দেবে না। আজ উৎসবের রাত। আজ ঘুমুতে নেই। আজ কথা—কেবল কথা বলতে হয়। যে কথা বলার জন্তে দুটি মানুষ বছরের পর বছর ধরে নিজেদের তৈরি করেছে। যে কথা শোনার জন্তে দুটি মানুষ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর প্রতীক্ষায় দিনযাপন করেছে।

চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল জগাই। অস্থির হয়ে ছোট ঘরটায় কয়েক বার পায়চারি করল। লণ্ঠনের পলতেটা উল্কে দিয়ে জগাই নিজের দিকে এক বলক তাকিয়ে নিল। সেই আদিম মানুষ। সেই গুহাবাসী মানুষ। যুগের পর যুগ ধরে অনেক ঘষা-মাজার পরেও রাতের অন্ধকারে তাকে চেনা যায়। চেনা যায় সেই উন্মত্ত মানুষটাকে যার শিরায় আজও সেই আদিম রক্ত প্রবাহিত।

লক্ষ্মী আনন্দের অবসাদে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। জগাই তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিল। বলল, ‘ওঠো, ঘুমিয়ে পড়লে যে বড়।’

লক্ষ্মী খড়মড় করে উঠে বসল। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, ‘মোর বড় ঘুম পাচ্ছে।’

‘আজ ঘুমবো না। সারা রাত কথা বলব।’

‘ইস, অনেক তো কথা বলেছ।’

‘বলেছি। আরো বলব।’

‘বেশ বলো। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনব।’ লক্ষ্মী পাশ ফিরে শুলো।

কার্তিকের রাত্রি। শেষ রাত্রে সামান্য শীত পড়ে। লক্ষ্মী আঁচলটা বুকের ওপর টেনে নিল। তার আজ খুব ভালো লাগছে। জগাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, ‘মোর অন্তায় হয়েছে। মাপ করো।’

কি ভেবে লক্ষ্মী এক সময়ে চোঁকি থেকে নেমে জগাইয়ের পায়ে হাত দিল। বলল, ‘দোষ নিও না। মাপ করো, মোর অন্তায় হয়েছে। আর কোনদিন ঘর ছেড়ে যাব না।’

বিপুল ঔদার্যে জগাই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর লক্ষ্মীকে ভুলে নিয়ে চোঁকির ওপর শুইয়ে দিল। সত্যি, জগাইয়ের তুলনায় কত ছোট আর কত অমুরক্ত একটা মানুষ। তবু সেই আদিম মানবীই।

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল লক্ষ্মী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিল শ্লথ ভাবে। জগাই তাকে বিরক্ত করছে। করুক। আজ ভূতে পেয়েছে মানুষটাকে। সারা রাত ধরে বিরক্ত করে জগাই যদি আনন্দ পায়, পাক। লক্ষ্মী তাতেই খুশি।

ঢং ঢং, ঢং ঢং। চারটে বাজল ঘড়িতে। জগাই কোন দিন এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকে না। আজ জেগে থাকবে বলেই জেগে আছে।

কিস্তি কাল? পরশু? তার পরদিন? তারও পরদিন?

কোথায় যাবে তারা? নবাবগঞ্জে? নবাবগঞ্জ যদি তাদের গ্রহণ না করে? সেখান থেকে আবার কোথায় পাড়ি দেবে? সহায় সম্বলহীন মানুষ তারা। পথে নেমেই পথের সন্ধান করতে হবে তাদের। কাজ? কাজ দেবে তোমরা কেউ? গতর ফেরি করে বেড়াবে সে। নবাবগঞ্জ হোক আর যে কোন গঞ্জই হোক, গতর ফেরি করে বেড়ানোই তাদের বিধিলিপি। তবু তো চাঁপালতার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারবে : সে পুরুষ, পুরোপুরি পুরুষ। যে পুরুষের সঙ্গে রাত্রিযাপন করে চাঁপালতা সেই পুরুষ।

জীবন আর জীবিকা। বড় বিচিত্র আর জটিল এই ব্যূহের মধ্যে পড়েও তো কত মানুষ এই পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। তাহলে জগাই পারবে না কেন?

ক্রান্ত হয়ে জগাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল দিগন্তে তখন আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। এক টুকরো শীর্ণ চাঁদ বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আকাশের এক কোণে।

বিজয়া দশমীর পর দিন জগাই আর মদন বাউড়ি সপরিবারে রামগঞ্জ স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়ি ধরল। দীনদয়াল স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল। চোখ মুছতে মুছতে সে বার বার বলল, 'শহরে বহুৎ রূপেয়া কামিয়ে, বুড়া বয়সে এখানে ফিরে এসো, বাবুজী। এখানকার মাঠে ফসল আছে, আসমানে চিড়িয়া আছে। এখানকার মাটির নিচে কয়লা আছে, চিমনির মাথায় ধোঁয়া আছে। নবাবগঞ্জে এসব চিজ নেই।'

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগাইয়ের মন থেকে নাপিতডুবির সমস্ত ছবি মুছে গেল। নবাবগঞ্জের ছবিটাও ধোঁয়াটে অস্পষ্ট। এই মুহূর্তে গাড়ির চাকার নির্মম ধাতব শব্দটাই একমাত্র বাস্তব জগাইয়ের কাছে।

কামরায় যাত্রীদের ভয়ানক ভিড়। এই ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্মীর বিষণ্ণ সুন্দর মুখখানা জগাইয়ের কাছে অনন্ত প্রেরণার উৎস। দিন আর রাত্রির অফুরন্ত প্রেরণা।

সমাপ্ত

তিন পুরুষ ॥ অমলেন্দু চক্রবর্তী

শেষ রাতের দিকে ফিরে এলো ওরা। দোরগোড়ায় এসে বুঝি লোহা, আগুন আর নিমপাতা চাইলো। আর শেষবারের মতই যেন সারা বাড়িটা আবার একবার কঁপে উঠলো আর্ত চিৎকারে। সকলকে ছাপিয়ে কাঠি-চেরা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো ছোট মেয়েটা—‘মা মাগো……’

কাল স্বপ্নরবাড়ি থেকে এসে শেষ দেখাও দেখতে পারেনি। বেচারী সেই থেকে কাঁদছে। সারা রাত কাঁদেছে। ওরা কাঁদছে। কাঁদবে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় আর কাঁদবে না। থেমে যাবে। হয়তো ভুলেও যাবে একদিন। কী-ই বা হারালো ওরা। কতটুকুই বা হারালো। শিশু যদি মাকে হারায়, সব হারায়। ওর সব—ওর সমস্ত অস্তিত্ব। ওরা শিশু নয়। যা ওরা হারালো, তার চেয়ে পেয়েছে অনেক বেশি। ওরা বড় হয়েছে। স্বামী পেয়েছে। স্ত্রী পেয়েছে। সন্তান পেয়েছে। ওরা সংসার পেয়েছে। নতুন সংসার। আর— আর সব হারালেন শশধর। তার সব কিছু। বাড়ির একেবারে কোণের দিকে ছোট একটা ঘরে বড় ছেলে হরিহরের বয়সী ভাঙা পালঙ্কটায় অবশ হয়ে পড়ে আছেন। একা, চুপচাপ। চারদিক থেকে কারা আর হাহাকারের একটা তীব্র আক্রমণ ছুটে আসতে চাইছে তার দিকে। শক্ত দেয়ালগুলোও রোধ করতে পারছে না। শক্তিহীন কাঁপা কাঁপা হাতদুটোয় কান দুটো শক্ত করে চেপে ধরেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ওরা কাঁদছে। যেন তাকেই শোনাতে, তারই বৃদ্ধ শরীরে হাজার হাজার ছুঁচ ফোটাতে ওরা কাঁদছে।

কিন্তু কাঁদতে পারছেন না শশধর নিজে। মাথার শিরা-উপশিরা দপদপ করে কাঁপছে, বুকের হাড় পাঁজর, মরচে-পড়া শরীর সবই যেন ছমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যেতে চাইছে অসহ্য যন্ত্রণায়। মৃত্যু, একজনের মৃত্যু। আরও একটি জীবনের শেষ। না, এই প্রথম নয়, মৃত্যু আরও দেখেছেন শশধর। অনেক আগে, প্রায় ষাট বছরেরও আগে একদিন বুড়ী মাকে মরতে দেখেছিলেন। মুমূর্ষু মায়ের পাশে সেই কয়েকটি মুহূর্ত। মজে-ঝাওয়া বুকটার দ্রুত ওঠা-নামা, গলার শিরায় কাঁপুনি, তারপর হঠাৎ সব থেমে যাওয়া। সেই শব শবশবনে বয়ে নিয়ে যখন মুখাণ্ডি করলেন, চিতার আগুনে যখন সাদা চুলের গোছা পুড়ে

ছাই হয়ে গেল, চারদিকের দাবানলের মধ্যে কঁকড়ানো শরীরটা হারিয়ে গেল, মিশে গেল, তখনও নয়, কিন্তু বুড়ী মায়ের শরীরটার ওপর যখন শ্মশানের মাহুঘরা শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করলো, মাথার ঘিলুটা ঝেঁটে চৌচির হল, জমাট-বাধা রক্ত আর সাদা ঘিয়ের মত কি সব বেরিয়ে পড়ে আগুনকে কাঁপিয়ে তুললো তখনই আর সহিতে পারেননি। ছুটে চলে এসেছেন। চিৎকার করে কঁদে উঠেছেন। সেই কান্না বছদিন কঁদেছেন, ঝাড়া মাখা কালো চুলে ভরে না ওঠা পর্যন্ত সে কান্না থামেনি। কিন্তু আশ্চর্য, একদিন সত্যি থেমে গেছে। যেমন ছিল তেমনি হয়ে উঠেছে সবকিছু। মার কথা হয়তো মনে হয়েছে অনেকদিন কিন্তু কান্না আসেনি আর। সেদিন সহিতে পেরেছিলেন। আর আজ? সেদিন বয়স ছিল, আজ আর কোন কিছুই নেই। না বয়স, না সাহস।

কিন্তু আজও তো মৃত্যু আছে। সেই বুড়ীর মৃত্যুর মতই আরও একটা বুড়ীর মৃত্যু দেখলেন শশধর। কিন্তু এ তো শুধু মৃত্যু নয়! আরও কিছু, আরও বেশি কিছু। একথা তিনি কাকে বলবেন, কাকে বোঝাবেন? এমন করে বুড়ীকে কাঁকি দিয়ে চলে গেল বুড়ী। সর্বনাশী বুড়ী। একবার কিরেও চাইলো না, একটু মায়াও হল না। এত স্বার্থপর। চিতার কাঠের মতই চিরচির করে কেটে যাচ্ছে বৃকের হাড়-পাঁজর। তবু এরই মধ্যে যেন সেই প্রথম ঘোবনের অভিমান আজ আবার নতুন ভাবে ঘিরে ধরলো তাকে। বুড়ীর অভিমান বুড়ী বোঝে। সে কি আর আছে। পালিয়েছে। কিন্তু কালও যে ছিল আজ সে নেই। এ পৃথিবীর কোথাও সে নেই। সে কথা ভাবতেই যেন বৃকের হাড়-পাঁজরগুলো আরেকবার গায়ে গায়ে ধাক্কা খেলো, ককিয়ে উঠলো। কিন্তু সবই তো ঠিক আছে। এই ঘর, এই দেয়াল, এই ভাঙা পালক, ছেলে, ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী এই সংসার। কই, কোথাও তো পান থেকে চুন খসেনি। এমন কি ওই দেয়াল, দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছেলে, ছেলে-বৌ, মেয়ে, মেয়ে জামাই নাতি-নাতনী নিয়ে তোলা ওই ফটোটা, ওই ক্যালেন্ডার, ক্যালেন্ডারের পাতায় বিধে রাখা ছোট-বড় তিনটে ছুঁচ, ছুঁচের ফুটোয় স্নাতো। ওই ছুঁচ কে রেখেছে ওখানে? কার ছুঁচ? অনেক কষ্টে উবু হয়ে একবার দেখতে চেষ্টা করলেন শশধর। ওই তো মেঝের ওপর সেই কাঁথা। সাতদিন আগে ইঁট আর জলের ঘটি দিয়ে যেমন টান করে পেতেছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। কেউ ভাঙেনি, কেউ আসেনি এদিকে। ভেবেছিল ভালো হয়ে বুড়ী আরার

এসে বসবে, রঙীন স্মৃত্যের নকশা কাটবে, কাঁথা বুনেবে। ন-বোঁমা এই তো আতুড় ঘরে প্রথম রাত কাটিয়ে এলো, ওর জন্মে কাঁথা চাই, সেজো বোঁমার মেয়েটার বয়স হবে চার মাস, ওর জন্মেও দরকার, মেজো বোঁমার ছেলেটা এখনও বুকের দুধ ছাড়েনি, দিনে তিনবার পাঁচবার কাঁথা বদলাতে হয়। গোটা সংসারটাই যেন ফরমাশ দিয়ে বসে আছে—‘কাঁথা চাই, কাঁথা দাও।’ আর হাসি মুখে ছানি পড়া ছোটো চোখ অন্ধের মত বেগার খেটে গেছে দিনের পর দিন। এখন কে আর খাটবে অমন করে? কে? ওই তো পাট করে পাতা ছেঁড়া শাড়ী পড়ে আছে মেঝেতে। পাশে কালো রঙের নারকেল মালায় সজ্জিত রয়েছে শাড়ীর পাড় তোলা আঙুলে জড়ানো রঙীন স্মৃত্যের গোলা। রঙীন চক খড়ি, নিকেলের ক্রেমে বাঁধানো নড়বড়ে চশমা, টুকিটাকি আরও কত কি। সর্বনাশীর দয়াও নেই এতটুকু। আর কারো জন্যে না হোক, ছোট ছোট নাতি-নাতনীগুলোর কথাও ভাবলো না একবার। চাঁদের বুড়ীর গল্প শুনিয়ে নিজেই সকলের আগে চাঁদের বুড়ীর কাছে চলে গেল। এ বুড়ীর আঁকলও নেই। বয়সকালের মান-অভিমান নয়, এ অভিমান যন্ত্রণা, তীব্র জ্বালা। আর যেন সহিতে পারছেন না শশধর। সারা শরীরটা এমনিতেই একটু একটু কাঁপে। সে কাঁপুনিটা যেন আরও বেড়েছে মনে হল। কোমরের বাতের বেদনাটা আবার যেন চাড়া দিয়ে উঠছে। প্রায়াক্ষ চোখজোড়া ঝাপসা থেকে আরও ঝাপসা দেখছে চারদিক। অন্ধকার, যেন জমাট-বাঁধা গাঢ় অন্ধকার কালো হয়ে নামছে তাকে ঘিরে। দাপাদাপি করতে ইচ্ছে করছে। দাপাদাপি আর ছট্‌ফট্‌। ভাঙা পালঙ্কের এ-পাশ আর ও-পাশ। আর কান্না। কিন্তু অবশ, অক্ষম শরীর নড়তেও পারছে না এতটুকু। কাঁদতেও পারছে না। পঁচাত্তর বছরের স্ত্রীকে হারালো ছিয়াশী বছরের বুড়ো। আর সেই শোকে কান্না? ছেলে, ছেলেবোঁ-এয়োতি মেয়েদের সামনে সে কান্না তিনি কাঁদবেন কি করে? ওরা যদি কান্না খামিয়ে ছুটে আসে। না ওরা কাঁদছে। কাঁদুক। ওরাই কাঁদুক।

উঃ, কেন এমন হল। না হলেও তো পারতো।

ওকি জানতো না কলতলাটা ওরকমই। গাল-ভোঁবড়ানো, মাজা-ভাঙা, পিঠ বেকে যাওয়া বুড়ি, লাঠি ছাড়া চলতে পারে না, চোখে দেখতে পারে না, হাযানদিস্তায় না গুঁড়োলে পান খেতে পারে না, ফেনাভাতের মত কাদা-কাদা

না হলে যে ভাত মুখে তুলতে পারে না—সে বুড়ীর কি বোঝা উচিত ছিল না অমন সন্ধ্যা বেলা, অন্ধকারে, একা একা যেতে নেই ওখানে। সেই কবে সেজো বোঁমা ঝামা দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করেছিল, সে তো কতকাল আগে। বোধহয় মাস দেড়েক হবে। ও বুড়ীর কি সে খেয়াল ছিল। সর্বনাশী। পঁচাত্তর বছরের বাহাতুরে বুড়ী। নইলে কি অমন সাধ করে মরতে যায় কেউ?

কিন্তু কেন এমন হল? না হলেও তো পারতো। এমন তো কতদিন হয়েছে। কোন কাজ করতে হয়তো এগিয়ে গেছে ও, আর তখনই ঝাঁকে ঝাঁকে নাতি-নাতনীরা এসে ছেঁকে ধরেছে, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওর ওপর।

‘ও ঠাকু-মা যাচ্ছে কোথায়। শোনই না ছাই, শোন। গল্প বলবে, গল্প—’

‘জানো ঠান্মা, ঝেঁটু বলছিল গামোফোনের ভেতরে মানুষ থাকে। সেই মানুষটা গান গায়। সত্যি?’

‘আচ্ছা, দেখি তো কেমন তোমার বুদ্ধি ঠাকুন্মা। বলো তো এটা কি? তিন অক্ষরে নাম তার সন্ধ্যা লোকে জানে, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে...’

বাস্। অমনি ওলট-পালট হয়ে যেত সবকিছু। মালাগোনা খেমে যেতো, আগুন আনতে পা বাড়িয়ে রান্নাঘরে যাওয়া হয়ে উঠতো না আর, আফিম খেয়ে কাত হবার পরও ঘুম টুটে যেত কখনও কখনও। যেখানে সেখানে এমন কি ঘরের চৌকাঠেই বসে যেতো গোল হয়ে। সময়ে অসময়ে, যখন তখন। লোলচর্ম, প্রতি লোমকূপ কুঁচকে যাওয়া জরাগ্রস্ত সেই বীভৎস মুখ ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, কুতকুতে চোখ—সবকিছুই কেমন যেন সুন্দর হয়ে উঠত তখন। সবগুলো দাঁত পড়ে যাওয়া লাল মাড়ি দুটো—ভয়ংকর প্রেতের হাসিটাও অপূর্ব হয়ে উঠতো।

এমন কিছুও তো হতে পারতো সেদিন। কেন হল না। ঝেঁটু, মিষ্টু বাপি, মিষ্টু, খোকা এসে আগলে দাঁড়াতে পারতো। বলতে পারতো—

‘ওখানে যেয়ো না ঠান্মা। ওখানে ভুত আছে। আরশুলা, কঁকড়াবিছে...’

‘অন্ধকারে পিছলে গেলে কি হয় ঠামা। মরে যায়। না ঠামা?’

কিন্তু কেউ কাছে ছিল না সেদিন। ছেলেরা বাড়িতে ছিল না, ছেলে-বোঁরা ছেলেগুলি আগলাছিল নিজেদের ঘরে, নাতি-নাতনীরাও স্তর করে পড়ছিল ওদের মায়েদের কাছে বসে। ভর সন্ধ্যা। অন্ধকার। আর তখনই, তখনই বুড়ীর মরণের সাধ হল। সর্বনাশী বুড়ী। পোড়ারমুখী।

না কাঁদবেন না শশধর। কিছুতেই না। ছেলে-মেয়ে-ছেলেবো-নাতি-নাতনীরা ছুটে আসবে তার চিংকারে, পাড়ার লোক বলবে - আদিখ্যেতা। অতগুলো নাতি-নাতনী আর ভরাট সংসার রেখে, শাখা-সিঁচুর নিয়ে অমন সতীর পুণ্য আর অত স্বপ্ন নিয়ে যে বুড়ী মরলো তার জন্তে এত শোক, এত কারা? কিন্তু কি করে তাদের আজ বোঝাবেন শশধর—এ বুড়োর কাছে, ও বুড়ীর মৃত্যু মৃত্যুই। হুঃখেরই মৃত্যু। ও বুড়ী মরেই যেন বলে গেল তাকে—‘বুড়ো হয়েছো তুমি। খুখুরে বুড়ো। সংসারের ভার। এখনও মরতে পারোনি। এত কুঁড়ে তুমি।’

সত্যি বুড়ো হয়েছেন শশধর। হাসিমুখে মরবার মত বুড়ো। আজই যেন প্রথম বুঝলেন—এক বছর নয়, এক মাস নয়, একটা মুহূর্তের ভবিষ্যৎও তার আজ অর্থহীন। যা কিছু অর্থ আছে, মূল্য আছে তা স্মৃতি। দীর্ঘ ছিয়াশী বছরের একটা ধু ধু করা অতীত। অতীতের স্মৃতি।

তেরশো সাল শুরু হয়নি তখনও। বারো-শো নিরানব্বই। মাসটাও মনে আছে—অষ্টাণ। সাত তারিখ।

বড় কান্দুন্দী গ্রামের নৈকম্ব কুলীন নীলাধর চাটুজের আট বছরের মেয়ের আঁচলে গাঁটছড়া বেঁধে ছিলেন তিনি। সে আজ কতদিনের কথা, কত পুরনো। চালের দর তখন তিন টাকা মন, দু-গুণ্ডা পয়সায় আড়াইসের দুধ, এক জোড়াধুতির দাম সাতসিকে, দেড় টাকা। তবু সেই দিনেও কত গরীব ছিল মানুষ। বামুন কায়েত ব্রজমানদের ঘর থেকে প্রণামী পাওয়া বাসন-কোসন বেচে কল্যা সম্প্রদান করেছিলেন স্বস্তরমশাই। আর নতুন বউ নিয়ে নিজেদের মাটির ঘরে এসে উঠেছিলেন শশধর। তখন কত আর বয়স হবে। তাজা জোয়ান। উনিশ কি বিশ। সেই দিনের সেই কচি মেয়েটা। এক চিলতে বয়স। নতুন বিয়োনো বাছুরের মতই ছোটোছুটি করতো সারাদিন। পাড়ার সইদের ডেকে এনে খুঁটি খেলতো ঘরের দাওয়ায়, বুড়ীসমস্ত খেলতো উঠানে। দিনভর টো টো করে বেড়াতো পাড়ায় পাড়ায়। কখনও গাছের টঙে, কখনও পুকুরের জলে, কখনও ঝোপে-জঙ্গলে কখনও মায়ের আঁচলে। বনবাদাড় ভেঙে বৈচি কুড়োতে ছুটতো, খানা-পুকুরে ডুব দিয়ে পানি-ফল ভুলে খেতো। আমের দিনে আম, কুলের দিনে কুল। একটা গামছাতেই বার লজ্জা ঢেকে যায়, মাথার ঘোমটা তো দূরের কথা বুকের কাপড় ধসে পড়লেও বার হাঁশ থাকে

না—সে মেয়েই হঠাৎ একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরও রাতারাতি বয়স বাড়লো না। পুতুলের চেয়ে বেশি প্রিয় হল না স্বামী। আদর করে কাছে টানলে ছুটে পালাতো ভয়ে। স্বামীকে ভয়, স্বশুরকে ভয়, এ বিদেশ-বিভূয়ের সব অচেনা মানুষকে দেখেই ভয় হত ওর। সব চেয়ে বেশি ভয় শাশুড়ীকে। ছুটে পালানোর জন্তে আনচান করতো মনটা। কিন্তু ভয়ে মুখ বুজে থাকতো, আড়ালে কাঁদতো। কখনো ঘরের কোণে, কখনও দাওয়ার কোণে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে।

সেদিন কিন্তু সবই বুঝতেন শশধর। কিন্তু মার ভয়ে কিছুই বলতেন না। মার চোখ পালিয়ে কখনও স্বেযোগ পেলে কাছে ডাকতেন। আদর করে কোলে টানতে চাইতেন। কিন্তু সে আদরের কোন দাম না দিয়ে, মুখ গোমড়া করে, নাক দিয়ে সিঁটকি টেনে হাতের ফাঁকে পিছলে যেতো ওইটুকুন মেয়ে। এ বাড়ির কারও আদর, সোহাগ ও সইতে পারতো না। ওর এ বন্দীদশার জন্তে যেন এ বাড়ির সবাই দায়ী। বিশেষ করে শশধর। যেন ওর দোষটাই বেশি। বিয়ে করে ওকে এখানে এনেছে বলে।

সেই সেবারে শরিকী যজমান ভবন সরকারের গৃহ-প্রবেশের কাজ চুকিয়ে ঘরে ফিরলেন শশধর। হাতে তখন ছাতা, কাঁঠাল আর চাল-কলার পুঁটলি, ঘটে বসানো নয়হাতি শাড়ীখানা দিয়ে পুঁটলি বাধা। উঠানে এসে পা ফেলতেই কোথেকে ছুটে এলেন মা। দু-হাত তুলে প্রায় গোঁটা পাড়াটা চিৎকার করে মাথায় তুললেন—‘আরে শশে, সর্বনাশ হ'লো রে! সর্বনাশ! ওরে হাঁ করে কি দেখছিস্। যা না, ছুটে যা—’ দুই ক্রোশ পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন শশধর। এমন আচম্কা মার কপাল-চাপড়ানো হা-হতাশ শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। বিব্রতও হলেন—‘আঃ, বলি অমন করে মড়া কারা কাঁদছো কেন। কি হয়েছে বলবে তো আগে। কী সর্বনাশ, কিসের সর্বনাশ।’

‘সে কি আর বলার মত রে বাবা! সে আমার কপাল, আমার অদৃষ্ট! নইলে ছেলের বে দিয়ে এমন পোড়াকপালী বোঁ ঘরে আনে কেউ? হতচ্ছাড়ী, হাড় জালিয়ে মারলো—’ এটুকু বলেই বেশ হাঁপাতে শুরু করলেন মা—‘আরে, সন্ধ্যাবেলা তোর সোহাগীর বোঁকে বললাম—উনি গোরুটা দুইবেন, বাছুরটা ধরতো বোঁ।’ কি আর এমন মন্দ বলেছি, বল্। রোজই তো ধরে তা আজও বলেছি। কিন্তু রোজই তো ও বেশ সামলায় আজই যে এমন করবে কে জানতো। বাছুরটা সেই যে হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে উত্তরমুখী মাঠের

দিকে নেমে গেল অমনি বেহায়া বোঁটাও পিছু পিছু দে ছুট। সেই যে গেছে এখনও করেনি। বল্ বাবা, বল্, ঘরের বোঁ বেআক্ৰ হয়ে মাঠ ধরে ছুটলো এটা কেমন কথা। তোর লম্বীছাড়া বোঁ।’

‘আঃ, চূপ করো তো এখন। বাবা কোথায়?’

‘উনিও তো ওকে খুঁজতে গেছেন সেই কখন, ফিরবার নামটি নেই। বল্ বাবা, আমি এখন কি করি, ঠাণ্ডে করে গলায় দড়ি দিয়ে হাড় জুড়োই।’

মার প্রলাপ শোনার মত সময় ছিল না। হাতের জিনিস পত্র রেখেই হস্ত দস্ত হয়ে ছুটলেন শশধর। সন্ধ্যা উৎরে গেছে। অন্ধকার। ঝোপে জঙ্গলে জোনাকি জলছে, একটানা ঝাঁ ঝাঁ ডাকছে চারপাশে। এ সময়ে লণ্ঠন ছাড়া গ্রামের পথে চলে না কেউ। এই অন্ধকারেই হস্তদস্ত হয়ে ছুটলেন শশধর। বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল বিনোদ সার বাড়ির কীর্তনের আসরে। বোঁ খুঁজতে এসে বোঁ হারানোর গল্প শোনাচ্ছেন সকলকে। কিন্তু এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলো শশধর। শেষে কায়েত পাড়ার বিষ্টে মিত্তির বললো ‘নন্দ ঘোষের ছোট মেয়েটাকে দেখতে এসেছিলাম। সেখানেই তো তোর বোঁ।’

নন্দ ঘোষের মেয়ে?—শেকালী? ওই সাত-আট বছরের যে মেয়েটা ওদের বাড়ি গিয়ে সই পাতিয়েছিল ওর বউর সঙ্গে। বুঝলেন শশধর—দেড় মাসের বাছুরকে হাতছাড়া করবার মত মেয়ে নয় ওর বোঁ। ওটা পালানোর ছতো। ওই ছতোয় পালিয়েছে।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে গেল শশধর। গিয়ে দেখে বিষ্টে মিত্তির মিথ্যা বলেনি। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় পরম নিশ্চিত্তে মাটিতে দাগ কেটে সইয়ের সঙ্গে বাঘবন্দী খেলছে ওর বোঁ। তাকে দেখেই দাওয়ার অন্ধকার কোণ থেকে টিট্‌কিরি দিয়ে উঠলো নন্দ ঘোষের বুড়ী পিসি—‘যা লো, বোঁ, তোর সোয়ামী এইচে তোকে নিতে।’ পিছন ফিরে এতটুকুও ঘাবড়ালো না মেয়েটা। ঠোঁট উল্টে বললো—‘সোয়ামী না হাতি। যাবো না ওর সঙ্গে। যাবো না, কিছুতেই যাবো না। ওদের বাড়ি খালি খালি মারে।’

কিছুই বললেন না শশধর। চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিটড়ে বোঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে বাছুরটাকেও।

তার দিন কয়েক পরেই ছেলে-বোঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন যা। বিয়ের সময় একটা ঘটি-বাটিও পাওয়া যায়নি, এখন না হয় এ দস্তি মেয়েটাকে একটু শুধরে দিক ওরা।

সত্যি, সেদিন ওকে প্রচুর মেরেছিলেন শশধর। প্রচুর কাঁদিয়েছিলেন।

আর—

আর আজ সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেল বুড়ীটা। পঁচাত্তর বছরের ওই বুড়ী। কিন্তু আজ কেন। এতদিন পরে হঠাৎ আজই কেন ওর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হল। তাই যদি হয় তবে ওদের কাঁদালো কেন? ওই ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনী তাদের তো দোষ নেই। ওরা যে ওরই সন্তান। সন্তানের সন্তান। ওরই রক্তের ধারা। তবে? তবে কি এই বুড়োর ওপরই রাগ করে চলে গেল? এই বুড়োর ওপর?

না, না, তা হয় না। হতে পারে না। তাকে ভালোবাসত ওই বুড়ী। হ্যাঁ, বাসতো। নিশ্চয়ই বাসতো। শুধু তারই জন্তে, তারই কল্যাণের জন্তে ও সারা জীবন সিঁদুর লেপেছে কপালে, সিঁথি লাল করে চুল ঝরিয়েছে, হাতের শাখা-আয়ত্ন ভাঙতে দেয়নি কোনদিন। জৈষ্ঠ্যমাসে ষষ্ঠি পূজা করেছে, কালীঘাটে মানত করেছে। বুঝি সেজন্তেই আজও, এই ছিয়াশী বছর বয়সেও নিলজ্জের মত বেঁচে আছেন শশধর। আজও মরতে পারেননি।

হঠাৎ একটা পুরনো, খালি-লরীর বিরক্তিকর শব্দে চমকে উঠলেন শশধর। স্বল্প পরিসরের এই রাস্তাটা দিয়ে কতো গাড়িই যায় সারাদিন। রিকশা, মোটর, লরী। দূরে কাঁসা-বাসনের ফেরীওয়ালা কাঁসার বাটি বাজাচ্ছে থেমে থেমে। প্রায়ই বাজায়। কিন্তু, আজই কেমন যেন সইতে পারছেন না শশধর। সামান্য শব্দেই কেঁপে কেঁপে উঠছেন। অস্থির হচ্ছেন। উঃ, কী ডাইনী শহর কলকাতা। রোজকার মত ঠিক নিয়মেই চলছে। কোন তফাৎ নেই। কিন্তু কত তফাৎ সেদিনে আর এদিনে—

আঠারো বছর বয়সেই জমিদারের সেরেস্তায় কাজ নিয়েছিলেন শশধর। বিয়ের পর বদলি হয়েছিলেন শহরে। জমিদারের খাসমহলে। সে কি আজকের কথা? কর্জন সাহেব বড়লাট হয়ে আসেনি তখনও। কলকাতা তখন ছিল সাহেব সুবোর দেশ শ্লেচ্ছ-যবনের রাজত্ব। এত মোটর-বাসও ছিল না, গাঁয়ের লোকে রেলও চাপতো না বেশি। হেঁটে আসতে হতো। দিনে দিনে না এলে বাঘ-ভাল্লুকের খপ্পরে নয়তো ঠ্যাঙাড়ের হাতে প্রাণ দিতে হত। সে যুগেই শহরে এসেছিলেন শশধর।

আর কিছুদিন শহরে থেকেই যেন মরদ হয়ে উঠলেন। হঠাৎ বোর খোঁজ পড়লো তাই বছর পাঁচেক পরে আবার যেদিন বোঁকে ফিরে পেলেন সেদিন যেন সত্যি

অবাক হয়ে গেলেন শশধর। ষোল কলায় বেড়ে ওঠা এ যেন আরেক মেয়ে।
অন্য বো।

বৈচি কুড়োবার তাড়া নেই, পানিকলের, শাপলা ফুলের আবদার নেই, লাফিয়ে
লাফিয়ে গঙ্গা-ফড়িং ধরবারও উৎসাহ নেই, ছোটোছুটি নেই—শাস্ত, নরম,
কলাবো।। আধহাত লম্বা ঘোমটার আড়ালে সত্যি যেন মা-লক্ষ্মীর মুখ। কেমন
ডাগর ডাগর চোখ, নাকছাৰি আঁটা নাক, হাঁটু ছোয়া চুল। মাথার কাপড়
নিয়েই হাতদুটো এত ব্যস্ত যে, বুকের আঁচল একটু নড়তেও সাহস পায় না।
সেই প্রথম স্বামী চিনলো মেয়েটি আর সংসার চিনলেন শশধর।

ছুটি-ছাটায় মনটা যেন কেমন কেমন করতো তখন। স্বযোগ পেলেই তিন-
চার ক্রোশ পথ হেঁটে চলে আসতেন ঘরে। জমিদারের শহরের সেরেস্টার তার
যে দানই থাক, সাহেব-সুবোর শহরে তিনি যত ছোট গোলামই হোন—তার
মাটির ঘরে তিনি তো দেবতা। পতিগুরুর পায়ে মাথা কুটবার মত একটা
বো তো আছে সেখানে।

এতদিন পরে আজও মনে করতে পারেন শশধর—কত লাজুক, কত নিরীহ,
কত অসহায় ছিল সেই ষোল বছরের মেয়েটি। আজকালকার বো-মেয়েগুলোর
সঙ্গে কত তফাৎ।

কতদিন পরে পরে ঘরে ফিরতেন শশধর। কিন্তু সারাদিনে একটিবারও বোকে
কাছে পেতেন না। মার কড়া শাসন। সংসারের নানা কাজ সেরে রাতে যখন
স্বামীর কাছে আসার স্বযোগ পেত, তখন ও ক্লান্ত, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতো।
তবু তখনই প্রদীপের আলোয় বোকে দেখতেন শশধর। পাশে টেনে এনে
তাকিয়ে থাকতেন। ওর যুম তাড়াতে নানা ছল করতেন, আদর করতেন,
সোহাগ করতেন। শেষ ওষুধ—কলকাতার গল্প। সে এক আজব শহর
কলকাতা। কত কি হচ্ছে সেখানে। যা জানতেন, যতটুকু দেখেছেন, তা
বলতেন না, যা জানতেন না, যা কোনদিন দেখেননি তাই ফলাও করে, রঙ
চড়িয়ে বলতেন। শুনতে শুনতে শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে হাঁ হয়ে যেতো মেয়েটা।

‘তুমি সাহেবদের সঙ্গে কথা বলো?’

একটু ঢৌক গিলে নিজেকে সামলে নিতেন শশধর। অবোধ বোয়ের কাছে
নিজেকে ছোট করতে কেমন যেন বাধতো। বলতেন—‘বলি না মানে?
হামেশাই তো আসে ওরা। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, লার্ড, বড়লার্ড—’

‘তুমি ওদের মত ইংজিরি বলতে পারো?’

হঠাৎ গলা পর্যন্ত এসে কি যেন একটা খেমে যেতো। বোধহয় মিথ্যে কথাটা। কিন্তু ওই বোকা বোকা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে একটু মজা করতে ইচ্ছে করতো শশধরের— ‘ই্যা, সে তো বলতেই হয়। নইলে চলবে কেন।’

শিবের মত অমন দুর্লভ স্বামী পাবার কৃতিত্বে, আনন্দে, তৃপ্তিতে চোখ-মুখ ঝলসে উঠতো ওর। পৈতেটা আঙুলে জড়িয়ে স্বামীর বুকে হাত বুলাতে বুলাতে ও বলত— ‘ই্যা গো সাহেবদের বৌ-ঝিরা নাকি ঘোড়ায় চড়ে, পুরুষ মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়। ওদের খিজি খিজি মেয়ে-গুলোর নাকি লাজ-লজ্জার বালাই নেই একেবারে। তা তোমরা হিঁচুঁরা ওদের কিছু বল না কেন।’

এর পরে দমে যেতেন শশধর। মেম-সাহেব তিনি দেখেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দূর থেকে। পাড়া-গাঁয়ের এ নির্বোধ মেয়েটি কেন, ওদের বেলান্নাপনা দেখে তিনি নিজেকেই ঘেন্নায় মরে গেছেন। কিন্তু স্বয়ং রাজাবাহাদুর জমিদারই যেখানে তোরণ সাজিয়ে নহবত বাজিয়ে খানাপিনার ব্যবস্থা করে ওদের আশ্রয়ন করতেন সেখানে শশধরের মত খাতা-লিখিয়ে কী আর করবেন। কতটুকুই বা পারবেন। শুধু এখানেই বৌর কাছে খেমে যেতেন তিনি। হেরে যেতেন।

‘ই্যা গো, আমায় তুমি নিয়ে যাবে?’

‘কোথায়?’

‘কলকাতায়।’

‘কেন গো, সেখানে কেন? আমাদের মত এ গরীবের ঘরে তোমার কষ্ট হয়, না? শাক-ভাত আর পান্তা রুন খেয়ে খেয়ে—’

আদর পেয়ে শুকনো খেজুর পাতার মত ওর বুকে ঢলে পড়েছিল বৌ। হেসে বলেছিল— ‘না গো, না। আমি কি পরমাত্র খেতে স্বামীর ভিটেয় এসেছি যে অমন করে বলছো। তুমি দূরে দূরে থাকো তাই—’

সেদিন হেসে ফেলেছিলেন শশধর— ‘আর কটা দিন সবুর করো বৌ। তোমার নিয়ে যাবো। তখন আর দূরে থাকবো না। সারা জীবন কাছে কাছে থাকবো। কেমন?’ সমস্ত বুক উজাড় করা একটা দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠলেন শশধর। সেই কলকাতাতেই মরলো বুড়ী। আজ এত বছর পরের এই কলকাতায়। কথা তো রেখেছিলেন তিনি। ওকে এনেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু—
কিন্তু ও-ই কথা রাখলো না। সব ছেড়ে চলে গেল।

‘বাবা—’

চমকে উঠলেন শশধর। কে যেন ডাকলো। কে? এঁই তো তিনি চেয়েছিলেন। কেউ আসুক। ছেলে-ছেলে-বো-নাতি-নাতনী যে কেউ। যাকে দেখে সব ভুলবেন তিনি। এঁই শোক, এঁই যন্ত্রণা—সব। যাকে তিনি ভালবাসেন, ওঁই বুড়ীর চাইতেও বেশি ভালবাসেন, আপন বলে মানেন, এমনি কেউ। এমনি কাউকে খুঁজছিলেন তিনি।

‘বাবা।’

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন শশধর। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না, চিনতেও পারলেন না। হু-হাতে চোখদুটো আড়াল করে লক্ষ্য করলেন। যখন চিনলেন, ফেটে পড়লেন চিংকারে। পাগলের মত প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততার চিংকার করে উঠলেন—“বেরো, বেরো ভুই এখান থেকে। তোরা সবাই, সবাই আমায় পাগল করে দিবি। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি—”

কোভে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন শশধর। কিছুই বুঝতে না পেরে একটু খতমত ধৈর্যে, ধানিকঙ্কণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল হরিহর। তার ছেলে, তার প্রথম সন্তান।

তখনও কাঁপছেন শশধর। খাঁ খাঁ করছে খোলা দরজাটা। কেউ নেই। কিন্তু মনে হল, এখনও যেন ওঁই ভয়ংকর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ও কে? ও কার মূর্তি? খালি পা, উকো-খুকো চুল, পরনে হাঁটু উঁচু কোরা ধূতি, গায়ে কোরা খানের চাদর। গলায় ওটা কি? পৈতে? না, শুধু তো পৈতে নয়—দড়ি। হবিষ্যির কাঁস। ও সব কেন? ওর যা মরেছে বলে? ভয় পেলেন শশধর। ভয়ে, আতঙ্কে বুক কাঁপছে তার। ও তো তার ছেলের মুখ নয়—তার মৃত্যু। তার মৃত্যুর ছবি।

তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে আবার ঢলে পড়লেন শশধর। কোমরের বাতটা যেন আবার চাড়া দিয়ে উঠলো হঠাৎ। মাথার শিরা, বকের পাঁজর সবই যেন প্রতিবাদ করে উঠলো একসঙ্গে—তুমি বুড়ো, তুমি অথর্ব। এবার, এবার তিনি পাগল হবেন। পাগলের মত ছটফট করে মরবেন। বাঁচতে হলে মরতেই হবে তাকে। মরে বাঁচবেন।

হরিহর। সেই হরিহর আজ বড় হয়েছে। বুড়ো হয়েছে। চূলে পাক ধরেছে। আটার পেরিয়ে উনষাটে পা দিয়েছে গেল আশ্বিনে। আর—

আর সে ছিল আরেক আশ্বিন। অনেক বছর, অনেক যুগ পেছনে ফেলে সেই

এক গেঁয়ো-আগ্নিন। গ্রাম থেকে চিঠি এলো হঠাৎ। বাবার চিঠি—
‘বৌমার অসুখ।’

এর বেশি প্রয়োজন ছিল না। সব ছেড়ে রওনা হলেন শশধর। সারা পথ
ভাবলেন—‘অসুখ। কী অসুখ। কত বড়ো হতে পারে?’

ঘরে এসে দেখলেন সত্যি অসুখ। চূপচাপ বসে আছে বৌ। টিমটিমে
প্রদীপ জ্বলছে ঘরের কোণে। অন্ধকারে কেমন যেন মনে হল মুখখানা।
একটু কাতর, একটু সুন্দর। তাকে দেখেই মূচকি হেসে উঠে দাঁড়ালো। মাটির
দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে যেতে চাইলো। টলতে টলতে অনেক কষ্টে।
অতশত বোঝেননি শশধর। কাছে গিয়ে কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিলেন—
‘কিগো, অমন করছ কেন। কি হয়েছে?’

উত্তর দেয়নি। হেসে উঠোনটা দেখিয়ে দিয়েই সরে পড়েছিল বৌ। উঠোনের
কোণে তখন খেজুর পাতার ছাউনি তুলছিলেন বাবা।

মা বললেন—‘আমরাও মেয়েমানুষ শশে, অত ভয় খাচ্ছি কেন? আমি
বলছি ও কিছু না।’ বাবা বললেন—‘ও কি রোগ’ নাকি। ও তো হবেই।
বিধির নিয়ম।’

রোগ নয়—কিন্তু বড় ভয় পেয়েছিল বৌ। আঠারো বছরের সমস্ত শরীরটা
সেই প্রথম নড়ে উঠেছিল অদ্ভুত যন্ত্রণায়। তারপর যখন তেতো মুখে রুচি
ফিরলো, শরীরটা হালকা হয়ে বুকটা ভরে উঠলো, তার কিছুদিন পরেই মা
মারা গেলেন। তার এক বছর পরে বাবা।

ছোট সেই মাটির ঘরে গিন্নী হল নতুন বৌ। কোল ভরে রইলো সেই
শিশু। সেই শিশু এই হরিহর। উনষাট বছরের চুলে-পাক-ধরা, নড়বড়ে
দাঁতের এই বুড়ো।

সেই শিশু আজ বুড়ো। তিন মেয়ে আর দু-ছেলের বাপ।

বুকের ভেতর যন্ত্রণার বাসুকীটা মোচড় দিয়ে উঠলো আরও একবার।
ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন শশধর। বয়স বেড়েছে তার। এ বয়স বাঁচবার নয়—
মরবার, এবার সংসার নয়—শ্মশান।

এই তো সেদিন, বছর চল্লিশেক আগে আতুড় ঘর থেকে লতিকাকে নিয়ে
আসার পদ বড়ছেলের বিয়ে দিল বুড়ী। মেয়েকে দুধ দিতে দিতে হেসে
বললো, একদিন—‘না গো আর না। এবার কিন্তু লজ্জা করবে আমার। এরই

মধ্যে তো দুটো মেয়ে মা হয়ে গেছে, এবার ছেলেও বাপ হবে। নাতি-নাতনী আসবে ঘরে। আমি আর পারবো না কিন্তু—’

আটটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে ওই বুড়ী। দুটি পেটেই মরেছে। তারপর লতিকাই শেষ। হরিহরের মেয়ে বিনতার মত লতিকাও আজ এক ছেলে, দু-মেয়ের মা।

লতিকা কাঁদছে। কাল শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে শেষ দেখাও দেখতে পারেনি মাকে। সেই যে কান্নার শুরু, এখনও শেষ নেই। কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে আকুল হচ্ছে মেয়েটা।

হঠাৎ হুঁশ হল তার। উৎকর্ণ হলেন শশধর। কাঁদছে?

কই, না তো। কেউ কাঁদছে না। সবাই ঘেমে গেছে। সব চুপ।

এরই মধ্যে শেষ হল সব কিছুর? চিতার আগুন নিভেছে অনেক আগে। এবার ওরাও কাঁদতে ভুললো। ওরা ভুললো ওদের মাকে? কি করছে ওরা। হরিহর, গদাধর, নীলাধর, পীতাধর, বিশ্বেশ্বর? মার শ্রদ্ধ-শাস্তির হিসেব কষতে শুরু করেছে। কাকে কাকে ডাকা হবে. কত টাকা লাগবে সব মিলিয়ে। হিসেবী ছেলে গদাধর কি বলবে না একবার—‘খরচ কমাও, খরচ কমাও। বুড়োটা এখনও বেঁচে আছে। ওর জন্তে রাখো কিছু।’

খোলা দরজার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন শশধর। সেই মূর্তি, সেই ভয়ংকর মূর্তিটা আবার যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মনে হল। বড় ছেলে, বুড়ো ছেলে হরিহর। তাকিয়ে আছে, ব্যঙ্গ করছে তার দিকে তাকিয়ে—‘আপনাদের জন্তে কত আর কাঁদবো বাবা, ছেলেপুলে আছে আমাদের। ওদের জন্তে ভাববো এবার।’

ভালো করে দেখলেন শশধর। ছানি-পড়া চোখ দুটো কুঁচকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে লক্ষ্য করলেন—না, ভুল। ওটা ভুল। মতিভ্রম। কেউ নেই। কেউ আসেনি। শান্ত হলেন। ঘেমে নেয়ে ওঠা ক্লান্ত, অথর্ব শরীরটা নিয়ে আবার নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়।

কী আশ্চর্য এই সংসার, কী অদ্ভুত। সেই ছোট মাটির ঘর, বেড়ার রান্নাঘর, এক চিলতে উঠোন, তুলসীতলা। ছোট সংসার। ডালাপালা ছড়িয়ে সেই সংসার আজ কত বড়। একটি নয়—আটটি সন্তান। একটি ঘর নয়—পাঁচ ছেলের পাঁচ ঘর; পাঁচ ছেলের পাঁচ বোঁ। ছেলেদের ঘরে নাতি-

নাত্নীর কলরব। সেই সংসার আজ কত বড়, কত ভরাট, জমজমাট।

কিন্তু এ সংসারে কে শশধর? কেউ নন। তারই রক্তের বিন্দু দিয়ে গড়ে ওঠা বংশপ্রাণে তিনি এক পিছিয়ে পড়া চেউ। কে আর আসবে কাছে। কে আর শুনবে তার কথা। রুদ্রাক্ষের মালা গুনতে গুনতে কে আর অমন করে বলবে হঠাৎ—‘বোঁমা উনার স্বর্ণ-সিঁদুরটা গুঁড়িয়ে দাও তো একটু। বাতের মালিসটাও এটু ডলে দিয়ে ধোয়ো।’

ছেলে-বোঁদের মধ্যে কেউ কখনও আসতো, কখনও আসতো না। শেষে জপের মালা রেখে ওই বুড়ীকেই উঠে আসতে হত। স্বর্ণসিঁদুর, দুধের সর, মধু, আর খল-নোড়া নিয়ে বসতে হত। তারপর বাতের মালিস নিয়ে। এমন দিনও তো গেছে, আফিমের পরস্য বোঁদের কাছে না পেয়ে নিজের ভাগটুকু স্বামীর জন্তে তুলে রেখে নিজে ভুগে মরেছে দু-রাত, তিন রাত।

এই বছর দশেক আগে বিয়ে নিয়ে কি কাণ্ডটাই না করলো বিশ্বেশ্বর। ছেলেদের মধ্যে ও-ই কি জানি কেমন করে কলেজের মুখ দেখেছে। বার দুই কলেজ থেকে জেলে গেছে কিন্তু তিন-তিনটে পাশ দিয়েছে ঠিক মতই, তারপর কি যে খেলা চাপলো, বললো—বিয়ে করবো। কলেজেরই মেয়ে। একসঙ্গে পড়ে। সেই নিয়ে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া, বাপের সঙ্গে তর্ক। শেষে মায়ের জোরেই দিতে গেল। বিয়ের পর ভিন্ন হতে চেয়েছিল, সেটাও বুড়ীই আটকালো।

‘ছেলে-মেয়েগুলোকে শুধু শুধু পেটেই ধরেছি। ওরা কি আমাদের এখন—’ সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করতে করতে একদিন বলেছিল বুড়ী—‘জানো, বিত্ত কি বলেছে আজ। বলে—মা তোমরা সেকলে মানুষ। অত শুচিবাই রেখে দাও। তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। মেলাতে এসো না। ঠকবে। বলি, বুঝলে তো, বুঝলে তো কথাটার মন্য। মানে, এখন আমি তুমি আর কেউ নই। আমরা বুড়িয়ে গেছি।’

‘হঁ—’ ছোট একটা নিস্পৃহ মন্তব্য করেছিলেন শশধর—‘সেদিন ওই যে তোমায় বললাম নিরাপদবাবুর কথাটা।’

‘কে নিরাপদবাবু—’

‘ওই যে গো, সাতের এক বাড়িতে থাকে বুড়ো। সেদিন পার্কে নিমাইবাবু বললেন তাই শুনলাম। নিরাপদবাবুর ছোট মেয়েটাও নাকি কোন একটা

ছেলেকে পছন্দ করেছে। বাপকে শাসাচ্ছে—বিয়ের না দিলে আত্মহত্যা করবে। দিনকাল যা পড়েছে কালে কালে আরও কত শুনবো। হবে না? হতেই হবে। শিজি শিজি মেয়েগুলো কলেজে পড়বে আর—।’

‘ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলো না। আমাদের ছোট-বৌ কিন্তু তেমন নয়। আহা, লক্ষ্মী মেয়ে। সারাদিন ইস্কুলে মাস্টারি করেও তো যা হোক শান্তুড়ী-শুণ্ডরের যত্ন-আত্তি করে একটু আধটু। তারা দুটিতে যখন কাছে এসে দাঁড়ায় আমার কি যে ভালো লাগে কি বলবো। ওরা সুখে আছে। দেখো তুমি সবচেয়ে সুখী হবে ওরা। আমরাই শুধু মাঝে মাঝে বাদ সেধে ওদের মন ভেঙে দিই। দোষ আমাদের।’

‘বাঃ ছোট-বৌমার মত তুমিও তো সুন্দর কথা বলছো। নতুন শিখেছো বুঝি।’

‘আ মরণ, সুন্দর কথা আবার কি বললাম। যা শুনেছি তাইতো বলছি। শোনো নি তো ছোট-বৌমার কথা শুনলে বুঝতে কী সুন্দর কথা বলে। কত কি—’

‘থাক, সে-কথা তুমিই শুনো। আমার দরকার নেই।’ ছোট-ছেলের বিয়ের কথা উঠলে কোথায় যেন কাঁটা ফুটতো শশধরের বুকে। প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসতেন। নয়তো রামায়ণটা, মহাভারতটা টেনে নিতেন কাছে।

সেই কাঁটা একদিন ওই বুড়ীই তুলেছিল। ছোট বৌমার কাছ থেকে শোনা কথাই শোনালো একদিন—‘জানো, বৌমা কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। সংসারে বুড়ো-বুড়ী মরে যায় কিন্তু বুড়ো বাপ, বুড়ী মা কি আর মরে? মরে না। বৌমা বলেছে—ওদের জন্তে আমরা যে কষ্ট পাচ্ছি ওরা বুড়ো-বুড়ী হলে ওরাও নাকি এমনি কষ্ট পাবে।’

উত্তরে কোন সাড়া দেননি শশধর। টু শব্দটিও না। এই তো সেদিনও, বোধ হয় মাস ছয়েক আগেও জপমালা নিয়ে এইখানে মেঝের উপর বসে ছিল বুড়ী। হাঁটু দুটো মাথা-উঁচু হয়ে উঠেছিল। তোবড়ানো গালে একটা শুকনো হাসি হেসে, মাথাটা যুহু যুহু কাঁপিয়ে, কাঁপা গলায় বলেছিল—‘আর কেন, অনেক তো হল। নাত্নীর ঘরে পুত্নীর মুখও তো দেখলাম। ওরা বেঁচে-বর্তে থাক। আর না, এবার বিদেয় হবো। কি গো, কি বলো—’

‘ছি ছি কি যে বলো—’ শশধরও হেসেছিলেন—‘তুমি যাবে কেন। আমি যাবো আগে। ছেলে-ছেলে বৌ, নাতি-নাত্নীর এত বড় সংসার। এ

সংসারে কি আর অমন সধবা বুড়ী শাশুড়ী মানার? তোমার সংসার, ভূমিই থাকো। আমি যাই।' আশা, বুড়োর কথার কী ছিরি। এত এত বছর পেরিয়ে চলে পাক দিলাম, এখন চিতার আঙনে কপাল পুড়িয়ে সিঁচুর মুছবো, সতীর পুণ্য নিয়ে মরবো, সেও হতে দেবে না বৃষ্টি। না গো, তা হবে না। আমিই আগে যাবো। এখন ওদের সংসার ওরা বুঝবে। এখন আমিই বা কে, ভূমিই বা কে? মায়ের খানে চलो না একদিন। দক্ষিণেশ্বরে অনেকদিন যাইনি—'

সেই তো হল। স্বার্থপরের মত আগেই তো মরলো বুড়ী। আবার যন্ত্রণার কাতরে উঠলেন শশধর। কী রেখে গেল তার জন্তে? সংসার? কার সংসার? কোথায় সংসার? তিনি তো শুধু কোণে ঠেলে রাখা পুরনো তক্তপোশের একটা ভাঙা-চোরা কাঠ। সংসারের অপচয়। মাকে পুড়িয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু ওরা কি জানে, ওই শ্মশানেরই একটা ফাটল-ধরা কালো কুচকুচে পোড়া কাঠ পড়ে আছে ওদের সংসারে। ওদের সংসার? হ্যাঁ, ওদেরই সংসার। ওই বুড়ীরই গড়ে তোলা সংসার, আর তারই রক্ত দিয়ে বইয়ে দেওয়া একটা বংশ-শ্রোত। এ সংসার চলছে, এ শ্রোত চলবে। তাকে বাদ দিয়েই চলবে চিরকাল।

সংসার গেছে—যাক। সেজন্তে দুঃখ নেই কিন্তু ও কেন গেল? ওই বুড়ী। আর যেন ভাবতে পারছেন না শশধর। একটা প্রচণ্ড আলোড়নে গুঁটিয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। ভোবড়ানো গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িগুলো বালিশে ঘষে ঘষে, হাড় বের করা ছোট বুকটাকে দু-হাতে চেপে ধরে অবাধ্য মনটাকে বাধতে চাইছেন, পারছেন না। ফিরে ফিরে একই ভাবনা যেন চেপে বসছে মাথায়। অমন করে কাছে এসে কেউ কোনদিন বলবে না—'আহ্নিক করেছো, গীতাটা পড়বে শুনবো, বিকেলে কতটুকু দুধ দিয়েছিল তোমাকে? বাটিটা ভরেছিল তো, কব্জের মশাইর কাছে হাঁটতে হাঁটতে বাও না একবার, শুনছো মেজো বোমা বলছিল ছোট বোমার নাকি পাঁচ মাস, আমারও কিন্তু সম্ম হচ্ছিল, পঞ্চায়তের ব্যবস্থা করতে হয়। এখন ঘুমোও, লেপটা টেনে দেব—'

এর পর—

এর পর ছেলেরা যখন ঘরে থাকবে না, ছেলে-বোরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকবে, নাতি-নাত্নীরা পড়বে নয়তো ঘুমোবে তখন কি অত আশ্রয়ে সেই তেল

চিট্‌চিটে পুরনো। রামায়ণটা খুলে বসতে পারবেন শশধর। কেউ কি মুগ্ধ হয়ে শুনবে সে পাঠ? কিন্তু শ্রোতাঈ যদি না রইলো তবে কথক রইলো কেন?

কাল রাতের সেই ছবিটা ভেসে উঠলো। উঠোনে টেনে আনা সেই কৌকড়ানো শরীরটা। মরার পরও যেন হাসছিল তার দিকে চেয়ে। কি যেন বলতে চাইছিল, পারছিল না। এখনও যেন সেই হাসিটা দেখতে পাচ্ছেন শশধর। শুনতে পাচ্ছেন সেই কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট শুনছেন—‘এখনও বেঁচে আছে। তুমি? এখনও? এখনও সাধ মেটেনি তোমার? এত তোমার লোভ?’
লোভ? কিসের লোভ? এর পরে আরও বেঁচে থাকার? আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন শশধর। ভয় পেলেন। বেঁচে থাকার ভয়। বুড়ো হয়েছেন তিনি। নির্লজ্জের মত বুড়ো। অসহায়ের মত দেখতে চেষ্টা করলেন। দেখতে পারলেন না। হাতে হাত বুলিয়ে অসুভব করলেন—গোকুর গলকন্ডলের মত বুলে পড়েছে চামড়া, থল্ থল্ করছে, থস্ থস্ করছে। মাদুলী-বাধা কাপড়ের স্রতোটা ছোট হতে হতে কত ছোট হয়ে এসেছে। গাল দুটোর হাত বুলোলেন। একটিও দাঁত নেই আর, চোয়াল ভেঙেছে। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। সাদা, সব সাদা, মাথার চুলও সাদা। ভালো করে চারদিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন। ঝাপসা, সব ঝাপসা। অন্ধকার, চারদিকে অন্ধকার।

‘বাবা—’

কে যেন তাকালো আবার। কে?

চোখ খুলে তাকাতেই চমকে উঠলেন শশধর। ফুটফুটে একরশ্মি ছেলেকে বুকে চেপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেজো-বোঁমা। পাশ ফিরে পিছুটি পড়া প্রায়াক্ষ চোখদুটো আরও একটু কুঁচকোলেন। ভালো করে লক্ষ্য করলেন—
হ্যাঁ, সেজো-বোঁমা। কাঁচা বয়স, সোমন্ত বোঁবনের মেয়ে সেজো-বোঁমা। চোখ মুখ বুক গায়ের গড়ন সবই যেন বেশ অঁটি করে বাধা। জ্র কুঁচকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মুগ্ধ হয়ে নয়—কেমন যেন একটু সন্দেহই মিশে আছে সে চোখে। মনে পড়লো সেই মুখ। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই একটা পুরনো মুখ। এমনি বাড়ন্ত বোঁবনেরই ঢল ছিল সেই মুখে, সেই শরীরে।

মায়া হল, চুঃখ হল সেজো-বোঁমার জন্তে। দিন আসছে বোঁমার, দিন

আসছে। মনে পড়ল, কাল রাতের সেই বুড়ীটাকে। মেরুদণ্ড বেকে যাওয়া, চামড়া ঝুলে পড়া, চুল পেকে যাওয়া সেই বৌভৎস মুখটাকে। একটা ডাইনী মত ষার রূপ।

বৌমার মুখের দিকে তাকালেন শশধর। ও কি কাঁদছে ওর শাশুড়ীর জন্যে? কিছুই বুঝলেন না। ডান দিকের ঘোমটার ছায়া পড়েছে চোখের ওপর। কিছুই দেখলেন না।

‘কতক্ষণ আর এভাবে পড়ে থাকবেন বাবা। উঠুন। হাতমুখটা ধুয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন।’

‘উ—হ—উঠবো কিন্তু’—এতক্ষণ পরে কথা বলতে গিয়ে বুঝলেন শশধর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। গলাটা শুকিয়ে গেছে। কথার স্বর কাঁপছে। অসহায় শিশুর মত তাকালেন বৌমার দিকে। শান্ত, নিরুত্তাপ চাউনি। বৌমার কাঁধে ভর করে উঠে বসলেন। তাকালেন চারদিকে। সেই ঘর, সেই দেয়াল, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার, ক্যালেণ্ডারে ছুঁচ, মেঝেতে কাঁথা পাতা নারকেল-মালা, প্রয়োজন-সুরোনো নিকেলের চশমা।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় চাড়া দিয়ে উঠলেন শশধর। বসতে চাইলেন, পারলেন না। শিরদাঁড়ায় টান পড়লো, ব্যথায় ককিয়ে উঠলো কোমরের বাত, মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইলো অসহ্য যন্ত্রণায়। আবার ঢলে পড়লেন বিছানায়, নেতিয়ে পড়লেন। ঘেমে উঠেছেন, হাঁপাচ্ছেন রীতিমত।

না, না, এবার তিনি কাঁদবেন। কাঁদতেই হবে তাকে। কান পাতলেন। না, ওধারে আর কোন কান্না নেই। তবে কি কাঁদতে কাঁদতে ক্লাস্ত ওরা। ওরা কি কাঁদবে না আর? সত্যি যদি না কাঁদে। তবে কি ওরা ভুললো ওদের মাকে। ঠিক অমনি করে একদিন তিনিও যেমন কাঁদতে কাঁদতে আর কাঁদেননি। ঘেমে গিয়েছিলেন। ভুলেছিলেন মাকে।

কিন্তু একজনকে তো কাঁদতেই হবে। আরও কাঁদবেন শশধর। জোর করে কাঁদবেন। নইলে সত্যি মরে যাবে ওই বুড়ী। অত সহজে ওকে মরতে দেবেন না শশধর। কিছুতেই না। কাঁদবেন। এবার তিনি নিজেই কাঁদবেন।

হঠাৎ—

হঠাৎ চোখ আটকে গেল তার। আটকে গেল বৌমার বুক-ছড়ানো এক কোঁটা ওই শিশুটার ওপর। ছোট ছোট হাত, দুটো পা নাচিয়ে হাসছে।

অবিরাম হাসছে। তারই দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হাসছে। যেন কিছুই হয়নি এ বাড়িতে। হলেও ওর তাতে কিছু না। কিছু না।

সেদিকেই চেয়ে রইলেন শশধর। অনেকক্ষণ, অনেক মুহূর্ত স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ভালো লাগছে, অদ্ভুত ভালো লাগছে। কি জানি কেন, আজকের দিনেও রোজকার মত ভালো লাগছে, সুন্দর মনে হচ্ছে ওই হাসি। এক কোঁটা একটা শিশুর অক্ষম দাপাদাপি, ছটফটানি।

আর—

আর সাদা দাড়িতে ভরা ওই বুড়োটে গালটা কেঁপে উঠলো একটু। ঠোঁটটাও কাঁপলো। প্রথম একটু। তারপর আরও একটু, আরও একটু—ধীরে ধীরে সারা মুখে সংক্রামিত হল সেই কাঁপুনি। যেন বুক পোড়া সলতে শেষবারের মত দপ করে হলে উঠল একবার। হেসে কেললেন শশধর। প্রবল উচ্ছ্বাসে নাতির মুখের কাছে হাততালি দিতে দিতে হেসে কেললেন। চোয়াল ভাঙা দাঁত পড়ে যাওয়া লাল মাড়ির এক বুড়োটে হাসির সঙ্গে এসে মিশলো দুধ দাঁতের কচি হাসি।

মুহূর্তে সব ভুলে গেলেন। ওই বুড়ী, ওই যুত্যা, এই সংসার, এই জীবন—সব কিছু। কি আর আছে এ পোড়ো জীবনে? এতটুকু ভবিষ্যৎ নেই। শুধু অতীত। আর ওর? ওই শিশুর? এতটুকু অতীত নেই—শুধু ভবিষ্যৎ। শুধু সম্ভাবনা। সরু সরু লোলচর্ম কঙ্কালসার হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন শশধর—‘আয় দাছ, আয়। আমার কাছে আয়।’

ছেলেকে স্বপ্নের হাতে ভুলে দিলেন সেজো-বোঁ। কী এক দুর্লভ সামগ্রীকে বুকে চেপে আকুল হয়ে উঠলেন শশধর। সশব্দে হাসলেন—‘বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্ দাছ আমার। সুখী হোক, সুখী হোক।’

পাঠকদের প্রতি

‘নতুন সাহিত্যে’ প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে সম্পাদকীয় মতামতের প্রবণতা আবিষ্কার করে সময় সময় কোন কোন পাঠক অভিনন্দন জানিয়ে, আবার কেউ কেউ বিক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি দেন। আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি ‘নতুন সাহিত্যে’ প্রকাশিত অনেক রচনাই—বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কমূলক রচনা—সম্পাদকীয় মতামত ব্যতিরেকেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং, বলা বাহুল্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে সম্পাদকীয় দায় সর্বত্র সমান নয়। সম্পাদক ‘নঃ সাঃ’

সমসাময়িক সাহিত্য

একালের চোখে--অচিন্ত্যশ ঘোষ । প্রকাশক—মিত্রালয়, কলিকাতা ।
দাম তিন টাকা ।

পনেরোটি প্রবন্ধের সংকলন 'একালের চোখে' । প্রবন্ধগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—লৌকিক গুচ্ছ এবং অলৌকিক গুচ্ছ । লৌকিক গুচ্ছের ভেতর দশটি প্রবন্ধ । আমাদের জীবনের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে লৌকিক গুচ্ছ । অলৌকিক গুচ্ছের পাঁচটি প্রবন্ধে ধর্ম, উৎসব, আচার অনুষ্ঠানকে উপজীব্য করা হয়েছে । সংক্ষেপে এই যে, অচিন্ত্যশ ঘোষ ১৩৬ পাতার ভেতর আমাদের জীবনের সদা-তরঙ্গিত মানসলোকের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন ।

আমার মনে হয় সে উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হয়েছে । সব কটি প্রবন্ধ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত । ফলে পারস্পর্য বিঘ্নিত হয়নি । একটি প্রবন্ধের উপসংহার অন্য প্রবন্ধে ধণ্ডিত হয়নি—সাধারণ ক্ষেত্রে যার সমূহ সত্যাবনা থাকে । কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে সংহত ও তীক্ষ্ণ না করে বক্তব্যকে এলোমেলো ভাবে উপস্থাপিত করেন এবং নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বক্তব্যের বিরোধী সম্ভাব্য যুক্তিগুলোকে যথাযোগ্য মূল্য না দিয়ে এড়িয়ে যান । আবার এমন প্রাবন্ধিকও দেখা যায় যার একটি প্রবন্ধের চিন্তা অন্য প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে ধিক্কৃত । উদ্ধৃতি এবং 'রেফারেন্সে' মুহূমান প্রাবন্ধিক পাঠকের কাছে কোন পরিচয় দিতে অসমর্থ হন । সুখের কথা, অচিন্ত্যশ ঘোষ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্যকে যুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল এবং তর্ক-মঞ্জুল করে নিজের এবং পাঠকের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছেন । 'একালের চোখে' তাই একালের একজন চিন্তাশীল মানুষের পরিণত মনের স্বাক্ষর ।

একালের যদি কোন সমস্যা আমাদের, আমাদের কেন, সমগ্র মানুষের জীবনকে আলোড়িত করে থাকে তা হল ব্যক্তি সমাজের সম্পর্ক । বলা ভালো, এই হল এ যুগের সমস্যা । এই সমস্যা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্নরূপে বারবার আমাদের কাছে আস্ত সমাধান দাবি করে । রাষ্ট্র-বিপ্লব থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক সংঘর্ষে এই প্রশ্নের ক্রুর ছায়া বর্তমান । আমাদের মানসদ্বন্দের চাবি এইখানে । অচিন্ত্যশ ঘোষ 'ব্যক্তি সমাজ এবং সংস্কৃতিকে' প্রথম প্রবন্ধের মূল্য দিয়ে প্রশ্নটিকে প্রাপ্য গুরুত্ব দিয়েছেন । এই সুলিখিত এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের আলোড়িত করবে । প্রবন্ধের সার্থকতাও বোধ হয় সেখানে ।

প্রবন্ধের সঙ্গে পাঠকের ভাবনার কতটা মিল ঘটল, সেটাই বোধ হয় আসল কথা নয়। আসল কথা হল, এই প্রাবন্ধিক পাঠকে কতটা ভাবিয়ে ভুলতে পারলেন, বন্ধুজলায় কতটা ঢেউ জাগল। সমাধান যেখানে নেই অথচ সমাধান বধন চাই-ই, তখন বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত একান্ত অপরিহার্য এবং মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তি স্মরণীয়।

ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কে লেখক যেসব তত্ত্ব উপস্থিত করছেন, তা সামগ্রিক ভাবে নিশ্চয়ই সত্য। এ কথা অনস্বীকার্য ফ্রেডের মতে ব্যক্তির বিকাশের সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব এইজন্য যে “Freud accepted the traditional belief in a basic disharmony between man and society as well as the traditional doctrine of the evilness of human nature. Man, to him, is fundamentally anti-social”. (Erich Fromm) এবং যেহেতু মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ফ্রেডের ধারণা স্ঠাণু। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিশ্চৈতন্য এবং অচেতনের কোন প্রভাব কি নেই ব্যক্তির বিকাশে? দ্বিতীয় কথা.—এ প্রশ্ন আলোচ্য প্রবন্ধে অঙ্গীকৃত না হলেও, বাঙালীর ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কে কি লেখকের কিছুই বলার নেই? লেখকের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে ‘ব্যক্তি’ বলে স্বয়ম্ভূ এবং অপরিবর্তনীয় কোন ঐশী কিম্বা দানবীয় সত্তা নেই। সমাজ সংস্কৃতি, পরিবেশ, অনুষ্ঙ্গ, অভিজ্ঞতা, বংশগত ধারা, এবং প্রাণধারণের প্রবাহের স্রোতে পড়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জটিল সত্তা হিসাবে জন্মলাভ করে। সেই ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। অগ্ন্যান্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আপন সত্তার সামগ্রিক প্রকাশই ব্যক্তির বিকাশ। তাই Reformation যুগ থেকে আজকের যুগ, স্বাধীনতার যুগ, ব্যক্তির যুগ।

আমার জিজ্ঞাসা অগ্নত। আমার মনে হয় রেলগাড়ি পতনের এবং যন্ত্রযুগ আরম্ভ হবার পর বাংলার জীবনে ব্যক্তির বোধের যে ধারণা জন্মলাভ করেছে এবং আজকের সংকটের মুখোমুখি যে বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার অন্তর্যঙ্গার তীব্র অনুভূতি সঞ্চারমান, তার কোন বিশ্লেষণ যদি থাকতো তবে আমাদের পরিবেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আরো নিগূঢ় হতো। পাঠক হিসাবে এ আমার আবেদন মাত্র। তাহলে সমগ্র পুস্তকের স্বরসঙ্গতি অক্ষুণ্ণ থাকতো এবং ‘একান্নবর্তী পরিবার প্রথা’র ওপর আলোক আরো গভীর ভাবে পড়ত। “অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী প্রথার বিলোপ

ঘটছে”, এবং “নূতন বাহনের সন্ধান শ্রেয়” সন্দেহ নেই। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যে ‘মড়া আগলানোর মত’ এমন গলিত প্রথাকে আঁকড়ে আছি আমরা, তা কি শুধু মাত্র অর্থনৈতিক কারণে? তার পিছনে কি কোন আত্মিক এবং আবেগের যোগাযোগ নেই? অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং অসমর্থ বিশ্বাস কি তার অন্ততম কারণ নয়? অন্য পক্ষে আদমসুমারির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা কোন মতে হ্রাস পায়নি। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা সব চেয়ে দুর্বল হওয়া উচিত ছিল কলকাতা এবং শিল্লাঞ্চলে। কারণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অল্লাধিক সুযোগ এখানেই। অথচ দেখা যাচ্ছে “উত্তরে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এমন কি রাজধানীর আশেপাশে চব্বিশ পরগণার শিল্লাঞ্চলে পর্যন্ত একান্নবর্তী পরিবার এখনও বেশ শক্তিশালী এবং উহার বিলোপের কোন লক্ষণ নাই।” (আমার দেশ) এই সবের কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের জীবনে অর্থনীতির প্রভাব প্রবল হলেও, গ্রামীণ প্রভাবে মানসলোক আচ্ছন্ন। অন্যপক্ষে কৃষিক্ষেত্র এবং চরিত্রহীন শহর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তাই আমাদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে আমূল বিপ্লব আগের মতন এখনও প্রয়োজনীয়।

আমি আগেই বলেছি, লেখকের সঙ্গে আমার কিম্বা আমাদের মতামতের কতদূর মিল ঘটলো, এ বিচার ভুচ্ছ। সব চেয়ে বড় কথা হল এই প্রবন্ধ আমাদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছে কিনা। এই দৃষ্টি থেকে ‘একালের চোখে’-কে বিচার করলে বোধহয় লেখকের প্রতি সুবিচার করা হবে এবং একথা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি আমার মত সাধারণ পাঠকের অনেক দিনের চিন্তার রসদ যোগাবে এবং আমাদের পরিবেশ চেতনাকে স্ফুর্ত করতে সাহায্য করবে।

রাম বসু

অন্তর্মুখ — জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক — অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা। দাম দু-টাকা।

ইদানীং যে কয়েকখানা বাঙলা উপন্যাস উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা পেয়েছে এবং যাদের বহু সংস্করণ প্রকাশের বিরল সম্মান মিলেছে, তাদের প্রধানতঃ দুটি চেহারা : উনিশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের বিরাটাকারের অনুরূপিতে বিশ শতকের

শেষার্ধের শুরুতে রচিত বাঙলা উপন্যাস, এবং কোন একটি বিশেষ অঞ্চল অথবা কোন বিশেষ পেশায় নিযুক্ত কয়েকটি চরিত্র নিয়ে রচিত ‘সমাচার উপন্যাস’। পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজার ছুঁইছুঁই করলেই তা যুগান্তকারী সৃষ্টি এবং ‘সমাচার সাহিত্য’ ধরনের কিছু লিখলেই তা বাস্তবধর্মিতার সার্থক রূপায়ণ রূপে স্বীকৃত। এই দুই আদলের উপন্যাসের লেখকদের সামাজিক মূল্যবোধের বালাই না থাকলে, ভাষা রুচিবান পাঠকের অসহ্য শিথিল মনে হলে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে অমার্জনীয় অসঙ্গতি থাকলে কিছুই আসে যায় না।

উপন্যাস আকারে বড় হলে অথবা তার প্রেক্ষিতে কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে বা পেশায় সীমায়িত থাকলেই দই কেটে গেল এমন কথা বলছি নিশ্চয়ই কেউ ভাববেন না।

গত কয়েক বছরে এই সব ‘যুগান্তকারী’ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত উপন্যাসও রচিত হয়েছে। যাদের লেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই বইগুলি নিয়ে বিশেষ কোন আলোড়ন হয়নি। কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ে বলা যায়, হওয়া উচিত ছিল। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অন্তর্মনা’ এমন আর একখানি উপন্যাস। ‘অন্তর্মনা’ যুগান্তকারী সৃষ্টি নয়, তবে নিঃসন্দেহে বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজক।

মানুষের দ্বৈত সংজ্ঞার একটি দিকের প্রতি চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী উপন্যাসগুলির পক্ষপাতিত্ব বড় বেশি প্রকট। মনে হয়, এই সব উপন্যাসের লেখকরা মানুষের সংজ্ঞার একটি দিক ভুলে গেছেন, অর্থাৎ মানুষের সংজ্ঞা ভুলে গেছেন। ‘অন্তর্মনা’ মানুষের সংজ্ঞার সেই উপেক্ষিত দিকটির সানন্দ স্বীকৃতি। প্রতিদিনের জীবন প্রবাহ থেকে নির্বাচিত যে সব নাটকীয় ঘটনা সাধারণতঃ কাহিনী গড়ে তোলে সে ধরনের ঘটনা ‘অন্তর্মনা’য় অনুপস্থিত। এই ছোট উপন্যাসটিতে প্রায় কিছুই ঘটছে না, অথচ এক নিগূঢ় অর্থে এর সুরটি নিদারুণ অশাস্ত। শুধু পরিচিত পথে একটু হেঁটে যাওয়া, একবার চোখ রাখা আকাশে বা একটি প্রিয় গাছের পাতায় বা কোন বাড়ির দেওয়ালে—এই সব সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়েছে যেন এক উত্তাল সমুদ্র। আর এই সমুদ্র একটি কিশোরের মন।

‘অন্তর্মনা’র প্রত্যেকটি চরিত্র একান্ত চেনা। অবশ্য আপন স্বাতন্ত্র্যে তারা বিশিষ্ট। স্কুলের শিক্ষকের ছেলে অনিন্দ্য প্রধানতম চরিত্র। মধ্য কলকাতার নিয়মমধ্যবিস্তৃত পাড়ার একতলার যে দুখানা ঘর তার কৈশোরের আশ্রয় সেখানে আলো-হাওয়ার কুপণতা নির্মম। এমন একখানা বই সে জীবনে পড়তে পারনি।

যাতে সে-ই প্রথম তার নিজের নাম সুন্দর করে লিখেছে। দেয়াল বেয়ে জল পড়ে আর একটুতেই সরু গলি নোংরা জলে ভেসে যায় বলে বাঙলা দেশের বর্ষণও তার ভালো লাগে না। সে সানন্দে লক্ষ্য করেছে, তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় তার ছোড়দিকে হাসলে বরাবরই সুন্দর দেখায়। শুনেছে, তার বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে তার মা ‘ভাজা ভাজা’ হয়ে গেলেন। গোপনে তদন্ত করে দেখেছে তার বাবা পাশের বাড়ি দাবার আজডায় ষাওয়ার নাম করে অসুস্থ শরীরে ছেলে পড়াতে যান। এই সব নিত্যান্ত দৈনন্দিন দেখাশোনার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত অসংখ্য অশান্ত ফেনশীর্ষ ঢেউ তার মনে আঘাত করে, তাকে এক টানে নিয়ে যায় কোন সুদূর অতলে, আর তখন তার সঙ্গী থাকে শুধু এক অনির্বচনীয় দুঃখ। অনিন্দ্যকে মাঝে মাঝে মনে হবে ‘পথের পাঁচালী’র অপূর্ণ নাগরিক সংস্করণ। কিন্তু সে আপন বিশিষ্টতায় অনন্ত। একশ চল্লিশ পাতার স্বল্প পরিসরে অনেক মানুষের ভিড়। অথচ প্রত্যেকটি চরিত্র—এমনকি ছু-চারটি কথায় যাদের উল্লেখ মাত্র আছে—একেবারে যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কবি হিসেবে পরিচিত। ‘অন্তর্মনা’ তাঁর প্রথম গল্প রচনা। প্রধানতঃ গীতিধর্মী বাঙলা কবিতায় একালেও ধাতব সুরের ঝঞ্ঝু স্বল্পভাষিতা বিরল। এই সব কারণে ‘অন্তর্মনা-’র কবি জ্যোতির্ময়ের গল্প রীতি লক্ষ্য করতে আগ্রহী ছিলাম। বইটি পড়ে তাঁর স্বল্পবাক স্পষ্টভাষিতায় তৃপ্তি পেলাম। অবশ্য তাঁর গল্প রীতি যে তৃপ্তি দিয়েছে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়টিও উল্লেখ করা দরকার যে অনেক খ্যাতিমান লেখকের মত জ্যোতির্ময়ও বাক্য গঠনে সচরাচর বৃত্ত ও অধ্ববৃত্তই রচনা করেছেন। শানিত সরলরেখা টানবার প্রচেষ্টা তাঁরও নেই।

সুধাংশু ঘোষ

আধুনিক ভারতের গল্প সংকলন। অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম্।
প্রকাশক—গণসাহিত্য ভবন কলিকাতা। দাম দু-টাকা।
অঙ্কুর গল্পগুচ্ছ। অনুবাদক—এ। প্রকাশক—গণসাহিত্য ভবন,
কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

কেরালার গল্পগুচ্ছ। অনুবাদক—ঐ। প্রকাশক—গ্রন্থলোক, কলিকাতা।
দাম বারো আনা।

বাংলা সাহিত্যে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে এ কথা বোধ হয় মিথ্যে নয় যে, আমরা ইংরেজি-ফরাসী-রুশ সাহিত্য সম্পর্কে যে পরিমাণ ধর রাখি, আমাদের স্বদেশীয় প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে তুলনায় তার খুব কমই জানি। এ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল যেন স্তিমিত, অবশ্য তার কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, এ অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাহিত্যলুপ্তরাগীদের দায়িত্ব এ দিকে নগণ্য নয়।

বোম্বায়া বিশ্বনাথম দক্ষিণ ভারতের লোক। তবু এ দিকে তাঁর সচেতন দৃষ্টি আমাদের সকলেরই প্রশংসার দাবি করে। বিশেষ করে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, তা অনেকের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ করতে পারে। শুধু অনুবাদ প্রচেষ্টাতেই তাঁর এই সম্প্রীতি সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাভাষাতে মৌলিক রচনাসৃষ্টিতেও তিনি তৎপর।

আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অনুবাদ-প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সবগুলি অগ্রগণ্য ভাষাকেই তাঁর লক্ষ্য করেছেন। “আধুনিক ভারতের গল্প সংকলনে” চোদ্দটি ভাষার চোদ্দটি গল্প তিনি অনুবাদ করেছেন তা ছাড়া “কেরালার গল্পগুচ্ছ” আটটি গল্প, আর “অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ” সাতটি। তেলেগু তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষা। তা ছাড়া অন্যান্য গল্প তিনি মূল থেকেই অনুবাদ করেছেন কিনা, তেমন কোন উল্লেখ নেই। তবু, আমার ধারণা মতে এই জাতীয় সচেতন উদ্যম এই প্রথম।

তাঁর এই অনূদিত গল্পগুলি থেকে ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের মনে যে ধারণা জন্মায়, তা হল ভারতের কোন ভাষার সাহিত্যই আর আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা থেকে মুক্ত নয়। কাশীর থেকে কন্ঠাকুমারিকা পর্যন্ত সাহিত্যে এখন এক নতুন চেতনার তরঙ্গ প্রবাহিত। হয়তো লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসা প্রত্যেকটি গল্পে সমান গভীর নয়, এমন কি কোন কোন গল্পে অতিমাত্রায় রোমান্টিকতার আমদানি করা হয়েছে (তেলেগু ভাষার গল্প “প্রতীক্ষা”), কোন কাহিনীর সমাপ্তিতে অভিনবত্বের প্রাধান্য (মারাঠী গল্প “বেড়ী”), কোথাও সমস্তার রূপদান অগভীর (কেরলের গল্প “বোঁমা”), তবু এ কথা

সত্য, পরিবর্তিত মূল্যবোধের যুগে নিজ নিজ সাহিত্যে এদের নিজস্ব একটা মূল্য আছে। সামগ্রিকভাবে দেখলে বলা যায়, এরা সাহিত্যের দরবারে নতুন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছে। তবে আমি বলব, অনুবাদক তাঁর গল্পনির্বাচনে যদি আরো সতর্কতার পরিচয় দিতেন, তা হলে সেট সেট ভাষার গল্পের মান সম্পর্কে আমাদের মনে আরো উন্নত ধারণা জন্মাবার পক্ষে সাহায্য করতেন। অন্তত জীবনের নবতর দিক প্রতিফলন করবার পক্ষে একাধিক গল্প তিনি এখানে অনুবাদ করছেন। এ সব গল্পের শিল্পবিচার ষাট হোক, তারা মোটামুটিভাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে কেরলের গল্প থেকে “যোসেফের ভাগ্যে গির্জা” “ভালোবাসা ও ত্যাগের সাওয়াল” কিংবা “পিয়ন” গল্প ধরা যেতে পারে। ঠিক তেমনি আরো কয়েকটি গল্পের নামোল্লেখ করা যায়, যেমন “ঝড়” “মুক মানুষ” “প্রদীপ শিখা” (অক্টোবর গল্পগুচ্ছ থেকে), “সৈনিক” “অন্তরালে” (আধুনিক ভারতের গল্প সংকলন থেকে)। কিন্তু এদের মাঝ থেকেও কিছু কিছু গল্প কখনো মূলের দুর্বলতার জন্ত, কখনো অনুবাদকের শক্তিহীনতার জন্ত সাহিত্য-সৌন্দর্য-কে ক্ষুণ্ণ করেছে। অনুবাদ কর্মকে বোন্মানা বিশ্বনাথম্ একটি মহৎ কর্তব্য হিসেবেই গ্রহণ করছেন, তবু এ ব্যাপারে যে মুনশীয়ানু এবং যথাযথ প্রবাদ প্রবচন ও ভাষা ব্যবহার আবশ্যিক, অনেকাংশেই তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সব গল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব সমস্তা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনার স্পর্শ রয়েছে। তাতে গল্পগুলি জীবন-সচেতন প্রমাণিত হবে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই রকম জীবনপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

একটা কথা বোঝা গেল না, “আধুনিক ভারতের গল্প সংকলনে” নেপালী ভাষাকে গ্রহণ করার পশ্চাতে যুক্তি কোথায়। আবার আসামী ভাষা তাঁর এই গ্রন্থ থেকে একেবারে বাদ গেছে।

শেষ কথা এই, আমাদের আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্য-সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠতা আসা প্রয়োজন। ভিন্ন ভাষা থেকে নিজ-নিজ মাতৃ-ভাষায় সাহিত্য-অনুবাদ-প্রসঙ্গে আমাদের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত। শুধুমাত্র সেই কারণেই, প্রসঙ্গটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্ত, বোন্মানা বিশ্বনাথম্ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁর কাছ থেকে-ও আমরা ভবিষ্যতে আরো প্রতিনিধিত্ব-মূলক গল্পের সার্থক বাংলা-অনুবাদ আশা করবো।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

আচার্য যদুনাথ স্মরণে

উনিশ শতকে বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, আচার্য যদুনাথ সরকার ছিলেন তার শেষ প্রতিভা। তৎকালীন বিশ্বসমাজের চিন্তার গভীরতা, বহুমুখী প্রতিভা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ উত্তরাধিকারসূত্রে যদুনাথ সরকার পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। দীর্ঘদিনব্যাপী মননমগ্ন সাধনা দিয়ে তিনি ইতিহাসচর্চার যে ধারাটিকে গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, ইতিবৃত্তকার, বিশেষ শাখার গবেষক ও ইতিহাসতাত্ত্বিক। ইতিহাসচর্চায় এই তিন শ্রেণীরই অবদান থাকে। আচার্য যদুনাথের কৃতিত্ব ইতিবৃত্তকথনে বা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কোন নতুন তত্ত্বের সংযোজনেও নয়, তাঁর কৃতিত্ব হল কঠোর পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণার দ্বারা ভারত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের (তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল মোগল যুগের শেষ অধ্যায়) ওপর আলোকপাত করা। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণায় তিনি অনন্যই শুধু নন, অগ্রগণ্যও। তাঁর গবেষণার আগে এই যুগের ইতিহাস রচনায় আমাদের সহায় ছিল মুসলমান ঐতিহাসিকদের কিছু রচনা এবং কয়েকজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের বই, যেগুলিকে ইতিহাস না বলে দিনপঞ্জী বলাই অধিকতর সঙ্গত। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে আচার্য যদুনাথ এই প্রায়াস্ককার যুগটিকে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্যনির্বাচন, ঘটনা-সংস্থান ও ঘটনাবিশ্লেষণে সে অতলান্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা তাঁর মধ্যে পাই, তা তাঁকে Ranke বা Acton-এর সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাঁর গবেষণা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তসংকলনেই নিবদ্ধ ছিল না; রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোর বাইরেও শাসনতাত্ত্বিক বিবর্তন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের যে ধারা প্রবাহমান ছিল, আচার্য যদুনাথের গবেষণায়, তার সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াও উপস্থিত।

আচার্য যদুনাথের গবেষণাকৃতির সম্যক পরিচয় অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর গবেষণার পদ্ধতি ছিল সুসংবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক। ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রথম যে স্তরটি অর্থাৎ তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যনির্বাচন, সেখানে আচার্য যদুনাথ প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। ইতিহাসের অজ্ঞাত ও ছলভ যে সব তথ্য বিভিন্ন

ভাষায় লিখিত গ্রন্থ, দলিল, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত স্মৃতিলিপি প্রভৃতির আকারে লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল, সন্ধানী দৃষ্টি, অনন্তসাধারণ অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মোচ্ছ্বাসের দ্বারা তিনি সেগুলির উদ্ধারসাধন করেছেন ও সুনিপুণ শিল্পীর মত আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এ জন্য তাঁকে পর্তুগীজ, আরবী, ফার্সী, মারাঠা প্রভৃতি ভাষা শিখতে হয়েছে, ঐতিহাসিক উপকরণ সমৃদ্ধ বহু জায়গায় বহুবার ভ্রমণ করতে হয়েছে, ব্যক্তিগত ভাবেও কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। কিন্তু কোন বাধাই তাঁর একাগ্র সাধনায় শৈথিল্য আনতে পারেনি। তাঁর এই সাধনার ফলশ্রুতি হচ্ছে তাঁর রচিত বিপুল গ্রন্থসম্ভার, যা ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় চিরদিন গৌরবের আসন অধিকার করে থাকবে। ঔরঙ্গজীব, মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মোগল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আচার্য যদুনাথের প্রতিভাদীপ্ত আলোচনা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। শিবাজী ও মারাঠা জাতির ইতিহাস রচনায় তিনি প্রচুর নতুন তথ্য সংযোজিত করেছেন। তাঁর চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তন সম্পর্কে বিশ্লেষণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক পরম সম্পদ। শেষ জীবনে তিনি ভারতবর্ষের সামরিক প্রণালীর বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর “India through the Ages” বইখানিতে ভারত ইতিহাসের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐতিহাসিক রচনা ছাড়াও আচার্য যদুনাথের সাহিত্য-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। আশা করি অচিরেই সেগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হবে।

আচার্য যদুনাথের বিশ্লেষণে যেটা প্রধান ভ্রুটি বলে আমাদের মনে হয়েছে, তা হল যে তাঁর ইতিহাসবোধ যথেষ্ট ব্যাপক নয়। তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে, তাই ইতিহাসের বহির্ভূতই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ এবং তাঁর গবেষণায় সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কোন প্রতিফলনই নেই। ইতিহাসের গতির রূপ ও পরিণতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতবিরোধই থাকুক না কেন, আজকের জগতে এ সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বসম্মত যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতই ইতিহাসের প্রধান উপাদান এবং এগুলি ছাড়া কোন ইতিহাসই পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু আচার্য যদুনাথের গবেষণায় এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক আলোড়নের দিকটি একেবারে উপেক্ষিত। তাই আর্য সভ্যতার অদ্ব্যুত্থানে তাঁর শুধু চোখে পড়েছে “ordered

imagination in literary and artistic creation,” বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় দিকটাই শুধু তাঁর নজরে পড়েছে, সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি কোন আলোকপাত করেননি। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের বিচারে এই বোধ থেকেই এসেছে নেতার প্রতি মোহ। এবং এই জন্তই আমার মনে হয় শিবাজীর চরিত্র চিত্রণে আচার্য যদুনাথ খানিকটা আতিশয্য সঞ্চার করেছেন। তিনি মারাঠা জাতির উত্থানের উৎস খুঁজেছেন শিবাজীর মধ্যে এবং ব্যক্তির প্রতি মোহবশতঃই শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সামন্ততন্ত্রের বিকাশকে তিনি জাতীয়তাবোধের বহিঃ-প্রকাশ বলে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে সামন্ততন্ত্র আর জাতীয়তাবাদের বাহন ছিল না, ছিল তার চরম শত্রু। তৃতীয়তঃ, আচার্য যদুনাথের ইতিহাসবোধকে খণ্ডিত করেছে তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তিনি ছিলেন হিন্দু revivalist এবং হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য সবসময়েই তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তাই তিনি ভারতের মুসলমান যুগকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের দিকটাই বড় হয়েছে, মিলনের দিকটা তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাম্প্রদায়িকতাবোধ কোন সময়ই তাঁর রচনার তথ্যবিকৃতি ঘটায়নি। এইখানেই নিষ্ঠাবান গবেষক হিসাবে তাঁর সততা লক্ষ্যণীয়। চতুর্থতঃ, আচার্য যদুনাথের বিরাট মনীষা ও জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাধনা সত্ত্বেও তিনি ইতিহাস ব্যাখ্যার কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপ সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ আমাদের দিতে পারেননি। ইতিবৃত্তসংকলন ও তথ্যসুসন্ধানী গবেষণার স্তর ছাড়িয়েও মানব ইতিহাসের বিবর্তনের বিরাট রূপ ও প্রকৃতি ধাঁচ চিন্তায় বিম্বিত, সার্থক ইতিহাসদ্রষ্টা তিনিই। ইতিহাসের গতি ও পরিণতির ব্যাখ্যায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অবদানের দৈন্ত শোচনীয়। এর কারণ কি তাঁদের বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি না চেতনার ব্যাপ্তির অভাব? অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইতিহাসের রূপ ও প্রকৃতিবিচার কি ঐতিহাসিক মাত্রেরই দায়িত্ব? সত্যিই এটা ঐতিহাসিক মাত্রেরই দায়িত্ব নয়, কিন্তু মহান ঐতিহাসিকেরই দায়িত্ব। আর সবচেয়ে বড় কথা হল সে, আচার্য যদুনাথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই দাবি কি নিতান্তই অযৌক্তিক?

সমস্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, আচার্য যদুনাথের অবদান ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সাধনা পরবর্তী যুগের ইতিহাস সাধকের কাছে

জীবন্ত প্রেরণাস্বরূপ। ভারতীয় ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার দুর্গম পথে প্রথম পথিকৃত-এর সম্মান নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রাপ্য।

যুগাক্ষেপের রায়

সাহিত্য সৃষ্টির গোড়ার কথা

‘কেন লিখি’—এর উত্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, “জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অতীতের তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার ভাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শকার্থক ব্যাপক সমাধি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অতীতের দান করি।” তাহলে লেখবার মূল প্রেরণা হল আমার অনন্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অতীত মনে সঞ্চারিত করা এবং লেখা ও লেখকের মধ্যে পাঠকের ভূমিকা হল পরোক্ষভাবে নিজের জীবনের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার বিনিময়। ‘বিনিময়’ শব্দটির প্রয়োগ এখানে একটু শিথিল, কেননা শকার্থ ধরলে আদান-প্রদান দুই-ই বোঝায়—কিন্তু সব পাঠকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন লেখকের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ নেই। তবু ব্যক্তিগতভাবে না হোক সমষ্টিগতভাবে পাঠকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সব লেখকই সচেতন। এবং এই সহৃদয় পাঠককেই তাঁরা তাঁদের জীবন-কাহিনী শোনান।

সুতরাং এ থেকে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, একজন লেখকের কাছে অভিজ্ঞতার দায় রয়েছে। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা, কিন্তু সার হল বিষয়। আমাদের জীবন যত সাধারণ হোক, সবার জীবনেই অল্প-বিস্তর দু-একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা থাকে, যা সচরাচর ঘটে না। আমাদের সামান্য জীবনে যত অনন্ত ঘটনা তা আমাদের মনে স্মৃতি হিসেবে সঞ্চিত থাকে, কিন্তু একজন লেখকের কাছে তাই সৃষ্টি-প্রেরণা। তাঁর অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যরূপ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শাস্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। সুতরাং একজন লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি-সঞ্চয় খুবই অল্প, তার অভিজ্ঞতা সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বজনীন। প্রথম চৌধুরী ‘আত্মকথায়’ লিখেছেন যে, তিনি পাঁচ বছর বয়সে প্রেমে পড়েন এবং সেই বাল্যপ্রেমের স্মৃতি তিনি মুক্ত করেন ‘নীললোহিতের আদিপ্রেম’ গল্পটি লিখে। ব্যক্তিস্মৃতি

রূপান্তরিত হল সাহিত্যে। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যে মহৎ চরিত্রায়ণের পেছনে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক্রীণ অথবা প্রবলভাবে বিদ্যুত—অভিজ্ঞতায় নিস্তাপ স্মৃতিই সৃষ্টির উপাদান। অবশ্য লেখকভেদে রূপান্তরের পরিমাণ নির্ভর।

এ অভিজ্ঞতার দায় মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। লেখক তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন এবং ভাবনার উৎস অভিজ্ঞতা। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার সীমা স্বজন করবার অধিকার কারো আছে কিনা সে কথা বিচার্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু ‘পদ্মানদীর মাঝি’ লিখে গেছেন, তারাশঙ্কর “নাগিনী কন্ঠার কাহিনী” অতএব অন্তত অভিনবত্বের দরুন আমাকে বার্ষপুরের শ্রমিকদের কাহিনী লিখতে হবে, এ ধারণা অশ্রাব্য। আজকের জীবনে উপন্যাসের উপকরণ অল্প অতএব শুধু সেই কারণেই অপরিচিত আদিবাসীদের জীবন-কাহিনী আশ্রয় করতে হবে, এরকম যদি কেউ ভাবেন তাহলে আমরা তাঁর সাহিত্যিক সততায় সন্দেহ করব। বস্তুতঃ, তার দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাস ও ভূগোল কোনটাই বিদ্যুত হয় না। অজানা বিষয়-অবলম্বনে কল্পনা-বিলাসের চেয়ে পরিচিত পটভূমিতে গভীর উপলব্ধির কথা কি বেশি মূল্যবান নয়? তাছাড়া একই বিষয় বা পটভূমি অবলম্বনে বহু লেখক লিখলেই বা ক্ষতি কি?—লেখক তো ভিন্ন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতা তো স্বতন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক জীবন-ধারায় একান্তবর্তী পরিবারের চিত্রণ তো রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়ের রচনাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু পটভূমির ঐক্যের দরুন সেগুলি এক না একঘেয়ে? অথবা কেউ কি একথা বলতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর এই পটভূমি অবলম্বনে গল্প লেখা নিরর্থক? তাই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সম্ভাবনাময় লেখকও যখন ‘অভিজ্ঞতার দায়’ নামক প্রবন্ধে বলেন আজকের দিনে বাঙলা উপন্যাসে ‘পটভূমির পরিবর্তনের শ্লোগান ত্রায়তই উঠেছে’ তখন ব্যথিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। প্রসঙ্গতঃ, আরেকটি কথা মনে পড়ল। বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্বের দরুন যে সব সাহিত্য সৃষ্টি নগদ-বিদায় পেয়ে থাকে, তার সাময়িক মূল্য সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, এসব উপন্যাস পাঠান্তে “আমরা ভূগোল না পড়েও এখন খানিকটা করে ভূগোল শিখে ফেলতে পারি, ইতিহাস না পড়েও উনিশ শতকের বাঙলার সামাজিক ইতিহাস সহজে দু-কথা শিখে ফেলেছি—মায় কিছু ওষুধ-বিষুধের নাম পর্যন্ত।” যদি কোন উপন্যাস পাঠান্তে এধরনের

কোন জ্ঞান হয়, তবে তা নেহাতই উপজাত। সুতরাং উপন্যাসের আলোচনায় তার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? বোরোভিনোর যুদ্ধকাহিনী পাঠই যদি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয় ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ পড়ব না, কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বই পড়ব। যদিও আমরা জানি ঐ উপন্যাসটি লেখবার জন্য টলস্টয়কে বহু বছর ইতিহাস পড়তে হয়েছিল এবং যুদ্ধকাহিনী বর্ণনায়ও টলস্টয়ের ‘sense of details’ বিস্ময়কর।

অভিজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করবার বিপদ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধেই দেখিয়েছেন। তখন ‘sense of details’ অবাস্তব খুঁটিনাটিতে পর্যবসিত হয় (নাগাজীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা বিষয়ে তাঁর মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

সবচেয়ে বড় কথা, অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন ইস্কুল নেই। সেটা একান্তভাবেই ব্যক্তির শিক্ষা, রুচি, গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং পরিবেশ নির্ভর। প্রত্যেক দিনই আমাদের বাইরের জীবনের সংস্পর্শ আসতে হয়। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের সংস্পর্শ অথবা সংঘাত থেকেই অভিজ্ঞতার জন্ম। মার্কসবাদীরা অন্য প্রসঙ্গে যাকে বলেছেন ‘life process of the brain’ এখানেও দেখি বাইরের ঘটনা মনে প্রতিকলিত হয়ে যে প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় তা-ই অভিজ্ঞতার ভিত্তি। সুতরাং ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় তার সামাজিক পরিবেশের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তাই ‘অভিজ্ঞতাকে’ সামাজিক সঙ্গতি দান করলে সে সমৃদ্ধ হয় একথা বলবার সার্থকতা কোথায়?

সীমান্ত সেন

যন্ত্র ও মানুষ

আধুনিক বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাবপরিধি ক্রমবর্ধমান। মাত্র স্থলরুচির প্রমোদবিধানের আশু উদ্দেশ্য নিয়ে এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও ভুরি ভুরি ছবি উঠেছে, আজো উঠছে। এরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে এমন ছবিও আজকাল মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে যাকে আর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের শিল্প-স্বীকৃতি বিলম্বিত হলেও ক্ষোভের কারণ নেই। কেননা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এমন কতগুলো ছবি এদেশে উঠেছে, যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। এ কালের কনিষ্ঠতম শিল্পমাধ্যমকে যথার্থ শিল্প করে তোলার এই ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়াসে যে কতিপয় তরুণ প্রতিভাবান আত্মনিয়োগ করেছেন,

বলাই বাহুল্য, ঋত্বিক ঘটক তাঁদের মধ্যে তরুণতম। সুবোধ ঘোষের সুবিখ্যাত গল্প ‘অযাত্তিকে’র চিত্রায়ণে এই তরুণ পরিচালক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহেই অভিনন্দনযোগ্য।

বাঙলাদেশে চিত্রনির্মিতির ইতিহাসে এল, বি, ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনালের লাহিড়ী ভাতৃদ্বয়ের নামও এই সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অর্থবিনিয়োগে সাংস্কৃতিক দায়িত্বকে ব্যবসায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে এঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার তুলনা বিরলদৃষ্ট। বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে এঁদের অপরিমিত দানের কথা আমরা বারংবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করব।

‘অযাত্তিকে’র কাহিনীর নায়ক বিমল, উপনায়ক জগদল। জগদল হচ্ছে একটি ভাঙা ঝরঝরে ট্যাক্সি, বিমল ট্যাক্সি-ড্রাইভার। জড় ও মানবের সম্পর্কটিকে কেন্দ্র করেই চিত্রকাহিনী গড়ে উঠেছে। যন্ত্র যে শুধু যন্ত্রই নয়, তার সঙ্গেও ‘যে একটি মানবিক ও অযাত্তিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে,—তাই হচ্ছে এ কাহিনীর কথাবস্তু। এবং এ কাহিনীর রূপায়ণে অনিবার্যভাবেই সম্প্রসারণের প্রয়োজন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব, রূপকল্পের বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকবিজ্ঞানের অভিনবত্ব ‘অযাত্তিকে’র চিত্রনাট্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য রচনার ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রের চলতি রীতি গ্রহণ করেননি। কাহিনীর নাট্যবস্তুকে আপাতনাটক বা অতিনাটকের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্তর্লীন নাট্যরসকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করেছেন পরিচালক। ঘটনার অভিঘাতগুলো বলা হয়েছে অমুচ্চ-সুরে, প্রতীকী ব্যঞ্জনা—বাস্তবতার ধর্ম রক্ষা করেই। মূল কাহিনীর পরিপূরক পার্শ্বঘটনাগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। শুধুমাত্র কাহিনীর নায়ক বিমল ও উপনায়ক বিমলের গাড়িখানার পারস্পরিক সম্পর্কটিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই ঘটনাগুলো উদ্ভাবিত। ছবিতে যারা প্রবহমান গল্প চান, পরস্পর-অসংপৃক্ত পার্শ্বঘটনাগুলো অনিবার্য ভাবেই তাঁদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখে। এবং বোধকরি ‘অযাত্তিকে’র ব্যবসায়িক বৈফল্যের কারণ এখানেই। এ চিত্রনাট্য পদ্ধতি স্বভাবতই দুঃসাহসী। রচনা-শৈলীর মৌলিকতায় ‘অযাত্তিকে’র চিত্রনাট্য নিঃসন্দেহেই অভিনব। সংক্ষিপ্ত সংলাপ ও সংযত বিজ্ঞাসের গুণে ‘অযাত্তিকে’র চিত্রনাট্য যে শির-সাফল্য লাভ করেছে, তাতে বিকল্পিত করা চলে না।

‘অযাত্তিকে’র কথাবস্তুর চিত্রায়ণ যথেষ্ট দুর্বল। জড় ও মানুষের হৃদয়হীন সম্পর্কের মধ্যেও যে হার্দ্যযোগ সম্ভব এবং জড় লোহপিণ্ডের মধ্যেও যে



মানবিকতা আরোপ করে তাকে ভালবাসা চলে, তার ওপর অভিমান, রাগ ও অমুরাগের বিচিত্র প্রকাশ চলে, একথা গল্পে বিশ্বাস্য করে তোলা যতটা সহজ, ছবিতে ততটা নয়। কেননা জড়বস্তুটাকে যখন আমরা জড়বস্তু হিসাবে চোখের সামনে দেখি, তখন চোখের সাক্ষ্যই বড় হয়ে ওঠে, একতরফা অনুভূতির প্রতিকলনে মানুষটার প্রতি হয়তো আমাদের সহানুভূতির অন্ত থাকে না, কিন্তু অনুভূতিহীন অনড় জড়বস্তুটাকে অনুভূতিশীল ভাবা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। গল্পে জগদল আলাদা একটি চরিত্র, কিন্তু ছবিতে জগদল জগদলই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে বিমল ও জগদলের সম্পর্কটিকে ছবিতে যতখানি বিশ্বাস্য করে তোলা সম্ভব, পরিচালক প্রায় ততখানিই করেছেন। এবং এই কারণেই বাঙলা ছবির মানের সঙ্গে তুলনা করে ‘অযান্ত্রিক’কে নির্দিষ্ট ভাবেই অননুসাধারণ ছবি বলা চলে।

কয়েকটি ক্রটির কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। প্রথমতঃ, ছবির প্রারম্ভেই মামা ও ভায়েকে কেন্দ্র করে যে প্রগল্ভ হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়েছে, এ ছবির মেজাজের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ বৈমান। যে স্থিতি-বোধ ছবির প্রায় সর্বত্রই আছে, একেবারে প্রথমাংশে কেন যে তা নেই ভেবে বিস্মিত হতে হয়। যে গৃঢ় হৃদয়বেগের সূত্রটির ওপর ছবিখানি বিধ্বত, প্রথম সিকোয়েন্সের অপরিচ্ছন্ন কাজে তা বহুলাংশেই ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এ ছবিতে দুটি নাটকীয় চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে হাসি নামক অর্ধপরিচিতা মেয়েটির বিদায় গ্রহণ; দ্বিতীয়তঃ, একেবারে শেষ দৃশ্যে, যখন ভগ্নাবশিষ্ট গাড়িটির বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গগুলো গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। হাসির বিদায় দৃশ্যটির তুলনার শেষ দৃশ্যটি জ্ঞান, এবং যথার্থ ক্লাইমাক্স হয়ে উঠতে পারেনি। হাসির বিদায় দৃশ্যটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু করুণ এবং তীব্র। ধাবমান ট্রেন, শব্দ আর হাওয়ায় মেয়েটির স্বর ডুবে গেল, জানা হল না, কে এই মেয়েটি, কী তার ঠিকানা। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের একটি ছোটগল্পের শেষাংশের সঙ্গে ছবছ মিলে যায়। ট্রেন চলে গেল। শূন্য প্র্যাটফর্মের ওপর ব্যর্থ বিমল। বিরাট একটা বেদনাময় কাহিনীকে কত স্বল্পপরিসরে, অথচ কত গভীর ভাবে বলা হল। একটা অব্যক্ত হাহাকার ও মর্মেতদী কারা নেপথ্যে থেকেও হৃদয় মথিত করে। এই নাট্য মুহূর্তের পর স্বভাবতই ছবির গতি ম্লান, আবেগ বিস্মিষ্ট, কিছুটা পুনরাবৃত্তির ক্লাস্তি, এমন কি শেষ মুহূর্তেও চিত্রকাহিনী আর ঠিকমত ক্লাইমাক্স ছুঁতে পারেনি।

আর একটা ক্রটির কথা উল্লেখ করা চলে। জড় ও মানবের অন্তর্গত সম্পর্কটিকে পরিস্ফুট করার মানসে পরিচালক একটি উন্মাদ চরিত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার জীবনকেন্দ্র একটি ভাঙা গামলা। বিমলেরও জীবনকেন্দ্র ভাঙা গাড়িখানা। শিল্পে কারিগরি বুদ্ধির সচেতনতা থাকে, কিন্তু তা থাকে নেপথ্যে। যা শুধু আভাসিত হলেই ভালো হত, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার আয়োজন হয়েছে। এই অতিপ্রকটতার ফলে গামলা-কেন্দ্রিক উন্মাদের ক্রিয়াকলাপ ছবিতে প্রায় উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে। এখানেও আরো একটু সংযমের প্রয়োজন ছিল। এবং তাহলেও বোধ করি সঙ্গতি রক্ষা হত।

ক্রটি সত্ত্বেও একথা অবশ্যই মানতে হবে, ‘অযান্ত্রিকে’ ঋত্বিক ঘটক যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন, বাঙলা চিত্রজগতে তা প্রায় একটি ঘটনা। সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবে বাঙলা চিত্র জগতে এক নবজাগৃতির সূচনা হয়েছে। শুধু মাত্র একক প্রতিভার বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে নবজাগৃতির এই ধারাটি অকালে শুকিয়ে যাবে না, এ প্রত্যাশার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। বিবিধ দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে কর্মোন্মোগ গড়ে উঠছে, ঋত্বিক ঘটকের ‘অযান্ত্রিকে’র মত ছবি নিঃসন্দেহেই তার শক্তি জোগাবে।

‘অযান্ত্রিক’ ছবিতে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, তার অংশভাক হিসাবে এ ছবির অগাধ কলাকুশলীদের কর্মিষ্ঠ সততাকেও শ্রদ্ধা জানাতে হয়। অভিনয়ে ব্যক্তিক কৃতিত্বের চেয়েও গোষ্ঠীগত অভিনয় সাফল্যেরই প্রশংসা করতে হয় বেশি। পাঞ্জাবী ড্রাইভার, মুড়িউলী, মিস্ত্রী, প্রভৃতির চরিত্রায়ণ নিখুঁত এবং প্রশংসনীয়। কাজল গুপ্তের অভিব্যক্তি-প্রধান চরিত্রাভিনয়ও অনবদ্য। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যদিচ নিখুঁত, তবু মনে হয়, এ চরিত্রে নতুন মুখ থাকলেই ভালো হত। তাছাড়া বিমলের চরিত্র-পরিকল্পনায় পরিচালক কিছুটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। বিমলকে গল্পে ততটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি, যতটা মনে হয়েছে ছবিতে। আরো স্বাভাবিকতার পৌঁচ দিয়ে এ চরিত্রকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলা সম্ভব ছিল, এবং বোধ করি উচিতও ছিল।

ছবিতে ক্যামেরার কাজ অনবদ্য। রাঁচির বহির্দৃশ্যগুলি সুগৃহীত। চিত্রশিল্পী দীনের গুপ্তের অসাধারণ নৈপুণ্য যে-কোন অধঃমনস্ক দর্শককেও মুগ্ধ করবে। দৃশ্যসজ্জার কাজে রবি চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তার নিখুঁত কাজের ফলেই অনবদ্য বহির্দৃশ্যের পরও দৃষ্টি কোথাও বিড়খিত হয় না। মোটর

স্ট্যাণ্ডের দৃশ্যটির' পরিকল্পনায় দৃশ্যসজ্জাকর এমন স্বাভাবিকতা ও বাস্তবসঙ্গতি আনতে পেরেছেন, যার জন্য রবি চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে হয়। স্টুডিও-র কৃত্রিম পরিবেশ কোথাও প্রকট হয়ে ছবির সঙ্গতি লঙ্ঘন করেনি।

শব্দগ্রহণের কাজ এঁদের তুলনায় অপরিচ্ছন্ন। বস্তুতঃ এ ছবির সব থেকে বড় ত্রুটি এর শব্দগ্রহণ।

নেপথ্য কলাকুশলীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব সঙ্গীত পরিচালক ওস্তাদ আলী আকবরের। এফেক্ট মিউজিক সৃষ্টিতে ইনি আশ্চর্য পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। যন্ত্রদেহী জগদলের অব্যক্ত ভাষাগুলি এফেক্ট মিউজিকের সাহায্যে বোধ্য করে তোলা হয়েছে। এবং বোধ করি আবহ সঙ্গীতের সুপ্রয়োগের ফলেই জগদলের জড়ধর্ম অনেকটাই লুপ্ত হতে পেরেছে। অবশ্য, এফেক্ট মিউজিকের অতিব্যবহার না ঘটানোই উচিত ছিল। বিশেষতঃ তীব্র এফেক্ট মিউজিক কখনো কখনো অতি-প্রধান হয়ে উঠেছে। সাধারণ আবহ-সঙ্গীত অনেক স্থলেই ওস্তাদজীর নেপথ্য অবস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে কান চোখের পথ অনুসরণ করে না। ছবিতে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহারে পরিমিতিবোধ বোধ করি এই জন্যেই অতি প্রয়োজনীয়।

এ ছবিতে পরিচালক প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। গোরস্থানের ক্রশটিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে পরিচালক অর্থদ্যোতনা বাড়িয়েছেন। বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যধর্মের সুসঙ্গত মিল ঘটিয়ে পরিচালক 'অযান্ত্রিক'কে একটি শিল্প করে তুলতে পেরেছেন। ত্রুটি আছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নিঃসংকোচে বলা চলে ঋত্বিক ঘটক তাঁর প্রথম ছবিতেই প্রমাণ দিয়েছেন, যে তিনি বিশিষ্ট আঙ্গিকের অধিকারী। তাঁর স্টাইল নিজস্ব, তাঁর দৃষ্টিকোণ মৌলিক। শিল্প কর্তব্যের মহৎ দায়িত্ব মেনে নিয়েই ইনি কাজে নেমেছেন। এঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

বিমল ভৌমিক

‘পুতুল খেলা’ প্রসঙ্গে

কিছুদিন আগে বহুরূপীর ‘পুতুল-খেলা’ দেখলাম। ইচ্ছা অচরিতার্থ হয়ে ছিল বহুদিন। সুযোগ ঘটল এত আকস্মিকভাবে যে স্থান সংগ্রহ করতে হল সর্বোচ্চ আসনে এবং সবচেয়ে কম দামের টিকিটে। তাতে দেখা ও

শোনার কোন রকম হেরফের ঘটেনি বলেই মনে হয়। 'নিউ এম্পায়ার' হলে উঁচু-নীচ সব দর্শকের জন্মেই সমান বর্টন-ব্যবস্থা। অভিনয়ের প্রতিটি দৃশ্যরস্তুর সময়েই কাশি, জুতো আর চেয়ারের শব্দ বেশ বিরক্তি জাগায়। তবু আগাগোড়া নির্বাক তন্ময়তায় নাটকটি দেখে গেলাম। বুলুর টুকিটাকি দ্রব্যসামগ্রী কিনে সংসার সাজানো দিয়ে নাটক শুরু হয়েছিল। শেষ হল ভূমিকম্পের মত প্রবল গা-ঝাঁকুনির সঙ্গে এদিক-ওদিক স্তব্ধ ও ভয়ংকর ধ্বংস রচনা করে। আলো জ্বলল। পথে বেরিয়ে এলাম। ভালো-লাগায় মন ভরে আছে। কিন্তু এ-এক অন্তরকমের ভালো-লাগা। অনেক নাটক দেখে ভালো লাগে, আর কিছুক্ষণ পরের রেস্টোরী, চায়ের কাপ, গুলতানি, ট্রাম, বাস, সিগারেটের ধোঁয়া, মন থেকে তা মুছে দেয়। আর এ ভালো-লাগাটা ভয় দেখায়, ভাবনা যোগায়, মনটাকে এঁটেল মাটির মত আঁকড়ে থাকে।

কেন ভালো লেগেছে? অভিনয়ের অপূর্বতার জন্মে? সেটা তো বটেই। তৃপ্তি মিত্রের তিন ঘণ্টা ব্যাপী অভিনয়ে কখনোই মনে হয়নি তিনি বুলু ছাড়া আর কেউ। পলকে পলকে আত্মনিগ্রহ আর আত্মানুসন্ধানের স্বন্দর মধ্যে দিয়ে ক্ষণকালের একটি মানুষকে চিরকালের মহত্তর মানবিক মূল্য-বোধের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। অভিনেত্রী হিসেবে এদেশে তাঁর তুলনা বিরল। থিয়েটারকে ফিল্মের মত পোর্টেবল আর্ট করে তোলার সুযোগ-সুবিধা কম বলেই হয়তো পৃথিবীর যে সব দেশ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দেখে বিস্মিত হয়েছে, তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হওয়ার সৌভাগ্য তাঁদের হল না। শম্ভুবাবুর নির্দেশনায় অনেক গভীরতার স্বাদ পাওয়া গেছে। পরাণের সাথে মরণ খেলার কবিতাটিকে কী অসাধারণ বিচক্ষণতায় তিনি জুড়েছেন বুলুর জীবন-মরণের সংকটের সঙ্গে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শম্ভুবাবুকে নতুন লাগল। তপন জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ বড় জটিল। টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা'র কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে' দেখা গেছে বহির্জগতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান বা উচ্চাভিলাষ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় চরিত্রের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা গভীর, দৃঢ়মূল। কিন্তু অন্তর্জগতের কোন গভীর বা মহত্তর উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় এদের চিত্তের অনেক মালিন্য, দৈন্য, অহুদারতা ও আধিপত্যের আদিম আকাঙ্ক্ষা। রঁলা এ-জাতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা! সেই মানুষ যারা 'afraid to listen to his own

heart'। একই সঙ্গে ভালো ও মন্দ, নিজ'ন ও নির্মম একটি জটিল চরিত্র উদ্ঘাটনে শম্ভুবাবুর যথেষ্ট চিন্তা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যাঁরা আমার আগে ও পরে একাধিকবার নাটকটি দেখেছেন তাঁরা শম্ভুবাবুর পরবর্তী অভিনয়ের আরও প্রশংসা করলেন। সমগ্র নাটকের মধ্যে বড় মর্মস্পর্শী চরিত্র, আমার মনে হয়েছে, ডাক্তার। যত সংক্ষিপ্ত, তত সুন্দর। যেন এক অগ্রিময় প্রাণ দীর্ঘকাল জীবনের পূর্ণতার সন্ধানে দিশেহারা হয়ে বেঁচে অবশেষে রূপান্তরিত হয়েছে একটি ক্ষীণ, অশুষ্ক, তীক্ষ্ণ, করুণ, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখায়। এই চরিত্রের আগে অনেক কথা জোড়া যায়। পরে অনেক কথা। আমরা পেয়েছি মাঝখানের ধ্বংস-টুকু। একটা সময়ের সমস্ত রকম ধ্বংস ও পতনের প্রতীকের মত। কুমার রায় আশ্চর্য স্বাভাবিক করেই প্রকাশ করেছেন চরিত্রটিকে। অভিনয় বা নির্দেশনা প্রসঙ্গে আরও প্রশংসা করে বলা যায়। কিছু ক্রটি বিচ্যুতির কথাও। যেমন গণেশের মূর্তিটা। যেমন অমর গাঙ্গুলীর অভিনয়ে হাঁটা ও কথা বলার গতি কখনো বেশি লঘু এবং কখনও বেশি দ্রুত হওয়ার কলে কেউপদর যথার্থ বয়সটি কিছুতেই ধরা পড়ে না। কিন্তু এ সব কথা থাক। যে কারণে 'পুতুল খেলা'র অভিনয় ইত্যাদি এতটা সার্থক না হলেও আমি বলতাম 'আমার ভালো লেগেছে' এবার সেই বড় ও বিশেষ কারণটিতে পৌঁছনো থাক।

'রক্তকরবী'র সময় থেকেই বহুরূপীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দিকপরিবর্তনের আভাস লেগেছে। Reality নামক বস্তুকে তাঁরা বাইরের দিক থেকে খোঁজার সহজ পথ ছেড়ে ভেতরের দিক থেকে বোঝার ও অনুসন্ধানের ছুরকি ত্যাগিদ অনুভব করেছেন। 'কেবল ভক্তি, কেবল টং, কেবল' দেখানে-পনা' নয়। 'যে সব সমস্যা আমাদের কর্মপথে আমরা পার হয়ে এসেছি' সেগুলো নয়। নাটকের গরজে অতি-নাটকীয় ফরমুলা-কথা ও শেষ পর্যন্ত দৈববাণী দিয়ে শেষ করা বাস্তবতার কিছু gross আর grotesque আড়ম্বর নয়। তার বদলে জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য ও সংকটকে রূপ দেওয়ার ও তারই মধ্যে নিজদের গভীর আত্মোপলব্ধিতে উদ্ভূত হবার ইচ্ছা। নিছক নয়, এই নিতান্ত প্রয়োজনেই তাঁরা এমন নাটক চান যা শেক্সপীয়র, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বা গ্রীকযুগের সোফোক্লিসের হলেও কতি নেই। সে-কারণেই 'দশচক্রে'র পরেও আবার তাঁদের ইবসেনের শরণাপন্ন হতে হল।

তারই ফল এই ‘পুতুল খেলা’। ইবসেন যেহেতু বল্লালসেনের দেশের নাট্যকার নন, তার ফলেই এদেশের কোন কোন নাট্যকারের কাছ থেকে তার কপালে নিন্দাবাদ জুটল।

অথচ একটু গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই বোঝা যেত ‘পুতুল খেলা’র নাট্যকার যে দেশেরই বাসিন্দা হোন, ‘পুতুল খেলার’ সমস্যাটি এদেশের মাটিতেও ডাল-পালা ছড়িয়ে আজ ক্রমশ আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। পূর্ণ আত্মবিকাশ, অধিকার ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন ও প্রত্যয় যখন এদেশের চারদিক থেকে দরজা-জানলা আঁটা পদািনশীন সংসারেও সূর্যালোকের মত সবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস ‘যোগাযোগ’ ও গল্প ‘স্ত্রীর পত্রে’ নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কের এই গুরুভার সংকটের প্রতি তাঁর সতর্ক, সজাগ ও সত্য দৃষ্টির আলোকপাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কালে তবুও রক্তবিনিময়ের অনুশাসন বা সংস্কার নিমূল হয়নি। তাই সম্ভাবন ছিল প্রচণ্ড বাধা ও বন্ধন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাসের পিঠের ওপর দিয়ে প্রলয় পরোষি জল গড়িয়ে গেছে। ধনতন্ত্রের নিজের হাতে গড়া কল-কল্লা ধনতন্ত্রেরই কল্লিকে দিয়েছে মুচড়ে। সমুদ্রপারের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। বিজ্ঞানের পা, মাটি ছেড়ে আকাশ, আকাশ ছেড়ে এগিয়ে চলেছে মহাজগতের দিকে। বিশ্ব আর বস্তুতার স্থান নেই। এই অবসরে মেয়েরাও রান্নাঘরের হাতা-খুস্তি কোলে হাত লাগিয়েছে বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় কাজে। সমাজ বাধ্য হয়েছে তাকে অর্থনৈতিক অধীনতা দিতে; অর্থাৎ যা স্বাবলম্বনের সম্বল। সংসারে, সমাজে ও সভ্যতার এই নতুন পরিবেশে মেয়েরা তাদের বহির্জীবনেও গৃহজীবনের মূল্যবোধকে এক করতে চাইলেন।--“ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী”।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহন্তর-বৃহন্তর’ গল্পে রূপায়িত হল প্রেমের এক নতুন ও তীক্ষ্ণ স্বরূপ। ঐ কাহিনীর নায়িকা দুটি মৃত ও দুটি জীবিত সন্তানের জননী। ব্যর্থ বেঁচে থাকার কষ্টে যেদিন তার আত্মা আর্তনাদ করে উঠল সেদিন সংসার ও সম্ভাবনাবোধের খাঁচার গলিত অন্ধকারের জগৎ থেকে পালিয়ে বাইরের সেবাত্রতের আলোয় দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন, ‘ছিলাম যন্ত্র, আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে।’ মানিকবাবুর দর্পণ, শহরবাসের ইতিকথা

উত্থাপিত আরো কিছু উপন্যাসে এই সংকটেরই সোজা ও বাঁকা দুটো দিকেরই পরিচয় আছে। নরনারীর যৌথ প্রণয় সেখানে আদিম অঙ্ককারে উপভোগ্য নয়, দুটি বিপরীতধর্মী হৃদয়ের সংঘাতে পীড়িত, বিপর্যস্ত। আরো আধুনিককালে অসীম রায়ের উপন্যাসে, রাম বসুর দুটি কাব্যনাট্যে ভালবাসার এই অসামঞ্জস্য নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্তর্জগতের সংকট আজ আন্তর্জাতিক। ক্রমশ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও ঘনতায় এর ব্যাপ্তি ঘটছে। অর্থনৈতিক পুষ্টিতেও একান্বর্তী পরিবার টিকছে না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, ও আন্তর্জাতিক জগতের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা উচিত তার তীরে তীরে ভাঙন। মানুষের মৌলিক অনুভূতি মূল্যবোধগুলো অসাড় হয়ে উঠেছে, অনুভূতিহীন অবকাশহীন মানুষ উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে চলেছে যন্ত্রের দিকে, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, জড় জগতের যাবতীয় সুখ-সন্তোষের মালিকানার দিকে। আর অন্তরালে এত উন্মাদনা, উত্তেজনার মধ্যেও decentralised মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠছে বিচ্ছিন্ন, একক। প্রচণ্ড অসীম নির্জনতা ছাড়া, অন্তর্নিহিত গভীর অবসাদ ছাড়া কোন অমল সত্য নেই। সমস্ত মানবিক সম্পর্কেই যান্ত্রিকতার ছায়া পড়েছে; দুটি নরনারীর অন্তরঙ্গ পবিত্র প্রণয় সম্পর্কও বাদ পড়েনি তার এলাকা থেকে। যতই মর্মান্তিক হোক, এ তবু সত্য। আর সত্যকে প্রকাশ না করে উপায় নেই। বহুরূপী নাট্যপ্রয়াসের মারফৎ এই মহৎ ও মর্মান্তিক সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁদের সত্যের অন্বেষণ সার্থক হোক।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

চিঠি-পত্র

আধুনিক চলচ্চিত্রের সমস্যা

বছর বিশেক আগে পুডফকিনের মত চলচ্চিত্র জগতের কর্ণধারও চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ আশা পোষণ করেছিলেন, বছর খানেক আগে সাত্র'রের মত বোকা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিক্রপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আজকের দিনে, বিদগ্ধমহল সর্বজনীন স্বীকৃতি না পেলেও, অনেকেই চলচ্চিত্রের শিল্পকৃতিত্বে বিশ্বাসী, শিল্পসজ্জাবনায় আশাবান। বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞাপনী সমালোচনার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে সূচিস্থিত আলোচনা শুরু হয়েছে—ভাতেই তার প্রমাণ। সম্প্রতি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীবিমল ভৌমিকের আধুনিক চলচ্চিত্রের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

লেখকের মূল বক্তব্যটি অনেকটা এঠি রকমের—মহৎ শিল্পের সঙ্গে আধুনিক সমাজ জীবনের যোগ নিবিড় হবে—এবং তা যদি না হয় তবে শিল্প মহৎ হবে না। শিল্পীকে দায়িত্ব নিয়ে সমাজ সত্যকে তার শিল্পকৃতির মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। আঙ্গিকসিদ্ধ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে এঠি আধুনিক সমাজের ভাব সত্য প্রতিফলিত হয়েছে—'অপরাজিত'তে আংশিকভাবে হয়েছে এবং 'পরশ পাথরে' একেবারেই হয়নি। অতএব বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে সত্যজিৎ রায় আমাদের হতাশ করেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম অনুসারে অবশ্য আধুনিক চলচ্চিত্র জগতের সমস্যাগুলির নানা দিকের আলোচনাই অভিপ্রেত ছিল কিন্তু লেখক মোটামুটি সত্যজিৎ রায়ের ওপরই গনোনিবেশ করেছেন, এবং তাঁর শিল্পকর্মের আলোচনায় ত্রুটি হয়েছে, জীবন ও শিল্পের সম্বন্ধ সম্পর্কে মৌলিক জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে।

কিন্তু আধুনিক সমাজ-মানসের সঙ্গে শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের আসল চেহারাটি কি হবে—এবং শিল্পের মহত্ব সেই সম্পর্কের পরে নির্ভরশীল হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে কোন রকম সরলীকরণের আশ্রয় না নেওয়াই উচিত। শিল্পকে সমাজ মানসের আয়নার সঙ্গে তুলনা করবার বেলা, সে তুলনাকে আক্ষরিক অর্থে সত্য মনে করবার বিরুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। রচনা নির্বিশেষে শিল্পীর প্রত্যেকটি কর্মে সমাজ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন অব্বেষণ করে বেড়ানো পণ্ডশ্রম। এককালে রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি কবিতায়, প্রতিটি নাটকে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সমাজ সত্যের প্রতিফলন খুঁজতে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা চলেছিল আজ তার অসঙ্গতি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের

কথা মূলতবী রইল—সম্প্রতি স্থানীয় একটি চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং আলিয়াস্ জাঁসের যুগ্ম উদ্যোগে কলকাতায় Lamorrise-এর “The Red Balloon” ছবিটি দেখানো হয়। সে ছবির পটভূমিকা আধুনিক কাল, কিন্তু মধ্যযুগের কাল হতেও কোন বাধা ছিল না। সে ছবির মহত্ব একটি কল্পনাপ্রবণ শিশুমনের কাব্যিক রূপায়ণে—এর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর বিশেষ কোন মনোভাবের পরিচয় নেই বলেই কি এ ছবি শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে? কোন মধ্যবিত্ত কেরানীকে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র করে যে কোন ছবি তৈরি করলেই ‘মধ্যবিত্ত আজ অবক্ষয়ের পথে’—এই সামাজিক সত্যকে ফুটিয়ে তুলতেই হবে—শিল্পীর কাছে এমন দাবি সঙ্গত নয়।

জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ নির্ণয়ের বেলা আমার মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। সমসাময়িক সমাজ সত্যকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরবার দায়িত্ব কেউ অস্বীকার করবে না কিন্তু শিল্পের মহত্বকে এই দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল মনে করলে শিল্পের ষষ্ঠার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। একথা বললেই কলাকৈবল্য তত্ত্বকে সমর্থন করা হয় না—শিল্পকে ভঙ্গি-সর্বস্ব বলে মনে করা হয় না। শিল্পের মাধ্যমে মানবজীবনের কোন না কোন সত্যকে গভীরভাবে চিত্রিত করাষ্ট শিল্পীর কর্তব্য—কেবল রূপসৃষ্টি নয়—কিন্তু সেই জীবন সত্য ক্ষেত্র নিরপেক্ষভাবে আধুনিক সমাজ সত্য হবে—এটা স্বীকার করিনে।

লেখক বিতৃপ্তভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন আধুনিক জীবনের সমস্ত সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কোথায় কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোথায় হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সত্যজিৎ‌র তিনটি ছবির মধ্যে যে ছবিতে আধুনিক সমাজ মানসের ছাপ সবচেয়ে কম প্রত্যক্ষ তাকেই লেখক আধুনিক সমাজ সত্য রূপায়ণের জন্য অভিনন্দিত করেছেন। ‘পথের পাঁচালী’তে গ্রাম জীবনের যে আশা ও আশাভঙ্গের ছবি আঁকা হয়েছে তাকে বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর জীবনের ছবি বলে মনে করবার কোন কারণ আছে কি? লেখক নাই মনে করুন, বিভূতিভূষণের মূল রচনাতেও কেবল গ্রাম্যজীবনের বহিঃস্থ নিয়ে ভাব-বিলাস নেই—সেখানেও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আশা এবং আশাভঙ্গ ছুইকেই ষথেষ্ট যত্ন সহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই আশা এবং আশাভঙ্গ মিলিয়ে গ্রাম জীবনের যে কাব্য তাই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ভিন্নক্ষেত্রে ভিন্নধর্মে। ‘পথের পাঁচালী’তে সত্যজিৎ রায় গ্রামকে কোথাও “নির্বিকার” করে আঁকেননি—যেমন নিরাসক্ত করে এঁকেছেন, কাশী, কলকাতা

মনসাপোঁতাকে ‘অপরাজিত’তে। নিশ্চিন্দীপুর আর মনসাপোঁতার চিত্রাংগে ভিন্নক্ষেত্রে ভিন্নপ্রকৃতির দৃশ্যনির্বাচনে সত্যজিত রায়ের মনোভঙ্গি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়নি কি? নিশ্চিন্দীপুরের কাশবন, আকাশজোড়া কালো মেঘকে খুঁজে পাওয়া যায় না মনসাপোঁতার শূন্য প্রান্তরে। ‘পথের পাঁচালী’তে পটভূমিকাকে মনে হয় সহানুভূতিপূর্ণ, ‘অপরাজিতে’তে নিষ্ঠুর।

‘অপরাজিত’-কে আমরা কিছুটা পরিমাণে জীবনভিজ্ঞাসায় জটিল ভাবে পাঠি এবং সেই কারণেই বিদেশী সমালোচকদের কাছে এ ছবি ‘more intricate’ আখ্যা পেয়েছে। কিন্তু ‘অপরাজিত’ ছবিতে যে সমস্তকে রূপায়িত করা হয়েছে, তার চেহারাটা এ কালের ইলেক্ট্রনিক্স মূল প্রকৃতিতে খানিকটা সর্বকালীনতার আভাস আছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ এবং সে ব্যক্তিকে অকীয় ইচ্ছায় গড়ে তোলার ইচ্ছা—তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অবশুস্তাবী বন্ধজনিত সমস্তা বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর সমস্তা নয়। ‘অপরাজিত’ ছবিতে এই সমস্তার অবশুস্তাবিতাকে নিষ্ঠুর ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং এ সমস্তার কোন সরল সমাধান করা হয়নি। তবে এ সমস্তা অপুকে কবলিত করতে পারেনি, সেখানেই সে অপরাজিত।

‘পরশ পাথর’ সম্পর্কে লেখকের অভিযোগ সবচেয়ে তীব্র। এ ছবিতে নাকি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এবং মধ্যবিত্তের অবক্ষয়কে এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়নি। লেখকের প্রথম অভিযোগ অগ্রাহ্য—দ্বিতীয় অভিযোগ স্বীকার্য। কিন্তু (লেখক ঠিকই অনুমান করেছেন, এ প্রশ্ন উঠবেই) মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়কে তুলে ধরা হয়নি বলেই কি এ ছবিকে ‘শুধুই গল্প’ পর্যায়ে আনোদ-বিতরণী (আনোদ অবশ্য খুব বিতরণ করতে পারেনি) অন্তঃসারশূন্য ছবির পর্যায়ে ফেলতে হবে? ‘পথের পাঁচালী’ সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন—“জীবন সম্পর্কে কোন মন্তব্য নয় কোন সিদ্ধান্তও নয়, ‘পথের পাঁচালী’ এক জীবনযাত্রারই প্রতিক্রিয়া” তেমনি তাঁর স্বীকার করা উচিত ছিল ‘মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে কোন মন্তব্য নয়, কোন সিদ্ধান্তও নয়, ‘পরশ পাথর’ আধুনিক নাগরিক জীবনের ওপর এক অভিনব তির্যক দৃষ্টিপাত।’ এবং সেটুকুই ‘পরশ পাথর’কে ‘শুধুই গল্প’-এর উর্ধ্ব স্থান দিয়েছে। লেখক যাঁই মনে করুন ‘পরশ পাথরের’ মূল সুর আটায়ারের; প্রসঙ্গতঃ মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবচিত্র তাতে সন্নিবেশিত, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বেশি পরিস্ফুট, কিন্তু ‘রিয়ালিজম’ ‘কান এবং ‘ফ্যান্টাসির’ সংমিশ্রণ এখানে Miracle in Milan-এর মতই সঙ্গত

(Miracle in Milan-কে নির্জলা fantasy বলা যায় না)। লেখক এক জায়গায় লিখেছেন সত্যজিৎ রায় হাস্যরস সৃষ্টিতে সগর্ভ নন, করুণ রসসৃষ্টিতে পটু, আবার বলেছেন ‘পরশ পাথর’ এক আশ্চর্য হাসির ছবি ছাড়া আর কিছু নয়, এদিকে বলেছেন চালির মত তিনি হাসাতে হাসাতে কাঁদাতে পারেন না। এসবের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি ধরা পড়ে না কি? আবার তিনি রস সংমিশ্রণের পক্ষ-পাতী নন, তাঁর মতে ছবি শুধু কমেডি, নির্জলা ফ্যাক্টসি কিংবা শুধু বাস্তবচিত্র। কিন্তু চ্যাপলিনের ম’সিয়ে ভাঙ্কে লেখক নিজেই তো নির্জলা কমেডি বলতে নারাজ, বলা সম্ভবও নয়। ম’সিয়ে ভাঙ্কে নিছক fun, তীব্র ব্যঙ্গ, গভীর বেদনাবিধুরতা সবই সন্নিবিষ্ট হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। ম’সিয়ে ভাঙ্কের সঙ্গে ‘পরশ পাথরের’ তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পসৃষ্টিতে ট্রাজেডি-কমেডির মধ্যে ভাববধূর সম্পর্ক নয় এটাই আমার বক্তব্য।

শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বিচারে দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এবং সামগ্রিক বিচারে আমাদের স্বীকার করেই নেওয়া উচিত চলচ্চিত্র আজ শুধু আমোদ বিতরণের উপায় হয়ে নেই, চতুর শিল্পীর আঙ্গিকের খেলা দেখাবার সহজ পথ হয়ে নেই, এর মধ্যে আমরা জীবন-স্পন্দন অনুভব করছি। আইজেনস্টাইন, পুতফকিন, কস্তোর শিল্পসিদ্ধি কেবল আঙ্গিকগত নয়, ডি সিকা, রসেলিনি, কুরুসোয়া, সত্যজিত রায়ের ছবি সংবেদনবিহীন, ভাষাসর্বস্ব, সারশূন্য কৃতিত্ব নয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকৃতিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও এবং পৃথিবীর চলচ্চিত্রকৃতির পর্যালোচনা করে চলচ্চিত্রের সং শিল্পসত্তাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা দেশের চলচ্চিত্রের শিল্পমান নিয়ে নিশ্চিত হবার সময় এখনও আসেনি। এবং সে চিন্তার কারণ কেবল মাত্র বিষয়বস্তুগত নয়, অনেকটা পরিমাণে আঙ্গিকগতও বটে। বাংলা ছবি আঙ্গিকের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে একথা মনে করতে পারলে সুখী হতাম কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়। বহুরূপী অসামান্য নাট্য প্রচেষ্টার ফলেও সাধারণ বাংলা নাট্য জগতে এখনও চলছে স্থলতার রাজত্ব। সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকৃতিত্বও সাধারণ বাংলা ছবির মূলগত চরিত্রে আশানুরূপ পরিবর্তন আনেনি। প্রচুর পরিমাণে বহিদৃশ্য সমাবেশ করলেই ছবি visual art হবার সম্মান অর্জন করবে আমাদের দেশের শিল্প-অনভিজ্ঞ চিত্র-নির্মাতাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে। তার ফলে চটের আকাশ, কাগজের ফুল আর ইলেকট্রিক বাষ্পের চাঁদ তারার বদলে আমরা মাঝে মাঝে পাচ্ছি আসল জিনিসের ফটোগ্রাফ। একেই আঙ্গিকসিদ্ধি বলে মনে করে

আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি কিন্তু তাতে সাধারণ ছবির শিল্পমান এক পাও এগোবে না। যথেষ্ট বিনয়ী মন নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের লেখা পড়ে ছবি দেখে ভাষা আয়ত্ত্ব করবার দায়িত্ব এখনও পালন করা হয়নি। বিষয়বস্তুর কথা না তোলাই ভালো। যে চিত্রনির্মাতাকে (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত) বেতারে আলোচনায় মস্তব্য করতে শুনি ‘সস্তায় জনগণকে আমোদ বিতরণ করাই হল চিত্র-নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য’ তাঁর কাছ থেকে গভীর জীবন-বোধ আশা করা অরণ্যে রোদন।

একজন তরুণ শিল্পীর কাছ থেকে আমরা সম্ভাবনার উজ্জ্বল একটি ছবি পেয়েছি। ‘অযান্ত্রিকে’র ক্রটি-বিচ্যুতি নগণ্য নয়, কিন্তু এ ছবিতে শিল্পনিষ্ঠার বলিষ্ঠ ছাপ আছে। কিন্তু বৈশ্বযুগের ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার পাকচক্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনার কি পরিণতি হয় তা আমরা নিয়তই দেখছি। নেশার সঙ্গে যারা পেশার মিল করতে চায় বারবার পেশায় আঘাত পেলে সে নেশার জাত বাঁচিয়ে রাখা সহজ নয়। দর্শক-রুচির পরিবর্তন চাই, চাই বেঁচে থাকবার উপকরণ সম্পর্কে নিশ্চিত নির্ভর। মহৎ শিল্পের সমস্তা আজ অশান্ত সামাজিক সমস্তার সঙ্গে তাই জটিল-ভাবে জড়িত। শিল্পের গুণাগুণের সঙ্গে আধুনিক জীবন সমস্তার এ এক ট্রাজিক সম্পর্ক। এ সব সর্বগ্রাসী সমস্তার সমাধান ছ-একজন প্রতিভাবান শিল্পীর একক সৃষ্টিতে নয়, শিল্পদৃষ্টিবিহীন পরিচালকদের নিষ্ফল উপদেশ-দানেও নয়, কিন্তু ‘আধুনিক জীবন অনিবার্য ব্যর্থতা-বোধ ও গ্লানি থেকে যে মুক্তির পথ খুঁজছে সে অন্বেষার সমাধান’ একদিন হবে লেখকের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমরা আশা পোষণ করবো।

কলিকাতা-২৬

ঋষি গুপ্ত

লেখকের বক্তব্য

ঋষিবাবুর প্রথম অভিযোগ, প্রবন্ধের শিরোনামে অল্পসারে আধুনিক চলচ্চিত্র জগতের নানা দিকের আলোচনা অভিপ্রেত ছিল, তা হয়নি। অভিযোগ স্বীকার্য। আমার প্রবন্ধটিতে আধুনিকতার সমস্তা ছাড়া আধুনিক চলচ্চিত্রের আর কোন সমস্তাই যথোপযুক্ত আলোচিত হয়নি, এ ক্রটির উল্লেখ নিঃসন্দেহেই অভিনন্দনীয়।

ঋষিবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ, এবং এইটিই সব থেকে মারাত্মক অভিযোগ, আমার

আলোচনাটিতে আধুনিক সমাজমানসের সঙ্গে শিল্পের পারস্পরিক সঙ্কল্প নির্ণয়ে এবং শিল্পের মহত্ব সেই সম্পর্কের ওপর কতটা নির্ভরশীল এ বিচারে সরলীকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সমালোচক বলেছেন,—‘রচনা নির্দিশেষে শিল্পীর কর্মে সমাজ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন অন্বেষণ করে বেড়ানো পণ্ডশ্রম।’ এ পণ্ডশ্রমে আমিও নারাজ। বস্তুতঃ ‘প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে’র কথা আমি ভুলক্রমেও উচ্চারণ করিনি। দুয়ে আর দুয়ে চার হয়, তেমনি আধুনিক সমাজ মানসের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনের ওপর শিল্পের মহত্ব নির্ভর করবে, এমন অদ্ভুত প্রতিপাত্ত আমার লেখা থেকে কী করে আবিষ্কৃত হল, এইটেই আশ্চর্য। বরঞ্চ সরলীকরণের প্রতি অশ্রদ্ধার বশেই আমি বলেছি, জীবন পলায়নপর। ভয়ংকর অস্থিরতার আবহাওয়ার মধ্যেও সন্ধিৎসু শিল্পীরা হার মানেন না। যিনি শক্তিমান শিল্পী, তিনি এই খণ্ডিত জীবন থেকেও এক সম্পূর্ণতর জীবন উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারেন। আমার এ বক্তব্যের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি বলেই সমালোচককে বিস্মিত হয়ে লিখতে হয়েছে,—‘আশ্চর্যের বিষয় এই, সত্যজিতের তিনটি ছবির মধ্যে যে ছবিতে আধুনিক সমাজ-মানসের ছাপ সবচেয়ে কম প্রত্যক্ষ, তাকেই লেখক আধুনিক সমাজসত্য রূপায়ণের জন্ত অভিনন্দিত করেছেন।’—জীবনের মিশ্র ও জটিল বিস্তার থেকে জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক উপলব্ধিতে পৌঁছানোই আধুনিকতার অঙ্গিষ্ট—একথাই তো আমি বিশ্বাস করি। ‘পথের পাঁচালী’র সব থেকে বড় কৃতিত্ব, এই অন্বেষণ। গ্রামকেন্দ্রিক হয়েও, আপাতগীতিময়তা সত্ত্বেও এই অন্বেষণ আছে বলেই ‘পথের পাঁচালী’ আধুনিক মনকে ছুঁতে পেয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর জীবনের ছবি বলে যদি একে স্বীকার করতে না চান কেউ আমার পক্ষে প্রমাণ হাজির করা সম্ভব নয়, শুধু বলতে পারি, ছবির ‘পথের পাঁচালী’ আর যাই হোক, ‘গ্রামজীবনের কাব্য’মাত্র নয়।

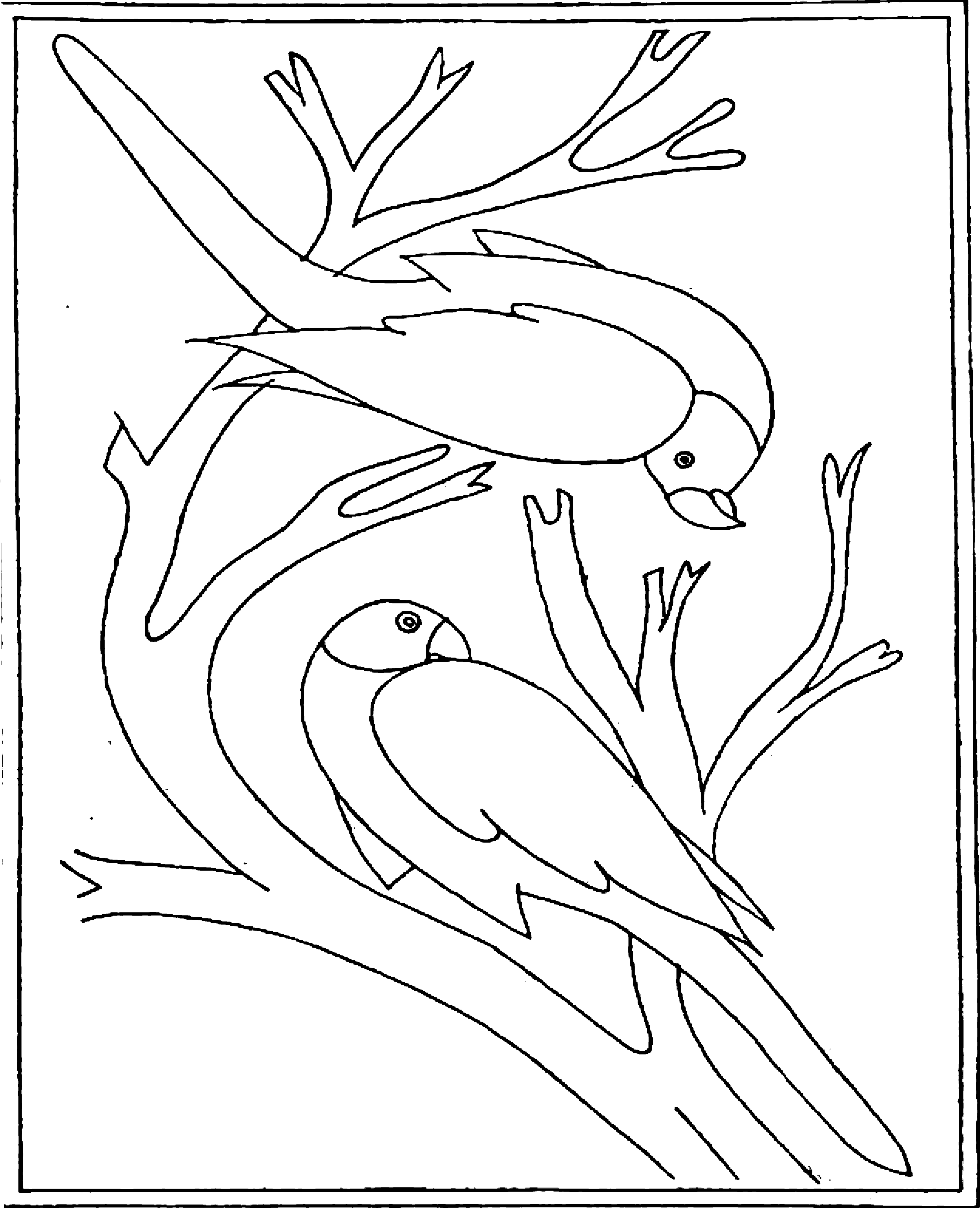
অপু অপরাজিত কিসে—এ নিয়ে আমি সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। ধ্রুববাবুর মতে ব্যক্তিকে স্বকীয় ইচ্ছায় গড়ে তোলার অভিলাষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের অবশ্যস্তাবী দ্বন্দ্রে অপু কবলিত নয়, তাই সে অপরাজিত। এ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য কেননা ‘অপরাজিতে’র অপু পারিপার্শ্বিককে পরাজিত করেছে, অন্তত ছবিতে একথা প্রমাণিত হয়নি। তা ছাড়া, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত গ্রীক নাটকের যুগ থেকে আমরা দেখে আসছি। আসলে বিংশ শতকীয় চরিত্র বলতে আমি যা বুঝি, ধ্রুববাবুর সঙ্গে তার প্রচুর তফাৎ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

স্বন্দ কিংবা আর্থনৌতিক সংকট ইত্যাদি জাতীর কতগুলো লেবেল এঁটে
 আধুনিকতার চারিত্র্য বুঝতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনাই প্রবল। এবং যে
 সরলীকরণের দায় লেখক আমার কাঁধে চাপিয়েছেন, অজ্ঞাতসারেই সেই
 সরলীকরণের অলাতচক্রের কাঁদে লেখক বাধা পড়েছেন। তিনি বলেছেন
 ‘পরশ পাথরের’ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এমন
 অভিযোগ অগ্রাহ্য। কেন অগ্রাহ্য, জবাব দেননি। তাঁর মতে, ‘পরশ পাথর’
 আধুনিক নাগরিক জীবনের ওপর তির্যক দৃষ্টিপাত। এ মন্তব্যও প্রমাণের অপেক্ষা
 রাখে। আসলে, আমার বক্তব্য ছিল, ‘পরশ পাথরে’ উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার
 ফলে রসবিভ্রান্তি ঘটেছে। সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি নাকি রসসং-
 মিশ্রণের পক্ষপাতী নই, কিন্তু জবাব খোঁজেননি, ট্রাজেডি-কমেডির মধ্যে ভাদ্র
 বধূর সম্পর্ক না থাকলেও বিবিধ সঞ্চারী ভাবের ঐক্য সত্ত্বেও উভয়ের স্থায়ী ভাবের
 ধর্ম কেন আলাদা হয়। ‘গোল্ড রাশে’ চ্যাপলিনের প্রিয়া প্রতীকার উল্লেখ
 এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে রসসংমিশ্রণে গৌড়ামির প্রতি আমার পক্ষপাত
 নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে হান্তরস বা করুণরস কোনটাই কেবলমাত্র কোন একটি
 শুদ্ধভাবে ওপর দাঁড়ায় না, বিভিন্ন মিশ্রভাবে রসপরিণতিতেই তার স্থিতি।
 ‘পরশ পাথরে’ সঞ্চারী ভাবের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার ফলে রসপরিণতি বিক্ষিপ্ত
 হয়েছে এবং সেইজন্মে এ ছবির বক্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটে। ‘আশ্চর্য
 হাসির ছবি’ কথাটা বিজ্ঞাপনী উদ্ধৃতি হিসেবে কিছুটা বাক্য ভাবেই ব্যবহৃত
 হয়েছে, যদিচ কথাটি কোটেশনের মধ্যে ব্যবহার করলেই অধিকতর সঙ্গত
 হত। আমার বক্তব্যের মধ্যে ধ্রুববাবু যে-সমস্ত স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন
 হয়তো সেজন্মে আমার ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা কিছুটা দায়ী, হয়তো আলোচনাটিকে
 আরো বিস্তৃত করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার বক্তব্য আর একটু মনযোগ
 সহকারে অনুসরণ করলে, ধ্রুববাবুও নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন যে
 আধুনিকতা বলতে আমি এক ঐতিহ্য-নিরপেক্ষ অবাস্তুর সংকটম্বনতা মাত্র
 বুঝিনি। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের অদক্ষয়কে তুলে ধরা হয়নি
 বলেই কি ‘পরশ পাথর’কে ‘শুধুই গল্প’ পর্যায়ের আমোদবিতরণী অন্তঃসারশূন্য
 ছবির সারিতে ফেলতে হবে? তাই কি ফেলেছি আমি? ‘পরশ পাথর’
 সম্পর্কে আমার বক্তব্য কি যথেষ্ট দ্ব্যর্থহীন ছিল না? প্রথম বক্তব্য, ‘পরশ পাথরে’
 সমস্তা এসেছে, কিন্তু সে সমস্তার বাস্তবতা রক্ষিত হয়নি; দ্বিতীয়, এ ছবিতে
 অভিজাত্যের নগ্নতা প্রকাশিত, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে সুখী মনোভাব

প্রকট ; তৃতীয়, ‘পরশ পাথরের’ সমাধান সরলতরৈখিক ; চতুর্থ, এ ছবিতে ‘টোনে’র সমতা নেই, যেহেতু চিত্রায়ণে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা ছিল ; পঞ্চম, কল্পনা ও বাস্তবের প্রতি বিধানিত আনুগত্যে এ ছবি না সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য, না সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এবং শেষ বক্তব্য, ‘পরশ পাথর’ মধ্যবিস্তৃত সমাজমানসকে প্রকাশ করে না এবং তার সংকটকে আদৌ ছুঁতে চায় না। এবং এই উপরোক্ত বক্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই ‘আমি শুধু বলতে চেয়েছি ‘পরশ পাথর’ আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা তার সামগ্রিকতায় প্রতিফলিত হয়নি।’ সমালোচক আমার বক্তব্যগুলি সম্পর্কে নীরব থেকে ‘পরশ পাথর’ সম্পর্কে কী মন্তব্য করা উচিত ছিল, তারই নির্দেশ দিয়েছেন। কলা বাহুল্য, আমার প্রতিপাদ্য অভিযোগগুলি যতক্ষণ খণ্ডিত না হচ্ছে, ততক্ষণ ‘পরশ পাথর’ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সম্পর্কে আমার দ্বিমত থাকবেই।

ঋণবাবুর সঙ্গে আমার বক্তব্যের প্রতিজ্ঞায় বিরোধ আছে। আমি মানি, বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ও অভিব্যক্ত করার দুরূহতম প্রয়াসে যে বিরামহীন প্রশ্নের মুখোমুখি সব শিল্পীকেই দাঁড়াতে হয়, চিত্রশিল্পীরও তার থেকে রেহাই নেই। একে দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা বললে আমি নাচার। ‘জীবনসত্য ক্ষেত্র নিরপেক্ষভাবে আধুনিক সমাজ সত্য হবেই—এটা স্বীকার করিনে।’ —লেখকের এই বক্তব্য থেকে এইটেই প্রমাণ হয় ‘জীবন সত্য ও আধুনিক সমাজ সত্য’ বলতে তিনি রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মত দুটো আলাদা বস্তুর কথা ভাবেন। আধুনিক সমাজনিরপেক্ষ কোন এক জীবন-সত্য সত্যই কল্পনীয় কিনা আমি জানি না। আধুনিকতা বলতে লেখক যদি কেবলমাত্র সমসাময়িকতা বুঝে থাকেন, তবে আমি নিরুপায়। কেননা আধুনিকতা বলতে আমি বুঝি এক মনোভঙ্গি যা দ্বিগুণে জীবনের প্রবহমান ধারাটিকেই উপলব্ধি করা হয় মাত্র, যে অর্থে শেক্সপীয়ার তাঁর কালে সর্বাধুনিক, এবং যে অর্থে রবীন্দ্রনাথও।

ঠিক এই কারণেই বলেছি, ঋণবাবুর সঙ্গে আমার মতবৈধতার শিকড় আরো মূলগত। এবং বিরোধী প্রতিজ্ঞার ওপর দাঁড়িয়ে এ আলোচনার সত্যই কোন সমাধান সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও ঋণবাবু যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এবং চলচ্চিত্রকে যথার্থ শিল্পমূল্য দিতে কৃপা প্রকাশ করেননি, এজন্যে তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।



শুক-শারিকা ॥ কালীঘাটের পট থেকে



রাজ-দম্পতি ॥ অজস্র চিত্রাবলী থেকে



অন্নপূর্ণা ॥ কালীঘাটের পট থেকে



শ্রীরাধার মুরলী-শিক্ষা ॥ কালীঘাটের পট থেকে

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য এবং অশ্লীলতা

এক

অশ্লীলতার প্রশ্নটা—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই—নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হারা হচ্ছেন এবং এ প্রশ্নের উত্থাপন হারা করছেন তাঁদের উভয় দলের কাছে নিবেদন-যোগ্য কোন সাধারণ সূত্র আলোচনা না হয়েই এক দলের অভিযোগ এবং অপর দলের তথাকথিত ‘অপরাধ’ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় মূলে সমস্যাটা কী এবং বাস্তবিকই সমস্যা কিছু বিদ্যমান কিনা সেটা নিশ্চয়ই বিবেচিত হওয়া দরকার। কিন্তু তৎপূর্বে বোধহয় এটাই সর্বপ্রথমে দৃষ্টব্য সমস্যাটার আপাত রূপ কী।

সমস্যাটার আপাত রূপ বড়ই ভয়াবহ। অভিযোক্তাদের বক্তব্য হল বাংলা সাহিত্য প্রায় রসাতল পথযাত্রী এবং “যা কিছু বিবমিষার উদ্রেক করে তাই আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য”। অভিযুক্তদের আচরণে এ অভিযোগের কোনই প্রতিক্রিয়া নেই। তাঁরা দিনের পর দিন তথাকথিত “অশ্লীল” রচনা লিখে চলেছেন এবং প্রকাশ করে চলেছেন। কিন্তু এ কথাটা কেউ জিজ্ঞাসা করছেন না যে সাহিত্যে অশ্লীলতা কাকে বলব, আর বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ক্ষেত্রে যাকে অশ্লীলতা বলা হচ্ছে তা বাস্তবিক মাত্র অশ্লীলতা না আর কিছু? সূত্রাং অবস্থা যা ছিল তাই থেকে যাচ্ছে। মান্ন থেকে রিরংসার অভিযোগে বিবমিষাও এসে যুক্ত হয়ে অবস্থা অধিকতর ঘোরালো করে তুলল।

অভিযোক্তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর বিপদ আছে এইখানে যে, তাঁরা প্রায় গল্পে লেখককে একটা শুচিবায়ুর অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলতে চান। কোন গল্পের কথক

যদি গাড়োয়ান হয় এবং সে যদি কোন মেয়ের রূপবর্ণনায় ‘পাছা’ শব্দটি ব্যবহার করে তাহলেই গল্প অশ্লীল হয়ে গেল এ ধারণাও আছে। তাঁদের বক্তব্য বোধহয় এই-যে উক্ত শব্দটির বদলে কোন শালীন শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক কবে বাঞ্ছোত বলেছিল। তখন কোন কোন রক্ষণশীল কাগজে আর্টনাদ শুনেছিলাম—গেল সব গেল। এখন কথাটা যে কেউ যখন তখন ব্যবহার করেন। এবং মানিকবাবুর ব্যবহারের তাৎপর্য না জেনেই রচনায় একটু পার্শ্ব আনবার জন্ত করেন। কেউ কেউ হয়তো কেবল জানেন যে গাড়োয়ান ‘নিতম্ব’ বললে অথবা কোমরের নিচেটা বললে সেটাই অশ্লীল হয়, মানিকবাবুর নায়ক যথাস্থানে ‘বাঞ্ছোত’ না বললেই সেটা অশোভন হয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বড়ই স্বল্প।

আবার অভিযুক্তদের পক্ষে কথা বলায় বিপদ ততোধিক বেশি। তাঁদের রচিত পাঠকের কাছে অশ্লীলতার দায়ে দায়ী রচনার প্রকাশের পর তাঁদের মনোভাব হয় জন্মেস কিংবা ফ্রুবেয়ারের মত। তাঁদের নীরব বক্তব্য হল নষ্টনীড় থেকে শুরু করে কল্লোলী তরঙ্গের কাল পর্যন্ত অশ্লীলতার অভিযোগ বহবার এসেছে, স্মরণ্য এ অভিযোগে কান পাতবার দরকার নেই। তাঁদের লজিকটা মোটামুটি এই যে, প্রাতঃস্মরণীয় লেখককুলের ভাগ্যেও যখন এ অভিযোগ উঠেছে তখন তাঁদের বিরুদ্ধে উঠলে আর আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে?

এবং আবারও, দু-পক্ষ মিলিয়ে কথা বলারও বিপদ আছে। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে যে চিরন্তন বাদ প্রতিবাদ আছে, তাহলে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এবং সে পথে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে আবার ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে আসতে হয়। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে অনন্তসাধারণ সমস্তার উদ্ভব হয়েছে তা যেমন ছিল তেমনই থাকে।

দুই

সমস্তটাকে অনন্তসাধারণ বলার হেতু আছে। বাংলা সাহিত্যে এতাবৎ উদ্ভাপিত অশ্লীলতার বা দুর্নীতির অভিযোগের সঙ্গে আজকের অবস্থার কোন মিল নেই। এবং আজকের অশ্লীলতা কার্যকারণের প্রসঙ্গস্থলে আবদ্ধ অনিবার্য কিছু নয়। নষ্টনীড়ের মত সামাজিক চিন্তাগত স্ববিরতাকে উপেক্ষা করে বিবাহিত মহিলার প্রেমজ সঙ্কটকে অঙ্কিত করার সাহস—যাকে ‘দুর্নীতি’ বলা হয়েছিল আজ তারও সাক্ষাৎ মেলে না। পটলডাঙ্গার পাঁচালিতে যুবনাম যে ত্রিষ্ট বস্তু পরিবেশ রচনা করেছেন

সেখানে নিঃসন্দেহে অতিবাস্তবতার বিকার বর্তমান—কিন্তু ঐ রকম ক্লিন্ন পরিবেশের মধ্যেও লেখকের ঝাঁকটা কোন কোন গল্পে নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট—এবং সে ঝাঁক মানবিকতার দিকেই। এখনকার ঐ সমস্ত গল্পে সে ঝাঁকও মেলে না।

কথাটি আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে কল্লোলের কালে একবার এই ধরনেরই অশ্লীলতার অভিযোগ বাংলা সাহিত্যে উঠেছিল। এবং দেখছি যে আজও এই ধরনের অভিযোগ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু এই দুই অবস্থার স্বরূপ এক নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে ‘মন্দাক্রান্ত’ অবস্থার সন্মুখীন আমরা হয়েছিলাম আর এখন আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তার মধ্যে মৌল সাদৃশ্য কোথাও নেই। তখন আমাদের জীবনে মূলেস্থলে এক আলোড়িত অবস্থা। পুরনো বিশ্বাস এবং ধ্যান ধারণা বাইরের দিক থেকে না হোক চিন্তার দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেতে শুরু করেছে। অথচ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক-গুলো সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা তখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। ফলে আমাদের প্রশ্ন জেগে উঠেছিল মাত্র একটা জিজ্ঞাসাচিহ্নের আকারে। প্রশ্নেরও কোন সঠিক রূপ আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল না। কাজেই কবিতায় এবং গল্পে উপন্যাসে তখন যে দেহাশ্রয়ী বাস্তবতা মুখর হয়ে উঠেছিল তা আসলে প্রথম মহাযুদ্ধের পরের সর্বাঙ্গীণ অস্থিরতার দ্বারা চিহ্নিত। আর সে অস্থিরতাও আবার উপনিবেশের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতাবোধ সজ্জাত। এবং এ ব্যাখ্যার পরেও সেই তথাকথিত অশ্লীলতার স্বপক্ষে একটা কথা বলবার থাকে। বলা যায় যে জীবনের সর্বতল সন্ধানের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা অনতিকাল পরেই বাংলা সাহিত্যে শুরু হল তার সূত্রপাত ঘটেছিল এইকালে। এই সন্ধিৎসারই প্রথম প্রকাশে আমরা পেয়েছি ‘অশ্লীলতাকে’। পৃথিবীর সমস্ত রুঢ় কথাকেই পটলডাঙ্গার পরিভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে এ বোধের ভিতরে কোন শিল্পমাহাত্ম্য নেই। যুবনাশ্বের গল্পেও নেই। কিন্তু নির্ভয়ে জীবনের সন্মুখীন হবার সাহস যুবনাশ্বের ছিল। কল্লোলের কাল মাত্র-সাহসের কাল। এই সাহসের প্রয়োজনও তখন ছিল।

কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আমাদের সঙ্কট ছিল মোটামুটি চাকরি না পাওয়ার সঙ্কট। আর ছিল তখন মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন অচরিতার্থতার সঙ্কট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেদিক থেকে আমাদের জীবনকে আঘাত করেছে অনেক প্রত্যক্ষভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধ আমাদের জীবনকে ভাঙেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের জীবনকে ভেঙেছে। দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ আমাদের

জীবনকে, তার স্থিরবিন্দুকে বিচলিত করেছে। ঘরের স্বপ্নই নেই, ঘরের ভাঙনও এসেছে বহুক্ষেত্রে—কাজেই জীবন স্থির এবং সুস্থ থাকতে অনেকাংশেই বইছে না। তাহলেও এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলার থাকে। জীবনের বাস্তব অবস্থার দিক থেকে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে আমরা বুদ্ধি বিশ্বাস এবং চেতনার দিক থেকে তেমনি অধিকতর লাভবান হয়েছি।

এবং একথাকে শুধু একটা রাজনৈতিক তত্ত্বকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেননা একথা কি সত্য নয় যে জীবন সম্বন্ধে এখন আমাদের একটা স্থিরাদর্শ থাকার কথা? এখন অর্থনৈতিক দৃষ্টির বা রাজনৈতিক দৃষ্টির হস্ত সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টতই অধিক সচেতন থাকার কথা? To put the question correctly যে সাহস প্রয়োজন, যে চেতনানুগ নিষ্ঠা প্রয়োজন তা এখন আমাদের সম্যক পরিমাণে থাকবে এটাই এখন আমাদের জাতি আশা। বাস্তবের সন্মুখীন হবার যোগ্যতা এখন আমাদের বেশি। কল্লোলের শিশুর কোঁতুল সে ক্ষেত্রে এখন পরিস্কৃত হবে এ আশাও জাতি।

সে আশা কোথাও ফলবতী হচ্ছে না একথাও সত্য নয়। কিন্তু তাহলেও অশ্লীলতার অভিযোগ উঠছে। এখন প্রশ্ন এ অশ্লীলতার স্বরূপ কী?

তিন

আমার মনে হয় প্রশ্নটা আদর্শেই অশ্লীলতার নয়। এ প্রশ্নের মূল আরও গভীরে। আমি এ প্রসঙ্গে সরাসরি গল্প ধরে আলোচনা করার পক্ষপাতী। সম্ভ্রুতি যে গল্পটি প্রগতিশীল মডেলে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই গল্পটি ধরা যাক। গল্পটি ‘মহাযুদ্ধের পরে’। এ গল্পটিকে আমরা সকলে মিলে বলেছি অশ্লীল। কিন্তু কেন বলেছি? কী থাকলে একটা গল্প বা রচনা অশ্লীল হয়? এ প্রশ্ন আমরা কেউ করিনি। মহাভারতে ছিন্নহস্ত ভূরিশ্রবা পড়ে যখন গড়াগড়ি যাচ্ছে তখন ভূরিশ্রবার স্ত্রী “নাভ্যরুজঘনস্পর্শী স্তন বিমর্দন-কর” আর নাই বলে শোক প্রকাশ করেছিলেন। নাভি উরু জঘন এবং স্তনের উল্লেখ থাকা সম্বন্ধে উদ্ভিষ্ট করণ রসের কোন হানি হয়নি। স্মরণ্যে কোন একটা বস্তুর উপস্থিতির জন্তই কোন রচনা অশ্লীল হয় না। বিজ্ঞাপতির রাধা আচলের আড়াল থেকে স্তন যুগল উন্মোচিত করে দেখে আত্মহারা হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যিনিই হোন এবং রাধা যিনিই হোন ওখানে ব্যাপারটা আমাদের রুচিকে আঘাত নিশ্চয় করত যদি না ব্রজবুলির অপরূপ বাচ্যবরণে সমস্ত বস্তুব্যটা সম্ভ্রুত হত।

কিন্তু রুচির মাপকাঠি দিয়ে রসবিচার সম্ভব হবে কিনা এ প্রশ্ন তখন আবার নতুন করে ওঠে। কাজেই সে পুরাতন প্রশ্নে না গিয়ে সাহিত্যে স্বাধীনতার সমস্যা কে নতুন ভাবে দেখা যায় কিনা ভাবা যাক। আমার মনে হয় গল্প লেখকের স্বাধীনতার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু গল্পের বক্তব্য তাঁর সে জাতীয় স্বাধীনতা-বিহারের ক্ষমতা নেই। পাঠকের কাছে শুধু একধরনের subjective রচনারই নয় সব গল্পেরই আমার মনে হয় যেন দুটো রূপ—Story as told এবং story to be deduced—গল্পের কথিত বক্তব্য এবং নিহিত বক্তব্য। গল্প-লেখককে এই দুটি বক্তব্যের দিকেই যুগপৎ একই সঙ্গে নজর দিতে হয় এবং এই দুয়ের সাজুয্যের ওপর মূল শিল্পকর্মটা দাঁড়ায়।

অঙ্গীলতার প্রশ্নটা গল্পের কথিত রূপের বেলায় উঠতেই পারে না। যেহেতু শিল্পকর্মমাত্রেরই কিছু না কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। মহাযুদ্ধের পরে কেন, সেক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ‘সোনার চাঁদে’ও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গল্পের আলোচনায় তার নিহিত বক্তব্যকেই অনুধাবন করতে হবে এবং এই বিচারের কলেই আবিষ্কৃত হবে কোনো গল্পে কেন অঙ্গীলতার অভিযোগ আসছে কোনো গল্পে কেন আসছে না।

‘মহাযুদ্ধের পরে’ গল্পটিকে এইভাবেই বিচার করা প্রয়োজন। গল্পের পাত্রপাত্রী তিনজন অন্ধ নরনারী। সময়কাল ভাদ্রমাস। স্থান একটি পরিত্যক্ত গুহাবৎ অন্ধকার টিনের শেড। এই গল্পের সমস্ত পরিবেশটাই শ্রুতি আর স্পর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দুজন অন্ধ ভিখারীর মাঝখানে ঘটনাগতিকে একজন অন্ধ ভিখারিনী এসে পড়ল। নারীস্পর্শ বঞ্চিত ভিখারী দুজনের জীবনে একটা তাদের অস্তিত্ব অনুধায়ী আলোড়ন অনুভূত হল। পরিশেষে উভয়ের অন্ধ আদিম ঈর্ষায় এবং আক্রোশে অন্ধ মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলল। এই গল্পের আবহাওয়ায় যৌন কাতরতা আছে। কিন্তু তার পক্ষে লেখকের বক্তব্যও আছে। সেটা কী দেখা যাক।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে লেখক কোথাও অন্ধ দুজনকে মানুষ বলেননি। এদের জীবন প্রায় মানবেতর জীবন সে কথা বারবার লেখক বলেছেন—

- ১। মানুষে কয় বিজলি চমকায়।
- ২। কি জানি মানুষে দেখে।
- ৩। সব কিছুর নাকি রং আছে—হাঁ। মানুষে দেখে।
- ৪। আন্ধার—মানুষে কয়।

লেখক বলছেন—‘ষুগযুগান্ত ধরে পাশাপাশি দুটি রাজ্যের ইতিহাস ও বিশেষের মত ঐতিহাসিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি ওদের। কারণ পরদিন ওরা আবার খেতে পেয়েছে, কারো ভাগে কম পড়েনি। তখন ওরা আবার একত্র হয়েছে, কেননা দুজনের অঙ্ক সমাজে আর কেউ নেই’। এ কথার পর লেখক বলছেন—‘সাধারণ মানুষের মত সাধারণ ভাবে ভালবাসাবাসি করেছে’। কিন্তু একটু পরেই এই ছত্রটিকে এই অমুচ্ছেদে একান্ত প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হবে যখন আমরা পড়ব—

—ভাত নাকি শাদা—

—হ্যাঁ মান্বে কয়। ওইটা শাদার গন্ধ।

—দুধ নাকি শাদা।

—মান্বে কয় দুধেরো গন্ধ শাদা।

—আমি দুধ খেয়েছি তিনবার।

এই যে বারবার ‘মান্বে কয়’ ‘মান্বে কয়’ লেখকের ধূয়ো, এটার একটা তাৎপর্য আছে। গল্পের পরিবেশকে আদিম প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ তুল্য করে তুলতে হলে এটা দরকার। এরা প্রায় মানবেতর প্রাণী—অন্তত এদের খাওয়া তাই। মানুষ এবং এরা পৃথক—লেখকও সে কথা বলেছেন। সুতরাং এই পরিবেশে যখন কোনো নারীর অবতারণা করা হল তখন এদের মধ্যে ঘোঁর ক্ষুধার উদগ্র বিকারে মানবেতর হানাহানি শুরু হবে এটা স্বাভাবিক। গল্পের ন্যায় শৃঙ্খলা তাতে ব্যাহত হয় না। এমন কি হাতে ঠেকল দুটি পা...‘যা সন্দেহ করছিল! কুরচি, কানী কুরচি! আরো ওপরে হাত তুলল। কুরচি। পুরোপুরি কুরচি।’ এখানেও লেখকের বক্তব্য ঠিকই থাকে। ওরা তো অঙ্ক। প্রায় অমানুষ সুতরাং এমনটাই ঘটবে।

ঠিক কথা। কিন্তু গল্পের নিহিত বক্তব্যটা কী? এত আয়োজন, বর্ণনার এত আবেগ কোন্ বক্তব্যে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল। বলা বাহুল্য যারা গল্পটি পড়েছেন তাঁরা জানেন কোথাও না। অঙ্ককার থেকে লেখক দুটি প্রাণীকে গ্রহণ করেছেন এবং পরিশেষে অঙ্ককারেই তাদের ফেরৎ দিয়েছেন। বক্তব্য-বিরহিত কোন গল্পই দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং এ গল্পও পারেনি। অভাবটা আসলে গল্পের নিহিত বক্তব্যের এবং এই বক্তব্যে ঝাঁকি থাকার জন্যই লেখককে পাঠকের দৃষ্টিভ্রম সৃজন করতে হয়েছে। কাজেই প্রথম থেকেই লেখক পশু পরিবেশ রচনার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়েছেন। গল্প যত অগ্রসর হয়েছে, যত নিজের বক্তব্যের দৈন্য স্বক্কে লেখক সচেতন হয়েছেন ততই জড়ো হয়েছে এই

সমস্ত উপমা এবং প্রতীক।

- ১। ভারি বাতাসের ঝাপটা খেয়েও পুরুষ জোনাকিগুলি মিটিমিটি বাতির ইশারায় ফুসলে বেড়াচ্ছে নিচের মেয়ে জোনাকিদেব।
- ২। তল্লাটের কুকুরগুলি পরস্পরের মধ্যে পাড়া ও আন্তাকুড় ভাগাভাগির সমস্ত চুক্তি সন্ধি ও বন্ধন ভুলে গেছে। তারা লড়ছে, রক্তারক্তি করছে। ঋতু কয়েদিগুলোর রক্ত ছাড়া পেয়েছে এই বর্ষার মরশুমে।
- ৩। এই বর্ষায় মাতাল পুরুষ ব্যাঙের মত ডাকতে ইচ্ছে করে কঁাকো, কঁাকো। যেমন করে মেয়ে ব্যাঙটাকে সে ডাকে।

গল্পের অস্বস্ততা যদি কোথাও থাকে তবে তা এইখানে এবং সে অস্বস্ততা চূড়ান্ত বক্তব্যহীনতার ফল। যার ফলে গল্পের শিল্পরূপ আহত হয়। যেটুকু বেঁচে থাকে সেটা Strangeness মাত্র। কেবল এ থেকেই যে কোন art form সিদ্ধিলাভ করতে পারে না সে কথা কে না জানেন।

কিন্তু তাই বলে যৌন বোধ বা যৌন বিষয়ক কোন প্রশ্নেরই সম্মুখীন হওয়া চলবে না এমন কোন কতোয়াও আবার সুস্থ শিল্পবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আসল প্রশ্নটা বক্তব্যের প্রশ্ন। যদি লেখকের বক্তব্যের স্থিরবিন্দু অবিচল থাকে তাহলে গল্পের আবহাওয়া তাঁর সহায় হবে। অর্থাৎ গল্পের কথিত রূপ দাঁড়িয়ে থাকবে গল্পের নিহিত বক্তব্যের ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে গল্পের কথিত রূপ যাঁই হোক না কেন তার সমালোচনায় অঙ্গীলতার অভিযোগ অবাস্তব।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সোনার চাঁদ’ গল্পটি সাধারণ রুচির পাঠককে আঘাত করবে নিঃসন্দেহেই। তার যৌন বিকারের বীভৎস স্থূলতার ছবি ভয়াবহ রূপে জঘন্ত। নিম্নের উক্ত অংশটি হয়তো অনেকেরই মনে আছে :

“ভেঁটু হামাগুড়ি দিয়ে শশীর কাছে সরে গেল। ‘হুঁ ভিজ়ে গামছাটা কোথায় দে, দে, আর একটু মুছে’ বলে শশী পটাপট সবগুলো বোতাম ছেড়ে দিয়ে পেঁটু লুনটা ঢিলে করে কোমরের নিচে ঠেলে দেয়। কালো থলথলে প্রকাণ্ড দুটো মাংস পিণ্ড চোখের সামনে ভেসে উঠতে ভেঁটু হি হি করে হাসে। ‘হাসছিস কেন দে ভাল করে মুছে দে শালা ভিজ়ে কেমন জেবজেবে হয়ে আছে দেখ্’। হাসি খামিয়ে ভেঁটু শশীর কোমর ও পাছার ঘাম মুছতে থাকে।’
আঃ কি আরাম, আরামে চোখ দুটো আধবোজা হয়ে যায় শশীর। বুঝলি মেয়েমানুষ কিচ্ছু না। বালি, ছাই। শালা ধরতে গেলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়। মেয়ে মেয়ে আমরা করি বটে, কিন্তু ও শালার মেয়েমানুষকে আদ্র

করা আর ছাইয়ে জলঢালা সমান। এমন বজ্জাত বেইমানের জাত তুই ছোটো পাবিনে।”

একটা রেস্টুরেন্ট-বয়ের জীবন, তার অশ্লীল অভিজ্ঞতা, তার সত্ত্ব জাগ্রত যৌনবোধ যেটা সুস্থ আর শশী নামক রেস্টুরেন্ট কারিগরের অসুস্থ বিকৃত যৌন বোধের পটভূমিকায় গল্পটি লিখিত। এ জীবনের যে রুচিবিকার স্থূলতা রুঢ়তার সমাবেশ তার সব কিছুই ব্যবহার করেছেন লেখক। উদ্ধৃত অংশটি তার প্রমাণ। এই কদর্ঘ পরিবেশ থেকে ভেক্টর বা রেস্টুরেন্ট বয় একটা মারামারির সুযোগে টাকা-পয়সা চুরি করে সরে পড়ল। সে হল আইসক্রিম বিক্রেতা। মষ্টি বলে একটা ফ্রুফরা সুন্দর মেয়ে তার কাছ থেকে আইসক্রিম কেনে।

গল্পের শেষ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যেত নায়কের যুক্তির মনোভাবকে লেখক কেমন করে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন। ‘শাদা রঙ’ ‘সোনালি রঙ’ আইভিলতার মতন ‘শেষ বেলার কমলা রঙ রোদ’ ‘আকাশ রঙের হাওয়াই সাট’ ‘কচিপাতা রঙের ট্রাউজার’—আইসক্রিম গাড়ি এবং আইসক্রিম বিক্রেতা কিশোরের সানন্দ অভিব্যক্তি লেখক এই ভাবেই রঙে রঙে ধরে দিয়েছেন।

এবং এই পটভূমিকাতেই উপরে উদ্ধৃত অংশে বর্ণিত কদর্ঘতার সার্থকতা। সাহিত্যের বাস্তবতা যে অংশে জীবনকাব্যের ব্যাখ্যাতা সেখানে সমগ্র বাস্তবতাকেই আমরা গ্রহণ করব। চাচারালিজমের সঙ্গে রিয়েলিজমের তফাৎ এইখানেই—একজন জীবনের যথাদৃষ্ট গণ্যময় অভিব্যক্তিকে ছাড়াতে পারে না, আর একজন বাস্তব থেকে নিষ্কাশিত করে জীবনের কাব্য—Poetry of life। সোনার চাঁদ গলে মাত্র strangeness নেই, পাঠককে অযথা অভিভূত করার প্রয়াসও নেই, এবং বক্তব্যশূন্যতাও নেই। কদর্ঘতার হাত থেকে জীবন মাত্রেরই যুক্তিকামী—ভেক্টর অভিজ্ঞতাও তাই বলে। সেই আলোকেই এ গল্প বিচার্য।

চার

তা নইলে শুধু strangeness বা অদ্ভুত আবহাওয়ায় কোন গল্পই বাঁচতে পারে না। গল্পের মধ্যে বাস্তবের যে অন্তর্গত তাৎপর্য সৃজন প্রয়োজন গল্পের অদ্ভুতত্বের ওপর নির্ভরশীল হলে কখনোই যে তাৎপর্য সৃজন করা সম্ভব হয় না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পে অসুস্থতা সঞ্চারিত হয় বিষয়বস্তুর অদ্ভুত নির্বাচনের জন্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে লেখকেরা সেই সব অদ্ভুত বিষয়কে গল্পস্থ করতে যান কেন? এর একমাত্র কারণ তাঁরা Realityর দর্শক হতে চেয়েছেন যতটা, ব্যাখ্যাতা

ততটা নন। মাত্র দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে রয়েছে বলেই বর্তমান লেখককুল নিজেকে বিষয়বাহন্যে নিজেরাই অভিভূত হয়ে রয়েছে। এবং এই অভিভূতিকে পাঠক হৃদয়ে যদি সংক্রমিত করতে হয় এবং তাকে convincing বা প্রত্যয়সিদ্ধ করতে হয় তাহলে যেটা করা দরকার সেটা হল গল্পে যে কোনো পরিমাণ অদ্ভুত বিকার সৃষ্টি। এর জন্তে গল্পের লজিক মানারও কোন দরকার হয় না। রূপকথায় যেমন একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রথমে শিশু সবই অবিশ্বাস করে, তার পরে সবই বিশ্বাস করে, বর্তমান লেখকবৃন্দও তেমনি পাঠকদের বয়স্ক শিশু ভেবে নিয়েছেন। এবং যে কোনো পরিমাণ অবিশ্বাস্যতাই আমাদের পাতে পরিবেশন করছেন। সূত্রটা দাঁড়িয়েছে এই—যেহেতু জীবন সম্বন্ধে কোন স্থিরাদর্শ নেই, vision of reality নেই, কেবল আছে অজস্র পরিমাণ আহরণ, তখন বক্তব্যের দৈন্ত আবৃত করার জন্য অদ্ভুত বিকার সৃষ্টি করতে হবে এবং তার জন্য পাঠকের জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ অ্যানাস্থেটিক প্রয়োজন। সুতরাং এসথেটিক বুদ্ধিকে জগাঞ্জলি দিয়ে যা খুশি করা হোক। এ থেকেই বৌনবিকার, এ থেকেই অঙ্গীলতা।

এই বক্তব্যের দৈন্তের বলি শুধু নবীন লেখকবৃন্দই নন। বনফুলের মত প্রবীণ লেখক এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মত প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের সকলেরই প্রিয় লেখকও কখনো কখনো এই বক্তব্যের দৈন্তের করুণ শিকার। শ্রাবণ সংখ্যা উন্টোরখে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প ‘দম্পতি’ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গল্পটিতে বিধ্বত সমস্তা বড় বিচিত্র। সাড়ে পাচ ফুট দীর্ঘ মেয়ে সর্বাণীর সঙ্গে সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ ছেলে উৎপলের দাম্পত্য জীবনের সমস্তা। স্ত্রী লম্বা হলে এবং স্বামী খর্বকায় হলে কী পরিমাণ অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব হতে পারে এ গল্পে নানা দিক হতে তাই দেখান হয়েছে। এই দম্পতি-জীবনে নাটক চূড়া স্পর্শ করল যখন প্রভাস নামে স্বামীর এক বন্ধু যে লম্বায় পুরো ছ-ফুট এবং সুদর্শন সে এসে উপস্থিত হল। একদিন গল্পসম্মত কোন কারণে উৎপলের ঈর্ষার সন্দেহের শাস্তি বশতঃ প্রভাস উৎপলকে কাঁধে করে সার্কাস দেখাতে লাগল এবং সর্বাণীকে তা দেখবার জন্য (সর্বাণী তখন বাথরুমে) চিৎকার করে ডাকতে লাগল। সর্বাণী উৎপলকে নামিয়ে দিতে অনুরোধ করল, প্রভাস বলল সে নামিয়ে দিতে পারে কিন্তু মুক্তিপণ দিতে হবে। সর্বাণী প্রভাসের স্বাক্ষরিত উৎপলের গালে পাতিব্রতের প্রমাণ স্বরূপ ছোটো চুমো খাক। সর্বাণী বলল—এও জান তুমি। নামিয়ে দাও। কথা যদি না শোনে আর একদিন বরং—। এ গল্প শেষ হল এই ভাবে—বেঁটে উৎপল

সিগারেট কেনার নাম করে বাড়ি থেকে সরে পড়ল। তার বক্তব্য হচ্ছে ‘এই শহরে বেঁটে উৎপলের চেয়েও মাথার ছোট স্ত্রীলোকের কি একান্তই অভাব’ ? ভগবান করুন নরেনবাবুর এরকম গল্প যেন আর ছুটি পড়তে না হয়। গল্পের বক্তব্যটা দাঁড়াল কী ? মেয়েরা কেউ বেঁটে বিয়ে কোর না ! নিশ্চয় এর জন্মে নরেনবাবুর মত স্থিতধী লেখক এত বড় গল্পটা লেখেননি। নরেনবাবু কি জানেন না যে শারীরিক বিকৃতির উপর নির্ভর করে রচিত গল্প কী পরিমাণে ট্রিটমেন্ট-সাপেক্ষ ? তিনি কি জানেন না যে এখানে ঢের বেশি দরকার নায়কের চেতনার সুকুরকে ব্যবহার করা। তবে বক্তব্যটা ঠিকমত ফুটতো। তার বদলে গল্পে যেটি এসেছে সেটি অস্বস্ততা। আপাত দৃষ্টিতে অশ্লীলতা বা অস্বস্ততা না থাকলেও গল্পের নিহিত বক্তব্যের কোন সমর্থনই গল্পের কর্ম পায়নি। সেটির অভাবেই গল্পটি স্তব্ধ নয়। ঠিক তেমনি বনফুলের ‘মহারানী’ উপন্যাসের অনৈসর্গিক পরিবেশ। নায়িকা ব্যক্তিবান নায়কের কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাঘ সিংহের খাঁচা বানিয়ে বাঘ সিংহের কাছে আদর কাড়াতে যেত। সিংহকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে পদানত করে নায়কের ওপর মনের ঝাল মেটাত। অদ্ভুত রসের এমন বিচিত্র সমাবেশ নিপুণ শিল্পীর হাতে পড়ে এক বিস্ময়কর পরিবেশ সৃজন করেছে। কিন্তু এখানেও সমস্তা সেই একই। জীবন সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণার অভাবে জীবন কোনো সুপরিকল্পিত প্যাটার্ন এ উপন্যাসে গ্রহণ করতে পারেনি। সমালোচকেরা বলেছেন যে গল্প উপন্যাসের আলোচনা কালে তার form এবং কলাকৌশল যে পরিমাণে আলোচ্য Life exhibited in it সেটাও সে পরিমাণেই আলোচ্য। যে উদ্ভাস সামন্ত জীবন ইতিহাসের অজ্ঞাত উজ্জান থেকে এ উপন্যাসে আহরিত হয়েছে তাকে ঠিকমত আত্মস্থ করা ও ব্যাখ্যা করা বনফুলের পক্ষে সম্ভব হয়নি—এই অক্ষমতারই পরিণামে প্রেমের সমস্তার ব্যবহারে সার্কাস শুরু করতে হয়েছে।

পাঁচ

সুতরাং আবারও বলতে হয় সমস্তাটা অশ্লীলতার নয়। বনফুল বা নরেনবাবুর লেখার অশ্লীলতা আছে এ অভিযোগ একমাত্র মুখেই করতে পারে। কিন্তু যে বক্তব্যগত শূন্যতা থেকে অন্যের ক্ষেত্রে চাচারালিঙ্গম এবং পরোক্ষাফি জন্ম লাভ করে সে শূন্যতা এই ছুটি কাহিনীতে আমরা দেখেছি। এটাকেই সাহিত্যিক অস্বস্ততা বলতে হয়। কেননা কোন কোন অবস্থায় গল্পকার বা কাহিনীকার বক্তব্যকে শিল্প রূপান্তরিত না করে, পাঠকের জীবনরস সমৃদ্ধ শিল্পবোধের কাছে শিল্পী-আবেদন

সৃষ্টি না করে যখন স্থূল বিশ্ববোধ সৃষ্টি করতে চান তখনই মনে হয় এই বিশ্ববোধের পাহাড়ের অন্তরালে কিছু একটা যেন তিনি করতে চান। হয়তো কিছুই তেমন চান না। কিন্তু যেটাই তিনি চান না কেন এই অবস্থাটাকেই বলা হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য পরিবেশ।

এই অসঙ্গতিই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'ট্যান্ডিওয়ালা' গল্পে। একটা নিভেজাল এবং নিখাদ সমস্তা আছে যা থাকার কথা এ গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকেও আমরা জানি অকারণে কিছু বলার জ্ঞান বলেন না তিনি। যে 'মনোবিকার + আজগুবি আবহাওয়া + অসততা = অবধূত, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বা সমরেশবাবু সে দূর থেকে অনেক দূরে। এ প্রসঙ্গে এ কথাটাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে সমরেশবাবু বা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর কোন কোন গল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করছিও এই জ্ঞান তাঁরা যথার্থ শক্তিমান লেখক। এবং এঁদের এবং এঁদের বন্ধুদের হাতেই বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এঁদের সঙ্গটাই প্রকৃত আলোচনার যোগ্য। অবোধের যেমন গো-বধেও আনন্দ অবধূতেরও তাই। যিনি অপাপবিদ্ধ এবং সঙ্গট যাকে স্পর্শ করে না তিনি আমার নমস্কৃত সুতরাং তিনি এ আলোচনার বাইরে। শুভায় ভবতু পড়বার পর এ বোধ আমার আরো দৃঢ়ীভূত হয়েছে।

নিঃসন্দেহেই ট্যান্ডিওয়ালা গল্পে ট্যান্ডিওয়ালার একটি সমস্তা আছে। যার স্ত্রী গৃহত্যাগ করেছে কোন শহরে অস্ত্রঃসারহীন চক্চকে ছেলের পাঞ্জায় পড়ে, এবং যার স্ত্রী পরিশেষে হাতে হাতে ঘুরে কোন কুৎসিত ক্ষত নিয়ে প্রবাসে হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে আর সাধারণ লোক নয়—সাধারণ ট্যান্ডিওয়ালা নয়। সে কলকাতা শহরকেই দেখবে অন্য চোখে। অন্য চোখে দেখবে এর মধ্যবিস্তৃত জীবনের অস্ত্রঃসারশূন্যতাকে তার নয়নাভিরাম আবরণকে। এটা গল্পের বাইরের কোন তত্ত্বকথা নয়। এইটাই গল্পের অন্তর্নিহিত লজ্জিক। লেখক যে তাকে বাধা দিয়েছেন তাও নয়। কিন্তু সমগ্র গল্পটি এমন এক মানসিকতায় আচ্ছন্ন যা এ গল্পের পক্ষে পরিহার্য ছিল। এই পরিহার্য বস্তুটির অতিপ্রাধান্তের ফলেই গল্প দু-দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক গল্পের বস্তুবোয় দিক থেকে। দুই গল্পের অঙ্গরাগের বা গঠন সৌষ্ঠবের দিক থেকে। এ গল্প ট্যান্ডিওয়ালার মাধ্যমে কথিত গল্প। তারই দৃষ্টিকোণ, তারই বাচন গল্পটিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং ট্যান্ডিওয়ালার মানস পরিবেশকে তন্নিষ্ঠ করে তুলতে গেলে যে পরিমাণ স্থূলতা রূঢ়তা এবং অমার্জিত বাগভঙ্গি রাখা দরকার জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর মত নিপুণ লেখকের কাছে তার অভাব আশঙ্ক্য করা অসঙ্গত। এবং স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা

সম্বন্ধে যে রীতিমত সচেতন তার ব্যবহারে নিশ্চয় শৌধিনতা আশা করাও অসম্ভব ।
 যে সুবেশা দাস্যবতী মেয়েটিকে নিয়ে (প্যাসেঞ্জার হিসাবেই) ট্যাক্সিওয়ালা
 ঘুরল—মনে মনে তার আসক্ত অহুভব করল সে মেয়েটিকে তার “স্বামী ?”
 ট্যাক্সিওয়ালার সামনেই প্রস্টিটুট বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিল । মেয়েটিকে
 তখন ট্যাক্সিওয়ালা তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য ঠিকানা চাইল । মেয়েটি
 বলল—বেশার আবার ঠিকানা কী ? একথার পর ট্যাক্সিওয়ালা যখন বুঝল
 ভাড়া পাবারও সম্ভাবনা নেই তখন তাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলল ।
 গল্পের শেষে নিঃসন্দেহে একটা বক্তব্য দাঁড়াতে পারত । ট্যাক্সিওয়ালার নিজের
 জীবনের অভিজ্ঞতায় এ জাতীয় মেয়ের প্রতি তার ঘৃণা থাকবে । সেই ঘৃণা তার
 জীবনের সম্বন্ধকেই রূপায়িত করত । কিন্তু এমন ঝাঁকুনি খেতে খেতে গল্প
 অগ্রসর হয়েছে যে গল্প বহুক্ষণ পূর্বেই তার দৃষ্টিবিন্দু হারিয়ে ফেলেছে ।
 ঝাঁকুনিগুলি এই :-

- ১। বর্ষার কচি মূলোর মত মসৃণ কোমল কজ্জি ।
- ২। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা ।
- ৩। শায়ার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংসে বাদামী রঙ ধরে আছে ।
- ৪। ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম । কেন জানি আমার তখন গরম
 ফাউল কারির কথা মনে পড়ে গেল ।
- ৫। মুখটা কেমনো ছিল । চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোর কথা
 মনে পড়ল ।

আর টুসটুসে আঙুর । আহা পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে
 ছিবড়ে করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম ।

উদ্ধৃতিগুলি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে সমরেশবাবুর ‘মানষে কয়’এর মত
 এরও একটা তাৎপৰ্য আছে । নিজের স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য নারীজাতি মাত্রেই
 ভোগ্য এ ছাড়া আর কিছু নয় এ রকম গোছের একটা ভাবনা ট্যাক্সিওয়ালার
 আছে । ভোগ্য বলেই ভোজ্যের এত উপমা এসে জমেছে । এবং এর সঙ্গেই
 যে বেশা মেয়েদের প্রতি একটা সূক্ষ্ম ঘৃণা থাকবে এও স্বাভাবিক । কিন্তু এই দুয়ের
 মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থাকবে এও ততোধিক স্বাভাবিক । সে কারণেই গল্পের শেষের
 ‘জার্ক’ গল্পের ট্রুটমেন্টের লজিকে অস্বাভাবিক লাগে । আবার বক্তব্য দাঁড়াতে
 পারল না বলেই গল্পের পক্ষে উক্ত উদ্ধৃতিগুলি অপ্রাসঙ্গিক এবং শিল্প হিসাবে
 অসার্থক ।

বলা বাহুল্য অঙ্গীলতার সমস্ত বলে বস্তুত কোন সমস্তা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে দেখা দেয়নি। সমস্তা ঐ শিল্পগত অসার্থকতার সমস্তা—যেটা বক্তব্যের দৈন্ত থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে। কখনো বা বক্তব্য দৈন্ত সঞ্চারিত করেছে। বিমল মিত্রের গার্ড ডি-সুজা গল্পটি এ প্রসঙ্গে স্বরণীয়। এ গল্পে কোথাও পর্নোগ্রাফি বা গাচারালিঙ্কম নিশ্চয় নেই কিন্তু সন্যে বক্তব্য এমন এক হেয় জঘন্যতার উপর দণ্ডায়মান যে সে ধরনের হেয় বক্তব্য আমাদের আলোচিত কোনো গল্পে নেই।

গার্ড ডি সুজার ভাইকে দিয়ে ডি সুজার স্ত্রী যৌন ক্ষুধা মেটাতে চায়। ডি সুজার অনুপস্থিতিতে এটা ঘটে। লেখক শুধু ডি সুজার ভাইয়ের প্রতিরোধ আর তার স্ত্রীর ক্ষুধার্ত আক্রমণের খটাপটি শুনতে পান। তারপরে একদিন ভাইটি রেল গলা দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু ডি সুজার স্ত্রী অস্তঃসত্তা। ডি সুজা সে কথা সানন্দে লেখককে জানাল। ডি সুজার স্ত্রীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। যেন ডি সুজার ভাইয়ের কাটা রক্ত খানিকটা মিসেস ডি সুজার মুখে ছড়িয়ে গেল। বিমলবাবুর সব গল্পেরই বক্তব্য একটাই—সংসারে এরকমও হয়। হয় নিশ্চয়। তা নইলে আর বিমলবাবু জানলেন কী করে, কিন্তু প্রশ্নটা এই যে তাদের নিয়ে গল্প হয় কিনা। এ গল্পের মোদ্দা কথা হল একটা সং ছেলে প্রতিরোধ করেও নিষ্ফল হল শেষটা আত্মহত্যা করল, আর মেয়েরা কি নিষ্ঠুর দেখ—স্ত্রীরাংশচরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। এ গল্পে বোধ হয় সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ অংশ তার প্রথম অংশটুকু—গল্পের ধরভাইয়ের অংশ। লেখক বন্ধুর ছেলের অনুরোধে সপুত্রক বহুপত্নীকে দেখে মন্তব্য করলেন—বাঃ বেশ ছেলে হয়েছে তোর। তাতে বহুপত্নীর আনন্দ এবং লজ্জায় সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লেখকের মিসেস ডি সুজার কথা মনে পড়ে গেল ‘এ মুখ তো ভোলা যায় না, এ মুখ তো আমার দেখা। মিসেস ডি সুজার মুখ তো সেদিন এমনি করেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। অথচ গল্পের শেষে বলছেন—‘মনে বল যেন জনির টাটকা কাটা রক্ত কেউ তার সারা মুখখানাতে মাখিয়ে দিয়েছে।’ তাহলে বহুপত্নীর লজ্জা আর মিসেস ডি সুজার লজ্জা কী এক হল। অবশ্য বুঝলাম গল্পের বহুপত্নী—তাহলেও গল্পের বহুপত্নী স্বাক্ষরে তিনি অথবা কৌতুহল জাগিয়েছেন এবং ডি সুজার স্ত্রীকেও কোনদিক দিয়েই বাঁচাতে পারেননি। নিজের উদ্দেশ্য স্বাক্ষরে স্থল অজ্ঞতা না থাকলে এ রকম ঠিকে ভুল হয় না।

ছয়

এবং ইয়া, দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই শিল্পবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ধরনের গল্পলেখার ঝোঁক ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে তরুণ লেখকদেরই এটা সংক্রমিত করছে বেশি করে। পত্রাস্তরে প্রকাশিত যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের ‘শবরী’ গল্পটি দ্রষ্টব্য। শিল্পবুদ্ধির খাতিরেই এটা পরিহার্য। তবে তার জন্ত সম্পাদকদের ওপর চড়াও হয়ে কোন লাভ নেই। তাঁরা প্রতিশ্রুতিবান লেখকদের নিশ্চয় স্বাধিকার দেবেন, লেখকরা স্বাধিকার-প্রমত্ত হবেন কিনা সেটা তাঁদের দ্রষ্টব্য। সমালোচকেরা বরঞ্চ নিঃসংকোচে সমালোচনা করুন। সম্পাদকেরা তাঁদেরও স্বাধীনতা দিন। আর সমালোচকেরা গেল গেল রব তুলবেন না দয়া করে। এটাও শিল্প-নিরীক্ষণের বুদ্ধি নয় এবং প্রিয় লেখকদের কাছে বাংলা দেশের পাঠকদের নিশ্চয় কিছু নিবেদন আছে। সেটা হল অদ্ভুতত্বের দৌড় এবার বন্ধ হোক। কুণ্ঠী, অন্ধ, কানা, বোবা, বত্রিশ আঙুলে, নপুংসক, লম্বা, বেঁটে। আমার মনে পড়ে যায় পুরীর রাস্তায় পেশাদার ভিখারীর ভিড়। যে যত অভিনব সে তত লাভবান। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ অভিনবত্বের প্রতিযোগিতা চলেছে। এ নিজেই সীমা। নিজে উপলব্ধি করে এবার সমাপ্ত হোক। ‘ঘাম’ গল্পে এই দৃষ্টি আকর্ষণের করুণ চিৎকার আমরা শুনেছি। ওতে আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। কেননা আমরাই যে সমরেশবাবুর ‘জোয়ার ভাঁটা’, জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ‘কেষ্টনগরের পুতুল’ পড়েছি এবং ভুলিনি।

মাইকেল মধুসূদনের কাব্যসাহিত্য

মাইকেল মধুসূদনের কাব্যসাহিত্যের গুণাগুণের ‘অধ্যাপকীয়’ আলোচনা অনেক হয়েছে। বড় বড় অনেক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, এবং তার চেয়েও বেশি স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ে, মধুসূদনের সাহিত্যের বিচিত্র সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পড়েছি। ইদানীং মধুসূদনের প্রতিভাকে খর্ব করারও একটা বিকৃত প্রবৃত্তি ‘আধুনিকতার’ নামে প্রকট হয়ে উঠেছে। সে-সব কথার বা আলোচনার পুনরাবৃত্তি করার কোন সার্থকতা নেই। তর্কাতর্কিও অর্থহীন। ষাঁর যে-রকম দৃষ্টিকোণ ও বোধশক্তি তিনি সেইভাবে বিচার করবেন। সেইরকম একটি দৃষ্টিকোণ আমাদের এই আলোচনাতেও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যতদিক দিয়ে একজন ব্যক্তি, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তার মধ্যে এও একটি। এটিকে অখণ্ডনীয় ভাষ্য বলে গ্রহণ করার কোন যুক্তি নেই যেমন, তেমনি আত্মমত জাহির করার জন্যে কোন আত্মাভিমानी “পণ্ডিতের” অধিকারও নেই একে অগ্রাহ্য করার। আমাদের প্রধান প্রতিপাল্য হল, মাইকেল মধুসূদনকে হয়তো এইভাবেও বিচার করা যেতে পারে এবং করলে তা অসঙ্গত নাও হতে পারে।

মাইকেল ব্যক্তিসত্তা, অগ্ণাণ অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতোই, তাঁর জীবনে ও কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে তাঁর চরিত্রের সুর ও ছন্দেরই অনুরণন শোনা যায়। প্রতিভাবান শিল্পীদের সাহিত্যে তাই হয়ে থাকে। কিন্তু মাইকেল প্রসঙ্গে তার বিশিষ্টতা এই যে সর্বকালে তা হয়নি। অর্থাৎ মাইকেলের আগের কালে তা হয়নি। প্রাচীন বা মধ্যযুগের শিল্পসাহিত্যে গোষ্ঠীচেতনা, জাতিচেতনা ও সমাজচেতনা (tribe, caste এবং community চেতনা বলতে যা বোঝায়)

সবই ছিল। যা ছিল না, তা হল ব্যক্তিচেতনা। এই ব্যক্তিসত্তাবোধ আধুনিক যুগের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের চরিত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, এই বন্ধনহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিচিত্র স্ফূরণ দেখা যায়। ইওরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগে এইটাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজে সাহিত্যে ও ব্যক্তিজীবনে এই যুগবৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ হয়েছিল তখন। বাংলাদেশে উনিশ শতকের নবজাগরণের কালে এই যুগবৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে থাকে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এই নবযুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন—তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধু-সাহিত্যের যুগান্তকারী তাৎপর্য হল এই যে, বাংলার রেনেসাঁসের প্রথম সার্থক সৃষ্টি সেই সাহিত্য। আধুনিক নবজাগরণের যুগের প্রথম চারণ-কবি মধুসূদন।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্ফূর্তির পথে যখন কোন বাধা রইল না, তখন প্রথম ব্যক্তি-সচেতন মানুষ বাইরের জগতে ও সমাজে তার এই চেতনার প্রতিবিম্ব দেখবার জন্তে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। কাচ যখন তৈরি হল এবং কাচের বড় বড় সব বাহারে আয়না, এই রেনেসাঁসের যুগেই, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে, তখন সেই আয়নার মানুষ যে কেবল তার নিজের রূপ দেখেই মুগ্ধ হল তা নয়, তার সঙ্গে তার ভিতরের সত্ত্বজাগ্রত ‘ego’ বা অহম্-কে দেখেও সে আত্মহারা হল। নিজের ভিতরের এই ব্যক্তিত্ব ও অহমিকার রূপ বাইরের যে আয়নার মানুষ দেখবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলো, সেই আয়না হল ‘fame’ ও ‘glory’—ঘন ও খ্যাতি। খ্যাতির ব্যাকুলতা সর্বপ্রথম জাগল মানুষের মনে রেনেসাঁসের যুগে, অর্থাৎ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্মকালে। স্বভাবতঃই তাই খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেকে ‘genius’ বা প্রতিভাশালী বলে মনে করা, রেনেসাঁসের যুগের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দেখা দিয়েছিল। রেনেসাঁসের যুগ থেকেই সমাজে প্রতিভাভাবাপন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হতে থাকল। একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এ-সম্বন্ধে বলেছেন :

The creative impulse had to be brought to fruition by an entirely new consciousness in the artist, it was now that it became possible to talk of ‘genius’ as the highest expression of a new consciousness, of its power and freedom which, based entirely upon the personal forces and ability of the individual, became possible only in a bourgeois world. In art as in economic

organisation the guild system, the communal structure, was in decay, and making way for the new individualism.

কালের দিক থেকে যত পিছিয়ে যাওয়া যায় তত দেখা যায়, মানুষের আত্মচেতনা ক্রমে, সমষ্টি-চেতনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, স্বতন্ত্র রূপে তাকে আর মাথা তুলতে দেখা যাচ্ছে না। এই সমষ্টি-চেতনাকে কিন্তু একালের গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। সমষ্টি-চেতনারও রূপ ছিল তখন সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—tribe caste ও communityর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেকালের শিল্পীরা অনেকে তাঁদের কলাকীর্তিতে নামের স্বাক্ষরটিও রেখে যাওয়া প্রয়োজনবোধ করেননি। কবিরা যারা নাম প্রকাশ করে গেছেন, তাঁরাও কোথাও নাম জাহির করার জন্তে করেননি, একটা প্রচলিত প্রথা হিসেবে অত্যন্ত বিনয় চিত্তে তাকে প্রকাশ করেছেন। কারও তখন কোনো নিজস্ব স্টাইলের অহংকার ছিল না, স্বকীয়তায় কেউ তখন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাননি, প্রতিভার দাবি নিয়ে সাহিত্যের হাটে আজকের মতো সোরগোল সৃষ্টি করেননি। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে, জেকব বুখাট লিখেছেন, শিল্পী-সাহিত্যিকরা যেন যশের কাঙাল হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেকেই দাবি করতে লাগলেন যে তিনি শুধু একজন genius নন, ‘unique genius’, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্টাইল আছে এবং সেই স্টাইলের মধ্যেই তাঁর unique ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে। দাস্তে, পেত্রার্ক, বোকাচো, যে যত বড় শিল্পীই হন না কেন, সকলের মধ্যেই এই খ্যাতির ও প্রতিভার জনস্বীকৃতির কাঙালিপনা প্রবল ছিল।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুগের কবি-শিল্পীদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে, বাংলাদেশের যে-কবির কথা সবার আগে, সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মহাকবি দাস্তে যাকে ‘the great desire for excelling’ বলেছেন, সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার আকাঙ্ক্ষা—দাস্তের প্রতিভামুগ্ধ বাঙালী দাস্তে মাইকেলের মধ্যে ঘেরকম তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা ভাবলে আজও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ছাত্র-জীবনেই তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছেন : “Oh ! how should I like to see you write my ‘Life’, if I happen to be a great poet which I am almost sure I shall be, if I can go to England.”

এতদিন আমরা জানতাম, মঙ্গলচণ্ডী শিব অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবদেবীর বরলাভ করলে, অথবা কোন রাজসভার বদান্ততার কোলে আশ্রয় পেলে, তবেই কবির কবিত্বশক্তির ক্ষুরণ হয়, তা না হলে হয় না। এইবার মধুসূদনের মুখে প্রথম

ওনলাম যে তা ছাড়াও হয়, সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতেই হয়, কবিশক্তি কবির নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভা ছাড়া কিছু নয়। কবি নয় শুধু, মহাকবিও হওয়া যায়। কেবল যদি ইংলও যাওয়া যায় একবার। এ-ইংলও অবশ্য কেবল মানচিত্রের ইংলও নয়, সাত সমুদ্র তের নদী পারের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা একটা অজ্ঞাত অজানা দেশ, যেখানে বন্ধনমুক্ত মন ছুটে যেতে চায়। রেনেসাঁসের যুগে ইওরোপেও তাই দেখা যায়, দূর দেশ-বিদেশে অজানার সন্ধানে যাত্রা করার আগ্রহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, কবি-শিল্পীদের মধ্যেও। মধুসূদনের জীবনে সেই আগ্রহেরই প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর ইংলও যাবার তীব্র বাসনার মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা, খেয়াল খুশি, উচ্ছ্বলতা ও উদ্দামতা, সবই নবযুগের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। হয়তো খানিকটা অসংযত প্রকাশ, তবু সেটা সমস্ত জড়ত্বের বন্ধনমুক্ত প্রকাশ। রেনেসাঁসের যুগের সমস্ত গুণ ও দোষ নিয়ে গড়ে ওঠা, মধুসূদনের মতো এরকম কবি-চরিত্র তাই বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতকে আর দেখা যায় না। রেনেসাঁসের যুগে ইওরোপের, বিশেষ করে রেনেসাঁসের আদিকেন্দ্র ইতালীর শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রেরণার সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিল ‘Classical Antiquity’— অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক-লাটিন শিল্প-সাহিত্য। সেইটাই ছিল শিল্পীদের ‘model’— সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার অক্ষুরন্তু ভাণ্ডার। কেবল ক্লাসিকাল সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ নয়, ক্লাসিকাল ভাষায় পর্যন্ত তাঁরা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। লাতিন ভাষায় তাঁরা অধিকাংশই সাহিত্যরচনা করতেন এবং তার জন্ত গর্ববোধ করতেন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য-রচনা করলে সাহিত্যের পবিত্র মর্যাদার হানি হবে, এই তাঁদের ধারণা ছিল। ইতালীর রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীদের এই দার্ভিক মনোভাবকে প্রত্যেক ঐতিহাসিকই নিন্দা করেছেন এবং তাঁদের এই ‘proud Latinity’-র কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ তাঁরা খুঁজে পাননি। বাংলার নবজাগরণের যুগের ধর্ম-সংস্কারক ও সমাজসংস্কারকরাও অনেকে ‘ক্লাসিকাল’ যুগের ও ‘ট্রেডিশনের’ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রামমোহন বা বিষ্ণুসাগর কারও মধ্যে এই ‘proud Latinity’-র মতো অন্ধ সংস্কৃতানুরাগ এবং নিজের মাতৃভাষার প্রতি বিজাতীয় বিরাগ ছিল না। প্রথম থেকেই তাঁরা মাতৃভাষার অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করেছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ক্লাসিকাল যুগে সন্ধান করেছিলেন এবং বিশ্বয়কর হল, কেবল ভারতের ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্যের ভাণ্ডার নয়, ইওরোপের

ক্লাসিকাল-সাহিত্যের ভাণ্ডারও তিনি তাঁর উপাদান ও আঙ্গিকের জগ্নে সন্ধান করেছিলেন। মাতৃভাষা বাংলাকে মধুসূদন অবজ্ঞা করতেন, এরকম অভিযোগ করা সম্ভব নয়। মাদ্রাজ থেকে তিনি বন্ধু গৌরদাসকে তাঁর দৈনন্দিন কার্যসূচী সঙ্ক্ষে লিখেছিলেন (১৮৪৯) : “Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit, 5 to 7 Latin, 7 to 10 English, am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?” প্রথম কৈশোর জীবনে তাঁর ঝোঁক বেশি ছিল অবশ্য ইংরেজি ভাষার উপর, যেমন ইংলও যেতে পারলেই তিনি মহাকবি হবেন, এইরকম একটা আজগুবি ধারণা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল ও ভিত্তিহীন, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। একবার ‘আলালের ঘরের দুলালের’ লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ নিয়ে মধুসূদনের তর্ক হয়েছিল। তখন প্যারীচাঁদের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রকাশিত হচ্ছে। মধুসূদন কথ্যভাষায় সাহিত্যরচনা সঙ্ক্ষে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। প্যারীচাঁদ বলেছিলেন যে তাঁর ভাষা ও রচনারীতিই ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের বাহন হবে এবং স্থায়ী হবে। মধুসূদন বলেছিলেন : ‘It is the language of the fishermen, unless you import largely from Sanskrit’—এবং তার সঙ্গে একথাও তিনি বলেছিলেন যে-ভাষায় তিনি (অর্থাৎ মাইকেল) সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, সেই সাহিত্য ও ভাষাই চিরস্থায়ী হবে। প্যারীচাঁদ ও মধুসূদনের উভয়ের কথাই ঠিক। কিন্তু মধুসূদনের ‘মনোভাব’ লক্ষণীয়। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা ছিল না, কিন্তু তার সাধারণ আটপোরে লৌকিক রূপের প্রতি তাঁর বেশ খানিকটা যে অবজ্ঞা ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। এই মনোভাবের মধ্যে কিছুটা অবশ্য ইওরোপের রেনেসাঁস-সাহিত্যিকদের মতো মধুসূদনের ‘proud Latinity’-র বা ক্লাসিকাল আভিজাত্যের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু একথাও ঠিক, তখনকার বর্ধিষ্ণু বাংলা ভাষাকে বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হলে তাকে ক্লাসিকাল সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে অনেক সম্পদ আহরণ করে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। মধুসূদন সেই প্রয়োজনীয়তার কথাও ভেবেছিলেন। কেবল তাই নয়, অর্থাৎ ভাষা নয় শুধু—কাব্যরীতিকেও তিনি ক্লাসিকাল-রীতির সুশৃঙ্খল বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এবং সর্বতোভাবে তার লৌকিক রীতি বর্জন করতে চেয়েছিলেন। সেইজগ্নেই কেবল এদেশের ক্লাসিকাল সাহিত্যের সমুদ্র নয়, বিদেশের ক্লাসিকাল সাহিত্যের বিপুল সমুদ্র মন্বন করে তিনি

অনেক অমৃত, অনেক মণিরত্ন কুড়িয়ে এনে, বাংলা সাহিত্যকে দান করেছিলেন। ইওরোপের আদর্শ রেনেসাঁস-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে এবং হিউম্যানিস্ট intellectualদের সঙ্গে এইদিক থেকে মধুসূদনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কেবল দেশের নয়, বিশ্বের ক্লাসিকাল সাহিত্যের মহাসমুদ্রে তিনি অবগাহন করেছিলেন, বাংলাভাষায় ক্লাসিকাল রীতিতে কাব্যরচনার জন্তে। তাই দেখা যায়, মধুসূদনের কাব্যগুরু কেবল আমাদের ব্যাস-বাল্মিকী নন, বিদেশের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ভাসনোও তাঁর কাব্যগুরু। ‘মেঘনাদবধকাব্যে’ যেমন হোমার ও বাল্মিকীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পড়েছে, তেমনি দান্তে, ভাসনোর প্রভাবও কম পড়েনি। সব মিলিয়ে নানারঙের পাপড়ির একটি সুন্দর ফুল, মধুসূদনের কাব্য এবং সে-ফুল দেশজ ফুল, দেশের অমর সম্পদ।

আইরনের কাজ মধুসূদন সজ্ঞানে সচেতনভাবে করতেন, এবং তার জন্তে বহু পরিশ্রম করে দেশী বিদেশী অনেক ক্লাসিকাল ভাষা তিনি শিখেছিলেন। ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক রচনার পরে তিনি বহু গৌরদাসকে লিখেছিলেন : I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama...In matter literary, old boy, I am too proud to stand before world, in borrowed clothes. I may borrow a necktie, or even a waist-coat, but not the whole suit.” ‘পদ্মাবতী’ নাটক মুদ্রণকালে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—‘It is also written on the Classical model.’ ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মধুসূদন রাজনারায়ণকে যে বিখ্যাত চিঠি লিখেছিলেন, তাই থেকে তাঁর বলিষ্ঠ বিদ্রোহী, এবং অগাধ আত্মবিশ্বাসী কবিচিন্তের প্রমাণ পাওয়া যায় : It is my ambition to engraft exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shant have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের কবির এই নিজের ব্যাখ্যানের চেয়ে সুন্দরতর ব্যাখ্যান কোনো সাহিত্যরসিক আজ পর্যন্ত দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। I shall not borrow Greek stories, but

write, rather try to write, as a Greek would have done”—
মধুসূদনের নিজের এই উক্তি তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সঙ্ক্ষেপে
সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি বলে আমার ধারণা। তিনি কেবল গ্রীক সাহিত্যভাণ্ডার থেকে
সম্পদ আহরণ করেননি। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি এ-দেশের ক্লাসিকাল
বিষয়বস্তু গ্রীক মহাকবিদের মতো করে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা
করেছেন। এদেশের মাটিতে তাই দাস্তুর হোমারের মতো গ্রীক মহাকবির
বিকাশ হয়েছিল মধুসূদনের মধ্যে।

মধুসূদন লিখেছিলেন—I mean to give free scope to my inventing
powers—এই শক্তির প্রকাশ হয়েছে তাঁর অমিতাক্ষর ছন্দের মধ্যে।
অমিতাক্ষরের মধ্যে বিদেশীয় কিছু নেই। প্রাচীন বাংলা কাব্যের পয়ার ছন্দের
মাত্রা-যতি-শৃঙ্খলিত বন্ধনকে মধুসূদন মুক্ত করে দিলেন অমিতাক্ষরের
মধ্যে। তাঁর নিজের বন্ধনমুক্ত কবি-মানসের স্ফূর্তির জন্মে ছন্দের এই শৃঙ্খল-
মোচনের প্রয়োজন ছিল। এখানেও ইওরোপীয় রেনেসাঁসের অনেক কবির
'hexametre' ছন্দে কাব্য রচনার কথা মনে পড়ে, ঐ একই উদ্দেশ্যে। মুক্ত-
চিন্তার অবাধ পক্ষবিস্তারের জন্মে ছন্দের কঠোন বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়োজন।
মধুসূদনের বিদ্রোহী ও বন্ধনহীন কবিমানস তাই অমিতাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনে সার্থক
হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের প্রহসন রচনা সঙ্ক্ষেপেও দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।
আগে বলেছি, রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক লক্ষণ হল—individua-
lityর বা ব্যক্তিসত্তার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বতঃস্ফূর্তি এবং প্রবল যশাকাঙ্ক্ষার মধ্যে
তার প্রকাশ। বাংলাদেশে মধুসূদনের আমলে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের চরিত্রে
এই স্বাতন্ত্র্যের যে চরম বিকাশ হয়েছিল, সেরকম আর কখনও হয়নি।
মধুসূদনের নিজের চরিত্রেও এই উৎকট স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ যথেষ্ট ছিল।
রেনেসাঁসের যুগে ব্যক্তি চরিত্রের যখন এই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হল এবং যখন
নানারকম উদ্ভট ও উৎকট আচার-ব্যবহারের মধ্যে তার প্রকাশ হতে লাগল—
তখন ব্যক্তি ও দল দুই-ই আবার 'বিদ্রূপের' খোরাক যোগাতে লাগল শিল্পীদের।
ইওরোপে রেনেসাঁসের যুগে তাই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ হয়েছিল
দেখা যায়। বুখার্ট তাই বলেছেন : The corrective, not only of this
modern desire for fame, but for all highly developed individuality
is found in ridicule.” এবং মহাকবি দাস্তুর সঙ্ক্ষেপে বলেছেন যে “in the

utterance of scorn Dante leaves all other poets in the world far behind.” মধুসূদনের আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক আমলে এই প্রহসনের একটা প্রবল ধারা বয়ে আসছিল—একেবারে কবিরাজদের থেকে আরম্ভ করে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের ব্যঙ্গরচনার ভিতর দিয়ে। মাইকেল এই ধারাকেও সমৃদ্ধ করেছেন, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ইত্যাদি প্রহসন রচনা করে। Young Bengal দল এই প্রহসন রচনায় এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, যে তাঁরা প্রতিবাদ করে শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই প্রহসন অভিনয় করতে দেননি। কিন্তু কিম্বদন্তি ব্যাপার হল এই যে—যে-মধুসূদনের নিজেরই চরিত্রে ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব বোধেই ছিল, তিনি শিল্পী হিসেবে স্বাধীনভাবে সেই ইয়ং বেঙ্গলের নির্মম সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। এ যেন কতকটা কঠোর আত্মসমালোচনার মতো মনে হয়। মধুসূদনের চরিত্রে শিল্পীসত্তার স্বাতন্ত্র্য যে শেষ পর্যন্ত উন্মার্গ হয়নি, দেশের ও জনসমাজের কল্যাণের আদর্শেই উদ্ভূত হয়েছিল—এ হল তারই প্রমাণ।

এই সব কারণেই আমরা মাইকেল মধুসূদনকে বাংলার রেনেসাঁ-যুগের সর্বপ্রথম আদর্শ কবি বলতে পারি। রেনেসাঁসের গুণ ও দোষ দুইই তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে মিলিত হয়ে তাঁর সত্তাকে গড়ে তুলেছিল। তাঁর শিল্পীসত্তা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিচরিত্রের দোষগুলির উদ্দেশে উঠে, নবজাগরণের যুগের সমস্ত ঐতিহাসিক গুণগুলিকে আত্মসাৎ করতে ব্যর্থ হয়নি। সেই আত্মীকরণের স্বাক্ষর তাঁর সাহিত্যে অঙ্কর হয়ে রয়েছে। সেইটাই তাঁর কালোস্তীর্ণ কীর্তি। রেনেসাঁসের যুগে মধুসূদনের মতো এরকম typical ব্যক্তি এবং এরকম ideal কবি বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে আর কেউ জন্মাননি। তিনিই নবযুগের বাংলার প্রথম ও প্রধান কবি, তিনিই রেনেসাঁসের যুগের সমস্ত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে ও কবিমানসে আত্মসাৎ করে, বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সুশোভনার কাহিনী

এক

সুশোভনাকে ভূতে ধরেছে।

কিন্তু কিছুটা আত্মপূর্বিক বলা দরকার।

সুশোভনার বিয়েটা ভালোই হয়েছিল। ঘর-বর সবই ভালো। সকলেরই খুশি হওয়ার কথা—কতাপক্ষের সকলেরই। এই মকসল শহরে এমন একটা বিয়ে অনেকদিন হয়নি।

লাখপতির ঘর নয়। বড় জোতদারের ঘর। পাশের শহরে। ট্রেনে যেতে দেড়ঘণ্টা। বর উকিল। বুদ্ধিমান চৌধুরী, বছর বাইশ-তেইশের একটি যুবক। মেয়েরা যেখানে নানা কাজকর্মে জটলা করছে সেখানে সুশোভনার ঠানদি বললো, 'বুঝলি, কনের মা, আমারই লোভ হয়।'

কথাটা এমন কিছু নয় কোন ঠানদির পক্ষে। কিন্তু সুশোভনার ঠানদি তার মায়ের চাইতে বয়সে ছোট, সম্বন্ধে খুড়িশাশুড়ি। তার বয়স এখনও যৌবনের কাছে ঘেঁষা। ঠানদির পদবী নিয়ে এসব সুযোগে তিনি যা রসিকতা করেন তা একসঙ্গে সব বয়সের মেয়েদের বিশেষ করে অবিবাহিতাদের শোনা উচিত নয়।

সুশোভনার মা বললো, 'আ, খুড়ি, মুখ বন্ধ কর তুমি।'

'বাঃ, যা করলাম, তা বলতেই দোষ। শুধু দেখে মজিনি। চিবুকে হাত দিয়ে সেই হাতে চুমু খেয়ে চেখে দেখলাম যে। মধুর মতো লাগলো।'

সুশোভনার মা কপট ক্রোধে বললো, 'ছি-ছি, বুড়ি হলে।'

‘বলিস কি ? তাই বলে ।’

সুশোভনার মা তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না । কোমর জড়িয়ে ধরে সে ঘর থেকে তাকে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বললো, ‘চলো ওদিকে, কাজ পড়ে রয়েছে সব ।’

ঘরের মধ্যে যে সব মেয়েরা কাজ করছিল তাদের বয়স ষোল থেকে ত্রিশের মধ্যে । তারাই উপভোগ করছিল ঠানদির রসিকতা । তাদের একজন বললো সুশোভনার মাকে, ‘আপনি ঠুঁকে নিয়ে যাচ্ছেন আমরা শুনলামই না বর কি রকম ।’

‘বল, তোরাই বল ।’

সুশোভনার মা শাসনের ভঙ্গিতে বললো, তার চোখ ঠোট আনন্দে ঝক্ ঝক্ করছে, ‘তোমরা নিজে গিয়ে দেখে এলেই তো পারো । ও পান নিতে এসেছে, দিবে বিদেয় করো । রাজ্যের কাজ পড়ে আছে ।’ বলে নিজেই একটা পান তুলে ঠানদির মুখে ঝুঁজে দিল ।

মেয়েদের মধ্যে দু-একজন সম্বন্ধে সুশোভনার মায়ের জায়ের মতো । একজন বললো, ‘নিজেরা যাব কি গো বরযাত্রীদের আধড়ায় ।’

একটা আনন্দ, উত্তেজনা, কৌতূহলের অদৃশ্য স্রোতে ঘরের মেয়েগুলি যেন ফুলের মতো ভাসছে । একটি সরল নব-বিবাহিতা প্রশ্ন করলো, ‘দেখতে কি রকম ঠানদি ?’

পানটা গালের একপাশে সরিয়ে মুখটা একটু উঁচু করে এক চিমটে দোস্তা মুখে ফেলতে ফেলতে ঠানদি বললো, ‘এক কথায় বুঝবি, ঠিক আমাদের রবির মতো ।’ ঠানদি চলে যাচ্ছে দেখে মেয়েরা বলল—‘শোন শোন—’

কিন্তু সত্যি সত্যি কাজ ছিল ঠানদির । পোলাউ-এর ভারটাই ছিল তার উপরে ।

মেয়েরা ঘরের মধ্যে কাজ করতে করতে আনন্দের উত্তেজনায় ভাসতে লাগলো । বাইরে বাশি বাজছে । অনেক লোক অনেক কথা তরল স্বরে বলছে । মেয়েদের দু-একজন ঠানদির অহুকরণে বরের স্বাদ নিয়ে আলাপ করলো । খুব কম বয়সী যারা তাদের কান লাল হয়ে উঠলো মাথা নিচু করে কাজ করার ভঙ্গিতে তা শুনতে শুনতে ।

রবির মতো ? তা হলে তো ভালো, খুবই ভালো ।

ঠিক পাশের ঘরে সুশোভনাকে ঘিরে তার বন্ধুর দল তাকে সাজাচ্ছে । দু-ঘরের

মধ্যেকার দরজাটা খোলা। এঘরের কথা ওঘরে যাচ্ছে। সাজানো নিয়ে আলাপ হচ্ছে। বাসর ঘরে কি কথা বলবে সুশোভনা এ নিয়েও প্রশ্ন হচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে বন্ধুরা। একজন বললো, ‘আমরা একালের মেয়ে। চট করেই কিন্তু প্রিয়তম ট্রিয়তম বলে বসিস না।’ অন্য বন্ধুরা বললো, ‘ভারি তোর অভিজ্ঞতা দেখছি।’ অন্য একটি মেয়ে সাজাতে বসে সব সময়েই প্রায় সুশোভনাকে ছুঁয়ে থাকছে। এ পর্বস্তু গায়ে পা লাগার ছলে দু-তিনবার চুমু খেয়েছে সুশোভনাকে। সে বললো, ‘চট করে কিন্তু গায়ে হাত দিতে দিসনে।’

কিন্তু এ ঘরে সবাই অবিবাহিত। এদের কণ্ঠস্বর সেজন্তে অত্যন্ত নিচু।

সুশোভনা স্থির হয়ে বসে আছে। কখনো বিন্ বিন্ করে ঘাম ফুটছে তার কপালে। কখনো সে থর-থর করে কেঁপে উঠছে। গাল দুটো অনবরতই যেন লাল হয়ে আছে। হাত দু-খানার অদৃশ্যপ্রায় লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে একটা আনন্দের উজ্জ্বলতা।

এমন সময়ে সুশোভনার দাদা রবি এসেছিলেন। ‘আর কত দেরি? বর আনতে যাচ্ছি।’

‘আমরাও রেডি।’

‘হ্যাঁ। রবিদা, বর নাকি তোমার মতো দেখতে।’ সুশোভনার এক বান্ধবী বললো।

‘নিজের চেহারা কি দেখেছি। লোকে তাই বলছে। না কি বদলে নেয়া যায়।’

সুশোভনার দাদা রবি এবারে ডাক্তারি পাশ করেছে। স্বাস্থ্য ভালো রূপবান সে। শহরের অনেক মেয়ের সঙ্গেই তার বিবাহের প্রস্তাব উঠছে। সুশোভনার বান্ধবীদের মধ্যেও তারা ছিল। অন্য কোন সময়ে হলে মেয়েরা সরে যেতো, রবিও সোজাসুজি চাইতো না। কিন্তু আজকের ব্যাপার অগ্নরকম। বর কি রকম তা বুঝবার জগুই যেন সকলেই রবিকে ভালো করে দেখলো।

বিয়েটা আনন্দের মধ্যে সুশৃঙ্খল শাস্ত্র সুখের মধ্যে মিটে গেল। অনেক মেয়েই নিজের নিজের বিয়ের রাত্রির কথা স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। ও পাড়ার মধু চৌধুরী কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছে। বিয়েতে যেতে পারেনি। তার স্ত্রী বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরলো।

‘কি রকম দেখলে?’ মধু প্রশ্ন করলো।

‘খুব ভালো, বেশ।’

‘বর কি রকম?’

‘ভারি সুন্দর । একেবারে যেন তোমার রবিডাক্তার । যমজ বলে মনে হয় । শুধু এর রংটা যেন আরও উজ্জ্বল । ফুরফুরে পাতলা ঠোঁটের উপরে সরু একটি গোঁফের রেখা, রবির যা নেই ।’

মধুর বউ মশারি তুললো । মধু বউএর দিকে তাকালো । সে দেখতে পেল ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপরে বউএর বিয়ে বাড়ি যাবার পোশাক জড়ো করা ।

মধু বললো, ‘ডাক্তার মানা করেছিল ।’

মধুর বউ বিছানায় উঠে এল ।

দুই

কোথা থেকে কি হয়ে যায় । দ্বিরাগমনের পরে যখন যাবার সময় হল সুশোভনা বললো, ‘আমি যাবো না, মা ।’

মায়ের চোখেও জল, মেয়েরও তাই ।

একদিন সুশোভনার বাবা বললেন, ‘চিঠি লিখেছি বটে, রাজিও হয়তো ওরা হবে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে ।’

‘সে কি আর বুঝছি না । মেরেকে স্বস্তরবাড়ি পাঠিয়েই আনন্দ, অথচ কাঁদতেও হয় । দু-দিন পরে ওরও সে বাড়ির উপরে টান হবে । সব মেয়েরই এমন হয় । সবাই বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে কাঁদে । পরে বাপের বাড়ির কথা মনেও পড়ে না । কিন্তু ওর কান্না যেন একটু বেশি, একটু যেন বেশি মনে হয় ।’ বাবা বললেন, ‘মেয়েদের কথা মেয়েরাই বোঝে ভালো । তোমারও হয়তো এমনি হয়েছিল ! আমার কিন্তু কষ্টই হয় ওর কান্না দেখলে । কি যেন বলতে চায়—না বলে কাঁদে । ওর ছোটবেলার ধরনটাই এমনি ছিল ।’

‘ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ওতো আর ছোট-টি নেই ।’ বাবার হাই উঠলো । ঘুম পেয়েছিল । বেদনা বোধ করছিলেন তিনি কিন্তু সে বেদনার ধারে কাছে সুখও ছিল । মেরেকে সৎ-পাতে সম্প্রদান করার সার্থকতা বোধ ছিল । বললেন, ‘শোবে না ?’

প্রায় একমাস থাকলো সুশোভনা বাপের বাড়িতে । ওপক্ষ বিবেচক । তারা উচ্চবাচ্য না করেই রাজি হয়েছিল । কিন্তু সে মাসটা শেষ হল । সুশোভনা কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে স্বস্তর বাড়ি রওনা হল । মা ভেবেছিলেন শক্ত হয়ে থাকবেন, কিন্তু মেয়ের কান্না দেখে তিনিও কাঁদলেন । এমন কি রসিকতার যার যুখে থৈ কোটে সেই ঠানদিও । একজন বৃদ্ধা বললো—আজকালকার মেয়ে

এমন কাদে, তাতো জানি নে, বাছা। সুশোভনার বাবা বললেন, ‘সামনেই পুজো। তখনই আনব, মা। আর কাদিস নে। দাদা তো সঙ্গেই যাচ্ছে।’

সুন্দরী সৎ-পাত্রস্বা একটি মেয়ে অগ্ন্যস্ত্র বাঙালী মেয়েদের মতোই স্বস্তুর বাড়ি গিয়েছিল। তার বাবা-মাও পুজোয় মেয়ে আসবে জামাইএর সঙ্গে এ আশা নিয়ে রইলেন। সুশোভনা এলও বটে। পুজোর দু-চার দিন আগেই, কিন্তু ঘাড়ে ভূত নিয়ে।

বাড়ির সামনে হঠাৎ দরজা বন্ধ পাক্কী ঘোড়ার গাড়ি থামতে দেখে যারা অবাক হয়েছিল, সুশোভনার বরকে নামতে দেখে তারা আনন্দে কোলাহল করতে গিয়ে বেমে গেল। তার উদ্ভাস্ত ভাবটার পিছনেই মূর্তিমতী উদ্ভাস্তির মতো নামলো সুশোভনা। তার মাথার চুলগুলো উকোখুকো, চোখ জোড়া টকটকে লাল। পরনের দামী কাপড়টা অবিচল হেঁড়া খোড়া। টলতে টলতে এগোচ্ছে সুশোভনা, তার বর তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আনছে।

সুশোভনার মা ডুকরে কেঁদে উঠতে উঠতে জামাই তাকে ইশারার নিষেধ করলো কাদতে। ‘ওকে একটু শুইয়ে দিন। পরে সব বলছি।’

সুশোভনাকে শুইয়ে এসে মা বললেন, ‘এমন কি করে হল।’

‘কাপড়টা গাড়িতে আসতে আসতে ছিঁড়েছে।’

‘কি হয়েছে?’

‘ঠিক বুঝতে পারছি নে।’ মনে হল সুশোভনার বর কান্নার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার।

‘তুমি না পারলেই, তোমার বাড়ির লোকেরা?’ বিচক্ষণ জেরা করলেন মা।

স্পষ্টতই বিধা করতে লাগলো সুশোভনার বর। অবশেষে বললো, ‘ভূতে ধরেছে।’

‘ভূত?’

‘তাই বলছে।’

‘ভূত?’

‘ঠিক কি তাই বুঝবার জন্তই নিয়ে এলাম।’

‘ভূত ধরেছে?’ সুশোভনার মা মাটিতে বসে পড়লেন।

এসব ব্যাপার কবে কোন্ মুহূর্ত থেকে শুরু তা বলা যেমন কঠিন, ধাপে ধাপে কি করে এ সব হল তা বলাও তেমনি শক্ত।

সুশোভনার বর বাপ-মায়ের কাছে মেয়েকে গছিয়ে দিতে আসেনি। তাদের

সাহায্যে স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করাই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই সে কিছুই গোপন করলো না।

ব্যাপারটার সঙ্গে শনিবার অমাবস্তা প্রভৃতির যোগ আছে।

প্রথম যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল তা এই রকম : সুশোভনার আট ন-বছরের একটি ননদ আছে। বৌদিকে সে যত ভালো বাসে, বৌদিও বেশ হয় তার চাইতে কম ভালো বাসে না। এক শনিবারের বিকেলে সুশোভনা তাকে চড় মেয়ে বসলো। মারাটা খুব জোরেই হয়েছিল।

তখন রোদ পড়ে আসছে। সুশোভনার ক্ষুদে ননদ গিয়ে বললো, ‘বৌদি, চুল বেঁধে নাও।’

‘এখনই, কেন রে ? আয় গল্প করি। সারা দুপুর কি করে বেড়ালি ?’ সেলাই সরিয়ে রাখলো সুশোভনা।

‘মা বললেন, আজ শনিবার।’

‘শনিবারে কি আগে ভাগে চুল বাঁধতে হয় ?’

‘বাহ। তুমি জানো না বুঝি,’ চোখ বড়বড় করে বললো ননদ, ‘শনিবারে এলো চলে বেড়ালে ভূত ধরে।’

‘তা ধরুক। তুই সারা দুপুরে আজ একটা অঙ্ক করিসনি কিন্তু।’

‘তা হোক। মা বললেন, তুমি ওঠো। গা ধুয়ে নাও, চুল বেঁধে একটা ভালো শাড়ি দেখে পরো।’

‘কোথাও যেতে হবে নাকি ?’

‘না গো না। কে আসবে তা জানো না ?’

‘কে ?’

‘আজ শনিবার। দাদা ফিরবেন সদর থেকে।’

সুশোভনা একটু যেন শিউরে উঠলো। (তার ননদ সাক্ষ্য দিয়েছে চমকে উঠলো বলে।) তারপর সেলাইটা আবার টেনে নিল।

ননদ বক্ বক্ করে চললো, ‘তোমার যেন কিছু মনে থাকে না বৌদি। তুমি যে বলেছিলে দাদার একটা ফটো চাও। ভালো করে দেখবে বলে, তা আজ আমি যোগাড় করে রেখেছি। কিন্তু কি যে লোক তুমি বুঝি না। লোকটাকে কি তুমি দেখতে পাও না ? লজ্জা করে মুখের দিকে তাকাতে না ? আচ্ছা লোককে মুখ দেখানোর সময়ে তুমি যেমন চোখ বুঁজে থাকো দাদার সামনেও তেমনি করে থাকো বুঝি ! তা তুমি আমার দাদাকে না-দেখে থাকো

নিজের দাদাকে তো দেখেছ। তা হলেই চিনতে পারবে। হুবহু এক রকম।’

‘কি, যা তা বলিস।’ সুশোভনা ক্যাকাশে মুখে বললো।

‘সত্যি বলছি। তুমি তো দুজনকে দেখনি তাই বলতে পারো না। আমি দুজনকেই খুব ভালোভাবে দেখেছি। প্রায় একই রকম দেখতে।’

হঠাৎ এই জায়গায় ননদকে চড় মেরে বসলো সুশোভনা। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি। মারের শব্দ দূর থেকে সুশোভনার শাশুড়ি শুনেছিলেন। তারপর ননদ কেঁদে উঠলো।

সুশোভনার বর বলেছে : সেটা একটা লজ্জার রাত্রি। নতুন বউএর এরকম রাগটা অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকেছিল। একটু মুখচাওয়া-চাওয়ি হয়েছিল।

‘তুমি কি শাসন করেছিলে?’ সুশোভনার মা জামাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

‘না। এ অবস্থায় শাসন করার কি আছে। ওদের দুজনকে, আমার বোন আর সুশোভনাকে ডেকে একজায়গায় বসিয়ে রেখেছিলাম। এক সময়ে লুকিয়ে দেখলাম দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।’

সুশোভনার দাদার প্রশ্নের উত্তরে জামাই বলেছিল জনান্তিকে ‘নিশ্চয়ই আদর করেছিলাম। পাছে তার মনে কোন সন্দেহ থাকে ব্যাপারটা মিটে যাওয়া সম্বন্ধে বরং একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল আদরের।’

‘তারপর?’

‘প্রতি শনিবারে কিছু না-কিছু ঘটতে লাগলো। এক শনিবারে মাঝরাতে দেখি বিছানায় নেই। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম রান্নাঘরের বারান্দায় মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এক শনিবারে বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে মাথা কাটলো।’

‘মাথা কাটলো?’

‘তা অনেকটা। আপনারাই তো খাট-টা দিয়েছেন। ঘরজোড়া খাট। তা থেকেই পড়ে গেল।’

সুশোভনার দাদার কাছে জনান্তিকে জামাই বললো, ‘পড়ে যাওয়ার কারণটাকে আমি ভূতের ভর বলতে পারি না। ওর একটা অভ্যাস আছে। পাশাপাশি ছুটি মানুষ শুলে ঘুমের ঘোরে অনেক সময়ে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি জেগে থাকতে বরং কাছে থাকে— ঘুমের মধ্যে সে যেন দূরে দূরে সরে যায়। নিজে না ঘুমিয়েও আমি পরীক্ষা করেছি। ও ঘুমিয়ে আছে—ওর দিকে আমার হাতটা এগিয়ে দিলাম—উঁ করে ও সরে গেল।

এরকম করে করে ও খাটের ধারে গিয়ে পৌঁছায়। অনেক সময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কাছে টেনে আনতে হতো।

‘কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কবে থেকে হল।’ সুশোভনার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘আমি ছুটি করে বাড়িতে আসবার পর।’

‘তুমি ছুটি নিয়েছ, মানে কোটে বেরুচ্ছ না। সবই ভাগ্য। এখন উঠতি পসার।’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জামাই বললো, ‘কিন্তু এদিকে না তাকিয়েই বা কি উপায়।’

সুশোভনার বর বললো, ‘ময়লা জিনিসের দিকে ওর একটা টান জন্মেছে।

একদিনের ঘটনা বলি। সে দিন ছুটি ছিল বাড়িতেই ছিলাম আমি। বেড়াতে বেরুচ্ছি, শুনলাম মা ওকে ডাকছেন। ওর উত্তর নেই। শুনতে পাচ্ছে না

হয়তো। মনে হল বলে যাই। শোবার ঘরে ছিল না। অন্য ঘরে

খুঁজতে যাব এমন সময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। দেখি ঘরের পিছন

দিকে বসে এক ডাঁই গোবর নিয়ে বসে দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। ডেকে

আনলাম। বললাম—ঘুঁটের এমন কি দরকার হল। ‘ঘুঁটে?’ ও যেন

অবাক হল। আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। সংসারে ছোট ছোট অনেক

ঘটনা ঘটে। সাধারণ সময়ে সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ টেনে বার করা হয় না।

কিন্তু এ বেলায় একটার কথায় আর একটার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

এই ঘুঁটে দেয়ার আগে গোবর নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল। চাকরকে

বলেছিলাম আমার ঘরের পিছনের বাগানে সার দিতে। সে কাঁচা গোবর এনে

ডাঁই দিয়ে রেখেছিল বাগানে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বাইরে গিয়ে

ঘুমিয়েছিলাম সে রাত্ৰিতে। পরের দিন চাকরকে গালাগালি করেছিলাম।

সুশোভনা খুব কৌতুক বোধ করেছিল যেন ব্যাপারটায়। কিন্তু এই শেষ নয়।

আর শুধু গোবর নিয়েও নয়। সন্ধ্যায় যখন অত্যাঁচ মেয়েরা হাত পা ধুয়ে কাপড়

ছাড়ছে। সুশোভনা যেন সারাদিন পরে জেগে উঠলো ময়লার টানে। হয়

ঘুঁটে দেয়ার চেষ্টা করে, নয় পুরনো বাসন মাজতে বসে, কিছু না পেলে উঠান

ঝাঁট দিতে লেগে যায়। শরীরটাও ভালো থাকছিলো ওর। গাল ভেঙে, চোখ

বসে লোকটাই যেন বদলে যেতে লাগলো। এর পরে আমি ছুটি করে বাড়িতে

এসেছিলাম। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। বরং যেন আরও ক্ষেপে গেল।

রাগা-রাগি নয়, অসন্তোষ নয়, বৈকে বসলো খাবো না। একবেলা নয়, দু-বেলা

নয়, পর পর তিনদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেলো না। তখনই স্থির করেছিলাম

এখানে নিয়ে আসব। কিন্তু সেদিন রাত্ৰিতেই ঘটনাটা ঘটে গেল। মাঝ

রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ওর বিছানায় ও নেই। উঠে বসে দেখলাম দরজা খোলা ভেজানো, একটু কঁক আছে। সে দিকে চেয়ে আছি এমন সময়ে মনে হল সাদা কাপড় পরা কে একজন সে ভেজানো দরজার কঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে। তার দিকে চাইতেই সে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার ঘরের মূহু আলোটা বাইরে গিয়ে পড়েছিল বলেই হাতছানির ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। বাইরে বেরুলাম। কিছু দেখতে পেলাম না। যে হাতছানি দিয়েছিল সে যেন হাওয়ার মিলিয়ে গেল। একটা বেড়াল ডেকে উঠলো। উঠানের ওপারের আমগাছটার একটা পানি ঝটপট করে উঠলো। অন্ধকারে উঠানের এদিক ওদিক খানিকটা ছায়ার পিছনে ছুটে ঘরে ফিরে এসে আবার টর্চ নিয়ে বেরুলাম। টর্চের আলোয় দেখলাম রান্নাঘরের দরজা খোলা। সে ঘরে গিয়ে দেখলাম—কেউ নেই সেখানে। আমার মনে হল সুশোভনাকে চিৎকার করে ডাকি। কেলেকারির ভয়ে নীরবে তাকে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে পেলাম তাকে। বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট ডোবা আছে। সেখানে ছাই ফেলা হয়। আস্তাকুড়। ভাঙা হাঁড়িকুড়ির মধ্যে সে বসে আছে। শুধু বসে থাকা নয়, কি খাচ্ছে। দেখলাম আচলে ভাত—আর—আনসে রাখা কাঁচা কাঁচা মাছ। টর্চের আলোয় সে উঠে দাঁড়ালো। একটা অলৌকিক ভয়ে। পিছিয়ে আসছিলাম এমন সময়ে সে ককিয়ে কেঁদে উঠলো।’

সুশোভনার মা বললেন, ‘আহা তিনদিন খায়নি। কী ক্ষিধেই পেয়েছিল। তুমি তো বকোনি বাবা?’

‘না, বকিনি।’ হঠাৎ সুশোভনার বরের চোখ দিয়ে জল পড়লো, কোলে করে তাকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। নিজে হাতে তাকে স্নান করিয়ে দিলাম। ঘরে নিয়ে গিয়ে সারা রাত তাকে বুকে জড়িয়ে রাখলাম। সে একটা রাত্রি গেছে আমার। বেড়ালের চোখ দেখেছেন নিশ্চয়ই—কখনো তার দৃষ্টি তীব্র কখনো অস্পষ্ট—পর্যায়ক্রমে এরকম হতে লাগলো। কখন তার চোখ ঘুমে ভরে আসছে। কখনো কটমট করে তাকাচ্ছে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো। একথা আমার বাড়ির কেউ জানে না, আপনারাও বলবেন না।’

‘কবে এটা হয়েছিল?’

‘গত শনিবারে।’

সুশোভনার বাবা বললেন, ‘আচ্ছা। রবি দেখেছে ওকে। বললো জ্বর, একটু ব্রংকিয়াল ট্রাবলও আছে। সেরে যাবে। এখন কিছুদিন আমার কাছে থাক।’

সুশোভনার বর তখন ফিরে যাচ্ছে। সাধারণতঃ যা হয় না, তাই হল। তার ঠোট কাঁপতে লাগলো, চোখে জল দেখা দিল। সে বললো, ‘আমি যেন ওকে ফিরে পাই।’

তিন

চিকিৎসা রবিই করছিল। জ্বর কমে আসছে, ধীরে ধীরে, বুকের দোষ প্রায় সেরেই গেছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল তারই ঘোরে যেন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন। রবি বলে দিয়েছে কেউ যেন ঘুম না ভাঙায়। ঘুম ভাঙলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়, তখন সে দেখে যাবে।

ঘুম ভাঙলেই রবি আসে। রোগী দেখে। পথ্যর ব্যবস্থা করে। ওষুধ পাণ্টায়। একদিন বিপদ দেখা দিল। সুশোভনা ক্লান্ত গলায় মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। রবি এল।

হঠাৎ সুশোভনার দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে উঠলো। আশ্চর্য উজ্জ্বল সেই কাঠি। কিছুক্ষণ সে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো রবির দিকে। দুর্বল হাত দিয়ে সে মাথায় কাপড় দেয়ার চেষ্টা করলো। যেন উঠে বসবে এমন ভঙ্গি দেখালো।

মা বললেন—‘চিনতে পারছিস না, ও রবি।’

রবি খাটের দিকে আর একটু এগিয়ে এল। ‘খুব পারছে চিনতে। দেখি তোর হাতটা।’

‘কে, দাদা?’

‘ইয়ারে।’

‘দাদা?’

‘তা নয় তো কি।’

‘দাদা? আমাকে ছুঁয়ো না, বলছি ছুঁয়ো না।’

বিচক্ষণ ডাক্তারের মতো রবি বললো, ‘ঠিক আছে।’

রাত্ৰিতে মা বললেন—‘কি হবে?’

‘অনেকটা সেরেছে দেখতেই পাচ্ছ। আর একটু ঘুম দরকার। খুব সাবধানে ওষুধ দিতে হচ্ছে তো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেরে যাবে। তা ছাড়া কাল ওকে ভাত দেব। পরশু শুক্রবার সদরে যাব। সেখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে কথা করে যদি তাঁরা ব্যবস্থা দেন রবিবারে ফিরব। আর যদি তাঁরা রোগীকে দেখতে চান তা হলে শনিবার রাত্ৰিতে ফিরে রবিবারে ওকে নিয়ে সদরে যাব।’

২ রবির 'ওষুধ' কাজ করবে বলে মনে হল। সুশোভনা অল্পপথ্য করলো। উঠে বসলো তো বটেই, দু-এক পা করে হেঁটে চলে বেড়াতেও লাগলো। মা মনে মনে দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানৎ করলেন। অস্বাভাবিকতা কিছুই যেন আর নেই। সে বৃহস্পতিবারে বললো—বাবাকে বলে একটা ভালো শাড়ি আনাও মা। এটা তো ভালো নয়। মা সুশোভনার ট্রান্স খুলে শাড়ি বার করে দিলেন। শুক্রবারে সে বললে, 'কি যে হয়েছে বাড়ি। ক-দিন ছিলাম না, আমার বইগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। একটা উপন্যাস দাও না মা পড়ি।' সুশোভনার মা উপন্যাস বার করে দিলেন আলমারি থেকে। সবই স্বাভাবিক। শুধু বই পড়তে পড়তে যেখানে শুয়ে সুশোভনা ঘুমিয়ে পড়েছে, বিকেলে তাকে ডাকতে গিয়ে মা দেখলেন—বইএর অনেকগুলি পাতা মাঝে মাঝে কুটি কুটি করে ছেঁড়া।

তা হোক রবি বলে গেছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সে হয় আজ রাত্রিতেই ফিরবে কিম্বা কাল সকালে।

সন্ধ্যাবেলার সুশোভনাকে একা রেখে মা কোথাও যান না। অন্য একজন রান্না করছে। মা সুশোভনার কাছে বসেছিলেন। সুশোভনা একটা বই পড়ছে। বাবা এলেন।

'ও কি আজই আসবে?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। আজই তো শনিবার মনে ছিল না। আচ্ছা এবার ঠিক করে রেখে দেব।'

'যে অন্ধকার রাত। আজ আবার অমাবস্যা। কাউকে লণ্ঠন দিয়ে স্টেশনে পাঠাই কি বলো।'

'তাই ভালো।'

বাবা চলে গেলে সুশোভনা বললো, 'কে আসবে, মা?'

'তোমর দাদা।'

'দাদা?'

সুশোভনার মায়ের মনে আছে এ ছাড়া সে কিছু বলেনি। একবার শুধু যেন বিরক্তিতে উঁ করে উঠেছিল।

মা বললেন, 'কি রে?'

'কিছু না তো।'

কিন্তু মাঝ রাত্রে হঠাৎ সুশোভনা উঠে বসলো। ঘরের কোণে মিট মিট করে

আলো জ্বলছে।' মায়ের মনের আছে স্মৃশোভনাই যেন তাকে নাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছিল।

'কে এলো, মা?'

'কে আবার আসবে।' কিছুক্ষণ আগে কে যেন এলো, বাবা দরজা খুলে দিলেন।'

'তা হলে তোর দাদা।'

'তাই হবে,' বলে স্মৃশোভনা আবার শুয়ে পড়েছিল।

মা বলেন আধঘণ্টাটেক বাদেই তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলেন দরজা খোলা, বিছানায় স্মৃশোভনা নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় ও বাথরুমে খুঁজে না পেয়ে মা সকলকে জাগিয়ে তুললেন। মা আনুপূর্বিক সব বলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। রবিই এসেছিল রাত্রিতে।

সে বললো, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো। আমার মনে হচ্ছিলো বটে জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে কে আমার মশারি তুলবার চেষ্টা করছে। ঘরের আলোয় মনে হল বটে অস্পষ্টই মানুষের ছায়া দেখলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

স্মৃশোভনাকে পাওয়া গেল। বাড়ির পিছন দিকে আগাছার জঙ্গলে একটা পিটুলি গাছ ছিল তার ওপরে সে যেন পা দুলিয়ে বসে আছে। ডাকলে সে কি নামবে? পড়ে যাবে না তো। দু-তিনজন সাহসী ছেলের সাহায্যে দড়ির দোলা তৈরি করে তাকে শুইয়ে স্মৃশোভনাকে নামিয়ে এনেছিল রবি। তখন সে বেহুঁশ।

চার

'আপনি কে?'

'তুমি কে তাই বলো।'

'আমি এই বাড়ির মেয়ে স্মৃশোভনা। আমার বাড়ির লোকরা কোথায় গেল?'

'অনেক ছেনালি করেছে। এখন বলো তুমি কে।'

'কী ছোটলোক, কী অসভ্য!'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ। পালানোর পথ বন্ধ, আগে পরিচয় দাও।'

স্মৃশোভনা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। 'মা, ঘুম পাড়িয়ে রেখে কোথায় গেলে। মা, মাগো।'

'দেখো ওসব কান্না অনেক শুনেছি। ভালোয় ভালোয় পরিচয় দিয়ে বলো কোথায় তোমার পিণ্ডি দিতে হবে।' ওঝা বললো।

‘ছোটলোক, ইতর। মা বোন নেই তোমার।’

‘এই তো ভাষা ফুটছে।’ ওঝা খুশি হল যেন।

‘তুমি এ ঘর ছাড়বে কি না বলো। মেয়েমানুষের লাথি খাবার জন্তে দাঁড়িয়ে আছে।’

‘ঠিক, ঠিক। তাহলে পরিচয় দেবে না। এই সরার আগুন দেখছো। ওতে মরিচ আর গন্ধকের গুঁড়ো দিয়ে যে ধোঁয়া হবে তার উপরে তোমার মুখ চেপে ধরব। আর হাতে এই কঞ্চি দেখছো তাড়ব তোমার পিঠে।’

বন্ধ ঘর। ঘরের মধ্যে সরায় গনগনে আগুন। দরজার কাছে একজন অচেনা পুরুষ। সুশোভনা একটা মালুরে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল তার শোবার ঘরে। সেটারই এখন এই পরিবর্তন। সুশোভনা অন্তত পনের মিনিট ধরে মা-বাবা-দাদাকে চিৎকার করে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। তারপর হাউ মাউ করে কেঁদেছে। অবশেষে সাহসে ভর করে দাঁড়িয়েছে যেন।

‘তুমি মনে রেখো, যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তোমার আমি মরে খাবার আগে তা হবে না। চামার, জন্তু কোথাকার।’

‘বাহবা। তা হলে মস্তুরে বাধবো। কিন্তু আরও একটা মস্তুর আছে আমার। কাপড় কেড়ে নেব?’

সুশোভনা হাঁপাতে লাগলো। হাতজোড় করে বললো ‘তুমি আমার বাবা, তোমাকে বাবা বলছি।’

‘বেশ কথা। বলো তুমি কে।’

‘কি শুনলে তুমি সুখী হও?’

‘তোমার পরিচয়।’

‘আমি সুশোভনা।’

‘আবার।’ ওঝা বিড় বিড় করে মস্তুর পড়ে সুশোভনার দিকে এগিয়ে গেল।

সুশোভনা দৌড়ে ঘরের অভ্যন্তরে গিয়ে দাঁড়ালো।

‘বুঝতে পেরেছ দৌড়ে বেশি দূর যেতে পারবে না। এ ঘরের দরজা বন্ধ। বাড়িতে কেই নেই। সত্যি কথা বলো কোন অমঙ্গল হবে না। মায়ের দিব্য, গুরুদেব দিব্য। আর যদি না বলো কি করে বলাতে হয় আমি জানি। মনে রেখো যা ইচ্ছা করতে পারি আমি।’

‘আমি যদি বলি তা হলে তুমি এঘর থেকে চলে যাবে?’

‘যাব।’

‘কি জানতে চাও?’

‘সুশোভনাকে কে ভর করে আছ।’

‘তা ঠিক জানি না। কে যেন অন্য একটা মেয়েমানুষ। বুঝি না। এই দেখতে পাচ্ছিলাম। হারিয়ে গেল।’

‘হঁ। কিছু বলে সে।’

‘বলে। স্বপুর্নবাড়ি থেকে পালাতে বলে।’

‘হঁ। যে বলে তার নাম কি?’

‘নাম কি করে জানব। ঘূমের মধ্যে আসে সে।’

ওঝা হো হো করে হেসে উঠলো। ‘এসব গল্প শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা। স্পষ্ট করে বলো তুমি কে—কোথায় তোমার বাড়ি ছিল। কিসে তোমার মৃত্যু হয়, কিসে তোমার মুক্তি হয়। কেন এই মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ।’

‘কি করে বলবো? আমি জানি না।’

‘জানাচ্ছি’ বলে ওঝা এগিয়ে গিয়ে সুশোভনাকে চেপে ধরলো।

‘ছাড়ো, ছাড়ো।’ সুশোভনা ওঝাকে আচড়ে দিল।

‘উঃ।’ ওঝা হাতের কঞ্চিটা দিয়ে মারলো সুশোভনাকে।

দুজনে কিছু দূরে দূরে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। সুশোভনা হাঁপাচ্ছে। কিছুদিন আগে রোগ-ভোগ করে উঠেছে সুশোভনা। দুর্বল বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ সে ঝপ করে মাটিতে বসে পড়লো। মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল। ঝানিকটা সময় চুপচাপ।

‘ওসব চং করে লাভ নেই। আমার কাছে বাঘা স্মেলিংসন্ট আছে।’

ওঝা কি একটা নাকের কাছে চেপে ধরলো। সুশোভনার মাথাটা ঝেঁজে ধরলো। তারপর সে এই বেদনার মধ্যে চোখ খুললো আবার।

‘দেখলে, ছেনালিপনা করে লাভ নেই। থাক আমি মস্তুর দিচ্ছি। ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি তোমার উপরে অন্য ওষুধ লাগাবো না।’

ওঝা মাটিতে দাগ কেটে বিড়বিড় করতে লাগলো।

হঠাৎ সুশোভনা ফুঁপিয়ে উঠল। ‘মা, মা, মা, আমি পারছি না। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। একটু জল দাও। মা, মা, মা। ওমা। আমি মরে যাচ্ছি, মা।’

‘আরে ঝাঙ্। এখনই কষ্ট কি। এই তো মস্তুর সবে শুরু।’

‘মা, তোমরাও কি পিশাচের দলে মিশেছ।’

ওঝা বললো ‘এখন পরিচয় দিবি । না দিস তো বল, তোকে নিয়ে শুলানে যাউ ।’

‘কি পরিচয় দেব । বিশ্বাস করো আমি খানিকটা অভিনয় যেন করতাম ।’

‘কে তুই । তাই বল । বাজে কথা রাখ ।’

সুশোভনা যেন কি ভাবলো তারপর গড়গড় করে বলে গেল । ‘আমি পাঁচুর বউ । ছেলে হতে মরেছি । আমি কিছু বলবো না আর সুশোভনাকে ।’

‘এ কথা আগে বললেই হতো । সুশোভনার স্বস্তরবাড়িতে মাহিন্দার পাচু । তার বউ ছেলে হতে মরেছে শনিবারে, এসব খবর আমিও জানি । কি করে ছাড়বে সুশোভনাকে তাই বলো । মেয়েটার কষ্ট হচ্ছে দেখছি না । ওর সুখের সংসার পুড়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না । কই কথা বলছি না যে বড়ো । চুপ করে কেন ?’

‘মা, ও বাবা, আমার ভয় করছে ।’ সুশোভনা ডুকরে কেঁদে উঠলো ।

‘কেঁদে কিছু লাভ নেই । পরিচয় এখন দিবে ফেলেছ তখন তোমাকে যেতেই হবে । বলো যাবে ।’

‘যাব ।’

‘কোথায় যাবে ।’

‘স্বস্তরবাড়িতেই যাব ।’

ওঝা খল্ খল্ করে হেসে উঠলো । ‘অমন বোকার ভান করে তাকাস্থ কেন ? তুমি ছেড়ে গেলে স্বস্তরবাড়িতে যাবে সুশোভনা, তুমি কোন্ আদাড়পাঁদাড়ে যাবে তাই বলো, পাঁচুর বউ । কই কথা বলো । কঞ্চির বাড়ি যাবে, না কাপড় কেড়ে নেব । তাতে আর পেত্নীর কি লজ্জা । তা হলে কঞ্চি যাবে ।’

‘না, না, দোহাই তোমার । আমি যাব ।’

‘কোথায় যাবে ।’

‘এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে যেতে বলবে ।’

‘কি করে বুঝব তুমি গেলে ?’

‘দেখতেই তো পাবে ।’

‘তা বটে । ওই বুদ্ধি নিয়েই আমি ওঝাগিরি করি, তাই না ।’

‘কি করব তবে ?’

‘এই জলভরা কলসি দেখছ ওটা দাঁতে করে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আন্তাকুড়ে যাবে । সেখানে আকাশে উঠবে ।’

‘আমি ওটা তুলতে পারি না ।’

‘খুব পারবে। সুশোভনা পারে না, কিন্তু পাঁচুর বউ না পারে কি।’
 এর পরে ওঝা দরজা খুলে দিয়েছিল। নিজের কাপড়ের খানিকটা কলসির
 গলায় জড়িয়ে সেই কাপড় দাঁত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুশোভনা টলতে টলতে
 বেরুলো ঘর থেকে। কিন্তু আঁস্তাকুড় পর্যন্ত যেতে পারলো না। উঠানের
 মাঝামাঝি গিয়ে পড়ে গেল। কলসিতে মাথাটা ঠুকে গেল। ফিনকি দিয়ে
 রক্ত ছুটে বেরুলো! ওঝা বললো, ‘ওঠ, ওঠ, উঠলি না চাবুক লাগাব।’
 কিন্তু রবির বোধ হয় আর সহ্য হল না। সে কারো কথা না শুনে ছুটে বেরিয়ে
 এল তার ঘর থেকে। বোনকে কোলে করে নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে
 ছুটে ছুটে বললো, ‘আমার ডাক্তারি ব্যাগটা আনো, মরে যাচ্ছে শোভা।’
 একটা হৈ-হৈ উঠলো। সুশোভনার বাবা, মা, রবির কম্পাউণ্ডার, রবির পিছনে
 ছুটলো।

ওঝা শুধু মাথা দোলাতে দোলাতে বাড়ির বাইরে থেকে যারা এসেছিল এবং
 যারা জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিল ওঝাগিরি, তাদের বললো—‘ছোট
 বাবু কাজটা ভালো করলেন না। গণ্ডিটা কাটতে পারলাম না মেয়েটার
 চারদিকে। আবার ভর না করে।’

পাঁচ

ওঝার ওস্তাদি আছে বলতেই হবে। রবি চিকিৎসা করে আবার খাড়া করে
 তুললে সুশোভনাকে, কিন্তু এ যেন অণু কোন সুশোভনা। ধীর-স্থির গম্ভীর মুহূ
 স্বল্পভাষী একটি মেয়ে। যেন আঠার-উনিশ থেকে সে পর্য্যবেশে পা পৌঁছে
 গেছে। কিন্তু অনেক শনিবার এল গেল, কোন বিকার দেখা গেল না।

একদিন সুশোভনার মা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে বললেন, ‘আজ শনিবার নাকি রে?’
 কথাটা সুশোভনার দামনে বলাই পরিকল্পনা। সুশোভনা কুলোয় করে ডাল
 বাচছিল। কোন বিকার দেখা দিল না তার মুখে। শুধু কথাটা বুঝতে যতক্ষণ
 সময় নেয়া দরকার তার চাইতে সামান্য কিছু বেশি সময় যেন লাগলো তার।
 দিন পনেরো পরে মা বললেন—‘শোভা, শ্রুতরবাড়ির ওরা চিঠি লিখেছে। তোর
 বাবা বলছিলেন যেতে হয়। অনেক দিন এসেছিস।’

সুশোভনা বললো, ‘যাবো।’

‘তুই যেন রাগ করে বললি।’

‘না রাগ নয় তো।’

রাগ নয়। মা ভাবলেন। সমান সহজ গলা সুশোভনার। লজ্জায় লাল হল না মেয়ের গাল। একবার অভিমান করেও বললো না—তুমি যেন আমাকে ভাড়াতে পারলেই বাঁচো।

সুশোভনা শ্বশুরবাড়ি এসেছে। তার চালচলন কথাবার্তায় কোন অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে না। শুধু সে যেন আগেকার চাইতে একটু চাপা ধরনের। পায়ের দিকে চোখ রেখে চলে। যা ঘটেছে তার লজ্জায় যেন কারো দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। ইতিমধ্যে একদিন তার স্বামী তার মুখটা তুলে ধরেছিল। সুশোভনা মুখ ঘুরিয়ে নেয়নি, কিন্তু যেন প্রথম রাত্রির লজ্জায় চোখ বুজে রইলো। তা হোক। তার স্বামী বাড়ির সবাইকে বলে দিয়েছে কেউ যেন সুশোভনার দিকে বেশিক্ষণ একভাবে চেয়ে না থাকে। সে যেন কখনই না মনে করে আমরা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

চার-পাঁচ মাস পরে সুশোভনার শাশুড়ি চিঠি লিখলেন সুশোভনার মায়ের কাছে—
ভালোই আছে! ভালো খবর এই—বোধ হয় ছেলেপুলে হবে।

সুশোভনার স্বামী সদরে যায় না ওকালতি করতে। নিজের শহরেই মাস্টারি করে। সে সুখেই আছে। মায়ের কাছে শুনেছে সে সুশোভনার ছেলেপুলে হবে। এটা তার এক আনন্দের কারণ। নতুন উচ্চাশার সূত্রপাত হয়েছে তার মনে।

সুশোভনা—হ্যাঁ। তাকে স্বাভাবিকই বলতে হবে। চোখ মুদে থাকে সে এখনও মুখটাকে তুলে ধরলে। এই বীড়া ভালোই লাগে তার। বরং তৃপ্তির কারণই যেন। অবশ্য খুব খুঁজলে একটা ঘটনার কথা সে বলতে পারে। একদিন হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল। ঘরের বড় দেয়ালপঞ্জিটাতে শনিবারগুলোয় যেন কে ঢেরা কেটে দিয়েছে। যেন তারা নেই।

তার মনে হয়েছিল দেয়ালপঞ্জিটাকে সরিয়ে ফেলবে, কিন্তু তা করেনি সে। আর একদিন একটা কোতুকের ব্যাপার হয়েছিল। শোবার ঘরের টেবিলে সুশোভনার দাদার একটা ফটো ছিল। এক সকালে দেখলো সে ফটো মাটিতে পড়ে আছে, ফ্রেমটা চুরমার করে ভাঙা।

পড়ে গিয়ে ওরকম হয়নি তার আর একটু প্রমাণ ফটোর চেহারায় গোঁফের দাগ এঁকেছে কে কালি দিয়ে। সুশোভনার স্বামী ফটোটাকে সরিয়ে ফেললো।

কিন্তু একদিন সুশোভনার স্বামীকে ‘গণ্ডি’ এই কথাটার তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করতে হল। শনিবার সেদিন। সকাল সকাল দুল থেকে এসে ছাত্রদের খাতা দেখতে

দেখতে নে বললো—‘বাড়ি এখন সন্ধ্যায় সবাই দিবা নিদ্রায়। চুপ করে ছু-কাপ চা নিয়ে এসো করে।’ সুশোভনা চা করতে গিয়েছিল। তার স্বামী খাতা দেখতে দেখতে তার প্রতীক্ষা করছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন কথা বলছে। কতকটা সুশোভনার মতোই মনে হয়। কিন্তু সে কণ্ঠস্বর যেন নিদ্রিত। যেন অনেক দূর থেকে আসছে।

‘গণ্ডিটা দেয়া হয়নি বলেই কি কষ্ট দেবে আমাকে। বলো তুমি কে। কি ক্ষতি তোমার করেছে আমি।’

তার পরই চুপ-চাপ।

সুশোভনার স্বামী তাড়াতাড়ি উঠে এসেছিল। সে দেখতে পেল শোবার ঘরে এসে সুশোভনা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে আয়নাটা আছে তার কাছাকাছি। সব মেয়ে এরকম করে কিনা বলা যায় না। স্বামীর কাছে যাবার আগে আয়নায় মুখ দেখে নাকি সুশোভনা। কিন্তু সুশোভনার হাতের চায়ের কাপ টেবিলে রাখা। চা ছলকে পড়েছে টেবিলে। সে যেন ক্রান্ত।

সুশোভনার স্বামী বললো, ‘কি হল।’

‘কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল।’

‘এ সময়ে তা হয়। তুমি কি কথা বলছিলে নাকি?’

‘কথা? মনে মনে যেন কি খুঁজছিলাম।’

একটু চুপ করে থেকে সুশোভনার স্বামী বললো, ‘কই চা দাও। চলো ও ঘরে গিয়ে বসি।’

আর একদিন গভীর রাত্রে বন্ বন্ করে একটা শব্দ হল। ঘুম ভেঙে গেল সুশোভনার স্বামীর। কেমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে তার। হাতড়ে দেখলো পাশে সুশোভনা নেই।

‘সু-সুশোভা।’

ঘরের ছান আলোতে সে দেখতে পেল যেন সুশোভনা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উঠে আলো জ্বাললো সে। সুশোভনাই বটে। টেবিলের একটা কোণ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। টেবিলের বড় আয়নাটা চুর-চুর হয়ে ভেঙে গেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলো সেটা সুশোভনার চুল সাজানোর বৈশিষ্ট্য। অন্য সময় এরকম দেখা যায় না। সেই চা আনবার ঘটনাটার সময়ে এরকম দেখেছিল সে। চুল দু-ভাগে ভাগ করে এক গোছা কাঁধের উপর দিয়ে এনে বুকুর উপরে ঝোলানো, অন্য ভাগ পিছনে। এখনও চুল সে রকম করেই ছড়ানো।

সুশোভনার বর তার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, ‘কি হল।’

সুশোভনার চোখ বোজানো। সে যেন ঘুমোচ্ছে।

‘শুনছ।’

বরের বুকের উপরে সুশোভনা যেন অজ্ঞান হয়ে গেল।

তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে কিন্তু ঘুম ভাঙল তার।

‘কি হল, বলো তো।’ প্রশ্ন করলো সুশোভনা।

‘কিছু না তো।’

‘কে যেন ফিস্-ফিস্ করে ঝগড়া করছিল আমার সঙ্গে। আমাকে যেন কি সব বিস্ত্রী কথা বলছিল। খুব রাগ করলাম।’

‘স্বপ্ন হবে।’

‘তা হবে। তুমি কিন্তু আমাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখো। কি যে পুরুষ মানুষ তুমি, কিছু যেন জোর নেই।’

এর পরেও আর একটা আয়না ভেঙেছিল।

সুশোভনার বর জিজ্ঞাসা করলো, ‘কি হল।’

‘আয়নাটা ভেঙে গেল। কি যেন খুঁজতে এসেছিলাম।’

‘তা হবে। এখন অনেক রাত। তুমি বিছানায় এসো।’

সুশোভনার শাণ্ডি সাধের ব্যবস্থা করছিলেন। সুশোভনার মায়ের সঙ্গে পত্রালাপ করে স্থির হয়েছে স্বস্তরবাড়ির সাধটাই আগে হবে। তারপর সে বাপের বাড়ি যাবে। একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল তার তাতে সাধের আয়োজন পিছিয়ে যায়নি। স্বামী শুতে এলে সে বললো, ‘তাই কি হয় নাকি। আমার গলায় ব্যথা হয়েছে। জ্বরটাও বেশ এসেছে। চোয়াচ লাগবে না?’

‘কি এমন হবে।’

‘একজনের জ্বর দুজনে ভাগ করে নিয়ে লাভ কি?’

কাজেই সুশোভনার বর পাশের ঘরে শুয়েছিল। মাঝরাতে একবার মনে হল সুশোভনা কার সঙ্গে কথা বলছে যেন। কান পেতে সে শুনলো—সে যেন তার দাদাকে তার শরীরের কষ্টের কথা বলছে। সুশোভনার বর উঠে গিয়ে দেখলো আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে।

‘এমন করে মুড়ি দিয়ে শোয়। ঘেমে উঠেছ।’

‘ও তুমি।’

‘কষ্ট হচ্ছে নাকি?’

‘না। তুমি শোও গে।’

শেষরাত্রির দিকে স্নশোভনার বরের ঘুম আবার ভেঙে গিয়েছিল। এবার যেন স্নশোভনা কাকে বকছে মনে হল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল সে। স্নশোভনা যেন একই প্রশ্ন করছে বারবার—‘কে—কে তুমি? কেন আমাকে কষ্ট দাও, সুখী হতে দাও না।’

স্নশোভনার বর ভাবল উঠে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে আসবে। একটু ক্লান্তিও বোধ করল সে। অনেকের এরকম অভ্যাস থাকে ঘুমের মধ্যে কথা বলা। এই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিরক্তির মতো একটা নিশ্চিন্ততা এল তার।

সকালে একটু বেলা করে কিন্তু একটা হৈ-রৈর মধ্যে ঘুম ভাঙলো তার। খোলা জানলা দিয়ে আর সকলেই দেখেছে। দরজা বন্ধ বলে তারা ঘরে ঢুকতে পারছে না।

স্নশোভনা আত্মহত্যা করেছে।

পাখা লাগানোর জন্য যে লোহার আঁকড়া ছিল, তার সঙ্গে চাদর জড়ানো আর তা থেকে ঝুলছে স্নশোভনার দেহ।

স্নশোভনার বর লক্ষ্য করল চুল সাজানোর কারদাটা। একগোছা চুল বুকের ওপর লুটানো। অন্য গোছাটি পিঠের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে সে স্নশোভনার দেহটাকে নামাতে গিয়ে চমকে চিৎকার করে উঠলো। দেয়ালের গায়ে আর একটি স্নশোভনা যেন বিস্ফারিত প্রশ্নের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু সেটা আয়না। আয়নাটা ওখানে ছিল না। তা হলে স্নশোভনাই ফটো সরিয়ে সেই লোহার টাঙিয়েছে। বেগ পেতে হয়েছে টাঙাতে।

আর একবার দেখলো স্নশোভনার বর আয়নার স্নশোভনার ছবির দিকে। সে স্নশোভনার ঘাড়টা ঝাঁকানো কতকটা ঝগড়ার ভঙ্গিতে। কুচকুচে কালো চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যেন প্রশ্ন করছে—কে তুমি?

বহুবাক্য

অগ্রণী নাট্য-সংস্থার মেলা-মেশার আসর । অনুগ্রাহক, সমর্থক ও দরদীরা
নিজ নিজ আসনে বসিয়া আছেন । যথেষ্ট অগ্রণীর নাট্য-সম্পাদক
উপস্থিত ।

সম্পাদক ॥ আজ আবার আমাদের মেলা-মেশার আসর । আপনারা হয়তো
বলবেন—‘এত ঘন ঘন মেলামেশার আসরের দরকারটা কি ? এই তো
সেদিন একটা হয়ে গেল ! তার চেয়ে, আপনারা মশাই নাটুকে দল,
নাটক করুন—আমরা হাততালি দিয়ে বাড়ি চলে যাই ।’ এর উত্তরে
সেবারও বলেছিলাম—এবারও আমাদের বলতে হচ্ছে, যে আমরা নাটক
পাচ্ছি না । এখানে কথা উঠতে পারে—‘সে কি মশাই ! বাজারে এতগুলো
নাটক হচ্ছে, সকলে সেগুলোকে নাটক বলে দেখতে যাচ্ছে—আর আপনারা
বললেই হবে, নাটক পাচ্ছেন না ! তার চেয়ে বলুন না, নাটক করবেন
না । এখানে কিন্তু একটা কথা আছে । সর্ববাদীসম্মত নাটক আজও
পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । ধরুন, পুরনো দিনের মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়দের কথা । এঁদের তো বাংলা নাট্য সাহিত্যের
জনক বলে অভিহিত করা হয় । কিন্তু আমরা বললে কী হবে ? বেশ
কিছু লোক এঁদের নাটক সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা বলে থাকেন ।
দীনবন্ধু মিত্রের কথায় বলেন,—না না, ও ঠিক সভ্য নাটক নয়, অশ্লীলতা

দোষে হুঁ। আমরা পেছিয়ে গিয়ে ধরলাম মাউকেলের 'বুড়ে সালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা'। মাথাওয়ালা লোকেরা এসে ধমকে দিলেন—নাটক করব বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছ কেন?—বললেই পারতে—স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে মুখ ঝরাপ করব, আপনারা এসে শুনুন। ভয়ে ভয়ে গিরীশচন্দ্র হাত দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরক আর বাহকেরা তেড়ে এলেন। শুনতে পেলাম—উনি নাকি ভক্তিবাদ, সমাজবাদ, ইতিহাস, সব কিছু মিলিয়ে নাটক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলিদান হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এলাম। কিছু লোক দেখতে ও এলেন। শেষ হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন দেখলেন? গম্ভীর ভাবে বললেন—ওটা রবীন্দ্রনাথ হয়নি, কার্ল মার্ক্স হয়েছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেন? অভিনয় কি ভালো হয়নি? বললেন—অভিনয় ভালো হয়েছে বলেই তো আপত্তি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করা নিয়ম নয়, জানেন তা?—ও শুধু একে বেকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যেতে হবে, আর ভক্তিবাদে শুনতে হবে!—যেটুকু অভিনয় করবেন সেটুকু কার্ল মার্ক্স হয়ে যাবে, বুঝলেন। তাঁরা ধমকে বেরিয়ে গেলেন। ভয়ে আমরা কথা বলতে পারলাম না, চোখগুলো শুধু বড় বড় হয়ে গেল। শেষে ভাবলাম ঠিক আছে। ভীষ্ম-আলমগীর-প্রতাপাদিত্যই করব। রিহাসাল আরম্ভ করবার আগে কেউ ভীষ্ম, কেউ আলমগীর, কেউ প্রতাপাদিত্য সেজে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। কেমন দেখায় দেখতে হবে। দেখলাম, সব সাড়ে-বত্রিশভাজার সেল্‌সম্যান্ হয়ে গেছি—শুধু পায়ে শুঙুরটা নেই। শেষে সমকালীন নাট্যকারদের নাটক নিয়ে কাজ আরম্ভ করব ঠিক করলাম। কিন্তু সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ধারা ম্যানেজিং ডিরেক্টর—যেমন ধরুন, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক,—এঁদের মতে সাহিত্যে নাটক অপাংক্তেয়। কাজেই বাংলা নাটক নিয়ে যুগোপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ সাহিত্যিকদের নেই বললেই চলে। এমন অবস্থায় যা দু-একখানা নাটক পেয়েছি তা আপনাদের সামনে অভিনয় করেছি। কিন্তু তাতে আপনাদেরও চাহিদা মেটেনি, আমাদেরও না। শেষ পর্যন্ত সব ভুলে দেব ঠিক করেছি, এমন সময় আর একজন এসে পথ দেখালেন। তিনি বললেন, আপনারা সত্যিকারের থিয়েটারকে বাদ দিয়ে চলেছেন, তাই আপনাদের এই অবস্থা। জিজ্ঞেস

করলাম—সত্যিকারের থিয়েটার ? বললেন—হ্যাঁ নশাই, হ্যাঁ । ওই যাকে বলে কলকাতার থিয়েটার—বেম্পতি-শনি-রবি, প্রত্যেক হুগ্গার তিনদিন করে থিয়েটার করে চলেছে, তিনশ থেকে পাঁচশ নাইট ধরে । ভেবে দেখলাম—সত্যিই ভুল করেছি । এরাই তো সত্যিকারের থিয়েটার । আর সত্যিকারের থিয়েটার বলেই তো এদের আমোদ-কর দিতে হয় না । সরকারী মতে সত্যিকারের থিয়েটার হতে গেলে ভালো নাটক, ভালো অভিনয়, এ সব কিছু তো থাকার দরকার নেই । শুধু নিজেদের একটা থিয়েটার-বাড়ি থাকলেই হল । সেটা এঁদের আছে । মালিককে মাসে দু-তিন হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়িটা এঁরা নিজেদের করে নিরেছেন । এঁদের ঐ হুগ্গার তিন দিনের নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার অলি-গলিতে নাকি থিয়েটারের ভিরেন বসে গেছে । সপ্তাহের বাকি চারদিন দলের পর দল এঁদেরই নাটকের ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিন থেকে চারশ টাকা ভাড়া দিয়ে এঁদেরই বোর্ডে নাটকের পর নাটক নামিরে চলেছেন । এঁরা বুদ্ধিমান লোক । নিজেদের ভাড়াটার প্রায় দ্বিগুণ পরের ভাড়ায় তুলে নিয়ে শত-রজুনীর পর শত-রজুনী করে চলেছেন । এক একটা শতরজুনী আসে, আর ধারক আর বাহকেরা নেমস্তন্ন নিরে থিয়েটার দেখতে এসে বক্তৃতার তোড়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে যান । আর শুধু থিয়েটার ! সাহিত্য ! (ততক্ষণে সম্পাদকের মুখে চোখে সম্পাদকের ভাব আর নাই । মনে হইতেছে, তিনি যেন এক অভিনেতা । ব্রহ্মক্ষে সম্পাদকের ভূমিকার অভিনয় করিতেছেন ।) এঁদের অনুপ্রেরণায় কলকাতার রকে রকে থিয়েটার-কাম-সাহিত্য পত্রিকা সব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে । খুলে দেখুন, আস্তো একখানা উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে বি জি বেঙ্গল ক্লাবের খ্রীটনটনিয়ার গলায় মালা-দেওয়া-থিয়েটার—আবার ঐ গলায়-মালা-দেওয়া থিয়েটার থেকে আরম্ভ করে অলি-গলির থিয়েটারের গ্রীনরুমের কেলেকারী । সত্যিই তো । এরাই তো আসল ট্যাডিশনাল থিয়েটার ! আমরা কি ? কিছু নয় । থিয়েটারের স্কুল থেকে মাঝে মাঝে রিপারটরি হয়ে যাই—আবার রিপারটরি থেকে মাঝে মাঝে লিটল্ থিয়েটার মুভমেন্ট্ হয়ে যাই । এই তো আমাদের অবস্থা ! নাঃ—ট্যাডিশনাল থিয়েটার দেখতেই হবে ! গেলাম দেখতে । গিয়ে দেখি চমৎকার ব্যবস্থা ।

মাতাল ॥ আমি মাতাল মানিক । মায়ের চরণাশ্রিত । তিন বোতল 'মা' মার্কী টেনে পয়মাল হয়ে আছি ।

সম্পাদক ॥ মাতাল ! মাতাল তো এখানে কি ! যাও এখান থেকে ! দেখছ না এখানে সভা হচ্ছে ! ও—দাঁড়াও দাঁড়াও—ভূমি কি করে জানলে আমি টিকেট কাটার কথা বলছি ?

মাতাল ॥ আমি জানি গোপাল, তোমার যে পেট গরমের খাত । হাত-পা নেড়ে যে রকম গরম গরম বুলি দিচ্ছিলে, পেট গরম না হলে তো ও হয় না মানিক ! ওই এক ওষুধ ! হাওয়াই জাহাজের টিকেট কেটে হাল্কা হাওয়ায় ভেসে পড়ো—আপসে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে গোপাল !

সম্পাদক ॥ আচ্ছা আচ্ছা—বেশ হয়েছে—এখন যাও এখান থেকে ! যাও বলছি !

মাতাল ॥ গেলুম না ।

সম্পাদক ॥ গেলুম না ? মানে ?

মাতাল ॥ গেলুম না মানে গেলুম না । যাও বললে তো আমি যাব না মানিক । যাও বলতে নেই । এস বল—সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছি । তবে হ্যাঁ, জয় গোপাল বলতে বলতে—

সম্পাদক ॥ আচ্ছা ঠিক আছে—এখন যা-যা-যাও, মানে এস !

মাতাল ॥ এই তো—পথে এস মানিক—আমি সুড় সুড় করে চলে যাচ্ছি ! তবে হ্যাঁ, পাশেই রইলাম । গরম গরম বুলি হলেই চলে আসব কিন্তু—গুনতে ভারী ভালো লাগে ! জয় গোপাল, জয় গোপাল বল মন—মন, একবার জয় গোপাল বল তো ! (প্রস্থান)

সম্পাদক ॥ (অস্ফুট স্বরে) ওঃ, আচ্ছা আপদ যা হোক । (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) হ্যাঁ, তারপর সেই যে বলছিলাম—দু-নম্বর রাস্তা হচ্ছে এই নেই-নাটকের দেশ থেকে গেনে চেপে হ্যাঁ-নাটকের দেশে চলে যাওয়া ! মানে—যে দেশের পথে-ঘাটে আমাদের মনের মত নাটক সব কুড়িয়ে পাওয়া যায় । আর তিন, নাটকের কল বখন পেলামই না, তখন লেবরেটরি খিয়েটারে ঢুকে পড়ে টেস্ট-টিউবে নাটক প্রডিউস্ করা ! মানে $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 = 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{জল}$ না বার করে জারিয়ে নাটক বার করা । এখন এ তিনটির কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না । কাজেই গতবারের মেলামেশাতেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম, এবার

বোধহয় আমরা উবে যাব। এবার আমরা ঠিক করেই এসেছি, এই আমাদের শেষ। এবার আমরা নির্ঘাৎ উবে যাচ্ছি। জ্যাস্ত মাসে উবে যাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই আমরা নাটক বন্ধ করে রোজ উবে যাওয়ার রিহাসাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় গত পরশুদিন আমাদের নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় মশাই এসে হাজির—হাতে একখানি খাতা। ঘরে ঢুকেই হাত-পা নেড়ে বললেন—উবে যাওয়াই এখন ঠিক করেছেন, তখন শেষ-বেশ, এই নাটকটা করেই উবে যান! নাটকে আরন্ত করেছিলেন, এখন শেষ যদি করতে হয় তো নাটকেই করুন! খাতা খুলে দেখি—নাটকের নাম আর চরিত্রলিপি—এই পর্যন্ত আছে, আসল নাটক-টাই নেই। জিজ্ঞেস করলাম, নাটকটা কই? বললেন—‘নাটকটা লিখতে ভরসা পেলাম না। চরিত্রলিপি পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় জনা-পাঁচেক কৰ্ত্তা-ব্যক্তি আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে এলেন—নাটক তো লিখছেন। নাটক কাকে বলে জানেন কি? ভয়ে ভয়ে বললুম—নাটক মানে জীবন—মানে—নো! নেভার! নাটক মানুষের আদিম প্রকাশভঙ্গি—শুধু ড্যান্স। ককনো না! নাটক মাস্ট বি প্রোগ্রেসিভ—শুধু প্লোগান! কে বললে? নাটক হবে বুদ্ধিদীপ্ত দর্শন—শুধু বিষাদের রেশ! আজ্ঞে না! ওর কম্বুলা আছে! কম্বুলায় কেলে, শুধু অন্ধের মত কষে যান!

এদের কথা শুনবেন না মশাই, এরা পাগল! নাটক মানে—বাড়ি, গাড়ি পার্টি, আর চাঁদের আলোয় লারে লাগ্না! তবে হ্যাঁ—হয় নায়ক কিংবা নায়িকার, একপয়সাও থাকছে না! শেষে কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে বড়লোক করে দিতে হবে! মানে—সাধারণ লোক দেখবে, এই পেয়েছি এই পেয়েছি বলে হাত বাড়াবে, কিন্তু পাবে না! পাঁচজনই যাবার সময় শাসিয়ে গেলেন এর বাইরে নাটক লিখেছেন কি ঘরে আগুন দিয়ে দেব!

নাট্যকার ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে চরিত্র-লিপি পর্যন্ত লিখে খাতাটি আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর একান্ত অনুরোধ বাকি জায়গাটার আমরা বেন আমাদের মনের মত একটা নাটক বসিয়ে নিই। (পাশে রাখা একখানি খাতা তুলিয়া লইয়া) এই সেই নাটক, আর নাটকটা আমাদের খুব পছন্দও হয়েছে। নাটকটা আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি, আর দেখলে, আপনাদেরও পছন্দ হবে। (নাটকটিকে দর্শকের দিকে ফিরাইয়া উপরের মলাট খুলিয়া) নাটকের নাম—নব-স্বয়ংবর। চরিত্র-লিপিতে আছেন

গোপালবাবু, গোপালবাবুর ভগ্নী শ্রীমতী শীলা দে—যিনি স্বয়ংবরা হবেন, আর বরের দল, যারা গুটি গুটি স্বয়ংবর সভায় এসে হাজির হচ্ছেন—এক—মিস্টার কোকাকোলা, দুই—এক যুবক, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রগ্রেসিভ জঙ্গী, রোম্যান্টিক্যালি এক্সেনট্রিক, তিন—এক অধ্যাপক, প্রফেশনালি আক্টিক, চার—এক প্রোড, ইন্টেলেক্চুয়ালি দার্শনিক, পাঁচ—এক ধনী, অহুভূতিতে জৈবিক, ছয়—আপনার আমার মত এক ভদ্রলোক, নয়মালি সিন্থেটিক ! এইবার নাটক । (পাতা উন্টাইয়া) প্রথম পাতা ফাঁকা ! (পাতা উন্টাইয়া) পরের পাতা ফাঁকা ! (ক্রমাগত পাতা উন্টাইয়া যাউতে যাউতে) ফাঁকা—ফাঁকা—ফাঁকা—ফাঁকা……এই নিন (শেষ-পাতার আসিয়া) যবনিকা পতন—মানে শেষ । নাট্যকারের প্রস্তাব—ফাঁকা জায়গায় নাটকটা যেন আমরা বসিয়ে নিই । উত্তম প্রস্তাব, চমৎকার কথা ! সাদা খাতাটা নিয়ে তাই চলে এলাম—একুনি একুনি মনের মত নাটকটা ফাঁকটার বসিয়ে আপনাদের সামনে করে দেব ! (পাশে মুখ ফিরাইয়া হাঁক পাড়িল) রমেন……এই রমেন……(রমেনের প্রবেশ)

রমেন ॥ কী হল ?

সম্পাদক ॥ হয়েছে আমার শ্রদ্ধ ! সব কথা বলা হয়ে গেছে । মনের মত নাটকটা কই ?

রমেন ॥ আরে নাটক তো তোমার পেছনে । সামনে দাঁড়িয়ে বক-বক করছ বলে আমরা কার্টেন তুলতে পারছি না ! গোপালবাবুর বৈঠকখানা, গোপালবাবুর বোন হাজির, এক নম্বর বর মিস্টার কোকাকোলা কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করে দিয়েছেন—আর এদিকে তোমার বকুনির শেষ নেই ! নাও, এখন সরে এস, আমরা কার্টেন তুলে দিই ।

সম্পাদক ॥ ও, তাই নাকি ! তা এতক্ষণ বলতে হয় ! আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি । আপনারা নাটক দেখুন—নাট্যকারের সাদা পাতায় আমাদের বসানো নাটক নব-স্বয়ংবর । (মাতালের প্রবেশ) ।

মাতাল ॥ নবস্বয়ং যদি বর হয়—আমাকে তাহলে কনে করে দাও মানিক ।

সম্পাদক ॥ ওঃ—আবার সেই মাতালটা এসে জুটল ! এই যা বলছি এখান থেকে !

মাতাল ॥ (কীর্তনের সুরে) আমি যাব না, যাব না, যাব না গো ব্রজের কুঞ্জে ফেলে আমি যাব না গো ! বলেছি তো গোপাল—কনে করে দাও, একুনি চলে যাচ্ছি ।

সম্পাদক ॥ তুই যাবি কি না ? (মাতাল ঘাড় নাড়িল) ।

রমেন ॥ (সম্পাদককে বাধা দিয়া) দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি পারবে না । আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছি । (মাতালকে) দেখ বাবা, কনের তো এখানে দরকার নেই, দরকার বরের । তুমি যদি বর হতে চাও তো গোপালবাবুর বাড়ি চলে যাও—আমরা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি ।

মাতাল ॥ কেন ? এই যে শুনলাম নবস্বয়ং নাকি বর হবে ! আমাকে তুমি কনে করে দাও গোপাল—লক্ষ্মী গোপাল আমার, দাও তো !

রমেন ॥ আরে না না—নবস্বয়ং বর হবে না—গোপালবাবুর বোনের নবস্বয়ংবর হবে । সেখানে গিয়ে বর হয়ে বস ।

মাতাল ॥ কিন্তু আমার তো ঘুরপথে যাবার উপায় নেই মানিক—গা-হাত-পা যে টলছে—

রমেন ॥ তাহলে চূপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক । এগুনি পদ' উঠবে । পদ' উঠলেই গোপালবাবুর বৈঠকখানা । টুক করে একটু সরে গিয়ে বৈঠকখানায় সামিল হয়ে যেও । (সম্পাদক কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া) আর থাক, কথা বাড়িও না ! ও যদি বেশি মাতলামো করতে আরম্ভ করে দেয় তো সব পণ্ড হয়ে যাবে । আরে বাপু, সাদা পাতার তো নাটক—ও না হয় একটা বাড়তি চরিত্র হবে । (মাতালকে) কিন্তু দেখো সাবধান । যেন কোন গোলমাল না হয়—তাহলেই মাতাল বলে বার করে দেবে ।

মাতাল ॥ গোলমাল ? মাইরি বলছি গোলমাল নয়—একেবারে চূপ ! (নিজের মাথায় চাঁটি মারিয়া) চূপ ! একেবারে চূপ ! (আবার চাঁটি মারিয়া) চূপ ! চূপ ! একেবারে চূপ ! (নিজের গালে চড়াইতে চড়াইতে) ফের কথা বলে ! চূপ করতে বলছি না ! এই দেখ আবার কথা বলে । চূপ ! চূপ ! (নিজের মুখের সামনে আঙুল নাড়িয়া চিৎকার করিয়া) তবে রে ! স্ট্যাচু ! (বলিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া যায় । এই সঙ্গে সঙ্গে পদ' সরিয়া গিয়া গোপালবাবুর ঘর সামনে আসে । সম্পাদক ও রমেন তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া যায় ।)

(গোপালবাবুর বৈঠকখানা । গোপালবাবুর ভগ্নী বসিয়া আছেন । সামনে মিস্টার কোকাকোলা নানা কসরত করিয়া নিজের গুণপনার পরিচয় দিতেছেন । গোপালবাবুর ভগ্নী কখনো বা বসিয়া দেখিতেছেন, কখনো বা উঠিয়া জানালার

ধারে যাইতেছেন। মুখে চোখে একটা নিস্পৃহ অথচ আমুদে ভাব।
যেন, যতটুকু ভালো লাগে ততটুকু দেখি, ভালো না লাগলে অতৃদিকে
তাকিয়ে থাকি।)

কোকাকোলা ॥ আই অ্যাম ওয়েল ভার্গ্‌স্‌ড্‌ ইন ল্যাটিন ম্যাদ্‌মোরাডেল্‌।
র্যাডাম্যান্থাস্‌ পিরেমাস্‌ প্রোটাসিলাস্‌ প্রোটিয়াস্‌ পিয়ান্‌ ল্যাক্টাম্‌
ডিটেনাম্‌! ও পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? আই নো গ্রীক্‌ টু। (গানের
সুরে) অ্যালফা বিটা গামা ডেল্টা এপ্সিলন্‌ জেটা। ও নট টু ইয়োর
লাইকিং এ্যাঃ? দেন্‌ এটা থিটা আয়োটা কাপ্পা ল্যামডা মু—
(গোপালবাবুর সহিত এক যুবকের প্রবেশ। পরনে আধময়লা ধুতি ও
পাঞ্জাবি। মুখে চোখে একটা জঙ্গী ভাব, রোমান্টিক্যালি এক্সেনট্রিক্‌)

যুবক ॥ সেই কথায় তো আপনার ভগ্নীকে বলতে এলাম। এ ছাদের তলার
জীবন হয় না। জীবন চান তো মাঠে আসুন। ধু ধু করছে মাঠ—
ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ—

গোপাল ॥ বুঝেছি, কিন্তু আমি তো আর আপনার সঙ্গে যাব না। যাবেন
আমার ভগ্নী। মানে—স্বয়ংবরা হয়েছেন তিনি। দেখুন, তিনি রাজী
আছেন কিনা। আমি বরং আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—

যুবক ॥ না না পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেরই নিজের পরিচয়।
কমরেড সামন্তর অভিবাদন গ্রহণ করুন মিস দে—আসুন আমরা মাঠে
যাই! ইন-কিলাব জিন্দাবাদ—

কোকাকোলা ॥ হিয়ার ইজ গ্রীক্‌ ইন মিউজিক্‌ এগেন মাই ডারলিং। হু জি
ওমিক্রন্‌ পি রো সিগ্‌মা—হো লা লা-লা লা—

যুবক ॥ চলুন কমরেড, আমরা মাঠে যাই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, ধু ধু মাঠ—

কোকাকোলা ॥ টাউ ফি চি সি ওমেগা—হো লা লা—লা লা।

যুবক ॥ ধু ধু মাঠ—পত্‌ পত্‌ নিশান—

কোকাকোলা ॥ টেক্‌ দিস্‌-রক্‌ ন্‌ রোল্‌—আমি কোকাকোলা

ও মোনোভোলা

আহা দোলে দোলা

হ-হ-করে-নোলা

যুবক ॥ পত্‌ পত্‌ নিশান! ঝাঙা উঁচা রহে হামারা। এধারে বস্তি,
ওধারে নালা—সামনে কারখানা—

কোকাকোলা ॥ বক্ ন্ রোল্—সা-মাস্ত্রে-লভ্-স্তকি আমি কোকাকোলা
জি-না-বাস্তে-কু ও মোনোভোলা.....

যুবক ॥ পিপ্ পিপ্—ধোঁয়া উঠছে ! ছনিয়ার মজদুর—খোলা মাঠ । জীবন
হাতছানি দিয়ে ডাকছে—ইন-কিলাব জিন্দাবাদ ! আমরা এগিয়ে চলি
কমরেড—ধরবই—জীবনটাকে ধরবই । গ্রাম্প্ ইট, গ্রাম্প্ ইট—

মাতাল ॥ ঐ যাঃ—ফস্কে গেল—

যুবক ॥ (চমকাইয়া) কে ? তুমি কে ?

মাতাল ॥ মাতাল ।

যুবক ॥ মাতাল ? তা এখানে কি ?

মাতাল ॥ ঝুঁকে বিয়ে করতে এসেছি । নবস্বয়ং বর খুড়ি কনে হয়েছে, আমি
তাই বর সেজেছি ।

যুবক ॥ বর সেজেছ ! এই দেখুন কমরেড ! জীবনকে ফেস্ করবার সাহস
নেই, তাই মদ খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ! দেখতে পাচ্ছেন না, ভয়ে
মুখটা ঝুলে পড়ে বেকে গেছে !

মাতাল ॥ না, বেকে যাবনি । ওটা লক্ জ ।

যুবক ॥ লক্ জ ? লক্ জ কি ?

মাতাল ॥ ঝুঁকে দেখে লক্ জ হয়ে গেছি । (মেয়েটিকে মৃদু হাসিয়া অগ্রসর
হইয়া আসিতে দেখিয়া, এক হাত সোজা বাড়াইয়া দিয়া বারণ করিতে
করিতে) না-না- মাইরি বলছি, না-ভালো হবে না—পাগল হয়ে যাব—বুক
কেমন করবে—আর নয়—প্যারালিসিস্ হয়ে যাব—প্যারালিসিস্—
প্যারালিসিস্ ।

যুবক ॥ (কোকাকোলা গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, মেয়েটির সামনে
আসিতেছিলেন, তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া, সামনে আসিয়া) ছেড়ে দিন,
ওটা একটা মাতাল ! দেখছেন না, পালিয়ে বেড়াচ্ছে ! আসুন আমরা
এগিয়ে যাই কমরেড—ফরওয়ার্ড মার্চ ! ইন-কিলাব জিন্দাবাদ ! গ্রাম্প্
ইট্ ! গ্রাম্প্ ইট্ ! একটা খাপ্পোড় মেরে জীবনটাকে ধরে ফেলি কমরেড !
(ইতিমধ্যে এক প্রোচ বুদ্ধিজীবী গোপালবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকিতেছিলেন)

প্রোচ ॥ আর জীবন যদি তোমাকে একটা খাপ্পোড় দিয়ে—হঁ—(মেয়েটিকে)
ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ! দেখছেন না, কত অল্প বয়স ! কিষ্ট বা
দেখেছে, আর কিষ্ট বা শুনেছে ? জীবনের বোঝেই বা কি বলুন ?

জানে? জীবনটা একটা সামটোটাল্ অব কোটেশন্স—ইয়ার্কি করলে বানান ভুল হতে পারে? জানে না। (কোকাকোলা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন) এঁই দেখুন! যা দেখছেন শুধু বাইরেই! ভেতরে কিচ্ছ নেই—একেবারে ফাঁকা! জীবন নেই, শুধু তার একো আছে—জীবনের খাঁজে খাঁজে রাম, শুধু আম, আম হয়ে বেরিয়ে আসছে! এদের সে বোধ নেই মিস, সে ব্যথা নেই, সে পরিধি নেই। আমার কিঞ্চ আছে মিস। আমি দেখেছি দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ ঘণ্টা শুধু মূঢ় অপব্যয়, শুধু খুচরো কাজ—প্রাউড, সেল্ফিস, স্টুপিড্ সমস্ত কাজ! তাই তো আপনাকে নিতে এলাম। এদের সঙ্গে গেলে রোজ মোটে আধঘণ্টা বাঁচবেন। আর আমার সঙ্গে? চব্বিশ ঘণ্টা শুধু বেঁচে থাকা! ব্রাইট্, বিউটিফুল, ইন্টেলিজেন্ট, ইডিওসির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া!

যুবক ॥ বিশ্বাস করবেন মা মিস দে! উনি জোচ্চোর! নিজেকে ঠকাচ্ছেন! উনি নৈরাশ্রবাদী! তাই সাড়ে তেইশ ঘণ্টা ঔর কাছে মূঢ় অপব্যয়! আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন মিস—আমরা ফাঁকা মাঠে চলে যাতি। সেখানে দুনিয়ার মজহুর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!

কোকাকোলা ॥ (নাচিতে নাচিতে) ও, ফোক্? ইউ ওয়ান্ট্ ফোক্? হিয়ার ইজ ফোক্—পিওর ইণ্ডিয়ান! (গাহিতে আরম্ভ করিলেন)

হামারা শ্বশুরিয়া, পিয়ারা জিলেবিয়া

হুকালা—হো লা লা

হুকালা পারা লালিয়া

রামা হো—হো লা লা—

প্রোড ॥ মিথ্যে! বুঝতে পারছেন মিস—একেবারে ফাঁকা! এ দুটোই এক্সেনট্রিক! একটা হাওয়াইয়ান, আর একটা রোমান্টিক! বোঝে না, যে ঐ ইন-কিলাব জিন্দাবাদ, ঐ আওয়ারা মার্কা হাওয়াই সার্ট, সব ফুস হয়ে উড়ে যাবে! থাকবে শুধু নেড়া, বোচা, ট্যারা, টেকো একটা জীবন!

যুবক ॥ শুনবেন না মিস দে—ঔর কথায় কান দেবেন না! পেসিমিস্টিক্ ফিলসফি, এ বুর্জোয়া রিঅ্যাক্সনারি! আসুন আমরা ঝাণ্ডা হাতে করে বেরিয়ে পড়ি! দুনিয়ার মজহুর এক হয়ে যাক—ইন-কিলাব জিন্দাবাদ!

প্রোচ ॥ এই এঁতটুকু—নিজের চারপাশে ছোট্ট একটা গোল ! দুঃখবোধ নেই, তাই পরিধিও বড় নয় ! থট্ এক্সপ্যাণ্ড্‌স্, সরো এক্সপ্যাণ্ড্‌স্ ! টু থিঙ্ক ইজ টু বি শ্যাড ! আমি ভাবি, তাই দুঃখ পাই, অ্যাণ্ড সরো এক্সপ্যাণ্ড্‌স্ দি সার্কুল্ ।

যুবক ॥ বাজে কথা ! উনি আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন মিস দে ! ওঁর পায়ের তলায় মাটি নেই !

প্রোচ ॥ কারো পায়ের তলায় মাটি নেই মিস্ দে ! ম্যানকাইণ্ড ইজ লিভিং অন্ এ লিনিং টাওয়ার । মানুষের পাস্ট নেই, প্রেজেন্ট নেই, ফিউচার নেই ! শুধু দেয়ার ইজ এ সার্কুল্ অ্যাণ্ড এ সার্কাম্ফারেন্স ! শুধু পরিধিটা আছে ! আমার পাশে আপনি এসে দাঁড়ান মিস্ দে, দেখবেন সে পরিধি কত বড়—তার কোন মাপ নেই ! (গোপালবাবুর সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক প্রবেশ করিলেন) ।

অধ্যাপক ॥ মাপ নেই ? কে—কে বলে মাপ নেই ? পরিধির মাপ পাই আর স্কোঅ্যার ! আপনার পরিধি ? সে তো মুখে মুখে বলে দেওয়া যায় । আপনার রেডিয়াস্ কত ?

প্রোচ ॥ আমার কী ?

অধ্যাপক ॥ রেডিয়াস্—রেডিয়াস্ ? মানে নাভি থেকে পায়ের টো পর্যন্ত ? ম্যাথিমাম্ তিন ফিট্ হোক ! তাহলে পাই আর স্কোঅ্যার $= \frac{3}{4} \times 3 \times 3 = \frac{1}{4} \times 3$ স্কোঅ্যার ফিট্ ! ওর চেয়ে আমার পরিধি বড় । আমার রেডিয়াস্ অন্তত $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি বেশি হবে ।

প্রোচ ॥ মূৰ্খ ! জীবনটা কি অঙ্কের খাতা, যে খস খস করে কষে গেলাম, আর উত্তর মিলে গেল !

অধ্যাপক ॥ জীবনের প্রত্যেকটা উত্তর আমার হাতে করে মেলানো । তাই তো আপনাকে বলতে এলাম মিস্ দে—লাইফ ইজ পিওর ম্যাথমেটিক্‌স্ । শুধু পিওর ম্যাথমেটিক্‌স্ কেন ? ইট ইজ এ পারটিকুলার সেকশন অব ম্যাথমেটিক্‌স্—মানে অ্যালজেব্রা ! সব ছকে বাঁধা, সব কমুলায় ফেলা ! খালি একটা কমুল্য মিস্ দে—এ প্লাস বি হোলস্কোঅ্যারটা আমি মেলাতে পারিনি । এ স্কোঅ্যার প্লাস্ বি স্কোঅ্যার আমি আমার জীবন থেকেই পেয়েছি, এখন দরকার খালি প্লাস্ টোরাইস্ এবি-টার ! আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়ান মিস্ দে, আমি প্লাস্ টোরাইস্ এ

বি দিয়ে কম্বুলাটা মিলিয়ে দিই।

যুবক ॥ না মিস দে, না! জীবনটাকে উনি ছকে বেধে ফেলেছেন! মানুষ কি শুধুই সংখ্যা। মিস দে, শুধুই অ্যান্ডেজব্রিক্যাল কোয়ানটিটি? মানুষ মানুষ! জীবনের তার কত দিক! গণ-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন! তার কত অ্যাঙ্কল্ পপুলেশন্ অ্যাঙ্কল্, পলিটিক্যাল অ্যাঙ্কল্, ইকনমিক অ্যাঙ্কল্! চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি মিস দে!

প্রোচ ॥ উঁঃ! বেরিয়ে পড়ুন মিস দে! জীবনের গোলকধাঁধার রাস্তা চেন তুমি?

মাতাল ॥ (গম্ভীরভাবে) দরকার নেই। আমার পকেটে স্ট্রীট গাইড আছে।
দাম ছ-আনা। এক বোতল পাকি ধাওয়াও, এমনি দিয়ে দেব মানিক।

অধ্যাপক ॥ না না—স্ট্রীট গাইডে কি হবে? পাশাপাশি রাস্তা চললে প্যারালাল স্ট্রেট্ লাইনে চলতে হয়—সে জ্ঞান তোমার আছে? প্যারালাল স্ট্রেট্ লাইন কাকে বলে তা তুমি জান? শেষ পর্যন্ত তারা ইন্ফিনিটিতে মিট করে? ইন্ফিনিটি কি, কতদূর, কি তার ক্যালকুলেশন্, বলতে পার? রাস্তা চলবে? রাস্তা অমনি চললেই হল!

কোকাকোলা ॥ (বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে) পাসারা পাপারাসা পাপারাসা—হোলালা—নাউ উইথ্ এ ক্লাসিকাল টুয়িস্ট্—ইয়েঁ।
দদ' ভরি—

যুবক ॥ আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন মিস দে! বাইরে জীবন যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! চলুন আমরা সেখানে চলে যাই—যেখানে কুলিরা মোট বর, চাষীরা চাষ করে—যেখানে কড়া রোদ্দুরে মেয়েরা ছাদ পেটায়! (গোপালবাবুর সঙ্গে স্থানীয় বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বি আর সেনের প্রবেশ)

সেন ॥ (যুবকের পাশ দিয়া ঘাইবার সময়) তারপর - টি বি হলে ট্রুটমেন্টের খরচা, আঙুর-বেদানা-আপেলের খরচা, সব জোগাতে পারবে তো? (অধ্যাপক ও প্রোচের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মেয়েটির নিকটে আসিয়া) এতক্ষণ এই সব বাজে ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, খুব বিরক্ত বোধ করছেন তো? হাক গে, আর ভাবনা নেই—আমি তো এসেই পড়েছি! (মেয়েটি কিছু বলিবে আশা করিয়া) মানে—আমাকে চিনতে পারছেন তো? আপনাদের প্রায় নেক্স্ট-ডোর নেবার বললেই

হয়। বি আর সেন—মানে ব্রজরঞ্জন সেন। আপনার দাদা আমাকে খুব ভালো কবেই চেনেন। ব্যারাকপুর পেপার অ্যাণ্ড পান্ন, শ্রামনগর হোসিয়ারী—এসব আমাদেরই—মানে আমারই! এ ছাড়া শেয়ারমার্কেট, ফিল্ম, ডিস্ট্রিবিউশন, উন্টোডাক্সার টাব্‌স্‌ অ্যাণ্ড টাব্‌স্‌, মানে বালতির কারখানা, এ সব তো আছেই। (তখনও মেয়েটিকে চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া) ওঃ দেখেছেন—কী ভুল! আসবার পথে পাশের জুয়েলারি দোকানের শো-কেসে এটা দেখে পছন্দ হয়ে গেল—নিয়ে এলাম আপনার জন্তে। পছন্দ কিন্তু ভুল হয়নি। ভারী চমৎকার মানাবে আপনার হাতে! আসুন, আমরা তাহলে যাঁই, আবার ওদিকে দেবি হয়ে যাবে! না না—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা করে তবে আমি এসেছি। সেই জন্তেই তো নতুন মডেলের কিংসওয়েটা নিয়ে এলাম। আপনার যদি কিছু নিয়ে যাবার থাকে তো আমি আর্দালিটাকে বলে দিচ্ছি—ও গাড়িতে ভুলে দেবে। ইঁ্যা ভালো কথা—এ গাড়িটা আপনিই ব্যবহার করবেন—আমার আরও দুখানা আছে।

কোকাকোলা ॥ (নাচিতে নাচিতে) লেট্‌ মি ট্রিট্‌ ইউ টু অ্যান ইণ্ডিয়ান ড্যান্স, প্রোগ্রাম, অফ্‌ কোর্স্‌ উইথ্‌ অ্যান হাওরাইয়ান মিক্স্‌চার—খা—খা—থেকেটে—খা—তেরে—কেটে—খা—হো—লা—লা—

সেন ॥ আপনার মনে কি কোন দ্বিধা আছে মিস দে, কোন সঙ্কোচ?

যুবক ॥ ও ভুল করবেন না মিস দে। আপনি তার চেয়ে বরং এই অধ্যাপক, কি এই বুদ্ধিজীবীকে বিয়ে করুন। বাট্‌ নট্‌ দিস্‌ ম্যান্‌! হি ইজ্‌ এ ড্যান্ড্‌ ক্যাপিটালিস্ট! এরা প্রগতিককে বন্ধক রেখে কাজ করতে চায়! ডাউন্‌ উইথ্‌ ক্যাপিটালিজম্‌—ডাউন্‌—ডাউন্‌—

অধ্যাপক ॥ মিস দে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন! আমি টোরাইস এ বি টা যোগ করে নিয়ে ফর্মুলাটাকে মিলিয়ে নিই!

প্রোচ ॥ ভুল করবেন না মিস দে—জীবন ফর্মুলাও নয়, বন্ধকী গহনাও নয়। লাইফ্‌ ইজ্‌ এ শ্রাড্‌ খট্‌। আপনি আমার চিন্তার পরিধির মধ্যে ঢুকে পড়ুন মিস দে—সেখানে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়ান।

সেন ॥ বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি মিস দে—চলুন আমরা যাঁই। আপনি তো নিজেই বোঝেন, এসব ফাঁকা কথায় জীবন হয় না। লাইফ্‌স্‌ ওয়ে ইজ্‌ এ কিং'স ওয়ে, অ্যাণ্ড মানি রুল্‌স্‌ দেয়ার!

কোকাকোলা ॥ অ্যাণ্ড ড্যান্সিং আই ট্রেড্‌ অন ইট্‌ । টেক্‌ দিস্—আল্‌কা
বিটা গামা জেটা—ধা—ধা—ধেরে—কেটে—ধা—

প্রোট ॥ ভুল, ভুল সব ভুল । লাইফ্‌ ইজ্‌ এ সাম্‌টোটাল্‌ অব্‌ কোটেশনস্‌ ।

মিস্‌ আপনি আমার সঙ্গে আসুন, একটাও বানান ভুল হবে না ।

অধ্যাপক ॥ মিথ্যে ! জীবনটা একটা কয়লা । আপনি আমার সঙ্গে আসুন
মিস্‌ দে, আমরা স্মৃতি চলে যাই ।

সেন ॥ জীবনের পথে চলতে হয় মিস্‌ দে—অ্যাণ্ড্‌ দ্যাট্‌ ওয়াক্‌ মাস্ট বি এ
ফাইন ওয়াক্‌ ! আমার প্রচুর টাকা । আমি আপনার পথ কার্পেট দিয়ে
মুড়ে দেব মিস—গায়ে পায়ে আঁচড়টি লাগবে না ।

কোকাকোলা ॥ অল্‌ বোগাস্‌ ! লাইফ্‌ ইজ্‌ এ ড্যান্স্—থেকেটে—থেকেটে—
—ধা—

মাতাল ॥ (অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) সব ভুল গোপালের দল, সব ভুল ।
জীবনটা একটা পাকি মালের বোতল । সেই বোতল আমি তিন-তিনটে
খেয়ে হজম করতে পারি মিস ! জীবনে চলতে হয় না মিস্‌, শুধু টলতে
হয় । আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমরা টলতে টলতে বেরিয়ে যাই—
(এমন সময় গোপালবাবুর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোকের প্রবেশ । বয়স
পর্যায়ের মধ্যে, চোখে চশমা, গায়ে ছাণ্ডলুমের কাপড়ের পাঞ্জাবি, পরনে
সাধারণ ধুতি, পায়ে শাওল । খুব এতটা ফিট-কাট কিছু না হইলেও,
তেমন কিছু খারাপও নয় ।)

ভদ্রলোক ॥ একটু আগেই আসব ভেবেছিলাম । কিন্তু একা মানুষ তো—সব
গুছিয়ে আসতে করতে একটু দেরিই হয়ে গেল ।

গোপাল ॥ না না, তাতে কি হয়েছে—আমি তো কাগজে এগারটা অবধি সময়
দিয়ে রেখেছিলাম । আসুন—আমার ভগ্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ।

ভদ্রলোক ॥ চলুন, কিন্তু এঁরা—

গোপাল ॥ এঁরা সব আপনারই মত আর কি—

ভদ্রলোক ॥ ও—নমস্কার—

গোপাল ॥ (মেয়েটির নিকট আসিয়া) ইনি আমার ভগ্নী শ্রীমতী শীলা দে, আর
ইনি শ্রী অসীম রায় । (মেয়েটি নৃত্যরত কোকাকোলার দিকে তাকাইয়া
মুহু মুহু হাসিতেছিল । দাদার কথায় চটকা ভাঙিয়া এদিকে মুখ ফিরাইতেই
দেখে এক ভদ্রলোক সলজ্জ ভাবে মুহু হাসিতে হাসিতে তাহাকে নমস্কার

করিতেছে । সেও যুহু হাসিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে প্রতিনমস্কার করিল ।)
ভদ্রলোক ॥ না—মানে—তেমন কোন পরিচয় আমার নেই । সাধারণ ভদ্রলোক,
আমার শিক্ষা-দীক্ষাও সাধারণ । মার্চেন্ট আপিসে একটা চাকরি করি,
সবস্বত্ব মিলিয়ে মাসে দু-শ কুড়ি টাকা । আর পেলে ছাত্র পড়াই, এখন
ছুটো আছে । একাই ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বড় একা মনে হতে লাগল ।
তাই ঠিক করলাম, আপনাদের, মানে মেয়েদের যদি কেউ রাজী হন,
তাহলে একটা বিয়েই করি । সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসা, অবশ্য
আপনার পছন্দ হলে । তবে ও কথাটাও আমি ভেবে দেখেছি যে, আপনিও
আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না । তারপর মনে হল,
জন্তু-জানোয়ার তো আর নই—মানুষ । থাকতে থাকতে ঠিকই একসঙ্গে
মিলে-মিশে যাব ।

শীলা ॥ কিন্তু ধরুন যদি না মেলে ?

অধ্যাপক ॥ মিলবে ? কি করে মিলবে ? অন্ধ মেলানোর অভ্যাস থাকা চাই !

প্রোফ ॥ যত সব বাজে কথা ! অন্ধ মিললে কি জীবন মেলে ? আপনাকে
আমি বলেছি তো মিস—জাইফ্, ইজ এ শ্যাড্, থট্ ! এ সারকল্ অ্যাণ্ড
এ সারকাম্ফারেন্স্ ! আপনি একটু কাছে সরে আসুন মিস, আমি
ভাবের ল্যাসো মেরে আপনাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিই !

যুবক ॥ না মিস দে, না ! এরা আপনাকে পেছনে টানছে ! জীবন মানে শুধু
এগিয়ে যাওয়া—চলুন আমরা এগিয়ে যাই কমরেড—চাব না পশ্চাতে
মোরা, মানিব না বন্ধন ব্রন্দন—

সেন ॥ (যুবকের মুখের সামনে একটা আঙুল তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে বাধা দিয়া
মেয়েটিকে) ছোট্ট একটা কথা মিস দে—টাকা ! দেখবেন কোথাও অমিল
নেই । আসুন—মাই কিংস্ওয়ে ইজ্ ওয়েটিং কর্ ইউ !

মাতাল ॥ শ্রেষ্ট এক বোতল পাকি মাল মিস ! সব মিলে গোল হয়ে যাবে !

কোকাকোলা ॥ লেট্ আস্ ড্যান্স, অ্যাণ্ড উই উইল বি ওয়ান্-ধা-ধা-থেকেটে ধা—

ভদ্রলোক ॥ দেখুন, এঁদের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল ।

বলব ?

শীলা ॥ নিশ্চয় ! এঁরা যখন বলছেন, তখন আপনিই বা বলবেন না কেন ।

ভদ্রলোক ॥ একবার এক অন্ধ একটা হাতীকে গায়ে হাত দিয়ে বোঝবার চেষ্টা
করেছিল । ল্যাজে হাত দিয়ে বললে হাতী দড়ির মত—শুঁড়ে হাত দিয়ে

বললে সাপের মত—পায়ে হাত দিয়ে বললে খামের মত, আর কানে হাত দিয়ে বললে—না না বুঝেছি—হাতী কুলোর মত ! তাই দড়ি হল, সাপ হল, খাম হল, কুলো হল, কিন্তু হাতী হল না । তাই ইনি টাকা হয়েছেন, উনি ফর্মুলা হয়েছেন, ইনি ভাবছেন, আর উনি শুধুই এগিরে যাচ্ছেন ! আর এই দুজনের একজন নাচছেন, আর একজন নেশা করে উণ্টো পথে হাঁটছেন ! সব হল, কিন্তু জীবন হল না । এঁরা অ্যানালিসিস করে জীবনকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছেন ! কিন্তু সুষ্ট স্বাভাবিক জীবন তো অ্যানালিসিস নয় মিস্ দে, সেটা সিন্থেসিস । এঁরা ভাঙা টুকরো নিয়ে আছেন—তাই আপনাকে না পেলেও এঁদের চলবে । কিন্তু আমি জীবন ভোর সিন্থেসিস করবার চেষ্টা করে এসেছি, তাই আমার আপনাকে পেতেই হবে, আপনারও আমাকে চাই ! নইলে আমাদের সিন্থেসিস পুরো হবে না মিস্ দে—উই উইল নেভার বি নরম্যালি সিন্থেটিক্ ।

শীলা ॥ বিয়ে আমাদের রেজিস্ট্রী করেই হবে তো ?

ভদ্রলোক ॥ আমার তো সেই ইচ্ছেই আছে—তবে আপনার যদি—

শীলা ॥ না না—আমার কোন আপত্তি নেই—

ভদ্রলোক ॥ (ঘরের সকলের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া) আচ্ছা নমস্কার, আমরা •

তাহলে চলি কেমন—(গোপালবাবুকে) আপনি আসছেন তো ?

গোপাল ॥ আপনারা এগোন, আমি যাচ্ছি—(ভদ্রলোক ও শীলার প্রস্থান)

সেন ॥ এ পেরা অফ্ ফুল্স্ ! (গহনার বাক্সটা তুলিয়া লইয়া গট্-গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।)

প্রোড ॥ যাচ্ছ যাও—কিন্তু আবার ফিরে আসতে হবে ! লাইফ্ ইজ্ এ শ্যাড্ থট্—গাট্ কাম্স্ ব্যাক্ এগেন্ অ্যাণ্ড্ এগেন্ । (প্রস্থান)

অধ্যাপক ॥ (এতক্ষণ যেন খানিকটা হতভম্বের আয় হইয়া গিয়াছিলেন) মিস্ দে চলে গেলেন ! কিন্তু আমার টোরাইস্ এবি টা, মিস্ দে !

(ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) আমার লাইফের ফর্মুলাটা মিলবে না মিস্ দে—আপনি ফিরে আসুন—(বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন)

যুবক ॥ (গোপালবাবুকে) আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন কি ? আমি মুশড়ে পড়িনি ! আমার পেছন দিক নেই শুধু সামনে ! তোমরা এগোও কম্‌রেডস্ আমি যাচ্ছি—উন্-কিলাব জিন্দাবাদ—(বলিতে বলিতে প্রস্থান) ।

মাতাল ॥ কিন্তু 'আমি এখন যাঃই কি করে ? আমার যে নেশা কেটে যাচ্ছে !
(গোপালবাবুর নিকটে আসিয়া) ছোটো টাকা দাও না মানিক—একটু নেশা
করি—নইলে যে সোজা হয়ে চলতে পারব না গোপাল ! (গোপালবাবু
টাকা দিলে) জিতা রহো মানিক—জিতা রহো—(চলিয়া যাঃইতে
যাঃইতে) তোমার জন্ম জন্ম স্বয়ংবর হোক বাবা—জন্ম জন্ম আমি পাকি
খাই—(প্রস্থান)

কোকাকোলা ॥ ফাস্ট টু কাম্ বাট লাস্ট্ টু গো ! বাট্ আঃই উইল্ ড্যান্স
দেম্ আউট—খা—খা খেকেটে—খা—(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান) ।

যবনিকা

সহকর্মিনী শ্রীলতা সেন ॥ মণীন্দ্র রায়

সে আজ বছর দশ হবে, একদিন
আপিসে শ্রীলতা সেন এল, আর আমার কাছেই
কাজ শেখা শুরু হল তার । ক্রমে কথায় কথায়
জানা গেল, ভাইয়ের সংসারে একা থাকে ;
ও-বাড়িতে উদয়াস্ত খেটেও সুনাম
পায়নি, জীবন যেন অজগর, বাঁধে পাকে পাকে ;
অথচ এ-কাজে ঢুকে কয়েকটি টাকায়
বেড়ে গেছে তারো নাকি দাম !

এ কাহিনী ঘরে ঘরে । তবু সবিনয়ে
শুনে গেছি প্রবীণের মমতায় । আর
শ্রীলতাকে লেগেছে ভালোই ।
দেখেছি কী করে সেই ভীকু মেয়ে কঠিন শ্রমের
হঃসাহসে নিজেকেই ভেঙে ভেঙে রোজ
গড়েছে নতুন মূর্তি, যা অচেনা, যা রহস্যময়ী ।

ক্রমে সে দাঁড়াল এসে মুখোমুখি । আপিসের কাজে
প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার এবং অনেকেরি ।
কাজেই গোপন ঈর্ষা নিন্দার হাওয়ায়
জ্বলে মুখে মুখে । কিন্তু হয়ে গেছে দেরি,
পদোন্নতি হল তার । কেউ কথা বলে না, সে একা
কাজ করে, যেন তার ঘটেছে কী দোষ ।
আর এরি মাঝে দেখ আপিসে সেদিন
নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে ধূমায়িত হল অসন্তোষ ।

শ্রীলতা সে দলে নেই, এ তো জানাশোনা ।
তার দাবি মিটেছে আগেই ।
সে যেন বহিরাগত, তাকে আর মিটিঙে কে ডাকে ।
তবু ধর্মঘট এলে দেখা গেল তাদের দলের
সকলেই কাজে আসে. অথচ বিশ্বয়,
শ্রীলতা ভোলেনি আপনাকে !

জানি তার ক্ষতি হবে । হয়তো কখনো
পাবে না সে উপরের সিঁড়ি ।
তবু কী ছুঁবার ঐ জীবনের পরিণতি, আজ
সকলের পাশে নেমে সবার উঁচুতে
নাম তার আলোকিত । রয়েছে সে আমাদেরি ভিড়ে,
অথচ পারি না তাকে ছুঁতে !

মায়ের জন্মে ॥ তারাপদ রায়

কতদিন দূরে দূরে, আকৈশোর রয়েছে প্রবাসে ;
 এতকাল আমি একা অনাখ্যীয় সুদূর সংসারে
 গোধূলিতে ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে মৌন অন্ধকারে
 তোমার মুখের মত তোমাকেই ভাবি । আশে-পাশে
 রাত্রির শিশির পড়ে, জানালার মুখ কুয়াশায়
 ছেয়ে যায় : হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তোমার খোকন
 ঘর ফেলে বারান্দায় তারপর সদর উঠোন
 তোমার সীমানা ছেড়ে একদিন কোথায় হারায় ।
 অথচ মনেও পড়ে । যখন ছুপুর আঁকাবাঁকা
 আকাশের মেঘে-নীলে ভেসে যায় চিলের পাখায়
 স্তব্ধ প্রহরের ফাঁকি পায়রার করুণ কান্নায়
 গুরুভার হয়ে ওঠে বহুদিন মনে ধরে রাখা
 আম-হিজলের ছায়া কবেকার পাখি-ডাকা দিনে
 ধূসর অম্পষ্ট এক সংসারের নোনাধরা ঘরে
 রক্তের অনেক নিচে প্রতিটি সন্ধ্যার দীপ ধরে
 তুমি আজো কাছে ডাকো দিনান্তের প্রশান্ত বিপিনে ।

বর্ষা শেষ হয়ে আসে । ঘোলা-জল বুড়াএঙের খালে
 এতদিনে ভাঁটা নামে ; বাঁশের বনের নিচ ঘুরে
 নৌকোগুলি ফিরে যায়, পানকৌড়ি উড়ে যায় দূরে ।
 নারকেল-সুপারীর ফাঁকে ফাঁকে সোনার সকালে
 কাশ আরো সাদা হয়, আরো রঙ রোদের ঝালরে
 দিন আরো আনমনা আমন্ত্রণ আমগনৌ গানে
 সেই যে ঘরের ছেলে কবে ভেজা প্রথম বিহানে
 গিয়েছিল দূর দেশে হয়তো বা তাকে মনে পড়ে ।

অগ্নি এক শহরের ধুলো-জমা পথ হেঁটে হেঁটে
 বহু ভিড়ে জনতায় সে কবে হারিয়ে গেছে একা
 ছ-চোখে ক্রান্তির কালি, বয়সের ইতস্ততঃ রেখা
 আজ তাকে ছেয়ে রাখে ; তার দিন কবে গেছে কেটে ।
 হয়তো ভেবেছ তুমি তোমার কুমার একদিন
 সোনার মুকুট পরে যেন এক রাজার কুমার
 বাড়িতে আসবে ফিরে. ছন্নছাড়া পুরনো সংসার
 আবার সাজাবে তুমি—প্রতীক্ষায় আজো নিদ্রাহীন !

দুঃখের সাম্রাজ্য নিয়ে আজ আমি সম্রাট মহান,
 কোথায় আমার ঠাই ? তোমার নিরালো আঙিনায়
 সেই সিংহাসন নেই ; শুধু থাক প্রতিটি সন্ধ্যায়
 দীপের নিখর আলো, দীপ হোক তোমার নয়ান ।
 উৎস থেকে মোহনায় সময়ের অস্পষ্ট ধূসরে
 সরে আসি । ঘনিষ্ঠ স্মৃতিতে তবু সুদূর প্রবাসে
 চিরদিন পাশাপাশি ; দিন থেকে দিনান্তের পাশে
 দুঃখ শেষ ভোর হয়ে তুমি থাকো প্রহরে-প্রহরে ॥

দাশবোদ

টেলিগ্রামটা হাতে করে প্রায় আকাশ-কাটানো গলার চিৎকার করতে করতে বাড়িতে ঢুকল খোকন।

—মা—মা—দিদি—

বাড়িসুদ্ধ লোক এই মুহূর্তটার জন্তেই অপেক্ষা করছিল। স্বাস্থ্যগুলিতে টান রেখে প্রায় নিশ্বাস রুদ্ধ করে। বিকেল থেকেই থম থম করছিল আবহাওয়া, কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রতিমাকে একটা আশ্বাস দেবার ভাষা পর্যন্ত কারো ছিল না। টুয়েন্টি ওয়ান পাসে'ন্ট ইন্ টংলিশ—কয়েকদিন আগেকার এই টুকরো ধবরটুকু অসম্ভব আশার ক্ষীণ স্রোতায় বাধা একখানা খড়্গের মতো ছিল মাথার উপর। আর প্রতিমা ঘরের অন্ধকার কোনার স্তূপাকার পুরনো কাগজগুলোর পাশে লুকিয়েই বসেছিল একরকম—যাতে একান্ত দুঃসংবাদ আসবার সঙ্গে সঙ্গে আরো গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারে সে।

খোকনের চিৎকার—তার পায়ের শব্দ চকিতে গুমোট আকাশের মেঘগুলোকে সরিয়ে দিলে। দক্ষিণ বাতাসের একটা ঝড় বয়ে গেল যেন।

সকলেই বুঝেছে, তবু এক সঙ্গে তিনটে গলার আর্তস্বর উঠল।

—কী হল—কী হল? পাশ করেছে?

—হ্যাঁ মা, দিদি পাশ করেছে। এই যে—ক্যাল্ এক—এই তো দিদির রোল নম্বরের পাশে লেখা আছে 'পি'।

মা হাত তুলে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করলেন, কৃতজ্ঞতায় চোখ বুজে এল তাঁর। ছোট বোন অণিমা হাততালি দিয়ে উঠল : কী মজা ! এবার দিদি নামের পাশে লিখবে প্রতিমা বোস, বি-এ। কাল কিন্তু আমরা পোলাও মাংস খাব মা।

মা বললেন, হবে—হবে। উনি আপিস থেকে আসুন আগে। কী ভাবনা নিয়েই যে গেছেন !

একটা গভীর অবসাদে প্রতিমার সারা শরীর এলিয়ে এসেছে এখন। সারা দিনের অসহ্য মানসিক পীড়নটা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বিছানায় গিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে—তলিয়ে যায় একরাশ অতল ঘুমের ভেতরে।

কত রাত যেন সে ঘুমোয়নি।

ততক্ষণে খোকনের হাত থেকে টেলিগ্রামটা কেড়ে নিয়েছে দাদা। বিছিয়ে বসেছে মেজের উপর।

খোকন আঙুল দিয়ে দেখাতে যাচ্ছিল : এই যে—ক্যাল্ এফ্—

দাদা একটা স্নেহ ধমক দিয়ে বললে, তুই খাম, আমি ইংরেজি পড়তে পারি।

দিদির বি-এ পাশ করবার সমস্ত কৃতিত্ব যেন খোকনেরই, এমনি ভঙ্গিতে সে সোৎসাহে বলে চলল, প্রথমে খুলতেই ভুল করে ক্যাল্ এফ্ পিটা দেখেছি। দেখি, দিদির তো নেই-ই, আগে-পিছে আরো চার পাঁচটা রোল-নাম্বারই নেই। আমার তো মাথা ঘুরে গেল। ভালো করে দেখি—আরে ধেং, এষে এফ্-পি ! তখন মনে আবার ভরসা হল। তারপর—

দাদা গভীর হয়ে বললে, হুঁ, খুব ফেল করেছে, এবার।

অণিমা বললে, যাই, টুলীকে বলে আসি আমি। ওর দিদি বি-এ পাশ বলে কী অহংকার ওর ! এবার আমিও বলব—

ছুটে বেরিয়ে গেল অণিমা। এই সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে গেল—তবু বাধা দিলেন না মা। আজকের দিনটা অন্তরকম।

শুধু বললেন, দেরি করিসনি—এফুনি আসবি।

—যাব আর আসব। বলেই চলে আসব—দূর থেকে সাড়া দিয়ে গেল অণিমা।

টুলী অণিমার বন্ধু। গলির মোড়ে ওদের বাসা।

যাকে নিয়ে এত উল্লাস, এত উত্তেজনা—এতক্ষণে তার কথা মা-র মনে পড়ল।

—ঝুঝু—ঝুঝু কোথায় গেল ? ওরে অ ঝুঝু—

ঝুঝু প্রতিমার ডাক নাম।

অবসাদের জড়তা থেকে আশ্বে আশ্বে উঠে এল প্রতিমা। স্নেহে আনন্দে কেমন যেন লজ্জা করছে তার—কারো দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

দাদা গভীর হয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স মিস প্রতিমা বোস, বি-এ !

প্রতিমা আন্তে আন্তে মা-র পাশে এসে বসে পড়ল। গভীর মমতায় মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন, তুই আর ওকে এখন ঠাট্টা করিসনি বাপু। তিন দিন ধরে মেয়ে ঘুমোয় না, একটা কুটো অবধি দাঁতে কাটে না। শুকিয়ে একেবারে আধখানা হয়ে গেছে। যতই বলি, কিছু ভাবনা নেই, তুই নিশ্চয়ই পাশ করবি—তবু মুখ থেকে মেঘ আর সরে না। ফিলসফি ভালো হয়নি, খার্ড পেপারটা খারাপ দিয়েছি—এমনি কত কথা। হল এবার ?

—ওসব স্টাইল—ও-রকম বলতে হয়।—দাদা মস্তব্য করলে।

—হঁ—স্টাইল !—প্রতিমা এবারে গজ গজ করে উঠল : আমার যে কী ভয় ধরেছিল—

ভয় দাদারও ছিল—বাড়ির কারোই ভয়টা কম ছিল না। বাবা তো বলতে গেলে প্রায় আধপেটা খেয়েই আপিসে বেরিয়েছেন আজ। কিন্তু নির্ভাবনার সীমায় পৌঁছে দাদা বীরের মতো বললে, বি-এ পরীক্ষায় আবার কিসের ভয়—শুনি ? ও তো চোখ বুজেই পাশ করা যায়।

দাদা অবশ্য বলতে পারে কথাটা—সে-ও এক চান্সেই পাশ করেছিল। কিন্তু রেজাল্ট্‌ বেরুবার দিন সে যে সকাল থেকে দরজা বন্ধ করে বসেছিল—সেটা আর মনে পড়িয়ে দিল না প্রতিমা। আজকের দিনে সে উদার হয়ে গেছে—কাউকে এতটুকুও হুঃখ দিতে চায় না।

—কাগজটা আমাকে একটু দে না দাদা—

—নাও, ভালো করে দেখে নাও—দাদা ঠেলে সরিয়ে দিলে কাগজ।

না, ভুল নয় সত্যিই পাশ করেছে। এই তো তার রোল নাম্বার। শেফালি—ই্যা, শেফালিও পাশ করেছে। মাধবী ? না—মাধবীর রোল তো নেই। আর কী আশ্চর্য, জ্যোৎস্না বেরিয়ে গেছে ঠিক, অথচ টেস্টে কেঁদে-কেটে অ্যালাউ হয়েছিল।

—মা, মাধবী পাশ করতে পারেনি।

বিস্মিত সহানুভূতিতে উৎসুক হয়ে উঠলেন মা।

—সেই ফর্সা রোগা মেয়েটি ? আসত তোর কাছে ?

—ই্যা মা, সেই। বেচারী !

—সে তো লেখাপড়ায় ভালো বলে শুনেছিলুম।

প্রতিমার দৃষ্টি ঘুরছে কম্পার্টমেন্টালের পাতায়। না—সেখানেও নেই মাধবী।
সে চালও পায়নি।

বেদনা ছল ছল করে উঠল প্রতিমার গলায়।

—ভালোই তো ছিল মা—কিন্তু—একটু চূপ করে রইল প্রতিমা : কী যে কষ্ট
করে পড়েছে তুমি ভাবতেও পারো না। তিনটে টিউশন করে সংসারের খরচ
দিয়েছে, একখানা পড়বার বই ছিল না—

মা বললেন, আহা !

মাধবীর কথা মনে পড়তে নিজের পাশ করার আনন্দ হান হয়ে এল। কস! রোগা
মেয়েটি—ক্লাস্ত চোখে মাইনাস ফোরের চশমা। পায়ের ছেঁড়া চটি টেনে টেনে
দুর্বল ভাবে কলেজে আসা-যাওয়া করত। কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে
ওদের বাসা—কিন্তু কোনোদিন ট্রামে বাসে ওকে চাপতে দেখেনি প্রতিমা।

ইংরেজি এসে কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েও মাধবী পাশ করতে পারল না। আর
পাশ করে গেল জ্যোৎস্না চৌধুরী—একটা সেনটেন্স যে শুদ্ধ করে লিখতে পারত
না। জ্যোৎস্নার বাবা নাকি তিনজন প্রফেসর রেখে দিয়েছিলেন ওর জন্তে।

দাদা আস্তে আস্তে বললে, পরীক্ষাটা লাক্। কী যে হয়! ভুলে গেল একটু
আগেই সে বলছিল, যে কেউ চোখ বুজে বি-এ পাশ করতে পারে।

লাক্? না—কথাটা বিশ্বাস করে না প্রতিমা। যদি দুখানা নিজের বই থাকত
মাধবীর, যদি তিনটে টিউশন না থাকত, যদি পেট ভরে খেতে পেত—তা হলে
অনার্স পেতে পারত মাধবী, ডিস্টিংশন পেত। কিন্তু—

কিন্তু! কলেজের বারো আনা মেয়ের সামনেই ও কিন্ত-টা রাতদিন আঙনের
মতো জ্বলছে।

সেদিন স্টাক্ ক্রমে প্রিন্সিপাল দুঃখ করছিলেন, যাই বলুন, পড়াশুনোর স্ট্যাণ্ডার্ড
একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে আজকাল। হোপ্লেস! তার জবাব দিয়েছিলেন
হিট্টির মল্লিকাদি। বলেছিলেন, স্ট্যাণ্ডার্ড কী করে আশা করেন? চার টাকার বইয়ের
দাম হয়েছে বারো টাকা, টিউশন ফী হয়েছে দ্বিগুণ, বাঙালীর সংসারে দু-বেলা
দু-মুঠো জোটানোই প্রাণপণ সমস্যা। স্ট্যাটিস্টিকস্ নিলে দেখবেন ফিক্টি পাসেস্কে
স্টুডেন্ট একখানাও বই কিনতে পারে না, খাটি পাসেস্কে সামান্য কিছু কেনে,
আন্দাজ টুয়েন্টি পাসেস্কে মোটামুটি বইপত্র জোগাড় করে—নিশ্চিন্তে লেখাপড়ার
সুযোগ হয়। সে হিসেবে পরীক্ষার রেজাল্ট্ অনেক ভালোই হয় বলতে হবে।
মাধবী পাশ করতে পারল না। তার সাদা রক্তহীন মুখটা বার বার ভেসে উঠছে

চোখের সামনে। মাষ্টার ফোর চশমার নিচে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে। কলেজ থেকে বেরিয়েই টিউশন করতে চলল—এক কাপ চা-ও জুটল না হয়তো। ওদিকে জ্যোৎস্না পাশ করে গেল ঠিক—অথচ তার পাশ করার দরকার ছিল না। অগ্নিমা ফিরে এল।

—কিরে, বলে এসেছিস? মার জিজ্ঞাসা।

—হঁ। অগ্নিমা ক্ষুধা হয়েছে বলে মনে হল।

—কী বললে?

—টুলীর দিদি শুনে মুখ ভার করে বললে, পাশ কোসে পাশ করেছে—সেই খবর দিতে এমন করে ছুটে এলি? চ্যাচানি শুনে আমি ভাবলুম তোর দিদি বৃষ্টি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে!

বাড়ির খুশির হাওয়ায় বেসুরো বাজল। দাদা চটে উঠল।

—উনি তো বলবেনই ও কথা! দু-বার ফেল করে গাড়িরে গাড়িরে পাশ করেছেন কিনা।

মা বললেন, হিংসে—হিংসে! ছেড়ে দে ওর কথা। আমিও একবার ঘাট, দত্ত গিন্নীকে দিয়ে আসি খবরটা। রোজই জিজ্ঞেস করে একবার। শুনে খুব খুশি হবে।

মা পা বাড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হাঁ রে, খোকন কই?

খোকন আর কোথায়? কাগজটা দিয়েই সে অদৃশ্য হয়েছে। সে জানে, আজকের এই খুশির সন্ধ্যায় তার অনধ্যায়।

—না বলেই বেরিয়ে গেল? এলে কান ধরে ছুটো চড় দিস তো রতন?

রতন অর্থাৎ দাদা।

এদিকে মা-র পিছে পিছে অগ্নিমাও রওনা হয়েছে। মা ভুরু কঁচকে বললেন, তুমি আবার চললে কোথায়?

—তোমার সঙ্গে যাব।

—বেশ আছে সব! দিদির সঙ্গে সঙ্গে তোরাও গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলি নাকি?

যা—যা—পড়তে বোস—

অগ্নিমাকে ঠেকানো গেল না। এমন কি দাদা পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে বললে, যাক না

মা—ঘুরেই আসুক। আজ ওদের পড়ায় মন বসবে না।

মা-র সঙ্গে যাওয়ার একটা গোপন বাসনা প্রতিমার মনেও উঁকি দিয়েছিল। নিজে গিয়ে কথাটা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল কুশলকে। সকলের খুশির ভেতরে কুশলেরই

সব চাইতে খুশি হওয়ার কথা ।

মনে পড়ল, সেদিনও কুশল বলছিল : ধৈর্যের পরীক্ষা অনেক দিয়েছি—আর নয় । পরীক্ষার রেজাল্ট্ বেরুলেই কিন্তু—দুরু দুরু হলে উঠল বুকের ভেতর । সত্যিই বলবে নাকি কুশল ? আর বাবা কি রাজী হবেন ? পলিটিক্স করে জেল-খাটা কুশল—সামান্য মাইনের স্কুল মাস্টার ।

: তোমাকে যদি পাশে পাই—তা হলে আমার আর কোনো ভাবনা নেই বুনু । কিন্তু দুঃখ তুমি সইতে পারবে তো ? দুঃখ ! প্রতিমা হেসেছিল । বাবা-দাদার এই রোজগারে তাদেরও যে কিভাবে চলে সে কথা কি কুশল জানে না ? মাসের শেষ সাতটা দিন তাদের সংসারও মুখ খুবড়ে পড়ে—নিয়মিত বাজার আসে না, চায়ের সঙ্গে মুড়ির ব্যবস্থা হয়, যেবার বাবার ইন্সিয়োরের প্রিমিয়াম দিতে হয় সেবার বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে । কুশলের তো অজানা কিছুই নেই ! চমক ভাঙল দাদার কথায় ।

—তারপর মিস্ প্রতিমা বোস বি-এ, কী করতে চাও এখন ?

যেন মনের কথাটা দাদা টের পেয়েছে । লজ্জিত অপ্রতিভ হাসি হাসল প্রতিমা ।

—এম-এ পড়ব দাদা ।

—দি আইডিয়া । আমিও তাই ভাবছিলাম । এম-এ পাশ না করতে পারলে টুলীর দিদ্দিকে জব্ব করা যাবে না । কী পড়বি ? ফিলসফি ?

—না বাপু, ফিলসফিতে আমার ভরসা হয় না । খার্ড পেপার দিয়ে এত ভয় পেয়েছিলাম । বাংলাতে ভর্তি হবো দাদা ? আজকাল খুব বাংলা পড়ছে সবাই ।

—দূর, বাংলা একটা সাব্জেক্ট্ ! দাদা তাজিল্যের ভঙ্গি করলে : কোনো ইন্টেলিজেন্ট্ ছেলে মেয়ে বাংলা পড়ে ? যারা আর কোনো সাব্জেক্টে পাশ করতে পারবে না—তারাই বাংলায় অ্যাডমিশন নেয় । হিট্টি পড় । মডার্ন হিট্টি ।

—ওরে বাবা, অনেক পড়তে হয় । আর হিট্টিতে আমার একদম টেস্ট নেই ।

—তা বটে । টেস্ট না থাকলে নিয়ে শেষে মুশ্কিল হবে । তবে কী পড়বি ?

অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে দাদা চিন্তা করতে লাগল । শেষে বললে, তবে ইংরেজি নে ।

—কী সর্বনাশ !

—সর্বনাশ কেন ? নাম শুনেই ঘাবড়ে গেলি ? চমৎকার সাব্জেক্ট্ ।

—পাশই করতে পারব না ।

—আরে ধেং ! লিটারেচারে পাশ করতে পারবি না ?—দাদা অভয় দিয়ে বললে, দু-বছর খাটলে সব ঠিক হয়ে যাবে ।

—বড় জোর খাড' ক্লাস পাব ।

—তোর বাংলার ফার্স্ট ক্লাসের চাইতে ভালো । ইংরেজির কত ডিম্যাণ্ড জানিস আজকাল ? কোনোমতে পাশ করতে পারলেই প্রফেসারি । আমাদের আপিসেই একজন খাড' ক্লাস ইংরেজি এম-এ ছিল, দিব্যি লেকচারার হয়ে চলে গেল সেদিন ।

প্রতিমার চোখে স্বপ্ন ফুটে উঠল । লেকচারার ! কিন্তু সত্যিই কি খুব অসম্ভব ? আজকাল তো যে-কেউ কলেজে চাকরি পাচ্ছে । একটা মাঝারি সেকেন্ড ক্লাসও যদি পায়—

কুশলও তাকে সাহায্য করতে পারবে । সেও তো ইংরেজির কোর্স কম্প্লিট করেছিল । পরীক্ষার আগে আন্দোলন করে জেলে না গেলে পাশ করে এত দিনে সে-ও লেকচারার হতে পারত । কুশল যদি চেষ্টা করে—পারবে না প্রতিমা ? বাবার পায়ের শব্দ । এতক্ষণে এলেন । আপিসে কি সব কাজের চাপ পড়েছে আজকাল । প্রায়ই রাত হয় ফিরতে ।

দাদা সোৎসাহে বললে, বাবা—ঝুঝু—

বাবা স্মিতহাসিতে বললেন, জানি । আমি কি তোমাদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্তেই বসে আছি নাকি ? আপিসেই টেলিগ্রাম আনিয়েছিলুম । ওরা ছাড়লে না—দুটাকার মিষ্টি খাওয়াতে হল ।

—আমাদের মিষ্টি এখনো বাকি আছে বাবা । আর অনু বলছিল, কাল পোলাও-মাংসের ব্যবস্থা করতে হবে ।

জামা ছাড়তে ছাড়তে বাবা বললেন, হবে—হবে, সব হবে । তার আগে ঝুঝুনি মা আমাকে চা খাওয়াবে এক পেয়ালা ।

খুব খুশি হলে বাবা ঝুঝুকে ঝুঝুনি বলে ডাকেন ।

উঠে চা করতে গেল প্রতিমা । উলুনে হাঁড়িতে জল বসিয়ে গেছেন মা—এসে ডাল চাপাবেন । হাঁড়ি নামিয়ে কেটলি বসাতে বসাতে কুশলের কথাই ভাবতে লাগল বারবার । কী বলবে কুশল ?

: বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত ঐখ্য ধরেছি, আবার এম-এ ? না—আর চলবে না । বেশ তো, এম-এ পড়তে চাও পড়ো । কিন্তু তার আগে আমার দাবিটা পাকা করে দাও । কিছুতেই ছাড়ব না এবার ।

বাবা রাজী হবেন ?

বাধাও দেবেন না নিশ্চয়। পাড়ার সবাই কুশলকে ভালোবাসে। বাবা নিজেই তো কতবার বলেছেন : কুশল ? চমৎকার ছেলে।

নিজের মধ্যে কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে রইল প্রতিমা। ছোট অগোছাল ঘরখানা কুশলের। আর তার বারো আনা বইতে ঠাসা। বিছানার ওপর খবরের কাগজ আর স্কুলের খাতার স্তুপ। তা হোক—প্রতিমার হাতের ছোঁয়া লাগলে ওই ঘরই ঝকঝক করে উঠবে। ছোট ঘর ? তাদের জায়গার অকুলান হবে না।

কেটলির জল সাড়া দিয়েছে। চকিত হয়ে নামিয়ে ফেলল প্রতিমা।

চা নিয়ে ঘরে আসতে আসতে সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবা কথা বলছেন।

—এম-এ ? সীটই পাবে না। ও তো পাস কোর্স—শুনলুম এবার অনার্স-ডিসটিংশনকেই জায়গা দিতে পারবে না। আপিসের প্রফুল্ল বলছিল। তার ভাউ চাকরি করে ইউনিভার্সিটিতে।

দাদা নিরাশ হয়ে বললে, কিন্তু বুহুর ভারী সখ—

—সখ থাকলেই তো চলবে না—উপায় খাকা চাই তো। তারপর ধরে-টরে সীট যদি কোথাও একটা পায়ই—তার খরচ কে চালাবে ? তোমার মা-র চুড়ি বন্ধক দিতে হল বি-এ পরীক্ষার ফীরের সময়—ভুলে গেলে সে-কথা ?

প্রতিমা নিখর হয়ে রইল। শেষ খবরটা তার জানা ছিল না।

—ওসব স্বপ্ন আমাদের জন্তে নয়।—বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : বুহু যদি এখন একটা চাকরি-বাকরি পায়, তাহলে আমরা বরং একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি। আমি কী মাইনে পাই তুমি জানো—আর তুমি তো এখনো বিরানব্বই টাকায় ঘষছো। বুহুও যদি গোটাকয়েক টাকা এখন আনতে পারে তাহলে সংসারের কিছু সাশ্রয় হয়। ওর জন্তেই ধোঁজে বেরিয়েছিলুম—একটা আপিসে আসছে মাসে হয়েও যেতে পারে—ভরসা পেয়েছি।

মুহূর্তে সব রং মুছে গেল পৃথিবী থেকে। একটা বর্ণহীন, ধূসর আকাশ ভেসে উঠল সামনে। প্রতিমার ভবিষ্যৎ, তার পরিণাম। আসছে মাস থেকেই আপিস। উদয়-অস্ত ভারমহুর জীবিকা। সংসারের দাবি। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট—কুশল—স্বপ্ন কল্পনা। শূন্যতার মধ্যে বৃহদাঙ্গুলো মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে বাবার সামনে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল প্রতিমা। দাদা কি বলতে যাচ্ছিল, থমকে গেল তাকে দেখে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল

সে । চলে এল বারান্দার অন্ধকার কোনায় ।

বাইরে কলধ্বনি শোনা গেল । মা, অনু—আর-আর কুশল ।

মা বলছেন, তুমি কেন পাগলামি করে এতগুলো মিষ্টি কিনলে কুশল ? তোমাকেই আমাদের মিষ্টি খাওয়াবার কথা—তা নয়—

—আমিই বা ছাড়ব নাকি ? অত বোকা আমায় পাননি—ঠিক আদায় করে নেব ।

কুশলের উচ্ছলিত স্বর । কিন্তু আসল লোকটি গেল কোথায় ! ব্লু ব্লু—

অন্ধকার কোণ থেকে এগিয়ে এল প্রতিমা । আজকের দিন—মাত্র আজকের দিনটা । সাধ্যমতো আনন্দের অভিনয় করুক প্রতিমা—প্রাণ ভরে খুশি হয়ে উঠুক কুশল । কালকের বিবর্ণ আকাশে ক্লান্ত সূর্য না ওঠা পর্যন্ত—মাধবীর চোখের মতো তার চোখ ছোটোও নিভে না যাওয়া পর্যন্ত, মোহের ক্ষীণ কুয়াশা-টুকুই জড়িয়ে থাকুক ।

উনিশ শতাব্দীর সাহিত্য ইতিহাস-সন্ধান

এক

যে-কোনো দেশের ইতিহাসে কোনো কোনো শতাব্দী সূচীর তাৎপর্য পায়। ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে সেই শতাব্দী থাকে চিরস্তন স্মরণস্থল। অতীতের সঙ্গে তফাৎটাও এই সব শতাব্দীতে বেজে ওঠে। বাংলা দেশে উনিশ শতাব্দী এমনই এক মধ্যবিন্দু। কয়েক শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন ধারারেখা যেখানে পথপরিবর্তন করেছে। তার কারণ ছিল দেশের রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, অর্থনীতির পালাবদল। কিন্তু প্রধান ভূমিকা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। আত্মবোধের নতুন ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীর প্রাণচেতনা এই শতাব্দীতে একই সঙ্গে প্রাক্তনের সঙ্গে বিরোধাত্মক এবং অভিনবের প্রবর্তনা সূচিত করেছে। উনিশ শতাব্দীর তাৎপর্য তাই আমাদের দেশে শুধু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ এবং ব্যক্তিত্বেও বিকীর্ণ। বাংলার জলমাটি এবং জনমানসে ইউরোপীয়দের পদসঙ্কার উনিশ শতাব্দীর বাঙালীকে একই সঙ্গে দেশবোধ এবং দেশোত্তীর্ণ বিশ্ববোধে ব্যাপ্ত করল। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই যুগ্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেছেন অনেকে। উনিশ শতাব্দীর সাহিত্যনাট্যকরা অধিকাংশই কর্মী ও শিল্পী ছিলেন একাধারে। তাঁদের আদর্শবাদ এবং স্বপ্নকল্পনা, সমাজ সংস্কার ও শিল্প-সাধনায় অভিব্যক্ত। বিজ্ঞাসাগরের নারী আন্দোলন যেমন তাঁর আজীবন কর্মসাধনায় সংযুক্ত ছিল তেমনই তার ফলিত ভাবরূপ মাইকেলের কাব্য তাৎপর্যময়।

এমন এক বিশিষ্টবোধের শতাব্দী, এমন সমন্বয়ী ঐক্যের সমভূমি এবং তার সমান্তরালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তি-আবেগ-উদ্বেলতা-আতি সঞ্চারিত পটভূমি নানা বীক্ষণকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস, সমাজবিবর্তন, সাহিত্যাদর্শ, নীতিবোধ এবং ধর্মচেতনার বিচিত্র বিচার দৃষ্টিতে উনিশ শতাব্দীর স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে উনিশ শতাব্দীকে আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করব। সেই দৃষ্টিকোণের সূত্র সংগীত। বাংলা দেশের যে-কোনো শতাব্দীকে সংগীতের সূত্রে বিচার করা চলে। কেননা সংগীত বাঙালীর চিরন্তন মানস-সূত্র এবং বাঙালী মনের অস্তুর্লীন ভাববিচিত্রার অভ্যন্তরীণ শিলালেখ।

সমাজ ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে সংগীতের ভাব ও আঙ্গিক তর্কাতীত ভূমিকায় স্থাপিত। কিন্তু সংগীতের সূত্রে সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন কিংবা পুনর্বিন্যাস ইতিহাস লেখার প্রয়াস আজও অরূপস্থিত। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গীত প্রবাহে সে অঞ্চলের সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রফল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন মীরার ভজনে ভক্তি আন্দোলনের কলিত রূপ। যেমন বাংলা কীর্তনে ষোড়শ শতাব্দীর ভাবোদ্বেলতার প্রকীর্ণ পরিচয়।

প্রত্যেক সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যের আদিতে কবিতা এবং গান পরস্পর সংলগ্ন। কিন্তু বাংলা দেশ এমন প্রবলভাবে গীতাত্মপ্রাণ যে বাংলা কাব্যকে আদিযুগ থেকে সংগীতই পরিচালিত এবং বিবর্তিত করেছে। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদিকে প্রায় সকলেই অবশ্য কাব্যরূপে পড়েন কিন্তু আসলে এগুলি সংগীতের একে একটি আঙ্গিক মাত্র। এর মধ্যে প্রথমটি সাধন সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি গীতিনাট্য। এই ঘটনা থেকে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে যে, বাংলা দেশের সংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিক বাংলা কাব্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছে। এই সংগীতমাতৃক বাংলা কাব্যের রূপবদ্ধ বিবর্তনের গূঢ় রেখা অহুসরণ করে প্রবন্ধ সঙ্গীত থেকে গীতিনাট্য, তার থেকে পালাবদ্ধ পাঁচালি এবং কীর্তনে বিতত হয়েছে। তারই ফলে আমরা চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী এবং শাক্তসংগীত পর্যায়ক্রমে পাচ্ছি। এর কোনটিই সুরবিহীন পাঠ্য কবিতা নয়। যদিও আমরা এখন এগুলি পাঠ্য করি। বাংলা দেশে প্রথম সুরবিহীন পাঠ্য কবিতা লেখা হয়েছে উনিশ শতাব্দীতে। তখনই প্রথম সংগীত ও কবিতার ভেদ ঘটল। তাবের দিক থেকে এবং আঙ্গিকের দিক থেকে। কবিতার

আদ্বিক প্রথম পাওয়া গেল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যা সম্পূর্ণভাবে সংগীত নিরপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে যে উনিশ শতাব্দীর কাব্যে সংগীত অল্পপস্থিত রইল তা নয়; বরং নতুনভাবে পুনর্জোজিত হল। নতুন তাৎপর্য আনলো। সেই নতুনই এবার লক্ষ্য করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীর সংগীত বিচারের একটি গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে এই কারণে যে, এই শতাব্দীর সংগীতধারা নবজাগ্রত নানা আন্দোলনের সমাস্তুরালে স্থাপিত। একথা সকলেই জানেন যে, উনিশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নবজাগ্রত বাঙালী চেতনা ও মননধর্মের ফলশ্রুতি পরিকীর্ণ। কিন্তু এই ফলশ্রুতি যে এই শতাব্দীর সংগীতধারাতেও অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যে রূপায়িত একথা অনেকেই ভাবেননি।

দশম শতাব্দী থেকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বাংলা সংগীতের দুটি ধারা—ষড়ঙ্গসমন্বিত অভিজাত প্রবন্ধ সংগীত এবং বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যেমন বাংলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাৎপর্যমণ্ডিত, সংগীতেও তাই। তাঁকে ঘিরে বাংলার অশ্রুতম সংগীত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নামকীর্তন, লীলাকীর্তন এবং পদকীর্তন, এই ত্রিমুখী আন্দোলনের উদ্গাতা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে যে বৈষ্ণবীয় সম্মেলন আহ্বান করেন, সেইখানেই কীর্তনের স্থিরীকৃত রূপাদ্বিক সৃষ্ট হয়। এই কীর্তন সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল পরবর্তী বাংলা সংগীতের বিবর্তনে। উদাহরণ হিসেবে শাক্ত পদাবলীর উল্লেখ করা চলে। শাক্ত পদাবলী প্রত্যক্ষতঃ কীর্তনের আদর্শ সৃষ্ট। শাক্ত সাধনার আচারমূলকতার সঙ্গে ভাবমূলক সংগীতের কোন সাযুজ্যই নেই বলা চলে। কিন্তু এই কঠিন সাধনতন্ত্রীদের দৃষ্টির অভ্যন্তরে শুদ্ধতার মধ্যে সংগীত বাসা বাঁধল। তারই কলে পাওয়া গেছে রামপ্রসাদের গান। শাক্তপদাবলী বৈষ্ণবকাব্যের অমুজ্জ-প্রতিম। ভাবমূলক প্রাণসাধনার সূত্রে বৈষ্ণবপদ ও শাক্তপদ সমলগ্ন; যদিও ধর্মনৈতিক সূত্রে উভয়ের মধ্যে দূরতম পার্থক্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপাস্ত সংগীত হিসেবে আমরা শাক্ত পদগুলিকেই উল্লেখ করতে পারি।

দেববন্দনা এবং ধর্মের তামসিক অন্ধতা থেকে মুক্ত প্রথম উদার ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশ হিসেবেও রামপ্রসাদের শাক্ত পদগুলির উল্লেখ করতে পারি। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির ওই অকুণ্ঠ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল সংগীতের জগৎ। অর্থাৎ শাক্ত পদাবলী বৈষ্ণবপদাবলীর গীতাঙ্কিতায় পরিপুষ্ট ছিল বলেই রামপ্রসাদ

তাঁর ব্যক্তিমনের মুক্তি পেলেন তার ছোট সংহত পরিসরে। ভারতচন্দ্রের মত বিদ্যাসুন্দর রচনায় তিনি কৃতকার্য হননি।

রামপ্রসাদের পর শাক্ত সংগীত লিখেছেন ঝাড়া, তাঁদের মধ্যে বীতমান জমিদার ছিলেন কেউ কেউ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারের ক্ষমতা লোপ করে ছিলেন। আর সেই সম্ভবধিত জমিদাররা (মহারাজ শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, নন্দকিশোর রায়, রঘুনাথ রায় প্রভৃতি) শাক্তগান লিখেছিলেন। এই গানগুলি রামপ্রসাদের মত ব্যক্তিত্বের মুক্তিগান নয়; বরং অনেকটা বিনাশের মুখে ইষ্টজপের মত। ‘তনয়ে তার তারিণী’ এই হল এঁদের গানের মূল কথা। প্রকৃত চেতনার অভাবে এই কারণেই পরবর্তী কালে শাক্তপদ অপ্রধান হয়ে গেল।

জমিদার শ্রেণীর দ্রুত বিলীণমানতার মধ্যে নতুন পত্তনিদার, তালুকদার আর গাঁতিদারদের উদ্ভব হল। নবগঠিত কলকাতার আদি অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকরা প্রাধান্য পেল। অর্থাৎ, রাজসভার পোষকতা থেকে সংগীত ও সাহিত্য একেবারে স্থলরুচির আসরে গিয়ে পড়ল। আঠারো শতাব্দীর শেষ থেকে উনিশ শতাব্দীর আদিকাল পর্যন্ত ব্যবসায়িক কলকাতায় নিকৃষ্ট গানের উদাহরণ। ধেউড়, তরঙ্গা, ধেমটা এবং কবিগানে এই অবক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নিম্নশ্রেণীর লোক সংগীত ও সাহিত্যের কর্ণধার হয়ে পড়ল। কবিগানের রচনাকাররাও মূলতঃ নিম্নশ্রেণী থেকে আগত। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ যুগী, রামসুন্দর শাকরা, ভোলা ময়রা, কেঁটা মুচি প্রভৃতি।

• উনিশ শতাব্দীর লিরিক উদ্বেলতার পূর্বস্বাক্ষর রামপ্রসাদে পাই। ভারতচন্দ্রে পাই না। যদিও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর Urbanityর উজ্জ্বল প্রকাশ কিন্তু তাঁর মধ্যে লিরিক ধর্মের অনুপস্থিতি বেদনাদায়ক। সেই জন্য ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি। আধুনিক যুগের পূর্বাচার্য নন। ভারতচন্দ্রের লেখা গান : ‘ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে’ তাঁর প্রতিভার ব্যর্থতা প্রমাণ করে। অথচ ঈশ্বরপাটনীর মুখে : ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ মন্তব্যটি তাৎকালীন বিদ্যুৎরেখায় ভারতচন্দ্রের মনের গহনে স্তম্ভ লিরিক লাবণ্যকে প্রকাশ করেছে। একমাত্র এখানেই সমস্ত আলংকারিক চাতুর্য ভেদ করে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মত শ্রামলী বাংলার বাষ্পোদ্বেল মমতা ফুটে উঠেছে। রামপ্রসাদের আগমনী বিজয়ার আতি-গভীরতার উচ্চভূমিতে এই একবারই মাত্র আরোহণ করতে পেরেছেন ভারতচন্দ্র।

এই সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে সংগীত এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ধূসরতা ও অসুস্থতার দ্বায়মান আলো। উচ্চকিত যুগলক্ষণ রূপান্তরের আভাস দিল। মঙ্গলকাব্যের দান অবশেষ, খেউড়-ধেমটার অশ্লীল প্রকাশ, কবিগানের নিয়ন্ত্রণ আর চলল না। অশ্লীল উত্তেজনায় রুদ্ধগতি রামপ্রসাদের ব্যক্তিত্বপ্রয়াসকে বুকে তুলে নিলেন আরেক সংগীতনায়ক তাঁর সাধনায়। অষ্টাদশ আর উনিশ শতাব্দীর সংগীতনায়ক এই ব্যক্তি রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৮)। দুটি শতাব্দীর সেতুবন্ধ তিনি। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কাল। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীসর্বস্বতা থেকে লিরিক কবিতার উদ্‌বোধন, মাঝখানে নিধুবাবুর প্রেমসংগীত যোগ সূত্র। প্রেমের গান লিখেছিলেন নিধুবাবু; আন্তরিক অনুভবের রূপকহীন প্রথম সুরণ ঐ গানে। প্রায় শতাব্দী জীবনে অনেক কিছু দেখেছিলেন তিনি, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের তন্ময় সুররাজ্য, পলাশির যুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয়, ফোর্ট উইলিয়ম, ছাপাখানা ও বাংলা গদ্যের উদ্‌ভবপর্ব, রামমোহনের ধর্ম আন্দোলন, বিজ্ঞানসাগরের নারী আন্দোলন এবং নিধুবাবু যখন মারা যান তখন বাংলাদেশের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’র পাতায় কবিতা লিখেছেন। কিন্তু লিরিক চেতনায় নিধুবাবু ঈশ্বর গুপ্তেরও পূর্বাচার্য কবি।

উনিশ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্যের যে-কোন নবপ্রয়াসের পশ্চাৎভূমিতে ছিল ব্যক্তিত্বের জাগরণ। কিন্তু তার সমান্তরালে ছিল শিল্পক্ষেত্রে ভাব ও রূপের যুক্ত সমন্বয়। আঠারো-উনিশ শতাব্দীর যুগসন্ধিকালে দ্বায়মান সংগীতের আসরে পালা-বদলের ইঙ্গিত ছিল। নিধুবাবু প্রথম এই ইঙ্গিত বুঝেছিলেন। তাই প্রথমেই তিনি ভাবের নতুনত্বের সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও নতুনত্ব আনলেন। তিনি তাঁর প্রেমসংগীতের বাহন করলেন বিদেশানীত টপ্পাকে। তাঁর পূর্বে বাংলা সংগীতের বাহন ছিল রাগাত্মক অভিজাত সুর কিংবা লোকসংগীতের সরল সুর। টপ্পা অজানা ছিল বাংলাদেশে। নিধুবাবু বাংলার বাইরে থেকে আনলেন টপ্পার গীতরীতি। উনিশ শতাব্দীর সমস্ত সাহিত্যপ্রয়াস রূপায়িত হয়েছিল বিদেশানীত আঙ্গিকে। মাইকেলের কাব্য, দীনবন্ধু প্রভূতির নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সর্বত্রই বিদেশী আঙ্গিক। নিধুবাবুর নবপ্রয়াসকে তাই এই সবার পূর্বাভাস বলা চলে।

নিধুবাবুর টপ্পার সুরপ্রভাবও হয়েছিল দীর্ঘবিস্তারিত। শতাব্দীর যাবতীয় শাস্ত্র সংগীত এবং অন্তান্ত্রের লেখা প্রেমসংগীতেও টপ্পার সুরধর্ম ছিল। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এই টপ্পাকেই ধেরালের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই নতুন গীতরীতির

নাম হয়েছিল টপথেরাল। ব্রহ্মসংগীতগুলিতেও ঋপদ ছাড়া টপ্পার নিদর্শন রয়েছে। টপ্পাগানের শ্রেষ্ঠ সৌকর্যসাধন ঘটেছে রবীন্দ্রসংগীতে।

নিধুবাবু যে ধর্মসংগীত লেখেননি তার কারণ তাঁর আশ্চর্য জীবননিষ্ঠা। জীবনকে ভালবেসেছিলেন তিনি; সেই লাভপ্যের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর লেখা সংগীতে। অথচ তাঁর সংগীত রচনার সমকালেই রামমোহন রায় অসংখ্য ব্রহ্ম সংগীত লিখেছিলেন। সৌভাগ্যতঃ, নিধুবাবু সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি ঝোঁক না দিয়ে হৃদয়ধর্মের প্রতি ঝোঁক দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর মধ্যে এমন একজন গীতিকারকে খুঁজে পাই যার রচনায় প্রথম সমস্ত সমাজ-মানসের প্রতিকলন। স্বাদেশিকতা উনিশ শতাব্দীর একটি মৌল সূত্র। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর একটি বহু পরিচিত সংগীত উদ্ধৃত করছি—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কতু ঘুচে কি তৃষা ॥

মনে রাখতে হবে, এই স্বদেশ বন্দনার গীতলোক ঈশ্বর গুপ্তের আগে রচিত। উনিশ শতাব্দীর নারীজীবনের নবমূল্যায়নের কথা সকলেই জানেন। অবরুদ্ধ নারীজীবনের মুক্তি আন্দোলন বাংলা দেশে এক স্বরণীয় ইতিবৃত্ত। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বেধুন সাহেবের নারীশিক্ষা আন্দোলন, মাইকেলের কাব্যে নারিকার স্বাধীন প্রেমের চিত্রাঙ্কন, এই সমস্তই উচ্চকিত যুগলক্ষণ। এই নারীর প্রতি শ্রদ্ধার পূর্বাভাস পাই নিধুবাবুর প্রেমসংগীতে—

হউক হে হউক প্রাণ যাউক আমার
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলাম যদি, কী করে লাজেতে ?
লোকে বলে কলংকিনী হইলাম কুলেতে
আমি বলি এতদিনে আইলাম কুলেতে ॥

মনে রাখতে হবে এই স্বাধীন প্রেমের প্রকাশ, সেই দাম্পত্যপ্রেম মহিমাবিত্ত সমাজে, কী ভীষণ বিপ্লবের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছিল। এই সব আলোচনা করেই হৃৎধের সঙ্গে স্বরণ করতে হয় যে, নিধুবাবুর সম্পর্কে সুশোভন আলোচনা আজও হয়নি।

দুই

নিধুবাবু পর্যন্ত উনিশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের ভাবে ও ভাষায় গ্রাম্যতার প্রাধান্য। সেই কলঙ্কিনী নারী আর শঠ নায়কের প্রসঙ্গ। স্বয়ং নিধুবাবুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও তাঁর সমকালীন সংগীতের ভাষার দৈন্ত ঘোচাতে পারেনি। অকারণ অনুপ্রাসের ভিড় এবং শব্দশ্লেষের মারাত্মক সংক্রামে এ সময়কার সংগীত প্রায় অপাঠ্য। অথচ লক্ষণীয় যে, আঠারো শতকের উপাস্তে বাস করেও রামপ্রসাদ তাঁর সংগীতের ভাষাতে আশ্চর্য স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মুখের ভাষায় লেখা তাঁর সংগীত। লোকসমাজের নানা অনুবন্ধ এবং জনজীবনের থেকে আহৃত উপমার সমন্বয়ে তাঁর সংগীত প্রাণে বেজে ওঠে। অথচ তাঁর উত্তরসূরীদের রচনায় ভারতচন্দ্রের অক্ষর-ডম্বর শব্দশ্লেষ এবং ক্লাস্তিকর উপমার ছড়াছড়ি। সেই চাতক আর বৃষ্টি, সেই চাঁদ আর কলঙ্কের পুরনো প্রসঙ্গ।

নিধুবাবুর পরবর্তীকালের গীতরচয়িতারাও এই প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা কতখানি অপসারিত করতে পেরেছিলেন দেখা যাক।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম জীবনে কবির দলে ছিলেন। বারো বছর বয়স থেকে তিনি গান বাধতে পারতেন। এই ‘গান বাধা’ কথাটি তাৎপর্যময়। পরবর্তীকালে তিনি সে সব কবিতা লিখেছেন তাতে শুদ্ধ অনুভব কিংবা অস্তুপ্রজ্ঞার কোন সহায়তা নেই। বরং স্বভাবকবির কবিতা বানানোর প্রতিভার সাক্ষ্য আছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম জীবন যে কবির দলে কেটেছিল এ ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেই তিনি কবিতার সুর আবিষ্কার করেন। শাক্ত সংগীতের আধিদৈবিক প্রেরণা কিংবা ব্রহ্ম সংগীতের অতি আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডল নয়, তিনি দীক্ষা পেয়েছিলেন প্রাণের মন্ত্রে। এইজন্যই তিনি প্রথম মৌলিক কবি। এই ‘সংগীতের উত্তরাধিকার’ উনিশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকের সহজাত ছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ কবিতা লিখতেন দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র। পরে দুজনেই কবিতার পথ পরিবর্তন করেন। কিন্তু দুজনেরই একটি প্রচ্ছন্ন সাংগীতিক ঐতিহ্য লেখক জীবনের সমান্তরালে প্রবাহিত ছিল। সেইজন্যই দীনবন্ধুর নাটকে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংগীতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আর কি আশ্চর্য, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকার ছিলেন না, তবু তাঁর লেখা একটি মিশ্রভাষার সংগীত এখন ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

রঙ্গলাল অনেকগুলি কাহিনীকাব্য লিখেছিলেন। বিভিন্ন সর্গবন্ধ সেইসব কাব্য জাতীয় উদ্দীপনার পরিচায়ক। এই সব কাব্যেও তিনি সংগীত সংযোগ করেছিলেন। উনিশ শতাব্দীর যে-কোন শিল্পপ্ররাসে সংগীত কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তারই প্রমাণ এখানে।

উনিশ শতাব্দীর মহাকাব্যধারার খাঁর প্রবর্তক এবং রূপকার তাঁরা সকলেই সংগীত-বিজ্ঞান নিপুণ ছিলেন। তাঁদের সকলের লেখাতেই গান্ধীর্ষের পাশাপাশি কোমলতাও আছে। এপিকের মধ্যেও লিরিকের গীতাত্মতা। সেইজন্য এঁদের রচনার বীররসের মধ্যে থেকে উবেলিত ভাবের কান্নাও ('exalted lyrical cry') স্রুতিগোচর। তার কারণ এঁদের সংগীত চেতনা। মধুসূদন স্বয়ং ভালো গায়ক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠীদের গান গেয়ে শোনাতেন। অনেক ভালো সংগীত লিখেছিলেন তিনি; তার মধ্যে 'যেও না নবমী নিশি লয়ে তারাদলে' বিখ্যাত ছিল। রঙ্গলালের কাব্যে রাগনির্দেশিত অনেক গান আছে। হেমচন্দ্রও অনেকগুলি গান লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে' উল্লেখযোগ্য; এটি অহং একতালয় গাওয়া হত।* নবীনচন্দ্র সেন খুব বেশি গান লেখেননি। কিন্তু তাঁর পলাশির যুদ্ধ বীররসাত্মক কাব্যেও সংগীত সংযোজনের প্রয়াসটি স্মরণীয়। আরেকটি সংগীত উদ্ধৃত করছি নবীনচন্দ্রের—

যেও না যেও না নবমী রজনী সস্তাপহারিনী
আজি লয়ে তারাদলে।

গেলে তুমি দয়াময়ী উমা আমার যাবে চলে ॥

উদ্ধৃত সংগীতটি থেকে বোঝা যায়, মাইকেলের পূর্বোক্ত সংগীতটি নবীনচন্দ্রকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তীও ভালো গীতিকার ছিলেন। তাঁর 'সঙ্গীত শতক' নামক গীতাবলী পড়েই প্রথম বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আবিষ্কার করেন। পরে তিনি 'বাউল পঞ্চবিংশতি' নামে সংগীত পুস্তক লেখেন। অবশ্য তাঁর উল্লিখিত সংগীতগুলি রাগতালসম্বন্ধিত থাকলেও কখনও গাওয়া হত কিনা, তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ আমি পাইনি।

বস্তুতঃ, উনিশ শতাব্দীতে সংগীত ও কবিতায় ভেদ থাকলেও সকলে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না সম্ভবতঃ। অসংখ্য সংগীত যেমন লেখা হত তেমনই অনেক কবিতাতেও সুর দেওয়া হত। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে' দীর্ঘ কবিতাটিতে সুরমণ্ডিত করার চেষ্টাধিক্য লক্ষণীয়। আরেক উদাহরণ, বিহারীলালের

* এই তথ্যপঞ্জী 'বঙ্গালীর গান' থেকে প্রাপ্ত।

সারদামঙ্গল কাব্য। বিহারীলাল এই কাব্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘সর্বাদো প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেত্রী রাগিনীতে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলাম।’

এই উদাহরণ ছাড়াও বিহারীলালের বিভিন্ন কাব্যের যত্র তত্র রাগতাল নির্দেশিত গীতাংশ লক্ষ্য করে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই সব গীত রচনা এবং সুর-নির্দেশ প্রাথমিক ব্যাপার। সারদামঙ্গল কাব্য সকলেই পড়ে আনন্দ পেতেন। তবে কবি স্বয়ং গীতাত্মপ্রাণ ছিলেন। শুধু বিহারীলাল নন, উনিশ শতাব্দীর ঐ পর্যায়ের সব কবিই গীতবশীভূত ছিলেন এই কথা বলাই সম্ভব। এই সাংগীতিক তন্ময়তা তাঁদের কাব্যেও সূচিত।

কবিদের এই গীতধারার পাশে ব্রাহ্মসমাজের ধ্রুপদীপ্রয়াস স্মরণীয়। ধ্রুপদের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অজস্র ব্রহ্মসংগীত রামমোহনের থেকে তাঁর উত্তরসাধকদের ব্যাপক কীর্তি। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রহ্মসংগীতের খুব জনপ্রিয়তা ছিল এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।

বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করল গিরীশচন্দ্রের লেখা সংগীতগুলি। তাঁর সংগীত নাটকের প্রয়োজনে লেখা—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। বঙ্গালয়ের স্পর্শে বাংলার সংগীত এই প্রথম ব্যবহারমার্গে উপনীত হল।

গিরীশচন্দ্রের জীবনকাল (১৮৪৪-১৯১২) বিস্তৃত। এই দীর্ঘকালের শিল্পজীবনে তাঁর মধ্যে উনিশ শতাব্দীর প্রাণবীজ লক্ষ্য করা যায়। নবগঠিত কলকাতায় উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে মধ্যবিস্তরাই ছিলেন সব-কিছুর নেতা। অথচ কলকাতার আদি বাসিন্দা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কবিগানের বিলীমমানতার পর যাত্রাকে অবলম্বন করে তাদের ক্ষীণপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় উদ্ঘাটিত করছিল। গিরিশচন্দ্র এই যাত্রার দলে প্রথম জীবনে ছিলেন।* তাই তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীলতা জনরুচির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে তাই সৃজন এবং প্রত্যক্ষকর্মের একটি সমবায়ী রূপ আবিষ্কার করি। পরবর্তীকালের বঙ্গ-

* সেইজন্য যাত্রার প্রভাব তাঁর নাটকে প্রবল। বিশেষতঃ তাঁর নাটকে সংগীতের যত্রতত্র ব্যবহার যাত্রাগানকে স্মরণীয় করায়। সখীদের গান ও ডুয়েট গান যাত্রার চণ্ডে সন্নিবেশিত তাঁর নাটকে। আরেকটি কথা, উনিশ শতাব্দীর ধর্মোন্দোলনের দুটি দিক—একটি তত্ত্বদর্শী, আরেকটি আবেগময়। একদিকে রামমোহন, দেবেশ্বনাথ আরেকদিকে রামকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য। সেইজন্যে তাঁর ভক্তিসংগীতে উদ্বেল বন্দনা যতটা আছে সাধনবেগ ততটা নেই।

মঞ্চের সংস্পর্শে এসে মধ্যবিত্তদের উচ্চরুচিরও পরিচয় পেলেন। এই দুই রুচির সুন্দর সমন্বয় তাঁর নাটকে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সব রকমের নাটকই তিনি লিখলেন জনরুচির চাহিদামত। তাঁর নাটকে সংগীত সংযোজিত করার কারণও এই জনরুচির চাহিদা। বস্তুতঃ, রেনেসাঁস-পরবর্তী সমাজের শিল্পীকে সবসময়েই অগ্রসর মধ্যবিত্তমানসের চাহিদার পথে চলতে হয়। শিল্প-সমালোচক জানিয়েছেন, “The artist had either to conform or to find a market among the rising middle class.”

গিরীশচন্দ্রের সংগীত প্রয়োজন থেকে উৎসারিত। কিন্তু তার জন্যে সংগীতের কোনো হানি হয়নি। বরং তাঁর সংগীতের যে বহুধাবৈচিত্র্য তা এই জনরুচির বিচিত্র চাহিদার ক্ষেত্রকল। গিরীশচন্দ্রের সংগীত contextual music নয়, অর্থাৎ তা নাটকের মর্মবাণীকে স্ফুটতর করতে পারেনি। কিন্তু মনোমোহন বসুর ক্ষীণ সাংগীতিক প্রচেষ্টাকে বঙ্গমঞ্চে দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। যার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য এবং আরও অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানলালের নাটকে সাংগীতিক প্রয়াস প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযোজিত হতে পেরেছিল।

তিন

কিন্তু উনিশ শতাব্দীর সংগীতকর্মে অনেকেই আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও পূর্ণ সংগীত-সচেতনার পরিচয় পাই না। আগেই বলেছি, অনেকটা প্রাথমিক কারণে এঁরা গীত রচনা করতেন এবং রাগতাল সমন্বিত রূপ দিতেন। তাঁদের হৃদয়ের তীব্র আবেগ সংগীতে সঞ্চারিত হয়নি। তাঁদের গানের ভাবাত্মিক আলোচনা করলে বোঝা যায় দুর্বলতা।

মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল—সকলেই তীব্র হৃদয়োত্তাপের সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন সৃষ্টি উৎস উন্মোচন করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে সন্নিবেশিত অনুভবের দিকটি সংগীতে সঞ্চারিত হয়নি। দুঃখের সঙ্গেই একথা স্বীকার করতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক গান আছে। বিশেষভাবে আনন্দমঠের গানগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অবশ্য আনন্দমঠ উপন্যাসের রহস্য-নিলীন বাতাবরণে এই সব গান বেশ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আলাদাভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, গানগুলি অনেক ক্ষেত্রে জয়দেবের কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ।

মাইকেলের কাব্য বিভিন্ন অর্থেই মৌলিক, কিন্তু সংগীত রচনায় এই মৌলিকতা পরিস্ফুট নয়। কবি সংগীতের আগমনী-বিজয়া প্রসঙ্গই তাঁকে উৎসাহিত করেছে।

হেমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল যদিও স্বদেশমূলক কবিতা লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু সংগীতে তার একটুও প্রকাশ নেই।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত নবীনচন্দ্রের গানেও আগমনী-বিজয়া প্রসঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অমৌলিকতার পরিচয় দেয়। তাঁর আরেকটি গান, 'কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল' গতানুগতিকতার ভাবে সীমাবদ্ধ।

বিহারীলাল সংগীতের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর 'সঙ্গীত শতক' থেকে একটি গীতাংশ উদ্ধৃত করছি—

ক্রমে ক্রমে হইতেছে

নিদ্রা-অাকর্ষণ,

অরে অরে ভেরে ভেরে

আসিছে নয়ন।

রাগিনী বাগেত্রী, তাল আড়াঠেকা সমন্বিত এইরকম অনেক গান বিহারীলাল লিখেছিলেন। সেই সব পড়ে ধারণা হয়, গীতশ্লোক রচনার বিশেষ চেতনা বিহারীলালের ছিল না। সংগীতের ভাবপ্রসঙ্গ কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোনো স্থির ধারণা ছিল না বলেই তিনি লিখেছিলেন—

আহা, প্রাণ জুড়াইল

ছাতে এসে এ সময়ে !

উঃ কি গুমোট ! গেহে

কার সাধ্য থাকে সরে।

গিরীশচন্দ্রের নাট্যসংগীত বড় ঋণ্ডিত এবং গতানুগতিক। তাঁর সংগীতের ভাবপ্রসঙ্গ, নাটকের প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ, সখী, নর্তকী এবং নায়িকার প্রয়োচ্ছাসের প্রকাশ। কয়েকটি ভালো শ্রামাসংগীত লিখেছিলেন গিরীশচন্দ্র ; কিন্তু তাও সে যুগের প্রথাসিদ্ধ ছিল।

এঁদের গানের ভাবপ্রসঙ্গ মূলতঃ গ্রামীণ। সেই ভারতচন্দ্রের সমকালীন সমাজ কিংবা রাধাকৃষ্ণ লীলা আর সখীসংবাদের গতানুগতিক ধারা। উনিশ শতাব্দীর মুক্ত প্রাণপুরুষের তৃপ্ত হওয়া উচিত ছিল না এই সব গানে। বলতে দ্বিধা নেই উনিশ শতাব্দীর অধিকাংশ গীতিকারই পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন। নিধুবাবু প্রবর্তিত

আত্মোৎসারণের পথে কেউই অনুগমন করেননি। বস্তুতঃ এঁদের চেতনার বৈপরীত্যটুকু লক্ষণীয়। এঁদের নবগঠিত সমাজে প্রতিপত্তি ছিল। কাব্য আন্দোলনে এঁরা বিদেশানীত ভাব আঙ্গিকের অনুশীলন করেছিলেন অথচ মৌল মনোবৃত্তিটুকু বাঁধা ছিল বাংলার গ্রামজীবনের সীমায়। সংগীতে সেই চেতনার দ্বন্দ্ব, যাকে বলতে পারি Rurality এবং Urbanity-র দ্বন্দ্ব।

উনিশ শতাব্দীর সংগীত আন্দোলনে urbanity-র স্বল্প মনোভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫) ইওরোপীয় সংগীতচর্চার মধ্যে। ইওরোপীয় Music Drama-র অনুসরণে তিনি গীতিনাট্য রচনা করেন। এই প্রথম বাংলার সংগীতে, সাহিত্যের মতো, সাগরপারের আমেজ লাগল। পিয়ানোর টুংটাং উচ্ছল সুরধারায় বাংলা সংগীত তার প্রথাসিদ্ধ জরতী বেশ ত্যাগ করে নবীন আমন্দে নৃত্যমগ্ন হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে ভালো গীতিকার ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত সুরে রবীন্দ্রনাথ ভাষাবয়ন করে বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। পরবর্তীকালে গীতিনাট্য রচনায় এই বিদেশী আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উনিশ শতাব্দীর সীমান্ত স্পর্শ করে দুজন সংগীতকার বাংলার সংগীতক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন। একজন রবীন্দ্রনাথ, আরেকজন দ্বিজেন্দ্রলাল। দুজনের সংগীত প্রতিভা মূলতঃ বিংশ শতাব্দীতে অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ করলেও এঁদের প্রতিভার উৎসমুখ ও প্রাণবীজ ছিল উনিশ শতাব্দীর সাধনায়। এক কথায় বলা চলে, উনিশ শতাব্দীর প্রাণবেগ এঁদের মাধ্যমে আধুনিকতার মণ্ডিত হয়েছে। এঁদের সাংগীতিক প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবিপ্রতিভা। উনিশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কবি গীত রচনা করলেও সেই গানে তাঁদের কবিপ্রতিভা কুণ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম কবিতায় সঙ্গে সংগীতের মিলন ঘটালেন। সেইজন্য তাঁদের গান সর্বপ্রথম শ্রাব্যগুণমণ্ডিত হয়েও পাঠযোগ্য হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানে উনিশ শতাব্দীর বিভিন্ন চেতনার সারসংক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রেমামৃতব, জাতীয় উদ্দীপনা, আধ্যাত্মিকতা এবং সংগীতের নাটকীয় প্রয়োগ—সবই এঁদের সংগীত সাধনায় মর্মরিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে আধুনিক মানুষের বৈধ ও অন্তর্বেদনা প্রবল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে উনিশ শতাব্দীর বিশিষ্ট প্রেমসংগীতের পরিপূর্ণ রূপ লক্ষ্য করি। করুণ বিরহমূলক স্মৃতিময় এই সব দাম্পত্যপ্রেমসংগীত অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করাই অত্যাশ। তাঁর অন্তর্ময় অনির্দেশ্যতার সুরে

আমরা পৃথিবীর আতিকে খুঁজে পাই। সংগীতে ভাষাপ্রয়োগের যে দুর্বলতা উনিশ শতাব্দীর সব গানে লক্ষ্য করি, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে তার সামান্য অবশেষ থাকলেও রবীন্দ্রনাথে তা অপনোদিত হয়েছে।

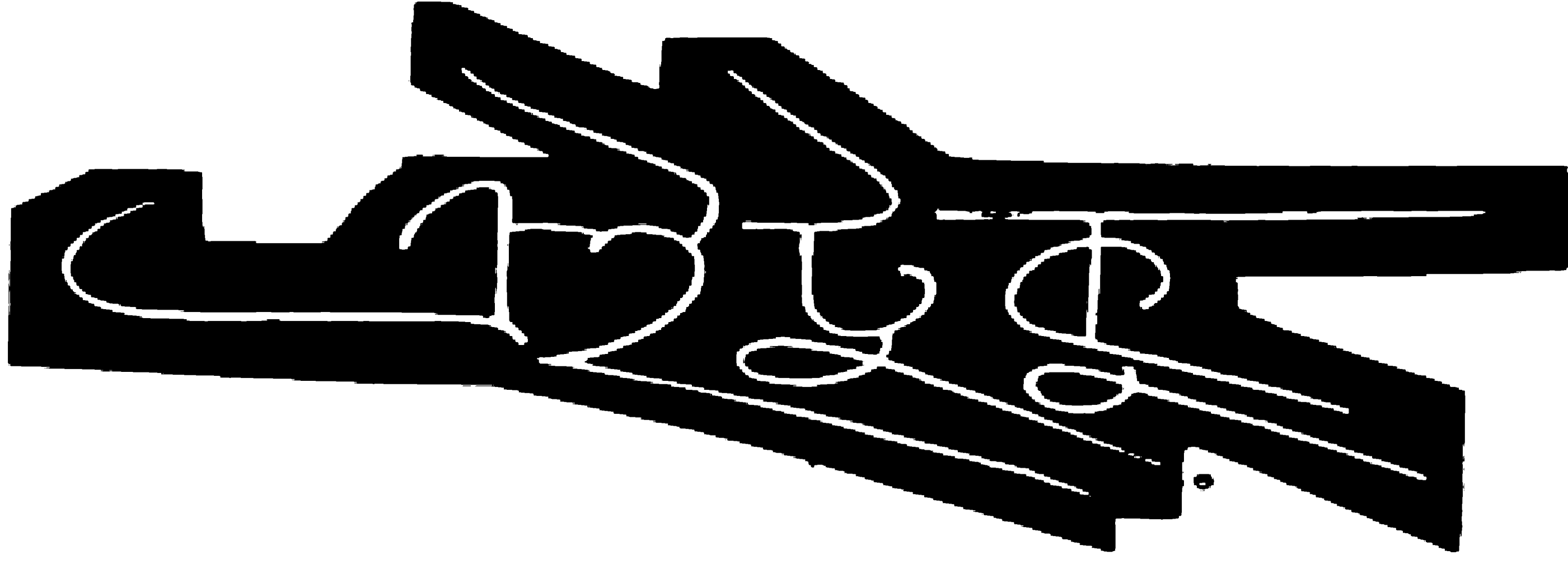
উনিশ শতাব্দীর ধর্মচেতনার উদ্বেলতার দিক, আগে বলেছি, গিরীশচন্দ্রের গানে প্রকাশিত। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী। তাঁর সংগীতে উনিশ শতাব্দীর ভক্তি ও শক্তিচেতনা একই সঙ্গে স্পন্দিত। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ সাধনসূত্রে উদ্বেলতার চেয়ে শাস্ততাই চোখে পড়ে। এই সাধনবেগেই তাঁর সংগীতে ব্যক্তিত্বের জয়। আর এই ব্যক্তিত্বের আবরণ উন্মোচনই ছিল উনিশ শতাব্দীর সব সাধনার মূলসূত্র।

এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গসূত্রে আলোচিত মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের লিখিত গানের একটি তালিকা দিলাম। গানগুলি সাধারণের প্রায় অজ্ঞাত। সেই কারণেই প্রণয়নযোগ্য। গানগুলি সংগ্রহ করেছি দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বঙ্গালীর গান’ এবং ‘প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী’র চতুর্থ খণ্ড থেকে।

মাইকেল মধুসূদন : ১। যেয়ো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে। ২। মধুর বসন্ত আগমনে ৩। পিরীতি পরম রতন ৪। কেন হেরেছিলাম তারে ৫। আমি ভাবি যার ভাবে সে ত ভাবেনা ৬। এই তো সেই কুসুমকানন ৭। আরে পরবশ মন ৮। অসুখী ভ্রমর দলে ৯। শুনিয়ে মোহন মুরলী গান ১০। যাইতেছে যামিনী ১১। মনে বুঝে দেখ না ১২। স্মৃতি ভূপতি তুমি ১৩। উদয় হইল সখি ১৪। এখন কি আর ১৫। চল সকলে আরাধিব ১৬। আর কি কব তোমারে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ১। বাজরে শিঙা বাজ ২। ফুরাল বন্ধের লীলা ৩। কে রচিবে মধুচক্র ৪। জয় জগদীশ জয় ৫। হাসরে কোঁরুদী হাস ৬। সাজা বন্ধে আজি রঙ্গে ৭। আজি স্নেহের দিন ৮। হাসরে শরত চাঁদ ৯। হাসরে আকাশে ১০। জীবন এমন ভ্রম।

নবীনচন্দ্র সেন : ১। দেখে আর তোরা হিমালয়ে ২। উঠ উঠ পুরবাসী ৩। এস মা আনন্দময়ী ৪। গাও সপ্তমী আরতি ৫। নীরব নিশীথে পূজিব তোমায় ৬। তুই মা আসিলি আবার ৭। নম নম নারায়ণী ত্রিনয়নী ৮। যেও না যেও না নবমী রজনী ৯। উমা আমার চলিলি এখন।



নেবুতলার গলিতে সকাল হতে বড় একটা কেউ দেখে না।

হোস্‌ পাইপের গলা কাটিয়ে মাটি-গোলা জলে যখন রাস্তা ভাসা-ভাসি হয়, শিস্‌ দিতে দিতে চোঁবাচ্চার কলে যখন হঠাৎ হুস্‌ করে জল আসে, বাইরের দরজায় ঠিকে ঝি বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো করে জোরে জোরে যখন কড়া নাড়ে, আর পাশের বাড়ির আলসের ওপর থেকে নিচে এঁটো-কাঁটার দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা ছট্‌ফটে কাক যখন ডেকে ডেকে পাড়া মাথায় করে—আওয়াজ শুনে একরকম চোখ বুঁজেই বলে দেওয়া যায় পৃথিবীর এ-প্রান্তে সকাল হল।

তারপরই নেবুতলার এই গলিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে ওঠে। পায়ের নিচে, মাথার ওপর, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বায়ে—সম্ভাব্য সমস্ত কটা দিক থেকে গল্‌গলিয়ে ধোঁয়া এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে শুয়ে-থাকা মানুষগুলোর দম যখন আটকে ধরে, তখন না উঠে উপায় থাকে না। ওঠবার আগে শুধু বিলম্বিত অন্ধকারের দিকে পা দুটো লাথির মতো জোড়া করে ছুঁড়ে দেয়।

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটুখানি সোনালি রোদ ঝুঁকে পড়ে দেখে—হ্যাৎলা-পড়া সবুজ উঠোনটুকুতে তার বিষণ্ণ ছায়ামূর্তিটা বার বার পড়ে পড়ে আছাড় খাচ্ছে। কলতলার ঝির হাত কস্কে থালাটা গেলাসটা পড়ে গিয়ে শান-বাঁধানো মেঝেতে ঝন্‌ ঝন্‌ করে আওয়াজ ওঠে। আর তাড়াতাড়ি নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে এ-বাড়ির নতুন বউকে সাঙুনা দেয়—এ বাড়িতে আজ মানুষ আসবে গো। তারপর বাঁ-হাতের চেটোর রাখা খড়িমাটির গুঁড়োর, হাঁটু বার করা লাল টেঁটি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের চায়ের কাপে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উঃ-আঃ

করতে করতে কখন যে একটা ফুটফুটে ডাগর দিনের সঙ্গে চোখাচোখি করে যায় ঠিক ঠাইর করে উঠতে পারা যায় না।

রোজ রাত থাকতে উঠে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গঙ্গা নাইতে যেত ফটকঅলা বাড়ির বুড়ো কর্তা আর গেল লড়াইতে লাল-হওয়া রাখহরি চাটুয্যে। উপুড় হয়ে তেল মাখতে মাখতে এ-পাড়ায় তারাই শুধু বাবুঘাটে স্বচক্ষে স্বর্ষ উঠতে দেখত।

একটু বেলা হলে তাদের গাড়িগুলো পায়ে-টেপা ঘন্টার ঘুঙুরের বোল তুলতে তুলতে নেবুতলার গলিতেই ফিরে আসত। বড় বড় বাড়ির বগলের নিচে দিয়ে গলে-আসা এক পাল কচি রোদ গাড়ির তলায় চাপা পড়তে পড়তে একটুর জগ্নে বেঁচে যেত। তারপরই ডানপিটে রোদগুলো করত কি, টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটিটা ধরে চলন্ত গাড়ির চালের ওপর টক্ করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানিতে পা রেখে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতে যেত। কিন্তু কিছুতেই টাল সামলাতে পারত না। পেছন দিকে মাথা করে শান-বাঁধানো রাস্তার ওপর সপাতে উল্টে পড়ত। বার বার আছাড় খেয়েও তাদের হুঁশ হত না।

তারপর রাস্তায় শুয়ে শুয়েই পথ-চলতি লোকদের পাগুলো বলের মতো লোফালুফি করতে করতে এক সময় তারা দিব্যি লায়েক হয়ে উঠত। তার পর মাথায় আরও ঢ্যাঙা হয়ে হুঁটের রাজ্যে কোথায় যে হারিয়ে যেত কেউ খবরও রাখত না।

এ-গলিতে টেলিগ্রাফের তারগুলো বেশি উঁচু দিয়ে যায়নি। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। এ-দেয়ালে ও-দেয়ালে মাথা ঠুকে গলির বাকের মুখে হঠাৎ শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন কাতর ভাবে ছুটে গেছে যে, ওদিকে চোখ পড়লেই ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে একবার শেষটা দেখে আসি।

তারের গায়ে পা বাধিয়ে হেঁটমুণ্ডি হয়ে ঝুলছে অসংখ্য স্ত্রীতো। কোনটার সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা ঘুড়ি। ঘুড়িগুলোকে নতুন নতুন বেশ দেখায়। যেটার উঁচুর দিকে গোল পট্ট দেওয়া, সেটা চাঁদিয়াল। চোঁখুপি চোঁখুপি রকমারি রং বার, সেটা সতরঞ্চি। যতক্ষণ কল বাঁধা থাকে, একটু হাওয়া হলেই উড়তে চায়। তারপর একদিকের কল কেটে গেলে ঠায় ঘোরে। একটা সময় আসে, যখন ঘুড়িটার আত্মোপাস্ত কিছুই আর আন্তো থাকে না। কানের কাছে কাঁপের কাঠিটা ছিঁড়ে গিয়ে এক টুকরো রং-চটা ফ্যাকাশে কাগজ নিশানের মতো নাচতে থাকে। আর সেই নিশানটা পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে একমাত্র আকাশ ছাড়া আর সব দিকেই ইশারা করে দেখিয়ে দেয়। ল্যাজের সঙ্গে বাঁধা চেংটানের কাঠিটা কি করবে দিশে না পেয়ে কেবল ডাইনে বাঁয়ে একঘেয়ে বিষণ্ণ সুর নিখর নিম্পন্দ

তারের গারে গুন গুন করতে থাকে। তখন টেলিগ্রাফের তারটার দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু শীতের সকালে কিম্বা এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশে যখন রোদ হেসে ওঠে, তখন গলির বঁকে ত্রিশকু তারগুলোর গায়ে ছোট্ট মেয়ের নাকের নোলকের মতো ফোঁটা ফোঁটা জল আর বিন্দু বিন্দু শিশির বিপজ্জনকভাবে বুলতে থাকে। এক হাত ঘোমটা টানা থাকলেও খড়খড়ি তুললে সে দৃশ্য চোখ এড়ায় না।

সারাদিন বৃষ্টির পর বিকেলবেলায় নেবুতলার গলিতে এক আজগুबी ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। রাস্তার যে যে জায়গায় খোয়া উঠে গিয়ে খোঁদলের মধ্যে জল জমেছে তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কেউ কেউ হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর রাস্তার ময়লা জলের দিকে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়। নিস্তরঙ্গ জলে একটি স্থির চিত্রার্পিত ছায়া মানুষের পায়ে আড় হয়ে পড়ে শহরে এসে ভুলে যাওয়া আকাশটার কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়।

পাড়ার বেশির ভাগ বাড়িই পুঁয়ে পাওয়া ক্ষয়্যাটে। চোয়ালের হাড় বার করা গাড়ি-বারান্দাগুলোর জন্তেই বোধহয় বাড়িগুলোকে কেমন যেন একটু কোল কুঁজো কোল কুঁজো বলে মনে হয়। এক তলার রোয়াকে উঠে দড়িতে ঝোলানো বাঁশের আলনার মতো বারান্দাগুলোকে লাফ দিয়ে ছোঁয়া যায়। এই গুণটুকুর জন্তেই চড়কের দিন রাত্তিরে জেলে পাড়ার সঙ দেখতে এ গলিতে লোক ভেঙে পড়ত।

গলিটা আজও ঠিক তেমনিই আছে।

শুধু নেই মুসলমান শালকেরের সেই দোকানটা যেখানে হেলানো বাঁশের গারে টান করে বাঁধা দড়িতে টাঙানো রংবেরঙের ভিজ়ে শাল আলোয়ানগুলো এ গলির মানুষদের সাত সকালে শীতের কথা ভাবিয়ে তুলত। তারপর বেলা বাড়লে রংবেরঙের ভাঁজ করা জাপানী পাথার মতো গলির একটা জায়গাতে নড়ে নড়ে তারা হাওয়া করত।

যদি খুঁটে খুঁটে দেখ, দেখবে বিলক্ষণ বদলেছে।

ময়রার দোকানে গরম জিলিপি ভাজার ছ্যাক ছ্যাক শব্দে ভোর এখনও অবশ্য হয়, তবে তার গন্ধ কাঁচ-ঢাকা দেয়াল ফুঁড়ে কতদূর অব্দি যায় সন্দেহ আছে।

কবিরাজ মশাই নেই। চুল-পাকা বুড়োদের ভিড়ে গিজ গিজ করত তাঁর যে বৈঠকখানাটা, যার পাশ দিয়ে গেলে দিনরাত কানে আসত গুড়ুক গুড়ুক শব্দ

আর হাওয়ায় ভূর ভূর করত ভালো অনুরি তামাকের গন্ধ, এখন সেটা মড়ার মতো পড়ে আছে। কবিরাজ মশাইয়ের ডাক্তার ছেলে বিলেতে গিয়েছিল; সে নিশ্চয় আজও এই অন্ধ গলির মায়ায় বাঁধা পড়ে নেই।

মিষ্টর দোকানের এদিকে খোলার বস্তিটা আজও আছে। হবার মধ্যে আরও ছাতা-পড়া, আরও পুরনো হয়েছে। সেই ভুঁড়িপেট হালুইকর, রোগা রোগা ডকের খালাসী, সেই পাইপ-সারানো মিস্ত্রী সেই ঘণ্টা-নাড়ানো টিকিওলা পুরুত, পানের দোকানদার বুড়ো, উড়িষ্যা থেকে আনা সেই মানুষগুলো সব এখনও কি ওখানেই থাকে?

চুন সিমেন্টের দোকানের পাশে উঁচু তিনতলা বাড়িটাতে কাবলীওয়ালারা অনেক দিন নেই। এ গলিতে একদিন তাদের আদর ছিল। লোকগুলো এত লম্বা যে, এ পাড়ার কাউকে কথা বলতে দেখলে মনে হত যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। ওদের হাতের চেটোগুলো বেতের লাঠির মাথায় এমন ভাবে উপুড় করা থাকত যে, দেখে মনে হত সিংহ যেন খাবা দিয়ে শিকার ধরেছে। পেছন ফিরলে ওদের হাত-কাটা লাল কিংখাবের জামা আর মাথার কালো বাবুরি চুলের মাঝখানে চওড়া গর্দানটা অন্তত সাদা দেখাত। আপিসে কাজ করা পাড়ার কেরানীবাবুরা বিস্ময়কর বাংলায় ওদের সঙ্গে রাস্তার দাঁড়িয়ে 'কী সাহেব' বলে এমন একটা সমানে-সমান ভাব নিয়ে কথা বলতেন যে, পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের রীতিমত তাক লেগে যেত। হাঁ, বীরপুরুষ বটে, সাহেব স্তবোধের সঙ্গে কি রকম ভুড়ি মেরে কথা বলছে দেখ!

নিবারণবাবু অনেক দিন গত হয়েছেন। থাকলে দেখতেন কড়িঙের মাও আর নেই।

সেই নিবারণবাবু কোন কারণ না থাকলে কারণ তৈরি করে নিজেকে যিনি দুঃখ দিতেন। কড়িঙের মা বার স্ত্রী।

আট-হাতি কাপড় পরে পিঠে কয়লার বস্তা নিয়ে চোখে-চশমা-আঁটা নিবারণবাবু কুঁজো হয়ে বাড়ির গলিতে ঢুকলেন, কোনদিকে না তাকিয়েও তিনি রাস্তায় শুধু জুতোর শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন লোকজন সারা রাস্তা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিবারণবাবু বুঝতেন সব।

একমাত্র কড়িঙের মাকে ছাড়া।

নিবারণবাবু চাইতেন কড়িঙের মা কষ্ট পাক। আগুনে না পুড়লে মানুষ খাটি

হয় না। দুঃখই জীবনের সার সত্য। ইত্যাদি।

ফড়িঙের মাকে নিবারণবাবু প্রায় এক যুগ স্পর্শ করতে ভুলে গেলেন, নিজের বড় ঘর ছেড়ে কোণের ঘুপচি ঘরটায় উঠে গেলেন, বাড়িতে স্ত্রীর হাতে না থেয়ে গা-ঘিনঘিনে হোটেলের দু-বেলা খাবার বন্দোবস্ত করলেন, শেষ অর্ধি নিজে পিঠে করে কয়লা বয়ে আনার সিদ্ধান্ত করলেন।

কিন্তু ফড়িঙের মাকে কিছুতেই কষ্ট দেওয়া গেল না।

এই করতে করতে নিবারণবাবু চুল পাকিয়ে ফেললেন এবং শেষ অর্ধি বুড়ো হয়ে গেলেন।

বুড়ো হয়ে নিবারণবাবু আরও একা পড়ে গেলেন, তাঁর দুঃখ আরও বাড়ল—কেননা ফড়িঙের মাকে সে আন্দাজে কই তেমন বুড়ো হতে দেখা গেল না।

শুধু তাই নয়। ফড়িঙের মার বিয়ের আগে নিজের একটা সুন্দর নাম ছিল। কুসুম। চেহারা ভালো বলে আদর করে বাবাই সে নামে ডাকতেন।

ফড়িঙের মা করলেন কি, বাপের বাড়ির লোকজনদের এ বাড়িতে ঘন ঘন আসতে দিয়ে রীতিমত কায়দা করে তাঁর সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো নামটাকে আবার ডেকে ডুকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন।

আর ফড়িং? বাপের কুপুত্র নয় বটে, কিন্তু মার কাছে লাই পেয়ে পেয়ে যে হারে সে নাটক-নভেল পড়তে শুরু করে দিল তাতে বোঝাই গেল ফড়িং এবার উড়বে। ফড়িঙের মার বড়লোক বাপের বাড়িই যত নষ্টের গোড়া। কুসুম বোনদের মধ্যে ছোট। বাবা তো খোলাখুলিই বলেন, আট মেয়েকে পার করতে গিয়ে ছোট মেয়েটা জলে পড়ে গেল। ভাইরা আগে ছোট বোনকে লুকিয়ে চুরিরে সাহায্য করত, এখন খোলাখুলি মনি অর্ডারেই টাকা পাঠায়।

ফড়িঙের মার শখ মেটাবার মত টাকা নিবারণবাবুর যে নেই তা নয়। নিবারণবাবু টাকার ব্যাপারে খুব যে কঞ্জুষ তাও নয়। দু-মেয়ের বিয়েতে তাঁর চেয়ে বেশি টাকা খরচ পাড়ার আর কোন মেয়ের বাবা করেনি। এটা তাঁর নিজের কথা নয়। মেয়ে মহলেরই মত।

নিবারণবাবুর মতে ফড়িঙের মার কাল হল লেখাপড়া শিখে। লেখাপড়া শিখলেই আর ঠেকাবার উপায় নেই, নাটক-নভেল পড়বেই। আর ওর মধ্যে যে কি সব ভয়ংকর ভয়ংকর কথা লেখা থাকে, ছেলে বয়সে একবার পড়েই তিনি তা টের পেয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক, ফড়িঙের মা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব। সেটা নাকি ভালবাসা নাও হতে পারে, শুধু একটা টানও হতে পারে। টান, ভালবাসা,

হেন-তেন করে লেখকেরা কেন মানুষের মাথাগুলো ঝুলিয়ে দেয় তা কি আর তিনি জানেন না? ফড়িঙের মা যখন তাঁর অগ্নি-সাক্ষী-করা স্ত্রী—তখন তাঁকে তিনি আলবৎ ভালবাসেন।

ভালবাসেন বলেই তো ফড়িঙের মাকে তিনি আঘাত দেন। যা খেয়েও ফড়িঙের মার কোন সাড় নেই।

কেন নেই সে বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে নিবারণবাবু একদিন মাথার শির ছিঁড়ে মারা গেলেন।

ফড়িঙের মা মারা গেলেন অনেক পরে। ঘরে ছেলের বউ এনে এবং নাতির মুখে ভাত দিয়ে।

নিবারণবাবুকে যমরাজা যদি নিজে বাছাই করে নেবার ভার দিয়ে থেকে থাকে, তাহলে নিবারণবাবু নির্ঘাৎ নরকই বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু সেখানেও তিনি বড্ড একা পড়ে গেলেন। কেননা ফড়িঙের মাকে বলতেই তিনি নিশ্চয় ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে চলে গেছেন।

গলির মধ্যে ঢুকে সেই সব পুরনো কথা মনে করতে করতে এক কালে এপাড়ার খাকা চল্লিশ বছরের এক বুড়ো মিন্সে হঠাৎ এইটুকু হয়ে গেল।

মাহাত্ম্য ব্যোমকায় সাহিত্য

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে-সব যুগে কর্মোত্তম অত্যন্ত প্রবল, জাতির সামনে উজ্জ্বল এবং আশা-দীপ্ত ভবিষ্যৎ এবং মূল্যবোধগুলি মোটামুটি সুনিশ্চিত বলে চিন্তাধারা গভীরে প্রবিষ্ট, সেই সব যুগে ট্রাজেডি প্রাধান্য লাভ করে। পক্ষান্তরে দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনধারা ও মূল্যবোধের কাল কমেডির পক্ষে প্রশস্ত। এই দুই যুগের উদাহরণ হিসাবে যথাক্রমে ইংরেজি সাহিত্যের এলিজাবেথীয় এবং রেস্টোরেশন যুগের কথা উল্লেখ করা চলে।

কথাটা একটু আপাত বিরোধী নয় কি? যে যুগে জাতীয় জীবনে আশা-উদ্দীপনার অন্ত নেই, সেই যুগে শিল্পী মানসে ট্রাজেডির পরিকল্পনা উদয় হয় কেন? এ প্রশ্নের জবাব খুব সহজ নয়। স্ফুট জবাব পেতে হলে প্রথমতঃ শিল্পীর মনস্তত্ত্বের সন্ধান নেওয়া দরকার, এবং দ্বিতীয়তঃ শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধেও খোঁজ নেওয়া দরকার।

শিল্পীর, তথা যে-কোন মানুষের মনের, মধ্যেই দুটো পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা রয়েছে। একদিকে মানুষের মন নিরাপত্তার দিক থেকে অধিকতর সুনিশ্চিত বলে স্থিতিস্থাপকতার পক্ষপাতী। অপরদিকে সমস্ত গতানুগতিকতাকে ভেঙে চুরে একটি অধিকতর কাম্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও সেই মনেই বিদ্যমান থাকে। সমাজে যখন কর্মোত্তম অত্যন্ত প্রবল; এবং ব্যক্তি মানস সেই কর্মশ্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন সেই স্থিতিস্থাপক মন ভাঙে, উদ্বেগে এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তারই ফলে জন্ম হয় ট্রাজেডি।

অনেক সময় বেপরোয়া কর্মোন্মের সঙ্গে একটা অপরাধ-বোধও জড়িত হয়ে থাকে (বেপরোয়া কর্মোন্ম অবিশিষ্ট প্রায়ই বাস্তবক্ষেত্রেও নৈতিক মানের সীমা লঙ্ঘন করতে পশ্চাদ্পদ হয় না) । মার্লোর 'ডক্টর ফাউন্টাস' নাটকে আছে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ের বিনিময়ে ফাউন্টাস কুড়ি বছরের জন্য অপরিমেয় ক্ষমতা লাভ করেছে । অপরিমেয় ক্ষমতা লাভ যে শয়তানের সঙ্গে চক্রান্ত ছাড়া সম্ভব নয় এই কল্পনার পিছনে রয়েছে অপরাধ-বোধ । আর অপরাধ-বোধ যার মূলে তার স্বাভাবিক পরিণতি ট্রাজেডিতে ! শেকসপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সুনীতির সীমা-লঙ্ঘনের গ্লানি জড়িত ।

শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃতির মধ্যে আর এক ধরনের ট্রাজেডির কারণ নিহিত । মূল্যবোধ যেখানে গভীর সেখানে সাহিত্যের কল্পনা কোনো মূল্যকে তার চরম পরিপূর্ণতার মধ্যে উপলব্ধি করতে চায় । এবং এই চরম পরিপূর্ণতার মুহূর্তটি সাধারণতঃ বিয়োগান্ত হয়ে থাকে । যেমন শেকসপীয়রের অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা নাটকে নায়ক-নায়িকা তাদের মৃত্যুর মুহূর্তেই তাদের প্রেমের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছুতে পেরেছিল । বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও লেখক নায়ক-নায়িকার পূর্ণ প্রেমের উপলব্ধির মুহূর্তেই তাদের জীবনাবসান ঘটিয়েছেন । বিয়োগান্ত পরিণতি এসব ক্ষেত্রে মূল্যবোধের এমন এক শীর্ষারোহণ যেখান থেকে লেখক আর তাকে দৈনন্দিনতার তুচ্ছতার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চান না । এ জাতীয় ট্রাজেডিকে প্রকৃত অর্থে নৈরাশ্রবাদ বলা যায় না । মৃত্যু এখানে বিফলতা নয়, পরিপূর্ণতা ।

পাঠক মানসের উপর ট্রাজেডির ফল কি এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যা বলে গিয়েছেন তার পরে আর নতুন করে কিছু বলার আছে বলে মনে হয় না । অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ট্রাজেডি মানুষের মনের সমবেদনা-বোধ (pity) এবং আতঙ্ক বোধ (terror)-এর একটি কাল্পনিক যুক্তি ঘটিয়ে তার মনকে নির্মল করে । ট্রাজেডিকে যদি মানব মনের নৈরাশ্রবাদের ফসল বলে ধরেও নেওয়া যায় তবু তা পাঠকের নৈরাশ্রবাদী প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে একথা ঠিক নয় । এবং পাঠকের মনের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্রহৃৎক ভাবগুলির কাল্পনিক যুক্তি ঘটিয়ে তা তাকে আরও বেশি স্বাভাবিক কর্মোন্মের উপযোগী করে তোলে—এ কথাটাও হয়তো একটু পরস্পর-বিরোধী শোনাচ্ছে । কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী কথাগুলোই অনেক সময় বেশি সত্য ।

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে অবিশিষ্ট ট্রাজেডিকে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বর্জন করা হয়েছে ।

কিন্তু ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ইংরেজি বা ফরাসী বা রুশ সাহিত্য—সর্বত্রই ট্রাজেডির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও এই সব দেশে যে কর্মোত্তম কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মনে হয় না।

কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালে এ দেশে যখন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন থেকে একটা ট্রাজেডি-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা দেয়। জীবনের অগ্রগতির ধারার চিত্র দেবে যে সাহিত্য সে সাহিত্যে বিয়োগান্ত পরিণতি কেন থাকবে? শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সাহিত্য মানুষকে আশার আলো দেখাবে তবেই না সাহিত্য মানুষের কাছে প্রেরণাদায়ক হয়ে উঠবে। কাজেই কোন সাহিত্যকর্মের আদিতে বা মধ্যে বিয়োগান্ত ঘটনা থাকলেও তার পরিণতিতে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত থাকবে, এটাকে তখন প্রগতিশীলতার একটি মৌলিক সূত্র বলে গণ্য করা হয়েছিল।

সমালোচকেরা সুনজরে না দেখলেও বাংলা দেশের প্রগতিশীল সাহিত্য প্রচেষ্টায় অবিশিষ্ট ট্রাজেডির, এমন কি নৈরাশ্রের, সুরটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রগতিশীলতার গোড়াকার কর্মসূচি সম্পর্কে এখন অনেকের মনেই অনেক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাজেই এই সময়ে ট্রাজেডি সম্পর্কীয় পূর্বতন মনোভাবটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেটা আলোচনা করা চলতে পারে।

আমি আগেই বলেছি যে সাহিত্যে ট্রাজেডির প্রাধান্য দেখা দিলেই যে মানুষ নিরুৎসাহ ও ভগ্নোত্তম হয়ে পড়ে তা নয়। কিন্তু বলা হয় যে, সেকালের লেখকেরা সচেতন শিল্পী ছিলেন না, কী করে সমাজের প্রতি বা ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয় তা তাঁরা জানতেন না। কিন্তু আধুনিক লেখকের তো সে অজুহাত চলে না; দায়িত্বের কথা সচেতনভাবে মনে রেখে তিনি কী করে ট্রাজেডি লিখবেন?

দায়িত্বের কথাটাই আগে আলোচনা করা যাক। অবিশিষ্ট লেখকের পক্ষে সচেতন ভাবে কোন দায়িত্বকে স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রশ্নও অনেকে ভুলতে পারেন। সে বিতর্কে না গিয়ে ধরে নিচ্ছি লেখকের দায়িত্ব আছে।

কিন্তু লেখকের দায়িত্ব শুধুমাত্র মানুষকে কতকগুলো সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই নয়; তার ভাবজীবনের বিকাশ এবং পরিপুষ্টি সাধনও বটে। ভাবজীবনের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বোধকরি আজও ট্রাজেডির উপযোগিতা আছে। জীবনের শেষ নেই বলে বাস্তব জীবনে প্রকৃত-পক্ষে আমরা কোন করুণতম ট্রাজেডির সামনেও প্রতীক্ষা করার অবকাশ

পাই না কিন্তু সাহিত্য মৃত্যুকে স্থায়িত্ব দান করে। মৃত্যুকে বা বিচ্ছেদকে যাতে আমরা ভুলে যেতে পারি জীবন তার জন্ত অনেক ব্যবস্থা করে রেখেছে। আদিম মানুষের কাছে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ বড় জোর খানিকটা ভয় বা আতঙ্কের কারণ ছিল। মৃত্যু বা বিচ্ছেদকে আধুনিক মানুষ যে গুরুত্ব দেয় তার পিছনে শিল্প-সাহিত্যের অবদান কম নয়। এই দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীবনের কতকগুলি গভীরতর আবেগ অনুভূতি এবং মূল্যবোধকে সাহিত্য মানুষের মনের সামনে প্রধান করে তুলতে পেরেছে। অভাব বোধের চিত্রের ভিতর দিয়েই আমরা কোন আবেগকে গুরুত্ব দিতে পারি। প্রিয়জনের মৃত্যুকে একটি নিদারুণ চিত্র হিসাবে উপস্থিত করেই সাহিত্য আমাদের কাছে প্রিয়জনকে এত মূল্যবান করে তুলেছে।

অবিশ্রি সমালোচক হয়তো বলবেন, বেদনার কাহিনীতে তো আর আপত্তি নয়, বেদনা যেন কাহিনীর উপসংহার না হয় ;—জীবন একটি বিয়োগান্ত ঘটনা এই অনুভূতি নিয়ে যেন পাঠক কাহিনী শেষ না করেন। কিন্তু সেটা কি কাহিনীর বিশেষ সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভরশীল নয়? যে কাহিনীর নায়ক এক-খানি বাড়ি সে কাহিনী কি বাড়িখানা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না? বাড়ির বাসিন্দারা তারপরেও বেঁচে থাকবে; কিন্তু কাহিনীতে তাদের আর স্থান হবে কী করে? জীবনের শেষ নেই; কিন্তু উপন্যাসের একটি কাহিনীর শেষ আছে।

ট্রাজেডি যেখানে মানুষের কতকগুলি আবেগ, অনুভূতি এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে পাঠকমানসে গভীরভাবে রেখাপাত করে সেখানে সে জিনিস সৃষ্টি করলে লেখকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রমাণ হয় না।

কিন্তু ট্রাজেডি সম্পর্কে প্রধান আপত্তি এইখানে যে ট্রাজেডি নৈরাশ্রবাদের তীব্রতম আর প্রগতি সাহিত্য মানুষকে আশাবাদের দীক্ষা দিতে চায়।

প্রসঙ্গটাকে খুব ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। কোন মানুষই পুরোপুরি আশাবাদী বা পুরোপুরি নৈরাশ্রবাদী হতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। জীবনে এমন কতকগুলো অপরিহার্য ট্রাজেডির দিক রয়েছে যাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু অবজ্ঞা করতে পারি না। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে কোমর বেঁধে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হতে পারি, কিন্তু সব সময়ই আমাদের সামনে কতকগুলো নোটিশ ঝুলছে, বিচ্ছেদের, ব্যর্থতার এবং মৃত্যুর। ব্যর্থতার অনুভূতি বড় বিচিত্র জিনিস। জীবনের সার্থকতার মুহূর্তে আমরা ব্যর্থতা

বোধ করতে পারি। মাইকেল তাঁর 'আশার ছলনা'। কবিতাটি তখন লিখেছিলেন যখন সারা জীবনের সংগ্রামের পর তিনি সাহিত্য জীবনে ও অর্থনৈতিক জীবনে খানিকটা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। কর্নার সার্থকতা আর বাস্তবের সার্থকতার তফাৎ থাকে বলেই এ-রকমটা ঘটনা স্বাভাবিক। নৈরাশ্যবাদ মানুষের কর্মজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে একথাও ঠিক নয়; ইতিহাসে অনেক নৈরাশ্যবাদীর জীবন খুব সার্থকতায় মণ্ডিত, আবার অনেক আশাবাদীর জীবনে সার্থকতার স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়।

আসল কথা, নৈরাশ্যবাদীর মনের কোণেও আশা লুকিয়ে থাকে; এবং আশাবাদীও একেবারে নিরাশামুক্ত নন। মানুষের মন এমনি বিচিত্র যে একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে পাওয়ার উপায় নেই। যিনি খুব ঘটা করে দুঃখই যে জীবনের সার সত্য এ-কথা দর্শনে বা সাহিত্যে প্রমাণ করতে বসেন, তাঁর সেই প্রয়াসই কি প্রমাণ করে না যে জীবন থেকে কিছু প্রাপ্তির আশা তিনিও রাখেন? যে কবি (Browning) All's right with the world লিখেছিলেন সেই কবিই Knight Roland to the Dark Tower came কবিতার মধ্যে সার্থকতার মধ্যে যে ব্যর্থতা থাকে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাজেই নৈরাশ্যবাদী বা আশাবাদী কথাগুলো একটি আপেক্ষিক প্রাধান্যের সূচক-মাত্র।

কিন্তু এই দু-জাতের লেখক জীবনের দুই বিভিন্ন দিককে পাঠকের সামনে অনাবৃত করে ধরেন বলে পাঠক-মানসের সম্প্রসারণের জন্য এই দু-জাতের লেখারই প্রয়োজন আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্যাম' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' জাতীয় গল্পগুলো জীবনের এক নির্ভর সত্যকে উদ্ঘাটিত করে; মানুষ যে মূলতঃ স্বার্থপরতা বা জৈবিক কামনার দ্বারা চালিত হয়, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সে মানবিক মূল্যকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাই এ গল্পগুলোর প্রতিপাদ্য। এ-গুলো আধুনিক ট্রাজেডির নমুনা; বিরোগান্ত পরিণতি আধুনিক ট্রাজেডিতে বড় কথা নয়, বড় কথা মূল্যবোধের অপমৃত্যু। কিন্তু এ-সব কাহিনী মানব প্রকৃতির নৈরাশ্যবাদী চিত্র দিচ্ছে বলে পাঠককে মানব প্রকৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে হতাশ করে তুলবে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবনের কতকগুলি রুঢ় সত্য সম্পর্কে পাঠক আপনা থেকেই আবছাভাবে সচেতন হতে থাকে; লেখক তার সেই সচেতনতাকে একটি স্পষ্ট রূপ দিয়ে তার চৈতন্যকে প্রসারিত করলেন। পাঠক বুঝতে পারলেন মানবিক মূল্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা

খুব অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। কঠিন সংগ্রামের জন্ত, ব্যর্থতাকে বরণ করার জন্ত পাঠকের মন তৈরি হবে। এই গল্পগুলো জীবনের একটি আংশিক সত্যকে সর্বাত্মকতার মর্যাদা দেওয়ায় সস্তা আশাবাদ বা ভাবানুতার সুখ-স্বপ্ন থেকে পাঠকের মন মুক্ত হল।

পাঠক-মানসের উপর সাহিত্যের প্রভাব মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের মতোই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই প্রগতিশীল সমালোচকরা ট্রাজেডির প্রতি অত বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। এই যান্ত্রিক চিন্তাকে আজকে পরিহার করার সময় এসেছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা যত আশাবাদীই হই না কেন, জীবনের অনেক বিয়োগান্ত সত্য সম্বন্ধে কোন সংবেদনশীল মানুষই অনবহিত থাকতে পারেন না। জীবনে যে-সব ট্রাজেডিগুলো আছে পাঠককে সে-সম্পর্কে সচেতন এবং প্রস্তুত করে তোলার দায়িত্ব লেখকের। যে দেশপ্রেমিক নিজেকে সুখ থেকে বঞ্চিত করলেন, যাদের জন্ত সংগ্রাম করলেন তাদের অনাদর ও উপেক্ষা সহ্য করলেন, তিনি যখন স্বাধীনতা অর্জনের আগেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তখন আত্মবঞ্চনা যে তাঁর জীবনের একদিকের রূঢ় সত্য এ কথা সাহিত্যিক প্রকাশ না করলে আর কে প্রকাশ করবেন। কিন্তু এ-কাহিনী পড়ার পর প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিজের মনের অবধারিত বঞ্চিতের মনোবৃত্তির উর্বে ওঠার জন্ত সচেষ্ট হতে পারবেন। জীবনের গতি ডায়ালেক্টিক্যাল এ-কথা মনে না করে জীবনের গতি যান্ত্রিক এ-কথা মনে করেছিলেন বলেই প্রগতিশীল সমালোচক এক সময়ে ট্রাজেডির বিরুদ্ধতা করেছিলেন।

সোভিয়েট সাহিত্যে ট্রাজেডিমূলক সাহিত্য প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু একখানি আশ্চর্য ট্রাজেডির চিত্র শোলোখভের 'ধীরে বহে ডন'। 'ধীরে বহে ডনে' শুধু যে বিয়োগান্ত পরিণতিই আছে তাই নয়, শুধু যে একটি নেগেটিভ চরিত্রকেই নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এ-বইয়ে প্রায় ক্লাসিক্যাল অর্থে নিয়তিবাদকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বিপ্লবের সময় সাধারণ মানুষেরা অনেক সময়েই নিছক ঘটনা প্রবাহের অসহায় ক্রীড়নক হিসাবে রেডদের দলে বা হোয়াইটদের দলে যোগ দিয়েছে। কোন্ দল তাদের প্রকৃত মিত্র এ কথা সঠিক ভাবে অনুধাবন করার মতো মানসিক শক্তি তাদের ছিল না। কিন্তু যে ভুলের জন্ত তারা দায়ী নয়, সে ভুলের জন্ত ইতিহাসরূপী নিয়তি তাদের ক্ষমা করেনি। অনেক নিষ্ফল সংগ্রাম ও যন্ত্রণা ভোগের পর সে ভুল পথে গিয়েছিল এই চেতনা লাভ করে

১. বলদৃপ্ত গ্রেগর এক সম্মানহীন যুত্মকে বরণ করতে বাধ্য হল। মানুষের অসহায়তার এই চিত্র নেহাৎ শোলোখভের মতো শক্তিশালী লেখকের হাত থেকে বেরিয়েছিল বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। না হলে এ জাতীয় চিত্র গতানুগতিক প্রগতিশীলতার মানদণ্ড অনুযায়ী স্বীকৃতি পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় বিপ্লব বা দ্রুত পরিবর্তনের পথ আশাবাদের সূচক হতে পারে; কিন্তু সে পথে যে অজস্র ট্রাজেডীর সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার দায়িত্ব রয়েছে লেখকের।

জীবনের যে সব দুঃখজনক বা বিয়োগান্ত ঘটনার প্রতিকার আমরা জানি না, সেই-গুলোই প্রকৃত অর্থে ট্রাজিক। সাহসের সঙ্গে পাঠক যাতে জীবনের এই সব রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হতে পারেন, লেখককে অবশ্যই সে দায়িত্ব নিতে হবে। অপ্রিয় সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই প্রগতিশীলতা কিনা সে কথা আর একবার বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আজকের জীবনের যত ক্ষয়-ক্ষতি অপচয়ের কথা কালকের জীবন তার সমস্ত চিহ্নকে মুছে ফেলবে। একমাত্র সাহিত্যই সেই বেদনার ইতিহাসকে চিহ্নিত করে রাখে এবং মানুষের মনের সমবেদনাকে উদ্ভূত করে। যদি কোন দেশের সাহিত্য ট্রাজেডিকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করে তবে উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে সে দেশের মানুষের মনের সমবেদনা-বোধ কুঁকড়ে শুকিয়ে যাবে। যে মানুষ জীবন যুদ্ধে পরাজিত হল, যে পথ চলতে চলতে পথের পাশে গড়িয়ে পড়ল, যে ভুল করে শাস্তি পেল, যে প্রগতির প্রতিযোগিতায় নামতে সাহস করল না,—সেই সব মানুষদের বেদনার কথা কোনো পৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে থাকবে না, বিজয়ীর দল মনের সহানুভূতি দিয়ে তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না! নির্মানবিক প্রগতিশীলতা মানুষের প্রগতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তিবশতঃ কখন যে মানুষকে ব্যথা দিয়ে শুধুই এক গাণিতিক প্রগতিকে গ্রহণ করবে তা সে জানতেও পারবে না।

শ্রীমত বাৎসার গ্রামদেবতা

আদিম শ্রেণীহীন সমাজে ভগবান নামক পরম দেবতাটির অস্তিত্ব ছিল না। ভগবান শ্রেণী-সমাজের আবিষ্কার। শ্রেণীহীন সমাজের মানুষ পারম্পরিক শোষণ-ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করেনি; সমতার ভিত্তিতে খাণ্ড-বিভাগের সহজ পন্থাই তখন একমাত্র পন্থা। এই সমতার ভিত্তিই, শ্রেণীহীন সমাজকে ভগবান আবিষ্কার করার জন্য বাধ্য করেনি। সহজ ভাবে এই কথাই বলা যায় যে, ভাগ্যের নিয়ামক ভগবান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা তখনো অনুভূত হয়নি।

সমাজ বিবর্তনের এক অধ্যায়ে নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের রহস্য মানুষের কাছে ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভয়ের পটভূমিকাতেই ভূত-প্রেত-দেব-দেবীর জন্ম। এর সঙ্গে, মৃত পূর্বপুরুষকে ভয় করার প্রসঙ্গও জড়িত। পূর্বপুরুষ পূজার প্রচলনের মূলে মূখ্য ভূমিকা ভয়ের, গৌণ ভূমিকা কৃতজ্ঞতার। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং পূর্বপুরুষদের রহস্যময় অবলুপ্তিই মানুষের মনে দেব-দেবী-ভূত-প্রেতের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিত পুষ্ট দেব-দেবীদের প্রভাব আমাদের সমাজে আজও অপ্রতিহত। এর পাশে আর একদল দেব-দেবীও সেই আদিম কাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করেনি। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের পূজা প্রাপ্তির জন্য এদের মাথা ব্যথা নেই। তবু, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ-স্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম গ্রামদেবতা।

বাংলাদেশে, সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদিপর্বেরই, এই অকুলীন দেবতার দল, মাথা

উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। অন্-আর্থ সংস্কৃতির অন্তঃশীল। প্রবাহের স্রোতরেখা ধরেই এদের আবির্ভাব। বেদ-পূর্ব যুগের সব কথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের পুরাণ-কাহিনীর অঙ্কাবরণ পরানো হয়নি বলে, এই দেবতাগুলির স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলা বাহুল্য, আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত-আত্মার জন্ম দিয়েছিল, সেট ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বৈদিক দেবতা তো আসলে প্রকৃতি দেবতা ছাড়া অণু কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়টি মানবসমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ঋগ্বেদের দেবতাহের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাসই নিহিত। জীবপূজা, অচেতনপদার্থ পূজা এবং সর্বপ্রাণ-পূজার সংমিশ্রণে বৈদিক দেবতার আবির্ভাব এবং এই দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদিপর্বটি গ্রামদেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও বিজড়িত।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই গ্রামদেবতাদের আধিপত্য বিদ্যমান। বৈদিক এবং পৌরাণিক দেবদেবীর সমাজে এরা অপাণ্ডিত্যের, কিন্তু গ্রামে গ্রামে এদের অঞ্চ প্রতাপ অস্বীকৃত নয়। গ্রামদেবতাই গণদেবতা।

পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বত্র গ্রামদেবতার 'খান' বিদ্যমান। আদি-দেবতা হিসাবে এই সব গ্রামদেবতার পূজা-বিধিও অণুদেবদেবীর পূজারস্তুর পূর্বভাগে। পৌরাণিক দেবতা গণেশঠাকুর যেমন সমস্ত দেবতা পূজার অগ্রভাগেই পূজাপ্রাপ্তির অধিকারী, তেমনি এই গ্রাম দেবতাগুলিও পূজাপ্রাপ্তির অধিকারীরূপে বর্তমান। গণেশঠাকুর পৌরাণিকত্ব প্রাপ্তির পূর্বে এই সব অকুলীন গ্রামদেবতাদের পর্যায়ে পড়তেন বলেই মনে হয়। এখনো এই গজমুণ্ডধারী লম্বোদর দেবতাটি সর্বভারতীয় মুখ্য গ্রামদেবতা। দক্ষিণ ভারতের গ্রামে গ্রামে এঁর অবস্থান।

বর্তমানকালে, পুরুষ গ্রামদেবতাদের প্রভাব পরিস্ফীণ। কিন্তু গ্রামদেবীদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকে পুরুষ দেবতার দল আত্মগোপন করেছে।

একদা, এই দেব-দেবীগণ কেউ আলাদা ভাবে থাকতো না। বিশেষ বিশেষ গাছের তলায় এদের একত্র অধিষ্ঠানভূমি ছিল। বর্তমানে, কোন কোন জায়গাতে গ্রাম-দেবতা এবং গ্রাম-দেবীকে একত্র অবস্থান করতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এমন দম্পতি দেবতার সংখ্যা অনেক কম। ধর্মঠাকুর ও কার্মিনা-র সহাবস্থানের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে।

ভয়ের দেবী হিসাবে, চণ্ডী, শীতলা, মনসা, রংকিনী প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবীগণ এখনো অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করছেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত দেবীগণ বর্তমানে ঠিক গ্রাম-দেবী পর্যায়ে নেই। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের অন্তান্ত্র পৌরাণিক দেব-দেবীদের আসরে ওদের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত গ্রামদেবীদের জন্ত সাধারণতঃ কোন মন্দিরাদি নির্মিত হত না। গ্রাম-সীমান্তের কোন বৃক্ষকে অথবা বৃক্ষ-তলাকেই এদের অধিষ্ঠানভূমি বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক রূপ পরিগ্রহ করে পুরোহিতপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং হিন্দু দেবদেবীদের নিচের তলার স্থান দখল করে সংস্কৃতি সমন্বয়ে আর একটি অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে অনেক গ্রামদেবতার সন্ধান মেলে। পাঁচালী-গানের আসরে মূলগায়ন গ্রামদেবতার বন্দনাগান করে আসল পালা শুরু করতেন। পৌরাণিক দেব-দেবীদের বন্দনা গানের সঙ্গেই আঞ্চলিক গ্রাম-দেবদেবীদের বন্দনা গান করতেনই হত। মঙ্গল-পাঁচালীগুলিতে এই প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায় খুব বেশি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সূচনার—অনেক আঞ্চলিক গ্রামদেবতার বন্দনা গান করা হয়েছে। • এই গ্রামদেবতাদের সকলেই প্রায় আঞ্চলিক গ্রামদেবী। ধর্মঠাকুর কালু রায়ই একমাত্র পুরুষ দেবতা। পলাশাই (পলাশবতী), হিজুলাই (হিজুলবতী), মেলাই (মেলাবতী), খেপাই (ক্ষেপবতী), বেতাই (বেত্রবতী), বাগুলী, বারাহী, কামারবুড়ী, ডাকিনী-যোগিনী, হিড়িমাই (হিড়িম্ববতী), প্রভৃতি নাম স্ত্রী-দেবতাদের। বলা বাহুল্য, সর্বজনীন গ্রামদেবতাদের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং তাদের অনেকেই পুরোহিততন্ত্রের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করে পৌরাণিক দেব-দেবীদের পর্যায়ে উঠে গেছে, অথবা শীতলা-মনসার নতো অপৌরাণিক হয়ে-ও জাতে উঠে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলেছে।

‘হিজুলীর দেবতা বন্দিব কালু রায়।’

‘চণ্ডীপুরের বারাহী বন্দিবুঁ বিধিমতে।’

‘পাড়ানুর কামার বুড়ীর বন্দিরে চরণ।’

‘বেতার গড়েতে বন্দো চণ্ডীকা বেতাই’

‘খেপের খেপাই বন্দো আমতার মেলাই।’

‘খড়পুরে হিড়িমাই অসুরদলনী।’

‘ডাকিনী যোগিনী বন্দো। শ্রীধর্মের পা।’

পশ্চিম বাংলায়, অঞ্চল বিশেষে, বিশেষ বিশেষ গ্রামদেবতার প্রাধান্য দেখা যায়। কোন কোন গ্রাম, আবার বিশেষ কোন একজন গ্রামদেবতার অধিকারভুক্ত রূপেও চিহ্নিত। এক গ্রামের দেবতা আর এক গ্রামের পূজা পার না। অনেক সময়ে এ গ্রামের দেবতা ও-গ্রামের দেবতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেছে, এমন কাহিনী-ও শুনে পাওয়া যায়। দেবতাকে অবলম্বন করে সময়ে সময়ে পাশাপাশি দুটি গ্রামের বেবারেই চরমে ওঠে। শুধু তাই নয়, এমন অনেক গ্রামদেবতার কথা জানা যায়, কোন কোন গ্রামে বাদে প্রভাব শীতলা-মনসার চেয়ে-ও বেশি। সেই সব গ্রামে, কোনদিনই শীতলা বা মনসার পূজা হয় না।

শাস্ত্রের বিধানে এই গ্রামদেবতা এবং গ্রামদেবীর দল পতিত দেবতা। বহুসংহিতার এই সব গ্রামদেবতাদের পূজারী ব্রাহ্মণকেও 'পতিত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার সমতল অঞ্চলের গ্রামদেবতাদের সঙ্গে, সীমান্ত বাংলার উচ্চাচ ভূমির গ্রামদেবতাদের গরমিল যথেষ্ট। একই হাঁকোর এদের তামাক খাওয়া অচল। শুধু নামে নয়, নানাবিধ প্রথা-পদ্ধতির কাজেও পরস্পরের শ্রেণী একেবারে আলাদা। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ভূ-প্রকৃতি এবং জনবিত্তাস যে আদিমতার সুরভুক্ত, সেই আদিমতা, গ্রামদেবতাদের আকৃতিতে এবং আবাসেও বর্তমান। আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির যে ধারাটি এই অঞ্চলে প্রবহমান, সেই ধারাটির সঙ্গে এই গ্রামদেবতার সম্পর্ক অবিস্ফুট। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত, মানভূম-খলভূম-ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বাকুড়াতে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তার সঙ্গে সমতল বাংলার ভেদ আছে। এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলটি বরষে প্রাচীন তো বটেই, তা ছাড়া এখানকার জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই সেই প্রাচীন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়-বন আর কঙ্করময় ভূমির কোলে যে গ্রাম-গুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশই আদিম অধিবাসীদের অথবা হিন্দুগোষ্ঠীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত মানুষদের। এই অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, বাগ্‌দী, বাউড়ি, মাল, মাহাতো, কোড়া, লোহার, মাহলী, ভূঞা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আঞ্চলিক গ্রামদেবতাগুলিও দায়বদ্ধ।

গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই গ্রামদেবী। চলতি কথায় 'গরামদেবী'। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় বলা হয় 'গরামদেব্‌তি'। সীমান্তবাংলার সর্বত্রই এই গ্রামদেবীদের অধিষ্ঠান-ভূমির নাম 'গরামখান' বা 'গেরাম খান'। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম উপজাতিদের জাহের খানের সঙ্গে স্বরূপতঃ এর কোন

পার্থক্য নেই, যদিও বাহ্যিক রূপ কিছুটা আলাদা। সাঁওতালদের জাহের খানে কিংবা শালুই খানে পোড়া মাটির কোন হাতিঘোড়া থাকে না। শুধু কতকগুলো পাথরের টুকরোকে এলো মেলো ভাবে স্তূপাকৃতি করে রাখা হয় সেখানে। শালুই খানে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পাথরও থাকে না। শুধু বড় বড় শালগাছই সেখানে দেবতা।

গরামখানের মধ্যে ঝোপঝাড়ই আসল। ঝোপঝাড়ের ভেতর, বেশ কিছু সংখ্যক মাটির হাতিঘোড়া পাশাপাশি অবস্থান করে। এই সব হাতিঘোড়া, গ্রামবাসীদের মানত করা দান। কোন কোন জায়গায় হাতিঘোড়ার স্তূপ ছোট খাটো পাহাড়ী টিলার আকৃতি ধারণ করেছে।

যে-সব গ্রামে পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীর পূজা হয় না, সে সব গ্রামের মুখ্য দেবতা গ্রামদেবী। হিন্দুপ্রধান গ্রামেও হিন্দু দেব-দেবীর পূজার তিথিতে সবচেয়ে আগে এই আদিম দেবতার পূজা প্রচলিত।

গ্রামদেবতাদের পূজারী সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত তন্ত্রের আওতায় পড়ে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অথবা প্রায়-হিন্দু আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন একজন, পুরুষানুক্রমে গরামখানের পূজারী হিসাবে কাজ করে। এদের প্রচলিত নাম দে-ঘরিয়া, দেহরী (দেহরী), এবং লায়। দে-ঘরিয়া এবং দেহরী সমার্থবাচক শব্দ। দেব-ঘরিয়া শব্দটিই অঞ্চলভেদে দেঘরিয়া এবং দেহরি (দেহরিয়া) শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শব্দ দুটির মধ্যে প্রথমটি মানভূম-পশ্চিম বাকুড়া অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টি ধলভূম-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সুপরিচিত। তা ছাড়া পশ্চিম মানভূমে, গ্রামদেবতার পূজারীর নাম 'লায়'। পার্শ্ববর্তী রাঁচি জেলার মুন্ডাদের মধ্যে এই শব্দটি পূজারী অর্থেই পাওয়া যায়। সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী গ্রামেও 'গরামখান' বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রামদেবতা 'জাহের' অথবা 'বড়াম'। তাই 'গরামখান' গুলিও 'জাহের খান' বা 'বড়ামখান' নামে পরিচিত হয়।

এই জাহের খানের দেবতাও স্ত্রী দেবতা। জাহের বুড়ী বা বড়ামবুড়ী! এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে সীমান্ত বাংলার সব স্ত্রীদেবতাই বৃদ্ধা। তরুণী বা যুবতী দেবীর নাম কোন জায়গাতেই শোনা যায় না। বহুপ্রচলিত শীতলা এবং মনসা দেবীও বৃদ্ধা। তবে, যেখানে মূর্তিপূজার প্রচলন আছে, সেখানে শীতলা ও মনসাকে বৃদ্ধা রূপে নির্মাণ করা হয় না; কিন্তু গ্রাম-জনতার বিশ্বাসে যে শীতলা এবং মনসা অবস্থান করে, তারা বৃদ্ধাই। এর একটি বিশেষ কারণও আছে। অন্-আর্থভাষী সমাজে বৃদ্ধা নারীদের মর্যাদা তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়। বৃদ্ধা নারী

যে ডাইনী ছাড়া অন্য কিছু নয়, এ বিশ্বাস অত্যন্ত সাধারণ। এই বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে, লোলচর্মা, চক্ষু কোটরাগতা এবং দন্তহীনা কুরূপা অতিবৃদ্ধাদের বীভৎস চেহারা যে কিছু পরিমাণে দায়ী নয়, এ কথা বলা চলে না। শারীরিক শ্রমে অদক্ষ। এই সব বৃদ্ধাদের, আদিম মানুষের সমাজ অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করতো। কিন্তু, বাধাক্যে এই কুৎসিত রূপকেও তারা ভয় করতো। অতিবৃদ্ধ কুৎসিত পুরুষদেরও এইরূপ ভয় করা হত। অতিবৃদ্ধরা শুধু বয়ঃবৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধও। তাদের বহুল অভিজ্ঞতা সমাজের সাধারণ মানুষকে অনেক সময়ে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, অনেক সময়ে বিপদে কেলোছে। কলে সমাজের মধ্যে পদমর্যাদার সঙ্কে সঙ্কে সারা সমাজের ভয় এবং কৃতজ্ঞতাও এদের শক্তিশালী করে তুলেছিল এবং এদের দ্বারা আদিম পুরোহিততন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। নানাবিধ তুচ্ছতাক্ষ মন্ত্র প্রক্রিয়া, ষাট-বিজ্ঞায় এরা অগ্রগামী ছিল। এদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ যে বৃদ্ধ বেশি পরিমাণে সমাজের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখতো সে হত সিদ্ধপুরুষ অথবা ডাকপুরুষ। স্ত্রী-সিদ্ধাদের বলা হত ডাকিনী বা ডাইনী। ‘ড্যাক্কা’ নামে সুপরিচিত গ্রাম্য শব্দটির মূলেও ‘ডাক’ শব্দটি বিদ্যমান।

মানভূম-পশ্চিম বাকুড়া-খলভূম-ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশের যে পৃথক সাংস্কৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে, সেখানে গ্রামদেবতা সংখ্যাহীন। এই সংখ্যাহীন গ্রামদেবতার বেশির ভাগই গ্রামদেবী। কোন কোন জায়গায় গ্রামদেবীর সঙ্গে অথবা একক ভাবে, গ্রামদেবের সন্ধান-ও মেলে, কিন্তু দেবের সংখ্যা নগণ্য।

এই প্রসঙ্গে, সিনি-অস্তিক দেবীদের কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ গ্রামদেবী হিসাবে এদের সংখ্যা মোটেই কম নয়। এই দেবীদের সম্পর্কে ষাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই ‘সিনি’ শব্দটির অর্থ বুঝতে পারেননি। বলা বাহুল্য, ‘সিনি’ ‘বাসিনী’ শব্দেরই অপভ্রংশ। এই ‘সিনি’-অস্তিক দেবদেবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিতা দুয়ারসিনি (দ্বারবাসিনী)। প্রত্যেক গ্রামের গ্রামস্থানেই দুয়ারসিনির অধিষ্ঠান। মূল গ্রামদেবীর দ্বারপালিকা রূপে এই গ্রামদেবীর পূজা সবচেয়ে আগে করতে হয়। এই দ্বারপালিকা দেবী-ও বৃদ্ধা : দুয়ারসিনি বুড়ী। দুয়ারসিনি দেবী কোনো কোনো জায়গায় একক রূপেও অবস্থান করে। বিভিন্ন গ্রামের নামের সঙ্গে অথবা বিভিন্ন উপজাতিক গোষ্ঠী-নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সিনি (বাসিনী) অস্তিক দেবীদের আবির্ভাব ঘটে। ভেদাসিনি, মাতা-সিনি, মালবাধিসিনি, মদনাসিনি, লোখাসিনি, কয়াসিনি, কালাসিনি, মণ্ডলাসিনি,

কুদরাসিনি প্রভৃতি গ্রামবাসীদের অধিকাংশই গ্রাম-গণ্ডীর দেবতা। ছয়ারসিনি, কুদরাসিনি প্রভৃতি দেবীরা সমস্ত অঞ্চলেরই দেবী। ছয়ারসিনি সমস্ত গ্রাম-দেবতার খানেই থাকতে বাধ্য। ছারবাসিনী দেবী, কুদরাসিনি মূলতঃ কুদরা ভূত। সাঁওতাল দেবতা। ধনকুদরা নামক ধনদাতা শিশুদেবতার কাহিনী সীমান্ত বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। এই কুদরা-ই ছয়ারসিনি প্রভৃতি দেবীদের নাম-সাদৃশ্যে কুদরাসিনিতে পরিণত হয়েছে। কুদরা ভূত আসলে, ধনরক্ষক যক্ষ-শিশুর আদিমতম সংস্করণ।

এর পরে চণ্ডীদেবীর কথা বলা যেতে পারে। ওরাও বনদেবী চণ্ডী বোঙার সঙ্গে এই দেবীর সাদৃশ্য অনেক। মানভূম অঞ্চলেই এই চণ্ডী-নামক গ্রামদেবীদের প্রভাব প্রায় সীমাবদ্ধ। খেলাই চণ্ডী, মেলাই চণ্ডী, সানাই চণ্ডী প্রভৃতি গ্রামদেবী এই অঞ্চলে সুপরিচিত। সীমান্ত বাংলার সংখ্যাহীন গ্রামদেবীর মধ্যে কেঁদুয়াবুড়ী (কেন্দুয়াকবাসিনী) ডাকাই বুড়ী (ডাকবতী-ডাকিনী), সাতবহিনী, মহামাই, জাহির বুড়ী, বড়ামবুড়ী, শিলাই বুড়ী প্রভৃতি গ্রামদেবীদের সম্পর্কে অনেক লোক-কথা প্রচলিত। এই সব লোক-কথার মধ্যে সাদৃশ্য অনেক।

পূর্বেই বলেছি যে পুরুষ গ্রামদেবতাদের সংখ্যা অনেক কম। এদের জন্ম সাধারণতঃ কোনো 'গ্রামখান' নির্দিষ্ট করা থাকে না। তবু যে সব পুরুষ গ্রাম-দেবতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আদিমতম গ্রামদেবতা ধর্ম ঠাকুর। তাছাড়া-ও 'কাল-বেতাল' ভৈরব, কালিয়া বদা (কালো পাঁঠা), কালিয়া ষাঁড় প্রভৃতি গ্রামদেবতার খান কোনো কোনো গ্রামে আছে। আর যে সমস্ত পশু-দেবতা বা অন্তান্ত ভূত প্রেত, ডাক-ডাকিনী জাতীর দেবতা আছে, তাদের জন্ম নির্দিষ্ট কোনো স্থান না থাকলেও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এদের ডাক পড়ে। বাসুংবীর, মহি বাসুর, হুমানবীর, মনপাটচেলা পাটমসনা, লোখা-লোখানী, প্রভৃতি এই শ্রেণীর দেবতা।

সর্বাত্মে এই গ্রামদেবতার পূজা; তারপরে অন্ত দেবতার। আদিম সংস্কৃতির এই ধারাটি, আজো সীমান্ত বাংলার জনসমাজে প্রবহমান। সীমান্ত বাংলার জনবিশ্বাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র অচ্ছেদ্য।

কালোত্তীর্ণা ॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ

ত্রিদশকামিনী যদি হতে তুমি ললিতবনিতা
 লাভণ্যে বিদ্যাবস্তু শুভম্পতি ঋতম-হুহিতা,
 হুশিচিন্তা ছিল না কিছু ; নিশেবনী-রাত্রির জগতে
 যদি হতে সোমলতা মন্দির ঈক্ষণে সমুখিতা
 সমস্তা ছিল না কোনো, অন্তহীন সংঘাতের পথে
 মানবিক ইতিবস্তু মস্ত্রে পেতো বৈদেহী-শুচিতা
 কৈলাসে কিম্বর পেতো রূপসিদ্ধি তুঙ্গ-মনোরথে,
 স্বাশ্রয়ী আত্মিক দ্বন্দ্বে ঋদ্ধ হত আমার কবিতা
 যদি হতে প্রিয়তমে ত্রিদশের বিদ্যাবনিতা ॥
 অগ্নিসূক্তে বরতনু ঢেকে দিতো সংক্রান্তি-সঙ্গম
 সত্যযুগ-ভাষ্যতীর অগুলিপ্ত স্থাবর জঙ্গম
 তেজস্ক্রিয় কামনায় । রতিমুগ্ধ পলাশে অশোকে
 অনন্ত যৌবন স্বপ্নে তোমার মানস-বিহঙ্গম
 ব্রহ্মাণ্ড স্থপর্ণে ঢেকে উড়ে যেতো দূর সপ্তলোকে
 গায়ত্রীতে ভর্গে-স্মরি ; এত চিন্তা এত পরিশ্রম
 এ যুগে জন্মের ফলে ! ঘামঝরা ললিত নির্মোকে,
 বিদগ্ধ ! বাজিনীবতি ! ঋতমের দৈবপরাক্রম
 তোমাকে বাঁচাতো । কবি হত না বিতর্ক-পারঙ্গম ॥
 মীনকেতু নয় আর রক্তকেতু বৈষম্য-নাশন
 চৈতন্য-শিখরে দীপ্ত, ভ্রলতায় পুষ্প-শরাসন
 ভ্রুকুটিতে অভিব্যাপ্ত ; স্ফুরিত রক্তিম বিশ্বাধরে
 স্তমিত ঘোষণা কাঁপে প্রাণাণ্বেয়-সূক্ত উচ্চারণ
 স্বাতন্ত্র্যে সম্ভ্রান্ত-কায়া । শরীরিণী দেশদেশান্তরে
 গতি যার, পিতা তার সত্যসঙ্গ পার্থিব ঋতম্,
 লোকাযত চেতনায় তৃপ্তপ্রেম আনে ঘরে ঘরে
 তারি স্বপ্ন দেখি, সে যে, তুমি প্রিয়ে, আনো উজ্জীবন
 শান্তিময়ি ! শান্তিকামী ভালে দাও অমৃত-চূষন ॥

তরঙ্গে তরঙ্গে ॥ তরুণ সাত্যাল

স্বরূপ তোমার কীই বা প্রভু, পুষ্পজ্যোতির দঙ্কভাল
সেই তো আমার নিত্যকালের রক্তে দোলা তরঙ্গ হে
দিগন্তকে পরাও আলো

সূর্য তোমার দিক রাঙালো

মুগ্ধ করো তাও আঁধারে—

ঢাকলে যখন সাঁঝ-সকাল,

এই কী তোমার স্রুতি এবং দিক প্রকাশের আসঙ্গ হে ।

প্রভু, আমার নীলের হৃদে নিত্যকালের ডুব সাঁতার
আমার বুকে ঘুমিয়ে আছেন, কিংবা জেগে, কী রঙ্গ হে—

বর্ণভেদের গোলাপ জ্বায়

আমার ক্রদের ফুল তারি পায়,

সস্তা আমার আঁধার-আলোর

অন্ধ কারুশিল্পে চারু—

পাঁকের নিচে ডুবছি বলে পদ্ম হল এ অঙ্গ হে ।

ছাখো, আমার অতৃপ্ত এই শরীর মনের অন্ধকারে,
আমার নামের দুর্নামে যে তিনিই শিখায় পতঙ্গ হে

আমার পাপের ঘূর্ণি গহন

ডুবছি আমি, তাঁর এ-জীবন

এই প্রসাদে অশেষ হবে

অন্ধকারের শেষ পাথারে—

আমার বহিরঙ্গ বিলাস, কিন্তু আমি উলঙ্গ হে

নগ্ন হাতের স্পর্শে দোলে রক্তে যে তাঁর তরঙ্গ হে ॥

খরগোশ ॥ চিত্ত ঘোষ

খুঁজেছি অনেক
পাইনি পায়ের চিহ্ন
কোথায় পালালো সাদা খরগোশ
ক্ষিপ্ত এবং বন্য !

খুবই সাদা তার গায়ের কেশর.
গরম বুকের স্পন্দন
চঞ্চল, আহা, ছিঁড়ে চলে গেছে
রক্তের বন্ধন ।

বনে থাকে বলে মন নেই তার
আছে ছরস্তু গতি
সাদা বরকের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে
হঠাৎ লাকায় নদী ।

পলাতক সে কি ফিরবে না আর
পুরনো হাতের গর্তে
আমি শুধু তাকে মাঝে মাঝে চাই
একটু আদর করতে ।

আমাকে কেন যে এত ভয় তার
এত ভয় দিনে রাতে
তাকে তো কখনো মারতে চাইনি
বন্দুক নিয়ে হাতে ।

আমি শুধু তাকে দেখতে চেয়েছি
কখনো আঙুলে ছুঁয়ে
তার ধবধবে গায়ে ও মাথায়
একটু হাত বুলিয়ে ।

কোন আদরের কাছেই কি তার
বুনো স্বভাবের দোষ
কিছুতে যাবে না ? চিরদিনই সে কি
পাহাড়ের খরগোশ !

হিমের কান্না পাথরে গড়ায়
শ্বেত পাথরের মন
ঘাড় উঁচু করে ছ-দিকে দাঁড়ায়
পাহাড় পাহাড় বন ।

অনেকের চোখের জলের নদীর
উৎসে এক আগ্নেয়গিরি
যেখান থেকে ঢল আসছে
অবিশ্রান্ত নোনা জলের ।

বসন্তের বাসি ফুলের মতো
লক্ষ্মীর ছবি সিল্যুটের, কেননা,
তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে কবির
দৃষ্টি গেছে নোনা জলের বাঁক পেরিয়ে
প্রথম সৃষ্টির মনোহর রূপে
যেখানে আগ্নেয়গিরিটার
কৃষ্ণ চূড়ার কেন্দ্রে ধীরে ধীরে
গরীবের চির বসন্তের জন্ম
অন্ধকার বিদীর্ণ হচ্ছে কি হচ্ছে না ?

আগ্নেয়গিরি ॥ রামেন্দ্র দেশমুখ্য

আজ লক্ষ্মীর চোখে জল ঝরছে,
আশা দিয়ে বাঁধা যায় না বাঁধ ।
সারা সকাল থৈ থৈ দৃষ্টির
অবিরল বৃষ্টির এক বুক জলে
অগাধ নদীর প্রবল ঢেউ ।
কেউ জানে না, গভীর বেদনা তার,
ময়নামতীর যুবতী মেয়ে লক্ষ্মীর,
দুঃখিনী যার সারা সকাল
পূজার সুখের দিনে শতধারা ।

আমাদের সুখী কবির। হয়তো
ঐ চোখের জলকে দেখে
নেশায় বুঁদ হয়ে ভাবছেন,
আহা, মেঘের মতো অবিকল চোখে
কান্না তো নয়, গজমোতির মালা,
যুবতী বধূটির মুখ
হোক না অভাবের মেঘে মেলা,
তবু বসন্তের বন-মেখলা নদীতে
চাঁদের চোরা পূর্ণিমা ।

আর ফুটন্ত রাগে মনোরমা
লক্ষ্মীর বেদনার পটভূমে দামাল
আমি দেখছি সীমাহীন দুঃখের
অমাবস্তার কৃষ্ণ জোয়ারে
বিদ্যুতের প্রহারে প্রহারে উষ্ণ

(শেষাংশ ১২৬ পৃষ্ঠায়)

ডায়েরির পাতায় : ১৩৬৪ ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়

চিরকাল চেনা পথে চলি

বাঁকা চোরা সামাজিক আত্মীয় ভুবন, ভালো-মন্দেতে মেশা

আকাঙ্ক্ষিত প্রসন্ন গন্তীর মায়া লাগা ।

খোলা চোখে দেখা পাই প্রসাধিত সংসারের ধ্যান

ঘিরেছে আদরে ঘরে ছুরন্ত দামাল

চিরযাত্রী অতিথিকে, তীর্থ খোঁজা কাঙাল বিধবা

নদীর ওপারে বাজে শাঁখ ঘণ্টা

ধন্য ধূলি মেখে গিয়েছে সবাই চলে দূর দেশে ।

মাছি, হাঁস, নোংরা কুকুরের ছানা, সব থাকে, যায়

ব্রষ্ট পায়ে ঘরে ফেরে মাতাল দোকানী, ছোট ছেলে ছড়া কাটে

দীর্ঘতর জীবনেরা চিত্রবৎ স্থির ।

নির্ধারিত একই নাট্য, দামী কিংবা কম দামী কারো

প্রাণের ঘটনা, প্রাগৈতিহাসিক বসন্তের ফেরিওয়ালা

(কী যে বোকা ভিখেরী-গাছটা) । সানাইয়ের প্রাণলগ্ন সুর

কিশোরী মেয়ের হাতে শাঁখা দেয়, সর্বজয়ী হাসি বুড়িমার চোখে কাঁপে

না জেনে বাচাল হরিধ্বনি দিয়ে ফেরে পাড়ার ছেলেরা ।

প্রবর্তিত ঋতু আসে ডাক দিয়ে, সর্বনাশী লতা, দেওয়ালের কোণ নিয়ে

গা বাড়ায়, পৌছুবে অকালে নড়বড়ে খুঁটিটায়, যেন তারি পারে

বৃহৎ বাঁচার বিশ্ব । হয়তো এসব তুচ্ছ নিয়মের চলা, না দেখলে ভালো হত

প্রামাণ্য খবর, ছন্দ ছেঁড়া পৃথিবীর আঙিনায় নেই, মৃন্ময় সমাজে

স্পর্শ নেই পরমার । তবু নিত্য দিন আর ব্যাপ্ত নিশীথিনী

আসে যায় । প্রাণলোকালয়ে রাজ্য গড়ে যত তুচ্ছ সব প্রাণী ।

একতলা

৩ ৩ এক ৩ ৩

রোজকার মতো আজও ভোর হল।

কিন্তু আজকের ভোর এই তিনতলা বাড়িটার অল একটা চেহারা নিয়ে এসেছে। তিনতলার ছাদের ওপরে অতদিন এসময়ে প্রণবশ ডান উরুতে নকল পা লাগিয়ে ডাঙ্কেল মুণ্ডর আর চেষ্ট-একনপ্যান্ডার নিয়ে ব্যায়াম করে। আজ সে নেই। চিলেকোঠার বাসিন্দা অমিয়নাথ চিলেকোঠার তিনধাপওলা সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপটিতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তিনতলার পেছনদিকের ফ্ল্যাটের সুবিমল অতদিন এ-সময়ে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে একতলার কলে নেমে আসে। আজ সে বিছানার ওপরেই পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বসে হাট তুলছে। দোতলার অরবিন্দ ঘোষাল এই ভোরেই বাজারের খলে আর গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে বেরিয়ে যায়। আজ তার ঘরের দরজা এখনো বন্ধ। দোতলার সামনের ফ্ল্যাটের মাষ্টারনী আশালতা অতদিনের মতো এখনো উলুনে আঁচ দেয়নি; টেবিল-ল্যাম্প জালিয়ে এই অসময়ে কাকে যেন চিঠি লিখতে বসেছে। একতলা ও দোতলার মাঝখানে গ্যারেজের ওপরে যে ঘরটিতে পিয়ন রামকান্ত চারটি ছেলেমেয়ে ও বো নিয়ে থাকে সেখান থেকেও আজ

এখনো ছেলেমেয়ের কারা ও চোঁচামেঁচি শোনা যাচ্ছে না। রামকান্তর বড়ো মেয়ে মালতী অন্তর্দিন এ সময়ে কতকগুলো এঁটো বাসন নিয়ে একতলার কলে গিয়ে বসে। আজ সে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে নিচের সরু গলিটার দিকে তাকিয়ে আছে। গলির এই অংশটুকু অন্তর্দিন এ-সময়ে শুকনো থাকে, ভেজে আরো পরে, ঝাঁঝালো গন্ধটা উঠতে আরো কিছুক্ষণ সময় লাগে। আজ সারা গলিটা জলে আর কাদায় থৈ থৈ করছে। গ্যারেজের কয়লার দোকানের কুলি সুদর্শন আজ এখনো হুম থেকে ওঠেনি। তিনতলার সামনের দিকের ফ্ল্যাটের কৃপানাথ রোজকার মতো আজও ঘুমোচ্ছে। তার শোবার ঘরের জানলার ফিকে নীল পর্দা অন্তর্দিনের মতো ঘরের ভেতরকার শিলিং ফ্যানের হাওয়ায় তির তির করে কাঁপছে না।

চিলেকোঠার সবচেয়ে উঁচু ধাপটিতে বসে আছে অমিয়নাথ। এই বাড়ির ছাদে উঠলে কলকাতার গোটা আকাশটা চোখে পড়ে। সেই আকাশে এখন রঙের ছোপ ধরেছে। পাড়ার রেডিওগুলো এখনো তারস্বরে বেজে ওঠেনি, কাজেই পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। এই পাখি-ডাকা ভোরে রঙ-ধরা আকাশের নিচে চুপচাপ বসে আছে অমিয়নাথ। শেষরাত্রে গোটা বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যে তোলপাড় কাণ্ড হয়ে গেল তাতে অমিয়নাথের কিছু আসে যায়নি। সে আছে সকলের নাগালের বাইরে। হঠাৎ যদি কোনো কারণে এ বাড়ির একতলাটা মাটির ভেতরে সঁদিয়ে যায় তাহলেও তার ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ থেকে সরাসরি বোমা না পড়া পর্যন্ত সে নিশ্চিত। একতলার আগুন তিনতলার ছাদে পৌঁছবার অনেক আগেই ছাই হয়ে যাবে, একথা তার জানা ছিল। কাজেই ছাদের আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমার ছবি দেখার মতো সে গোটা ব্যাপারটাকে উপভোগ করেছিল। সে ধরেই নিয়েছিল যে তার কিছু করবার নেই। ভয় পাবারও কিছু নেই। আগুনের শিখা একতলা দোতলা তিনতলার বাধা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত চিলেকোঠার ঘরটাকে গ্রাস করতে এলে সে বড়ো জোর বস্ত্রপাতির ব্যাগ আর যন্ত্রের মডেলটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দুপা সরে দাঁড়াত।

হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে গালে হাত দিয়ে বসে রইল অমিয়নাথ। অন্তর্দিন এ-সময়ে সে তার যন্ত্রের মডেল নিয়ে কাজ করতে বসে। অল্প কোনো দিকে হাঁশ থাকে না। ভোর হবার খবর পাখির ডাকে আর আকাশের রঙে

এমন ভাবে শোনা ও দেখা যেতে পারে তা সে আগে কোনোদিন জানতে পারেনি। আজ মনে হচ্ছে, ভোরবেলার এই সময়টুকু দিন ও রাত্রির অন্ত সমস্ত সময় থেকে একেবারে আলাদা। পুরোপুরি দিনও নয়, পুরোপুরি রাত্রিও নয়। হুরের একটা আশ্চর্য মেশাল। ভোরবেলার এই সময়টুকুতে নিজের মনকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা চলে যেন। অনেক কথা মনে পড়ছে অমিয়নাথের।

খোলা ছাদের ওপরে কয়েকটা চড়ুইপাখি হটোপাটি করছিল। এমন ভাবে তাকিয়ে রইল অমিয়নাথ যেন এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। কালও প্রণবেশ এই খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করেছিল। প্রণবেশকে ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনি অমিয়নাথের। প্রণবেশের আশেপাশে কয়েকটা চড়ুইপাখি এমন হটোপাটি করেছিল কিনা, সে-খবরটা এখন তারি জানতে ইচ্ছে করছে অমিয়নাথের।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না যে প্রণবেশ আজ আর ছাদে আসবে না। কাল, পরশু বা তার পরের দিনও নয়। এমনও হতে পারে, প্রণবেশ আর কোনো দিনই আগের মতো খোলা ছাদে ব্যায়াম করতে আসবে না।

অমিয়নাথ নিজেও হক্চকিয়ে গিয়েছিল। ততোক্ষণে সোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল চারদিকে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। সরু আর মোটা গলায় অনেক মানুষ চিংকার করছিল একসঙ্গে। সে-চিংকারের কোনো ভাষা ছিল না, বোবা গোঙানির মতো। তারই সঙ্গে মিশেছিল অন্য অনেক রকমের আওয়াজ। কারা যেন অনবরত দরজা-জানলা বন্ধ করছিল আর খুলছিল। কারা যেন অনবরত মেঝের ওপরে ছুটোছুটি করছিল। কারা যেন অনবরত সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছিল। আর সব মিলিয়ে শব্দের একটা ঝড় কাঁপিয়ে তুলেছিল এই তিনতলা বাড়িটাকে। পায়ের তলায় সেই কাঁপুনি টের পেয়েছিল অমিয়নাথ।

তবুও অমিয়নাথ নিচে নামেনি। চারদিকে এত হৈচৈ আর ছুটোছুটি— কিন্তু তার সঙ্গে কোনো কিছুর সম্পর্ক ছিল না যেন। সে শুধু নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কখন চিংকার থামবে, ছুটোছুটি বন্ধ হবে, পোড়া গন্ধটা মিলিয়ে যাবে।

আর ঠিক এমনি সময়ে সমস্ত সোরগোলকে ছাপিয়ে তিনতলার সিঁড়িতে ঠক্-ঠক্ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শব্দটা কিসের হতে পারে সেটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রণবেশ।

প্রণবেশকে ক্লাচ বগলে দিয়ে চলতে দেখে অবাক হওয়া উচিত ছিল অমিয়নাথের। প্রণবেশের নকল পা তার শরীরের স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল আর অভ্যেস ও চেষ্টায় প্রণবেশ এমন স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারত যে ক্লাচ বগলে প্রণবেশের এই চেহারা সহজে কল্পনা করা যেত না। কিন্তু নিচের তলার সোরগোলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে অন্ধকার ছাদের ওপরে ক্লাচ বগলে এসে দাঁড়াতে এই ক্লাচছুটোকে দেখেই প্রণবেশকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিল অমিয়নাথ।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রণবেশ বলেছিল, ‘অমিয়দা, আপনি এখানে! নিচে চলুন, বাড়িতে বোধ হয় আগুন লেগেছে।’

অমিয়নাথ একটুও অবাক হয়নি। উত্তেজিতও নয়। খুব স্বাভাবিক স্বরেই জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কোথায়?’

‘একতলার গুদামে।’ কথাটা বলে প্রণবেশ বগল থেকে ক্লাচছুটো সরিয়ে এনে ক্লাচের ওপরে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিল :

‘আপনার কাছে টর্চ আছে অমিয়দা?’

‘টর্চ? না তো। কেন?’

‘বাড়ির সমস্ত আলো নিবে গেছে। আপনি নিচে আসুন, আমি যাই।’

প্রণবেশ ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

‘তোমার পা কোথায় গেল প্রণবেশ?’

‘পরবার সময় পাইনি।’

‘ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়েছ?’

সিঁড়িতে বাক নেবার মুখে একটুখানি দাঁড়িয়ে প্রণবেশ বলেছিল, ‘না যাচ্ছি।’

অমিয়নাথের এখন মনে হচ্ছে যে প্রণবেশকে বলা উচিত ছিল, ‘তুমি গিয়ে তোমার পা পরে নাও প্রণবেশ, ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেবার জন্তে আমি যাচ্ছি।’

এই তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়িটায় বারোয়ারী ছুটোছুটির কাজগুলো প্রণবেশই করে।

ব্যাপারটা সকলের কাছে এত স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে একবারও কারও মনে পড়ে না যে প্রণবেশের একটা পা নেই।

গত রাতের ঘটনাগুলো একের পর এক মনে পড়তে লাগল অমিয়নাথের।

ছাদের সিঁড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছিল অমিয়নাথ। ঠক্ ঠক্ শব্দটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্লাচ বগলে দিয়েও কত তাড়াতাড়ি নিচে

নাথতে পারে প্রণবেশ ! দু-দুটো আস্তো পা নিয়ে অমিয়নাথও বোধ হয় এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না ।

নিচে থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসে : ‘সরে যা এখান থেকে, সরে যা !’ দোতলার অরবিন্দ ঘোষালের পাগল বৌ চিৎকার করছে ।

তারপরেও অমিয়নাথ ছাদের আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, একতলার গুদামে আগুন লেগেছে—তা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি ! কায়ার ব্রিগেডের লোকজন এসে চোখের পলকে এই আগুন নিবিয়ে ফেলবে । প্রণবেশটা বন্ধ পাগল ।

গলির উলটো দিকের দোতলা বাড়িটার সবকটা জানলা বন্ধ হয়ে গেল ।

ছাদের আলসেয় ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে অমিয়নাথ । না, আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছে না । ধোঁয়াও নয় । বাতাসে শুধু একটা পোড়া পোড়া গন্ধ । কি আছে গুদামঘরে যে ভালোভাবে আগুন লাগতে এত দেরি হচ্ছে ? আরেকদিনের কথা মনে পড়ে । চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে দুটে আসতে যতোটুকু সময় লেগেছিল তার আগেই আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল আগুন । চোখ বুজলে এখনো সিনেমার ছবির মতো সে দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে । ছ-মাসের বাচ্চাটাকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে সবিতার সেই অর্ন্ত চিৎকার এখনো শুনতে পাচ্ছে অমিয়নাথ ।

না, সবিতা নয় । চিৎকার করছিল দোতলার সামনের ফ্ল্যাটের মাষ্টারনী আশালতা ।

‘পানু, তুই কোথায় চলেছিস ?’

ঠক করে একধাপ নিচে নেমে প্রণবেশ বলে, ‘নিচে যাচ্ছি দিদি ।’

‘নিচে ! নিচে কেন ? একতলার গুদামে আগুন লেগেছে—তাতে তোর কি ?’

এই পোড়া পা নিয়ে তুই কেন যাচ্ছিস ?’

প্রণবেশ ক্লাচছুটোকে পরের ধাপে ফেলেছিল । কথাটা শুনে ক্লাচ দুটো আবার তুলে আনে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলে, ‘আমার পা যে খোঁড়া সেটা তোমরা মনে না করিয়ে দিলে আমার মনে থাকে না দিদি ।’

ঠক ঠক শব্দে আরো তিন ধাপ নিচে নেমে সিঁড়ির বাঁক নেবার আগে আরেকবার একটুক্ষণের জন্তে থেমে প্রণবেশ বলে, ‘তুমি কিছু ভেবো না দিদি । আগুন তো আর ব্রিটিশ আমলের পুলিশের গুলি নয় যে ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেবে !’

‘অন্তত তোর পা-টা লাগিয়ে যা পাহু ।’

‘সময় নেই দিদি ।’

বাড়ির আলো বে নিবে গিয়েছে সে-ধবর সোয়গোল ওঠার অনেক আগেই জানতে পেরেছিল অমিয়নাথ ।

রাত্রিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল হঠাৎ । চোখ মেলে তাকিয়ে মনে হয়েছিল গোটা বাড়িটা ঝিমঝিম করছে । সাধারণতঃ সে একঘুমে রাত কাটিয়ে দেয় । নিজের কোনো অসুখ না থাকলে বা বাইরে থেকে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটলে তার ঘুম ভাঙে না । কাজেই, আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে এক পলকের জন্যে সে কিছুতেই মনে করতে পারে না, সে কোথায় কি অবস্থায় আছে । জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে, সবুজ একটা তারা জলজল করছে । আশ্চর্যে আশ্চর্যে চিলেকোঠার ঘরটা চোখের সাগনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আর ঠিক সেই সময়েই কান পেতে শুনে তার মনে হয়, গোটা বাড়িটা ঝিমঝিম করছে । যেন একটু আগেই কোথাও ভারী একটা জিনিস উঁচু থেকে পড়ে গিয়েছে আর সেই প্রচণ্ড আওয়াজের সবটুকু এখনো তিনতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি । অমিয়নাথের চোখ থেকে সমস্ত ঘুম উধাও হয়ে যায় ।

নাগালের মধ্যেই আলোর স্ফীচ । হাত বাড়িয়ে স্ফীচটা টিপেই উঠে বসতে হয় অমিয়নাথকে । আলো জ্বলেনি । মুহূর্তের জন্যে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হতে থাকে ।

কটা বেজেছে ? চোঁকি থেকে নেমে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো রিষ্ট-ওয়াচটা নামিয়ে নেয় । কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঘড়ির কাঁটারুটোকে ঠিক-মতো ঠাहर করতে পারে না । একবার মনে হয় তিনটে দশ । পরক্ষণেই দুটো পঁয়ত্রিশ । তারপরে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ । কানের কাছে এনে একবার দেখে নেয় ঘড়িটা ঠিক চলেছে কিনা । কিছুক্ষণ পরে মনে হতে থাকে, সে যে-অবস্থায় ঘড়ির কাঁটারুটোকে দেখতে চাইছে সে-অবস্থাতেই যেন দেখতে পাচ্ছে । সরে এসে জানলার সামনে দাঁড়িয়েও যখন বুঝতে পারা যায় না কটা বেজেছে তখন বাইরের আকাশের সবুজ তারার ওপরে রেগে ওঠে ।

সময় না জানলেই বা ক্ষতি কি ? কোনো রকমে আরেকবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই তো রাত শেষ । হাতড়ে হাতড়ে ঘড়িটাকে আবার দেওয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রেখে অমিয়নাথ শুয়ে পড়ে ।

তবুও ঘুম আসে না। অস্বস্তিতে বারবার চোখ মেলে তাকাতে হয় আর জানলার বাইরে সবুজ তারাটা চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, ঘরের আলো নিবে গেছে। ইচ্ছে করলেই সে ঘরের আলো জ্বালাতে পারবে না। এমনিতে ঘরে আলো জ্বলে তার কিছুতেই ঘুম আসে না। এখন ঘরে আলো জ্বালতে পারা যাবে না জেনে তার ঘুম ছুটে যায়।

কটা বেজেছে?

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেড়তলায় গিরে পিয়ন রামকান্তকে ডেকে তুলবে। একমাত্র রামকান্তকেই এ-সময়ে ডেকে তোলা যেতে পারে। একই কারখানায় কাজ করে তারা দুজনে।

সিঁড়ি দিয়ে চোরের মতো পা ফেলে অমিয়নাথ। খালি পায়ে নামছে। একটুও যেন শব্দ না হয়। এক-একটি ধাপে দাঁড়িয়ে পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে পরের ধাপটি ঠিক আছে কিনা। মাঝে মাঝে কান খাড়া করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করছে। চারদিকে এত রকমের শব্দ কেন? পাশের বাড়ির লোকগুলো শূতে যাবার আগে জলের কলটা বন্ধ করতে রোজই ভুলে যায় নাকি? পাড়ায় কি নতুন লোক ঢুকেছে যে কুকুরটা এভাবে চিংকার করছে? বড়ো রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি গেলে গলির এত ভেতরের এই তিনতলা বাড়িটা দিনের বেলাতেও কি এভাবে কাঁপে? পায়ের তলা দিয়ে মাঝে মাঝে কি ইঁহর চলাফেরা করছে? এ পাড়ার বাচ্চাগুলো কি রোজ রাতে এমন নিঃসাড়ে ঘুমোর? সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেও কি মানুষের গলায় একটু কান্না শোনা যাবে না? অরবিন্দ ঘোষালের পাগল বোঁটাও তো একবার চিংকার করে উঠলে পারে।

তিনতলায় পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। না, কান্না নয়। মেরেলি গলায় ফিসফিস করে কে যেন কথা বলছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে অমিয়নাথ।

‘রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, কাছে এসো। আমি তো বলছি আমি তোমারই। এসো, এসো বলছি।’

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কথা ভেসে আসছে। নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমিয়নাথ। তার মনে হয়, সে যেন ভয়ানক একটা অপরাধ করে ফেলেছে। চুরি করতে এসে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে যেন।

‘কেন বলো তো তুমি এমন করছ? আমাকে কতদিক সামলিয়ে চলতে হয় তা কি তুমি বোঝো না? এসো, তুমি অমন করে দূরে সরে থাকলে আমার কষ্ট হয়।’

অমিয়নাথের পা ছোটো মেঝের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে টেনেও একটি পাও সে তুলতে পারছে না।

‘আসবে না তো? বেশ!’

মাঝরাতে এই নিভৃত আলাপ শুনে চায় না অমিয়নাথ। এ ধরনের কথা সবিতাও তাকে অনেক বার বলেছে, অনেকবার! একদিন তো—

‘নাউ যদি আসবে তো আমার এই খোলা রাউজের বোতামগুলো নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়ে যাও। আমি চলে যাই।’

অমিয়নাথের পায়ের তলা দিয়ে ইঁদুরগুলো কি এখনো চলাফেরা করছে? এত শব্দ কিসের?

দেড়তলায় রামকান্তর কাছে আর যাওয়া হয় না। সে ভুলেই যায় কেন সে মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে নিচে নেমেছিল। ফিরে এসে দরজা খোলা রেখেই শুয়ে পড়ে।

সেই সবুজ তারাটা আর দেখা যাচ্ছে না। জানলার বাইরের আকাশটা সবিতার চলের মতো কালো। সেদিকে তাকিয়ে সবিতার কথাই ভাবে সে। ঘরের আলো জ্বালতে পারা যাবে কি যাবে না তা নিয়ে তার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কটা বেজেছে না জানলেও এখন চলে। তিন বছর আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ছে।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে সেজেছিল সবিতা। লাল ফুল তোলা হলদে রঙের রাউজের সঙ্গে লাল পাড় দেওয়া ফিকে নীল শাড়িতে সবিতার মতো মেয়েকেও ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। কপালে দিয়েছিল কুসুমের টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর। চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসে হঠাৎ মস্ত একটা ঢেউ হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। সাজতে জানত সবিতা আর ভালোও বাসত সাজতে।

আজ এতদিন পরে যদিও সেদিনকার সবিতাকে খুঁটিয়ে মনে করতে পারছে, সেদিন কিন্তু সবিতার দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি অমিয়নাথ। কয়েকটা বই আর যন্ত্রের মডেলটা নিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ আশেপাশে ঘুর, ঘুর করে হঠাৎ রেগে গিয়েছিল সবিতা : ‘ওসব যন্ত্রপাতি নিয়েই যদি থাকবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?’

চোখ তুলে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসতে চেষ্টা করেছিল অমিয়নাথ : ‘এই মডেলটা হয়েছে তোমার সতীন, না সবিতা?’

সবিতা ঝাঁজালো স্বরে জবাব দিয়েছিল, ‘থাক, থাক, আর ঠাট্টাতে কাজ নেই।’

অমিয়নাথ তবুও ঠাট্টা করেছিল, ‘মাটির ঢেলার মতো এই এক সতীনেই তোমার এত রাগ ! রক্তমাংসের সতীন হলে না জানি কি করতে ?’

‘চূপ করো তো দেখি !’ বলে সবিতা দুম দুম করে পা ফেলে পাশের দরে চলে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে এক অস্বাভাবিক কাণ্ড করেছিল সবিতা। অমিয়নাথ তখনো টেবিল-ল্যাম্প জালিয়ে তার পড়ার টেবিলের সামনে বই খুলে বসে আছে, হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সবিতার চিংকার শোনা গেল : ‘উঁহ-হঁ-হঁ ! গেলাম ! গেলাম !’ অমিয়নাথ ছুটে গিয়েছিল। ‘কী হয়েছে ?’ বলে সুইচ টিপে আলো জালতেই চমকে উঠতে হয়েছিল অমিয়নাথকে। সবিতার পরনের শাড়ি খসে পড়েছে, চুলগুলো এলোমেলো, আর জোড়া খাটের মস্ত বিছানায় কি এক যন্ত্রণায় ছটফট করছে সবিতা। ‘কী হয়েছে ?’ বলে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়তেই সাপের মতো ঠাণ্ডা আর নরম দুটো হাত জড়িয়ে ধরেছিল অমিয়নাথকে। তারপরেই সে কী খিলখিল হাসি। কোনো রকমে একবার নিশ্বাস নিয়ে অমিয়নাথ বলেছিল, ‘ইস, কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বোঁ তো ?’ অমিয়নাথের গালে গাল ঘষতে ঘষতে সবিতা বলেছিল, ‘তোমার কি কিছু মনে থাকে না ?’ ‘কি ?’ ‘আজ কত তারিখ বোঁ তো ?’ তখন মনে পড়েছিল অমিয়নাথের। এক বছর আগে এই দিনটিতেই বিয়ে হয়েছিল তাদের। সবিতার কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে অমিয়নাথ বলেছিল, ‘ছাড়, আলোটা নিবিয়ে দিই।’

● ● দুই ● ●

বিছানায় পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বসে হাই তুলছে সুবিমল। ভারি ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। তার জীবনে আজকের এই ভোরটি না এলেই যেন ভালো হত। একতলার আগুন তিনতলার কোণের দিকের এই ছোট্ট ঘরটিকে পুড়িয়ে ছাই করল না কেন ? বেঁচে থেকে লাভ কি ? কী নিয়ে সে বাঁচবে ?

না, আরো একটি দিন দেখা দরকার। দেখবে, রোজকার মতো আজ রাতেও রেখা তার ঘরে আসে কিনা। দেখবে, রোজকার মতো আজ রাতেও রেখা এসে বলে কিনা, আমি তো তোমারই।

মনে পড়ল, কাল রাত্রেও সে গদগদ স্বরে রেখাকে বলেছিল, ‘দেখলে তো, রাগ করি, যাই করি, শেষ পর্যন্ত না এসে পারি না।’

অৎচ তারপরে কতটুকুই বা সময়! রেখা চলে যাবার পরে তার গায়ের গন্ধটুকুও বাতাস থেকে মিলিয়ে যায়নি। তার আগেই পোড়া গন্ধটা পাওয়া গিয়েছিল। তার আগেই আগুন জ্বলে উঠেছিল।

রেখা বলেছিল, ‘হ্যাঁ, এসেছি, তবে অনেক সাধ্যসাধনার পরে। এবার ছাড়, যাউ।’
টোন্টের ওপরে আলতো ভাবে চুমু খেয়ে সুবিমল বলে, ‘আরেকটু থাকো রেখা। এই তো এলে।’

সুবিমলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রেখা বলে, ‘তোমাকে বরণ করিনি যে অমন শব্দ করে থাকে না! আমাকে বিপদে না ফেলে তুমি ছাড়বে না দেখছি।’

‘সব সময়ে মনে থাকে না রেখা।’

‘মনে খুবই থাকে। আমাকে আর বোকা বুঝিও না। এবার ঘুমোও।’

সুবিমল তবুও বলে, ‘আরেকটু থাকো রেখা! কতটুকু সময়ের জন্যে তোমাকে পাই বলা তো!’

মাথার চুল ঠিক করতে করতে রেখা বলে, ‘কেন, একই রাত্রে দু-বার এসেছি। দু-বারে কম সময় নাকি!’

‘আমি তোমাকে দিনে রাতে সব সময়ে পেতে চাই রেখা। শুণু রাত্রিবেলা চুপি চুপি দু-একবার পাওয়া নয়।’

‘আবার পাগলামি শুরু হল তো!’ বলে শাড়ির আঁচলটাকে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে রেখা একটুও শব্দ না করে দরজা খোলে।

রেখার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে সুবিমল। অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় রেখা একদিনও চৌকাঠে হাঁচট খায় না। লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে যাবার সময়েও ভুল জায়গায় পা ফেলে না কোনোদিন। মেরেরা বোধ হয় পারে। সব বিষয়ে ওদের হিসেবটা খুবই পাকা।

শরীরটা কেমন দুর্বল আর অবসন্ন মনে হচ্ছে সুবিমলের। কেউ যদি ওকে এ সময়ে একগ্রাস জল গড়িয়ে দেয় তো তারি খুশি হয় সে। কুঁজোটা ঘরের ঠিক কোন্ কোণে আছে তাও সুবিমলকে ভেবে মনে করতে হচ্ছে। রেখার কিন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে একদিনও দিকভুল হয় না।

মনে পড়ছে আজই সকালে একতলার কলে বাসন মাজতে মাজতে মালতী

বলেছিল, ‘সুবিমলদা, আপনার চোখদুটো এমন লাল হয়ে রয়েছে কেন ? রাস্তিরবেলা ঘুম হয়নি বুঝি ?’

প্রায় কৈফিয়ৎ দেবার মতো। সুরে সুবিমল বলেছিল, ‘হ্যাঁ, মানে, কাল রাত্তিরে খুব গরম পড়েছিল কিনা ।’

মালতী অবাক হয়ে বলেছিল, ‘গরম কোথায় সুবিমলদা ! আমার তো শীত করছিল ।’

‘তাই নাকি ?’ বলে একটু হাসতে চেষ্টা করেছিল সুবিমল ।

আর সুবিমলের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থেকে মালতী খুব নরম গলায় বলেছিল, ‘আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সুবিমলদা ! আপনার নিশ্চয়ই একটা চাকরি হবে । এত লেখাপড়া শিখেছেন আপনি !’

সুবিমল ফস করে বলে বসেছিল, ‘তোমার বাবাকে বলো না আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে ?’

মালতী চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেছিল, ‘আপনি ঠাট্টা করছেন সুবিমলদা !’

মালতীর বাবা রামকান্ত কোন্ এক কারখানার সামান্য পিয়ন মাত্র । কথাটা সুবিমলের মনে ছিল না । মালতীকে ঠাট্টা করতে চায়নি ও । কিন্তু সে-কথাটা মুখে বলতে গেলে আরো বড়ো ঠাট্টার মতো শোনাবে ভেবে চূপ করে গিয়েছিল ।

আচ্ছা, রেখা কি কখনো দিনের বেলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে ? ওর শরীরটা যে দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা কি কখনো চোখে পড়েছে রেখার ? কই, রাত্তিরবেলা ঘরে ঢুকে কোনোদিন তো বলেনি—‘সুবিমল, আজকাল তোমার শরীরটা এমন খারাপ দেখায় কেন বলো তো ?’ বললে খুশি হয় সুবিমল । একটু হেসে সে জবাব দেবে, ‘কই না তো ! আমি ভালোই আছি । সারাদিন তোমাকে কাছে পাই না কিনা তাই মন খারাপ থাকে । এখন তুমি একবার আলোটা জ্বালিয়ে ণ্ঠাখ !’ রেখা বলবে, ‘হ্যাঁ আলো জ্বালি আর পাড়াস্থল লোক আমাদের দেখুক !’ রেখা একদিন মিথ্যে করেও তার শরীরের জন্তে খানিকটা উদ্বিগ্ন জানালে পারে তো !

দিনের বেলা রেখাকে সামনা সামনি বড়ো একটা দেখতে পায় না সুবিমল । একদিন দীপুকে পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তোমার দিদি কি করছে দীপু ?’ দীপু বলেছিল, ‘জানি না তো, একবার দেখে আসব মাষ্টারমশাই ?’ সুবিমল বলেছিল, ‘না থাক ।’

আর একদিন দীপু নিজের খেকৈই বলেছিল, ‘জানেন মাষ্টারমশাই, আজ দিদি

জামাইবাবুর মাথা থেকে তিনটে পাকা চুল বার করেছে। জামাইবাবু বলেছে, আপিস থেকে ফিরে এসে দিদির মাথা থেকেও পাকা চুল খুঁজে বার করবে। খুঁজলে নাকি এমন দু-তিনটে পাকা চুল সবার মাথা থেকেই বার করা যায়। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আমার মাথাতেও পাকা চুল আছে ?

সুবিমল শুধু বলেছিল, 'তা থাকতে পারে।'

সেদিন কোনো কাজে মন বসাতে পারেনি সুবিমল। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মতো ভেবেছিল, এমন কোনো উপায় যদি জানা থাকত যাতে দীপুর জামাইবাবু নরসিংহের মাথার সমস্ত চুল উড়ে গিয়ে রাতারাতি টাক পড়ে যায় তাহলে বেশ হত কিন্তু। নরসিংহের মাথা থেকে পাকা চুল খুঁজে বার করার সাধ রেখার ঘুচে যেত চিরকালের মতো।

এক বছর আগে যখন রেখার সঙ্গে সুবিমলের রাত্রিবেলার সম্পর্ক হয়নি, যখন দিনের বেলাতেই রেখা এসে মাঝে মাঝে সুবিমলের সঙ্গে গল্প করত, সে সময়ে রেখা একবার কথায় কথায় বলেছিল, 'জানেন সুবিমলবাবু, পুরুষমানুষের চেহারায় দুটো জিনিস আমার সবচেয়ে বিচ্ছিরি লাগে। টাক আর ভুঁড়ি। ভুঁড়িওলা আর টাকওলা পুরুষমানুষ দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে আমার।'

সুবিমল হেসে বলেছিল, 'তাহলে আপনি মনে মনে কামনা করুন, নরসিংহবাবুর যেন কোনো কালেই খুব বেশি টাকা না হয়।'

চোখ কপালে তুলে আর ডানহাতের তর্জনী চিবুকে ঠেকিয়ে রেখা বলেছিল, 'ওমা ! কেন ?'

'একটা চলতি কথা শোন। যায় যে টাকার সঙ্গে টাক ও ভুঁড়ির সম্পর্ক আছে। ও দুটোকে বাদ দিয়ে টাকা হয় না।'

সেদিন নিতাস্তই কথার ওপরে একটা কথা বলেছিল সুবিমল। কিন্তু কথাটা সত্যি হয় না ! নরসিংহবাবুর নিশ্চয় অনেক টাকা আছে। নইলে আজকালকার দিনে কেউ পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে শালীর জন্তে গৃহশিক্ষক রাখে ? তাও সুবিমলের মতো শিক্ষকতায় অনভিজ্ঞ বেকার যুবককে ? নরসিংহবাবুর অনেক টাকা হোক ক্ষতি নেই, সেই সঙ্গে টাক ও ভুঁড়ি হলে খুশি হত সুবিমল।

* নরসিংহবাবুর যে অনেক টাকা আছে তার অস্তুত একটা প্রমাণ সুবিমলের জানা আছে।

কয়েক বছর আগে একদিন নরসিংহ সুবিমলকে বলেছিল, 'সুবিমলবাবু, রেখার কাছে শুনলাম আপনি নাকি চাকরি খুঁজছেন ?'

সুবিমল বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

নরসিংহ হেসে উঠেছিল : 'চেষ্টা করছেন ক্ষতি নেই। কিন্তু চাকরি পাওয়া আজকাল মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

ঋণিকক্ষণ সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে নরসিংহ বলেছিল, 'আমার ব্যবসাটা যদি আরেকটু বাড়াতে পারতাম তাহলে আমিই চাকরি দিতে পারতাম আপনাকে। মাষ্টারি করতে আপনার ভালো লাগে না বুঝি?'

নরসিংহের কাছে সেদিন বলতে পারেনি সুবিমল যে গৃহশিক্ষকতা করে জীবন কাটাতে এমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে কলকাতায় আসেনি। বর্ধমানে দেশের বাড়িতে তার পিসীমা ও ছোট চারটি ভাইবোন আছে। তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে তারা। মাস গেলে সে বড়ো জোর চল্লিশটা টাকা দেশের বাড়িতে পাঠাতে পারে। এই চল্লিশটা টাকায় পাঁচজন লোক কি ভাবে চালাচ্ছে সে কথা ভাবতে চেষ্টা করে না সে। অন্য অনেক দরখাস্তের সঙ্গে এই গৃহশিক্ষকতার চাকরির জন্মেও সে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। একবারও ভাবেনি যে দরখাস্তের জবাবে নরসিংহ সঙ্গে সঙ্গে তাকেই ডেকে পাঠাবে। চাকরিটা পেয়ে কিন্তু এই ভেবে খুশি হয়েছিল যে কলকাতা শহরে থাকা-খাওয়ার একটা আস্তানা পাওয়া যাচ্ছে। এবারে সে শহরে থেকে ভালো ভাবে চাকরির চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু পুরো একবছর চেষ্টা করেও কোনো চাকরি সে যোগাড় করতে পারবে না—একথা বর্ধমান ছেড়ে আসার সময়ে ভাবতে পারেনি। নরসিংহ যদি তাকে সত্যিই একটা চাকরি দেয় তো বেঁচে যায় সে। দেখা গেল কথাটা নরসিংহ ভোলেনি। কিছুদিন পরে নিজের থেকেই বলেছিল, 'সুবিমলবাবু, ব্যবসাটা বাড়াবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। আপনি যদি আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করেন তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই আমি আপনাকে একটা চাকরি দিতে পারব।'

উৎসাহিত হয়ে সুবিমল বলেছিল, 'বলুন কী করতে হবে। আমাকে দিয়ে আপনার যদি কোনো সাহায্য হয় তাহলে আমি প্রাণ দিয়ে তা করবার চেষ্টা করব।'

আখ্যাস দেবার ভঙ্গিতে নরসিংহ বলেছিল, 'না, প্রাণ দিতে হবে না। তার চেয়ে অনেক ছোট কাজ। আমাদের এই বাড়ির একতলার গুদামঘরটা আপনার নামে নিতে চাই।'

সুবিমলকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নরসিংহ আবার বলেছিল, ‘জানেন তো, আজকাল এমন সব আইনকানুন হয়েছে যে ভালো ভাবে ব্যবসা করতে হলে অনেক দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। আমি যদি দুটো পরসী লাভ করি তো দশদিক থেকে দশটা হাত সেই লাভের পরসী ছিনিয়ে নিতে চাইবে। কাজেই লাভের পরসী ঘরে রাখতে হলে দু-একটা ব্যাপার চোখের আড়ালে না সারলে চলে না।’

সুবিমল তবুও চুপ করে আছে দেখে তিনি তারপরে বলেছিলেন, ‘যাই হোক, আপনি ভাববেন না আমি আপনাকে দিয়ে কোনো অন্তায় কাজ করিয়ে নিচ্ছি। ব্যবসা বাড়াতে না পারলে আমাদের দেশের উন্নতি নেই। আপনি দেশের কাজই করছেন।’

সুবিমলকে এত কথা বলার দরকার ছিল না। চাকরি পাবার জন্তে সে মানুষ খুন ছাড়া আর সবকিছু করতে রাজি আছে। নিজের নামে একটা গুদামঘর ভাড়া নেওয়াটা তো খুবই সহজ কাজ।

তা ছাড়াও কথা আছে। নরসিংহ যদি তার নামে একটা গুদামঘর ভাড়া নেয় তাহলে নরসিংহের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক বজায় থাকবে। তাহলে, অন্য কোনো সুযোগ যদি না থাকে তো অন্তত এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই রেখার কাছাকাছি আসতে পারবে সুবিমল। যে ভাবেই হোক রেখার কাছাকাছি থাকতেই হবে সুবিমলকে। কিছুকাল আগে থেকেই রেখার সঙ্গে সুবিমলের অন্য একটা সম্পর্ক। আচমকা একদিন মাঝরাতে রেখা তার ঘরে ঢুকে তার কাছে প্রেম জানিয়েছে। সুবিমলের পক্ষে ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখারও সময় হয়নি। তার আগেই মেয়েলি গন্ধে ও ছোঁয়ায় দিশেহারা হয়ে চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটিয়ে বসেছে। তারপর থেকে প্রায় রোজ রাতেই ঘটছে। সারা মাসে বড়ো জোর দিন সাতেক রেখা আসতে পারে না। কিন্তু সেটা নিতান্তই রেখার দিক থেকে শারীরগত বাধা থাকে বলেই।

তারপরে একটু একটু করে সুবিমলের সমস্ত চিন্তা জুড়ে বসেছে এই একটি মেয়ে। পিসীমার বা ভাইবোনের কথা আর বিশেষ মনে পড়ে না। মনে পড়লেও বেশিক্ষণ মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। শুধু ভাবে, আগের রাতে রেখা কতবার এসেছিল আর কতভাবে সে তাকে আদর করেছিল। এমন খুঁটিয়ে ভাবতে পারে যে জাবর-কাটার মতো একটা আত্মদে বিমবিসম করে ওঠে শরীরটা। কেমন নেশার মতো মনে হয়। বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করে। আর

অস্থির ভাবে অপেক্ষা করে, কখন আবার রাত্রি আসবে, ভেজানো দরজাটা ঠেলে কখন আবার রেখা এসে ঘরে ঢুকবে, একতাল কাদার মতো রেখাকে ঘেঁটে চটকিয়ে কখন আবার আদর জানাতে পারবে। পরিচিত খাবারের চিন্তা থেকেও অনেক সময়ে তার সত্যিকারের আশ্রয়দটা পাওয়া যেতে পারে। সুবিমলেরও সেই অবস্থা।

সুবিমল একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ‘তোমার কিন্তু সাহস কম নয় রেখা!’ অন্ধকারে সুবিমল দেখতে পায়নি যে কখাটা শুনে রেখা চোখ ঘোঁচ করে তাকিয়েছিল।

‘কেন? একথা বলছ কেন?’

‘কোনোদিন যদি ধরা পড়ে যাও?’

‘না, পড়ব না।’ নিশ্চিন্ত সুরে জবাব দিয়েছিল রেখা।

‘আচ্ছা কোনোদিন যদি এমন হয় যে তোমার পাশের ঘরের মানুষটি—’

‘এখন আর কোনো কথা নয়।’ বলে রেখা সুবিমলকে জড়িয়ে ধরে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় সুবিমলের ঠোঁট বন্ধ করে দিয়েছিল।

দিনের বেলা বড়ো একটা দেখা হয় না। একদিনের একটা ঘটনার পরে সুবিমলও আর দেখা করার চেষ্টা করে না। সেদিন সকাল থেকেই ভীষণ মাথার ব্যথা হচ্ছিল। দীপু পড়তে এসে ফিরে গেল। দীপুকে পড়াবার মতো শরীরের অবস্থাও ছিল না। সুবিমল আশা করেছিল, দীপুর কাছে থবর শুনে রেখা নিশ্চয়ই একবার খোঁজ নিতে আসবে। রেখার হাল্কা পায়ের পরিচিত শব্দটা শোনার জন্যে সুবিমল কান খাড়া করে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যে শব্দটা ঘরের দরজার সামনে এসে থেমেছিল তা হাল্কা পায়ের নয় ভারী জুতোর।

নরসিংহ জিজ্ঞেস করেছিল, ‘সুবিমলবাবু, আপনার শরীর খারাপ শুনলাম?’

‘হ্যাঁ।’

‘মাথা ধরেছে?’

‘হ্যাঁ।’

সুবিমলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নরসিংহ হঠাৎ বলেছিল, ‘আপনাকেও এই রোগে ধরেছে দেখছি! ক-রাত্রি ঘুম হয়নি?’

প্রায় চমকে উঠেছিল সুবিমল। রাত্রিবেলা সুবিমলের যে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে সে থবর তো জানার কথা নয় নরসিংহের!

‘ঠিক আছে। আমি আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওষুধটা খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিন, দেখবেন শরীর ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে।’

একটু পরে দীপু এসেছিল ছোটো ওষুধের বড়ি নিয়ে।

‘মাষ্টারমশাই, জামাইবাবু এই ওষুধটা আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছেন।’

ওষুধের বড়ি ছোটো হাতে নিয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করেছিল, ‘দীপু, তোমার দিদি কি করছে?’

‘দিদি জামাইবাবুর টাই বেধে দিচ্ছে।’

মাথার যন্ত্রণাটা আরো বেড়ে গিয়েছিল যেন।

‘ওষুধ খাবেন না মাষ্টারমশাই?’

‘ই্যা খাব। আচ্ছা দীপু, তোমার জামাইবাবু কাজে বেরিয়ে গেলে তোমার দিদিকে একবার আসতে বলবে?’

‘বলবো।’

দীপু চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে যে শব্দটা এসে সুবিমলের দরজার সামনে থেমেছিল তাও হাল্কা পায়ের নয়, কাঠের খড়মের। একবার তাকিয়েই চোখ বুজেছিল সুবিমল। ঘোমটা-টানা রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে রোজ রাত্রেই চেনা মুখটাকে খুঁজে পায়নি।

‘কিছু চাই?’ অনেক দূর থেকে রেখার গলার স্বর ভেসে এসেছিল।

‘জল।’

ওষুধের বড়ি ছোটো খেয়ে সামনের দিকে তাকাতেই সুবিমলের মনে হয়েছিল, একটা নয়, ছোটো রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সারাদিন প্রচণ্ড একটা ঘুমের পরে সন্ধ্যাবেলা দীপুকে পড়াতে বসে সুবিমল বলেছিল, ‘তোমার জামাইবাবু চমৎকার ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন কিন্তু।’

দীপু বলেছিল, ‘বাঃ, চমৎকার হবে না! জামাইবাবু নিজেও রোজ এই ওষুধ খান যে!’

তারপর থেকে দিনের বেলা রেখাকে চোখে দেখার ইচ্ছে হলে রেখার সেই ঘোমটা-টানা মূর্তিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে-রেখাকে ভুলে থাকতেই চায় সুবিমল।

অন্ধকার ঘরে চুপটি করে বসে ভাবতে ভাবতে আরো অনেক ঘটনা মনে পড়েছিল সুবিমলের। রেখা চলে যাবার পরে রোজ রাত্রেই মনে পড়ে। ঘটনাগুলো চোখের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ায় যেন। আর প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে

থেকে এক-একটি রেখা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, রেখাকে সে চিরে চিরে টুকরো-টুকরো করে দেখতে পাচ্ছে। রেখার কোনো কিছুই আর চিনতে বাকি নেই।

তবুও রেখার সেই ঘোমটা-টানা মূর্তিটা কিছুতেই ভোলা যায় না। রাত্রিবেলার রেখার কথা ভাবতে গিয়ে দিনের বেলার রেখা পাশে এসে দাঁড়ায়। মনে হতে থাকে, সেদিনকার অসুস্থ চোখে সেই যে দুজন রেখাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল, সেই দেখাই সত্যি।

চেনা রেখার পাশে অচেনা রেখা এসে দাঁড়ালেই নিজেকে বড়ো একা আর অসহায় মনে হতে থাকে। নিজের ওপরে রাগ হয়। রাগ হয় নিজের ব্যক্তিরহীনতার ওপরে, সামান্য একটু জোয়া আর কথাতেই কামনায় জ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়ার ওপরে। শরীরটাকে নোংরা আর অশুচি মনে হতে থাকে।

একটু চান করতে পারলে ভালো হত। বাইরে সিঁড়ির দিকে এ-ঘরের একটা দরজা আছে। সেই দরজা খুলে অনায়াসেই একতলার কলে যাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বড়ো বেশি পরিশ্রমের ব্যাপার। সময়েরও। তার চেয়ে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল চোখেমুখে ছিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

তারপরেও সুবিমল চুপ করে বসে থাকে। সে কি চোখ বুজে আছে? এত অন্ধকার কেন?

হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচটা খুঁজে বার করে। সুইচ টেপে।

সুবিমল কি অন্ধ হয়ে গিয়েছে?

● ● তিন ● ●

না, তারপরেও ঘুম আসেনি অমিয়নাথের। উঠে বসেছিল। তিনতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শোনা কথাগুলো মনে পড়েছিল আবার। নরসিংহের সঙ্গে আলাপ আছে অমিয়নাথের। নরসিংহকে দেখে কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে রাত্রিবেলা সে এমন এক মান-অভিমানের পালার নায়ক হতে পারে।

নরসিংহের সঙ্গে প্রথম আলাপ প্রণবেশের মারফৎ। প্রণবেশ একদিন বলেছিল; 'আপনি বড়ো একা একা থাকতে ভালোবাসেন অমিয়দা!'

অমিয়নাথ বলে, 'আমার মতো বয়স হোক তখন তোমারো মনে হবে, পৃথিবীতে যে মানুষ যতো বেশি একা সে ততো বেশি সুখী। মানুষের সঙ্গ পেতে হলে বড়ো বেশি দায় দিতে হয় প্রণবেশ।'

প্রণবশ ছেলেরাঘরের মতো বলে, 'আমি তো একা থাকতে হলে হাঁপিয়ে উঠি। হাতের কাছে কথা বলার লোক না পেলে রাস্তায় বেরিয়ে যাই। তবু তো মানুষজনের মুখ দেখা যায়।'

অমিয়নাথ একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, 'রাস্তার মানুষের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলো না নিশ্চয়ই?'

প্রণবশও হাসে : 'তাও বলি। আপনি কখনো কোনো অপরিচিত মানুষের সঙ্গে মনে মনে কথা বলেছেন অমিয়দা? হাসবেন না। আপনি আমার কথামতো চেষ্টা করে দেখুন, তিনদিনের মধ্যে আপনার নেশা ধরে যাবে।'

অমিয়নাথ বলে, 'তোমার এই নেশার ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলো তো শুন।'

উৎসাহিত হয়ে প্রণবশ বলে, 'এই যেমন ধরুন আপনার কথা। আপনি এখানে আসার পরে তিনদিন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগই আমি পাইনি। সব সময়ে আপনার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতাম। আপনি কি ভাবছেন ওই তিনদিন আমি চুপচাপ ছিলাম? আপনার সঙ্গে কথা বলিনি?'

অমিয়নাথ হেসে বলে, 'বলেছিলে নাকি? একটু নমুনা দাও তো শুন।'

একবার কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে প্রণবশ বলতে শুরু করে, '(স্বাভাবিক গলায়) কয়েকদিন ধরেই ভাবছি আপনার সঙ্গে আলাপ করব, কিছুতেই আর সুযোগ হয় না। (মোট গলায়) ও! (স্বাভাবিক গলায়) আপনার বাড়ির লোকজনদের আনবেন না? (মোট গলায়) না! (স্বাভাবিক গলায়) এখানে কোনো অসুবিধে হলে আমাদের বলবেন। (মোট গলায়) আচ্ছা। (স্বাভাবিক গলার চেয়ে একটু খাদে) আপনাকে দেখতে ঠিক আমার দাদার মতো।'

অমিয়নাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার দাদা আছে নাকি? জানতাম না তো?'

প্রণবশ হাসিমুখে বলে, 'না, নেই। কিন্তু থাকলে ভালো হত। দিদির চেয়ে দাদা থাকা ভালো।'

'কিন্তু কথাটা শুনে আমি যদি তোমার দাদার সঙ্গে আলাপ করতে চাইতাম তাহলে তুমি কি বলতে?'

'আমি বলতাম, আমার তো দাদা নেই, তবে আপনাকে দেখে মনে হল আপনি

যদি আমার আপন দাদা হতেন তো বেশ হত। আমার কথাটা শুনে আপনি কি বলতেন ?

‘তুমিই বলো, আমি কি বলতাম ?’

‘আপনি নিশ্চয়ই বলতেন, আজ থেকে তুমি আমার ভাই হলে। তুমি আমাকে দাদা বলেই ভেবো।’

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয়নাথ হঠাৎ বলে ওঠে, ‘প্রণবেশ, আমি বোধ হয় ওকথাটা মুখ ফুটে বলতে পারতাম না !’

‘কেন ?’

‘কথাটা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারবে না।। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের বেশির ভাগ দুঃখকষ্ট আসে আত্মীয়তার বন্ধন থেকে।’

প্রণবেশ চুপ করে থাকে। আর প্রণবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয়নাথের নিজের ওপরে রাগ হয়।

এই অল্পবয়সী ছেলেটার কাছে সে কেন এসব কথা বলছে ? ছেলেটার এমনতেই একটা মস্ত দুঃখ আছে। একটা পা নেই ওর। ব্রিটিশ আমল শেষ হবার বছর দুয়েক আগে কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনের যে প্রচণ্ড ঢেউ জেগেছিল তারই একটা চিহ্ন রয়ে গেছে ওর এই অঙ্গহানির মধ্যে। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে ; সময়মতো পেনিসিলিন যোগাড় করা যায়নি। আই-এসসি ক্লাসের ছাত্র ছিল সে সময়ে। ইচ্ছে ছিল আই-এসসি পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। কিন্তু একটা পা না-থাকার জন্তে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশে ভর্তি হতে গিয়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই একটা রোধ চাপে। নকল পা লাগিয়ে অভ্যেসে আর চেষ্টার চলাফেরার দিক থেকে এমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে জানা না থাকলে সহজে বোঝা যেত না যে তার একটা পা নেই। তারপর থেকেই রোজ সকালে ব্যায়াম করে। কলেজের লেখাপড়ার দিকে আর মন বসাতে পারেনি। কিছুদিন চাকরির চেষ্ঠা করার পরে হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত খুচরো চারের ব্যবসা ধরেছে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি। সমস্ত খদ্দেরের সঙ্গেই তার কিছু না কিছু সম্পর্ক পাতানো চাই। কেউ দাদা, কেউ কাকা, কেউ মামা। এই দাদা-কাকা-মামার দলের অনেকেই আত্মীয়তার সুযোগ নেয়।

এতসব কথা প্রণবেশের নিজের মুখ থেকেই শোনা। সব কথা প্রণবেশ স্পষ্ট করে

বলেছে তা নয়। অনেকখানি অমিয়নাথকে বুঝে নিতে হয়েছে। অমিয়নাথ ভালো করেই জানে, প্রণবেশকে একদিন বুঝতে হবে যে এই পৃথিবী তার কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি অনাত্মীয় ও স্বার্থপর। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রণবেশের এই উপলব্ধি আসুক। তার আগে অমিয়নাথ কেন তার অভিজ্ঞতার অঙ্ককার দিয়ে প্রণবেশের চোখের সামনে থেকে ভালো-লাগার রঙীন আলোটুকু মুছে দিচ্ছে?

কথাটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে অমিয়নাথ বলে, ‘প্রণবেশ, তুমি বরং তোমার দাদা-কাকা-মামাদের গল্প বলো শুনি। এসব কথা থাক।’

প্রণবেশ বলে, ‘অমিয়দা, আপনি আমার ছুতো-জেঠার গল্প শুনেছেন?’

‘ছুতো-জেঠা!’

‘হ্যাঁ। এই বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটের নরসিংহবাবু? তাঁকে আমি বলি ছুতো-জেঠা। সামনে নয়, আড়ালে।’

অমিয়নাথ একটু অবাক হয়ে বলে, ‘প্রণবেশ, তোমাকেও যিনি আড়াল মানতে বাধ্য করেছেন, তিনি বড়ো সহজ লোক নন। তোমার ছুতো-জেঠার গল্পই হোক।’

• • চার • •

ছুতো-জেঠা কথাটা প্রণবেশ শিখেছিল তার দিদি আশালতার কাছে। কেউ যদি আশালতাকে কোনো ব্যাপারে ঠকায় বা তার কাছে কোনো অস্ত্রায় দাবি করে তাহলেই আশালতা মন্তব্য করে ওঠে, ‘এই এক ছুতো-জেঠার পাল্লায় পড়া গিয়েছে দেখছি!’

আশালতার বয়স যখন দশ আর প্রণবেশের দুই তখন তাদের মা গিরিবালা বিধবা হয়েছিলেন। স্বস্তর-শান্তিডেকে গিরিবালা চোখে দেখেননি। স্বামী নলিনীকান্তর কোনো আত্মীয়স্বজনের খবরও সঠিক ভাবে তাঁর জানা ছিল না। নলিনীকান্ত অসবর্ণ বিয়ে করেছিলেন, তার ওপরে ছিলেন নিতান্তই গরীব। সেজন্যে তাঁর আত্মীয়স্বজনরাও বিশেষ সম্পর্ক রাখত না। বিধবা হবার পরে শোকের চেয়েও ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় যখন গিরিবালা চোখে অঙ্ককার দেখছেন সে সময়ে একদিন পুরনো চিঠিপত্রের তাড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে নলিনীকান্তর এক খুড়ছুতো দাদার সন্ধান পেয়ে গেলেন। পর পর তিনটি চিঠি লিখলেন ভদ্রলোকের

টিকানায়। কোনটারই জবাব না পেয়ে একদিন ঠাকুরের নাম নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে নিজেই গিয়ে হাজির হলেন সেখানে।

ভদ্রলোকের নাম কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশা ওকালতি। বাইরের চকচকে নেমপ্লেট আর বসবার ঘরের আলমারি ভর্তি বই ও পরিপাটি চেয়ার-টেবিল দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে পসার খুব খারাপ নয়।

প্রণাম করে উঠতেই কালীমোহন বললেন, ‘তোমরা যে আসবেই আমি জানতাম। সেজন্তে আর চিঠি দিইনি। নলিনী বুঝি কিছুই রেখে যায়নি?’

ঘাড় নেড়ে গিরিবালা জানালেন, না।

চোখ কপালে তুলে কালীমোহন বললেন, ‘অ্যা, বলো কি! মেয়ের বিয়ের চিন্তাও কি ছিল না? গয়নাগাঁটিও তো কিছু দেখছি না মেয়ের গায়ে।’

গিরিবালা চুপ করে রইলেন।

‘ভবেই তো মুশকিল!’

মাথা নিচু করে গিরিবালা বললেন, ‘আমি আপনার বামুন-ঝিয়ের কাজ করে দেব, আপনি আমাকে একটু আশ্রয় দিন।’

তারপরের ঘটনা মামুলি। গিরিবালাকে সত্যি সত্যিই কালীমোহনের বৃহৎ সংসারে বামুন-ঝিয়ের কাজ করতে হয়েছিল। কোলের ছেলেকে এককোঁটা দুধ খাওয়াতে পারেননি। আশালতার ঝুলের পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আশালতার হাতের দু-গাছি চুড়ি, কানের ছল আর গলার হার গুপ্তধনের মতো গিরিবালা আগলিয়ে রেখেছিলেন। সেই সম্বলটুকুকেও শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া করতে হয়েছিল। নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। ছেলেমেয়ের জীবনের ভবিষ্যৎ কিছু আছে তাও মনে করতে পারতেন না। এমনি ভাবে যখন জীবন কাটছে তখন আশ্চর্য একটি ঘটনায় আশালতার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

কলেজের একটি ছাত্র কালীমোহনের ছোট ছেলেকে পড়াতে আসত। আশালতা মাঝে মাঝে গিয়ে বসত সেখানে। আশালতার দু-একটা কথা থেকে ছাত্রটি বুঝতে পেরেছিল যে পড়াশুনোয় মেয়েটির মাথা খুব পরিষ্কার। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?’ আশালতা বলেছিল, ‘আমি পড়ি না।’ ছাত্রসুলভ উদার মন নিয়ে সে বলেছিল, ‘আমি তোমাকে পড়াবো—তুমি পড়বে?’ আশালতা বলেছিল, ‘হ্যাঁ পড়ব।’

সেই ছাত্রটির চেষ্ঠায় আশালতা যেদিন ম্যাটিক পাশ করল সেদিন ছাত্রটি নিজে

ছাত্র-জীবন শেষ করে অধ্যাপক হয়ে বসেছে। তারই চেষ্টায় আশালতার একটা চাকরি হয়ে গেল। এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। মাইনে খুবই সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য মাইনের উপর নির্ভর করেই আশালতা মা আর ছোটভাইকে নিয়ে আলাদা একটা সংসার পেতে বসল। শুধু তাই নয়, স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল প্রণবেশকে।

আশালতা কালীমোহনকে আড়ালে ডাকত, তুতো-জেঠা। জেঠামশাইয়ের মশাইটুকু যদি অশ্রদ্ধা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারও ওপরে তুতো জুড়ে দূরে না ঠেলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। শুধু তাই নয়, আলাদা বাড়িতে চলে আসার পরে যখন আশালতার কাছে তুতো-জেঠা কথাটা বিশেষ হিসেবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল তখন সে অনায়াসেই সেটাকে বিশেষণ বানিয়ে নিয়েছে। প্রণবেশ যদি পর পর দু-দিন খেলা দেখার জন্তে টাকা চায় তাহলে আশালতা বলে, ‘তুইও দেখছি তুতো-জেঠা হয়ে উঠলি!’ গিরিবালা যদি কোনোদিন রান্নাঘরে গিয়ে হাতা-খুনতি নিয়ে বসেন তো আশালতা হা-হা করে ছুটে আসে : ‘তুমি সরো তো মা। আমাকে কি তুমি তুতো-জেঠা পেয়েছ?’

গিরিবালা একদিন বলেছিলেন, ‘ছি আশা, গুরুজনের নামে এমন করে বলতে নেই। ভুলে যাসনি যে উনি বড়ো দুঃসময়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।’

রেগে গিয়ে আশালতা বলেছিল, ‘সেজন্তে দামও বড়ো কম আদায় করেননি। সে দাম এখনো আমাকে শুধতে হচ্ছে।’

কথাটা বলেই আশালতা ঠোট কামড়িয়ে ধরেছিল। এর ভেতরকার ইঙ্গিতটুকু গিরিবালার কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এই সংসারের তার নিতে গিয়ে আশালতাকে যে জীবনের বড়ো পাওনা থেকে মুখ কিরিয়ে নিতে হয়েছে—সেটা গিরিবালার মনেও সবচেয়ে বড়ো ব্যথার জায়গা। আশালতার কথায় সেই ব্যথার জায়গাটাই টনটন করে উঠেছিল।

কিন্তু তুতো-জেঠা কথাটা তারপরেও রয়ে গিয়েছে।

● ● পাঁচ ● ●

তিন পাউণ্ড চায়ের দামের জন্তে প্রণবেশ তাগাদা দিতে যায়নি। নরসিংহু ডেকে পাঠিয়েছিল।

বসবার ঘরটি বেশ সাজানো। ঘরের মাঝখানে নিচু একটি টেবিল। তিনদিকে তিনটি সোফা। কোণের দিকে মস্ত একটা পেতলের ফুলদানিতে একগোছা

টাকা ফুল। দরজা-জানলায় নীল পর্দা। চার দেওয়ালে চারটি ছবি—সুভাষচন্দ্র, নেহরু, গান্ধিজী ও স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের ছবির দিকে তাকিয়ে মুখটা ছুঁচলো করে নরসিংহ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। প্রণবেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে, ‘বোসো।’

প্রণবেশ বসে। চণ্ডা নরম সোফায় যতোখানি গা এলিয়ে বসা যেতে পারে তার চেয়ে অনেক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। এমন পরিপাটিভাবে সাজানো গোছানো ঘরে কেমন অস্বস্তি হয় প্রণবেশের।

পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে নরসিংহ বলে, ‘তিন পাউণ্ড চায়ের দাম পাবে তুমি। টাকাটা রেখে দাও।’

‘আপনার কাছে ভাঙানো টাকা নেই?’

‘না।’

‘তবে আমি এই নোটটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি।’

প্রণবেশ উঠতে যাচ্ছিল। নরসিংহ বলে, ‘বোসো। বাকি টাকাটা পরে চায়ের দাম থেকে বাদ দিয়ে দিও।’ তারপর হাতের জলন্ত সিগারেটটা ছাইদানির মধ্যে ফেলে দেয়।

‘তোমার এই চায়ের ব্যবসা কতদিনের?’

প্রণবেশ বলে, ‘ছ-মাসের।’

‘সুবিধে হচ্ছে কিছু?’

প্রণবেশ চুপ করে থাকে। নরসিংহের সঙ্গে তেমন আলাপ নেই প্রণবেশের। চায়ের দাম নিতেও কোনোদিন তাকে নরসিংহের কাছে আসতে হয়নি। রেখাদিই দাম দিয়েছে। আজ হঠাৎ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হচ্ছে প্রণবেশ বুঝতে পারেনি। তার ওপরে নরসিংহ তার ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করতেই সে একটু অবাক হয়েছে।

‘তোমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি বলে অসন্তুষ্ট হচ্ছে না তো?’

এবার প্রণবেশ বলে, ‘না, না।’ যতোটা সম্ভব মোলায়েম করে বলার চেষ্টা করে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নরসিংহ বারকয়েক জোরে জোরে টান দেয়। তারপর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে নিতান্তই একটা কথার কথা জিজ্ঞেস করার মতো সুরে বলে, ‘আচ্ছা, তোমার ঐ পায়ের অ্যাক্সিডেন্টটা কবে হয়েছিল বলে তো?’

প্রণবেশ কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসে বলে, ‘অ্যাক্সিডেন্ট তো নয়, পুলিশের গুলি লেগেছিল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।’

‘তোমাকে কিন্তু বাইরে থেকে বোঝাই যায় যা যে তোমার একটা পা নেই।’

এবার প্রণবেশ একটু হাসে।

‘আমি তো জানতামই না। দীপুর কাছে শুনলাম। শুনে এত অবাক লাগল যে আলাপ করতে উঠেছিলাম। কিন্তু এই খুচরো চায়ের ব্যবসা করে তুমি কি জীবনে উন্নতি করতে পারবে বলে মনে করো?’

প্রণবেশ একটু উৎসাহিত হয়। বলে, ‘চেষ্টা করে তো দেখি। পুরো শরীর আর অনেক বিস্তে নিয়েও আজকাল লোকে চাকরি পায় না। আমার তো শরীরটা পুরো নয়, বিস্তেও সামান্য।’

কথাটা শুনে নরসিংহ কেন যে ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠে প্রণবেশ বুঝতে পারে না। সে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নরসিংহ বলে, ‘পুরো শরীর আর অনেক বিস্তে নিয়েও অনেকে ভিথিরির মতো জীবন কাটায় তাও একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পারে। আসলে যে জিনিসটি দরকার সেটা কি জান ভাই? পুরুষকার। এই পুরুষকার যার নেই তার পুরো শরীরই থাকুক আর অনেক বিস্তেই থাকুক—তাকে দিয়ে কোন বড়ো কাজ হয় না। নকল পা দিয়েও তুমি যে ভাবে সত্যিকারের পায়ের কাজকর্ম চালাতে পারো তাতে আমার মনে হয়, এই পুরুষকার জিনিসটি তোমার মধ্যে খুব বেশি মাত্রাতেই আছে। সুযোগ পেলে তুমি জগতে কীর্তি রেখে যেতে পারবে।’

প্রণবেশ মাথা নিচু করে হাতের নখ খুঁটতে থাকে।

এক পেয়লা চা হাতে নিয়ে দীপু ঘরে ঢোকে। নরসিংহ বলে, ‘দীপু, তোমার পানুদার জন্তে আরেক কাপ চা নিয়ে এসো।’

‘পানুদা তো চা খায় না।’

নরসিংহ আবার হেসে ওঠে : ‘তুমি তো বেশ ছেলে প্রণবেশ। চায়ের ব্যবসা করো অথচ নিজের চা খাও না। তুমি তো মহাপুরুষ হে।’

শুধু সাজানো গোছানো ঘরে বসে থাকার জন্তে নয়, নরসিংহের কথা শুনেও এবার প্রণবেশের অস্বস্তি লাগছে। বাইশ বছর বয়সের এই যুবকটির চেহারা যতোই লম্বা-চওড়া হোক, তার মুখখানা দেখে এখনো তাকে কিশোর বলে মনে হয়। কথাবার্তার বা চালচলনেও সে এখনো কৈশোর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। এ বাড়ির বড়োরা তাকে ছেলেমানুষ মনে করে, ছোটরা তাকে সমবয়স্কের বেশি মর্যাদা দেয় না। আশালতা পর্যন্ত মনে করে, প্রণবেশ যে চায়ের ব্যবসা করছে সেটা ব্যবসা ততোটা নয় যতোটা আমি ব্যবসা

করছি এই ভেবে ভালমাহুয়ি খুশির একটা খেলার মেতে ওঠা। এমন কি, প্রণবেশ যে অমিয়নাথের এত বেশি ভক্ত তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে অমিয়নাথ প্রণবেশকে পোশাকী নাম ধরে ডাকে, পান্ন বলে না। এই প্রণবেশকে সামনে বসিয়ে নরসিংহের মতো লোক বধন প্রশংসা করতে শুরু করে তখন সেটা তার পক্ষে খুব একটা ভালো-লাগার ব্যাপার হয় না।

দীপু তাকে বাঁচিয়ে দেয়। বলে, ‘পান্নদা, তোমাকে দিদি ডেকেছে, বাবার আগে দেখা করে যেও।’

প্রণবেশ উঠে দাঁড়িয়েছিল। নরসিংহ বাধা দিয়ে বলে, ‘আর একটু বসো, আসল কথাটাই বলা হয়নি।’

প্রণবেশ বসে।

‘আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। জানো তো, খুব সামান্য অবস্থা থেকে যারা মস্ত বড়ো হয়েছে তারা সকলেই ব্যবসায়ী। চাকরি করে কখনো উন্নতি করা যায় না। যতো বড়ো চাকুরেই তুমি হও, একটা বাঁধা আয়ের মধ্যে তোমাকে থাকতে হবে, একটা বাঁধা জীবন কাটাতে হবে। ব্যবসাতে নামো, ঝুঁকি অনেক, কিন্তু সুযোগও কম নয়। অবশ্য খুচরো চায়ের ব্যবসা করে সে-সুযোগ তুমি পাবে না। বড়ো ব্যবসা করতে হবে, বড়ো রকমের ঝুঁকি নিতে হবে।’

প্রণবেশ হাঁ করে তাকিয়ে তাকে।

‘তোমাকে খুলেই বলি শোনো। পূর্ববাংলার সঙ্গে আমার কিছু লেনদেনের কারবার আছে। বড়ো রকমের কারবার, কাজেই ঝুঁকিও বড়ো রকমের। এই কারবারে আমি তোমাকে লাগিয়ে দিতে চাই। একবার যদি এই কারবারের অঙ্কিসন্ধিগুলো জেনে নিতে পারো তো তোমাকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাছাড়া তোমার পক্ষে মস্ত একটা সুবিধে হচ্ছে তোমার ঐ নকল পা।’

‘নকল পা!’

‘হ্যাঁ, নকল পা।’ তারপর প্রণবেশের ডান পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, ‘উরু থেকে পাতা পর্যন্ত তোমার ঐ নকল পায়ের মধ্যে অনেকখানি লুকোনো জায়গা। ওই জায়গাটুকুকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে কিছুদিনের মধ্যেই তোমার ওই পা থেকে সোনা ঝরতে শুরু করবে। লেগে পড়ো হে লেগে পড়ো।’ নরসিংহের কথা শুনে প্রণবেশের নকল পা-টাও শিরশির করে ওঠে।

‘কি ভাবছ? ভয় হচ্ছে বুঝি?’

নকল পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রণবেশ বলে, ‘না, ভয় নয়। ভাবছি।’

‘আচ্ছা, দু-দিন ভেবে নাও। পরে আমাকে জানিও।’

কোণের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গিয়ে গোলাপ ফুলগুলোর দিকে আর একবার নজর পড়ে। এত টাটকা ফুলগুলো যেন এজুনি গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে। প্রণবেশ খুব আলতো ভাবে ফুলের একটা পাপড়ির ওপরে আঙুল ছোঁয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিতে হয় হাতটা। কাগজের ফুল। নকল।

কড়াইয়ে তেল ঢালতে ঢালতে রেখা বলে, ‘দীপু, তোর পান্নদার জন্তে একটা চেয়ার দিয়ে যা তো।’

প্রণবেশ বলে, ‘চেয়ারের দরকার নেই রেখাদি, আমি মাটিতেও পা ছড়িয়ে বসতে পারি।’

একটা আলুর চপ ডিমে ডুবিয়ে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখাতে মাখাতে রেখা বলে, ‘তা বাবা তুমি সবই পারো। তোমার অসাধ্য কিছই নেই।’

‘চপ ভাজছ বুঝি রেখাদি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাই আমি বাইরের ঘরে বসে গন্ধ পাচ্ছিলাম।’

রেখা হেসে ওঠে, ‘তোমার নাকটা খুব লম্বা বলতে হবে পান্ন। আমি সেই দুপুরবেলা কিমা তৈরি করে চপ বানিয়ে রেখেছি। আর এখন ভাজব। তুমি কিন্তু ভাজা শুরু করার আগেই গন্ধ পেয়ে গেছ!’

প্রণবেশ বলে, ‘আমি পাই রেখাদি। তুমি যদি আমাকে না ডাকতে তাহলেও আমি গন্ধে গন্ধে চলে আসতাম। আমার কাছ থেকে কোনো কিছ লুকোতে পারবে না রেখাদি।’

বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো একটা চপ হাতে নিয়ে ধোঁরা-ওঠা কড়াইটার দিকে তাকিয়ে রেখা অপেক্ষা করছিল, প্রণবেশের কথা শুনে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ‘তোমার যদি সত্যিই এ ক্ষমতা থেকে থাকে পান্ন তবে জীবনে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে—এই আমি বলে রাখলাম। দীপু, তোর পান্নদাকে একটা ডিশ দে তো।’

ঘরের ভেতর থেকে একটা ভারী চেয়ার বাইরে টেনে আনতে গিয়ে দীপুর একটু কষ্টই হয়েছে। দিদির যতো বাড়াবাড়ি! অন্য সময়ে তো পান্নদা দিবা মাটিতে

পা ছড়িয়ে বসে। ভারী ভারী জিনিস টেনে আনে। এখন দিদির সামনে এসে যতো ঢঙ (ঢঙ কথাটা দীপু কিছুদিন হল শিখেছে। একতলার কলে একই সময়ে মালতীকে বাসন মাজতে ও সুবিমলকে দাঁত মাজতে দেখে দোতলার অরবিন্দ ঘোষালের বৌ মাটিতে ধুধু ফেলে বলেছিল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে ! দীপুর সেদিন মনিং স্কুল, কথাটা সে শুনেছে)। দীপুরও এখন বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ঢঙ দেখে বাঁচিনে ! বলতোও হয়তো, কিন্তু হঠাৎ পানুদাকে জব্দ করার একটা মতলব মাথায় এসে গেল।

‘আচ্ছা পানুদা তোমার কাছে তো কোনো কিছু লুকোনো যাবে না ! আচ্ছা বলো তো দেখি, আমার ফ্রকের পকেটে কি আছে ?’

‘বলবো ?’

‘বলো না !’

‘চকোলেট ।’

‘না, হয়নি। হেরে গেলে তো ! দেখলে দিদি, পানুদার মুখেই যতো বড়ো বড়ো কথা। এই ঞ্চাখ, আমার পকেটে ওষুধ ।’

রেখা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘কিসের ওষুধ রে দীপু ?’

‘মাষ্টারমশাইর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, জামাইবাবুর কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ চেয়ে নিয়ে দিতে যাচ্ছি ।’

‘মাষ্টারমশাই বলেছে বুঝি ?’

‘হ্যাঁ’

‘তোর এত সদাঁরি কেন ? আমাকে বলতে পারিসনি ? দে আমার হাতে !’

ওষুধের বড়িছোটো হাতে নিয়ে রেখা নিজের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। পেছন থেকে প্রণবেশ বলে ওঠে, ‘রেখাদি, তোমার চপ পুড়ে যাচ্ছে যে !’

ফিরে এসে উলুন থেকে কড়াইটা নাগিয়ে রেখে রেখা বলে, ‘চলে যেও না যেন পানু। একটু বোসো, আমি আসছি। খুব তো শরীরের বড়াই করো, আজ দেখব কত চপ তুমি খেতে পারো ।’

● ● ছয় ● ●

সব কথা শুনে আশালতা বলে, ‘পানু, তোকে আমি বারণ করছি, তুই এসনের মধ্যে যাবি না। তোর নরসিংদাকে বলে দিস ।’

‘কেন দিদি ?’

কেন দিদি ! রেগে উঠতে গিয়েও আশালতা নিজেকে সামলে নেয়। বাইশ বছর বয়স হলে হবে কি, এখনো একেবারে ছেলেমানুষ। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কোনো একটা মতলব না থাকলে আজকালকার দিনে কেউ কাউকে ডেকে চাকরি দেয় ? আর কথার কী ছিরি ! তোমার নকল পা থেকে সোনা ঝরবে। সোনা যেন রাস্তার ধুলো ! এই ভাইটাকে নিয়ে হয়েছে তার মহা জ্ঞান। কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে সেজন্তে সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এই তো, স্নান ছেলে খেয়েদেয়ে বইখাতা নিয়ে কলেজে গেল, বাস, তিন দিন ধরে আর কোনো খবরই নেই ! সারা শহরময় আশালতার সে কী ভুটোভুটি। শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেল হাসপাতালে। পুলিশের গুলি ধেয়ে বাবু হাসপাতালে গুরে আছেন। আশালতাকে দেখে একগাল হেসে বলেছিল, ‘দিদি আমার পায়ে গুলি লেগেছে।’ সেদিনও প্রচণ্ড একটা রাগ সামলাতে হয়েছিল আশালতাকে। পুলিশের গুলির সামনে তুই যদি ঝাঁপিরে না পড়তিস তাহলে কি দেশ স্বাধীন হত না ? শেষ পর্যন্ত একটা পা কেটে বাদ দিতে হল তো ! কাকেই বা কি বলবে ! মাও কম যায় না। ছেলে প্রাণে বেঁচেছে সেজন্তে কোথায় খুশি হবে, না, ‘আশা, মা, বামুনের ছেলের পা নিয়ে বেড়াল-কুকুরে টানাটানি করবে ? তুই ওটার সংকারের ব্যবস্থা কর মা।’ শেষ পর্যন্ত আশালতাকে পাঁচটা টাকা খরচ করে হিন্দু সংকার সমিতিতে দিয়ে ওই পায়ের সংকার করতে হয়েছিল। ভাইটার জন্তে তখন থেকেই তার দুশ্চিন্তা। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হল না বলে লেখাপড়াই ছেড়ে দিল। কত করে বলেছিল আশালতা যে ‘বি-এসসি পড় পান্ন।’ কিহুতেই কিহু না। ‘না দিদি, বি-এসসি পড়ে আমার কোনো লাভ হবে না। আমি একটা কারখানায় কাজের চেষ্টা করছি। ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারি তো মিস্ত্রী হবো।’ শেষ পর্যন্ত হতে হয়েছে খুচরো চায়ের ফেরিওলা। প্রণবেশ ফেরিওলা ছাড়া কি ? সিকি-পাউণ্ড আধ-পাউণ্ড চা নিয়ে একমাস ঘুরিয়ে সব দাম দেয়। যাই হোক, ছোট ভাই ফেরিওলা হলেও কোনো আপত্তি ছিল না আশালতার। সেভাবে খরতে গেলে ফেরিওলা নয় কে ? সে নিজেও তো তাই। এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে শিক্ষকতা ফেরি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ফেরি করতে গিয়ে আশালতা বাইরের পৃথিবীটাকে চিনেছে। পান্ন চেনেনি। ও এখনো একেবারে ছেলেমানুষ। আর তাই পান্নর জন্তে আশালতার এত ভয়।

আশালতাকে চূপ করে থাকতে দেখে প্রণবেশ আবার জিজ্ঞেস করে, ‘কেন দিদি ?’

‘তুই কি বুঝতে পারছিস না পান্নু যে তুই এক তুতো-জেঠার পান্নায় পড়েছিস?’

পান্নার ঘরে গিরিবালা ঠাকুরের আসনের সামনে বসে জপ করছিলেন। উঁচু স্বরে বলা আশালতার কথাগুলো কানে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ান।

‘কার কথা বলছিস রে আশা?’

আশালতা বলে, ‘মা, এবার তোমার ছেলেটিকে তুমি সামলাও।’

‘কেন? কি হয়েছে? কী করেছিস রে পান্নু?’ সারা মুখে উদ্বেগ নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন।

প্রণবেশ বলে, ‘কিছু না মা, তুমি ভয় পেও না। দিদিকে আমি বলছিলাম, দিদি, আমার এই নকল পা-টা যদি সোনা দিয়ে তৈরি করা যেত তো বেশ হত। শুনে দিদি জিজ্ঞেস করল, তোর মাথায় এ বুদ্ধি কে ঢুকিয়েছে রে? আমি বললাম, তিনতলার নরসিংহদা। শুনে দিদি কি বলল জান মা? তুই কি বুঝতে পারছিস না পান্নু যে তুই এক তুতো-জেঠার পান্নায় পড়েছিস? আচ্ছা মা, আমার নকল পা-টা সোনা দিয়ে তৈরি করতে পারলে বেশ হত, না?’

আশালতা ধমক দিয়ে ওঠে, ‘মোটোও বেশ হত না পান্নু। সোনার পা এত ভারী হত যে তা নিয়ে এক পাও চলাফেরা করতে পারতিস না তুই। বুঝলি? কথাটা মনে রাখিস।’

● ● সাত ● ●

তুতো-জেঠার গল্প শুনে অমিয়নাথ বলেছিল, ‘প্রণবেশ, তোমার তুতো-জেঠার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে?’

প্রণবেশ তক্ষুনি রাজি : ‘হ্যাঁ, চলুন না।’

অমিয়নাথ বলে, ‘না, এখন নয়। তুমি আমার কথা বলে রেখো। পরে একসময়ে যাব।’

প্রণবেশ প্রথমে বলে, ‘আচ্ছা।’ তারপরে একটু ভেবে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা আপনার কথা কি বলবো বলুন তো?’

অমিয়নাথ হেসে ওঠে, ‘বলবে যে চিলেকোঠার একটা পাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সে কি একটা যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করছে, যন্ত্রটা

আপনাকে দেখাবে ।’

‘সত্যি এ কথা বলতে বলছেন অমিয়দা ?’

‘ই্যা ।’

‘কিন্তু উনি তো ইঞ্জিনিয়ার নন, ব্যবসাদার । উনি আপনার যন্ত্রের কি বুঝবেন ?’

অমিয়নাথ বলে, ‘যন্ত্রের ব্যাপারটা তো বোঝার দরকার নেই । উনি যদি শুধু এটুকু বোঝেন যে এই যন্ত্রের পেছনে কিছু টাকা ঢাললে আথেরে ঊর লাভ হতে পারে—তাহলেই যথেষ্ট ।’

প্রণবেশ হঠাৎ বলে ওঠে, ‘আমার যদি অনেক টাকা থাকত অমিয়দা তো বেশ হত ।’

‘টাকা থাকলে সবারই ভালো লাগে, কিন্তু তোমার হঠাৎ টাকার দরকার পড়ল কেন ?’

‘তাহলে আমি সমস্ত টাকা আপনাকে দিয়ে দিতাম । আপনি এই যন্ত্রটা তৈরি করে ফেলতে পারতেন ।’

অমিয়নাথ কিছু না ভেবেই বলে, ‘মজার কথাটা কি জান প্রণবেশ ? তোমার যদি সত্যিই কোনো দিন টাকা হয় তো তখন দেখবে, টাকা দেবার মতো মনটা ভুমি খুইয়ে বসেছ ।’

প্রণবেশ চুপ করে থাকে । আর প্রণবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয়নাথ আবার নিজেকে ধমক দেয় । এই ছেলেটার কাছে সে কেন এসব কথা বলছে ? অমিয়নাথ নিজেকে না হয় মনে করতে পারে যে এই পৃথিবীটা বড়ো বেশি স্বার্থপর, এখানে কারও কাছ থেকে কোনো উপকার আশা করতে নেই, লাভের আশা না থাকলে কেউ কাউকে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না—কিন্তু এই ছেলেটির মনে সে কেন এসব ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে ? ওর জীবনের এই তো সবে শুরু । ওর পৃথিবী এতটা বিকল্প নাও হতে পারে ।

সবিতার কথা মনে পড়ছে । সবিতা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে অমিয়নাথ সবিতাকে বিয়ে করেছিল ওই টাকার জন্তেই । দু-হাজার টাকার দাম বড়ো কম ছিল না সে-সময়ে অমিয়নাথের কাছে । অমিয়নাথের মতো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে পেরে সবিতার বাবা খুশি হয়েই সে-টাকাটা পণ হিসেবে দিয়েছিলেন । সবিতার মতো রূপহীনা মেয়ের অমিয়নাথের মতো স্বামী পাওয়া সবিতার অনেক জন্মের শিবপূজোর ফল, একথা সবিতার ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়রা অমিয়নাথের সামনেই অনেক বার বলেছে ।

গোড়ার দিকে সবিতা নিজেও হয়তো কথাটা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে একমাস পার না হতেই বলেছিল একদিন : ‘তুমি যে কেন একবারও না দেখেই আমাকে পছন্দ করেছিলে তা এখন বুঝতে পারি।’

বোর্ডের ওপরে পিন দিয়ে আঁটা কাগজে রুল টানতে টানতে মাথা না তুলেই অমিয়নাথ বলেছিল ‘কেন বোলা তো?’

‘তুমি তো আমাকে বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছ আমার বাবার টাকাকে।’

সেদিন আর অমিয়নাথ কাজে মন বসাতে পারেনি। বইপত্র ও যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে বেড়াতে বেরিয়েছিল সবিতাকে নিয়ে। রাত্রিবেলা একদিকে ধরেছিল। তারপর ছোটো খাট জোড়া লাগিয়ে একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সেই প্রথম সবিতার কাছে নিজের জীবনটা মেলে ধরেছিল। বলেছিল নিজের স্বপ্নের কথা, যে-যন্ত্রটি সে তৈরি করতে চেষ্টা করছে তার সম্ভাবনার কথা, আর যন্ত্রটি তৈরি হবার পরে সারা দেশ থেকে অঙ্ককার কেটে গিয়ে যেনতুন ছবিটি বাস্তব হয়ে উঠবে তার উজ্জ্বলতার কথা।

সে-সব কথার কতটুকু সবিতা বুঝেছিল অমিয়নাথ জানে না। কিন্তু অনেক রাতে পরিতৃপ্ত ক্লাস্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অমিয়নাথের কানের কাছে মুখ এনে সবিতা ফিসফিস করে বলেছিল, ‘আমার তিরিশ ভরি সোনার গয়না আছে। দরকার হলে তুমি নিও।’

জীবনে সেই একবার অমিয়নাথের মনে হয়েছিল, পৃথিবী আর এই জীবন সত্যিই বড়ো সুন্দর।

অমিয়নাথ বাবাকে কোনোদিন চোখে দেখেনি। ছেলেবেলায় মাকে জিজ্ঞেস করত, ‘মা আমার বাবা কোথায়?’ মা বলত, ‘তোমার বাবা অন্য জায়গায় থাকেন।’ ‘চলো না মা, আমরাও সেখানে যাই।’ ‘সে-জায়গা এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানে যাওয়া যায় না।’ ‘তবে বাবা গেল কি করে?’ ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলত, ‘তোমার বাবার ঘাড়ে একটা পেঙ্গুই তর করেছে কিনা, তাই তোমার বাবা যেতে পেরেছে।’

একমাত্র ছেলেকে মানুষ করার জন্যে তার মাকে শেষ পর্যন্ত ঘিরে কাজ নিতে হয়েছিল। তারপর বধন ধরা পড়ে যে মাকে কালরোগে ধরেছে আর অনেক খরচ করে চিকিৎসা না করালে এই অসুখ সারে না, তখন অমিয়নাথ একবার গিয়েছিল তার বাবার কাছে। বাবাকে একবার চোখের দেখা ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি।

মা মারা যাবার আগেই একটা কারখানায় ঢুকতে পেরেছিল। অ্যাথেন্টিস্, মিস্ত্রী, আর্মেরচার ওয়াইন্ডিং-এর কাজ। অল্প সময়ের মধ্যে এত ভালো কাজ শেখে যে ফোরম্যানের নজরে পড়ে যায়। তারই চেষ্টায় কারখানার একটা বিশেষ ট্রেনিং-কোর্স নিয়ে শেষ পর্যন্ত চার্জম্যান হয়ে বসে। এই সময়েই অমিয়নাথ টের পায় যে তার আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। খুড়ো-জ্যেষ্ঠা-মাসী-পিসীরা তো আছেই, ঠাকুমা-ঠাকুদা-দিদিমা-দাদামশাইও প্রায় ডজন-খানেক, তুতো ভাইবোন তো অজস্র। সকলেই অমিয়নাথের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সকলেই শেষ পর্যন্ত অমিয়নাথকে বুঝিয়ে ছাড়ে যে তাদের প্রত্যেককেই টাকাপয়সা গিয়ে সাহায্য করাটা অমিয়নাথের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। শুধু তাই নয়, যেখানে যতো বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে তাদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও সনির্বন্ধ ও সজ্জলুম প্রস্তাব আসতে শুরু করে। অবস্থা চরমে ওঠে যেদিন বাবার ঘাড়ের ভর করা সেই পেত্নীটা বিধবার বেশ ধরে একপাল ছেলেমেয়ে সমেত হাজির হয়।

কিন্তু সেই অবস্থাতেও অমিয়নাথ টলেনি। তার আগেই অল্প একটা নেশায় সে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে বাইরের জগতের কোনো উপদ্রবকেই সে বিশেষ গায়ে মাখত না।

অবশ্য পকেটের টানটা ঠিকই টের পেতে হত। মাইনের টাকার একটা মোটা অংশ বিলিয়ে দিয়ে এইসব উপদ্রব শাস্ত করতে হত তাকে।

আর্মেরচার-ওয়াইন্ডিং-এর কাজ শিখতে গিয়ে বিদ্যুৎতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনো করতে হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে মেধাবী ছাত্র, জানার আগ্রহটা তার খুবই বেশি, কাজেই চাকরি করার জন্তে যতোটুকু দরকার ততোটুকুতে এসে সে থেমে যায়নি। সংক্ষেপে স্বান সেরে নেবার জন্তে বিদ্যুৎতত্ত্বের নদীতে পা টিপে টিপে নেমেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড স্রোতের টানে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান অগাধ সমুদ্রে। কারখানার লাইব্রেরির কয়েক আলমারি বই আর অসম্ভব একটা মনের জোর নিয়ে সেই অগাধ সমুদ্রে সে পাড়ি জমাল।

থার্মো-কাপল, সঙ্কর ধাতু আর মোটর ও ডায়নামো সম্পর্কে পড়াশুনো করতে করতে একসময়ে সে ভাবতে শুরু করে, এমন একটা যন্ত্র বানানো যায় না যার সাহায্যে একটা স্থারিকেনের বাতি থেকে ছোটখাটো মোটর বা ডায়নামো চালাবার ‘মোটর ফোর্স’ তৈরি হতে পারে? এমনি ধরনের অনেক ভাবনাই তার মাথায় ঘোরাফেরা করত। কিন্তু এই ভাবনাটাই শেষ পর্যন্ত জেঁকে

বসে। তত্ত্বের দিক থেকে ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে হল না। কিন্তু হাতে কলমে একটা মডেল তৈরি করে দেখা দরকার।

কারখানার কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলেই হেসে ওঠে আর উপদেশ দেয়, ‘এসব পাগলামি ছাড়ুন। এ ধরনের যন্ত্র তৈরি করে লাভ কি? খার্মাল পাওয়ার আর হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির যুগে এ যন্ত্র অচল।’

কিন্তু অমিয়নাথ কল্লনার চোখ মেলে অন্য একটা ছবি দেখত। যে-সব গাঁয়ের রাস্তায় কোনো দিন গাড়ির চাকা চলেনি, সেখানেও ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। কুটির-শিল্প চালানো হচ্ছে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে। আর সেজন্তে কোনো খার্মাল বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্টেশন থেকে হাই-টেনশন্ তার টানতে হয়নি। দেশের কোনো একটি কোণেও একবিন্দু অন্ধকার জমে নেই।

শেষ পর্যন্ত নিজের মাইনের টাকা ক-টিকে সদন করেই অমিয়নাথ কাজে নামল। যন্ত্রের একটা মডেল তৈরি করে সে দেখিয়ে দেবে যে এই খার্মাল পাওয়ার ও হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির যুগেও তার যন্ত্র অচল নয়।

তারপর থেকেই অমিয়নাথের জীবন প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মধ্য দিয়ে কেটেছে। কাজে হাত লাগিয়েই সে বুঝতে পারল, যন্ত্রের একটা মডেল তৈরি করতে হলেও অনেক টাকা চাই। খার্মো-কাপ্ল-এর জন্তে নানান ধরনের সঙ্কর ষাটু তৈরি করা দরকার। আর্মেচারের জন্তে বিশেষ ধরনের তার। জোরালো স্বাভাবিক চুম্বক। অনেক অনেক টাকা না হলে গোড়ার দিকের এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলতে পারে না।

কারখানার ফোরম্যান একদিন এসে বললেন, ‘অমিয়, তোমার এসব পাগলামি ছেড়ে দাও। মন দিয়ে চাকরি করো, অনেক উন্নতি পরতে পারবে।’

‘চাকরিতে তো আমার অমনোযোগ নেই।’

ফোরম্যান হেসে বললেন, ‘অমনোযোগ না থাকা এক কথায় আর মন থাকা অন্য কথা। আমি তোমার ভালোর জন্তেই বলছি। আর শোন, তোমার আর এভাবে একা একা থাকা চলবে না। বিয়ে করো। বিয়ে করলেই তোমার সমস্ত পাগলামি সেরে যাবে।’

শেষকালে ভদ্রলোকের আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল। নিজের মেয়ের সঙ্গে তিনি অমিয়নাথের বিয়ে দিতে চান। মেয়েটি অবশ্য দেখতে যাকে বলা হয় রূপসী তা নয়, কিন্তু সত্যিকারের গুণবতী। এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে অমিয়নাথ

নিশ্চয়ই সুখী হবে। ভদ্রলোক সাধ্যমতো পণ ও যৌতুক দেবেন।

অমিয়নাথের তখন এমন এক মানসিক অবস্থা যে টাকার জন্তে বিয়ে করতেও পিছু-পা নয়। এক কথায় সে রাজি হয়ে গেল।

না, সবিতাকে অমিয়নাথ দোষ দেয় না। তার চেহারায় রূপ না থাকুক, এমন কি স্ত্রী বা লাবণ্যের ছিটেকোটাও না থাকুক—অমিয়নাথের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। সে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে এতখানি অসাবধানী হয়নি যে ছ-মাসের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে বসে শাড়ির আঁচলে আগুন ধরিয়ে বসবে। আর বাচ্চাটাকে নিশ্চয়ই সে বাঁচাতে চেয়েছিল, নইলে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলবে কেন? সে কি খেয়াল করেছিল যে ছুঁড়ে ফেলার পরে বাচ্চাটার গলা থেকে একটি কারাও বেরিয়ে আসেনি?

তারপরেও অমিয়নাথ তার সেই নেশাতেই বুদ্ধ হয়ে থেকেছে। সবিতার ফেলে-যাওয়া গয়নাগুলো বিক্রি করতে হয়েছে একে একে। বিক্রি করেছে ঘরের সমস্ত দামী আসবাব। কম ভাড়ার এক চিলতে ঘরে উঠে এসেছে। সম্ভার হোটেল খাওয়া দাওয়া করে। কিন্তু তবুও কুলিরে উঠতে পারছে না অমিয়নাথ। আরো অনেক টাকা চাই। অনেক টাকা।

● ● আট ● ●

গোলাপ ফুলগুলোকে তেমনি তাজা দেখাচ্ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ছবির দিকে তাকিয়ে মুখটা ছুঁচলো করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল নরসিংহ। সামনের ছোট টেবিলটার ওপরে দুটো খালি চায়ের পেয়ালা, একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট আর প্রায়-ভর্তি ছাইদানি।

নরসিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয়নাথ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ছাইদানির মধ্যে চেপে ধরে নরসিংহ বলে, ‘আপনার এই যন্ত্র দেশের কতখানি উপকারে আসবে সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এই যন্ত্রের পেছনে টাকা খাটিয়ে আমার কি লাভ হবে বলতে পারেন?’

অমিয়নাথ বলে, ‘কেন? আপনি দশগুণ টাকা উঠিয়ে আনতে পারবেন।’

ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসে নরসিংহ : ‘এ যন্ত্র কে কিনবে?’

অমিয়নাথ বলে, ‘দেশের গভর্নমেন্ট কিনবে। দেশের মানুষ কিনবে। সারা দেশে বতো গ্রাম আছে—’

কথার মাঝখানেই নরসিংহ উঠে দাঁড়ায় : ‘আচ্ছা এক এক করে ধরা যাক।

আপনি বলছেন, গভর্নমেন্ট কিনবে। হ্যাঁ, কেনা উচিত, কেনা সম্ভবও। আগামী কয়েক বছরে দেশের নানান জায়গায় কুটির-শিল্পের পুস্তন হবে আশা করা যায়। সে-সব জায়গায় আপনার এই যন্ত্র বিক্রি হবার একটা সুযোগ আছে। কিন্তু সেই সুযোগটুকু তৈরি করার জন্তে কতখানি কাঠ-খড় পোড়াতে হবে জানেন? প্রথমতঃ একদল নামজাদা বিজ্ঞানী যদি সুপারিশ না করেন তাহলে আপনার আমার কথায় গভর্নমেন্ট কোনো কানই দেবে না। সেটুকু করতে পারা যাবে আশা করা যায়। কিন্তু তারপরের ব্যাপারগুলো? গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন। সেই বিশেষজ্ঞটিকে নিজের আপিস^১ গুছিয়ে বসার জন্তে কয়েক মাস সময় দিতে হবে। তারপর তিনি আসবেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। এই গেল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটি আরো অনেক জটিল ও সময়সাপেক্ষ। সেই বিশেষজ্ঞটি কোনো একটি শৈলাবাসে বা সমুদ্রতীরে গিয়ে কন্ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট রচনা করতে বসবেন। বারকয়েক তাঁকে দিল্লীতে ক্লাই করতে হবে। তাঁর পার্সোনোল অ্যাসিস্ট্যান্টদের নানান জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্তে। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই কাজটি চলার পরে শেষ পর্বন্ত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা থেকে একশো পৃষ্ঠার মধ্যে ফুলস্কেপ কাগজে টাইপ করা যে জিনিসটি তৈরি হবে তা রিপোর্ট নয়, একটি থিসিস। সরকারী কর্তারা সেই থিসিসের অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে আরেক জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বসবেন। আর এই নতুন বিশেষজ্ঞটি নিশ্চয়ই কাঁচিয়ে দিয়ে যাবেন গোটা ব্যাপারটাকে। শেষ পর্বে হয়তো দেখা যাবে যে একটি তদন্ত কমিশন বসেছে। আবার সেই গোড়া থেকে শুরু। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ফাইল জমবে। ডিনার, লাঞ্চ আর গার্ডেন-পার্টির মরসুম পড়বে। আর প্রত্যেকটি পর্বে আপনাকে খোলাখুলি ভাবে বা আড়ালে আবডালে জলের মতো টাকা খরচ করতে হবে।’

নরসিংহ বসে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরায়, মুখটাকে ছুঁচলো করে ধোঁয়া ছাড়ে, তারপর বলে, ‘আপনি বলছেন, দেশের মানুষ আপনার এই যন্ত্র কিনবে। আচ্ছা শুধুন তাহলে—’

অমিয়নাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘আপনার কথা আমি বুঝেছি। আমি চলি।’

পেছন থেকে নরসিংহ বলে, ‘অমিয়বাবু, এমন কোনো যন্ত্র যদি বানাতে পারেন যা আমাদের মতো ব্যবসাদারদের কাজে লাগে—তাহলে আমি আপনাকে

সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে দেশের গভনমেন্ট বা দেশের মানুষের কথা ভুলতে হবে আপনাকে।’

নরসিংহের কথা শুনেই সেদিন অমিয়নাথ বুঝতে পেরেছিল যে লোকটি করিৎকর্মা। সরকারী আপিসের ঘাঁৎঘোঁৎ ওর ভালোভাবেই জানা। কিন্তু এত কথার পরেও লোকটিকে সেদিন সে চিনতে পারেনি। চিনেছিল গুদামঘরে আগুন লাগার পরে।

● ● নয় ● ●

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মালতী কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। কাল রাত্রে আগুনে এই বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল না কেন? তাহলে এ বাড়ির অনেক নোংরা পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এত কাণ্ডের পরেও সেই রোজকার মতো আর একটা দিন শুরু হয়েছে। মালতীকে আবার সেই আগের মতোই বাসন মাজতে হবে, উতুনে আঁচ দিতে হবে, ঘরকন্নার হাজারটা খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে দিয়ে সারাটা দিন কাটাতে হবে। বিল্বী। বিল্বী।

মালতীর মা সত্যবতীর আজ আর বিছানা ছেড়ে ওঠবার ক্ষমতা নেই। গত রাতের উত্তেজনায় তার হাটের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। এখন দিন সাতেক মাকে এভাবেই বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

পাঁচ বছরের ছোট ভাইটা কাঁদছে : ‘দিদি খেতে দে।’ সাত বছরের বোনটা কিন্তু চুপচাপ। খেতে দেবার কোনোরকম তোড়জোড় হচ্ছে না দেখেও কোনো প্রশ্ন নেই। ও মেয়ে বলেই বোধহয় এত সহজে খিদে সহ্য করতে পারে। বারো বছরের ছোট ভাই বিস্ময় এখনি ঘুমোচ্ছে। বেচারী! কাল রাত্রে ওর ওপর দিয়ে কম ঝকল ঝাটনি।

সত্যবতী চিঁ-চিঁ করে জিজ্ঞেস করল, ‘আশা, তোর বাবা এখনো ফেরেনি?’

‘না মা।’

‘ঘরে কি কিছুই নেই রে?’

মালতীর একবার ইচ্ছে হল বলে, সে খবর আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো মা। কিন্তু মুখে সে বলল, ‘না মা, কিছুই নেই।’

‘তোর আশাদির কাছ থেকে আট আনা পয়সা ধার করে আন না।’

মালতী খুব একটা শক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল। মা যেন কী! এ-সময়ে আশাদির কাছে গিয়ে পয়সা ঝাওয়া যায়! পানুদা স্নান হয়ে না ফেরা পর্যন্ত আশাদির

মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না মালতী। মা বড়ো অবুঝ। মুখে সে বলল, ‘তুমি অস্থির হয়ে না মা, বাবা এগুনি ফিরবেন।’

কাল রাত্রে আগুন লেগেছিল বলে নয়, কাল রাত্রে রান্না হয়নি বলে মালতীকে এখনো এঁটো বাসন নিয়ে একতলার কলে যেতে হয়নি। একেবারে রাস্তার ধারে বসে ওইভাবে বাসন মাজতে তারি বিল্ডী লাগে মালতীর। বড়ো রাস্তা অবশ্য নয়, সরু গলি, আর ভোরের দিকে এই গলিতে লোকজনের যাতায়াতও খুব কম—তবুও বিল্ডী লাগে।

সবচেয়ে প্রথমে আসে সুদর্শন, গ্যারেজের কয়লার দোকানের কুলি।

‘দিদিমণি, এক বাসতি জল নেব?’

‘নাও।’

একতলার বারোয়ারী কল, যে কেউ আসতে পারে। তবু তো সুদর্শন দিদিমণি বলে খাতির করে। বলে কয়ে তারপরে বাসতি পাতে কলের নিচে। তাছাড়া সুদর্শনই বা করবে কি? ওর অবস্থাও তো মালতীর মতোই। তফাতের মধ্যে সুদর্শনের গ্যারেজ-ঘরে রয়েছে কয়লা, আর মালতীদের দেড়তলার ঘরে ঘরকন্নার খুঁটিনাটি। একতলার গ্যারেজ-ঘরটিতে অবশ্য গাড়ির বদলে কয়লা থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সেখানে মানুষ থাকার কথা নয়। তেমনি গ্যারেজের ওপরে একই মাপের দেড়তলার ঘরটি যদিও মানুষ থাকার জন্তে তৈরি কিন্তু সেখানেও পুরো একটি সংসারকে কিছুতেই আটানো চলে না। দু-জায়গাতেই কিছুটা জবরদস্তি রয়ে গেছে। যা হবার কথা নয় তাই করার চেষ্টা। এসব কথা মালতী এতটা স্পষ্ট করে ভাবতে পারে তা নয়। তবে রাত্রিবেলা যখন বাক্স-প্যাটার্স আর হাঁড়ি-কুঁড়ি সরিয়ে শোবার জন্তে একটুখানি জায়গা করে নিতে হয় আর হাত-পা ছড়িয়ে শুতে না পারার জন্তে কেমন একটা গুমোট ভাব বুকের ওপরে চেপে ধরে—তখন মনে হয়, এর চেয়ে সুদর্শনের মতো খোলাখুলি রাস্তার ওপরে খাটিয়া পেতে শোওয়া অনেক ভালো।

সুদর্শন বাসতি ভরে জল নিয়ে যাওয়ার একটু পরেই দোতলার সিঁড়িতে কাঠের ষড়মের শব্দ ওঠে। অরবিন্দ ঘোষাল বাজারের খলে হাতে নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে চলেছেন। শব্দটা নিচে নাষে, তারপরে মালতীর সামনে এসে থেমে যায়।

‘বাসন মাজা হচ্ছে বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ, বেশ।’

মালতী চূপ করে থাকে।

‘একটু নজর রেখো, কেমন?’

‘আচ্ছা।’

রোজই এই এক কথা। একটু পরেই বালতি আর গোরু সমেত গয়লা আসবে দুধ দিতে। সামনে ছুঁয়ে দেবার চুক্তিতে একপোয়া দুধ। তিনি নিজেকে থাকতে পারেন না বলে মালতীকে নজর রাখতে বলে যান। শুধু এইটুকুতেই রেহাই নেই। ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করেন, ‘বালতিটা ভালো করে দেখেছিলে তো মালতী? জল ছিল না তো? ব্যাটারা কিন্তু ভারি শয়তান।’

খড়মের শকটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই গঙ্গাজলের ছিটে দিতে দিতে নিচে নামেন অরবিন্দ ঘোষালের বোঁ। আশাদি নাম দিয়েছে বাতিকগিরী। মালতীও আড়ালে তাই বলে, সামনে ডাকে জেঠিমা। তাও নিতান্তই কথা বলার দরকার হলে। বাতিকগিরীকে পারতপক্ষে কেউ ম্যাঁটায় না।

গঙ্গাজলের ছিটে দিতে দিতে একেবারে রাস্তায় গিয়ে ঝাঁড়ান তিনি, তারপরে শূন্য রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘সরে যা এখান থেকে, সরে যা!’ ফিরে যাবার পথে কচিং মালতীর সঙ্গে কথা বলেন দু-একটা।

‘রোজ রোজ এত বাসন মাজো কেন?’

‘এত নয় তো জেঠিমা, এই তো মাত্র পাঁচটা খালা—’

‘তা হোক। তুমি কি একা খাও যে রোজ তোমাকেই বাসন মাজতে হবে?’

‘মার শরীরটা ভালো নয় কিনা—’

‘তা জানি। তোমার বাবা কি করে?’

‘বাসনমাজা কি পুরুষমানুষের কাজ জেঠিমা?’

‘ও, পুরুষমানুষ! ভুলেই গিয়েছিলাম।’

তারপর দু-পা সরে এসে আরেকবার গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে বলে ওঠেন, ‘সরে যা এখান থেকে, সরে যা!’

বাতিকগিরী চলে যাবার পরে আসে সুবিমল। টুখব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে আসে। মুখের মধ্যে একরাশ ফেনা ও টুখব্রাশটা থাকে বলে কথা কথা বলতে পারে না, উঁ-আ করে মালতীর প্রশ্নের জবাব দেয়।

মালতীদের সঙ্গে যে সুবিমলের আত্মীয়তা আছে সেটা প্রণবেশের আবিষ্কার। প্রণবেশের যা স্বভাব, সুবিমলের সঙ্গে আলাপ হতে খুঁটিয়ে তার ঘরের খবর জেনেছিল। তারপর কথায় কথায় একদিন গল্প করেছিল সত্যবতীর কাছে।

তখনই জানা গিয়েছিল যে সত্যবতী সম্পর্কে সুবিমলের মাসীমা। অবশ্য সম্পর্কটা টেনেটুনে বার করতে হলেও একই বাড়িতে থাকার দরুন ঘনিষ্ঠতাটা সম্পর্কের সীমানায় থেমে থাকেনি। কাজেই সুবিমল যদি ভোরবেলা দাঁত মাজতে মাজতে তিনতলা থেকে একতলায় নেমে আসে আর মালতী যদি বাসন মাজতে মাজতে তার সঙ্গে গল্প করে তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। বাতিকগিরী বাক্য মস্তব্য করলেও কিছু যায় আসে না।

সুবিমল বলে, ‘মালতী, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি, তুমি বাসনগুলো ধুয়ে নাও।’

মালতী বলে, ‘আচ্ছা।’

সুবিমল বালতি বালতি জল ঢালে। মালতী যতো চেষ্টায়, ‘আন্তে, আরো! আন্তে,’ সুবিমল ততো বেশি বেশি জল ঢালে। মালতীর বাসন ধোয়া হয়ে গেলে ঝকঝকে বাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলে, ‘শুধু জল ঢাললেই বাসনের ময়লা কেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, না মালতী?’

মালতী অবাক হয়ে বলে, ‘তা তো হবেই।’

ততোক্ষণে গ্যারেজের কয়লার দোকানের সামনে ছোটো ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বাশচেরার মতো আওয়ারজটা শুনে মালতী বুঝতে পারে, মস্ত চামচের মতো জিনিসটা দিয়ে কয়লা তুলছে সুদর্শন। চার-পাঁচজন লোক হৈ-চৈ করে কথা বলে। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে যায়।

মালতী একদিন বলেছিল, ‘সুবিমলদা, আমার খুব পড়তে ইচ্ছে করে।’

সুবিমল বলেছিল, ‘পড়াশুনো ছেড়ে দিলে কেন মালতী? আর ছোটো বছর পড়লেই তো ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারতে।’

মালতী জবাব দেয়নি। পড়াশুনো কেন ছাড়তে হয়েছে মালতীকে তা কি সুবিমলদা বুঝতে পারে না? আশি টাকা মাইনের পিয়নের মেয়ের আরো অনেক আগেই পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আর একদিন সুবিমল নিজের থেকেই কথাটা তোলে : ‘তুমি পড়াশুনো করতে চাও মালতী? আমি তোমাকে পড়াবো।’

মালতী খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে : ‘সত্যি পড়াবেন সুবিমলদা?’

‘হ্যাঁ, বলছি তো।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজই বই-খাতা নিয়ে চলে এসো। কিংবা আমিও তোমাদের ঘরে আসতে পারি।’

ততোকালে মালতীর মুখখানা হান হয়ে গিয়েছে।

‘আমার তো বইখাতা কিছুই নেই সুবিমলদা। ক্লাশ নাইনে উঠে ওসব আর কেনাই হয়নি।’

সুবিমলও চুপ করে থাকে। কিছুতেই বলতে পারে না যে ‘বইখাতা কিনে নিও মালতী, তারপরে আমি পড়াতে শুরু করব।’ কিংবা একথাও বলতে পারে না যে ‘তুমি কিছু ভেব না মালতী, আমি তোমার সমস্ত বইখাতা কিনে দেব।’

ঘরসংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে মালতীর বুকের মধ্যে একটা চাপা রাগ ফুঁসে ওঠে। গ্যারেজের ওপরে দেড়তলার ঘরটাকে আরো বেশি ছোট আর চাপা বলে মনে হয়। বাবা কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে ভালো করে জবাব দেয় না, ভাইবোনদের ধমক দেয়, মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে। একদিন আশালতাকে বলেছিল, ‘আশাদি, আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দাও না?’

আশালতা হেসে উঠেছিল।

‘হাসির কথা নয় আশাদি। সত্যি বলছি।’

‘কেন রে, তোর হঠাৎ চাকরি করার কি দরকার পড়ল?’

‘আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আশাদি।’

আশালতা তবুও হাসে : ‘তোকে এসব কথা কে শিখিয়েছে রে মালতী?’

মালতী বলে, ‘তোমাকে দেখেই শিখেছি আশাদি।’

এই তিনতলা বাড়িটার মালতীর কথা বলার লোক বলতে একমাত্র আশাদি। বাতিকগিরী বা তিনতলার রেখাদির সঙ্গে দু-একটা দরকারী কথা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। দুজনেই বড়ো দূরের মানুষ। বাতিকগিরীকে তো ভয়ই করে চলতে হয়। আর রেখাদির চালচলনের মধ্যেই এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে মালতীর সব সময়ে মনে পড়ে যায়, মালতীর চেয়ে অনেক উঁচুতলার মানুষ রেখাদি। পানুদা অবশ্য রেখাদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু মালতীর ধারণা, মানুষ চেনার ক্ষমতা পানুদার নেই। পানুদা কার না প্রশংসা করে? তাছাড়া, সকলের কাছেই পানুদার খাতির, কারণ সকলেই পানুদাকে দিয়ে কোনো না কোনো কাজ করিয়ে নেয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মতো সময় বেদিন পানুদার থাকবে না, সেদিন দেখা যাবে পৃথিবীসুদ্ধ লোক কেমন এত ভালো থাকে পানুদার চোখে!

পানুদার ওপরে অন্য একটা কারণেও রাগ আছে মালতীর। তার সঙ্গে পানুদা এমন ভাবে কথা বলে যেন সে এখনো ছেলেমানুষ। তার বয়স বে প্রায়

আঠারো হাতে চলেছে, সে যে আর ক্রক-পরা খুকীটি নয়—একথাটা পাহুদা যেন মানতেই চায় না। আচ্ছা, সময় তো আর দুরিয়ে যাচ্ছে না। মালতীও একদিন শোধ তুলবে।

এই বাড়িতে মালতীর সমবয়স্ক কোনো মেয়ে থাকলে ভালো লাগত মালতীর। এত বড় বাড়ি কিন্তু কেমন যেন খাঁ খাঁ করে। তিনতলার সামনের দিকের মস্ত ফ্র্যাটটা নিয়ে যে ভদ্রলোক একা থাকেন তাঁকে তো চোখের দেখাই দেখতে পায় না মালতী। তাঁর কি বাড়ির লোকজন কেউ নেই নাকি? গত দু-বছরে মালতী ওই ফ্র্যাটে কাউকে উঁচু গলায় কথা বলতে শোনেনি। তিনতলার পেছনদিকের ফ্র্যাটে অবশ্য রেখাদি ছাড়াও দীপু আছে। কিন্তু ওই ক্রকপরা মেয়েটার সঙ্গে কী কথা বলবে মালতী? দোতলায় এক আশাদি। তাও সারাদিনের মধ্যে আশাদির সময় এত কম যে এক ছুটির দিন ছাড়া আশাদিকে পাওয়া মুশকিল।

বেলা দশটার মধ্যেই এ বাড়ির সমস্ত কাজের মানুষরা বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাড়াশব্দ থেমে যায় যেন। এমনকি বাতিকগিন্নীকেও বিকেল পাঁচটার আগে আর একবারও গঙ্গাজলের ছিটে দিতে দেখা যায় না। তিনতলার রেখাদি সারা দুপুর একা একা কী করেন কোনো দিন খোঁজ নিতে যায়নি মালতী।

তবে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা মালতী এই তিনতলা বাড়িটার ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। চিলেকোঠার ভাড়াটে আসার পর থেকে মালতী বিকেলের দিকে আর ছাদে আসে না। কিন্তু ছাদের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আপিসের দিনে দুপুরবেলা ছাদে লোক থাকে না, আর তখন আসে মালতী।

ঝাঁঝে চারদিকে ভালো করে তাকানো যায় না। মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। পিঠের ওপরে চুল ছড়িয়ে ছাদের কার্নিশে বুক চেপে বুক পড়ে মালতী। তেতে-ওঠা কার্নিশের ভাপে বুকের ভেতরটা কেমন শির শির করে আর ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মালতী। প্রায়ই চোখে পড়ে সরু গলিটা জুড়ে একটা কি দুটো লরি এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট বড় নানান ধরনের বস্তু ও প্যাকেট বোঝাই করা হচ্ছে লরিতে। একতলায় একটা গুদামঘর আছে, সে-খবর মালতী জানে। কিন্তু সেই গুদামঘরে এত নানান ধরনের বস্তু আর প্যাকেট থাকে, তা ভাবতেও কেমন অবাক লাগে মালতীর। কী আছে এইসব বস্তু আর প্যাকেটের মধ্যে কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়?

সুদর্শন একদিন বলেছিল, ‘জানেন দিদিমণি, কাল একটা লোক এসে আমাকে এই গুদামঘরটার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি কিন্তু লোকটাকে চিনে ফেলেছি।’

মালতী কিছু না বুঝেই জিজ্ঞেস করছিল, ‘কে লোকটা?’

‘পুলিসের টিকটিকি।’

মালতী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল : ‘কি বলছিল সে?’

সুদর্শন মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, ‘সে সব নানান কথা। এই গুদামঘরটার কখন কখন মাল আসে, একই লরিতে আসে না আলাদা আলাদা লরিতে আসে, কখন কখন মাল বার করা হয়—এমনি হাজারটা প্রশ্ন। আমি বললাম, আমি তো কিছু জানি না বাবু। তখন লোকটা কি বলে জানেন? তুমি যদি আমাকে সমস্ত খবর যোগাড় করে দিতে পার তো তোমাকে টাকা দেব।’

‘তুমি কি বললে?’

‘আমি বললাম যে গুদামের মালিক এই বাড়ির তিনতলাতেই থাকে, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন গে। শুনে লোকটা চলে গেল। আমার কি মনে হয় জানেন দিদিমণি?’

‘কি?’

‘এই গুদামটায় চোরাই মাল আছে।’

মালতী হেসে উঠেছিল, ‘তাই কখনো হয়! দিনে দুপুরে মাল নামাচ্ছে, মাল ওঠাচ্ছে, চোরাই মাল হলেই হল?’

সুদর্শন বলেছিল, ‘দিদিমণি, আজকাল সমস্ত চুরির কারবার দিনে-দুপুরেই চলে। চোরদেরই রাজত্ব কিনা!’

কথাটা সত্যি কিনা মালতী জানে না। কিন্তু সুদর্শনের কথা বলার ভঙ্গিতে মালতী হেসেছিল।

আর একজনের কথা মনে পড়ে। পানুদা। দুপুরবেলা ছাদের কার্নিশে বুক চেপে দাঁড়িয়ে লরিতে মাল তোলা দেখতে কেন যে পানুদার কথা মনে পড়ে তা বুঝতে পারে না মালতী। বেশ আছে পানুদা। সারাদিনের মধ্যে দুপুরবেলা খাওয়ার সময়ে একবার বাড়িতে ঢোকে, বাকিটা সময় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখখানাকে ভারিক্কী করে বলে, ‘আমার তো আর পুতুল খেলে দিন কাটালে চলবে না। আমাকে ব্যবসা করে খেতে হয়।’ এমন রাগ হয় পানুদার ওপরে! মালতীর যেন পুতুলখেলার বয়স আছে!

সারাদিন মালতীকে যতো কাজ করতে হয় তার সিকি ভাগ করতে হলেও পান্নদা কবে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত। তবুও বেশ লোক পান্নদা। ভগবান ওর একটা পা কেড়ে নিয়ে ওকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। ও কিন্তু ভগবানের ওপরেও শোধ তুলেছে। বোঝাই যায় না যে একটা পা নেই। মালতী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আচ্ছা পান্নদা, একজনের পা কেটে আরেক জনের পায়ে লাগানো যায়?’

কিন্তু না ভেবেই পান্নদা জবাব দিয়েছিল, ‘হ্যাঁ, যায়।’

‘তবে আমার একটা পা কেটে তোমার পায়ে লাগিয়ে নাও না?’

‘তোমার মতলব তো ভালো নয় মালতী। পুরো শরীরটাও নয়, সামান্য একটু পা দিয়েই সারা জীবনের মতো আমার ঘাড়ে ভর করতে চাও মনে হচ্ছে!’

ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল মালতী। পান্নদা যেন কী!

পাঁচ বছরের ছোট ভাইটা কাঁদছে: ‘দিদি, খেতে দে।’ সত্যবতী চোখ বুজে শুয়ে আছে। সাত বছরের বোনটা তেমনি চুপচাপ। বিস্তর একবার বোধ হয় ঘুম ভেঙেছিল, চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে আবার পাশ ফিরেছে।

বাবা এখনো ফিরছে না কেন? বিদ্রী লাগছে মালতীর। ইচ্ছে করছে, ছোট বোনটার গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মারে! ও কাঁদছে না কেন? বিস্তুটাকে টান মেরে উঠিয়ে দিলে হয়। ওরও তো খিদে পেয়েছে। ঘরসুদ্ধ লোক খিদে পেয়েছে বলে কারা জুড়ুক না।

সত্যি, পান্নদা যেন কী! গুদাম ঘরে আগুন লেগেছিল তাতে ওর কি! কই, আর তো কেউ সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পায়নি! পাড়াসুদ্ধ লোক তো জড়ো হয়েছিল! সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পান্নদার।

কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল মালতী। ভগবান, পান্নদাকে তুমি এমনতেই অনেক শাস্তি দিয়েছ। এবার তাড়াতাড়ি ভালো করে দিও।

● ● দশ ● ●

সকালে উঠে রোজকার অভ্যাসমতো দাঁত মাজার জন্তো উল্লুনের ছাই নিতে গিয়েছিল রামকান্ত। তখন আবার মনে পড়ল। কাল রাত্তিরে রান্না হয়নি। ঘরে খানিকটা আটা ছিল। আর একটু গুড়। তাই দিয়ে সিন্দীর মতো কি একটা বানিয়েছিল সত্যবতী! অন্ন অন্ন তাই খেয়েছিল সকলে।

রামকান্তর পেটের ভেতরটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছে। এক রাত্তিরের মধ্যে এত

খিদে পায় নাকি লোকের ? নাকি কাল রাত্তিরে আগুনের সামনে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল বলে পেটের মধ্যে কোনো একটা যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছে ?

আর আগুন বলে আগুন ! পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে এমন কাণ্ড রামকান্ত আর আর কখনো দেখেনি । কী ছিল গুদামঘরের মধ্যে যে আগুনের সঙ্গে সঙ্গে এমন হুমদাম অগ্নয়াজ হচ্ছিল ? কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার সময়েও এতটা ভয় পায়নি রামকান্ত ।

আগুনে সবস্বন্ধ পুড়ে মরতে পারলে ভালোই হত একদিক থেকে ! মাসের অধিক দিন এভাবে টাকার চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়তে হত না । কাল আপিসে চেনা-পরিচিত সবার কাছে হাত পেতেছে । কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও পায়নি । ধার দেবার মতো অবস্থাই বা কার আছে ? তাছাড়া রামকান্ত এতবেশি ধার চায় যে সবাই পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চায় তাকে ।

এখন এই সাতসকালে টাকার ধান্দায় কোথায় যায় রামকান্ত ?

ভাবতে ভাবতে গুদামঘরটার সামনে এসে একবার দাঁড়াল । সামনের দিকে তিনটে জানলা ও একটা দরজা । সবই হাট করে খোলা । ভেতরটা মিশমিশে অন্ধকার । রামকান্তকে রোজ দু-বেলা যাতায়াত করতে হয় এখান দিয়ে । কিন্তু সবকটা জানলা-দরজা খোলা অবস্থায় গুদামঘরটাকে কোনো দিনই দেখেনি । জানলার দিকে তাকালেই চোখে পড়ত, জানলার শিকের ফাঁকে ফাঁকে মাকড়সার জাল ঝুলছে । আজ একেবারে অগ্নরকম চেহারা । রামকান্তর মনে হতে লাগল, সে একটা নতুন জায়গায় এসে পড়েছে ।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখল রামকান্ত । সুদর্শন ঘুমোচ্ছে । উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দায় বা জানলার একটি লোকও নেই । কাল রাত্তিরের উত্তেজনার পরে পাড়াটা এখনো জাগেনি ।

তিনটে ধাপ পার হয়ে গুদামঘরের দরজার চৌকাঠের ওপরে দাঁড়াল রামকান্ত । একবার ভেতরে ঢুকে দেখলে হয় !

‘কে ?’ মানুষের গলার স্বর ।

রামকান্ত চমকে উঠল । পোড়া গুদামঘরের ভেতরে এ-সময়ে কোনো মানুষ থাকতে পারে তা ভাবতে পারেনি সে । বাইরের লোক চুরি করতে আসেনি তো ? মিশমিশে অন্ধকারের ভেতর থেকে কালি ঝুলি মাথা একটা লোক এসে রামকান্তর হুখোমুখি দাঁড়াল ।

কি চাই?’ লোকটা যেন ধমক দিতে চাইছে।

কিন্তু তার আগেই লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে। তিনতলার সামনের দিকের ফ্ল্যাটের কুপানাথবাবু। রামকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি এখানে?’ হাতের কালি শাটের সামনের দিকে মুছতে মুছতে কুপানাথ বলল, ‘এই একটু দেখতে এসেছিলাম। জানেন তো, অনেক সময়ে আমরা ভাবি যে আগুন নিবে গেছে কিন্তু আগুন তারপরেও থেকে যায়। ব্যাপারটা সত্যি কিনা পরখ করে দেখছিলাম।’

রামকান্তকে তবুও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কুপানাথ আবার বলল, ‘চলুন, ওপরে যাই। আপনাকে আমার আইডিয়াটা বুঝিয়ে বলব।’

রামকান্ত বলল, ‘চলুন।’ মনে মনে সে ঠিক করেছে, কুপানাথবাবুর কাছেই শেষ পর্যন্ত ধার চাইবে। ধৈর্য ধরে ভদ্রলোকের আইডিয়াটা শুনলে হয়তো ভদ্রলোক ধার না দিয়ে পারবেন না।

কুপানাথের পেছনে পেছনে ওপরে উঠতে লাগল রামকান্ত। এই ভদ্রলোকের ধরন-ধারন এত অদ্ভুত যে রামকান্তর মাঝে মাঝে মনে হয়, ইনি বোধ হয় পাগল। দোতলায় এক পাগল আছে অরবিন্দ ঘোষালের বৌ, আর তেতলায় ইনি। ভাগ্যিস, একতলায় কোনো মানুষ থাকে না, নইলে সেখানেও হয়তো পাগল এসে বাসা বাঁধত। আর চিলেকোঠার ঘরের অমিরবাবুকে তো সে অনেক দিন থেকেই চেনে। এঁদের চেয়েও আরো উঁচুদরের পাগল তিনি, কারণ তাঁর পাগলামি বাইরের লোকে বুঝতে পারে না। এতগুলো পাগলের হাওয়া লেগে রামকান্ত নিজেও না পাগল হয়ে যায়?

ব্যাপারটা রামকান্তর কাছে তারি অদ্ভুত লাগে। এই লোকগুলোকে দেখেই বোঝা যায় টাকাপয়সার অভাব এদের নেই। জীবনটাকে যেমন ভাবে খুশি এরা কাটিয়ে দিতে পারে। তবে এদের মধ্যে পাগলামি আসে কোথেকে? মানুষ তো পাগল হয় টাকাপয়সার চিন্তায়!

কুপানাথকে যে কোনো ধরাবাঁধা চাকরি করতে হয় না তা বোঝা যায় তার যখন-খুশি বাড়িতে ঢোকা থেকে। তিনখানা ঘরের মস্ত এক ফ্ল্যাট নিয়ে সে একা থাকে। বাইরের লোকজন প্রচুর আসে তার কাছে কিন্তু কেউ এক রাস্তিরও থাকে না। আর লোকগুলোর চেহারাও সব একই ধরনের। উস্কো-খুস্কো চুল, চোখে পুরু চশমা, হাতে মোটা মোটা বই বা ভারী পোর্টফোলিও ব্যাগ, অন্তমনস্ক পা ফেলা—সব মিলিয়ে যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। এ বাড়িতে বাইরের

লোক যারা আসে তাদের চেহারা দেখেই রামকান্ত বলে দিতে পারে তারা কোন্ তলার কোন্ ফ্ল্যাটের আগন্তুক।

একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। রামকান্ত খুম থেকে উঠে সিঁড়ির কাছে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল, হঠাৎ দেখতে পেল কুপানাথবাবু ওপর থেকে নিচে নামছেন। নামার ধরনটা অদ্ভুত। প্রত্যেকটি ধাপকে দু-পায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামছেন। প্রথমে বাঁ পা, তারপরে ডান পা। আর কি যেন বলছেন বিড় বিড় করে। রামকান্তর সামনে দিয়ে ভদ্রলোক নিচে নেমে গেলেন কিন্তু রামকান্তর মুখের দিকে একবার তাকালেন না পৰ্যন্ত। একটু পরেই দেখা গেল, ভদ্রলোক আবার নিচে থেকে ওপরে উঠে আসছেন। ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে, প্রত্যেকটি ধাপকে দু-পায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রামকান্ত একতলার কলে মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে আসছে, দেখতে পেল কুপানাথবাবু আবার ওপর থেকে নিচে আসছেন। সেই একই ভঙ্গিতে। দেড়তলার চওড়া সিঁড়িতে দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

রামকান্ত কস্ করে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, ‘আপনি কি কিছু হারিয়েছেন?’

‘এঁয়া? কি বলছেন?’ কুপানাথ ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিল।

‘আপনি কি কিছু হারিয়েছেন?’

‘না!’ কুপানাথের গলার স্বরে একটু যেন ঝাঁজ, ‘তবে এখন হারালাম।’

‘কী হারালেন?’

‘সংখ্যা।’

‘সংখ্যা!’

‘ওপর থেকে গুণতে গুণতে আসছিলাম, তিনতলা থেকে একতলা পৰ্যন্ত সিঁড়ির কটা ধাপ আছে। সেই সংখ্যাটা হারিয়ে গেল।’

কুপানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল রামকান্ত। না, ভদ্রলোকের বিপরীত চোখেমুখে ঠাট্টার চিহ্নমাত্র ছিল না। সেদিন থেকেই রামকান্তর ধারণা, কুপানাথবাবু একটি আন্তো পাগল। এই পাগলের সঙ্গে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে। অস্তুত পাঁচটা টাকা হাতে নিয়ে না ফিরলে রামকান্তর ঘরে আজও উঠুনে আঁচ পড়বে না।

● ● এগার ● ●

আশালতা এই অসময়ে টেবিল-ল্যাম্প জালিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে। অন্তরদিন

ভোরের দিকে আশালতার নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ থাকে না। দু'হাত দিয়ে দশ হাতের কাজ করতে হয় তাকে। সকাল নটা পর্যন্ত তার সময়। এই সময়টুকুর মধ্যেই সে দু-বেলার রান্না সারে, ঘরদোর ঝাঁটি দেয়, জামাকাপড় কাচে, পান্নকে তাড়া দিয়ে দিয়ে বাজারে পাঠায়, গিরিবালা সঙ্গে নানা ব্যাপারে খুচরো কথা বলে, পান্নর জন্তে বিকেলবেলার জলখাবারের বন্দোবস্ত রাখে, তারপরে গিরিবালাকে নানা দরকারী কথা মনে করিয়ে দিতে দিতে পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যায়। সুলের পরে ছোটো টিউশনি সেরে ফিরতে ফিরতে রাত নটা। কাজেই সকালবেলার এইটুকু সময়ের মধ্যেই মাঝে মাঝে আবার কিছু বাড়তি ঝামেলাও এসে পড়ে।

তবুও আজ আশালতা সমস্ত কাজ ফেলে রেখে চিঠি লিখতে বসেছে।

‘শ্রীচরণেশু,’

(ননীমাধবকে শ্রীচরণেশু লিখতে ভালো লাগে না আশালতার। বাবা-কাকা-জ্যেঠা বা মা-মাসী-পিসীর মতো গুরুজনদের কাছে চিঠি লিখতে হলে শ্রীচরণেশু কথাটা বেশ মানায়। ননীমাধবকে নাম ধরে সম্বোধন করতে পারলেই ভালো হত। আশালতার বান্ধবীদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা তো অনেকেই স্বামীকে নাম ধরে ডাকে। কলম তুলে দু'হাতের মধ্যে গাল রেখে আশালতা একটু হাসে। স্বামী! কথাটা কি বিস্মী অথচ কি মিষ্টি! ননীমাধব এখনো অবশ্য তার স্বামী হয়নি। কিন্তু হতে কোনো বাধা নেই। আশালতা আপত্তি না জানালে এতদিনে ননীমাধব শুধু তার স্বামী হত না, হয়তো তার কোল জুড়ে...আঃ! কি সব আবোল-তাবোল ভাবছে সে!)

‘কাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।’

(চিঠির প্রথম লাইনেই দুর্ঘটনার কথা লিখবে নাকি? তিনমাস পরে চিঠি লিখতে বসেছে আশালতা। তিনমাসের মধ্যে ননীমাধবকে জানাবার মতো আর কোনো কথা কি জমেনি? ননীমাধবের কাছ থেকে জানাবার মতো কথাও কি নেই? না, দুর্ঘটনার কথাটা সে চিঠির শেষদিকে জানাবে)

‘শ্রীচরণেশু,’

(আচ্ছা, নাম ধরে সম্বোধন করলেই বা ক্ষতি কি? সে এই চিঠিতে বে বিশেষ কথাটা জানাবে তারপরে তো...)

‘ননীমাধব,’

(নাঃ, বড় বড়ো নাম । সব সময়ে ডাকতে হলে দম ফুরিয়ে যাবে ।)

‘ননী,’

(উঁহ, ননীমাধব যখন কলেজের ছাত্র ছিল তখন এ নামে ডাকলে মানাত । ননী ! বেশ মজা কিন্তু, নামটাকে ছোট করলেই মনে হয় বয়স অনেক কমে গেছে । আর যখন এ-নামে ডাকলে মানাত তখনই কিনা ননীমাধবকে ডাকতে হয়েছে মাস্টারমশাই বলে । আর সেই পুঁচকে মাস্টারমশাইয়ের দাপট কত ! বলে কিনা, আমি তোমাকে পড়াবো, তুমি পড়বে ? বললেই হত, আমি রূপকথার রাজপুত্র তুতো-জ্যেষ্ঠার দৈত্যপুরী থেকে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসেছি, চলো আমার সঙ্গে, যাবে তো ? সেই রাজপুত্রকে ননী নামে ডাকা চলত, এখন আর চলে না ।)

‘মাধব,’

(দূর, দূর, কি বিল্লী বুড়োটে নাম । ননীমাধবের যখন চুল পাকবে, দাঁত পড়ে যাবে, তখন বরং এ-নামে ডাকা চলে) ।

‘শ্রীচরণেশু,’

(এই ভালো । হাজার হোক ননীমাধব তার মাস্টারমশাই । ননীমাধব না পড়ালে সে কিছুতেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারত না । তারপরে ননীমাধব উৎসাহ দিয়েছিল বলেই সে এতগুলো পাশ করতে পেরেছে ।)

‘অনেক দিন কোনো চিঠি পাই না । শরীর ভালো তো ?’

(ভ্রাতা ! তুমি চিঠির জবাব দিয়েছ যে ননীমাধব তোমাকে চিঠি লিখবে ? মনে নেই ননীমাধবের সেই শেষ চিঠি ? ননীমাধব তো স্পষ্টই লিখেছিল—‘এখনো যদি তোমার বিয়ে করার সময় না হয়ে থাকে তবে আর কবে হবে জানি না । তোমার জন্তে অপেক্ষা করতে করতে আমার টেবিলের সামনের দেওয়ালে পাঁচবার ক্যালেন্ডার বদলাতে হয়েছে । ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা ধসার সঙ্গে সঙ্গে বয়েস খসে পড়ছে জীবন থেকে । এবার তুমি আমাকে শেষ জবাব দাও ।’ মনে নেই ?)

‘শ্রীচরণেশু,

এতদিনে আমি জবাব খুঁজে পেয়েছি । তোমাকে জানানো বলে এই চিঠি ।’

(না, খুঁজে পেয়েছি কথাটা ঠিক হল না । এতদিন জবাব খুঁজতে হচ্ছিল নাকি তাকে ? যে দিনটি থেকে সে ননীমাধবকে স্বামীর আসনে বসিয়েছে সে-দিনটির কথা কি ননীমাধব ভুলে গেছে ? শুধু তো সামাজিক অনুষ্ঠানটুকু

বাকি ছিল। পান্নুর একটা ভালোমতো চাকরি হলেই সে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ননীমাধবের কাছে চলে যেত। ননীমাধব কি তার কাছে এই জবাব চেয়েছে নাকি? না, আগে বরং দরকারী কথাটাই সেরে নেওয়া যাক।)

‘শ্রীচরণেশু,

কাল রাত্রে আমাদের বাড়িতে ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমাদের বাড়ির একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছিল। আগুন নেবাতে গিয়ে পান্নুর পা পুড়ে গিয়েছে। ও এখন হাসপাতালে।...’

খানখুতির আচলটাকে গায়ে জড়াতে জড়াতে পাশের ঘর থেকে ধড়মড় করে উঠে এলেন গিরিবালা।

‘হ্যাঁ রে আশা, পান্নু তো এখনো কিরল না!’

প্যাডটাকে উল্টিয়ে রেখে আশালতা বলল, ‘ফিরবে মা, ব্যস্ত হচ্ছে কেন?’

‘তুই ঠিক বলছিস তো আশা, ওর কিছু হয়নি?’

‘না মা, ওর কিছু হয়নি। পাড়ার একটা ছেলের পা পুড়ে গিয়েছে। ও তাকে নিয়ে গিয়েছে হাসপাতালে। তোমার ছেলেকে তো তুমি জানোই মা, সব ব্যাপারে ওর মাথা গলানো চাই।’

‘তা যা বলেছিস!’ বলতে গিরিবারার নজর পড়ল ঘরের মেন্ডের দিকে, ‘একি রে আশা! সারা ঘরময় কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেলেছিস কেন? কী লিখছিস তুই?’

আশালতা হাসল: ‘ছুটির দরখাস্ত লিখছি মা।’

● ● বারো ● ●

কুপানাথ বলল, ‘বসুন।’

সরু লম্বা একটা ঘর। চওড়ার দিকে একদিকে দরজা, অন্যদিকে জানলা। লম্বার দিকে একদিকে ব্যাক্তি বই, অন্যদিকে সারি সারি অনেকগুলো মানচিত্র। ঘরের মাঝখানে একটা চৌকোনা টেবিল আর চারদিকে ছড়ানো অনেকগুলো ছোট ছোট চেয়ার। এককোণের একটা চেয়ারে একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল রামকান্ত।

‘আপনি বসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি যদি বলি, আপনি বসেননি।’

এবার রামকান্তকে বাড়ি ফিরিয়ে দেখে নিতে হল, দরজাটা খোলা আছে কিনা।

‘আমি তো বসেছি!’

‘আপনার ধারণা, আপনি বসে আছেন। আমি যদি বলি, না, আমি দেখছি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন—তাহলে কি হবে?’

চেয়ারটাকে দরজার দিকে একটু সরিয়ে নিয়ে রামকান্ত বলল, ‘তাহলে প্রমাণ হবে যে আপনার চোখ খারাপ। চশমা নেওয়া দরকার আপনার।’

রূপানাথ একটু হেসে বলল, ‘ঠিক এই জবাবই আশা করেছিলাম আপনার কাছে। আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন যে আমরা আমাদের চামড়ার চোখ দিয়ে যা দেখি সেটাই ঠিক দেখা?’

রূপানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি ‘হ্যাঁ’ বলার সাহস হল না রামকান্তের। অথচ চুপ করে থাকাটাও নিরাপদ নয়। সে বলল, ‘তবে?’

রূপানাথকে দেখেই বোঝা গেল, সে খুশি হয়েছে। চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে সে বলল, ‘যাক, আপনার প্রশ্ন শুনেই আমি বুঝতে পারছি, আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে। আপনি বলেননি, হ্যাঁ। আপনি জিজ্ঞাস করেছেন, তবে? এমনি একটা জিজ্ঞাসা নিয়েই জীবন-ব্যাপারের মূলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।’

রামকান্ত উশখুশ করছে। টাকার কথাটা সে এবার তুলবে নাকি?

‘আচ্ছা, আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। প্রশ্নটা ছিল এই : আমাদের চামড়ার চোখের দেখাটাই কি ঠিক দেখা? যদি শুধু এইটুকুই প্রশ্ন হয় তবে জবাবে বলতে হবে, হ্যাঁ এবং না। কখনো ঠিক, কখনো বেঠিক। আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন?’

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে রামকান্ত বলল, ‘পারছি।’

‘বেশ। তাহলে এবারে আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, কেন? একজোড়া চামড়ার চোখ দিয়েই আমরা দেখি কিন্তু আমাদের দেখাটা সবসময়ে ঠিক দেখা নয় কেন? কেমন, আপনি নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন করবেন?’

‘তা তো বটেই।’

‘বেশ। বেশ। তাহলে গোড়ার কথাটায় আসা যাক। ধরুন আমরা একটা জিনিস দেখছি। জিনিসটার আকার, জিনিসটার রং, সবকিছুই আমরা দেখি। কেমন তো?’

রামকান্তকে বাড়ি নেড়ে সাই দিতে হল।

‘কিন্তু আসলে কী দেখি আমরা? সেই জিনিসটাকে কি? (একটু থেমে রামকান্তকে প্রশ্নের জবাবটা আঁচ করার জন্যে একটু সময় দিয়ে) না, তা নয়। আমরা দেখি সময়ের একটা বিশেষ ভগ্নাংশে স্পেস-এর একটা বিশেষ ভঙ্গিমা। (রামকান্ত হাই ভুলছে) সময়ের একটা বিশেষ ভগ্নাংশে স্পেস-এর একটা বিশেষ ভঙ্গিমা! কিন্তু আমাদের চামড়ার চোখের পক্ষে মুশকিল কি জানেন? চামড়ার চোখে স্পেস-এর বিশেষ ভঙ্গিমাটুকুকেই শুধু ধরে রাখা যায়। সময়ের বিশেষ ভগ্নাংশটুকু ধরা পড়ে না (রামকান্ত চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়েছে)। কথাটা আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করছি শুনুন। ধরা যাক আমি চামড়ার চোখে দেখছি যে আপনি আমার সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন। অর্থাৎ, স্পেস-এর একটা বিশেষ ভঙ্গিমা আমার চোখের পর্দায় এই বিশেষ ছবিটা ফুটিয়ে তুলেছে। কেমন তো? (রামকান্ত মাথা হেলিয়েছে) কিন্তু এই দেখাটাই পুরো দেখা নয়। আংশিক দেখা, সময়ের একটা বিশেষ ভগ্নাংশের মধ্যে বন্দী হয়ে দেখা। অর্থাৎ, ঠিক যে-মুহুর্তে আমি দেখছি যে আপনি চেয়ারে বসে আছেন, সেই মুহুর্তটি আমার কাছে ঠিক সেই মুহুর্তই হতে পারে, কিন্তু অন্য আরেকজনের কাছে তা নাও হতে পারে। অন্য আরেকজনের কাছে হয়তো সেই মুহুর্তটি ঠিক তার আগের মুহুর্ত, যখন আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মানে, (রামকান্তর দিকে তর্জনী বাড়িয়ে, তর্জনী মাটির দিকে হেলিয়ে) আপনি এই মুহুর্তে বসে আসেন সেকথাও সত্যি, (তর্জনী আকাশের দিকে উঁচিয়ে) আপনি এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেকথাও সত্যি। বুঝতে পেরেছেন?’

রামকান্ত বলল, ‘আমাকে একগ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?’

‘কি বললেন?’

‘একটু জল খাব।’

‘ও, জল! আচ্ছা আনছি। কিন্তু আসল কথাটা মনে রাখবেন। সময়ের অঞ্চল রূপটাকে আমরা ভাবতে পারি না বলেই এত বিপত্তি। সময়ের অণুতম ভগ্নাংশও অনন্তকাল ধরে টিকে থাকে। কখনো হারিয়ে যায় না বা ফুরিয়ে যায় না।’

রামকান্ত চোখ বুজল। কটা বেজেছে কে জানে। পেটের জ্বালাটা আরো বেড়েছে মনে হচ্ছে। পাঁচটা টাকা দেবে তো? এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের কথা শুনেছে, তার পরেও যদি পাঁচটা টাকা ধার বলে না দেয় তাহলে

বুঝতে হবে, ভদ্রলোকের চোখদুটো নিতাস্তই চামড়ার, চক্ষুলজ্জা নেই।

‘এই নিন’, রূপানাথ ফিরে এসেছে।

চোখ মেলে তাকিয়ে রামকান্ত গ্লাসের সবটুকু জল ঢক্ ঢক্ করে থেয়ে নিল।

চেয়ারে বসে রূপানাথ আবার বলতে লাগল, ‘তাহলে আসল কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে? যে কোনো একটি ঘটনাকে নানা ভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন ধরুন, গুদামঘরের আগুন নিবে গেছে, এটা একটা ঘটনা। কিন্তু আমি যদি বলি, গুদামঘরে এখনো আগুন জ্বলছে, আমি দেখতে পাচ্ছি—’

রামকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারেন?’

একবার চোখ ঘোঁচ করে তাকিয়েই রূপানাথ হেসে উঠল : ‘আচ্ছা বেশ, এই ঘটনাটাকেই ধরা যাক। আমি যদি এখন আপনাকে পাঁচটা টাকা দিই, তাহলে কি আপনাকেই পাঁচটা টাকা ধার দেওয়া হবে? না, কক্ষনো নয়। টাকা ধার চাইবার আগে আপনি আমার কাছে যে-আপনি ছিলেন, টাকা ধার চাইবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর সে-আপনি রইলেন না। আপনি যদি আপনিই না থাকেন তাহলে আমি ধার দেব কাকে? আমার কথাটা বুঝতে পারছেন?’

রামকান্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

● ● তেরো ● ●

রোজকার মতো সূর্যদর্শন বাইরে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। আর রোজকার মতোই ঘুমিয়ে পড়ার আগে অল্প একটু সময়ের জন্তে ভেবেছিল, কোথাও একটা ঘর ভাড়া নিতে হবে। এভাবে আর থাকা চলে না। সারাটা দিন কাজের মধ্যে এক রকম কেটে যায়। হিন্দুস্থানীদের মতো ছাত্তু খাওয়া অভ্যেস করেছে বলে দুপুরবেলা রান্না করার ঝামেলা নেই। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দুটি চাল ফুটিয়ে না নিলে চলে না। সঙ্গে যা হোক একটা তরকারিও চাই। আর এটুকু করতেই তার যতো আলিঙ্গি। রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবে, কোনো একটা বস্তুতে একটা ঘর ভাড়া নেবে, ছোট্ট একটা সংসার, আর শাঁখা-চুড়ি পরা দুটি হাত দুবেলা ভাত রান্না করবে তার জন্তে।

সত্যিকারের ঘরটা আর পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে সূর্যদর্শন স্বপ্নের ঘর তৈরি করে।

এই স্বপ্নের ঘরটাই আগের দিন রাত্রে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে চুরমার হয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে গেল সুদর্শনের।

খাটিয়াটা কাঁপছে। বড়ো রাস্তা দিয়ে মাল বোঝাই লরি গেলে খাটিয়াটা যতোটুকু কাঁপে তাতে সুদর্শনের ঘুম ভাঙে না। সুদর্শনের মনে হল, কোথায় যেন কি একটা ব্যাপার ঘটেছে।

বিশ্রী একটা গন্ধ না? সুদর্শন খাটিয়ার ওপরে উঠে বসল। কি যেন একটা পুড়ছে। এখন তো আর শীতকাল নয় যে কোথাও কেউ হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই পুড়িয়ে আগুন তৈরি করেছে? কী পুড়ছে তাহলে? রবার পোড়ার মতো গন্ধ যেন।

কাউকে ডাকবে নাকি? কিন্তু এমনও তো হতে পারে, বাচ্চার দুধ গরম করার জন্তে কেউ হয়তো পুরনো খবরের কাগজ পোড়াচ্ছে? পুরনো খবরের কাগজ পোড়ালেও এমনি বিশ্রী গন্ধ। দূর ছাই, যা খুশি পুড়ুক। সে কেন মাঝরাতে হুশিয়ার করতে বসেছে?

দুম্ করে একটা শব্দ হল। ভারী একটা জিনিস উঁচু থেকে পড়েছে। খাটিয়াটা কাঁপছে। খাটিয়া ছেড়ে মাটিতে দাঁড়াতে হল সুদর্শনকে।

না, সুদর্শনের বুঝতে ভুল হয়নি। একতলার গুদামঘরে কিছু একটা কাণ্ড চলছে। এই গুদামঘরটাকে অনেক দিন থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে সে। অবিগ্রহি তাই বলে সে পুলিশের টিকটিকির কাছে কোনো খবর বলতে যায়নি। কিন্তু সমস্তই লক্ষ্য করে। সে বরাবরই জানে, গুদামঘরে মাল আসে লরি বা ঠেলা বোঝাই হয়ে। গুদামঘর থেকে মাল যায়ও সেইভাবে। কিন্তু ট্যাক্সি করে বা অনেক সময়ে ছ্যাকরা গাড়ি করে মাল আসতে বা যেতে সে এর আগে আর কখনো দেখেনি। তাছাড়া সে লক্ষ্য করে দেখেছে যে মাল দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কোনো পক্ষ থেকেই কোনো রকম চালান সই করা বা গোণাগুণতি করা বা ওজন করার ব্যাপার নেই। ভয়ানক একটা তাড়াহড়োর মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা সারা হয়। সুদর্শনের কয়লার দোকানেও তো লরি বোঝাই হয়ে কয়লা আসে, রোজ ভোরে তাকেও তো ছুঁঠেলা ভর্তি কয়লা ওজন করে দিতে হয়—সে এসব ব্যাপার খুব ভালো ভাবেই জানে। কাজেই এমন সৃষ্টিছাড়া গুদামঘরে রাস্তিরবেলাও যে কিছু একটা কাণ্ড চলবে, তাতে সুদর্শনের অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু সে শুধু একবার উঁকি মেরে দেখবে, ব্যাপারখানা কি। তাই বলে সুদর্শন পুলিশের টিকটিকির কাছে মুখ খুলতে যাবে না।

পা টিপে টিপে গুদামঘরের দরজার সামনে এসে স্তূদর্শন অবাক হয়ে গেল। দরজায় তালা ঝুলছে। গুদামঘরে কাউকে ঢুকতে হলে এই একটিমাত্র দরজা। তবে কি জানলা ভেঙে চোর ঢুকল নাকি? না, জানলাও তো সব বন্ধ।

হুম করে আরেকবার শব্দ হল। এবার আরো জোরে। পোড়া গন্ধটাও এখনো পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি আগুন লেগেছে নাকি? কি সর্বনাশ! দোকানে আজ সকালেই লরি বোঝাই হয়ে কয়লা এসেছে। আগুন লাগলেই হয়েছে আর কি! এক ছুটে বাবুর বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে নাকি? কিন্তু তার আগেই যদি আগুন ছড়িয়ে পড়ে? কি করবে এখন স্তূদর্শন? আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠবে নাকি?

না, তার চেয়ে বরং পান্নবাবুকে ডেকে তোলা যাক। পান্নবাবু একাই একশো। সেই ভালো।

● ● চোদ্দ ● ●

এত রাতে কে ডাকছে? কে ডাকতে পারে? গিরিবালার এমনিতেই খুব পাতলা ঘুম। প্রথম ডাকেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

‘কে?’

‘আমি স্তূদর্শন।’

নাম শুনে নয়, ভয়মেশানো গলার স্বর শুনে গিরিবালা উঠে বসলেন। আশাকে ডাকবেন নাকি? না থাক, রাত্তিরবেলার এই তো এটুকু সময়! এছাড়া বিশ্রাম কোথায় ওর? আর এমন মড়ার মতো ঘুমোয় মেয়েটা যে গা ধরে ঝাঁকুনি না দিলে ওঠানো যায় না। মেয়েমানুষের এতবেশি ঘুম আবার ভালো নয়। একসময়ে তাকেও তো খাটা-খাটুনি কম করতে হয়নি! একটুখানি মাথা গুঁজবার ঠাই পাবার জন্তে ঝি-চাকর-বামুনের কাজ একার হাতে করতে হয়েছিল। কিন্তু তখনো তো রাত্তিরবেলা কোথাও একটু খুঁট করে শব্দ হলেই গিরিবালার ঘুম ভেঙে যেত। মেয়েমানুষকে কত ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। বেহুঁশ হয়ে ঘুমোলে চলে নাকি!

‘পান্নবাবু!’

চোর-ডাকাত নয় তো? কিংবা খুনে? পান্ন তো যা ছেলে! কোথায় কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে এসেছে কে জানে। এখন এই মাঝরাত্তিরে পান্নকে বাইরে

ডেকে নিয়ে গিয়ে যদি কিছু একটা করে বসে? পান্নকে ডেকে তোলার আগে চিৎকার করে লোক জড়ো করবেন নাকি গিরিবালা?

‘গিন্নী-মা! দিদিমণি!’

ও বাবা, এ যে দেখছি সব পোজখবর নিয়েই এসেছে। গতিক স্নবিধের নয় দেখছি। আর এই বাড়ির লোকগুলোই বা কি? একটা লোক (একটা কিনা কে জানে! হয়তো দল বেঁধেই এসেছে!) একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে এমন ডাকাতির মতো চেঁচাচ্ছে, কারও কি ঘুম ভাঙে না গো?

‘পান্নবাবু, শিগগির বাইরে আসুন। একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে।’

এঁয়া বলে কি? আগুন! কি সর্বনাশ! ও আশা, উঠে পড় মা, বাড়িতে আগুন লেগেছে! পান্ন, উঠলি বাবা, আর আর। আমার লেপটাকে শিকে থেকে নামিয়ে দে বাবা। আমি যে ওই এক লেপেই বাকি জীবনটা কাটাবো ভেবেছিলাম রে!

পাশের ঘর থেকে প্রণবেশ উঠে এসেছিল। নকল পা পরবার সময় পায়নি, ক্লাচ বগলে দিয়ে এসেছে।

‘মা, কী হয়েছে? এমন চেঁচাচ্ছ কেন?’

‘আমাদের সর্বোনাশ হয়েছে, বাবা! বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমার লেপটা নামিয়ে দে বাবা। আমি যে ওই এক লেপেই বাকি জীবনটা কাটাবো ভেবেছিলাম।’

এই সোরগোলের মধ্যে আলো জ্বালাবার কথা কারও মনে হয়নি। আশালতা উঠে আলোর সুইচটা টিপেই চেঁচিয়ে উঠল, ‘পান্নরে, আলো জ্বলছে না তো!’

বাইরে থেকে সূদর্শনের গলা শোনা গেল, ‘পান্নবাবু, শিগগির একবার বাইরে আসুন। একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে।’

দরজা খুলে প্রণবেশ বাইরে এল।

‘তুই কোথায় যাচ্ছিস পান্ন? তুই গিয়ে কি করবি?’

‘চুপ করো দিদি! সত্যিই আগুন লেগেছে কিনা দেখে আসি।’

‘পান্ন রে, আমার লেপটা নামিয়ে দিয়ে যা বাবা!’

‘আঃ মা, একটু থামো তো!’ আশালতা শাড়ির আঁচলটাকে টেনে কোমরে গুঁজে নিল।

গুদামঘরের দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে কালো কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

আর পোড়া পোড়া একটা গন্ধ। শুদামঘরের ভেতরে যে আগুন লেগেছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

প্রণবশ বলল, ‘সুদর্শন, তুমি চিংকার করে পাড়ার লোকজনকে ডেকে তোলো। যতগুলো পারে। বালতি যোগাড় করে রেখো। আমি নরসিংহবাবুকে খবর দিই।’

দেড়তলার জানলায় মালতী এসে দাঁড়িয়েছে।

‘কি হয়েছে পানুদা?’

‘কে? মালতী? শুদামঘরে আগুন লেগেছে। তোমাদের ঘরে যে কটা বালতি আছে বার করে দাও তো। আর তোমার বাবাকে শিগ্গির ডেকে তোলো।’

‘তুমি একটু দাঁড়াও পানুদা, আমি আসছি।’

কথা বলতে বলতে প্রণবশ তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে এসেছে। মালতী দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

‘কোথায় যাক্ মালতী? তোমার বাবাকে ডেকে তোলো। শুদামঘরে আগুন লেগেছে যে!’

‘পানুদা তোমার পা কোথায়?’

‘পা পরবার সময় পাঠনি মালতী।’

‘তুমি একটু দাঁড়াও পানুদা, আমি তোমার পা এনে দিচ্ছি।’

প্রণবশ ততোক্ষণে দেড়তলার চওড়া সিঁড়িটাতে উঠে এসেছে।

‘আগে নিজেদের ঘর সামলাও মালতী। পরে আমার পায়ের কথা ভেবো।’

ঠক ঠক শব্দে প্রণবশ ওপরে উঠে গেল। আর মালতী তবুও দাঁড়িয়ে রইল চূপ করে। কী বলে গেল পানুদা? ঘর সামলাতে? মালতীর বয়ে গেছে। লাগুক আগুন। সেই আগুনে মালতী পুড়ে মরবে। পানুদা কি মালতীদের ঘরের বাইরে? ঘর সামলাতেই তো চেয়েছিল মালতী।

ঠক-ঠক শব্দটা দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় উঠে গেল।

একটু পরেই অরবিন্দ ঘোবাল একটুও শব্দ না করে দরজা খুললেন, তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর আরো এক-পা এগিয়ে এসে তাকালেন একতলার নামার সিঁড়ি দিকে। ঠিক! যা ভেবেছিলেন! শাড়ি-পরা একটা মূর্তি

চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হুঁ বাবা অরবিন্দ বোবালের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। অনেক দিন থেকেই তিনি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, আজ একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়তে হয়েছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে এখানে?’

যা ভেবেছিলেন, মূর্তিটা একেবারে চমকে উঠল।

‘মালতী নাকি?’

‘হ্যাঁ জেঠামশাই।’

‘সেই মাস্টার-ছোকরা চলে গেল বুঝি?’

‘কার কথা বলছেন জেঠামশাই?’

অরবিন্দ ঘোমাল গলাটাকে যতোটা সম্ভব মোলায়েম করে বললেন, ‘থাক মা, আর কথা ঢাকার চেষ্টা করতে হবে না।’

‘জেঠামশাই!’

দরজা বন্ধ করতে করতে অরবিন্দ ঘোমাল দাঁত চেপে ভেংচি-কাটার মতো করে বলে উঠলেন, ‘জেঠামশাই!’ কিন্তু তাঁর গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল, তিনি যতোটা না রাগ করেছেন তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন।

ঠক্-ঠক্ শব্দটা তিনতলায় এসে একটুখানি থেমেই ছাদের দিকে চলে গেল। আগে অমিয়নাথকে খবর দেবে প্রণবেশ। অমিয়দা সামনে থাকলে অনেকটা যেন ভরসা পাওয়া যায়।

প্রণবেশ কিন্তু আশা করেনি যে ছাদে গিয়ে অমিয়নাথকে ছাদের আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। কোন একটা হট্টগোল শুনে যদি কারও ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকে তবে সে এমন নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কি করে? কারও কোন বিপদ হয়েছে কিনা, সেই খোঁজটুকুও তো নেওয়া উচিত?

যতোটা ভরসা নিয়ে এসেছিল তা আর রইল না।

‘অমিয়দা, আপনি এখানে? নিচে চলুন, বাড়িতে বোধহয় আগুন লেগেছে।’

প্রণবেশ ভেবেছিল, খবরটা শোনার পরে অমিয়দার নিশ্চয়ই ভাবাস্তর হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠবেন, ‘তাই নাকি? কি সর্বনাশ! চলো, চলো, আগুন নেবাবার বন্দোবস্ত করি গিয়ে। কারও কোন বিপদ হয়নি তো?’

কিন্তু অমিয়নাথ নিতান্তই নিশ্চিন্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায়?’

অমিয়নাথের প্রশ্ন শুনে নয়, গলার স্বর শুনে প্রণবেশ ভয়ানক দমে গেল।

‘রেখাদি ! রেখাদি !’

হুম হুম করে কয়েকটা ঘা মারল দরজার ওপরে । আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সময়ে দু-দিকের দুটি দরজা খুলে বেরিয়ে এল রেখা ও সুবিমল ।

প্রণবেশ বলল, ‘রেখাদি, একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে ।’

‘সে কি !’ রেখা প্রায় একটা আতঁনাদ করে উঠল ।

‘ই্যা রেখাদি । নরসিংহবাবু ওঠেননি ? ওঁকে এক্ষুনি গুদামঘরের চাবি নিয়ে নিচে আসতে বলো ।’

‘তুমি কোথায় যাচ্ছ পান্নু ?’

‘আমি নিচে যাই রেখাদি ।’

ঠক-ঠক শব্দটা নিচে নামতে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে রেখাও আবার ঢুকল ঘরের ভেতরে ।

সুবিমলের ইচ্ছে ছিল প্রণবেশ চলে যাবার পরে রেখাকে বলবে, ‘আমার বড্ড ভয় করছে রেখা ।’ কিন্তু কথাটা বলার সুযোগ না দিয়েই রেখা ভেতরে ঢুকে গেল । আরেকটু অপেক্ষা করল না কেন রেখা ? কথাটা শুনে সুবিমলের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে পারত, ‘ভয় কি সুবিমল, আমি আছি ।’ ঠিক এই সময়ে রেখার মুখ থেকে এই কটি কথা শুনতে পেল খুশি হত সুবিমল ।

কি করবে সে এখন ? নিচে যাবে ? নরসিংহ তাকে এই দুর্দিনের বাজারে মাইনে দিয়ে গৃহশিক্ষক রেখেছে । নরসিংহের গুদামঘরে আগুন লাগলে তার তো ছুটে যাওয়াই উচিত । কিন্তু তবুও সুবিমল দাঁড়িয়ে রইল । শরীরটা কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছে । রেখা কি আর বাইরে আসবে না ?

ঠিক এই সময়ে নিচে থেকে অরবিন্দ ঘোষালের বোয়ের গলা শোনা গেল : ‘সরে যা এখন থেকে, সরে যা !’

ভদ্রমহিলার এই এক বাতীক । বেশ নাম দিয়েছে মালতী । বাতীকগিন্নী । কাকে সরে যেতে বলছেন বাতীকগিন্নী ? গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে আগুন নেবানো যায় নাকি ?

সুবিমল আন্তে আন্তে নিচে নামতে লাগল ।

উল্টো দিকের দু-তিনটে বাড়ির পরে এক দোতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, ‘ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছে ?’

চারদিকের হৈঠে আর সোরগোলের মধ্যে কথাটা কারও কানে গেল না।

‘আমার কথাটা একবার শুনুন। কায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছে কি?’

কারও কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে তিনি আপন মনে গজগজ করতে লাগলেন ‘এ পাড়ার লোকগুলো বড় হুজুগে! আসল কাজের বেলায় কেউ নেই।’ নিচের গলিতে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। আগুন লাগার খবরটা এই নিশুতি রাতেও ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। বড় রাস্তার দিক থেকে আর গলির ভেতরের দিক থেকে ছুটে আসছে দলে দলে মানুষ। কলকাতা শহরে রাস্তার ফুটপাথেই এত লোক শুয়ে থাকে যে লোকের মুখে মুখে আগুনের মতোই খবর ছড়ায়।

গলির মধ্যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে! জানলায় জানলার সন্ত-ঘুম-ভাঙা মুখ। দু-একটা বাচ্চা জেগে উঠেই চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। গরনা-পর্য একটা মেয়ে জানলার শিকের ওপরে মুখ চেপে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কি মনে করে কানের ছল আর গলার হার খুলে রেখে এল।

একটু দূরে একটা দেতলা বাড়ির পার্টিশন করা বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে শাড়ি সামলাতে সামলাতে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি হয়েছে দিদি?’ পার্টিশনের অন্ডদিকে দাঁড়িয়ে অপর একজন মহিলা মন্ত একটা হাই তুলে জবাব দিলেন, ‘ওই কয়লার দোকানটা লুট হচ্ছে।’

মানুষবয়সী একটা লোক ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে এসে এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় আগুন লেগেছে, কোথায়?’ সে কথা শুনে আরো দুজন লোক পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় আগুন লেগেছে, কোথায়?’ ঠিক এমনি সময়ে গুদামঘরের ভেতরে হুম করে একটা আওয়াজ হল। চমকে উঠে এক-পা সরে এল লোকটি। ‘আরে বাবা, এ যে বোমা ফাটে দেখছি।’ তারপর পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে গলা কাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘হাঁ করে দেখছেন কি? জল আনুন, জল!’

জল! জল! চারদিকে একটা রব উঠে গেল।

দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক আবার বললেন, ‘না, এই পাড়ার লোকগুলো বড়ো হুজুগে!’

পাড়ার কয়েকটি ছেলে এর মধ্যেই একটা দল তৈরি করে ফেলেছে। বালতিও ষোগাড় হয়েছে গোটাকতক। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে জল আনবার ব্যবস্থা করছে।

একটু দূরে হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে আতুড় গায়ে চপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘাড় উঁচিয়ে দু-তিন বার বাতাস শুঁকে নিয়ে পাশের ছেলেটাকে বলল, ‘মড়া-পোড়ার মতো গন্ধ বেরোচ্ছে, না রে?’ পাশের ছেলেটা বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, ‘এটা কন্টেইনের চালের গুদাম কিনা, তাই।’

যে লোকটি একটু আগে ‘কোথায় আগুন লেগেছে, কোথায়?’ বলে চিৎকার করছিল সে এখনো ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে সমানে চিৎকার করছে, ‘দরজাটা ভেঙে ফেলুন না! ভেঙে ফেলুন! আগুন ছড়িয়ে পড়লে সর্বনাশ হবে যে!’ গলিটা এমনিতেই সরু। একটা লরি এসে দাঁড়ালে রিক্শা যাবার রাস্তাটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অনেক দূরে দূরে এক-একটা আলো। পাশের মানুষের মুখও স্পষ্ট দেখা যায় না। কাজেই মানুষের ভিড়ে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গিয়েছে। গুদামঘরের বন্ধ দরজা-জানলার কঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা কালো ধোঁয়ায় আর মানুষের কালো মাথায় আরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। বারো পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে তারা মাঝে মাঝে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে উঁচিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করছে, আগুনটা কোথায় লেগে থাকতে পারে। হুম-হুম শব্দ আর পোড়া-পোড়া গন্ধটা না থাকলে অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে চলে যেত।

হুম করে একটা শব্দ-হতেই ভিড়ের মধ্যে পেছন দিকে একটা ঠেলা পড়ল। সামনের লোকগুলো পিছিয়ে আসতে চাইছে।

দু-তিন বার জোরে জোরে ঠেলা দিতেই নরসিংহ আ-আ করে চিৎকার করে উঠল।

‘শুনছ! ওঠো, ওঠো। সর্বনাশ হয়েছে।’

পাশ ফিরে শুয়ে নরসিংহ বলল, ‘অন্ধকারই তো ভালো।’

রেখা আরো জোরে একটা ধাক্কা মারল। এ তো আচ্ছা ক্যাসাদ দেখছি। এমন ঘুমের ওষুধও মানুষে খায়!

‘শুনছ! সর্বনাশ হয়েছে! শুনছ!’

নরসিংহ চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কে?’

‘আমি রেখা। ওদিকে সর্বনাশ হয়েছে! গুদামঘরে আগুন লেগেছে।’

নরসিংহের চোখ থেকে সমস্ত ঘুম ছুটে গেল।

‘একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে!’

‘মা !’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলবো না । ভেবেছিলাম, ওই এক লোপেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব ।’

‘তুমি চূপ করবে !’

ছাদের আলসের খুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল অমিয়নাথ । কালো ধোঁয়া আর মানুষের কালো মাথা । বিল্ডী একটা হট্টগোল । এই ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে নিচে নেমে লাভ কি ! তামাসা দেখার শখ অমিয়নাথের নেই ।

তামাসা বৈকি । শাড়িতে আগুন লেগে সবিতা যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনও ঠিক এমনি ভিড় হয়েছিল । বাড়ির ভেতরে চেনা লোকের ভিড়, বাড়ির বাইরে অচেনা লোকের ভিড় । অমিয়নাথকে খুঁজে খুঁজে বার করে সমবেদনা জানিয়েছিল সকলে । আহা-উঁহ ছাড়া কথা ছিল না কারও মুখে । অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অমিয়নাথ । পৃথিবীতে এত লোক তার সমব্যথী ? এত লোক তাকে এমন আপন জন বলে ভাবে ?

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তুল ভেঙেছিল অমিয়নাথের । সেই লোকগুলোই আড়ালে গিয়ে তার সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করেছিল তা তার কানে পৌঁছে দেবার লোকেরও অভাব হয়নি । মানুষের মনের মধ্যে যে এতখানি বিষ থাকতে পারে সে-ধারণা অমিয়নাথের ছিল না । অমিয়নাথ তো কাউকে ডেকে পাঠায়নি । সবাই যেচে এসেছিল । মনের মধ্যে এত বিষ নিয়ে মুখে এমন দরদ দেখাবার তো কোনো দরকার ছিল না । বরং সাপের সঙ্গে ঘর করা ভালো । মানুষের সঙ্গে কিছুতেই নয় । মানুষ সাপের চেয়েও ভয়ংকর ।

আজ যদি নরসিংহের গুদামে আগুন না লেগে নরসিংহের বোয়ের শাড়িতে আগুন লাগত তাহলেও এই লোকগুলো এমনি ভাবে ভিড় জমাত । সামনে দরদ দেখিয়ে আড়ালে গিয়ে মন্তব্য করত : ‘বোটা মরে বেঁচেছে !’ ‘তোমরা বলো পাগল, আমি বলি শয়তান, ও নিজেই নিজের বোকে পুড়িয়ে মেরেছে !’ ‘বোটার গায়ে একরত্তি সোনাও রাখেনি গা ! কি সুখে ও আর বাঁচত বলো !’ আরো কত কি । না, এই তামাসা-দেখতে-আসার দলে ভিড় বাড়াবার জন্তে অমিয়নাথ নিচে বাবে না ।

সত্যবতীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ।

ধড়মড় করে উঠে বসে তিনি চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল মালতী ঘরে নেই। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। মালতীর ঘরে না-থাকার সঙ্গে বাইরের হট্টগোলের ভয়ংকর একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়ে তিনি দর-দর করে ঘামতে লাগলেন। চিৎকার করে উঠতে চাইলেন কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। তাঁর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল।

আর মানুষটা দিবি্য কেমন ঘুমোচ্ছে! এত ঘুমও হয় বাবা মানুষের! সারা পাড়ার লোক জেগে উঠেছে অথচ এই মানুষটার ঘুম ভাঙল না! পেটে খিদে নিয়েও এমন মড়ার মতো ঘুমোনো যায়!

বাইরের হট্টগোলটা ক্রমেই বাড়ছে যেন। তবে কি মালতী...না, না, মালতী তেমন মেয়েই নয়। কী যা-তা ভাবছেন তিনি মালতীর সম্পর্কে। হয়তো হট্টগোল শুনেই মালতী বাইরে গিয়েছে দেখতে। এক্ষুনি ফিরবে। ফিরে এলে প্রচণ্ড একটা ধমক দেবেন তিনি মালতীকে। আঠারো বছরের সোমন্ত মেয়ে রাতবিরেতে এভাবে একা একা বাইরে যায়?

আর এই মানুষটার কোনো দিকেই যেন হুঁশ নেই। কতবার তিনি বলেছেন, 'মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো, এতবড়ো মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখেছ, কোন্‌দিন কি বিপদ ঘটে যাবে!' কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর কথায় কেউ কান দেয়! ঝি-ঝাদীর মতো তিনি শুধু সারা জীবন খেটেই মরলেন।

বাইরে এত হট্টগোল কেন? একসঙ্গে এত লোক চিৎকার করছে যে কারও কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। ওটা কার গলা? পানুর না? নিশ্চয়ই পানুর। ওই তো মালতীর গলাও শোনা যাচ্ছে।

যাক্ পানু যেখানে আছে সেখানে মালতীর কোনো বিপদ হবে না। সত্যবতী ঝানিকটা নিশ্চিত হতে পারলেন। কিন্তু বাইরে এত হট্টগোল কেন?

'মাসীমা! মাসীমা!'

'কে?' এতক্ষণে সত্যবতীর গলা দিয়ে শব্দ বেরুল।

'আমি সুবিমল।'

অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল কুপানাথের। ভীষণ গরম লাগছে। গায়ের জামাটাও ঘামে ভিজ়ে উঠেছে মনে হয়। পাখাটা চলছে না কেন?

বিছানা ছেড়ে উঠতে হল কুপানাথকে। হাতড়ে হাতড়ে পাখার সুইচটা খুঁজে

পাওয়া গেল। 'না, সুইচ তো টেপাই আছে। তবে? বার দুয়েক সুইচটাকে উঠিয়ে-নামিয়েও পাখাটাকে চালানো গেল না। আলোর সুইচ টিপল। আলোও জ্বলছে না।

নিজেকে কেমন অসহায় মনে হতে লাগল রূপানাথের। পাখা না চললে তার ঘুম আসবে না। আর রাত্রিবেলা ঘুম না হলে দিনের বেলা শরীরটা এত খারাপ থাকে যে কাজেকর্মে মন বসানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষের এই যন্ত্রনির্ভরতাই মানুষের সর্বনাশ করবে। পৃথিবীর আকাশে এত হাওয়া অথচ তাকে একটু হাওয়া পাবার জন্তে পাখা চালাতে হচ্ছে। পাখা চালাবার জন্তে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের জন্তে যন্ত্র। কি বিলী ব্যবস্থা। এক জায়গায় কল বিগড়োলেই দশ জায়গায় তার টান পড়ে। বিষয়টি নিয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লেখা চলে কিন্তু।

রাস্তা থেকে অনেক লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে কেন? সত্যি কলকাতা শহরে দিনে রাতে কোনো তফাৎ নেই। দিনের বেলাও হৈ-হল্লা, চিৎকার, রাত্রিবেলাও তাই। এর চেয়ে কোনো পাড়ারগাঁয়ে গিয়ে থাকা ভালো। কিংবা কোনো সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের ধারে থাকার একটা সুবিধে এই যে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দে অন্য সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে যায়। হ্যাঁ, শব্দ যদি শুনতেই চাও তো সমুদ্রের শব্দ শোনো। পৃথিবীর আদিম শব্দ।

জানলার রেলিংয়ের ওপর মুখ চেপে নিচের গলিটা একবার দেখতে চেষ্টা করল রূপানাথ। তিনতলা থেকে সরু গলিটারও আরো সরু একটা চিলতে দেখা যায় মাত্র। কিন্তু সেটুকু দেখেই রূপানাথের ধারণা হল, কালো এফটা ঢেউ সমুদ্রের মতোই ছলছে।

হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুলে ছাদের দিকে পা বাড়াল রূপানাথ। এমনিতে ঘুম আসবে না। তার চেয়ে বরং ছাদে গিয়ে শরীরটা জুড়িয়ে আসা যাক। নিচের রাস্তাটাকেও ছাদ থেকে আরো ভালোভাবে দেখা যাবে।

একদল লোক গুদামঘরের দরজাটা ভাঙতে চেষ্টা করছে। পাড়ার ছেলেরা হাতে হাতে কয়েক বালতি জল এনে জড়ো করছে বন্ধ দরজাটার সামনে। জায়গাটা এখনো তেমনি অন্ধকার।

নানা ধরনের মস্তব্য শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে : 'আরে মশাই সবাই মিলে একসঙ্গে ধাক্কা মারুন না!' 'রেশনের চাল খেয়ে কি আর লোহার দরজা ভাঙা যায়!' 'অত জোর ফলাবার দরকার কি? মালিক এসে দরজা খুলুক,

ভারপর দেখা যাবে!’ ‘কয়েক বালতি বালি যোগাড় করে আনতে পার হে!’ ‘এ বাড়ির লোকগুলো তো আচ্ছা! সারা বাড়ি অঙ্ককার করে এখনো কেমন ঘুমোচ্ছে দেখ!’ ‘গতিক সুবিধের নয় হে, চলো পালাই! এই গুদামঘরের ভেতরে গোলাবারুদ ঠাসা আছে মনে হচ্ছে।’ ‘ইংরেজ আমলে কিন্তু আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল এসে হাজির হত!’

দমকলে খবর দিতে গিয়েছিল প্রণবেশ। খবর দেওয়া মানে, বড়ো রাস্তার মোড়ে গিয়ে লাল রঙের বাক্সের কাঁচ ভেঙে হাতল ঘুরিয়ে আসা। কিন্তু অনেকবার হাতলটা ঘুরিয়ে এসেও মনটা খুঁৎখুঁৎ করছে প্রণবেশের। খবরটা ঠিক পৌঁছলো তো? এজন্তেই পাড়ায় একটা টেলিফোন থাকা দরকার। টেলিফোনে খবর দিলে নিশ্চিত।

কিরে এসে বাড়ির কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়াটাই প্রণবেশের পক্ষে একটা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সবাই তাকে বাধা দেয়। ‘আপনার তো শখ কম নয় মশাই! কাঠি বগলে গুঁজে আগুন দেখতে এসেছেন!’

সবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে কোনো রকমে প্রণবেশ খানিকটা এগিয়ে আসে। এখন বুঝতে পারছে, দিদি আর মালতীর কথা শুনে নকল পা পরে এলেই ভালো করত সে। তাহলে এত কথা শুনে হত না বা এত কৈফিয়ৎ দিতে হত না। ব্যাপারটা প্রণবেশের কাছে ভারি বিত্তি লাগে। তার যে একটা পা নেই, সে কথাটা পৃথিবীস্বক্ লোক তাকে সব সময়ে মনে করিয়ে দিতে চায়।

‘পারুদা! পারুদা!’

একি, মালতীর গলা না? হ্যাঁ, তাই তো।

‘মালতী, এই যে আমি, এই যে!’

‘পারুদা, তুমি এখানে? শিগগির চলো। মাসীমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন।’

‘মা! কেন!’

‘আশাদি তোমাকে ডাকছে। একুনি চলো।’

প্রণবেশ বলল, ‘মালতী, তুমি আমার জন্তে একটু রাস্তা করে দাও। আমি একা যেতে পারছি না।’

‘এসো।’ বলে মালতী হাত বাড়িয়ে দিল।

নরসিংহ পাগলের মতো নিচে নামছে। এই গুদামঘরটা সম্পর্কে অনেক দিক

সামলিয়ে চলতে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু আগুন লাগার কথা কোনো দিন মনে হয়নি। ঘুম থেকে তুলে রেখা যখন তাকে খবরটা শুনিয়েছিল তখনো সে ঠিক বুঝতে পারেনি খবরটা কতখানি ভয়ংকর।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে এক এক ধাপ নিচে নামছে আর তার চোখের সামনে থেকে যেন এক একটা পদ সরে যাচ্ছে। তার ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রুর দলও বেড়েছে। তার সর্বনাশ চায় এমন লোকের অভাব নেই। এমন কি পুলিশও তার পেছনে লেগেছে। কোনো রকমে যদি জানাজানি হয়ে যায় যে তার গুদামঘরে কাপড়ের গাঁটের মধ্যে গাঁজা আফিম আর মদের বোতল লুকোনো আছে তাহলে তার সর্বনাশ আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। আর ঠিক এই সময়েই! আর সাতটা দিন হাতে পেলেই অবস্থাটা অন্তরকম হয়ে যেত! এবারের মালটা চালান হয়ে যাবার পরে তাদের বিশ্বের বার্ষিকীকে উপলক্ষ করে মস্ত একটা পার্টি দেবে ঠিক করেছিল সে। রেখাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরিও শুরু করেছিল সেজন্তে। বাছাই করা কয়েকজন লোককে সোনার ক্রেমে বাঁধানো তাদের দুজনের ফটো উপহার দেবার ব্যবস্থাও তো প্রায় ঠিক। আর এই সময়েই কিনা ভরাডুবি হতে বসেছে! নাঃ, এবার থেকে বড়ো রকমের ব্যবসাতে হাত দেবার আগে আরো ভালো জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে চলবে।

‘নিচে নামছ নাকি বাবাজী?’ দোতলার অরবিন্দ ঘোষাল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

‘হ্যাঁ।’

‘একতলার গুদামঘরে নাকি আগুন লেগেছে?’

‘শুনছি তো।’

অরবিন্দ ঘোষালের পাশ কাটিয়ে নরসিংহ নিচে নামতে লাগল।

অরবিন্দ ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে দু-ধাপ নেমে এলেন।

‘বাবাজী, তোমার নিজের ঘরেই পাপ পুষে রেখেছ। এ হচ্ছে সেই পাপেরই ফল। ভালো চাও তো পাপ বিদেয় করো।’

নরসিংহ কোনো জবাব না দিয়েই নিচে নামতে লাগল।

ধড়মড় করে উঠে বসল রামকান্ত।

‘এঁটা সুবিমল? কি বললে? আর একবার বলো তো?’

‘একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে।’

‘আগুন ! বলো কি ? কি করে লাগল ?’

সত্যবতী এবার ধমক দিয়ে উঠলেন, ‘এখন অত সাতকাণ্ড বিস্তার্ত্ত গুনতে হবে না।

আগে নিচে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ করো তো দেখি।’

রামকান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘কার খোঁজ করব ?’

‘তোমার পিণ্ডির খোঁজ করবে। মালতী যে ঘরে নেই তাও বুঝি চোখে পড়ে না ?’

‘কেন, মালতী কোথায় গেছে ?’

সত্যবতী সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাবা সুবিমল, দেখছ তো কী মানুষকে নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয় ! তুমি একটু নিচে গিয়ে মালতীর খোঁজ করবে বাবা। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি !’

বিশুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করল, ‘কি হয়েছে সুবিমলদা ?’

‘এক তলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে বিশু।’

বিশু একলাফে উঠে দাঁড়াল : ‘আগুন ! আমি একটু দেখে আসি মা।’

সত্যবতী বললেন ‘এই ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা !’

সুবিমল বলল, ‘আমিও নিচে যাই মাসীমা, মালতীর খোঁজ নিয়ে আসি।’

‘যাও বাবা, আর ধিক্কী মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে ঘরে পৌঁছে দিও।’

সুবিমলের সঙ্গে সঙ্গে রামকান্তও বাইরে বেরিয়ে এল।

‘আচ্ছা সুবিমল, গুদাম ঘরটায় কী আছে বলো তো ?’

‘তা তো জানি না।’

‘আহা বলোই না !’

‘আমি সত্যিই জানি না।’

‘জানলে ভালো করতে সুবিমল ! দু-এক বস্তা চাল আছে কিনা, সে ধবরটুকুও যদি অন্তত রাখতে ! জান, এর আগে আমরা যে পাড়ায় ছিলাম সেখানে এক বস্তির আলুর গুদামে আগুন লেগেছিল। বস্তির লোকদের তারপরে সাতদিন আর বাজার করতে হয়নি।’

সুবিমল চুপ করে রইল। বাড়িতে আগুন লাগলে অনেকের নাকি নার্তসা ব্রেকডাউন হয় ! রামকান্তও পাগল হল নাকি ?

এ সময়ে ছাদে কোন লোক থাকতে পারে তা কৃপানাথ ভাবেনি। কিন্তু ছাদে

পা দিয়েই চোখে পড়ল, আর একটি লোক ছাদের আলসেয় ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। খুশি হল কৃপানাথ। যাক, তবু দু-একটা কথা বলার লোক পাওয়া গেছে। এমনিতেও খুম আসবে না। না হয় একটু গল্পই করা যাক।

দু-পা এগিয়ে এসে কৃপানাথ জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, নিচে এত হল্লা কিসের?’
অমিয়নাথ চমকে ফিরে তাকাল। অমিয়নাথ তখন ভাবছিল ছ-মাসের সেই ছোট্ট বাচ্চাটার কথা। সবে দাঁত উঠতে শুরু করেছিল। হাসলে পরে সামনের মাড়িতে সাদা একটা ঝিলিক দেখা যেত। কি যে ছরস্তু ছিল! একদিন অমিয়নাথের অনেক পরিশ্রম করে আঁকা একটা ড্রইংয়ের ওপরে এক দোয়াত কালি উলটিয়ে দিয়েছিল। সবিতা কি খুশি! হাসতে হাসতে বলেছিল, ‘দেখো, বড়ো হয়ে ও আমার দুঃখ বুঝবে।’ সবিতা অনেক রাগ-অভিমান করেও অমিয়নাথের একটিও ড্রইংও মুছতে পারেনি। সবিতার তো খুশি হবারই কথা।
‘আচ্ছা, নিচে এত হল্লা কিসের?’

চমকে ফিরে তাকাতে হল অমিয়নাথকে। এই পৃথিবীতে একা থাকার জায়গা বড়ো কম। ঘরের বাইরে পা দিলেই কোনো না কোনো মানুষের সঙ্গে ঠোঁকর খেতে হয়। ভারি বিত্রী।

‘একতলার গুদামে আগুন লেগেছে।’

‘তাই নাকি?’ বলে কৃপানাথ অমিয়নাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

অরবিন্দ ঘোষালের কথা শুনে সত্যি সত্যিই মরতে ইচ্ছে হয়েছিল মালতীর। হি! হি! ঝাঁকে সে জেঠামশাই বলে ভক্তি করে তিনিই কিনা এমন একটা কুৎসিত উদ্ভিত করে গেলেন।

ভালোই হয়েছে বে একতলার গুদামে আগুন লেগেছে। এই আগুনে বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। বড়ো নোংরা জমেছে এই বাড়ির ভেতরে।

‘সরে যা এখন থেকে, সরে যা!’ গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে বাতিকগিন্নী বেরিয়ে এলেন।

মালতীর মনে পড়ে গেল সুবিমলদা ও তাকে লক্ষ্য করে একদিন বাতিকগিন্নী বলেছিলেন, ‘চুপ দেখে বাচিনে!’ কথাটা সেদিন গারে মাখেনি। আজ কিন্তু বাতিকগিন্নীকে দেখেই সারা গায়ে জ্বালা ধরে গেল।

‘জ্যেষ্ঠিমা, আপনি বরং নিচে গিয়ে একতলার গুদামঘরে একটু জল ছিটিয়ে আসুন। আপনার ভয়ে আগুন হয়তো পালিয়েও যেতে পারে।’

‘মালতী বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

‘আগুনের কথা কি বলছিস?’

খুব স্বাভাবিক গলার স্বর। রাগ বা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। খোঁচা দিয়ে কথা বলার জন্যে মালতীর একটু লজ্জা হল।

‘জ্যেষ্ঠিমা, আপনি জানেন না, একতলার গুদামঘরে আগুন লেগেছে?’

‘আগুন! বলিস কি মালতী?’

‘হ্যাঁ জ্যেষ্ঠিমা।’

গঙ্গাজলের পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাতিকগিন্নী বললেন, ‘তুই বুঝি খুব ভয় পেয়েছিস, মালতী? আয়, আমার কাছে আয়, ভয় কি!’

আগুনকে নয়, বাতিকগিন্নীর এই স্বাভাবিক ও শাস্ত্র গলার কথাগুলো শুনে ভয় করতে লাগল মালতীর।

‘আয়।’ বলে বাতিকগিন্নী নিচে নেমে এসে মালতীর হাত ধরলেন।

ঘরের ভেতরে ধোঁয়া ঢুকছে। গলির দিকের জানলাছুটো বন্ধ করে দিল আশালতা। এতক্ষণ অন্ধকার ঘরের মধ্যেও অস্পষ্ট একটা ছায়ার মতো গিরিবালাকে দেখা যাচ্ছিল। জানলা বন্ধ করে দিতেই ঘরের অন্ধকার দানা বাঁধল যেন।

এই ভালো। একতলার গুদামে আগুন লেগেছে। লাগুক। আশালতা এমনি অন্ধকারেই বসে থাকবে, যে অন্ধকারে নিজেকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। একতলার আগুন যতো আলো আর উত্তাপই ছড়াক না কেন, আশালতার কিছু যায় আসে না।

‘আশা, তুই কোথায় গেলি?’

‘এই তো মা, ঘরেই আছি।’

‘পায়ের তলায় ছঁয়াকা লাগছে যে।’

আশালতা বলল, ‘এত অস্থির হচ্ছে কেন মা, একতলায় আগুন লাগলে দোতলার মেঝে একটুখানি গরম হবেই। চৌকির ওপরে পা তুলে চূপটি করে বসে থাকো।’

কিছুক্ষণ চূপচাপ। জানলা বন্ধ করে দেবার পরে বাইরের হট্টগোলটা চাপা একটা গোঙানির মতো শোনাচ্ছে। সিঁড়িতে মাঝে মাঝে দু-একজনের পারের শব্দ। তাও খুব চাপা! পোড়া গন্ধটাও প্রায় না থাকার মতো। আশালতার মনে হতে লাগল, মাত্র দুটি জানলা ও একটি দরজা বন্ধ করেই সে বাইরের পৃথিবীর সমস্ত আলো-উত্তাপ-শব্দ-গন্ধকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। কত শক্ত কাজ অথচ কত সহজ!

আশালতার নিজের জীবনটাও এমনি একটা দরজা-জানলা বন্ধ করা ঘরের মতোই। জীবনের সমস্ত আলো-উত্তাপ-শব্দ-গন্ধকে আশালতা শুধু একটা অসম্মতির আড়াল তুলে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি আড়াল তুলতে পেরেছে কি? মাঝে মাঝে একটা চাপা গোঙানির ওপরে এই বলে জল ছিটোতে হয়নি কি যে আমি একটা মস্ত আত্মত্যাগ করছি, আমার এই আত্ম-ত্যাগেই আমি মহৎ।

কিন্তু কি লাভ! পৃথিবীটা ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত রোজকার বাজারের হিসেব রাখার খাতার পাতায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার বাইরে আর কিছু থাকেনি।

‘আশা!’

‘কি মা?’

‘চল আমরা ছাদে যাই। এ ঘরেও আগুন লাগতে পারে।’

‘তা পারে।’

‘পাল্লকে একবার ডাক না?’

‘পাল্লকে ডাকাডাকি করে লাভ নেই মা, ও আসবে না।’

‘তোমার কি হয়েছে বল তো আশা?’

‘কিছু না মা।’

:

‘অমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকিস নে আশা। আর দুজনে মিলে ঘরের জিনিস-পত্রগুলো একটু গুছিয়ে নিই। ঘরে যদি সত্যিই আগুন লাগে! আমার লেপটা একটু নামিয়ে দে আশা।’

‘আচ্ছা দিচ্ছি।’ বলে আশালতা উঠে দাঁড়াল, ‘আচ্ছা মা, তোমার তো বাকি জীবনটা এই একটা লেপেই কেটে যাবে, না? যতো শীতই পড়ুক তোমার শরীরটা কখনো ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে যাবে না। বাকি জীবনের জন্তে তুমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মা, আমার কথা তো তুমি ভাবছ না! শীতকালের জন্তে

আমারও তো একটা উত্তাপের সঞ্চয় থাকা দরকার। আমি কি করি বলো তো ?
গিরিবালায় কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে আশালতা হাতড়ে হাতড়ে
এগিয়ে এল।

‘মা ! মা ! কি হল তোমার ?’

গিরিবালায় কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। দরজা খুলে বাইরে
বেরিয়ে এল আশালতা।

‘মালতী ! মালতী !’

‘কি বলছ আশাদি !’ মালতী ধারেকাছেই ছিল।

‘নিচে গিয়ে শিগগির একবার পান্নুকে খবর দে তো। বলবি, মা অজ্ঞান হয়ে
গিয়েছে।’

গলিতে পা দেবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নরসিংহ। না, তার শুনতে ভুল
হয়নি। গুদামঘরের ভেতর থেকে দুম্ করে একটা আওয়াজ হয়েছে। ইলেক্ট্রিক
বাল্ব কাটলে যেমন আওয়াজ হয় অনেকটা তেমনি। নরসিংহ এই আওয়াজের
কারণ জানে। কাপড়ের গাঁটের ভাঁজে ভাঁজে যে বোতলগুলো রয়েছে সেগুলো
কাটতে শুরু করেছে। এখন আর দু-চার বালতি জল ঢেলে এই আগুন নেবানো
যাবে না। বোতলের ভেতরকার তরল পদার্থে আগুন আরো দাউ দাউ করে
জ্বলে উঠবে। এখন দমকল এসে পৌঁছবার আগেই গোটা গুদামঘরটা পুড়ে
একেবারে ছাই হয়ে যায় তবেই রক্ষে। কিন্তু সে আশা খুবই কম। দমকলে
কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে। কতক্ষণ আর দেরি হতে পারে ?

নরসিংহ একবার চারদিকটা ভালো করে দেখে নিল। ইস, সারা গলিটা শুধু
মানুষের কালো মাথায় ঠাসা। প্রত্যেকটা বাড়ির বারান্দায় জানলার আর ছাদে
মানুষ। মাঝরাস্ত্রের আগুন লাগলেও এত লোক জড়ো হতে পারে, সে-ধারণা
নরসিংহের ছিল না। গুদামঘরটাকে সে সমস্ত মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে
চেরেছিল, আর সেই গুদামঘরের ওপরেই সমস্ত মানুষের চোখ এসে পড়েছে !

না, ফিরে যাওয়াই ভালো। তাকে এখনো কেউ চিনতে পারেনি। সেও ধরা
দেবে না। গুদামঘরের আড়াল ভেঙে পড়ুক কিন্তু তাকে যে-করে হোক
আড়ালে থাকতেই হবে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা-দুটো কথা বলাতেই হয়েছে। একটা-

ছুটো কথা থেকে আলাপ। আলাপ থেকে পরিচয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অমিয়নাথ তার যন্ত্রের কথা বলতে আরম্ভ করল।

‘লোকে বলে এটা হচ্ছে থার্মাল-পাওয়ার আর হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটির যুগ। এ-যুগে আমার এই যন্ত্র অচল। কিন্তু আমার ধারণা, বিশেষ করে আমাদের দেশে এই যন্ত্রকে যথেষ্ট কাজে লাগানো যাবে।’

নিচের মানুষগুলো হঠাৎ একসঙ্গে প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে উঠল। কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। অথচ ভালো করে কিছুই দেখা যায় না। কালো ধোঁয়া ঝুলে আছে পদার মতো।

কৃপানাথ বলল, ‘হুঁ।’

অমিয়নাথ আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, ‘মাত্র হাজার দশেক টাকা চাই আমি। তাহলেই ছোটখাটো একটা কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। ছ-মাসের মধ্যে এই যন্ত্র তৈরি করতে পারা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।’

কৃপানাথ বুঁকে পড়ে দেখছিল, হঠাৎ বলল, ‘আচ্ছা, লোকগুলো এমন ছুটোছুটি করছে কেন? আমি এর অর্থ বুঝি না। এই অহেতুক উত্তেজনা, এই অনর্থক হাত-পা নাড়া—কি লাভ! আপনি এক কাজ করুন না! আপনার এই যন্ত্রের বিষয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে কাগজে ছাপিয়ে দিন। লোকে জাহ্নুক। দমকল আসছে না কেন বলুন তো?’

‘যতোকণ দমকল না আসে ততোকণই তো তামাসা দেখার সুবিধে। লোকে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? আমার নামের পেছনে কোনো বড়ো ডিগ্রি নেই, আমি বিলেত ঘুরে আসিনি। সত্যিকারের যন্ত্রটা তৈরি করে তবে আমাকে লোকের কাছে যেতে হবে। কি বিল্ডি ধোঁয়া দেখেছেন!’

দু-বার হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে কৃপানাথ বলল, ‘আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমি ঠিক যেমনটি বলব তেমনটি করতে হবে আপনাকে। বলুন, রাজি?’

‘কী করতে হবে আমাকে?’

কৃপানাথ অল্প একটু হাসল : ‘বিশেষ কিছুই নয়। আপনার যন্ত্রটাকে শুধু একবার উল্টিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ যন্ত্রের শুরুটা হবে শেষ আর শেষটা হবে শুরু।’

‘তার মানে?’

‘মানে খুবই সহজ। আপনি চেষ্টা করছেন, হারিকেনের বাতি জালিয়ে মোটর

বা ডায়নামো চালাতে। তার কোনো দরকার নেই। চেষ্টা করুন মোটর বা ডায়নামো চালিয়ে হারিকেনের বাতি জ্বালাতে।’

অমিয়নাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তাতে লাভ কি?’

‘আপনার কাছ থেকে লাভের হিসেব তো কেউ চায়নি। আপনি কি চান? একটা কীতি রেখে যাবেন—এই তো? তাহলে এই যন্ত্র কতটা কাজে লাগছে তা দেখার দরকার নেই। মন্ত একটা কাণ্ড ঘটানো যাচ্ছে কিনা সেটাই আসল কথা। যেমন ধরুন, ফসল বাড়ানোর কথা আজকাল সবাই বলছে। কিন্তু সেজন্তে কি ট্রাক্টর চালাতে হবে? ভালো সার তৈরি করতে হবে? কোনো দরকার নেই। বরং সরকারী দপ্তরখানার ছাদের ওপরে মাটি ঢেলে লাঙল চালাবার ব্যবস্থা করুন। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির কথা বলছিলেন। বেশ তো, সারা দেশ জুড়ে হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্টেশন তৈরি হোক। কিন্তু তারপর? ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলবে? কুটির-শিল্পে ইলেকট্রিক মোটর বসবে? কোনো দরকার নেই। বরং নতুন ধরনের গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করার জন্তে মন্ত একটা কারখানা চলুক। আজকাল অ্যাটমিক এনার্জির কথা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই, আমাদের দেশেও অ্যাটমিক পাওয়ার-স্টেশন দরকার। কিন্তু তারপরে যদি একটা থিসিস লিখে প্রমাণ করতে পারেন যে অ্যাটমিক এনার্জির সাহায্যে বিনা আয়াসে কুয়ো থেকে জল তোলা সম্ভব—তাহলে অন্তত ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনি হয়তো ডক্টরেট উপাধি পেয়ে যাবেন। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?’

নিচের অন্ধকার রাস্তাটায় হঠাৎ আগুনের একটা বলক এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা সোঁরগোল। কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। আগুনের ফুল্কি ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পাড়ার ঘরে ঘরে এতক্ষণ আলো দেখা যাচ্ছিল। এবার মনে হল, পৃথিবীর আদিম অন্ধকার সারা পাড়াটাকে গ্রাস করেছে।

অমিয়নাথ বলল, ‘কি ভীষণ আগুন লেগেছে দেখেছেন? দমকল আসে না কেন?’ রূপানাথ খুঁকে পড়ে আগুন দেখছিল। আগুনের দিকে চোখ রেখেই বলল, ‘দমকল আসার আগেই গুদামঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে যবে মনে হয়। তা বাক। কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার মনে ধরেনি বুঝতে পারছি। বেশ তো, লেগে থাকুন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একদিন আপনাকে মেনে নিতে হবে যে আমি ভুল বলিনি। অবশ্য তার আগেই যদি না—’

‘যদি না?’

‘যদি না যে-কাঠামোর মধ্যে আমরা দেশটাকে পুরে রেখেছি সেই কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। এই গুদামঘরটার আচমকা এমন আগুন লাগবে কেউ ভাবতে পেরেছিল? এখন হাজারটা দমকল এসে চেষ্টা করলেও গুদামঘরের সেই পুরনো চেহারা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? নিচে নিশ্চয়ই একটা কিছু কাণ্ড ঘটেছে।’

অমিয়নাথও চমকে উঠেছিল। নিচের সমস্ত সোরগোলকে ছাপিয়ে একটা মেয়েলী গলার আর্ত চিংকার শোনা যাচ্ছে।

চিংকার করে উঠেছিল মালতী।

একদল লোক গুদামঘরের দরজাটা ভাঙতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদের কোনো ধারণা ছিল না, দরজা-জানলা-বন্ধ ঘরের মধ্যে আগুন কতখানি ছড়িয়েছে। অল্প চেষ্টাতেই তালাটা ভেঙে গেল। তারপর লোহার দরজাটা ঠেলে ওপরে তুলতে গিয়েই আতকে উঠে সরে আসতে হল লোকগুলোকে। দরজা আর মেঝের মাঝখানে একটুখানি ফাঁক হতেই রাশি রাশি কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এসে লোকগুলোকে গিলে ফেলেছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আগুনের একটা তরল শিখা গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এসেছে দরজার ফাঁক দিয়ে।

ভীষণ একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। সামনের লোক পেছনের লোকের গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আর পেছনের লোকের সরে দাঁড়াবার জায়গা নেই বলে তারা পাল্টা ধাক্কা দিচ্ছে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কালো ধোঁয়া লোকগুলোকে ঘিরে পাক খেতে খেতে শূন্যে উঠছে।

প্রণবেশকে সঙ্গে নিয়ে মালতী ভিড়ের মধ্যে পথ করে করে এগিয়ে আসছিল। ধোঁয়ার আর ঠেলাঠেলিতে দিশেহারা হয়ে মালতী দু-হাতে আঁকড়ে ধরল প্রণবেশকে। আর প্রণবেশ যে এই প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির মধ্যেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল তার কারণ তার শরীরের ভর এক পায়ের ওপরে নয়, তিন পায়ের ওপরে—একটি সত্যিকারের পা আর দুটি ক্লাচ।

‘পানুদা!’

‘ভর কি মালতী, এই তো আমি আছি।’

একটু আগে মালতী প্রণবেশকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল। আর এখন প্রণবেশই মালতীকে ভরসা দিচ্ছে।

পেছন থেকে দু-একজনের মস্তব্য শোনা গেল :

‘দরজাটা খুলে ফেলে জল ঢালুন না মশাই !’

‘আপনারা সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছেন কি ? দরজাটা খুলুন ।’

‘আরে মশাই, ওপর দিকে একটু ঠেলা মারলেই তো দরজাটা খুলে যায় ।’

আসলে সেটাই হয়েছে বিপদ । পেছন দিকে ঠেলা মারলে দরজাটা যদি খুলত তাহলে দূর থেকেই একটা বাশ বা লাঠির সাহায্যে সে-চেপ্টা করা চলত । কিন্তু ঠেলাটা মারতে হবে ওপরের দিকে আর সেজন্তে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার । অথচ অবস্থা দেখে কারও আর এগিয়ে যাবার সাহস নেই ।

প্রণবেশ বলল, ‘মালতী, তুমি এ ছুটো একটু ধরো তো !’

এ ছুটো মানে প্রণবেশের দু-বগলের ছুটো ক্লাচ । মালতী কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, ‘কেন ?’

‘ধরোই না !’

তখনো মালতী প্রণবেশের মতলব বুঝতে পারেনি । ক্লাচছুটো ধরতেই প্রণবেশ এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ।

‘পানুদা ! পানুদা !’ মালতী বাধা দেবারও সময় পেল না । সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল কালো ধোঁয়ার আড়ালে পানুদা অদৃশ্য হয়ে গেছে ।

নিশ্বাস বন্ধ করে মালতী দাঁড়িয়ে রইল । চারপাশের লোকগুলোও এই কাণ্ড দেখে হতভম্ব । দু-একজন দূর থেকে বালতির জল ছুঁড়ছিল, তাদেরও হাত থেমে গিয়েছে ।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল নেই । আগুনের একটা ঝলক সাপের মতো ছোবল মারতেই চমকে উঠল মালতী । কালো পদাটী সরে গিয়েছে সামনে থেকে । গুদামঘরের দরজাটা একটা দৈত্যের মুখের মতো হাঁ-করা । অনেক আগুন ও ধোঁয়া মুখের মধ্যে পুরে দৈত্যটা বিকট মুখভঙ্গি করে আছে । আর দৈত্যটার হাঁ-করা মুখের সামনেই এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছ পানুদা ।

মালতী আর একবার চিৎকার করে উঠল, ‘পানুদা !’

কিন্তু সে চিৎকার প্রণবেশের কানে পৌঁছল না । গুদামঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে তাকিয়েই যে দৃশ্য তার চোখে পড়েছে তা দেখে চমকে উঠেছে সে । গুদামঘর আর গ্যারেজের মাঝখানে যে দেওয়াল সেখানে সারবন্দী কয়েকটা কার্টের প্যাকিং বাক্স ; তার মধ্যে একটিতে সবে আগুন ধরেছে ; আর খানিকটা ওপরেই মস্ত একটা ফাটল দেখা দিয়েছে দেওয়ালের গায়ে । প্রণবেশ বুঝতে পারল, এগুনি একটা কিছু করা দরকার । একটু দেরি

করলেই অন্য বাক্সগুলোতে আগুন ধরবে আর তখন এই ফাটল ধরা দেওয়াল সেই প্রচণ্ড আগুনকে কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। দেওয়ালটা যদি ধ্বসে পড়ে তাহলে কয়লায় আর আগুনে যে নারকীয় কাণ্ড শুরু হবে তা ভাবতেও শিউরে উঠল প্রণবেশ। সে ভুলে গেল যে তার মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, সেখানে আগে যাওয়া দরকার। ভুলে গেল যে সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তার চোখের সামনে গ্যারেজের ফাটল ধরা দেওয়াল আর লকলকে আগুন ভয়ংকর একটা সর্বনাশের চেহারা নিয়ে নেচে বেড়াতে লাগল।

‘পানুদা ! পানুদা !’ মালতী ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

না, আর অপেক্ষা করে চলে না। জ্বলন্ত কাঠের বাক্সটাকে যে করে হোক সরিয়ে ফেলা দরকার। গুদামঘরের আগুনকে কয়লার দোকানের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দিলেই সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। তাছাড়া, এই একটি জ্বলন্ত বাক্স সরাতে পারলে অন্য বাক্সগুলোও হয়তো বাঁচতে পারে।

প্রণবেশ হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর পা দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল বাক্সটাকে। অনেকটা সরিয়েও ছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ ভুলে কি একটা জিনিস ফাটল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তরল আগুনের স্রোত বেরিয়ে এল বাক্সের তলা থেকে। পা সরিয়ে নেবার সময়টুকুও পেল না প্রণবেশ।

মালতীর শরীরের সমস্ত রক্ত তার গলার ভেতর দিয়ে একটা চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এল।

নরসিংহ পালিয়ে আসছে।

গুদামঘরটা পুড়ুক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক। দমকলের লোকজন এসে পড়ার আগেই যেন গুদামঘরের মধ্যে শুধু ছাই ছাড়া আর কিছু না থাকে। টাকাপয়সার দিক থেকে তাকে অবশ্য মস্ত একটা ক্ষতি সহ্য করতে হবে। তাহলেও তাই যেন হয়। গুদামের একটি জিনিসও আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচাতে চায় না সে। দেড়তলার পা দিতেই সুবিমলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। রামকান্তর ঘর থেকে বেরিয়ে সুবিমল নিচে নামছিল, নরসিংহকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

‘নিচে যাচ্ছেন বুঝি ?’

সুবিমল বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘তার আর কোনো দরকার নেই। গুদামটাকে বাঁচানো যাবে না।’

সুবিমল লজ্জায় বলতে পারল না যে সে নিচে যাচ্ছিল মালতীকে ডেকে আনার জন্যে ।

‘আপনি বরং একবার ওপরে আসুন আপনার সঙ্গে কিছু কিছু পরামর্শ করার আছে ।

‘আচ্ছা আমি আরেকটু পরেই যাচ্ছি ।’

দোতলায় উঠে নরসিংহের মনে পড়ল, অরবিন্দ ঘোষাল তখন কী যেন বলতে চেয়েছিলেন । তাড়াহড়োতে শোনা হয়নি । এখন একবার ডাকবে নাকি ?

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকবে কিনা ভাবছে এমন সময় ভেতর থেকে অরবিন্দ ঘোষালের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ।

‘তুমি পাগল হলে বড়-বৌ ? এই কি তোমার খেলাঘর সাজিয়ে বসার সময় ? বাড়িতে আগুন লেগেছে—জিনিসপত্রের সামলাতে হবে তো !’

নরসিংহ বুঝল, অরবিন্দ ঘোষাল তাঁর পাগল বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছেন । থাক, এখন আর ডাকাডাকি করাটা ঠিক নয় ।

কিন্তু অন্তমনস্ক ভাবে তিনতলার সিঁড়িতে পা ফেলাতে গিয়ে একটু বেশি শব্দ করে ফেলেছিল নরসিংহ । অরবিন্দ ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ।

‘কে ?’

‘আমি নরসিংহ ।’

‘বাবাজী, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম । গুদামের আগুন কি নিবেছে ?’

‘না, ও আগুন আর নিববে না ।’

অরবিন্দ ঘোষাল বললেন, ‘তা আমি জানতাম বাবাজী ! এ হচ্ছে পাপের আগুন । এ আগুন জল দিয়ে নেবানো যায় না । প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার ।’

‘আপনি এসব কি বলছেন ?’

‘ঠিকই বলছি । তোমাকে বলবো বলেই খুঁজছিলাম । আজ রাত্রেই ঘর থেকে পাপ বিদেয় করো ।’

নরসিংহ জিজ্ঞেস করল, ‘কার কথা বলছেন আপনি ?’

অরবিন্দ ঘোষাল চাপা স্বরে বললেন, ‘তুমি তো আর বাবাজী চোখ-কান খোলা রাখো না, তুমি কি করে টের পাবে ! তোমার ঘরের ওই যে মাস্টার ছোকরা, কি যেন নাম তার ?’

‘সুবিমলের কথা বলছেন ?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটিই তোমার ঘরের মূর্তিমান পাপ। আমি অনেক দিন থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। তাহলে তোমাকে খুলেই বলি বাবাজী।’

রেখার বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। হিসেবটা তারও জানা ছিল। শুদামঘরে আগুন লাগা মানে তো শুধু কতকগুলো জিনিস পুড়ে যাওয়া নয়— রেখার অনেক সাধ-আহ্লাদ, অনেক ডিনার-পাটি আর অ্যাট-হোম, অনেক উপহার আর মেমেন্টোও পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। ভাবতেও বিলম্ব লাগে। রামধনুর রঙে গড়া আলাদা একটা জগৎ রেখার প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল, একরাতির আগুনে সেখান থেকে এবার অনেক দূরে সরে আসতে হবে। এরপর আবার সেই পা টিপে টিপে চলা আর হিসেব করে করে খরচ করা! অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া অভ্যাসকে আবার ফিরিয়ে আনা! ভাবতেও রেখার বুক কাঁপে।

বেচারি নরসিংহ! ভাগ্যের যতো বড়ো বড়ো মার তা যেন ওর জন্তেই অপেক্ষা করে আছে। বিয়ের আগে ও জানত না যে ওর বিয়ে করা উচিত নয়। জানলে নরসিংহ কখনোই বিয়ে করত না। সে-সময়ে রেখার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পেত। কিন্তু রেখাই আশু আশু নরসিংহের মন থেকে সমস্ত অপরাধ-বোধ মুছে দিয়েছে। মানুষ চিনতে রেখার ভুল হয়নি। নরসিংহও প্রমাণ দিয়েছে যে নিজের ক্ষমতার এলাকায় সে সত্যিকারের পুরুষ। স্ত্রীকে সে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে সেখানেই তো তার স্বামীত্বের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। নরসিংহের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই রেখার। আর এই হচ্ছে সময় যখন প্রমাণ দিতে হবে যে নরসিংহের সবচেয়ে বড়ো দুঃসময়ে সে-ই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো সহায়। মনের বা শরীরের সমস্ত বিলাসিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নরসিংহের সমস্ত দুর্ভাগ্যের সমান ভাগ নিতে হবে তাকে।

‘রেখা!’ নরসিংহ কখন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে রেখা টের পায়নি।

‘একি? ফিরে এলে যে? আগুন নিবে গেছে?’ রেখা উঠে দাঁড়াল।

রেখার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নরসিংহ বলল, ‘এ আগুন সহজে নিববে না। অনেক দূর পর্যন্ত এর জের টানতে হবে। সেজন্তে এখন থেকেই তৈরি হও রেখা।’

রেখা বলল, ‘আমার জন্তে তুমি ভেবো না, আমি সব অবস্থার জন্তেই তৈরি আছি।’

‘ওহু অবস্থার জন্তে তৈরি থাকা নয়, অবস্থাকেও সুবিধেমতো তৈরি করে নিতে হবে। আমার কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি শোনো। তুমি তো জান, এই গুদামঘরটা সুবিমলের নামে ভাড়া নেওয়া আছে। আমাদের এমন ভাবে তৈরি হতে হবে যেন এই গুদামঘরের মালের দায়িত্বটাও ওর ওপরে এসে পড়ে। বুঝলে?’

নরসিংহের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রেখা বলল, ‘বুঝেছি।’

নরসিংহ একটু হাসল : ‘সোজা রাস্তায় যদি কাজ না হয় তো বাকি রাস্তার সন্ধানও আমার জানা আছে। দরকার পড়লে সুবিমলের রাত্রিবেলার শয্যাসজিনীকে দিনের আলোয় টেনে আনতে হবে।’

রেখা ছিটকে সরে এল : ‘কি বললে? কি?’

রেখাকে কাছে টেনে এনে নরসিংহ বলল, ‘আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষাল নিজের চোখে দেখেছেন। সুবিমলের সঙ্গে মালতীর নাকি—’

আতকে উঠে রেখা বলল, ‘কি সর্বনাশ! এই ঝামেলাটা মিটলেই ওকে বিদেয় করো। এমন দুশ্চরিত্র লোকের কাছে দীপুকে কিছুতেই পড়তে দেওয়া চলে না।’

নরসিংহ বলল, ‘তা করা যাবে। এখন ঝামেলাটা মিটলে বাচি। নিচের সোর-গোলটা শুনতে পাচ্ছ তো?’

নরসিংহের বুকের ওপরে মাথা রেখে রেখা বলল, ‘তুমি কিচ্ছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি।’

‘রেখা!’

নরসিংহ দু-হাতে জড়িয়ে রেখাকে চেপে ধরল বুকের ওপরে। কিন্তু পরক্ষণেই ‘উঃ’ বলে চিৎকার করে উঠে ঠেলে সরিয়ে দিল।

‘কি হল?’

‘তোমার বুকে কি পাথর বেঁধে রেখেছ নাকি?’

বুকে হাত দিয়ে রেখা বলল, ‘ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার সেই মনিব্যাগটা।’

আশালতাও শুনতে পেয়েছিল।

মেরেলী গলার সেই চিৎকার শুনে আশালতার মনে হল, কে যেন তার বুক

ভেতরকার হৃদপিণ্ডটাকে মুঠো করে চেপে ধরেছে। হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন।

জানলার খড়খড়িটা তুলে একবার বাইরে তাকাবার চেষ্টা করল। আগুনের একটা ঝলককে ঘিরে কালো ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। সেই ধোঁয়ার আড়ালে মানুষ আছে কিনা সেটা হঠাৎ বোঝা যায় না।

নিজেকে ভারি অসহায় মনে হতে লাগল আশালতার। দোতালার এই ঘরে আগুন লাগবে না তো? দমকল আসে না কেন?

‘আশা, মা, ঘরে আছিস?’

গলার স্বর শুনেই আশালতা চিনতে পেরেছে। বাতিকগিন্নী। অন্য সময়ে এই মহিলাটিকে সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। আজ কিন্তু ভারি ভালো লাগল। ভরসা করার মতো একজন মানুষকে যেন সে হাতের কাছে পেয়েছে।

‘আছি জেঠিমা, ঘরে আস্থন।’

হাতড়ে হাতড়ে ঘরে ঢুকে বাতিকগিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় রে তুই?’

‘এই যে আমি। জেঠিমা, মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।’

‘বলিস কি রে! দেখি, দেখি, মাথায় জল দিয়েছিস?’

দেখা গেল, এসব ব্যাপারে বাতিকগিন্নী একাই একশো। নিজের ঘর থেকে তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন, তারপর আশালতার কুঁজো থেকে একটা পাত্রে জল ঢেলে নিয়ে তিনি বসলেন গিরিবালার শিয়রে।

‘দমকল এসেছে নাকি রে?’

‘না জেঠিমা, আসেনি।’

‘কি সন্ধানেশে কাণ্ড বাবা! এখন বাড়িসুদ্ধ না পুড়ে মরতে হয়!’

‘জেঠিমা আপনি একটু বস্থন। আমি একটু নিচে থেকে ঘুরে আসি।’

‘তুই পাগল হলি আশা! ওই আগুনের মধ্যে তুই কোথায় যাবি?’

‘একবার যাই জেঠিমা। মালতীকে পাঠিয়েছিলাম। পান্নুর খোঁজ করতে। এখনো ফেরেনি। পান্নুর জন্তো ভাবি না, অন্তত মেয়েটার একবার খোঁজ করে আসি।’

‘তবে যা, দেরি করিসনে যেন।’

নিচে এসে আশালতাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছিল বলে বুঝতে পারেনি। যদিকেই তাকাচ্ছে শুধু একটা ভয় ও আতঙ্কের ছাপ। ভয়ংকর একটা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়েছে যেন। সবাই চিৎকার করছে আর সকলের চিৎকার একসঙ্গে মিশে বোবা একটা

গোঙানির মতো শোনাচ্ছে। শুধু ধোঁরা আর ধোঁয়া। ধোঁরার ভেতর দিয়ে মানুষগুলোকে দেখে পুরোপুরি মানুষ বলে মনে হয় না। একটা প্রেত-লোকের ছবি দেখা যাচ্ছে যেন চোখের সামনে।

এখানে কোথায় খুঁজে পাবে মালতীকে? পানুই বা কোথায়? আশালতা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

‘মালতী! মালতী! পানু! পানু!’

আশালতার গলার স্বর সেই প্রচণ্ড সোরগোলের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ে খড়কুটোর মতো হারিয়ে গেল।

‘মালতী! মালতী! পানু! পানু!’

গুদামঘরের ভেতরে চোখ পড়তেই শিউরে উঠল মালতী। মস্ত একটা চিতা জ্বলছে যেন। ধোঁরা আর আগুন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশালতার মনে হতে লাগল, এই তিনতলা বাড়িটা এককোঁটা মোমের মতো এবার গলতে শুরু করবে।

আর এই চিতার আগুনের ঠিক ওপরেই সে কিনা মাকে কেলে রেখে এসেছে!

‘মালতী! পানু!’

ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল অমিয়নাথ। আশালতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি আমার সঙ্গে আসুন! আমি আপনাকে প্রণবেশের কাছে নিয়ে যাবি।’

চোখ মেলে তাকিয়ে গিরিবালা বললেন, ‘পানু! আশা!’

বাতিকগিল্লী গিরিবারার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন: ‘পানুর মা, এই তো আমি রয়েছি, ভয় কি!’

গিরিবালা তবুও এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

‘আশা গিয়েছে পানুকে ডাকতে। তুমি চুপটি করে শুয়ে থাকো তো। সব ঠিক আছে।’

‘কে? দিদি?’

‘হ্যাঁ।’

গিরিবালা চোখ বুজলেন। চোখদুটো জ্বালা করছে। আশা কি উলুনে আঁচ দিয়েছে নাকি? তা কি করে হবে? আশা তো গিয়েছে পানুকে ডাকতে। কোথায় গিয়েছে পানু? দিদি কেন এ-সময়ে তাঁর শিয়রের কাছে বসে?

‘দিদি, জল খাব।’

বেশ মজা কিন্তু। আশা গিয়েছে পান্নকে ডাকতে। আর এদিকে কিনা সব ঠিক আছে। সবই যদি ঠিক থাকবে তবে আশা কেন পান্নকে ডাকতে গেল?

‘পান্নর মা, একটু হাঁ করো তো।’

আঃ! শরীরটা জুড়োল। বড়ো রাস্তা দিয়ে মিছিল যাচ্ছে নাকি? এত লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে কেন?

‘কী কষ্ট হচ্ছে পান্নর মা?’

কষ্ট? তাঁর কিসের কষ্ট? তাঁর তো কোনো কষ্ট নেই। আশা তাঁকে কোনো কষ্ট করতে দেয় নাকি? তাঁর তো নিশ্চিন্ত জীবন। এবার মনে পড়েছে। আশা বলেছিল, তুমি তো সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমি কি করি বলো তো? গিরিবালা ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

‘দিদি, আগুন নিবেছে?’

‘এই তো দমকল এসে পড়ল বলে! তারপরেই নিববে। শরীর ভালো লাগছে, পান্নর মা?’

‘হ্যাঁ দিদি। আশা কিরছে না কেন?’

‘একুনি কিরবে। ছেলেমানুষ তো! হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে।’

‘আশাকে তুমি ছেলেমানুষ বোলো না দিদি। একটা পুরো সংসার চালাচ্ছে ও।’

‘তা ঠিক।’ বলে বাতিকগিন্নী চুপ কছে রইলেন।

‘দিদি, একটা কিছু বলো, নইলে বড়ো ভয় করে।’

‘পান্নর মা, আমি এসেছিলাম তোমাকে কয়েকটা জিনিস দিতে। তুমি নেবে?’

‘তোমার দেওয়া জিনিস নেব না? বলো কি দিদি!’

সেমিজের ভেতর থেকে ছোট একটা পোঁটলো খুললেন। প্রদীপের মিটমিটে আলোতেও দেখা গেল, পোঁটলার মধ্যে রয়েছে একটি কাঁচার পায়ের উল-বোনা জুতো ও মোজা আর পরনের সোয়েটার। নতুন অবস্থায় হয়তো টকটকে লাল রঙের ছিল, কিন্তু ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে বাদামী হয়ে গিয়েছে।

গিরিবালা বললেন, ‘এসব নিয়ে আমি কী করব?’

বাতিকগিন্নী বহু বছরের মধ্যে এই বোধহয় প্রথম একটু হাসলেন: ‘পান্নর মা, তোমাকেই তো নিতে হবে! তোমার আশা রয়েছে, পান্ন রয়েছে। আমার তো কেউ নেই। আমি নিজের হাতে বুনেছিলাম পান্নর মা। তিরিশ বছর

ধরে আগলে রেখেছি। আর তো আমার দরকার নেই !’

গিরিবালা চুপ করে রইলেন।

বাতিকগিল্লী অনেক দূর থেকে কথা বলছেন বলে মনে হল : ‘পান্নুর মা, আমার দুটি বেঁচে থাকলে এতদিনে তোমার আশা আর পান্নুর মতোই হত। আমার কপাল ! একটা কারাও শুনতে পাঠনি ! ভগবান যদি আমাকে মেয়েমানুষই করেছিলেন তো মা হতে দিলেন না কেন ? মেয়েমানুষ হয়ে মা না হবার দুঃখু তুমি বুঝবে না পান্নুর মা। এগুলো তুমি নাও। তোমার আশা যখন মা হবে তাকে দিও।’

ঝাপসা চোখে তাকিয়ে গিরিবালা বললেন, ‘দিদি, মেয়েকে আমি পেটেই ধরেছি। মা হতে পারিনি। আমি বড়ো স্বার্থপর।’

সুবিমল মালতীকে খুঁজে পায়নি। কোথায় আর যাবে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে গিয়েছে—এই ভেবে সুবিমল ওপরে উঠে এল। নরসিংহ তাকে পরামর্শ করার জন্যে ডেকেছে। নিশ্চয়ই কোনো জরুরী দরকার।

অন্ধকার ঘরে সিগারেটের আগুন দেখে বোঝা গেল, নরসিংহ তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

‘বসুন।’ ভারি নিশ্চিন্ত নরসিংহের গলার স্বর।

হাতড়ে হাতড়ে সুবিমল বসল।

‘দমকল তো এখনো আসেনি, না ?’

‘না।’

‘আপনি তো নিচে গিয়েছিলেন, কি মনে হল, খুব বেশি আগুন লেগেছে ?’

নরসিংহকে খানিকটা সাহুনা দেবার জন্যেই যেন সুবিমল বলল, ‘পাড়ার লোকজন বালতি বালতি জল ঢালছে। দমকল আসার আগেই আগুন নিবে যাবে।’

নরসিংহের মুখ দেখা যাচ্ছে না, ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে বোঝা যায়।

‘পারেও বাবা !’

কথাটা প্রশংসার না নিন্দার বুঝতে না পেরে সুবিমল চুপ করে রইল।

‘দমকল একুনি এসে পড়বে, না ?’

‘হ্যাঁ। আরো আগেই আসা উচিত ছিল।’

‘আগুন নেবার পরে যখন খোঁজ পড়বে এই গুদামের মালিক কে, আপনি কি বলবেন ?’

‘আপনার নাম করব।’

জলন্ত সিগারেটটা। নরসিংহ ছাইদানিতে চেপে ধরল : ‘আমি কিন্তু গুদামঘরের মালিক নই সুবিমলবাবু।’

‘তবে ?’

‘গুদামঘর ভাড়া নিয়েছেন আপনি। আপনাকেই মালিক হতে হবে।’

‘কিন্তু আমি তো আর সত্যিই মালিক নই !’

‘আইনের চোখে আপনিই মালিক। আপনি অস্বীকার করবেন কি করে ?’

সুবিমল চুপ করে রইল।

‘আর অস্বীকার করার দরকারটাই বা কি ! আপনাকে একটা চাকরি দেব বলেছিলাম, মনে করুন এটাই আপনার চাকরি। আপনাকে আমি মাইনে দেব এজন্তে। বলুন, রাজি ?’

সুবিমল তবুও চুপ করে রইল। ঠিক এই সময়ে এই প্রস্তাব সুবিমলের কাছেও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

অন্ধকারেও বুঝতে পারা গেল যে নরসিংহ উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘আমি আপনার ভালোর জন্তেই বলছি। এমনতেও গুদামঘরের মালিক আপনাকে হতেই হবে। আমি যদি স্বীকার না করি তো আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার কথা শুনে চলুন, আপনাকে আমি সব ব্যাপারে বাচিয়ে চলব।’

সুবিমল তবুও চুপ করে রইল। বাচিয়ে চলার কথা কেন উঠছে সে বুঝতে পারেনি।

নরসিংহের কাছ থেকে উঠে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছিল সুবিমল। শরীরটা ভারি ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছে। এক গ্রাশ জল পেলে হত। কিন্তু অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে কুঁজোটা খুঁজি পাওয়া গেল না। না, জল এক গ্রাশ চাই-ই। নইলে সুবিমল গলা শুকিয়ে মরবে। দরজা খুলে ভেতরের দিকের বায়ান্দার এসে দাঁড়াল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে না ? তাই তো।

‘দীপু !’

চিনতে ভুল হয়নি। দীপুই।

‘আমাকে এক গ্রাশ জল দেবে দীপু ?’

দীপু জল নিয়ে এল। তারপর সুবিমলের হাত থেকে গ্রাশটা ফেরত নিয়ে হঠাৎ বলে বসল, ‘জানেন মাস্টারমশাই, আমি আর আপনার কাছে পড়ব না।’

‘কেন?’

‘আপনি দুষ্টরিত্ত কিনা তাই।’

‘কী বলছ দীপু?’

‘ই্যা, আমি নিজের কানে শুনেছি। দিদি আর জামাইবাবুতে কথা হচ্ছিল। দিদি বলল, এমন দুষ্টরিত্ত লোকের কাছে দীপুকে কিছুতেই পড়তে দেওয়া চলে না। আচ্ছা মাস্টারমশাই, দুষ্টরিত্ত মানে কি?’

আশালতাকে দেখে একগাল হেসে প্রণবেশ বলল, ‘আমার পা পুড়ে গিয়েছে দিদি।’

ঠিক আর একদিনের মতো প্রচণ্ড একটা রাগ সামলাতে হল আশালতাকে। এই ভাইটাকে নিয়ে হয়েছে তার মহা জ্বালা!

মোড়ের বড়ো বাড়িটার রোয়াকে এনে শুইয়ে রাখা হয়েছে প্রণবেশকে। সুদর্শন গিয়েছে ট্যাক্সি ডাকতে। ট্যাক্সি এলেই অমিয়নাথ প্রণবেশকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। মেয়েলী গলার চিংকার শুনে ভাগ্যিস অমিয়নাথ নিচে নেমে এসেছিল। নইলে প্রণবেশের জন্তে এত তাড়াতাড়ি এতখানি বন্দোবস্ত হত কিনা সন্দেহ।

প্রণবেশের দুটো ক্রাচ দু-হাতে নিয়ে মালতী এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন এ দুটো জিনিসের সাহায্য না নিয়ে সে এক পাও চলতে পারবে না।

প্রণবেশের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আশালতা বলল, ‘তুই কবে একটু বুঝতে শিখবি বল তো পানু?’

‘দিদি, আমার পা পুড়ে গিয়েছে আর তুমি আমাকে বকছ!’

আশালতা প্রণবেশের কপালে হাত বুলাতে লাগল।

‘জান দিদি, সুদর্শন বলছিল যে এই গুদামটার নাকি চোরাই মাল আছে।’

‘বলিস কি রে!’

‘ই্যা দিদি।’

‘পাপের ধন কিনা তাই ভোগে লাগল না।’

প্রণবেশ হেসে উঠল : ‘তা না লাগুক। কিন্তু দিদি, আমার অবস্থাটা একবার ভাবো তো! আমি একটা পা খুঁয়েছিলাম ব্রিটিশ আমলের পুলিশের গুলি খেয়ে। পরে শুনলাম, আমরা এমন ভাবে গুলির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই নাকি আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কত বড়ো একটা সম্মান বন্দো তো!

কিন্তু দিদি, তুমি মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওদের বাড়িতে রাত্রিবেলা রান্না হয়নি। কেমন চমৎকার স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বলে তো দিদি! আর এমন স্বাধীন দেশে আছি বলেই তো আমার ভালো পা-টাকেও পোড়াতে হল চোরাই মালের গুদাম বাঁচাবার জন্যে।’

‘পান্ন, একটু চূপ কর, বেশি কথা বললে তোর শরীর খারাপ হবে।’

‘আর একটা কথা শোনো দিদি। আমাদের এই অমিয়দা একটা যন্ত্র বানাতে চেষ্টা করছে। সে এক আশ্চর্য যন্ত্র দিদি। স্থারিকেনের বাতি থেকে ইলেকট্রিক মোটর আর ডায়নামো চলবে। কিন্তু যন্ত্রটা কেন বানানো যাচ্ছে না জান দিদি? টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত দিদি—’

‘তুই চূপ কর পান্ন।’

অমিয়নাথ প্রণবেশের পারের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, ‘প্রণবেশ, তোমাকে দেখে এখন আমার কী মনে হচ্ছে জান? আমি বোধ হয় ঠিক জায়গায় হাত পাতিনি। ঠিক জায়গাটি চিনতে পারিনি এতদিন। এবার মনে হচ্ছে টাকাটা ভুলে নিতে পারব।’

প্রণবেশ প্রায় ছেলেমানুষের মতো আবদারের ভঙ্গিতে বলল, ‘তাহলে অমিয়দা, হাদপাতাল থেকে ফিরে যেন দেখতে পাঠি যে আপনার যন্ত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে।’

অমিয়নাথও ঠিক যেন ছেলেমানুষ ভোলাবার সুরে বলল, ‘আচ্ছা।’

প্রণবেশকে নিয়ে অমিয়নাথ রওনা হয়ে যাবার পরে আশালতা মালতীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মালতী আর আমার সঙ্গে।’

দু-হাতের ভর দুই ক্রাচের ওপরে রেখে মালতী জিজ্ঞেস করল, ‘আশাদি, এ দুটো?’ আশালতা বলল, ‘ও, নিয়ে যাযনি বুঝি? আচ্ছা, তাদের ঘরেই এখন রেখে দে। দেখিস, মা-র চোখে যেন না পড়ে। এ দুটো দেখলেই মা বুঝে ফেলবে, পান্নর একটা কিছুর হয়েছে।’

‘তুমি কিছু ভেবো না আশাদি। আমি এমন জায়গায় রেখে দেব যে আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।’ কথাটা বলে আর একদিনের মতো, লজ্জা পেল মালতী।

‘আয়, দেরি করিস নে।’

এমন সময়ে দুজনেই শুনতে পেল। গলির সমস্ত সোরগোলকে ছাপিয়ে ঢং-ঢং শব্দে কান্নার ব্রিগেডের গাড়ি আসছে।

আহুয়ার

বসে। ফ্লোরা কাউন্টেন পৌছে গেছি। কাটার কাটার ঘড়িতে বাজে আটটা।
অমার ইন্টারভিউ সাড়ে আটটার। হাতে যদি বা অধ ঘণ্টা সময় তবু সামনের
পথ এখনও অনেকখানি। যেতে হবে সী সাইড, ওরলী! বেবি ট্যাক্সিই নিলাম
একখানা।

ঠিক ঠিক সাড়ে আটটা। ক্যাক্টের 'মেন' গেট যদি বা পেরলাম, সদর দরজায়
কথো দিল পাঞ্জাবী সান্দ্রী—যানা মানা হুর বাবুজী!

কিন্তু অমার বারণ শুনলে চলবে কেন? যে করে হোক, সাহেবের সঙ্গে দেখা
আমাকে করতেই হবে আজ।

সদরজীকে বললাম, সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। দেখা করতে হবে এখনই।
এই চিঠি।

—বাস, তো নাম ভেজ দিজিয়ে আপকা। মজি হো তো বোলা লেগা।
সদরজী আমাকে শ্লিপ পাঠাতে পঙ্কামশ দেয় নাম আর ঠিকানা দিয়ে।

ইন্টারভিউ শ্লিপে নাম লিখে দিলাম:

প্রথমবারটা ভুল হল নাম লিখতে। সত্যি করে নিজের নামটাই লিখে
বসেছিলাম। তাড়াতাড়ি পাতাটা ছিঁড়ে পরের পাতায় লিখলাম, নিখিল
দাশগুপ্ত, বি. কম। পাঠিয়ে দিলাম শ্লিপ।

টুলের ওপর বসে আছি, হঠাৎ দুটো হাঁটু বাড়ি খেয়ে নড়ে উঠল আচমকা—
জবাই-করা জন্তুর ঠ্যাঙের মতো। মাটি থেকে গোড়ালিটা বোধহয় একটু উঠে
গিয়েছিল কি আর অমনি ঠক ঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে পা।

হু-হাতে হু-হাঁটু চেপে ধরলাম আমি। পা কাঁপা বন্ধ হল তো শুরু হল
বুক কাঁপা। ডান হাতের একটা পেন্সী আপনা থেকেই লাফিয়ে উঠল বার
কয়েক ! চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল কপালের ডানদিকের রঙে।

শিরায় শিরায় টংকার লেগেছে আর কি ! সন্দের সীমানা লঙ্ঘন করেছে রক্ত
অববাহিকা। তাই এই আক্ষেপ-বিক্ষেপ।

বসে আছি বাজি রেখে নিজেকে। চোখ দুটো ঘুরছে টহলদার সাস্ত্রীর বুটের
সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একজন নয়, নাল লাগানো ভারী বুট পরা
এমনি বহু সাস্ত্রী আমার সামনে কুচকাওয়াজ করে ফিরছে। বিরক্তিকর বিভ্রম
সব।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।—অবাঙালী এক চাকুরে ভদ্রলোক ডেকে নিয়ে যান
আমাকে ভুড়ি বাজিরে।

চাকরির ব্যাপার। সর্বাগ্রে ‘স্মার্টনেস’। আমি ‘ইয়েস সার’ বলে লাফিয়ে
উঠি।

বিরিট আপিস। বসে আপিস। পাথরের বাড়ি, পাথরের সিঁড়ি,—ভেতরে
রক্ত মাংসের মানুষ। লেজারে ফাইলে নুটপুট, বাধা টাইমের মিস্টার, খানদানী
কেরানী পুতুল।

বসে আছি ওয়েটিং রুমে। গত ছ-বছর ছিলাম ওয়েটিং লিস্টে। আমি না,
নিখিল দাশগুপ্ত।

ঝকঝকে তক্তকে কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই গদি আঁটা কম্পার্টমেন্ট,—ট্রেনের
কামরায় বসে আছি যেন। মাথার ওপরে ফ্যান নেই অথচ ঠাণ্ডাই আছে বেশ।
গোটা আপিসটাই এয়ার কন্ডিশান্ড,—জ্যাস্ত মানুষের তোফা রেক্রিজ্।

ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। চার রাত্তির ঘুমোইনি। বেয়ারা এসে খবর দিল : যাইয়ে
আপ। সাব বোলাতা।

সামনেই বড় সাহেবের কামরা। সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমি।

বিরিট ঘর। সুবহুৎ সেক্রেটারিয়েট। কার্পেটের ওপর দিয়ে অনেকটা হেঁটে
গিয়ে সাহেবের টেবিল। আমি এগিয়ে গেলাম।

ইনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কোম্পানীর হর্তা কর্তা বিধাতা—হয়কে যখন তখন
নয় করবার শক্তি ধরেন।

বসতে বললে বসতে হয়, কেতা জানা ছিল। চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে
রইলাম।

সাহেব কিন্তু অতুত চপচাপ। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পায়ের নলা বেয়ে ঘাম পড়ছিল। একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল, বসুন। এখন বসা যায়। টেনে বসলাম চেয়ারটা আস্তে করে। সাহেব কিন্তু এতটুকু নড়লেন না। তেমনি নির্বিকার গলায় বললেন, দরখাস্তে বলেছ তুমি তোমার কাজ জানো। পরলা থেকেই কাজ করো।

কি ভাবে ধন্যবাদ জানাব ভাবছি, এমন সময় তিন হাত চেয়ারটাকে সশব্দে পেছনে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন সাহেব।

ব্রহ্ম বাঙালী মতে একটা নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম আমি।

দাদারের বাঙালী টোলায় নামের নাম গন্ধের গন্ধ ধরে যার ঘরে দিন সাতকের কড়ারে উঠেছিলাম, সেখান থেকেই পত্র দিলাম বাড়িতে :

শ্রীচরণেশু,

মা, তোমার আশীর্বাদে চাকরি পেয়েছি একটা। চাকরিটা ভালোই হবে আশা করছি। পরলা থেকেই জরেন করব। বলা বাহুল্য টাকা পেলেই পাঠাব। বাবাকে এইবার হাঁসপাতালে যেতে বলা। শৈলেন ছোট হলেও ওর বুদ্ধি হয়েছে। ওই সব করবে। অপারেশান করতে দেরি হলে বাবাকে আর বাচানো যাবে না। চিন্তা করো না। তপুকে মেসোমশায়ের কাছে আর পাঠিও না। টাইপিষ্ট গার্লের কাজের জন্ত তিনি যেন তপুকে যেখানে সেখানে না পাঠান। ‘মিশর কুমারী’-তে অভিনয় করে তপু পঁচিশ টাকা পেয়েছে লিখেছ। ভালোই। সাবধানে চলাফেরা করতে বোল। তোমার চোখটা আসছে মাসে ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা চশমা করে নিও। ছানি এখন কাটাবার দরকার নেই। আমাকে কেউ খোঁজ করতে এলে কিছু বলবার দরকার নেই। বাড়ির সবাইকে বলে দিও। আমার বন্ধু কেউকে বোল—গণেশ তার টাকা মারবে না। শীলাকে আমি আলাদা চিঠি দেব। কোনোদিন বলিনি, আজ বলছি—শীলাকে তোমার কেমন লাগে? আমার অনুপস্থিতিতে শীলা যদি তোমাকে কোন টাকাকড়ি দেয়, নিতে ইতস্ততঃ কোর না। আমার জন্তে ভেব না। প্রণাম নিও। ইতি—গণেশ।

আরো অনেক কথা ছিল লেখবার। তবু এইখানেই শেষ করলাম চিঠি।

শীলার কথা ভাবতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে। শীলার মতো সত্যিই মেয়ে হয় না।

শত তুলসী চন্দনের পুষ্পাঞ্জলি দিলেও ওকে বেশি দেওয়া হবে না আমার। শীলার জন্যে খুবই কষ্ট হয়। সামান্য একটা টেলিফোন গার্ল যে রাজনন্দিনীর মতো ঐশ্বর্যময়ী, তা কি কেউ জানে? শীলাকে ভালোবাসবার আমার কিছুমাত্র যোগ্যতা নেই।—এ কথা শীলাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। শীলার ভালোবাসা মাটির ভালোবাসার মতো। আমার শত স্বেচ্ছাচারী আঘাতের একটি দাগও আজ সেই পৃথ্বীর বুকে লেগে নেই। আশ্চর্য শীলা!

শীলাকেও একখানা চিঠি দিতে হবে। সুদীর্ঘ চিঠি। এবার আর আঘাত না, খালি আশ্বাস দেব :—প্রাণবন্ত নিশ্বাসভরা আশ্বাস।

অবসর স্বায়ু.ঝিমিয়ে আসে ঘুমে,—তবু শীলা? আমার হৃ-চোখের তারায় এসে বসে শীলা।

দিন সাতেক চাকরি করছি। ভর আছে ভক্তি নেই চাকরিতে। তবু এই চাকরি আমার চাই-ই চাই। চাকরি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। চাকরি নেই তো আমিও নেই। এ চাকরির জন্যে আমি কী না করেছি? তবু চাকরি পাটনি। আমার চাইতেও আমার চাকরি বড়ো।

চাকরি আমার শীলার সামিল।

দশটা পাঁচটা কাজ করছি। বেশ লাগছে। তিন মাস পরেই পার্মানেন্ট হবো। তখন মাইনে আরও বাড়বে। সেই সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও আর সব বিষয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মান্যখানে শীলার একখানা চিঠি পেয়েছি। অনেক কথা লিখেছে শীলা। ভালোবাসার কথা ছাড়াও এমন সব কথা বিশ্বাস করে করে লিখেছে শীলা যে ভাবতেও ধরাপ লাগে। আদর্শবাদ জড়িয়ে দ্বৈত বিবাহিত জীবনের সুখ সন্তোগের কথা সব। লিখেছে, তুমি বসে আপিস থেকে কলকাতার আপিসে ট্রান্সকারের চেষ্টা করো। তুমি এলে এখানে পাকাপাকিভাবে সহঅবস্থানের কথা ভাবা যাবে। সত্যি কতদিন মান্যখানে তুমি আমাকে আদর করনি জানো!! জানতে চাইলেও জীবনের বহু কিছুই যে না-জানার ভান করে আজীবন চালিয়ে যেতে হয়, সে কথা জেনে শুনেও কথাটা লিখেছে শীলা। আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া না শীলা না আমি—কারো যেন বাঁচবার কোন উপায় নেই আর।

চাকরি করছি হঠাৎ আট দিনের দিন ডাক পড়ল আমার সারৈবের ঘরে।

বড়বাবু এসে বললেন, সায়েব আপনাকে একবার এফুনি ডাকছেন। যান, দেখা করে আসুন।

আমি সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সায়েবেরই চাকরি করি, সায়েবের সঙ্গে দেখা করবো, এ তো আমার সৌভাগ্য।

ঘরে ঢুকতেই অতিক্রান্তে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আমাকে পুলিশ। অনেক পুলিশ। সামান্য একজন কেরানীকে ধরতে বিশ-পঁচিশজন সশস্ত্র পুলিশ।

আমি হাত উঁচু করলাম। ইন্স্পেক্টর এসে হাতকড়া পরিয়ে দিল আমার হাতে। এতক্ষণে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন সায়েব। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে দরবিগলিত। অনর্গল ইংরেজিতে ষেটুকু জবাবদিহি করলেন তার সরল মানে হচ্ছে,—আমি একজন প্রবন্ধক।—নাম ভাঁড়িয়ে চাকরি করছি আমি।

আমি স্বীকার করলাম, আমার নাম শ্রীগণেশচন্দ্র রায়; নিখিল দাশগুপ্ত নামে চাকরিতে ঢুকেছি প্রাণের দায়ে।

বললাম, কিন্তু কেউ গুনল না। পরদিনই চালান হয়ে গেলাম আমি বন্দে থেকে কলকাতা। প্রকাশ, আমি না কি জি-ডি-সি-ডি কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট নিখিল দাশগুপ্তের আততায়ী।

কলকাতার বিচার হবে আমার।

বহু চেষ্টা করেও জামিন পাওয়া গেল না আমার। খুশী আসামীর না কি জামীন হয় না। শীলা বৃথাই হররান হল ঘুরে ঘুরে।

সর্বস্ব পণ করে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়েছে শীলা। মামলার দিন আদালতের নিচতলার লক্ আপ-এর কাছে দাঁড়িয়ে শীলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এ মিথ্যে মামলার কি করে জড়ালে তুমি আমার সব খুলে বল। তাতে মামলার সাহায্য হবে। ডিফেন্স জোরদার লড়বে। এ মিথ্যে মামলা টিকবে না তুমি দেখে নিও। খুন তো আর তুমি করোনি। আমার কাছে সব কথা খুলে বলো, গোপন কোর না।

আমি শীলাকে সব কথাই খুলে বললাম। বললাম আমিই খুন করি, বা আমাকে দিয়ে খুন করানো হোক,—কথাটা তুমি যে ভাবেই নাও না কেন, জি-ডি-সি-ডি কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট নিখিল দাশগুপ্তের আততায়ী আমিই।

শীলা ক্যালক্যুল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ধানিকঙ্কণ পরে একটা

টৌক গিলে বললে, আমি ভাবতে পারি না।

আমি শীলাকে কথার সাশ্রুনা দেই, ভাবতে আমিও পারি না। কিন্তু আশ্চর্য তখন আমি ভাবতে পেরেছিলাম। তবে লোকটা যে নিখিল দাশগুপ্ত, খুন করবার আগে এ কথা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

আমার চোখে চোখ রেখে শীলা আমাকে খুঁজতে থাকে। কঁাদতে লাগলো শীলা আমার জন্তে। বললে, আজকের কথায় তো তোমাকে জানোয়ার বলে বুঝতে পারছি না। খুন হয়ে গেলে খুন করে?

আমি বলি :—আমিই কি ভাবতে পারতাম! গৌরান্দ্রবাবু আমাকে দৈত্য বানালেন।

চমকে উঠে প্রশ্ন করে শীলা :—কে? গৌরান্দ্রবাবু?

সেই, চাকরির খোঁজ করতে গিয়ে যিনি তোমার হাত চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, আপিসের পর তুমি একটু অপেক্ষা করে যেও। আমি তোমায় রোজ আমার গাড়িতে লিফ্ট দেবো।

শিউরে ওঠে শীলা, বলে :—জানি, কিন্তু সেই গৌরান্দ্রবাবুর কাছে তুমি কেন গিয়েছিলে?

নইলে আমার পরিণতি কোথায়? একটা মানুষ খুনী হয় কি করে? শোনই না,—গৌরান্দ্রবাবুর সঙ্গে যেভাবেই হোক, ইদানীং আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। উমেদারি না করলে চাকরি পাবো না, তাই এই আত্মীয়তা। তবে গৌরান্দ্রবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে কিছু লোক, যাদের আমি সংসারে মোটামুটি ভালো বলে জানতাম, তারা গৌরান্দ্রবাবুর সম্বন্ধে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতো, গৌরান্দ্রবাবুর বৈত সত্তার বিশ্লেষণ করে এমন সব আজগুबी গল্প করতো যে আমার খটকা লাগলো। ভাবলাম, তাহলে তোমার হাত ধরে টুনবার ব্যাপারটা কি?

তার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন কথায় কথায় আর একজনের মুখে শুনলাম, অঞ্জলি! অঞ্জলিকে মনে পড়ে তোমার? সেই অঞ্জলিকে নাকি গৌরান্দ্রবাবু অনাথ আশ্রম থেকে উদ্ধার করে ওঁরই আপিসের বি, এ, পাশ একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সুস্থ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আরও শুনলাম, মুলীগঞ্জের সেই চাকুবালা—তার বেলায়ও নাকি ঐ রকম পিতৃহীন ব্যবহার করেছেন গৌরান্দ্রবাবু। ভদ্রমহিলা প্রথমটা না বুঝে গৌরান্দ্রবাবুকে নাকি ঠাস করে একটা চড়ই মেরে বসেছিলেন। কিন্তু গৌরান্দ্রবাবু তাঁকে আজীবন অনুশোচনা

করবার অবকাশ দিয়ে নিজের আপিসেই চাকরি করে দিয়েছেন।

এইরকম, শুধু মেয়েই নয়, নিরাশ্রয় অনেক ভদ্রলোকের বেলায়ও নাকি গোরাঙ্গবাবু এমনিধারা অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন।

এ সব কথা আমি পরম্পরার শুনতে পেয়েছি—একেবারে পরোক্ষ। কাজেই গোরাঙ্গবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে খটকা বাধে জোরদার। এই সংশয়ই অবশ্য পরে আমার কাল হল।

গত ছ-মাস ধরে তাই হাঁটাইটি করছিলাম গোরাঙ্গবাবুর বাড়ি। বেশ হৃৎতাও হয়েছিল ইদানীং। গোরাঙ্গবাবু জীবনের অনেক কথা বলে মাঝে মাঝে হাসতেন আবার সময়ে কাঁদতেনও হাউ হাউ করে। সে এক অদ্ভুত ঢঙ-এর চরিত্র গোরাঙ্গবাবু। এক এক সময় আমার ওপর ভীষণ চটে যেতেন, আবার অন্য সময় হুঃখু করতেন আমার একটা কিছু হল না বলে। এদানীতে কয়েকবার কিছু কিছু অর্থসাহায্যও দিয়েছিলেন, খোলানকুটির মতো, ছড়িয়ে ছড়িয়ে টাকা সিকি আধুলি। চাকরিও একটা করে দেবেন—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শেষকালে।

মোটকথা গোরাঙ্গবাবুর সম্বন্ধে তুমি যে সব অভিযোগ করেছিলে, সব কথা আমার ঠিক ঠিক বলে মনে হয়নি। মনে হয়নি যে এই গোরাঙ্গবাবু তোমার শ্রীলতাহানি করতে পারেন।

বিরক্ত বোধ করে শীলা। বলে, থাকগে তারপর ?

আমি বলে যাই : তারপর আর কি ! গোরাঙ্গবাবুর ওখানে রোজই যাই। থাকে বলে তাঁবেদরী করা আর কি, তাই করি সারাক্ষণ।

মদ খেতেন গোরাঙ্গবাবু। তা টাকা থাকলে মদ তো অনেকেই খায়। সেটা আমার তেমন কিছু গর্হিত বলে মনে হত না। ভাবতাম, খায় থাক না। আমি ঢেলেও দিয়েছি বহুদিন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। গোরাঙ্গবাবুর বাড়িতে গেছি আমি। দেখি ড্রয়িংরুমে গৌজ হয়ে বসে আছেন গোরাঙ্গবাবু। মুখটা গম্ভীর। রোজই হেসে বসতে বলেন। সেদিন কিছু বললেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, একলাটি চূপ করে বসে আছেন, শরীরটা খারাপ বুঝি ?—এ সব তোষামোদের কথা। এ সব কথা বলতে ভালো না লাগলেও বলতে হত।

আমি কিছু মনে করছি না, তুমি বলো। অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে শীলা।

আমি বলে যাই : অনেকক্ষণ একভাবে বসে রইলেন গোরাঙ্গবাবু। তারপর যথারীতি হুইস্কি খেতে লাগলেন। কি মনে করে আমাকে একটু দিলেন সেদিন।

বললেন, ড্রিংক ।

গোরাঙ্গবাবু হাতে করে দিচ্ছেন, আমি মাথায় তুলে নিলাম । চাকরি আমাকে পেতেই হবে ।

গোরাঙ্গবাবু ঢকঢক করে অনেকটা হুইস্কি খেয়ে ফেললেন । দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল গোরাঙ্গবাবুর মুখ । বললেন, আজ রাত্তিরে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাচ্ছ । দু-দিন লাঞ্চ না করলেও ডিনার খাব আমি, মন্দ লাগল না প্রস্তাবটা । এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম । গোরাঙ্গবাবু আরও মদ খেতে লাগলেন বসে বসে । হঠাৎ বলে উঠলেন, কি জানো গণেশ, এ জগতে ভালোবাসা নেই । আমাকে কেউ ভালোবাসে না । স্বীলোকের ভালোবাসায় আমি বিশ্বাসী নই । নইলে বিয়ে করতাম । করলাম না । আমি চাই পুরুষ প্রেম, একটা বলিষ্ঠ কলজের ছোঁয়াচ—যে হ্যাঁ, তোর জন্তে আমি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি । কেউ নেই ।

আমি অবাক হয়ে গোরাঙ্গবাবুর কথা শুনতে থাকি । বেশ লাগে তখন আমার গোরাঙ্গবাবুকে ।

গোরাঙ্গবাবু বলে যান, সংসারে কারো উপকার করতে নেই । অথচ আমি এমনি বেয়াকুফ, যে সেই ভুলই আমি জীবন ভোর করে যাচ্ছি । প্রতিদানের কোনো সম্ভাবনা না রেখে উপকার করলাম, তবু মানুষ ভুল বুঝল আমাকে । ঠিক আছে, পরোয়া নেই । কিন্তু কি জানো গণেশ, একটা লোকের পাপ যে আর দশজনের গলায় কঁাস জড়াবে, এইটেই আমি সহ্য করতে পারছি না । একটা লোকের স্বার্থপর অভিসন্ধি যে আমার কারখানার হাজার হাজার খেটে খাওয়া অভাবী লোকের সর্বনাশ করবে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না । জানি, আমি মহাপুরুষ নই । আমিও কারখানা চালাই মুনাফার জন্তে । কিন্তু সেই মুনাফা, তাদের রক্তের বদলে কিছুতেই না । মিথ্যে কথা, আমি তার আগেই কারখানা তুলে দেবো ।

তামসিক দস্তে ফুলে কেঁপে খানিকক্ষণ বসে রইলেন গোরাঙ্গবাবু । তারপর হঠাৎ বললেন, ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা আমার অ্যাকাউন্টেন্ট কি কাণ্ডটা করেছে জানো ? রাতারাতি কিছু অ্যাকাউন্টেন্টস-এর কাগজপত্র ফটোস্টাট কপি করে পুলিশের মারফতে খোদ দিল্লীর দপ্তরে চালান করে দিয়েছে । হারামজাদা খেতে পাচ্ছিল না, শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল কুকুরের মতো । আমার অপরাধ, আমি তাকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলাম । লাল হয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকেন গোরাঙ্গবাবু ।

শুধু একটা কথাই সাদৃশ্য দেই গোরাঙ্গবাবুকে, সাংঘাতিক লোক তো !
ফোভে দুঃখে গোরাঙ্গবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন হিটলারের মত । বসেন,
সাংঘাতিক গণেশ, সাপের চেয়েও সাংঘাতিক ।...কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছি
না । আমি শঙ্কিত হচ্ছি আমারই আশ্রিত দু-হাজার মেহনতী মানুষের কথা
ভেবে । গণেশ, তুমি জান না এ আমার কত বড় পরাজয় । কিন্তু দাশগুপ্তকে
আমি কিছুতেই সহ্য করব না । আমি ওকে স্রেফ সরিয়ে দেবো । দু-হাজার মজুর
সমেত কারখানা বিপন্ন হবার আগেই দাশগুপ্তকে সরিয়ে দেবে আমায় । একশো
লাগুক ! দুশো লাগুক ! পাঁচশো লাগুক !

মদ তখন মাথায় চড়েছে । বেপরোয়া জীবনের হিসেব নিকেসটা থোক পাঁচশোতে
মিটিয়ে ফেলতে তখন আর কোন কিন্তু মনে হচ্ছে না । ছুরির দাগ আমার
সর্বাক্ষে আর ছুরিকে ভয় করবো আমি ? কেন করবো ?...করকরে পাঁচশো টাকা
ভাবলাম পাঁচশো টাকায় সব হয় । আবার ফিরে ফিরতি আরম্ভ করা যার সব
কিছু । বোনটাকে আর রাত দুটোয় ফিরতে হয় না, শীলাকেও আবার ভালোবাসা
যায় । বলে বসলাম, পাঁচশো টাকা পেলে আমি পারি ।

গোরাঙ্গবাবু লাকিয়ে উঠলেন আনন্দে : আমি জানি তুমি পারবে । একখানা
দখীচির হাড়ের সত্যিই আমার বড্ড দরকার, গণেশ ।

তক্ষুনি নগদ দুশো টাকা আর তিনশো টাকার একখানা বেয়ারার চেক ।

শীলা বাধা দিয়ে বলে, সেই চেকখানাটাই বুঝি তুমি আমাকে বন্ধে যাবার আগে
দিয়ে গিয়েছিলে ? আমি ঢৌক গিলে বলি, হ্যাঁ, সেই চেকখানাটাই ।

কিন্তু বন্ধে যাবার ব্যাপারটা কি ?

আমি বলে যাই, সত্যি সে আর এক বিশ্বয় । কেন বন্ধে গেলাম ? শোন !—
মাঝখানের অধ্যায়টুকু আর বললাম না,—সেই অন্ধকার রাত,—নির্জন গলিপথ—
আমি আর দাশগুপ্ত । ওনবে ? আঁতকণ্ঠে বলে ওঠে শীলা, না ।

আমি বাকিটুকু বলে যাই : দাশগুপ্তকে চিনতে পেরেছিলাম পরে, অনেক পরে ;
—গ্যাসবাতির অস্পষ্ট আলোয় একখানা চিঠি দেখে ।

শীলা কাঠ কাঠ হয়ে তখনও আমার কথা শোনে ।

আমার বক্তব্য তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে । মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফেটে পড়ছে
গরাদেব ওপর । শীলাকে তাড়াতাড়ি বলে শেষ করি : পকেট হাতড়ে টাকাকড়ি
পাই না । পাই শুধু একখানা নিয়োগ-পত্র । বন্ধের একটা ফর্ম চাকরিতে ডেকে
পাঠিয়েছে নিখিল দাশগুপ্তকে ।

শীলা আহত হয়ে প্রশ্ন করে, তাই বসে গিয়েছিলে ?

আমি উত্তর দেই। বকলমের অভিশপ্ত চাকরি তা-ও টিকল না কপালে।

হঠাৎ অশাস্ত হয়ে ওঠে শীলা। বিভ্রান্ত হয়ে বলে, তা তো সব বুঝলাম, কিন্তু পুলিশ কি করে জানল তুমি খুন করেছ ? ছুরি দিয়ে নিশ্চয়ই নাম লিখে এসেছিলে না বহুর গায়ে ?

আমি ভেঙে পড়ি। বলি, গোরাক্ষবাবুই সব কাস করে দিয়েছেন। জাল মুনাফার নজির ধরে নিজের ওপর হামলা আসতেই গোরাক্ষবাবু ঘুরিয়ে দেন হামলা আমার ওপর। তাই বসে গিয়েও নিস্তার পেলাম না। চাকরিটা পেয়েও হারলাম। আশ্চর্য, কাঠগড়ায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোরাক্ষবাবু আমাকে সেদিন চিনতেই পারলেন না। অথচ গোরাক্ষবাবু.....।

দুই জ্বর মাঝখানে রেখার রেখার ভেঙে গিলিয়ে গেল শীলার শেষ কথা কটা,—
খুন করে খুন হয়ে গেলে !!

আমি টের পেলাম, অসীম যন্ত্রণা পাচ্ছে শীলা। আমিও চূপ করলাম।

একটু পরেই বড় বড় দুটো কালো চোখ তুলে ধরল শীলা আমার চোখে। কিন্তু সেই দুটো চোখে আমি আর আমাকে খুঁজে পেলাম না।

মাস কয়েক পর। জি-ডি-সি-ডি আররন ওয়ার্কসের চাকল্যকর খুনের মামলার শুনানী শেষ হল আদালতে।

উকিল ব্যারিস্টাররা হাজার চেষ্টা করেও মামলার রায় এখার ওখার করতে পারলো না। জুরীর সঙ্গে একমত হয়ে জজসাহেব রায় দিলেন : স্বতঃপ্রণোদিত হত্যা ঘটাবার অপরাধে দশ বৎসর এবং নাম জাল করে চাকরি করার দায়ে আরও দুই বছর,—দীর্ঘ এই বারো বছর একসঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে আমাকে। মেয়াদ হয়ে গেল আমার।

পুলিস ভ্যানে ওঠবার সময় দূরে এক নজর দেখলাম শীলাকে। মা ঠাকুমা শৈলেন, তপু,—সবাই দেখি দেখতে এসেছে আমাকে। তপুটাই কাঁদছিল বেশি। না বলে রাত কবে কেবাব জন্তে কতদিন যে চুলের মুঠি ধরে অনর্থক মেরেছি তপুকে ? কেন মেরেছি ! কোন উত্তরই খুঁজে পাই না মনে আমি।

মায়ের চোখে ছানি পড়ে একদিক থেকে দেখলাম ভালোই হয়েছে। বাবার চোখের কোন অসুখ নেই। চোখ দুটো দেখলাম রক্তজবা। দাউ দাউ করে

জলে যাচ্ছে বিশ্বসংসার ।

গাড়িতে উঠতে যাবো, হঠাৎ সস্তর বছরের বুড়ী ঠাকুরমা পুলিশ কর্ডন ভেঙে এগিয়ে আসেন হাউ মাউ করে । ভ্যানের ওপর হুমাড়ি খেয়ে পড়ে আমার গায়ে হাত সাপটান । হা-হতাশ করে ভাঙা ভাঙা কথায় আশ্বাস দেন চোখে মুখে হাত বুলিয়ে, ‘জেল থেকে ফিরে এবার তো নিজের নামেই চাকরি করতে পারবি বাবা । কটা বছর দেখবি দেখতে দেখতে কেটে যাবে ।’

গর্জে উঠল ভ্যান । নড়ে উঠল সৃষ্টি । হঠাৎ বুকের মাঝখানে দারুণ একটা যন্ত্রণার মুচড়ে উঠল । মনে হল যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রাণ । বেদিশা হতে হতে টের পেলাম, রয়ে যাচ্ছে শীলা, তাই ।

শীলার কথাই ভাবছিলাম । শীলার কোন বক্তব্য ছিল কি ? ছিল যদি তো বললো না কেন ? না কি কোনই কথা ছিল না ? সব ফুরিয়ে গিয়েছিল । শেষ হয়ে গিয়েছিল । দারুণ একটা ক্রোভ, খানিকটা হিংসারই মতন, জ্বলতে জ্বলতে শিরা উপশিরা বয়ে মাথায় উঠে গেল যেন । ঘাম হতে লাগল বৃষ্টির মতো শরীরে । মনে হল শীলাই আমাকে দিয়ে সবটা করিয়েছে, আজ সরে দাঁড়িয়েছে । বেইমান ভালবাসা ।

আদালতের উঠোন পেরিয়েই সদর রাস্তা । এক গাড়ডায় পড়ে ঝাঁকুনি লাগল মাথায় । এ সব কী কথা ভাবছি আমি ? একটার আর একটা খুন ? শীলার রক্তেই তর্পণ করছি নাকি ? ঘৃণা এল । মনে হল যেন নিজেকেই টুকরো করে ফেলি । বাতাস চাই বাতাস নেই । বোধ হল, এখনই বুকটা কেটে যাবে । দুঃসহ যাতনার আমারই হাতের খাবা লাফিয়ে ওঠে আমার কণ্ঠায় । ঝনঝনিরে ওঠে হাত-পায়ের শিকল বেড়ি । নিজের টুঁটি নিজেই ধরেছি এবার শক্ত মুঠোর । কিন্তু পাহারাদার সশস্ত্র সান্দ্রী তক্ষুনি রুখে দেয় আমাকে । কড়া পাঞ্জার চাপে হাত দুখানা শুইয়ে দেয় আমার কোলের ওপরে, ঘামে ভিজ প্যান্টটা যেখানে গায়ের সঙ্গে লেপটালেপটি হয়ে গেছে ।—তুমি আর তোমার গায়ে এখন হাত দিতে পার না । সম্বিং ফিরে পেয়ে আবার শুনি শীলা আসছে ঝিম ঝিম শিরা উপশিরা ধরে । দেখি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই—মা বাবা, তপু... ঠাকুরমার কথাটাও কানে আসে, জেল থেকে বেরিয়ে এবার তো নিজের নামেই চাকরি করতে পারি বাবা । কটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে । মেরাদী আসামীকে নিয়ে উদ্দ্বাসে ছুটে চলে ভ্যান । এক লোহার বাসর থেকে আর এক লোহার বাসরে ।—

আহারের পর
দিনে দু'বার..

দ্রব প্রাণুতে
খাদ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

হ' চামচ মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গে চার চামচ মহা-
ভ্রাকারিট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার
বাস্থ্যের উন্নতি উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-
ভ্রাকারিট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক
কলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও
বলকারক টনিক হ'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়ে এবং নবলক
বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

শুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

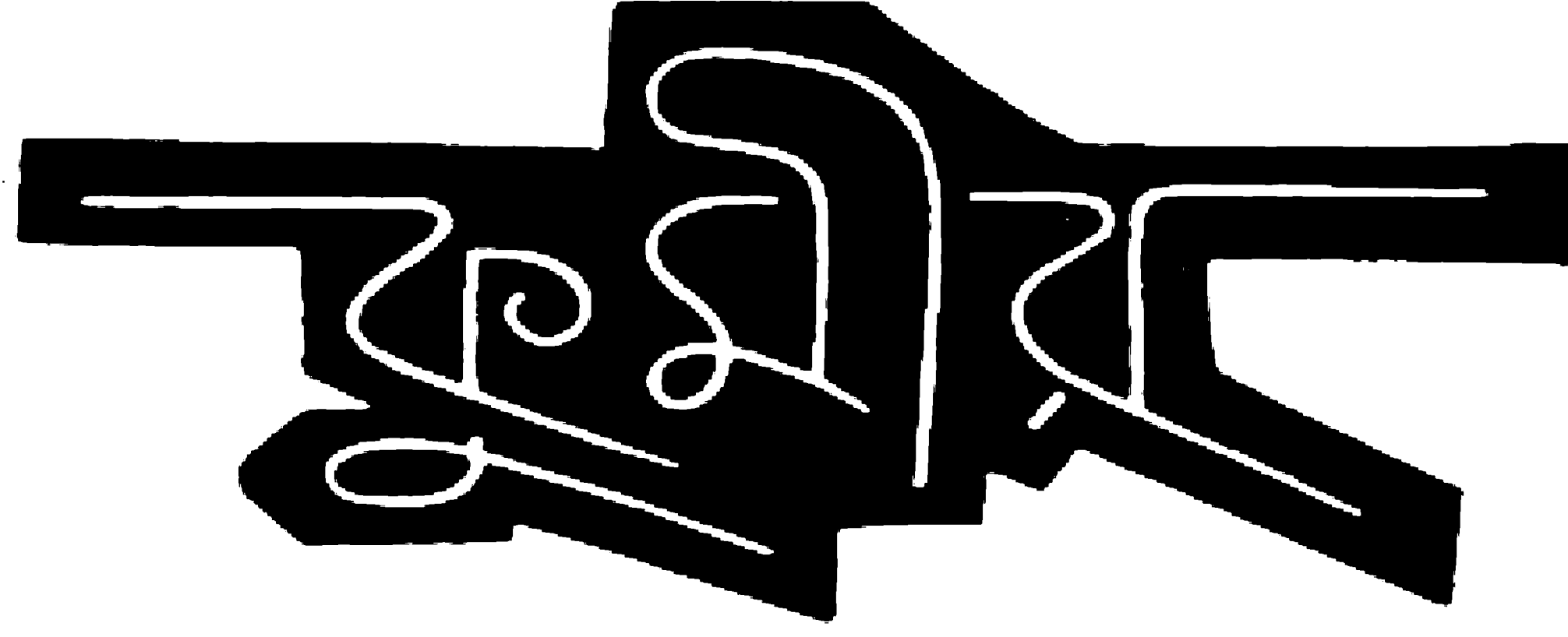


সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র
বোষ, এম.বি.বি.এস, আয়ুর্জেয়-
আচার্য, ৩৬, গোয়া লপাড়া
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র বোষ, এম.এ.
আয়ুর্জেয়শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লওন).
এম.সি.এস. (আমেরিকা), ডাঃগলপুর
কলিকাতার রসায়ন শাস্ত্রের তৃতপূর্ণ
অধ্যাপক।



—‘ধরেন, যদি আপনেন্নেই অখন মারি ? হ, আপনেন্নেই মেঞা । যদি খতম করি ?’ অনেকক্ষণ পরে কথা বলে আনোয়ার ।

অন্ধকারে খালেক মুন্সীর মুখটা দেখা যায় না । দেখতে পায় না আনোয়ার । কিন্তু আন্দাজ করতে পারে । বুড়ো খালেক মুন্সীর তুলো-সাদা ভুরু জোড়া প্রব-বোধক চিহ্নের মতোই বেকে গেছে । কপালের রেখাগুলি আরো গভীর হয়ে উঠেছে । স্ববির চোখ দুটিতে ভয়, শংকা, সন্দেহ । আনোয়ার যেন টের পায় এসব । অন্ধকারেও দেখতে পায় ।

খালেক মুন্সী যেন ভয় পায়নি । কিছু ভাবেনি । মনে কোনোই সন্দেহ নেই তার । গলাটা সাক করার ভঙ্গিতে বার দুই কাশে । শেষে হাসে । বেশ জব্ব করেই আনোয়ারকে গুনিয়ে-গুনিয়ে হাসে খালেক মুন্সী । বলে, ‘পাগলের লাখান কী যা-তা কও মাঝি !’

—‘পাগল না মুন্সী, আমি সেয়ানা । হাচাই কইতেছি আপনেন্নে । অখন যদি চিরকালের মতোই নিকাশ কইরা ফেলাই আপনেন্নে, কেহই ণাখব না । জানব না । কী জোবা কন তো মারনের ?’

সত্যি, এমন সুযোগ বড় মেলে না । মস্ত সুবিধে আজ । ইচ্ছে করলেই খালেক মুন্সীকে মেরে ফেলতে পারে আনোয়ার । কিন্তু পারে কি ? সে সাহস আর শক্তি কি এখনো আছে আনোয়ারের ? সেই রক্ত ? পঁচিশ বছর আগের দিনগুলি কি ভুলতে পারেনি আনোয়ার ? রক্ত থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার ইতিহাস ? এখনো কি রক্তে-রক্তে বয়ে বেড়াচ্ছে তারই প্রতিহিংসার বীজ ?

পেছন ফিরে তাকাল খালেক মুন্সী। না, কিছু নেই। অন্ধকার, ঘনভার রাত্রি। চেনা আলোর বিন্দুগুলি হারিয়ে গেছে কোথায়। কোন্ দূরে মিলিয়ে গেছে লোকালয়। চরমুগরিয়া ডুব দিয়েছে অন্ধকারে। দেখা যার না। কিছুই দেখতে পার না খালেক মুন্সী।

আকাশে মেঘ। ভয়ংকর কালো মুখখানা। থেকে থেকে চোঁচাচ্ছে। কাকে ধমকাচ্ছে আকাশটা। ভারি কুৎসিত আর বনু হাসি হাসছে। খাড়া ঝিলিক। সরু লিকলিকে সাপের জিভ যেন। চাটছে আকাশটাকেই।

বাতাস বড় ছরস্তু। নদী বড় দামাল।

দেখতে দেখতে কোথায় এসে পড়েছে নৌকোটা। ছোট এক মালাই আনোয়ারের। আর এগোতে চায় না। লক্ষ হাতে বাতাস ঠেলে দিচ্ছে পেছনে। লগি থই পায় না। আড়িয়লখা এখানে অটু অতল। বৈঠায় জল কেটে এগুতে পারে না আনোয়ার। চায়-ও না।

ঝড় উঠেছে। আনোয়ারের নৌকোটা হয়তো আজ রাত্রেই ডুববে। তার জন্তে ভয় নেই। দুঃখ নেই আনোয়ারের।

এমন রাত্রেই মাথাটা খরাপ হয়ে যায় আনোয়ারের। ভয়ংকর ক্ষেপামিতে পেয়ে বসে। লোকটা পাগল হয়ে যায়। মাথার ভেতরে এক অস্থির যন্ত্রণা অনুভব করে। এক অসহ্য দাপাদাপি। কী যেন ইচ্ছে হয় তখন। যার সঠিক কোনো মানে আনোয়ার নিজেও খুঁজে পায় না। কিন্তু জালাটা বড় তীব্র, বড় কঠোর বড় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কিছুই ভালো লাগে না তখন। সমাজ সংসার, স্বজন কিছু না। এমন কি নিজের বেঁচে থাকা পর্যন্ত অসহ্য মনে হয়। এমন ঝড়ের রাত্রিই সর্বনাশ ডেকে আনে আনোয়ারের মনে।

এতক্ষণে খালেক মুন্সী কী ভাবে। ক্ষেপামিটা একটু অল্প রকম লাগে আনোয়ারের। কেমন খটকা লাগে। ভয় হয়। সন্দেহটা তীব্র হঠাৎ দেখা দেয়। আরেকটু স্পষ্ট। খালেক আনোয়ারকে দেখে। অন্ধকারে অস্পষ্ট। আরো কিছু জমাট অন্ধকার মনে হয় লোকটাকে। মাঝে-মাঝে আকাশ চমকায়। সেই হঠাৎ আলোর চমকানিতে লোকটাকে দেখায় ভয়ংকর। কেমন বিল্বী। কেমন উদ্ভ্রান্ত। আর জল শুধু জল। বাতাস। ঢেউ। ঢেউয়ের হাততালি। যেন আশমান-জমিনে এক দারুণ রেবারেবি শুরু হয়েছে আজ। সমস্ত দুনিয়া জোড়া কী এক বড়যন্ত্রের বিল্বী কানাকানি। নদীর বুকে ঝাঁপুই খেলছে বাতাস। ঢেউ ছলছে। ঢেউ ফুলছে। সাপের মাথায় মণি জলছে। নৌকোর চারপাশে কিল-বিল করছে

সাপ। ছোবল দিচ্ছে। নোকোটা ছলছে। বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে নোকোটাকে। যেন বাসুকীর মাথায় ছোট পৃথিবী।

—‘মাঝি, কূলে নি ভিড়াইবা নাও? ভারি যে ভুফান শুরু হইল এখন।’ খালেক মুন্সী কথাটা বলে। বেশ আস্তে। মনের ভয়টা গোপন রেখে। গলাটা তবু কেঁপে যায়।

আনোয়ার বুঝি টের পায়। হাসে। বলে, ‘ডর করে নি মেঞার! ডর কিয়ের? এডা ভুফান না, খোদার পয়গম। আইজ এস্তুকালের দিন। ডরান ক্যা পোলাপানের লাখান?’ যেন ঠাট্টা করে আনোয়ার খাঁ। কেমন হেঁয়ালি মনে হয় ওর কথা।

—‘কী যে কও! পাগলামি কইর না। কূলে লও।’ আদেশ করে খালেক মুন্সী। কিন্তু আনোয়ারের কানে সকাতির মিনতির মতো ঠেকে।

ভালোই লাগে আনোয়ারের। লোকটাকে আজ হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে। হোক পঁচিশ বছর। রাগটা তবু পুরনো হয়নি মোটেই। জালাটা এখনো নতুন মনে হয়। ব্যবধানটা পঁচিশ বছরের নয়। যেন আজ কালের। ঝড়ের রাতে লোকটা এমনি হয়ে যায়। এমনি উদ্ভ্রান্ত। উন্মাদ। মাতাল যেন। অন্ধকার গুরুভার পাথর হয়ে চেপে বসে বুকে। আর ভেতরে খাঁচায় বন্দী পাখিটা ছট্-ফট্ করে তখন। কী যেন ইচ্ছে হয়। কাকে মনে পড়ে। বুকের ভেতরে তোলপাড় করে। ফেপামিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন। মাথার ঠিক থাকে না।

‘পানি দেখছনি মেঞা ভাই? পানি?’ পাগলামিটা আবার দেখা দেয়। আনোয়ার খাঁ কথা বলে। খালেক মুন্সী তাকায়। ছই-এর ফাঁকে আনোয়ারের মুখটা দেখে। যেন দেখতে পায় ভয়ংকর নিষ্ঠুর, কঠোর আর কুটিল আনোয়ারের মুখটা। দেখে ভয় পায়। ভীষণ ভয়। ঝড়ের রাতগুলি ভয়াবহ। এমন রাতেই লোকটা কেমন হয়ে যায়। খালেক মুন্সী তা দেখেছে। কিন্তু এরকম দেখেনি কখনো।

আনোয়ার বলে, ‘মেঞা ভাই।’

—‘কি কও!’

—‘তুমি কী ভাবো মেঞা ভাই? মনের কথাডা কবা নি?’

—‘মনের কথা কী কব? মনে আমার বেহুদা কথা নাই।’

—‘কেন্ মেঞা ভাই, নাই কেন? কোনো আকেজ্জা নাই তোমার?’

‘—না ।’

—‘আমার আছে । শোনবা ?’

—‘কও, শুনি ।’ খালেক মুন্সীর কণ্ঠে বিরক্তি । ইচ্ছে নেই । তবু অনিচ্ছার কথাটা বলা যায় না । বড্ড নিরুপায় মনে হয় নিজেকে । তাই শুনতে হয় । পাগলের আবোল-তাবোল ।

—‘মেঞা ভাই, পানি দেখলেই আমার মনে লয় ডুইব্যা মরি । তোমার নি সাধ হয় ?’ আনোয়ার খাঁ চূপ করে । অপলক তাকিয়ে থাকে খালেক মুন্সীর দিকে । খালেক মুন্সী দেখে না । অন্ধকারে দেখা যায় না আনোয়ারের মুখটা । তবু অস্বস্তি বোধ করে ! বলে, ‘না, এখন আবার সাধ কিয়ের ! সাধ নাই ।’

—‘নাই ! হাচা কইতে আছেন তো ?’ বেশ উৎফুল্ল মনে হয় আনোয়ারকে ।

—‘হ !’ বড় গম্ভীর হয়ে ওঠে খালেক মুন্সী ।

—‘মরতে পারেন ? ডুইব্যা মরতে পারেন আপনে ?’

—‘কেন্ মরুম কেন্ আমি ?’ কেমন ব্যাকুল শোনায খালেকের কথাটা । যেন ভয় পেয়েছে ।

—‘না, তুমি মরবা না মুন্সীর পুত । আমিই খতম করুম তোমারে । তোমার গলা জড়াইয়া ডুইব্যা মরুম আমি ।’ ভীষণ ক্ষেপে যায় আনোয়ার । চিৎকার করে কথা বলে । বাতাস যেন তার অজস্র হাতে লোকা-লুফি খেলে ওর কথা নিয়ে । খালেক মুন্সী সব কথা শোনে না । কিন্তু ক্ষেপামিটা আন্দাজ করে ভয় পায় । কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে । একটা বিপদের আশঙ্কায় মনটা কুকড়ে আসে । মুখে কথা নেই । চূপ করে থাকে খালেক । সে যেন নেই । কোথায় চলে গেছে এখান থেকে । এই মুহূর্তে । একলা আনোয়ার । সে বকুক ! বকে মরুক ! তার কোনো কথার কান দেবে না খালেক । কক্ষনো না । এবার বৃষ্টি নামে । তীরের মত তীক্ষ্ণ । ঝাঁক-বেঁধে বৃষ্টি নামে । যেন টগবগিয়ে ওঠে নদীর জল । অন্ধকারে দেখা যায় না । কিন্তু অশ্রুভব করা যায় । স্পষ্ট । পরনের লুঙিটা ভিজ্ঞ একশা । গায়ের গামছাটা পর্বস্তু । মাতলাটা ঠেকাতে পারে না । বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীর । আনোয়ারের লক্ষ্য নেই ভ্রক্ষেপ নেই সেদিকে ।

কাজটা জরুরী নয় । দু-দিন আগে-পিছে হলে ক্ষতি নেই । কিছুই লোকসান হত না খালেকের । তবু কি খেয়াল হল । আজকেই ইচ্ছে হল মেয়েকে দেখার । যেই ভাবা সেই কাজ ।

আনোয়ার বলেছিল, ‘আইজ-ই যাইবেন মেঞা ? দুইডা দিন সবুর করেন ।’

—‘না । মাইয়াডার লেইগ্যা মনডা উচাটন হইছে ।’

—‘আশমানের মোখটা দেখছেন নি !’

—‘হ, হ লও ! হইব না কিছু ।’ অভয় দিয়েছে খালেক ।

আনোয়ার প্রতিবাদ করেনি আর ।

ক্ষীণ আপত্তি করেছিল বিবি । কোন ফল হয়নি । খালেক মুন্সীর নিয়তিই বৃদ্ধি
আজ তাকে টেনে এনেছে বাইরে ।

নদী নির্জন । নিঃসঙ্গ । হাওয়া উত্তাল । এলো-মেলো । অনর্গল বৃষ্টি ।
বাচাল মেয়ের মত ঝরছে তো ঝরছেই । থামা নেই । রাখ-ঢাক নেই । গুড়-
গুড় করছে আকাশ । দাঁতে দাঁত ঘষছে মেঘেরা । চারদিক তটস্থ । ভয়ে ।
খালেক মুন্সী ভয় পায় । চোখের পাতা বন্ধ করে । অন্ধকার আরো ঘন হয়ে
ভারি হয়ে যেন গিলে ফেলতে চায় । চিৎকার করা যায় না । কেউ শুনবে না ।
ছুটে আসবে না কাছে । লোকালয় থেকে এখন অনেক দূরে চলে এসেছে খালেক
মুন্সী । বড় করুণ মনে হয় নিজেকে । বড় দুর্বল আর একলা । আনোয়ারকে
দেখা যায় না । তবু অনুভব করা যায় একটা ভয়ংকরের অস্তিত্ব । সত্যি,
লোকটা যেন বদলে গেছে এখন । এই ঝড়, এই বৃষ্টি, এই নদী বদলে দিয়েছে
লোকটাকে । লোকটা তাই হিংস্র । হিংস্র আর ভয়ংকর হয়ে গেছে আনোয়ার ।

—‘এক জমিনে দুই কসল হয় না মেঞা সাইব ?’ আনোয়ারকে দেখা যায় না ।
গলুইয়ের উপর স্তূপীকৃত অন্ধকার । অন্ধকার সশব্দ । নদী বড় মুখরা ।

—‘হয় । আউশ আর আমন ।’ অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলে খালেক । শীতে দাঁত
কপাটি লাগে । ঠক-ঠক করে কাঁপছে শরীর । ঠোট কাঁপছে থর্-থর্ ।

—‘যেমন আপনে আর আমি । এক-ই জমিনে দুই কসল । দুই খন্ডে জনম
আমাগো । বীজ দুই রকম । আপনে মুন্সীর পুত । আমি ঝায়ের । মা-ডা
কিন্তুক হালিমা বিবি ।’ আনোয়ার হাসে । হাসিটা দেখা যায় না । দেখতে পায়
না খালেক মুন্সী ।

—‘দেখছনি মেঞা ভাই !’ আনোয়ার কথা বলে ফের । বীজের গুণে স্বভাব-
চরিত্তিরে কী তফাৎ আমাগো ? যেন আশমান আর জমিন । আশমান তুমি ।
জনম ভইর্যা ঘুইর্যা মরলাম । তবু তোমার লাগুর পাইলাম না ।’
কী বলে লোকটা ! কেমন হেঁয়ালী ঠেকে ওর কথাগুলি । লোকটা কেমন

রহস্যময় । বড় অদ্ভুত । বড় দুর্বোধ্য ।

—‘কী ক’ও তুমি ?’ অধৈর্য হয়ে ওঠে খালেক । ভীষণ ব্যাকুল ।

—‘বোঝ না মেঞা ভাই ? পাগলডার কথা বোঝ না ? বেহুদা বুড়া হুইলা তুমি ।

তোমার চুল পাকছে বাতাসে !’ আনোয়ার যেন ঠাট্টা করে খালেককে ।

আবার চপচাপ । কথা নেই । কথা বলে না কেউ ।

ঝুটি পড়ছে । টগ-বগ করে ফুটছে নদীর জল । ঢেউ ছলছে । ঢেউ ফুলছে ।

ঢেউ ভাঙছে । টল-মল করছে আনোয়ারের নৌকোটা । মোচার খোলার মত

আকাশ-পাতাল করছে খালি । মাতালের মত টলছে । আনোয়ার তবু নিবিষ্কার ।

পূবে সাঁওটায় ভিজে যাচ্ছে শরীর । খেয়াল নেই ।

খালেক মুন্সীর বুঝি ঘুম এল । বাইরে ঝুটি । ছই-এর ভেতরে শীত । থেকে

থেকে হাওয়া হানা দিচ্ছে ভেতরে । জলের ছাটে ভিজে যাচ্ছে সব । কতকাল

ছইটা সারানো হয়নি । অজস্র কুটো-কাটা ছই-এর গায়ে । এখন জল চুইয়ে

পড়ছে ভেতরে । খালেকের অত খেয়াল নেই । নামাজের ভঙ্গিতে উবু হয়ে পা দুটো

বুকের ভেতরে টেনে শক্ত পাটাতনের উপরে চপ করে পড়ে থাকে খালেক । যুমোতে

চেটে করে । ঘুম আর আসে না । কসাইখানার জানোয়ারের মতোই ঝিমোয় ।

আবার চমকে ওঠে আকাশ ! সরু লিকলিকে সোনালি সাপটা আকাশের এ-

প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দৃটে যায় । মুহূর্তের জন্তে ঝক-ঝক করে ওঠে চারদিক ।

আকাশের দিকে তাকাতে ভয় হয় । নদীর দিকে তাকাতে শংকা ! কুলহীন

পারাবার । সহস্র কেনার দাঁতে কুটিল হাসি হাসছে নদীটা । আমার চমকাল

আকাশটা । চৌচির হয়ে গেল । আর একটু পরেই শব্দটা শোনা গেল । বাজ

পড়ল কোথায় ।

ধড়-মড় করে উঠে বসল খালেক । ‘কী ! কী হইল !’

আনোয়ার হাসে । বলে, ‘কী, কী দেখলেন হব্বার ।’

—‘না, না । কিছু না । খোয়াব দেখতে আছিলাম ।’

—‘হেই কথা কন ।’ বিদ্যুতের আলোর আনোয়ারের দু-সারি দাঁত ঝক-ঝক

করে ওঠে । কেমন হিংস্র আর বীভৎস দেখায় লোকটাকে । খালেক দেখে আর

সংকুচিত বোধ করে নিজেকে । কী সর্বনাশের আশঙ্কায় সমস্ত হয়ে ওঠে

খালেকের মন ।

এতক্ষণে ঝুটি ধরে আসে । বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে আরো । নদীর ক্ষেপামি

বেড়ে যায়। খালেক মুন্সী বুঝি ভয় পায়। চিৎকার করে বলে, ‘আমি যামু না আনোয়ার। নাও ভিড়াও তুমি। কূলে লও!’ ভাবটা আদেশের। কিন্তু স্মরণটা মিনতির। খালেকের গলায় করুণ প্রার্থনা।

আনোয়ার বলে, ‘কী যে কন মেঞা ভাই! কূল কই? কোন্ কূলে নাও ভিড়া কন তো।’ কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে, ‘কাম নাউ কূলে গিয়া। আসেন এইবার মরি!’

এই হেঁয়ালী আর ভালো লাগে না। মনে-মনে ভীষণ বিরক্তি বোধ করে খালেক। মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না। অনিচ্ছায়! আশঙ্কায় চূপ করে থাকে খালেক।

আকাশ চমকে ওঠে। আবার শব্দ হর দূরে। বাজ পড়ে। সীসে ভারি আকাশ-খানা কালো কালো হয়ে যায়।

মানুষ নেই। নদী নির্জন। জেলে নৌকোগুলিও আজ দেখা যায় না। শুধু বালুই মাছের মতো আনোয়ারের একমালাইটা বড় অসহায়ের মতো টল-মল করছে। দুটি মাত্র মানুষ। আনোয়ার আর খালেক। তারা কেউ কারো মনের হৃদয় পায় না। তবু শেষ বোঝা-পড়ার দিন বুঝি তাদের আজকেই।

আনোয়ার বলে, ‘আশমানের মুখখানা দেখছেন নি মেঞা ভাই?’

—‘হ।’ সংক্ষিপ্ত জবাব খালেকের।

—‘ঠিক যেন বরুণী বিবির লাখান। গোসা করলে হের মুখখানাও এমুন দেখাইত।’

ঠিক! খালেক যা ভেবেছে তাই। লোকটা পাগল হয়ে গেছে। ঝড়ের রাতে লোকটা এমনি করেই পাগল হয়ে যায়। খালেকের কথাটা মনে ছিল না। এবার মনে পড়ে।

খালেক বলে, ‘চূপ কর। পেচালু পাইড না।’

—‘কেন্ মেঞা ভাই। পেচাল পাড়তে মানা কর ক্যা?’ আনোয়ার চিৎকার করে ওঠে। যেন কৈফিয়ৎ তলব করে। বলে, ‘আমারে পাগল করছে কে! তুমি না?’

—‘কি যে কও! তোমার কথা বুঝি না।’ অধৈর্য মনে হয় খালেককে।

—‘বোঝ না? এই আশমানের তলে বইয়া কইতে আছ তো?’

খালেক চূপ। মুখে রা নেই। শপথ করতে বাধে।

—‘মেঞা ভাই একটা কথা শোন!’ যেন অত্যন্ত গোপনীয় কথাটা। সামনের

দিকে ঝুঁকে সাবধানের ভঙ্গিতে কথা বলে, আনোয়ার, ‘চড়ির ঝন-ঝনি আর টাকার কন-কনি যার সময় না দোজখে-ও তার ঠাই নাই।’

—‘হাচা কখাই তো।’ খালেকের সমর্থনটুকু অস্পষ্ট।

—‘আমার যোবতি কবিলাটা কৈ গেল মেঞা ভাই?’

ভয়টা এবার স্পষ্ট। সন্দেহ অমূলক নয়। লোকটা আজ ক্ষেপে গেছে সত্যি।

কিন্তু পঁচিশ বছর চূপ করে ছিল কী করে! খালেক মুসলী চূপ—যেন শোনেনি।

চূপ-চাপ কয়েক মুহূর্ত কাটে। আবার আনোয়ার বলে, ‘বরনী বিবিকে কই রাইখ্যা আইলা মেঞা ভাই?’ আর রহস্য করে বলা নয়। এবার সরাসরি প্রশ্ন।

—‘কারে কও?’ খালেক যেন আকাশ থেকে পড়ে। আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করে আনোয়ারকে।

আনোয়ার জলে ওঠে। ‘হ হ মুসলীর পুত। তোমারেই জিগাই। তোমার না গোস্তের কারবার আছিল? মাইয়া মাইনষের নরম গোস্ত না তুমি বেচতা?’

খালেক বোবা হয়ে যায়। ভয়ংকর ভীকু আর দুর্বল মনে হয় নিজেকে।

আনোয়ার বলে, ‘তখনো তুমি মুসলী হও নাই। আমি-ও মাঝি আছিলাম না চিরডা কাল। নছিব আমাগো এমন কইর্যা বানাইছে। জমি-জিরাত ধোয়াইয়া আমি তোমার মাঝি হইলাম। মাইয়ামাইনষের গোস্ত-ও তোমার কাছে হারাম হইয়া গেল একদিন। কিন্তু হুঃখুটা ভুলুম ক্যান্বায় আমার। আমার দিল-কলিজা যে তুমিই কাইড়্যা নিছ!’

—‘আমি না, আমি নারে আনোয়ার ভাই!’ খালেকের কণ্ঠে আকৃতি।

বেশ মজা লাগে আনোয়ারের। বড় খুশি হয়ে খালেকের অবস্থাটা উপলব্ধি করে। বলে, ‘মিছা কইও না মেঞা ভাই। আমি সব জানছি। কেবল হাতের কাছে পাই নাই তোমারে।’

—‘পাইলে কী করতা ছোড ভাই?’

—‘কী কইলা? ছোড ভাই? হ আমি তোমার ছোড ভাই। এক জমিনে আউশ, আমন আমরা। মাডা এক। বাপ আমাগো দুইড্যা। রক্তের তফাতে আমরাও আলাদা মানুষ দুইড্যা। কি মেঞা ভাই, হাচা না?’

—‘ক্ষেমা দেও, ক্ষেমা দেও আনোয়ার। আমার ডর করে।’

—‘কেন্ মেঞা ভাই, ক্ষেমা দিয়ু কেন? আপনে কি ক্ষেমা দিছিলেন আমার বিবিরে ডুবাইয়া মারণের বেলা? ভাবছিলেন নি, বলদ, মুরুকু মানুষডার-ও একটা দিলকইলজা আছে?’

—‘ও কথা কও কেন্? আমি তোমার বিবিরে মারি নাই।’

—‘মিছা কইয়া কল নাই মেঞা ভাই। আমি মুক্কু, আর তুমি যে বন্দ! নিমকহারাম কতগুলি মাইনবেরে লইয়া কাম হাসিল করতে চাইছিল। তারাই কাঁস কইরা দিল আমারে। সব জানলাম। আমি পাগল হইলাম। তীর ছাইড়া পানিতে ভাসলাম। আমার দুশ্মনেরে খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা বুড়া হইলাম। মেঞা ভাই সব আগুন নিব্যা যায়। মনের আগুন বুঝি নিভে না। নাইলে এত গাঙের পানিতে-ও নিভল না কেন্ আমার রাগটা!’

—‘কী চাও তুমি!’ খালেক মুন্সী বুঝি কঁদে কঁদে এবার।

—‘তোমারে মারতে। নইলে শান্তি পামু না। সোয়াস্তি নাই আমার।’

নদীর বঁকে আলো জলে উঠল। তীর এবং তীক্ষ্ণ সেই আলোর ছটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। একটু পরেই বঁকের মুখে স্টিমারটা দেখা যায়। এগিরে আসছে এদিকেই। মাদারীপুর যাচ্ছে। আলোর আলোময় হয়ে উঠল সমস্ত নদীটা। আর ভয়ংকর ক্রুর, হিংস্র দেখায় নদীটা। যেন সমস্ত প্রকৃতিটাই আজ এক-ই প্রতিহিংসায় লিপ্ত। আনোয়ারের সঙ্গে জোট পাকিয়েছে সবাই। খালেক মুন্সী এখন নিরুপায়। এখানে জল অতল। ঝাঁপ দিলে মৃত্যু। তীর চোখে পড়ে না। শুধু জল আর জল। ঢেউ আর ঢেউ। সামনের গলুয়ের তলায় আছড়ে পড়ছে জল। হিস্-হিস্ শব্দ। হাওয়া বইছে। শাঁই-শাঁই হাওয়া। হাওয়ার গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। সূচের মত বিধছে সারা গায়ে। ছাট আসছে ভেতরে। নৌকোর ভেতরটা-ও নিরাপদ নয়। আজ পৃথিবীতে নিরাপত্তার স্থান নেই কোথাও। পালাবার আর পথ নেই খালেক মুন্সীর। মুক্তি নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। তার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বসে আছে ঐ লোকটা। আনোয়ার ঋ। পঁচিশ বছর ধরে যাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করে এসেছে খালেক মুন্সী। আজ তার ভাগ্য-বিধাতা আনোয়ার। তার জীবন ভোর সূর্য্য অস্তায়ের বিচার করবে সে। মাক নেই। কসুর নেই।

মানুষ তবু বাঁচতেই চায়। পরম সুখে, সমস্ত ঐশ্বর্য আহরণ আর ভোগের মধ্যে নিজের জীবনকে টিকিয়ে রাখতে চায় মানুষ। সারা জীবনের শ্রমের সঞ্চয় আজ অসামান্য খালেকের। তবু-ও একটা তুচ্ছ লোকের কাছেই তার ছেলেমানুষী প্রার্থনা। প্রাণের জন্ত অস্তিম আকৃতি। খালেক বলে, ‘সোনা ভাই তুমি তো জান না, তোমার বিবিরে আমি মারি নাই। এমুন এক তুফানের রাইতে নাও থিকা গাঙের জলে ঝাঁপ দিয়া মরল সে। আমি কি করুম। আমি তো বাঁচাইতে চাইছিলাম।’

—মেঞা ভাই বিবি আমার মইরা বাঁচছে। আমি তার লেইগ্যা বাঁচচ্য। মইর্য। রইলাম কেন্? তোমারে খতম করণের লেইগ্যা। আর দিক্ কইর না।’

—‘আনোয়ার অমন কইরা কইস্ না তুই। আমার ডর করে।’ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, ‘তুই না আমার ভাই? এক মায়ের প্যাডের ছাওয়াল না আমরা?’

—‘কিস্তক বাপ আমাগো দুইডা।’

স্টিমারটা অনেক দূরে। বুঝি কিনার ঘেঁষে যায়। বোঝা যায় না। খালেক মুন্সীর ঠাহর হয় না। নদীটা আবার অন্ধকার। ভয়ংকর সেই অন্ধকারের চেহারাটা কী কুংসিত!

আল্লে আল্লে বলে খালেক, ‘বাড়ি ল। তোরে জমি-জিরাত কইরা দিমু! সাদি দিমু। আবার ঘর-সংসার করবি তুই।’

—‘মেঞা ভাই, তার থিকা কচু গাছে গলায় দড়ি দিতে কও না কেন্?’

—‘আনোয়ার, আমার ভাই, কথা শোন! আমারে মাইর না। ফিরা লও। ঘরে আমার সুন্দরী কবিলা। হের কথাডা ভাইব্যা দেখ। আমার ছাওয়াল, আমার মইরা? তাগো যে কেউ নাই ভাই!’ বাতাসের কানে কানে খালেকের অন্তিম প্রার্থনার কথাগুলি অনেকক্ষণ ভেসে বেড়ায়। কেউ শোনে না। একটা নিষ্ফল আবেদন নদীর বুকে অকারণ মাথা কুটে মরে কেবল। নির্বিকার, নিস্পৃহ আনোয়ার। ভয়ংকর নির্মম হয়ে উঠেছে লোকটা।’

আনোয়ার বলে, ‘মেঞা ভাই এখন আমরা বুড়া হইছি। মরণের দিন হইছে। ঈশ্বরের কান্না কাইন্দ্যা কী হইব?’

—‘কী চাও তুমি, ট্যাহা?’

—‘না। ট্যাহা দিরা কী হইব আমার? এখন আমি মরতে চাই। তোমার গলা জড়াইয়া মরুম আমি। কোনখানে ঝাঁপ দিছিল আমার বিবি, ভাই?’

—‘মজুন্দারের মুখে।’ নিজের অজান্তেই কথা বলে খালেক।

আনোয়ার বলে, ‘তবে লও, আরেকটু আউগাই।’

তারপর কথা নেই। দুজনেই চুপ-চাপ। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে সময়। একটি অন্তিম লগ্নের প্রতীক্ষায় তারা চুপ করে থাকে। অশান্ত নদী। হিংস্র নেকড়ের মতো ছই-এর উপরে ঝাপিয়ে পড়ছে হাওয়া। আকাশ শাসাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীকে। চারদিক ভয়ে স্তব্ধ। অন্ধকার। শুধু সেই আদ্যিম অন্ধকারে মুখোমুখি দুটি

মানুষ। বুঝি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের উত্থান-পতনে কোনো ভূমিকা নেই তাদের। ছিল না কোনদিন। বর্বর যুগের ছুটি মানুষ আজ পরস্পরকে দেখছে। খালেক শেষ চেষ্টা করে। বলে, ট্যাঁহা কয়ডা রাধ আনোয়ার ভাই। পানিতে ভিজ্যা গেল।’

আনোয়ার বলে, ‘গাঙের পানিতে ফেলাইয়া দেও। ডুইব্যা মরতে ট্যাঁহা লাগে না।’

আবার ঝুটি নামে। বাতাস আরো জোরে বইতে শুরু করে। অন্ধকার ছোটোছুটি করে বেড়ায় চারদিকে। মাঝে মাঝে আকাশ চমকে ওঠে। কানে তালা-লাগা সেই শব্দটা শোনা যায়। দূরে, অনেক দূরে বাজ পড়ে কোথায়। নদীর দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না। দেখতে পারে না খালেক মুন্সী। বড় বেহারা, নিরলঙ্কার মেয়েমানুষের মতই আজকের নদী। রাগে ফুঁসছে। ও কী চায়, কে জানে! কিন্তু অমন ভয়ংকর রূপ চোখ মেলে দেখা যায় না। সর্বনেশে রূপ! আনোয়ার বুঝি এই রূপ দেখেই ভুলেছে। মরতে-ও ভয় নেই তার।

—‘জান মেঞা ভাই, হেই থিকা পানি আর তুফান দেখলে আমায় পেরাণ্ডা কেমন করে! কী যেন চায় অবুঝ মাইরামাইনুষের লাখান! আমি বুঝি না। শুনছি হেইদিন-ও নাকি তুফান আছিল?’

—‘হয়।’

—‘মেঞা ভাই তুফান দেখলে তোমার পেরাণ্ডা পোড়ায় না বরনী বিবির লেইগ্যা?’ গলাটা বুঝি ধরে আসে আনোয়ারের।

—‘অমুন কইর্যা কও ক্যান? আমি মারি নাই। বিবি তোমার ডুইব্যা মরছে।’

—‘মেঞা ভাই হেই থিকা পাগল হুঁইছে আনোয়ার থা। খালেক মুন্সীয়ে খুঁইজ্যা ফিরছে চেরকাল। আইজ খোদা মিলাইয়া দিচ্ছে। আমি তোমারে ছাড়ুম না।’
দৈববাণীর মত আনোয়ারের কথা শোনে খালেক। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে আজ অনেক দূরে চলে এসেছে তারা। জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে আজ হিসেব-নিকাশে মত্ত। ঘোবনের জয়-পরাজয়ের হিসেবটা বুঝি শেষবারের মত খতিয়ে দেখতে চায় তারা দুজনেই। সভ্য সমাজ এখান থেকে বহু দূরে। অস্পষ্ট স্বপ্নের মত তাদের স্মৃতিতে মাটির পৃথিবীটা একটা সবুজ উপগ্রহ ছাড়া কিছু না।

বৈঠেটা ক্লে দেয় আনোয়ার। নৌকোটা তীর বেগে ছুটে যায় সামনে।

তারপর লাটিমের মতই ঘোরে। এখানে ঘূর্ণি। কাদে পা দিয়েছে তারা দুজনেই আনোয়ারের তাতে হুঃখ নেই। আপশোস নেই। বরং এক অমানুষিক আনন্দে সে যেন মেতে ওঠে। আনোয়ার গলাটা টিপে ধরে খালেকের। খালেক চিংকার করে। সে আর্তনাদ কেউ শোনে না। শুধু পরম উপভোগ্য লাগে আনোয়ারের। আনোয়ার গলাটা ছেড়ে দেয়। খালেক তার কণ্ঠনালীতে কামড় বসিয়েছে। ভয়ংকর নৃশংস মনে হয় আনোয়ারকে। ছুটো চোখ-ই খুবলে আসে খালেকের। বলে, 'মাইয়া মাইনুষের মুখ দেখনি এই চোখ দিয়া?'

বিদ্যুতের আলোয় খালেকের বীভৎস মুখটা শেখবারের মতো দেখা যায়। তারপর কী যেন হয়। সব অন্ধকার। দম-বন্ধ-করা অন্ধকারে তারা নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে দুজনকে। আবার ভালবাসার মতো গভীর আলিঙ্গনে পরস্পরকে কাছে টানে তারা।

ঠিক তখন-ই। জলের সবচেয়ে বৃহৎ হিংস্র সামাজিক জীবটি মাটির অহিংস অসামাজিক জীবটিকে দেখতে ছুটে আসে। আর শেখবারের মতই চমকে ওঠে আকাশ।



আধুনিক

অলঙ্কার



লৈপুণ্যে...

ফোন • ৬৪-৩৮৫২

রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির

প্রখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার

১০১-বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

আধুনিক উপন্যাস-চিত্তা ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী

সমকালীন সাহিত্যের বিচার উচিত কি না এ সম্বন্ধে সুধীজন সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সাহিত্য যদি সমাজের মুকুর হয় তবে সমকালীন সমাজ-প্রতিচ্ছবির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তা কি অধিকতর মনোগ্রাহী, অধিকতর চিন্তনীয় নয়? জীবন ও সমাজে অধিকতর ক্রিরাশীল? এ কথা ঠিক, পূর্ণ পরিপ্রেক্ষণের জন্য কিছুটা দূরত্ব দরকার। কিন্তু নৈকট্য যেমন দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তেমনি আবার ফুটিয়ে তোলে মৌন্দর্ষের সূক্ষ্ম কারুকাজ যা পূর্বে ছিল না। এইমাত্র যোজিত হয়ে পূর্বাগরে আশ্চর্য ব্যবধান সৃষ্টি করল,—দিতে পারে এক উত্তাপের স্পর্শ যা পরবর্তী যুগে জুড়িয়ে গিয়ে পাঠককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করবে না। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী রবীন্দ্রনাথের তরুণ মনে যে ঢেউ তুলেছিল আজকের পাঠক কি তার কণামাত্র উপলব্ধি করেন? সে আবেগ উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা আজ আকাডেমিক তথ্য মাত্র। আধুনিক উপন্যাস পাঠ ও আলোচনা এইজন্তই প্রয়োজন যেজন্ত প্রয়োজন মুকুরের—আত্মসংশোধন ও আত্মপ্রসাধনের দায়িত্ব সকলের।

সম্মুখ উর্মির কথা বলবার আগে একবার যদি পশ্চাতের ঢেউয়ের দিকে তাকাই সেখানে দেখব উপন্যাসের আদিপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে। জীবনের মূল্যবোধগুলি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট—প্রধানতঃ আদর্শ স্থাপনের জন্তই তিনি সেগুলি রচনা করেছেন এবং সেই অনুসারেই রূপ দিয়েছেন চরিত্রগুলিকে যেমন কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম। জীবন থেকে আদর্শে তিনি আসেন নি। আদর্শ থেকে জীবনে তিনি গিয়েছেন। অর্থাৎ অবরোহী পদ্ধতি (Deductive approach)। শরৎচন্দ্রের মধ্যে আরোহী পদ্ধতির (Inductive approach) পরিচয় মেলে। তিনি জীবনকে দেখেছেন আগে তারপর এক নূতন মূল্যবোধে পৌঁছিয়েছেন। ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর মত চরিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেই পেয়েছিলেন জীবনদর্শনের সন্ধান। এজন্ত বোহিণী চরিত্রের পরিণাম নিয়ে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ধ্যানলব্ধ মূল্যবোধ ও প্রকৃত জীবন এক নয়—এক হতে পারে না অভিজ্ঞতার নিকষে শরৎচন্দ্র তা যাচিয়ে দেখেছিলেন। তার থেকেই শুরু হল বাংলা naturalistic

উপন্যাসের ধারা—যার ব্যাপকতর রূপ দেখি তারশঙ্করে। শুধু পড়ন্তু জমিদার বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়—চারী, কবিয়াল, বৈকবী, পুতুলওয়ালা, বেদে, কবিরাজ, সাপুড়ে, ডাক হরকরা প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি ও শ্রেণীর সম্বন্ধে তারশঙ্করের ব্যাপক অভিজ্ঞতা উপন্যাসে কার্যকরী হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী ও আরণ্যক তো naturalistic উপন্যাসের পরাকাষ্ঠা, নিশ্চিতপূরের প্রত্যেকটি গোটুকুল ও লবটুলিয়া বইহারের প্রতিটি শাল শিশুর জীবনী পাই তাতে।

বঙ্কিম ও শরৎ সাহিত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। কালের দিক থেকে মধ্যবর্তী হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি শ্রেণী। শরৎচন্দ্রের চেয়ে জীবনকে তিনি কম দেখেননি (যার প্রমাণ গল্পগুচ্ছ, পলাতকা), বঙ্কিমের চেয়ে কম আদর্শ-বোধ তাঁর ছিল না (যার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র)। জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধির শক্তি ছিল তাঁর সাহজিক (instinctive)। কিন্তু উপন্যাসে তার প্রয়োগ ছিল মননধর্মী। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি—গোরা, ষোঁগাষোঁগ, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে প্রত্যেকটিতেই জীবনকে দেখা হয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোকে। সেইজন্তই সাধারণ পাঠকের কাছে হৃদয়াবেগ-প্রধান শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অধিকতর চিত্তাকর্ষী হয়েছিল। রাজলক্ষী, সাবিত্রী, অভয়া, কমলের উচ্চকিত আত্মঘোষণা এত বেশি তাদের আচ্ছন্ন করে আছে যে দামিনীর মৌল শক্তি বা কুমুদিনীর কাস্তিক সৌকুমার্য, লাবণ্যের সুমিতি-বোধ বা বিমলার স্বপ্নভঙ্গজাত গভীরতর জীবন-বোধ তাঁদের চোখে পড়ে না। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা বিদ্রোহিনী—রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা সমন্বয়-সাধিকা। কিন্তু বিদ্রোহই তো সর্বথা সমস্তার সমাধান নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনা একটি পুরাতন মূল্যবোধের জন্তু যা আর কোন দিন ফিরবে না। শরৎচন্দ্রের বেদনা একটি নূতন মূল্যবোধের বিলম্বিত জন্মের জন্তু। কি অতীত স্বর্ণ যুগ—কি ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্য কোনটির জন্তই রবীন্দ্রনাথের বেদনা নেই। জীবনকে তিনি নিয়েছেন তার ভালো-মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব স্তব্ধই। সমস্তা সম্বন্ধে তাঁর সমাধান হল,—পরিমিতি বোধের উদ্বোধন। তাঁর গোরা, কুমুদিনী, লাবণ্য সবাই জীবনের উত্তালতাকে এই পরিমিতিবোধ দিয়ে বেঁধে সংঘাতের পার পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন যাত্রাই উত্তাল তরঙ্গ তাতে পার হওয়া যায় শান্ত বৈরাগ্যের ভেলা চড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিকের কাজকে minion বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি

পুরাতন ঐতিহ্য রক্ষা কি নূতন সমাজ সংগঠন কোন দায়কেন্দ্র উপন্যাসিকের আবশ্যিক দায় বা minion বলে স্বীকার করেননি।

এঁদের পরবর্তী যুগের উপন্যাসিকরা জীবনকে নানা পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেন। দন্দ যত বাড়লো, জীবন যত জটিল হল ততই জীবনকে বিচিত্র রূপে দেখবার প্রয়াস বৃদ্ধি পেল। শরৎচন্দ্রের উত্তরপুরুষ তারাশঙ্করে যেমন রয়েছে পুরাতন ও নূতন মূল্যবোধের সংঘাত বর্ণনা ও সামঞ্জস্য চেষ্টা। প্রাচীন ও নবীন উভয়ের মধ্যেই ভালো আছে—তারাশঙ্করের মূল বক্তব্য হল এই। গান্ধীজীর গণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে তিনি দেখলেন বিস্তৃত ভাবে, তেমনি গভীর ভাবে তলিয়ে গিয়ে এ যুগের জীবনকে দেখলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর যদি বাংলা সাহিত্যকে space দিয়ে থাকেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন depth। যখন চৈতন্য থেকে জাগর চৈতন্যে—মনঃসমীক্ষা থেকে সাম্যবাদে—এ যুগের আবিষ্কৃত সব কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে তিনি দেখলেন, ভেঙেচুরে প্রায় পিকাসোর মত ডস্টয়েভ্‌স্কির মত মানুষের রূপের বিভিন্ন তল ফুটে উঠলো তাঁর উপন্যাসে—বলাবাহুল্য তাদের বিশ্বয়কর কিছুটা ভীতিকর বৈপরীত্য নিয়ে। মৃত্যুর থেকে জন্মের দিকে যাবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মূল কথা।

শরৎচন্দ্রের মতই তাঁরও বেদনা ছিল এক নূতন মূল্যবোধের বিলম্বিত জন্মের জন্ত যদিও উভয়ের মূল্যবোধে গভীর পার্থক্য। আর শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববাদীদের মত হয়তো তাঁর কাছে সবই নগ্নার্থক মনে হয়েছিল—বিকৃত পরিবেশে সবই বিকৃত হতে বাধ্য এমনি নগ্নার্থক প্রতীতি।

নূতন মূল্যবোধের জন্ত কঠিন চিন্তন অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসেরও মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের মননধর্মী উপন্যাস তাঁকে শরৎচন্দ্রের আবেগধর্মী উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর প্রেরণা জুগিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। যদিচ একদা জাগর মনে শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন তাঁকে অভিভূত করেছিল কিন্তু নিশ্চয় তিনি জেনেছিলেন শেষ প্রশ্নের গোমুখী ছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি যে ঋণগ্রহণ করেছেন তা হল বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষ সম্বন্ধের সমস্তা। বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়, বিবাহোত্তর বিপ্রলভ, পরকীয়া প্রেম—এ সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের জিজ্ঞাসা তাঁর সব উপন্যাসেই ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের নানা মতবাদ, মার্কস-পন্থা—ভারতবর্ষের সত্য ও ইউরোপের সত্য সম্বন্ধে নানা অন্বেষণ তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। সত্যাসত্যের

সুখী যেমন ভারতবর্ষের সত্য, বাদল তেমনি ইওরোপের সত্য আর উজ্জয়িনী এদের মধ্যে দোলাচল চিত্তবৃত্তি। এ যেন ঘরে বাইরে সমস্তার নূতন চিত্রণ। সেখানেও বিমল ভারতপন্থী নিখিলেশ ও ইওরোপপন্থী সন্দীপের মধ্যে এমনি দোলায়িত। শুধু পার্থক্য এই যে, বাদল ইওরোপের অপরাজিত বুদ্ধির প্রতীক, সন্দীপ ইওরোপের অপরিমেয় প্রাণশক্তির। আর অনিবার্যভাবে আধুনিক মানুষ ইওরোপের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

উত্তর চম্পিশের উপন্যাসের পটভূমি ছিল সমসাময়িক ইতিহাস—হুভিস্ক, দাঙ্গা, দেশবিভাগের মধ্যে যার ট্রাজেডি রূপায়িত। মানুষ সেখানে গোঁণ—অন্ধ ইতিহাসের ক্রীড়নক বা হাতিয়ার মাত্র। লৌকিক ভাবের অলৌকিক রসস্বে আরোহণ সেখানে কচিৎ ঘটেছে। অধিকাংশই পড়ার পর মনে হয় সাংবাদিক বিবরণীর মত—থিওডোর ড্রিজার বা আপটন সিনক্লেয়ারের মত। স্রব্ধের বিষয় উত্তর-পকাশে পুনরায় মানুষের কথা শুরু হয়েছে। সহসা ভাবতে গেলে এই পর্বের যে কয়জন ঔপন্যাসিককে সংপাঠক মাত্রেরই মনে পড়বে তাঁরা হলেন—অমিয়ভূষণ মজুমদার, দীপক চৌধুরী, সমরেশ বসু ও বিমল মিত্র। (তাই বলে যে আর কোন ভালো ঔপন্যাসিক এ যুগে নেই তা নয়। কিন্তু আলোচনা সব সময়েই সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।)

এই চারজন ঔপন্যাসিকের বিভিন্ন গ্রন্থ সমকালীন উপন্যাস জগতে আলোড়ন এনেছে সন্দেহ নেই। নীল ভূঁইয়া ও গড় শ্রীখণ্ড, পাতালে এক ঋতু ও এই গ্রন্থের ক্রন্দন, গঙ্গা, সাহেব বিবি গোলাম ইত্যাদি হল মোটামুটি এঁদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মনে হয় কিছুই শিল্প সৃষ্টির জগতে তুচ্ছ নয়। আলেক, রামচন্দ্র, নয়নতারা, সুরতুন, জয়া বসু, বেলারানী, ভবতোষ, সনাতন, হিমি, তেঁতলে বিলস, পটেশ্বরী, এদের প্রত্যেকের পরিচয় জানবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমুদ্রের পৃথিবী আপাত-অপরিবর্তিত থেকেও কি অত্যন্ত বদলে গেল না! অবশ্য এ পরিবর্তনের অর্থ জীবনবোধ আরো গভীরতর হল কিংবা যে সব বিশৃঙ্খলার অর্থ এতদিন আমরা বুঝে উঠতে পারিনি তারি অন্তরালের স্রষ্টাটি খুঁজে পাওয়া গেল।

উপন্যাসের এই নূতন বস্তু দেখি গঠনশিল্প অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায়, মননশক্তির সচেতন ব্যবহারে, ভাষার পারিপাট্যে এঁরা প্রবীণ লেখকদের থেকে অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই অতি সচেতনতা ও প্রকরণের উপর জোর দেওয়া বলা বাহুল্য আধুনিক কবিতার মত আধুনিক

উপন্যাসেরও প্রধান লক্ষণ। যেমন এই গ্রন্থের ক্রন্দনে দীপক চৌধুরী সমগ্র উপন্যাসটি লিখেছেন মাত্র চোদ্দটি চিঠির মাধ্যমে কিংবা শব্দবিবে নয়টি খণ্ডে flash back-এর প্রকরণে অথবা সমরেশ বসুর অধ্যায় বা ধণ্ডুহীন গঙ্গা নদীর প্রবাহের মতই অচ্ছেদ্য। এঁদের ভাবা কখনো আধুনিক কবিতার মত জটিল কখনো বা গানের মত সুরেলা হয়ে উঠেছে। যেমন,—

(১) কিন্তু জমি জমিই। বিশেষ করে জোয়ার জমি। এক সঙ্গে তিন চাব। আউস, আমন, কলাই। আউস তোলা, নাযুক ঢল। জল পড়বি, আমন বাড়বি। এক হাত বাড়ে জল, সোয়া হাত আমন। কাটো সোনার আমন। জল কমবি, জল শুকায়ে যাবি। একাবারে শুকানোর আগে ছলছলায় কাদায় ছিটাও কলাই। (গড় শ্রীখণ্ড পৃ: ২৬৯)।

(২) বুধে ডাঙ্গার যে জমিগুলিতে কাল চাষ দেওয়ার কথা সেগুলিকে ভুলে গিয়ে আবার জোয়ার কথাই চিন্তা করতে লাগলো সে। মানুষের দুখানা হাত একত্র করে ষাচঞার ভঙ্গি করলে যেমন দেখায় অঞ্জলিটা, তেমনি যেন জোয়ার চেহারা। কালো রঙের মাটি, যেন কালো রঙের একজন চাষী অঞ্জলি পেতে আছে। সেই অঞ্জলি ভ'রে উঠবে ধানে, জলে, কলাইয়ে। আলেফ খুশি-খুশি মুখে ঘুমিয়ে পড়লো। (গড় শ্রীখণ্ড পৃ: ২৮২)

(৩) হঠাৎ চোখের সামনে মধ্যপ্রাচ্যের একটা চিত্র ভেসে উঠল। বধ্যভূমির চিত্র। প্রায় দু-হাজার বছরের পুরনো একটা পেরেক লম্বা হয়ে এগিয়েও এল জয়া বসুর বুক পর্যন্ত। তাঁর পাচা ফুসফুসে বিঁধে গেল পেরেকের মুখ। (এই গ্রন্থের ক্রন্দন পৃ: ৩৮৭)

(৪) তুমি মারো মাছ. তোমাকে মারেন আর-একজন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গুণটা ব্যতিক্রম তবে, মাছ মারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্তরকম হয়। ঈশ্বর সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সূতো গাঁথা হয়। বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদেন কালে একবার রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার। (গঙ্গা পৃ: ৩২)

আধুনিক প্রকরণের আর একটি দিক লক্ষণীয়, যে-জীবন লেখকেরা বর্ণনা করেছেন তাদের ভাবনা, চিন্তা, আকৃতি, প্রকৃতি সব কিছুর মধ্যেই সেই ভাবটি ওতপ্রোত করে মিশিয়ে দিয়েছেন। আবহ সঙ্গীতের মত এই উপমাগুলি

এক আশ্চর্য গাঢ়তার সৃষ্টি করেছে। যেমন সমরেশ বসু হিমিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার নদী, সমুদ্র, মাছের উপমা দিয়েছেন।

“একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণ সমুদ্রের মতো। তার ওপরে জড়ানো সাদা রঙের ফুল। যেন সোনার মতো সোনার খড়কে মাছ ছিটিয়ে দিয়েছে। * * * গড়নে পিটনে একটু ছেউট ছেউট। অর্থাৎ শরীরখানি অকূল হয়নি, কুলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে।” (গঙ্গা পৃ: ১৪৭)

তেমনি দেখি দীপক চৌধুরীর সৃষ্ট সঙ্গীতসাধক জগবন্ধুবাবুর সন্তান জন্মের কল্পনা তাঁর কাছে রাগরূপেই ফুটে উঠেছে।

“মেঘমল্লারের সূচনা, জগবন্ধুবাবু যেন দেখতে পেলেন গাঢ়তম মেঘের গভীরতম ভ্রণাচ্ছাদনে।” (শঙ্খবিষ পৃ: ৪২)

ব্রাত্য সান্দারের মেয়ে সুরতুনের আহার অনাহারের বর্ণনাও অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে ধানের রূপের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

ধান যখন নতুন বউ-এর মতো পাত্রে অপাত্রে অকাতরে সলজ্জ হাসি বিলোচ্ছে তখন আহার করা, এবং ধানের দিন স’রে যেতে-যেতেই উপোস শুরু করার অভ্যাস ছিল তার। (গড় শ্রীখণ্ড পৃ: ৯)

আর সুরতুনের রোদে পোড়া ফসাঁ রঙ তাঁর কাছে মনে হয়েছে—“ধবধবে সাদা নয়, বরং রোদে পুড়ে পুড়ে পাকা খড়ের মতো রঙ। (পৃ: ২৩৭)

চরিত্র সৃষ্টিতেও নূতন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিচারক বা বন্ধু কিছুই হন না। বন্ধিমচন্দ্র যেমন অনায়াসে পাপীয়সী বলে শৈবলিনীকে অভিহিত করেছেন তেমন অনায়াসে পটেশ্বরী বা বেলারানীকে পাপীয়সী বলতে পারা যায়নি। অথবা শরৎচন্দ্র যেমন দেবদাসের অস্ত্রে শোকাশ্রু বিসর্জন করেছেন, জয়া বসুর অস্ত্রিমে, হিমি বিলাসের বিচ্ছেদে বা মাধাই বায়েনের মৃত্যুতে তেমন কোন মন্তব্য লেখকেরা করেননি। সেদিক থেকে আধুনিক ঔপন্যাসিক অনেক বেশি objective—তাঁরা বরং দেখিয়ে গেছেন কি পরিস্থিতিতে এই চরিত্রগুলি প্রথাগত মূল্যবোধ থেকে চ্যুত হয়েছে। মন্তব্য করার ভার তাঁরা পাঠকদের জন্ত রেখেছেন। Leon Edel এইজন্মই বলেছেন “this kind of novel seemed to turn the reader into an author: it was he, ultimately, who put the story together.”

ফলতঃ, আধুনিক উপন্যাসিকেরা ক্রমশঃ নাট্যকারের মত নিরুপেক্ষ দর্শক হয়ে যাচ্ছেন। এতে উপন্যাস শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই কি? লেখকের নিরুপেক্ষতা উপন্যাসের বিস্তারকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করে কেলছে নাকি? বিরাট জীবনদর্শনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করে তাঁরা স্বল্প কয়েকটি চরিত্রের গভীরতর বিশ্লেষণ করছেন (অমিরভূষণ ব্যতীত)।

দীপক চৌধুরী আবার তাঁর চরিত্রগুলিকে প্রতীকের ধর্ম দান করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলির আয়তন আরো সংকুচিত হয়েছে যদিচ সংহতিগুণ বেড়ে গেছে। যেমন ধরা যাক 'এই গ্রহের ক্রন্দন' গ্রন্থটি। বলা বাহুল্য আধুনিক উপন্যাস জগতে এ গ্রন্থটি এক হিসেবে সার্থকতম। যুগরূপের যথার্থ চিত্রায়ণে, প্রকরণের ঘনত্বে, জীবনবোধের অভিনবত্বে উপন্যাসটি ধনী। প্রতীকতা, ও অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন বাংলা উপন্যাসে তিনিই সচেতনভাবে প্রথম প্রয়োগ করলেন এ কথা মনে রাখতে হবে। কিন্তু গ্রন্থটির নাম শোনামাত্র যে ব্যাপ্তির কল্পনা জাগে গ্রন্থের মধ্যে তার আভাস নেই। পরিবর্তে দেখা যায় একটি গ্রহের নয়, একটি গৃহের ক্রন্দন প্রতীকের বলে এ যুগকে প্রকাশ করতে চাইছে। কিন্তু ভৌগলিক দিক থেকে কলকাতা থেকে কলকাতা আভাসে প্যারিস লণ্ডন, সামাজিক দিক থেকে প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দর্শনের দিক থেকে Existentialism, জয়া বসু কি এই বিস্তার নিয়ে আধুনিক জীবনের নিরন্তর নিরুপায়তার যোগ্য প্রতীক হতে পেরেছে? কিংবা ধরা যাক সমরেশ বসুর গঙ্গা। যে গঙ্গা সারা উত্তরভারতের প্রাণবাহিনী ছোট একটু ভৌগলিক সীমায় তার রূপ কতটা সার্থক হয়? পদ্মা নদীর মাঝির কপিলার সাহসও নেই এর নায়িকা হিমির মধ্যে। যদিচ দীপক চৌধুরীর রচনার বলিষ্ঠ সত্যসন্ধান ও সমরেশ বসুর রচনার লিরিক-সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না—তবু তাঁদের এই স্বেচ্ছারোপিত সঙ্কোচন আমাদের ভীত করে। ঘনবদ্ধতা হয়তো আধুনিক মননধর্মের আঙ্গিক, অতি ছাঁটাই হয়তো এক নূতনতর উপন্যাস রচনার দিক খুলে দিচ্ছে কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—সত্যিই কি? উপন্যাসের কারবার তো কবিতার মত শুধু একটি মাত্র মুড বা মেজাজ নিয়ে নয়। বটগাছকে জাপানী প্রথায় বামন করে রেখে অত্যাশ্চর্যের সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু স্বাভাবিকতা সেখানে বজায় থাকে কি? কাফ্‌কার মত একেবারে প্রতীকধর্মী উপন্যাসে হয়তো তা সম্ভব, টমাস মান ও আধুনিক জীবনের চিত্র আঁকতে ম্যাজিক মাউন্টেনে বিরাট পরিসর নিয়েছিলেন। তবু এই গ্রন্থদ্বয়কে প্রশংসা করতেই

হয়—অস্তিত্ববাদী, দর্শন আর ফ্রেডেরীয় মনস্তত্ত্ব তথা আদিম বস্তু হিংস্রতাপূর্ণ ভিনদেশী এক আবহাওয়া অবিরত আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জন তোলে। বিশেষ করে দীপক চৌধুরীর অতি ধীমান, আশ্চর্য সংবেদনশীল রচনা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এ যুগের একটি অন্যতম প্রধান সত্য সাহিত্য কেবল জীবন থেকেই উৎসারিত হয় না—সাহিত্যের উৎসারণ সাহিত্য পাঠেও সম্ভব। যেমন এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের অন্তর্গত কাহিনীটি ফিলিপ টয়েনবির Tea with Mrs. Goodman উপন্যাসে কল্পিত মত প্রচ্ছন্ন ভেতনি পাতালে এক স্বতন্ত্র অন্তরে আছে নাকি রংগাবোর নরকে এক স্বতন্ত্র ছায়া বা অরওয়েলের একাধিক উপন্যাসের, কেসলারের আত্মজীবনী-বৃত্তান্ত? এই গ্রন্থের ক্রন্দনে জয়া বসুর পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ওয়েস্টল্যান্ডের হারানো পিতার অনুসন্ধানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ শিকড়ের জন্ত আধুনিক মানুষের আকুলতা। কখনো সে শিকড় খুঁজছে ধর্মে, কখনো প্রেমে, কখনও সাম্যবাদে। আর একটি একটি করে ফাঁকি ধরা পড়েছে। যদিও গ্রন্থ শেষে (এই গ্রন্থের ক্রন্দন বা শব্দবিষ) দেখি সব মানুষই সবার সঙ্গে যোগদানে বিধৃত তথাপি সবাই একক। এই নিঃসীম নিঃসঙ্গতাই অস্তিত্ববাদীর শেষ জীবনদর্শন। সাত্ত্বের জীবন চেতনাও তো এই। দীপক চৌধুরী মননশীল বলেই যে তাঁর রচনায় পঠন পাঠনের প্রভাব পড়েছে তা নয়, সমরেশ বসুর মত naturalist-এর রচনাতেও উপকথার টুকরো, তারাকঙ্করের রসান উঁকি মারে; বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের পরতে পরতে পাই জোড়াসাঁকোর ধারে, ঘরোয়া, জীবন-স্মৃতি, ছেলেবেলা, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের দেহহীন সৌরভ। তবে এঁদের মধ্যে দীপক চৌধুরীর প্রয়োগও মনমধর্মী, সেদিক থেকে আধুনিকতার লক্ষণ তাঁর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট। উইলিয়ম জেমস যাকে বলেছেন—Stream of consciousness অর্থাৎ মানসিক চিন্তার প্রবাহ যা সর্বদা বহমান তথা সর্বদা পরিবর্তনশীল তার গভীরতর পরিচয় দীপক চৌধুরীর রচনাতে লক্ষণীয়। তাঁর কাছে শুধু বক্তব্য যুগজিজ্ঞাসার তর্কে বিতর্কে তাঁর চরিত্রগুলি কিছুটা অনড় স্বদোষ লাভ করছে। হয়তো বক্তব্যযুগে সবই বক্তব্য—হয়তো মানুষের চারদিকে দেয়াল বলে মানুষও দেয়ালের মত অনড় হয়ে যাচ্ছে তবুও তো পঙ্খ পাখা ব্যস্ত হয়! দ্বিতীয়তঃ তাঁর উপন্যাসে ঠাকুর নামীনাথ থেকে অধ্যাপিকা জয়া বসু পর্যন্ত একই বক্তোক্তিতে কথা বলে এটা কিছু অস্বাভাবিক, শব্দবিষের মাধব পিয়ন ও তার বড় সাহেবের কথোপকথনের কৃত্রিমতাও লক্ষ্য করবার।

সমরেশ বসুর জীবন-বোধ অবশ্য সরলতম। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে একটি গল্প তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন। একটি শ্রেণীর সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ধর্মের কথা তিনি জানিয়েছেন অল্প শ্রেণীর মানুষকে। সেদিক থেকে তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের naturalist ধারার তিনি অন্ততম উত্তরসূরী। তাঁর লেখাকে যে একদল সমালোচক কেবল রূপকথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন সে কথা ঠিক নয়, তাছাড়া রূপকথারও তো জীবনে প্রয়োজন আছে। আমাদের মগ্ন শৈশব চৈতন্যে তার যা প্রভাব তা তো কম নয়। দ্বিতীয়তঃ, লোকজীবনের পরিচয় দিতে গেলে লোকসাহিত্যের প্রকরণ গ্রহণে অত্যাঁ কোথায়? তবে তাঁর সম্বন্ধেও বস্তব্য উপন্যাসের পরিসর আরো একটু বিস্তৃত করলে ভালো হয়। বর্ণনার decoration যদি কিছুটা কমাতে পারেন তাহলে তাঁর রচনা আরো শিল্পোত্তীর্ণ হবে। না হলে বারোক (Baroque) দোষ আসতে পারে। মনে হয় চরিত্র কম থাকলেই বর্ণনার আতিশয্য বেড়ে যায়। তার কারণ উপন্যাসের একটা দৈর্ঘ্য চাইই।

বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামে অবশ্য পরিসর বৃহত্তর। হিন্দু সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, সত্বাসবাদী, রামকৃষ্ণপন্থী, নূতন ক্যাপিটালিস্ট, পড়ন্ত ফিউডাল, চাকর, সরকার, মোসাহেব, গোমস্তা, ঝি, নটী, অভিজাত বধূ, শিক্ষিতা, কুমারী, একের পর এক সারি বেঁধে এসেছে। উত্তর চল্লিশের পর এই প্রথম সার্থক এপিক উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের পর। কিন্তু সুখপাঠ্য হলেও সাহেব বিবি গোলাম কোন নূতন বস্তু রচনা করেছে কি? বরং মনে হয় নাকি পুরাতন ঐতিহ্যেরই প্রীতিপ্রদ অনুবর্তন? তার একটি প্রধান কারণ লেখকের জীবন-বোধ খুব গভীর নয়। যদিচ রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের রচনাবলী এর পটভূমিকাকে গভীরতা দিয়েছে—তার উপকরণ গুলিও লেখক সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু আত্মসাৎ করতে পারেননি। উৎস-গ্রন্থগুলি যাদের পড়া আছে তাঁরা এক নজরেই উপলব্ধি করবেন সেই স্বাদ, সেই ভ্রাণ। তবু বলব পটেশ্বরী চরিত্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ এবং এই পটেশ্বরী চরিত্রই সমগ্র উপন্যাসটিকে প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছে,—নিয়ে চলেছে এক যুগের অতলাস্তিক কান্না আরেক যুগের হৃদয় তটাভিযুখে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে বিমল মিত্র কি শুধু পটেশ্বরী চরিত্রের জন্যই অমর হবেন? তাঁর সাহেব বৌদি, নফর সংকীর্তন কিন্তু সে ইঙ্গিত দিচ্ছে না। সাহেব বিবি গোলামে তিনি অন্ততঃ documentগুলি ব্যবহার করেছিলেন, সেটুকুও না

ধাকলে বিকৃত করনা দিয়ে naturalist উপন্যাসিকও হওয়া যায় না। তাঁর ধর্ম মননধর্ম নয়—তাঁর জীবন-বোধ শুধু বাংলা দেশের শহরে জীবনেই কেন্দ্রীভূত। অতএব তাঁর উচিত হবে ‘সাহেব’ বা ‘গোলাম’ নামের মোহ ছেড়ে দিয়ে ঊনবিংশ শতকের বিচিত্র জীবনকে রূপায়িত করা। সে যুগের কোন কল্পিত মহিলা সাহিত্যিকের জীবনী কেন তিনি লিখছেন না? তাঁদের জীবনের বন্দ—শিক্ষা ও সংসার, স্বামী ও সাহিত্য, সন্তান ও কবিতা সৃষ্টির দুস্তর বেদনা!

এ যুগের কাগাকে এপিক উপন্যাসেই রূপ দিতে পেরেছেন একমাত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর গড় শ্রীখণ্ডে। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের যোগ্য উত্তরপুরুষ তিনি। যে বিস্তৃত পরিসর—যে গভীর জীবন-বোধ যে আত্মসংযম যে বীক্ষণের মমতা ধাকলে একটি উপন্যাস মহৎ পদবাচ্য হয় গড় শ্রীখণ্ড তার উজ্জল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দেশ-বিভাগের প্রাকালে রাজসাহী অঞ্চলের কাহিনী এ গ্রন্থের উপজীব্য। সেদিক থেকে এর পটভূমিকা উপরে আলোচিত সব কয়টি উপন্যাস থেকে বৃহত্তর—এর বেদনা আরো ব্যাপক আরো মর্মভেদী। একটি সমগ্র দেশ তার জমিদার প্রজা, হিন্দু মুসলমান, শ্রীপুরুষ, নদী নালা খাল বিল, জমিজিরেত সব কিছুর নিয়ে শেকড় ভেঁড়ার বেদনায় গুলট পালট খাচ্ছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার গভীর অখচ সংযত দৃষ্টি দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। সুরভূয়েসা, ফুলটুসি, রামচন্দ্র মণ্ডল, সান্তালমশাই, অননুয়া, আলেক, এরফান, মাধাই বায়েন এরা যেমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তেমনি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে চিকন্দি থেকে সানিকদিয়া বাবার সড়ক, বুধেডান্দা, চরণকাশি প্রভৃতি গ্রাম, পদ্মার সর্বনাশা বন্যা, উপরে ড ড ড করে ঝলসে যাওয়া বিদ্যুৎ—যে পৌরাণিক কণ্ঠে বলে—দয়া করো, দয়া করো। সেই বিদ্যুতে আবার জ্বলন্ত হয়ে ওঠে চালের চোরা কারবার, চামড়াব্যবসায়ী ককিলুন্দির জন্তু মাধাইয়ের গোকুলে বিষ দেওয়া, আধুনিক স্মৃতির আইনের বিয়ে, ধান লুকিয়ে ফেলা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চাষীদের রোষ আর সেই দেশ-বিভাগের বেদনাবহ বৃত্তান্ত। অতি সংসারী অখচ অতি সরল মানুষের জীবন নেংড়ানো প্রশ্ন “দেশ নাকি ভাগ হতেছে?” আবার পাঁচ বিঘা থেকে পুনর্জীবনের শুরু। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, ঘৃণা, অমানুষিকতা, স্বার্থ, লোভ, হতাশা, শিল্পরচনা, করুণা আত্মত্যাগে পূর্ণ মানুষ আর একবার জীবনের নগ্ন রূপকে প্রত্যক্ষ করল এযুগেও—এ কালেও—এই আত্মঘাতী অতি সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেও। এপিকের কারবার যদি হয়

Heroic subject নিয়ে, অমিয়ভূষণ সেদিক থেকে এযুগের চরম বীরদের বিবরণ বেছে নিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। এপিক রচয়িতাকে যদি তাঁর নিজের অথবা কাছাকাছি কালের একটি সমগ্র যুগ ও জীবন জিজ্ঞাসাকে রূপ দিতে হয় তাতেও তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই Choric quality বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসকে মহিমা দিয়েছে। Lascellas Abercrombieর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেছেন এপিক রচয়িতার লেখা হবে—“accepting, and with his genius transfiguring, the general circumstance of his time……Symbolizing, in some appropriate form, whatever sense of the significance of life he feels acting as the accepted unconscious metaphysic of the time.”—অমিয়ভূষণের গড় ক্রীড়েও সব কয়টি লক্ষণই আছে। বলা বাহুল্য এই জন্মই এপিক ও ট্রাজেডি পৃথক। ট্রাজেডিতে যুগের প্রভাব থাকলেও তার প্রধান প্রবণতা হল চিরন্তন মানব প্রকৃতির রূপায়ণ। মানুষের মৌল সত্তাকে প্রকাশ করাই তার লক্ষ্য। তৎকালীন যুগপ্রকৃতির রূপ অনুধাবন সেখানে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। একটি বিশেষ যুগের বাঁচবার সমস্যা ও দায়িত্ব ঠিক ট্রাজেডির উপকরণ নয়, চিরকালের মানুষের সমস্যাই তার প্রধান কারবার। অবশ্য চিরন্তনের রূপায়ণ এপিকেরও অন্যতম লক্ষণ যেমন Choric quality ট্রাজেডিরও সহায়ক। আসল কথা হল ট্রাজেডির বেদনার সাক্ষ্যতা যখন একটি মানব মন বা একটি বংশকে অতিক্রম করে একটি যুগের একটি সমগ্র জাতির মিলিত মনে দেখা দেয় তখন এপিকের উদ্ভব। সংকীর্ণ গভীরতা পায় বিস্তৃত পরিসর, চিরন্তনতা পায় বৈচিত্র্যের সায়ুজ্য। সে হিসেবে গড়ক্রীড়ার Choric quality প্রশংসার যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বহু মানবের কথা এপিক লেখককে বলতে হয় বলে তাঁকে প্রায় প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। তাঁ শুধু সম্ভব প্রচুর তথ্যের সংযত ব্যবহারে। এছাড়া তাঁকে বিচিত্র ভাবাবেগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হয় অর্থাৎ জীবনের সাধারণ ইন্দ্রিয়পরতা থেকে সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা পর্যন্ত। অথচ জীবনের স্বাভাবিক রূপায়ণও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে চলবে না যদিচ বিচিত্র জীবনকে তিনি দেখাবেন পাশাপাশি। যেমন সহজের পাশে বক্রতা, ঔদার্যের পাশে স্বার্থপরতা। অমিয়ভূষণের রচনায় এ লক্ষণগুলি প্রকট। তাঁর আলেখ্যকে যখন দেখি জোনার জমির মাটির গন্ধ ডলে ডলে শুঁকতে (পৃ: ২৭০) অথবা ধান ঝাড়ানোর ধুলোর পূর্ণ বাতাসকে প্রাণভরে নিতে (পৃ: ২৭৪) অথবা রামচন্দ্রকে যে মাটির বৃত্ত

দেখে, হাতের চেটোয় মাটির ডেলা গুঁড়ো করে জিহ্বার স্বাদ নিয়ে জমির প্রকৃত মূল্য বলে দিতে পারে (পৃ: ১০৫ গড় শ্রীধর)—তখন আমরা বাঙালী চাষী সম্ভার একটি নিবিড় পরিচয় পাই। কসাই ইসমাইলের ঘরনী ফুলটুসির নিরুপায় আত্মসমর্পণে বাঙালী মেয়েদের নীরব সহনশীলতা তথা সামাজিক হৃদয়হীনতা প্রসূত নির্বোধতা জোরালো রঙে ফুটে উঠেছে। ধানক্ষেতের চাষী থেকে স্টেশন বাজারের শহরে আঁচ লাগা দোকানী, বারনারী, পয়েন্টসম্যান তাঁর রচনায় হয়ে উঠেছে রক্তমাংসের সজীব মানুষ। তাদের দুঃখ, দৈন্ত, রোগ, প্রাণশক্তি, হুলতা, মূঢ়তা, অরক্ষা, ঘোঁনভুকা, কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু যখন তিনি সমাজের আর এক পাল্লার লোকদের কথা বলেছেন যেমন জমিদার সান্তাল মশাই ও তাঁর পরিবার তখন কেমন বিবর্ণ ও অস্বাভাবিক চিত্রণ হয়েছে। তার কারণ বোধহয় উপন্যাসটিতে সংহতির স্বল্পতা। দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ দৃঢ় রেখেও জীবন-বোধের গভীরতা তাঁর আছে বলে তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্ন যে উপন্যাসকে কি আরো একটু দৃঢ়বদ্ধ করা যায় না? সংঘম, মনন, আবেগ, ভাষা—কোনটিকে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে অবহেলা করেননি। শুধু অন্তর্বাণী ফল্গু শ্রোতের মত একটি সংহতি ধারা থাকলে ঘটনাগুলি এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো না। উপন্যাসের অন্ততম প্রয়োজনীয় চরিত্র সান্তাল মশাই ও তাঁর পরিবারকে অসংলগ্ন মনে হত না। জমির সঙ্গে জমিদারের যোগ ও ওতপ্রোত এবং দেশ-বিভাগের পটভূমিকায় তার প্রতিক্রিয়াও তুচ্ছ নয়। যে সহানুভূতির সঙ্গে আলোক, রামচন্দ্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা বিরল। কিন্তু সান্তালমশাই চরিত্র চিত্রণের বর্ণহীনতার জন্য সমগ্র ঐতিহাসিক অভিঘাতটি কি দুর্বল হয়ে পড়ল না?

এতৎসঙ্গেও বলব অমিয়ভূষণ মজুমদারের মধ্যেই একমাত্র প্রকৃত ঔপন্যাসিক হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অপরদের মত জীবনকে ঋণ্ডিত করে তিনি দেখেননি—অথবা বিশেষ একটি দৃষ্টিবিন্দু প্রসূত ছকে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন সমগ্রভাবে—তার সুখ ও বিষ উভয়েরই উত্থানে—তার অবিচ্ছেদ্য প্রবাহমানতায়—চরাচর ও মানবপ্রকৃতির দুর্বলতায় ও প্রাণ-প্রাবল্যে—‘To feel it steadily and see it whole!’—

হতে পারেন। এই স্বাধীন-স্বাচ্ছন্দ্য উপন্যাসের বা গল্পের কাঠামো নির্মাণে, চরিত্র সৃজনে, ভাষাবয়নে এবং জীবন ব্যাখ্যায় সর্বত্রই অনুভূত হয়। বস্তুতঃ, লেখকের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ধ্যান-ধারণা বা লেখকের মনোভঙ্গির উপরেই সার্থক উপন্যাসের রস পরিণাম নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, লেখকের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা বা মনোভঙ্গি এবং লেখকের ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে এক বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের পক্ষে এক গভীরতর প্রশ্ন। লেখকের দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটা অপেক্ষাকৃত বাইরের প্রশ্ন। সে কারণে দুজন মার্কসবাদী লেখকের দৃষ্টিকোণের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজনের মনোভঙ্গির মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। হাওয়ার্ড ফাস্ট এবং এরেনবুর্গ উভয়েই একই রাজনৈতিক দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং উভয়েরই উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনাস্থিত হলেও উভয়ের রচনার প্রসাদ যে ভিন্ন তার মূলে দুই লেখকের মনোভঙ্গির পার্থক্য। একজন যে ব্যক্তিকে ইতিহাসের পটে স্থাপন করে তাকে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী এবং একজন যে ইতিহাসকে ব্যক্তির জীবন-বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত করায় সচেष्ट এখানেও দুই লেখকের নিজস্ব মনোভঙ্গিই সক্রিয়। লেখক যে জীবনকে দেখেছেন সেটা অবশ্যই তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয়ে থাকে এবং সেই জীবনরস সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির কথাই ঘোষণা করে। সে কারণেই হেনরি জেম্সের সুবিখ্যাত বক্তব্যটি আমরা স্মরণে রাখি যে No good novel will ever proceed from a superficial mind। তাই উপন্যাসের শিল্পকর্মের বিচারে লেখকের মানসবিচারই হয়ে থাকে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমাদের মানিকবাবুর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বা attitude-এর কথা সর্বাগ্রে আলোচ্য। মানিকবাবু ফ্রেড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনটার জন্তেই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে মানিকবাবু জীবন থেকে কী “নির্বাচন” করেছেন, কোন্ বক্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন—সুদূর কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি কী। একজন লেখকের শিল্পগত এই মনোভঙ্গি বিচারের কালে আমাদের করণীয় কী এ সম্বন্ধে রসজ্ঞ পণ্ডিতদের সূত্রও এই প্রশ্নেই স্মরণীয়। কোন শিল্পকর্ম বিচারে বিশেষ উপন্যাস বিচারে আমাদের বিবেচ্য এবং আলোচ্য তিনটি বিষয়—প্রথম, লেখক কী পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, দ্বিতীয়, কী তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কী তিনি বর্জন করেছেন,

তৃতীয়, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন নৈতিক বোধে বিশিষ্ট। যেকোনও লেখকের সাহিত্য-কীর্তি আলোচনা করতে গেলে উক্ত সূত্র তিনটির আলোকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা রকম ভাবে জীবনকে দেখা যায় বলেই সত্যের কমিউনিষ্ট হলেও গোকি হবেন না। তারাক্ষর মনস্তত্ত্ব লিখলেও তারাক্ষরই থাকেন। সে কারণেই মানিকবাবুর সঙ্গে তারাক্ষরের তুলনা অনর্থক। সে কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে যদি দেখা যায় যে, মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন—এ কথাই উল্লেখও হল না তখন সে আলোচনাও অপূর্ণ।

তিন

মানিকবাবুর উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটে মোটা দাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে পড়ে পুতুল নাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝি আর একভাগে পড়ে চতুষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য প্রভৃতি। যদিও এই তিন ভাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি—জীবনকে গ্রহণের পদ্ধতি—প্রথমাবধি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিকবাবুর শক্তি এবং তাঁর দোর্বল্যের উৎস এই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। অবশ্যই কোন লেখক তাঁর attitude towards life-কে পরিহার করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় নিজ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণাকে যদি কেউ পরিবর্তিত করে নিতে চান তাহলে তাঁর অবস্থা হয় শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের মত। সুবোধবাবুর শিল্পজীবনের মধ্য পর্যায়ে গান্ধীবাদে পৌঁছনোর আমার কোন ক্ষোভ ছিল না যদি সুবোধবাবুর নবলব্ধ বিশ্বাস তাঁর শিল্পীজীবনে কঁাকির সৃষ্টি না করত। গান্ধীবাদকে গ্রহণ করার পর সুবোধবাবুর যথার্থ শিল্পীহৃদয় যেটা আবিষ্কার করল সেটা হল ‘অসাম্প্রিক’ ‘গোত্রান্তর’ এবং ‘ফসিল’ রচনার কালে জীবন সম্বন্ধে লেখকের যে মনোভঙ্গি ছিল গান্ধীবাদকে শিরোদেশে অঙ্কিত করে সে ভঙ্গিতে জীবনদর্শন আর সম্ভবপর নয়। শ্রেণীসমন্বয়, হৃদয়ের পরিবর্তনের মতাদর্শের সঙ্গে গোত্রান্তরের মতাদর্শকে মেলানো শিবের অসাধ্য। অতএব সুবোধবাবুকে এমন দায়-হীন (কিন্তু সশ্রদ্ধ ভাবেই বলছি দায়িত্বহীন নয়) প্রেমের গল্প লিখতে হয়। এই চকচকে গল্পগুলোর তাৎপর্য-হীনতার পিছনে শিল্পী জীবনের ঐ কঁাকিই সক্রিয়।

ছঃখের বিষয় মানিকবাবুর ক্ষেত্রেও শিল্পের সংকটের যে অনুযোগ উপস্থাপিত হয় সে সংকট মানিকবাবুর পক্ষে মতবাদের সংকট। এই সংকটের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে মানিকবাবুর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা দরকার এবং এ আলোচনার সূত্রপাতেই একটা মোটা কথা পাঠকের মনে না হয়ে পারে না। সেটা হল চতুষ্কোণ এবং সরীসৃপ পর্যায়ের রচনাগুলি ব্যতীত পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথায় অথবা শহরতলীতে কিছা চিহ্নে যৌনতাকে মুখ্য বিনয় কোথাও করা হয়নি। শহরতলী, চিহ্ন, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথায় মুখ্য বিষয় মানুষ। যদিও তাঁর প্রথম পর্যায়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিস্তর পার্থক্য তথাপি এই দুই পর্যায়ে মানুষেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন মানিকবাবু হয়েছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে একমাত্র চতুষ্কোণ পর্যায়েই যৌন বিবরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাত্র চতুষ্কোণকে অবলম্বন করে মানিকবাবুর রচনায় জীবন কম, যৌনতা বেশি এ অভিযোগ করা সমীচীন হবে না।

বরঞ্চ আমাদের মনে হয় চতুষ্কোণকে গৌণ আসন দিয়ে চতুষ্কোণ পর্যায়ের আগে এবং পরে মানিকবাবুর আরম্ভ এবং পরিণতির কথাটাই বিশেষ বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বিবেচ্য হবে পদ্মা নদীর মাঝি এবং পুতুল নাচের ইতিকথা। বস্তুতঃ, পদ্মা নদীর মাঝি এবং পুতুল নাচের ইতিকথায় মানিকবাবুর বক্তব্য প্রায় এক। শুধু জীবনের দুটো ভিন্ন বিস্তারিত সে বক্তব্যকে ধরা হয়েছে—এই যা তফাৎ। বই দুটি মানিকবাবুর বিশিষ্ট শক্তির প্রায় সমস্ত চিহ্নই বহন করেছে। মানিকবাবুর সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির লক্ষণ এই : মানিকবাবু জীবনের বর্ণবহুল মুহূর্তগুলিকে পরিহার করতে চান। মানুষের হাসি-কান্নার প্রেম-বিরহের উপরিতলশায়ী সমস্ত বিকারের অপেক্ষা চৈতন্যের গভীরতর প্রশ্নকে তিনি ধরার পক্ষপাতী। সুতরাং স্বজ্ঞ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ইমোশনকে জাগ্রত করবে এ জাতীয় সমস্ত প্রলোভনকে স্বভাবতঃই তিনি পরিহার করবেন। বলা বাহুল্য মানিকবাবুর বিষয় যেহেতু মানুষের মন সেই হেতু ঘটনার প্রোজ্জ্বল রঙ চড়ানো বর্ণনা অপেক্ষা মানুষের মনের উপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য তিনি বেশি উৎসুক। তাই পুতুল নাচের ইতিকথায় ‘ভোরের দিকে সেনদিদি মরিয়া গেল’ মৃত্যুর বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর চেয়ে অধিক সময় দিতে নারাজ। কারণ সন্তান প্রসবের পর সেনদিদির মৃত্যুতে শশী এবং গোপালের মানস প্রতিক্রিয়াই মানিকবাবুর মুখ্য লক্ষ্য।

পুতুল নাচের ইতিকথায় শশীর সমস্তা নিশ্চয় যৌন সমস্তা নয়। সম্পূর্ণই শশীর মনের সমস্তা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্তাই এ উপন্যাসের বিষয়—গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার স্তরে শশীর জীবনের বিড়ম্বনা এক হয়ে যাওয়ার সমস্তা। যেহেতু মানিকবাবুর নায়ক একান্তভাবে মানিকবাবুরই নায়ক সেকারণে শশীর কাছ থেকে ধাত্রী দেবতার শিবনাথের ব্যবহার এবং চরিত্র আশা করা অশ্রাব্য হবে। সুপণ্ডিত সমালোচক শশীর সমস্তাটাকে যে সহানুভূতি দিয়ে অনুধাবন করেননি সেটা বুদ্ধি তখন, যখন দেখি যে শশীর সমস্তাটাকে চেপে রেখেই উপন্যাসের আলোচনা শেষ হল। তাই যখন দেখি যে কুসুমের সেই বিখ্যাত উক্তিকে ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন, ছোটবাবু’—উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হল শশীর তৎপরবর্তী স্বগতোক্তি তাৎপর্য ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই তখন দুঃখ হয়। অথচ ঐ বিচিত্র স্বগতোক্তি উপন্যাসের নিজস্ব স্রাবের ক্রমেই ঘটেছে। ‘শরীর শরীর, তোমার কি মন নাই কুসুম’—এইটাই তো শশীর প্রশ্ন। আমাদের এই কিস্তিকিমাকার গঠনের ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দূরত্বক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক কি তারই প্রতীক নয়? শশীর ফুলের চারা মাড়িয়ে কুসুমের দাঁড়ানোটায় কি কোন মানে নেই। শশী কি কলকাতার তথা উপনিবেশের প্রয়োজনানুগ শিক্ষায়ত্নের তৈরি শশীবাবু (উপন্যাসে ছোট বাবু) মাত্র নয়? এই বাবুয়ের আরোপিত যন্ত্রণায় মানুষ শশীটা ছট ফট করেও শেষ অবধি শশী ডাক্তার হয়েই কেমন করে শেষ হয়ে যায় সেইটাই উপন্যাসের বিষয় নয় কি? মানুষের মনটাই ছিল শশীর অন্তর্নিহিত। অথচ এইটা শশী জানত না যে কুসুমের মন গাওদিয়ার মন, শশীর অনুরূপ নয়? অপরের মনের সঙ্গে নিজের মনের মিল না পাওয়া গেলে শশী নিজের মনের মানেও খুঁজে পাবে না। এবং এই মিল তাকে সেখানে খুঁজতে হচ্ছে যেখানে ‘কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবেশ দিকে তাকাইলে’ আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতে শশীর লজ্জা করে। গাওদিয়াকে কলকাতার ছাঁদে গড়ে নিতে গিয়ে শশী পারে না এটাও আমাদের সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ। শশীর জীবনে এবং মনে গাওদিয়ার জটিল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই তাই গাওদিয়া রূপময় হয়ে ওঠে। গাওদিয়ার মানুষগুলোর “রোজকার জীবনযাত্রার” প্রসঙ্গ না টেনে আনলে একে রূপময় করে তোলা যাবে না, সে মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার উপন্যাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হওয়া চাই এও অসম্ভব দাবি।

সমালোচক কি জানেন না যে It is a matter rather of the firm and vivid concreteness with which the representative attitudes and motives are realized। যে গুণে একজন শিল্পী তার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন তার প্রধান কথা হল He must be exceptionally aware of them। এই exceptional awareness-এর পরিচয় রোজকার জীবনযাত্রার সংবাদ প্রদানের মধ্যে থাকে না। এর পরিচয় খুঁজতে হয় অন্তর্ভাবে। কারবারী লোক গোপাল দাসের প্রতিদিনকার কারবার কেনাবেচার মধ্যেই তাকে সন্ধান করতে হয় না। শশী সম্বন্ধে তার মনোভাবের মধ্যে যে অধিকারের চেতনা জাগ্রত ছিল সেটাই তার সম্পত্তিবান গ্রাম্য মালিক মনোভাবের যথেষ্ট প্রমাণ। তার জন্তে তাকে গণদেবতার শ্রীহরি পাল হতে হবে নিশ্চয় এ আবদার আমরা করব না। জীবিকার উপরিতলশায়ী পরিচয়ের চেয়ে এ পরিচয় যে অনেক গভীর রসজ্ঞ সমালোচক সে-কথা ভুলে যান কী করে তা আমার বুদ্ধির অগম্য, বুদ্ধির অগম্য কী করে গোপাল দাস পুত্রের কাছে স্বীকৃতি চেয়েছিল তাই শশী আর গোপাল দাসের সম্পর্কের শেষ ব্যাখ্যা হিসাবে এই উক্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। আসল কথা মানুষের মন এবং তার আচার-আচরণের মানে একে বিষয় করে রচিত উপন্যাসের বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমরা সচেতন নই। তাই এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির কাছে যা দাবি করার নয় তাই দাবি করে বসি।

চার

এবং এই ঠিকে ভুল আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় পদ্মা নদীর মাঝি হোসেন মিস্ত্রির চরিত্রের মূল্য নিরূপণে। হোসেন মিস্ত্রির ইউটোপিয়া শ্রীতির উল্লেখই তার চরিত্রের ব্যাখ্যা কার্য শেষ করতে চাই বলে হোসেন মিস্ত্রির সম্যক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। তাই হোসেন মিস্ত্রির চরিত্র আলোচনাকালে তার গান বীধার প্রসঙ্গ অনালোচিত থাকে আমাদের আলোচ্য সমালোচনায়। গানটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :—

আধার রাইতে আশমান জমি ফারাক কইরা খোও

বোন, ধু কত ঘুমাইবা।

বায়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও

মিস্ত্রা, কত ঘুমাইবা।

মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার পিকু

উঠা দেখা না।

আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি

দিশা রাখা না।

তোমার লাইগ্যা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও

দিল জাগানি আলেন যিনি, মিয়া

চিরা মেঘের বাদাম তুল্যা বন্ধু কনে যাও ?

জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।

নিদ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকে শির,

পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—

মাঝি, কত ঘুমাইবা।

যদিও বাউল মুর্শিদেয় গানের আদলে এ গান রচিত তথাপি কত ঘুমাইবা এই ধূয়ার মধ্যেই গানটির অন্ত তাৎপর্য হোসেন মিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু একে বুঝতে হলে কিছুক্ষণ আগে পুতুল নাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝির যে সমান ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে দু'কথার প্রয়োজন। অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়ানক মানুষের কথাই এই দুটি উপন্যাসের উপজীব্য। গাওদিয়ার গ্রাম সমাজ এবং পদ্মা নদী এই দুই উপন্যাসে অদৃষ্টের অন্ধ নিয়তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝিতে উপন্যাসের রূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ পৃথক। হোসেন মিয়া এবং পদ্মা কুবেয় ও তার সমগোত্রীয়দের কাছে অবশ্যই একই ছরতিক্রম্য বিধিলিপির প্রতীক। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং পদ্মা পরস্পরের সহযোগী কদাচ নয়। বরঞ্চ হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতাই তার ভূমিকা। পদ্মার তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের কথা পদ্মার কাছে সমর্পিত ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজ ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির মাঝখানে দীপ রচনায় একাগ্রচিত্ত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। পদ্মার ক্রুর প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে হোসেন মিয়াই কঠিন হাতে পাঞ্জা ধরেছে। কাজেই তার ব্যবহারও অক্রুর নয়। তাই 'কত ঘুমাইবা' উপরে উদ্ধৃত গানের এই ধূয়ার অর্ধ বাউল-মুর্শিদ-ইঙ্গিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের যে বিরুদ্ধতা হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ গানটির রূপকে তাই বলা হয়েছে। এবং এই গানের পর বিস্মিত কুবেয় যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে—আপনি গান বাইন্থবার পারেন? তখন হোসেন মিয়ার জবাবটিও

লক্ষ্য করার মত—খুশি হলে না পারি কি ? অবশ্য কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রায় ঐশী শক্তির সমতুল্য। দ্বীপে বসতি রচনা এবং গান রচনা খুশি হলে সে সব পারে—হুইই তার লীলা। সে কারণেই ময়না-দ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়ার পুরুষকার প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিকবাবুর রচনার দরকার হয়—কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জন্যই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। এর কোন কথাই, আশা করি, নতুন কথা নয়। তবু একটা কথা বোধ করি কাউকে অসম্মান না করেই বলা চলে যে হোসেন মিয়ার মত কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্র মালায় আর একটিও নেই। পুতুল নাচের ইতিকথার যাদব আর হোসেন মিয়া একই মনোলোল্যে গঠিত এ-কথা তাই আর একবার আমাদের আঘাত করে।

পাঁচ

এ সমস্ত কারণেই চতুষ্কোণ অবলম্বন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বসে থাকা হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যৌনতা আছে বেশি জীবন আছে কম। চতুষ্কোণের ক্ষণিক পর্যায় মানিকবাবুর আদি এবং অন্তে কোথাও স্থায়ী চিন্তা হিসাবে ছিল এ প্রমাণ নেই। চতুষ্কোণের পরবর্তীকালে শহরতলী, চিহ্ন এবং আরোগ্যে মানিকবাবু নতুন করেই মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। মানুষের গোটা চেহারা তারই সমাজ প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল চতুষ্কোণে এ বক্তব্যের ব্যর্থ শিল্প রূপায়ণের পর স্বাভাবিক ভাবেই মানিকবাবু অগ্রসর হয়েছেন নতুন জিজ্ঞাসায়। এবং এরই কলে মানিকবাবু মার্কসবাদকে স্বীকার করেন।

নিঃসন্দেহে এই স্বীকরণ নিভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে নিজ শিল্পীজীবনে জারিত করে নিতে গেলে নিজেরই শিল্পী ইতিহাসকে যে ভাবে অনুধাবন করা দরকার সে ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ব্যত্যয় ছিল। তাঁর শেষ দিকের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোন যোগ্য বিনীত সমালোচনা হলে একথা নিশ্চয় উত্থাপিত হবে। শুধু যখন অন্নিষ্ট হয় নিজের মন অথবা মনের মানে, তখন,—অথবা অন্ধ অদৃষ্টভূল্য প্রকৃতির গ্রাসে উপায়হীন জীবন যখন উপজীব্য তখন যে মনোভঙ্গি কার্যকরী, মানুষ নিজ ইতিহাসকে নিজেই রচনা করে একথা বলবার সময় আর সে মনোভঙ্গি কার্যকরী হয় না। মানুষ পরিবেশের অধীন শহরতলী পর্যন্ত একথা যত শিল্পসম্মত ভাবে মানিকবাবু বলেছেন—মানুষ আপন অদৃষ্ট রচনায় অংশ গ্রহণ করে একথা তত শিল্পসম্মত ভাবে তিনি

বলতে পারেননি। অথচ মানিকবাবু হোসেন মিয়া'র মত চরিত্র সৃজন করেছেন।
 যশোদার নিঃসঙ্গতার ছবি এঁকেছেন। পাকার আত্মানুসন্ধানের ছক রচনা
 করেছেন। অক্ষয়ের মদের গ্রাসে তাজা ছেলের রক্ত দেখেছেন।
 তাই তাঁর শিল্পী-জীবনের যেখানে ব্যর্থতা সেখানে আমরা নিশ্চয় অঙ্গুলীসংকেত
 করব। কিন্তু একথা বলব না যে তাঁর রচনায় যৌনতা বেশি, জীবন কম।
 বলব না যে, তাঁর রচনায় কখনো জীবনের স্বাস্থ্য আসেনি : আর পুতুল নাচের
 ইতিকথা সম্বন্ধে অংশতঃ আলোচনা করে, পদ্মা নদীর মান্নি সম্বন্ধে অক্ষুট মন্তব্যে
 তৃপ্ত থেকে, শেষবর্তী রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে শুধু চতুষ্কোণ প্রসঙ্গে
 লরেন্সের প্রতি-তুলনা ডেকে আনা প্রায় মশা মারতে কামান দাগা। উপন্যাসের
 শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে মানুষের স্বরূপেরই সন্ধান করেন। সে সন্ধানকার্য কোন
 সমালোচনা স্রষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী নাও হতে পারে। শিল্পীকে বিষয়ের
 সন্ধানে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তাই বিচার করতে হয় প্রতিভাত শিল্পকর্মের।
 আর যখন শিল্পকর্মই প্রশ্ন তখন সার্থকতর শিল্পস্রষ্ট্রিকে বাদ দিয়ে শিল্পীর
 গৌণ কর্মের পিছনে অকারণ সময় ব্যয়ের কোন মানে হয় না। কোন বিদেশী
 পণ্ডিত এবং কোন আহুত পাণ্ডিত্যের দোহাই দিয়েও নয়।

আমলা-তত্ত্ব ॥ অমল দাশগুপ্ত

বস্তুজগৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে আমলা-জগৎকে বিচার-বিশ্লেষণ করার কোনো চেষ্টা এতদিন হয়নি। অধ্যাপক পার্কিনসন এই বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পথিকৃত। বহু বছরের অক্লান্ত গবেষণার ফলে আমলা-জগতের বাড়বুদ্ধির মূলহুতটি তিনি আবিষ্কার করেছেন। প্রায় তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা বলতে চেষ্টা করছি।

কোন কাজ কতটুকু সময়ে হতে পারে তার কোনো স্পষ্ট নিরিখ নেই। বিশেষ কাজের বিশেষ একটা পরিমাপ আছে—একথাও ঠিক নয়। একই কাজ সময় বিশেষে বাড়ে, সময় বিশেষে কমে। শেষ পর্যন্ত হাতের সময়ের সঙ্গে কাজের সময় ঠিক ঠিক খাপ খেয়ে যায়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, ব্যস্ত মানুষের সময়ের অভাব হয় না। কথাটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, ঠাকুর্দা আছেন দেশের বাড়িতে বর্ধমান, আর নাতি আছে আপিসের মেসে কলকাতায়; ঠাকুর্দা চিঠি লিখবেন নাতির কাছে। কতক্ষণ সময় লাগতে পারে একাজের জন্তে? খুব চটপটে একজন মানুষের পক্ষে হয়তো তিন মিনিটের বেশি নয়। কিন্তু ঠাকুর্দার সারাদিনে অটেল সময়। তিনি কেন তিন মিনিটে চিঠি লিখতে যাবেন? ধীরে-স্বস্তে রয়ে-বসে কাজ করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। হয়তো পোস্টকার্ড খুঁজে বার করার জন্তেই তাঁর এক ঘণ্টা সময় লাগবে। আরো এক ঘণ্টা লাগবে চশমার হৃদিশ পেতে। ঠিকানা লেখা কাগজটার সন্ধান পাবার জন্তে আধঘণ্টা তাঁকে হাতড়াতে হবে। ঘণ্টা-দেড়েক লাগবে সমস্ত বস্তু গুছিয়ে চিঠিখানি লিখতে। তারপরেও হয়তো মিনিট কুড়ি কাটবে চিঠিটা পোস্ট করতে যাবার জন্তে বেরোতে গিয়ে ছাত্তা নেবেন কি নেবেন না ঠিক করতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে-কাজ তিন মিনিটে অবলীলাক্রমে শেষ করা চলে তা ক্ষেত্রবিশেষে অনেক উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রম সমেত পুরো একদিনের কাজ হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। অতএব মানতে হবে যে যে-কোনো কাজকে খুশিমতো বাড়ানো-কমানো যায়।

কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে অণু ভাবেও বলা চলে। যে-কোনো কাজকে যতোজন খুশি মানুষকে দিয়ে করানো সম্ভব। কাজের পরিমাণ ও কাজের মানুষের সংখ্যার মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক নেই। যার সত্যিকারের কিছু করার নেই তার অণুও অবসর—এমন ব্যাপার সব সময়ে সত্যি নাও হতে পারে। আবার কাজ না থাকলেই নিষ্কর্মা হতে হবে, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা চলে না। যে-কোনো কাজকে কাঁপিয়ে ফেনিয়ে এমন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা সম্ভব যে যতোক্ষণ খুশি সময় তা দিয়ে ভরাট হতে পারে। এই তথ্যটিকে এমনিতে হয়তো আমরা অনেকেরই অস্বীকার করি না কিন্তু আমলা-জগতের ব্যাপক ক্ষেত্রে এই তথ্যটির তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা অনেকেরই অবহিত নই। আমরা প্রায়ই মেনে নিই (যদিও পুরোপুরি বিশ্বাস করি না) যে আমলার সংখ্যা বাড়ি মানেই কাজের পরিমাণ বাড়ি। আবার আমাদের মধ্যে যারা একটু বেশি ছিদ্রান্বেষী তারা বড়ো জোর এই বলে সন্দেহ প্রকাশ করে যে আমলাদের সংখ্যা বাড়লে কারও কারও হয়তো কোনো কাজই থাকে না কিংবা সবাই আগের চেয়ে কম কাজ করে। কিন্তু আসলে আমরা হু-দলই ভুল করি। সত্যি বলতে কি, আমলাদের সংখ্যা আর কাজের পরিমাণের মধ্যে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। যে সূত্র অনুসারে আমলাদের সংখ্যা বাড়ি তার নাম পার্কিনসনের সূত্র। কাজের পরিমাণ বাড়ুক বা কমুক বা ছিটেকোঁটাও না থাকুক, পার্কিনসনের সূত্র অনুসারে আমলাদের সংখ্যা অবধারিত ভাবে বেড়ে চলবে।

এবার তাহলে কথা উঠবে—সূত্রের সংজ্ঞা কি? প্রমাণ কি? সংজ্ঞা ও প্রমাণ পরে আসছে। তার আগে আমলা-জগতের বাড়িবৃদ্ধির পেছনকার দু-একটি কারণ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণ পাঠকের সুবিধের জন্তে কোনো রকম টেকনিকাল আলোচনার মধ্যে আমরা যাব না (যদিও এ বিষয়ে টেকনিকাল আলোচনার অনেক কিছু আছে)। মোক্ষ কারণ হচ্ছে দুটি এবং এই কারণ দুটিকে প্রায় দুটি প্রবাদবাক্যের মতো কবুবে এভাবে বলা চলে : (১) প্রত্যেক আমলাই অধস্তনদের সংখ্যাবৃদ্ধি চায়, সমকক্ষদের নয় ; (২) আমলারা একজন আরেকজনের জন্তে কাজ তৈরি করে।

এই কারণদুটিকে ব্যাখ্যা করার জন্তে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

মনে করুন, ক-বাবু একজন আমলা। তিনি মনে করছেন, তাঁর একার পক্ষে

কাজ বড়ো বেশি। কাজ সত্যিই বেশি কিনা তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কাজ যাই হোক না কেন, ক-বাবু যদি সত্যিই একজন আমলা হন তাহলে কোনো না কোনো সময়ে এই উপলক্ষি তাঁর হবেই। এক্ষেত্রে তাঁর করণীয় কী? এক, তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারেন। দুই, তিনি একজন সহকর্মী (মানে করুন খ-বাবু) চাইতে পারেন। তিন, তিনি দুজন অধস্তন কর্মচারী (মানে করুন গ-বাবু ও ঘ-বাবু) চাইতে পারেন। এই তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি ক-বাবুকে করতে হবে। কোন্টি করবেন তিনি? অবশ্যই তৃতীয়টি। ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যে ক-বাবু প্রথমটি বা দ্বিতীয়টি করেছেন। কেন করতে যাবেন তিনি? চাকরিতে তিনি ইস্তফা দেবেন না কারণ চাকরিতে ইস্তফা দিলে মাইনে ও পেন্সন দুই-ই হারাতে হবে। খ-বাবুকে সহকর্মী হিসেবে তিনি কিছুতেই চাইতে পারেন না কারণ সেক্ষেত্রে খ-বাবু তাঁর প্রমোশনের রাস্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবেন। যতো দেরিতেই হোক ঞ-বাবুকে একদিন না একদিন (কোন সুদূর ভবিষ্যতে কে জানে) অবসর নিতেই হবে তখন ক-বাবুই গিয়ে ঞ-বাবুর চেয়ারে বসবেন। কাজেই গ-বাবু ও ঘ-বাবুকে অধস্তন কর্মচারী হিসেবে নেওয়া ছাড়া ক-বাবুর গতাস্বর নেই। আর এতে তাঁর অণু দিকেও সুবিধে। প্রথমতঃ, দুজন অধস্তন কর্মচারীর মাথার ওপর বসতে পারার দরুন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ, আপিসের কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করে গ-বাবু ও ঘ-বাবুর ওপরে আলাদা আলাদা ভাবে স্তম্ভ করার পরে তিনিই হবেন একমাত্র লোক যিনি দুটি ভাগ সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল থাকবেন। এখানে আরো একটি কথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। কথাটা খুবই জরুরী। গ-বাবু ও ঘ-বাবু অবিচ্ছেদ্য; তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না। যেহেতু ক-বাবু একজন আমলা, কাজেই তাঁর এটুকু বুদ্ধি আছে যে একা গ-বাবুকে চাকরি দেওয়া চলে না। কারণ সেক্ষেত্রে গ-বাবুর সঙ্গে ক-বাবুকে কাজ ভাগাভাগি করতে হবে। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে ক-বাবু গ-বাবুকে সহকর্মী হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন। অথচ এখানেই তাঁর আপত্তি এবং এই আপত্তির জন্তেই খ-বাবুকে সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি নারাজ। অতএব গ-বাবু ও ঘ-বাবুকে জোট বেঁধে আসতেই হবে। ফলে, দুজনের মধ্যে কেউ-ই নিশ্চিত হতে পারবে না কার ভাগ্য আগে প্রমোশনের শিকে ছিঁড়বে। দুজনকেই তটস্থ ও সতর্ক থাকতে হবে। আর এই সুযোগে ক-বাবু দুজনের ওপরেই হস্তত্যাগ করবেন।

ওদিকে গ-বাবু অধস্তন কর্মচারী হতে পারেন কিন্তু তিনিও আমলা। কাজেই কালক্রমে তাঁকেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁর একা পক্ষে কাজ বড়ো বেশি। ক-বাবুর কাছে তিনি এ নিয়ে দরবার করবেন ও ক-বাবু আপত্তি করবেন না। সুতরাং আরো দুজন অধস্তন কর্মচারী আসবে গ-বাবুকে সাহায্য করার জন্তে (মনে করুন চ-বাবু ও ছ-বাবু)। কিন্তু ক-বাবু অবিবেচক নন। অদূরদর্শীও নন। তিনি জানেন, গ-বাবুর দুজন সহকারী মঞ্জুর করতে হলে ঘ-বাবুকে একা ফেলে রাখা চলে না। কাজেই আরো দুজন অধস্তন কর্মচারী আসবে ঘ-বাবুকে সাহায্য করার জন্তে (মনে করুন জ-বাবু ও ঝ-বাবু)। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে ছ-জন অধস্তন কর্মচারী। ছ-ছজন অধস্তন কর্মচারীর মাথার ওপরে বসতে পেরে ক-বাবুর মর্যাদা আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রমোশনের নিশ্চয়তাও।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, একজন আমলা গোড়ার যে-কাজ করে তা করার জন্তেই অল্প কিছুকালের মধ্যে সাতজন আমলাকে হাজির হতে হয়। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর তা হবার পরেই দেখা যাবে, আমলারা একজন আরেক জনের জন্তে কাজ তৈরি করছে। এত বেশি কাজ তৈরি করছে যে হিমসিম খেতে হচ্ছে প্রত্যেককে। খোদ ক-বাবুকে খাটতে হচ্ছে আগের চেয়েও বেশি।

বিষয়টা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।

হয়তো একটা চিঠি এসেছে যার জবাব দেওয়া দরকার। চিঠিটা পেয়ে চ-বাবু ঠিক করলেন যে এটি ছ-বাবুর এক্তিয়ারভুক্ত। ছ-বাবু একটা খসড়া জবাব লিখে গ-বাবুর কাছে পেশ করলেন। জবাবের খসড়া গ-বাবুর পছন্দ হল না, তিনি বিস্তর কাটাকুটি করলেন, তারপর গেলেন ঘ-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। ঘ-বাবু ডাকলেন জ-বাবুকে এবং একটি খসড়া জবাব লিখতে বললেন। কিন্তু জবাব লেখার আগেই জ-বাবুকে ছুটিতে যেতে হল। তিনি ফাইলটি চালান করলেন ঝ-বাবুর কাছে। ঝ-বাবু আবার একটি নতুন খসড়া করলেন। ঘ-বাবু সেটি সই করে পাঠালেন গ-বাবুর কাছে। দুটি খসড়া মিলিয়ে গ-বাবুর চূড়ান্ত জবাব তৈরি হল এবং সেটি তিনি পাঠালেন খোদ ক-বাবুর কাছে।

খসড়া জবাবটি পেয়ে ক-বাবু কী করবেন? তিনি অনায়াসেই চোখ বুজে সই করে দিতে পারতেন কারণ তাঁকে আরো অনেক জরুরী বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্তেও ভুলতে পারেন না যে ঝ-বাবু

অবসর নিলেই তাঁর প্রমোশন অবধারিত। কাজেই তাঁকে মনে মনে সিদ্ধান্ত করতে হয়, গ-বাবু ও ঘ-বাবুর মধ্যে কে সেক্ষেত্রে তাঁর পদে প্রমোশন পাবে। জ-বাবুর ছুটি নেওয়াতে তিনি আপত্তি করেননি যদিও কড়াকড়ি ভাবে বিচার করলে জ-বাবুর ছুটি মঞ্জুর করা চলে না। বরং তাঁর একটু হুঁচিস্তা আছে ঝ-বাবুর সম্পর্কে। কিছুটা পারিবারিক অশান্তির জন্তে আর কিছুটা অন্য কারণে লোকটার শরীর ক্রমশই ধারাপ হচ্ছে। ঝ-বাবু ছুটিতে গেলেই ভালো হত। খুশি হয়েই তিনি ছুটি মঞ্জুর করতেন। শুধু কি এই, আরো কত রকমের সমস্যা। কন্ফারেন্সের সময়ের জন্তে ছ-বাবু বিশেষ ইন্ক্রিমেন্ট চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছেন, সেটি এখনও তাঁর টেবিলে পড়ে আছে। আরেকটি দরখাস্ত রয়েছে চ-বাবুর; তিনি পেন্সন-দপ্তরে বদলি হতে চান। ওদিকে কথাটা ক-বাবুর কানেও উঠেছে যে ঘ-বাবু একজন বিবাহিতা টাইপিষ্ট মহিলার সঙ্গে প্রেম করছেন। ঝ-বাবু ও ছ-বাবুর মধ্যে কথা-বলাবলি বন্ধ তাও ক-বাবু জানেন। অথচ কী নিয়ে যে এঁদের মধ্যে ঝগড়া তা কেউ বলতে পারে না। এমনি হাজারটা কার্যকারণহীন ঝামেলার মধ্যে মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে হচ্ছে ক-বাবুকে। কিন্তু তাই বলে তিনি বিবেককে জলাঞ্জলি দেননি। তিনি তো অনায়াসেই গ-বাবুর লেখা খসড়া জবাবে সহ করে ব্যাপারটাকে চুকিয়ে কেলেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। তাঁর কর্তব্যবোধ খুবই সজাগ। সুতরাং তিনি খসড়া জবাবটি খুঁটিয়ে পড়লেন, গ-বাবু ও ঝ-বাবুর লেখা এলোমেলো অনুচ্ছেদগুলো কেটে বাদ দিলেন, ছ-বাবু যেমনভাবে খসড়াটি লিখতে চেয়েছিলেন মোটামুটি সেই চেহারাতেই এনে দাঁড় করালেন খসড়াটিকে (বোঝা যাচ্ছে, ক-বাবুর মতে ছ-বাবুই কাজের লোক)। তারপরে তিনি ভাষাগত ভুল সংশোধন করলেন (আজকালকার ছোকরাগুলো একেবারেই ইংরেজি জানে না)। শেষ পর্যন্ত জবাবটি যখন চূড়ান্ত ভাবে লেখা হল তখন দেখা গেল সেটি একান্তভাবে ক-বাবুরই জবাব—চিঠিটি তাঁর হাতে সরাসরি এসে পৌঁছলে কারও সাহায্য না নিয়েই তিনি ঠিক এই জবাবই লিখতেন। গ-বাবু ও ঘ-বাবুর অস্তিত্ব অন্ততঃ এই চিঠিটির জবাবের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করার কোনো অবকাশ নেই যে গ-বাবু ও ঘ-বাবু বসে বসে সময় কাটিয়েছেন। কেউ-ই বসে থাকেননি। প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়েছে সবাইকে। তবুও ক-বাবু অত্যন্ত দক্ষ আমলা বলেই এত কম সময়ের মধ্যে এতখানি কাজ করতে পেরেছেন। অন্য আপিসে

আরো অনেক বেশি সময় লাগে। লক্ষ্য করে দেখুন, দক্ষতার মান বজায় রাখার জন্তে কী খাটুনিই না খাটতে হচ্ছে ক-বাবুকে! সন্ধ্যা কখন উৎরে গেছে তবুও তিনি আপিস ছেড়ে যেতে পারেননি। এই আপিস পাড়াটা পুরোপুরি নিঃশুম ও নিশ্চুপ হবার পরে তাঁর বাড়ি যাবার সময়। বা, আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে তিনি তখন আপিসটাকেই গোটা কয়েক কাইলের মধ্যে এঁটে বাড়িতে নিয়ে হাজির করেন। তা হোক। সাকল্য অর্জন করতে হলে কিছুটা দাম দিতে হবে বৈকি। শুধু চুল পাকলে বা টাক পড়লেই সাফল্যের দেবী খুশি নন, সেজন্তে অনেক রাত পর্যন্ত আপিসের কাজ করাও চাই।

এই হচ্ছে আমলা-জগতের ছবি। ছবিটি যদি অস্পষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে যে-কেউ এতক্ষণে বুঝে নিয়েছেন যে আমলাদের বাড়িবৃদ্ধি ঠেকাবার ক্ষমতা কারও নেই। তা হবেই। কোনো কিছুর জন্তে ঠেকে থাকবে না। এবার তাহলে সময়ের একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে। কতখানি সময়ে কি পরিমাণ বাড়িবৃদ্ধি? ক-বাবুর চাকরি যখন থেকে শুরু তারপর কতটা সময় কাটবে ক-বাবুর চাকরি পাকা হতে? এ প্রশ্নের জবাবে বিপুল পরিমাণ স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া চলে এবং এই বিপুল পরিমাণ স্ট্যাটিস্টিক্স বিশ্লেষণ করেই পার্কিনসনের সূত্র রচিত। প্রবন্ধটি ছোট করতে হচ্ছে বলে খুব বেশি স্ট্যাটিস্টিক্স-এর মধ্যে আমরা যাব না, শুধু পাঠকদের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্তে দু-একটির উল্লেখ করব।

এ-ধরনের গবেষণা প্রথম শুরু হয় ব্রিটিশ নৌ-বিভাগে। নৌ-বিভাগে এ-ধরনের গবেষণার একটা সুবিধে এই যে নৌ-বিভাগের কাজের মধ্যে খুব বেশি ঘোরপ্যাচ নেই, সহজেই একটা হিসেব পাওয়া সম্ভব।

১৯১৪ সালে ব্রিটিশ নৌ-বিভাগে অফিসার ও নাবিকের সংখ্যা ছিল ১,৪৬,০০০, ডকের আমলা ও কেরানীর সংখ্যা ৩,২৪৯, ডক-মজুরের সংখ্যা ৫৭,০০০। কিন্তু ১৯২৮ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, অফিসার ও নাবিকের সংখ্যা মাত্র ১,০০,০০০, ডক-মজুরের সংখ্যা মাত্র ৬২,৪৩৯, কিন্তু ডকের আমলা ও কেরানীর সংখ্যা ৪,৫৫৮। এই সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজের হিসেবটাও নেওয়া যেতে পারে। ১৯১৪ সালে ৬২টি যুদ্ধ-জাহাজ কিন্তু ১৯২৮ সালে মাত্র ২০টি। সদর দপ্তরের আমলাদের সংখ্যা ১৯১৪ সালে ছিল ২,০০০ কিন্তু ১৯২৮ সালে ৩,৫৬৯। এই হিসেবগুলোকে একটা ছকের মধ্যে তুলে ধরলে এই রকম দেখাবে।

নৌ-বিভাগের স্ট্যাটিস্টিক্স

বিভাগ	বছর		শতকরা হিসেবে বৃদ্ধি বা হ্রাস
	১৯১৪	১৯২৮	
যুদ্ধ-জাহাজ	৬২	২০	—৬'৭৭৪
ফিসার ও নাবিক	১,৪৬,০০০	১,০০,০০০	—৩১'৫
ডক-মজুর	৫৭,০০০	৬২,৪৩৯	+৯'৫৪
ডকের আমলা ও কেরানী	৩,২৪৯	৪,৫৫৮	+৪০'২৮
সদর দপ্তরের আমলা	২,০০০	৩,৫৬৯	+৭৮'৪৫

এই স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে অনেকে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন যে নৌ-বিভাগে যুদ্ধ করার লোক যতো না আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে আপিসে কাজ করার আমলা। কিন্তু আমাদের কাছে এই সমালোচনা অর্থহীন। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই যে সদর দপ্তরের আমলার সংখ্যা ১৯১৪ সালে ২,০০০ কিন্তু ১৯২৮ সালে ৩,৫৬৯। মনে রাখা দরকার যে আমলাদের এই বাড়িবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিমাণ বিন্দুমাত্র বাড়েনি। আসলে এ দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। কাজ বরং কমেছে। ওপরের হিসেব থেকে দেখতে পাই, ১৯১৪ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে, অফিসার ও নাবিকের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। ভবিষ্যতে কাজ বাড়বে এমন সম্ভাবনাও নেই, কারণ ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন চুক্তি অনুসারে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৪ বছরের মধ্যে আমলাদের বাড়িবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৭৮ ভাগ। অর্থাৎ গড়ে বছরে শতকরা ৫'৬ ভাগ। অথচ এই একই সময়ে কর্মচারীদের (এক্ষেত্রে, নাবিক) সংখ্যা শতকরা ৩১'৫ ভাগ কমেছে।

আসল স্ট্যাটিস্টিকস্-এর সাহায্যে একথা প্রমাণ করা যায় যে নাবিকরা থাকুক বা না থাকুক আমলাদের সংখ্যা বাড়বেই। সত্যিকারের একজন নাবিকও যদি না থাকত তাহলেও ব্রিটিশ নৌ-বিভাগে আমলাদের বাড়িবৃদ্ধি এই হারেই হত।

নৌবিভাগের পরবর্তী কালের হিসেব আরো কোতূহলোদ্দীপক। ১৯৩৫ সালে সদর দপ্তরের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮,১১৮, আর ১৯৫৪ সালে ৩৩,৭৮৮।

আমাদের বক্তব্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশ দপ্তরের হিসেব আরো অনেক বেশি পরিষ্কার। প্রথমে হিসেবটা দেখা যাক।

উপনিবেশ দপ্তরের স্ট্যাটিস্টিকস্

বছর	১৯৩৫	১৯৩৯	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫৪
কর্মচারী	৩৭২	৪৫০	৮১৭	১১৩৯	১৬৬১

কর্মচারীর সংখ্যা কি হারে বেড়েছে তা হিসেব করার আগে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৪—এই কুড়ি বছরে ব্রিটিশ উপনিবেশ দপ্তরের কাজ একই পরিমাণ থাকেনি। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে উপনিবেশের আয়তনে বিশেষ হেরফের হয়নি। কিন্তু ১৯৪৩ সালে উপনিবেশের অনেকখানি অংশ শত্রুপক্ষের দখলে ছিল। আর ১৯৪৭ সালের পর থেকে তো ব্রিটিশ উপনিবেশ একের পর এক হাতছাড়া হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যেতে পারে, উপনিবেশের আয়তন কমার সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ দপ্তরের কর্মচারীদের সংখ্যাও কমবে। কিন্তু উপরের হিসেবের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যাবে যে কুখ্যাতি একেবারেই ভুল। কর্মচারীর সংখ্যা বছরে বছরে অনিবার্য ভাবে বেড়েছে। যদি ছিটেফোঁটাও উপনিবেশ না থাকত তাহলেও ঠিক এমনি ভাবেই বাড়ত।

এবার তাহলে উপনিবেশ দপ্তরের ক্ষেত্রে বাড়িবৃদ্ধির গড় হিসেবটা বার করা যেতে পারে। এই হিসেব বার করার জন্তে আমরা যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দেব—কারণ যুদ্ধের কয়েকটা বছরে দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশ দপ্তরের কাজের পরিমাণ আচমকা বড়ো বেশি কমে গেছে আর কর্মচারীর সংখ্যা আচমকা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে। তাহলে আমাদের হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে এই :

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৫.২৪ ভাগের কিছু বেশি। আর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে বেড়েছে শতকরা ৬.৫৫ ভাগ। অর্থাৎ গড়ে বছরে ৫.৮৯ ভাগ। এই হিসেবের সঙ্গে নৌ-বিভাগের আমলাদের বাড়ার হার হিসেবের আশ্চর্য মিল পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আরো অজস্র স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া চলে। কিন্তু এই প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে তার জায়গা নেই। তবে স্ট্যাটিস্টিক্স বিশ্লেষণ করে সব সময়েই আমরা প্রমাণ করতে পারব যে যেখানেই একজন আমলা কাজ করে সেখানেই কিছুকালের মধ্যে দুই বা ততোধিক আমলার আবির্ভাব হয়। কতখানি সময়ে কতজনের আবির্ভাব হয় তার হিসেবটাও আগে থেকেই বলে দেওয়া চলে। গড়ে বছরে প্রতি ১০০ জনে ৫.৭৫ জন।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে পার্কিন্সনের সূত্র। তবে যারা এই সূত্রটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান তাঁদের কয়েকটি বিষয়ে হুঁশিয়ার করার আছে।

পার্কিন্সনের সূত্রের রাজনৈতিক মূল্য কিছু নেই। কতকগুলো বিশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই সূত্রটি আবিষ্কার করা হয়েছে। আমলা-জগতের কোনো একটি বিভাগে আমলাদের সংখ্যা কি হারে বাড়বে তার নির্দেশ এই সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভাগটিরও উপবিভাগ গজাবে কিনা তার কোনো নির্দেশ এই সূত্রে নেই। কোনো একটি দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আমলাদের সংখ্যাটি নির্দিষ্ট কিনা তার নির্দেশ দেওয়াও পার্কিন্সনের সূত্রের উদ্দেশ্য নয়।

কথাটা আরেকবার বলছি। পার্কিন্সনের সূত্রটি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এর সঙ্গে আজকের দিনের রাজনীতির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আগাছা উপড়ে ফেলার কাজ উদ্ভিদবিদের নয়। আগাছা কি হারে বাড়ছে, সেই খবরটুকু জানাতে পারলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। :

ঢেউ ওঠবার আগে ॥ বিমল ভৌমিক

● ● এক ● ●

ঘুম ভাঙার পরও বেশ কিছুক্ষণ লাগল ভেবে নিতে সে কোথায় আছে। মাথাটা এখনো ভারী হয়ে আছে, সমস্ত শরীরে অবসাদ। বুকের ভেতর থেকে একটা চোঁয়া ঢেকুর উঠে আসতেই আদিত্যের মনে পড়ে গেল, কাল রাতে সে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। নেশা কেটে গেছে, কিন্তু ঘোর এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। এক রাতের নেশাতেই শরীরটা যেন ছিবড়ে হয়ে গেছে। বিছানাতেই শুয়ে শুয়েই সেই পুরনো অথচ ভয়ানক কথাটা নতুন করে মনে পড়ে তার। বয়স ষাট পেরিয়েছে, এবার মরতে হবে। হবেই। আজ না হোক কাল। কাল না হোক পরশু।

শুয়ে শুয়েই চিবুকের ওপর হাত দিয়ে অনুভব করল আদিত্য, চিবুক ভেঙে তুবড়ে গেছে, চামড়ায় ভাঁজ ধরেছে, বুকের মধ্যে কেমন একটা বুনো যন্ত্রণা।

‘আঃ’—কেমন একটা আক্ষেপের মতো শোনালো শব্দটাকে। নিজের স্বরটাই নিজের কাছে অচেনা-অচেনা ঠেকে, করাত দিয়ে কাঠচেরা শব্দের মতো ফ্যাসফেসে, ভাঙা।

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের পিচুটি মুছে ধীরে ধীরে বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসল আদিত্য। দরজাটা বন্ধ। দরজার ওপারে বিরাট একটা পরিবারের অস্তিত্ব বিছানাতে বসে বসেই টের পায় আদিত্য। এতবড় একটা পরিবারের কর্তা সে—একথাটা মনে পড়ে অস্বাভাবিক দিনের মতো গর্ব আর তৃপ্তি পায় না আর। বরঞ্চ মনে হয়, সে যেন দলছাড়া, দলচ্যুত।

কী হয়েছিল ব্যাপারটা—ভাববার চেষ্টা করতে গিয়েই মনে পড়ে গেল আদিত্যের, ‘ওঃ হো, ঠিক ঠিক।’ রেসে কাল সে জিতেছে। মোটা টাকা। ‘কী নাম ছিল ঘোড়াটার—গোল্ডেন এঞ্জেল—সোনালী পরী।’

ধীরে ধীরে আদিত্যের খাবড়ানো মুখটার একটা হাসি ফুটে উঠল, পুরু মোটা ঠোঁট ছোটো কানের দিকে ছড়িয়ে গেল আরো একটু, টারফ গ্রাউণ্ড, সবুজ ঘাস, মানুষ—মানুষের মাথা, স্কার বোর্ড, গোল্ডেন এঞ্জেল, ট্রব্ল টোট—ওঃ, যদি সবটা টাকা লাগিয়ে দিতে পারতো।

পেমেন্ট নিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা গিয়ে উঠল মদের দোকানে। মদ খেলো।
নেশায়, উত্তেজনায়, আনন্দে, জ্বালায়।

ধীরে ধীরে মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে কপালের ওপর কাঁচাপাকা ভুরু দুটো তার
কুঁচকে এল।

দরজায় এলোমেলো লাগি পড়তেই সুবর্ণ,—সুবর্ণের চেহারাটা এই মুহূর্তে আদিত্যের
ঠিক মনে এল না,—দরজা খুলে দিয়েছিল। পেটে মদ, পকেটে টাকা, সামনে
সুবর্ণ, বাড়ি নিঝুম। ষাট বছরের পাকানো হাড়ের ভেতর থেকে, রক্তমজ্জার
অনেক নিচে বাস করে এমন একটা কুৎসিত লিপ্সা, তাকে টানতে থাকে। সমস্ত
বাড়ি নিঝুম। আলো জ্বলছে না কোনো ঘরে। বউ নিরজা সারাদিন
খাটাখাটনির পর এখন নিশ্চয়ই হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। নিরজার সেই হাঁ-করা
মুখটার কথা মনে পড়তেই ঘোরায় ছটকটিয়ে উঠল আদিত্য। বছর বিউনী বউ,
এক ডজন বাচ্চার মা হয়ে বসে আছে, কুন্ডি-কুন্ডি।

সবাই ঘুমোচ্ছে। নমিতা-সবিতা-ছবি-রুবি-বেণু-নন্দ-সন্ত সবাই। চিলেকোঠায়
সুবর্ণের আলোও জ্বলছে না। এই ঘুমন্ত নিঃস্বপ্ন বাড়িতে সুবর্ণ একা জেগে
কেন? দেওয়ালে ভর দিয়ে কোনভাবে টাল সামলে একটা চোয়া উদগার তুলে
আদিত্য জড়ানো গলায় ডাকল, সুবর্ণ।

খুঁট করে উঠোনের আলো জ্বালিয়ে সুবর্ণ বললে, বলুন জামাইবাবু।

সুবর্ণ নিরজার বোন, নিরজার থেকে বোলো বছরের ছোট। বিয়ের পরের বছরই
বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি কিয়ে গিয়েছিল। সুবর্ণের জন্ম দিতেই সুবর্ণের মা
মারা যায়। দাদার সংসারে বেশি দিন টিকতে পারলো না সুবর্ণ। তিন
দেওরের সংসারে বছর কয়েক কাটিয়ে অবশেষে নিরজার সংসারে ঠাই
নিরেছে।

আদিত্য এগিয়ে গিয়ে স্নাইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল। ভয় পেয়ে সুবর্ণ
চাপায় গলায় বললে—জামাইবাবু, আলোটা জ্বলুন।

—উহঁ।

পশু তার শিকারকে পিঠে ফেলে যেমন করে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি করে সুবর্ণকে
প্রায় শূন্যে তুলে ঘরে নিয়ে গেল আদিত্য।

চিলেকোঠায় আলসের ধারে সুবর্ণের দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে একটা শব্দ উঠল।
রাতচর হাঁচর বা বিড়াল ছাড়া ঐ শব্দের আর কোনো উৎস আছে বলে কেউ
ভাবতেও পারে না।

স্বাস্থ্যসেতে ঘর। নোনাধরা দেওয়াল। ঘরের একমাত্র জানাল। দিয়ে একফালি রোদ মেঝের একপাশে চৌকো হয়ে পড়েছে।

কতগুলো মোটা চাহিদা ছাড়া এই ষাট বছরের জীবনে আদিত্য আর কিছু বোঝেনি। তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে এই মোটা চাহিদাগুলো কী ছিল, আজ আর জানা যায় না, কিন্তু এখন তার জীবনে মদ আর ঘোড়া ছাড়া আর কোনো বড়ো চাহিদা নেই। শুধু সূর্য্য একটা নতুন নেশার মতো তার এই ষাট বছরের ভাঙা নড়বড়ে শরীরটা চাক্ষু করে তোলে। এক ডজন সন্তানের বাপ সে। বড়টি বাড়ি ছেড়েছে অনেক দিন, নাকি বোম্বাইতে ভালো চাকরি করে। মার খোঁজ যদি বা করে, বাপের খোঁজ রাখে না কোনোদিন। মেজ স্ত্রী ঐষ্টান ধর্ম নিয়ে সিংহলে গিয়ে কোনো এক গির্জার কাদার হয়েছে। ধর্মত্যাগী কুসন্তান। তারপরে স্ত্রীত। বি-এ পাস করে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়ায়। একটা চাকরি জোটাবার মুরোদ নেই—এই তোর বিস্তে। আদিত্য দেখতে পারে না এই মেনিমুগো ছেলেটাকে। কথা কম কর। চোখ দুটো যেন গিলে খাবার জন্তে হাঁ হয়ে আছে। স্ত্রীতকে আদিত্য ঘৃণা করে, কিন্তু ভয়ও করে। এ সংসারে একেবারেই বেমানান। ওর চোখে মুখে কেমন যেন একটা চাপা তিরস্কার, কেমন যেন সব বুঝে-ফেলেছি বুঝে-ফেলেছি ভাব, কথা কম বলে, কিন্তু ওর ওই চাপা টোটে দুটোতে না-বলা কথাগুলোই যেন লটকে রাখে বড়ো হরকের পোস্টারের মত। যে শত্রুকে চেনা যায়, তার সঙ্গে যুদ্ধ সহজ। কিন্তু স্ত্রীতর মধ্যে এমন একটা দুঃস্বপ্ন দুর্ভেদ্যতা আছে, যাকে আদিত্য বুঝি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীতর ছোটটির নাম ছিল সুকুমার। গলায় দড়ি দিয়ে সংসারের ওপর শোধ নিয়েছে। অকালকুরাণ্ড—ভীক—কাপুরুষ—মৃত সুকুমারের উদ্দেশে গালগুলো উচ্চারণ করতে নিজেকে আদিত্যের কেমন যেন বোকা আর অসহায় মনে হয়। এ কালটাকে বোঝা যায় না, এরা কেন বাঁচে, কেন মরে। স্ত্রীত কেন কথা বলে না, সুকুমার কেন গলায় দড়ি দেয়। দুই মেয়ে নমিতা-সবিতা। পিঠোপিঠি কিন্তু ঠিক উন্টো স্বভাবের। নমিতা কর্কশ—রুচ—বেপরোয়া। সবিতা ঠাণ্ডা—নরম—মিনমিনে। নমিতা খাড' ইয়ারে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়েছে, সবিতা ফাস্ট' ইয়ারে। এদের পরে আর যে-কটা ছেলেমেয়ে আছে তাদের কোনো চরিত্র নেই, তারা আদিত্যের কাছে শুধু কতগুলো নাম, ছবি-রুবি-বেহু নস্তু আর সন্ত। আনিপুর আদালতের পেন্সন-পাওয়া নাজির আদিত্য

সব কিছুর মধ্যে কোনো এক অদৃশ শয়তানের বড়সন্ত্র খুঁজে পায়। বালিশের কোণটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরে আদিত্য বিড় বিড় করে গাল পাড়ে, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা।

নিজের গলার শব্দে সাহস বেড়ে যায় আদিত্যের। গাল পাড়তে ইচ্ছা করে সারা সংসারকে। এই ইচ্ছেটাকে আবিষ্কার করতে করতেই চিংকার করে উঠল আদিত্য, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শুয়োরের বাচ্চারা আমার বাড়ি থেকে।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আদিত্যর গলার শব্দটা কর্মচঞ্চল সংসারের ঠিক মাঝখানটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

আদিত্য যে রাগ করে শুয়োরের বাচ্চা বলে, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। জীবন-ধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা ছাড়া ওদের বেঁচে থাকাকাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এর ওপর আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে আছে সূর্য। এঁটো পাতের কুকুরের মতো দিদির গা কামড়ে পড়ে আছে। বাঁচতে হবে—বাঁচার এই আদিম ইচ্ছে ছাড়া এ পরিবারের এতগুলো মানুষকে বেঁচে থাকতে হত না নিশ্চয়ই। পেন্সন হিসাবে আদিত্য যা পায়, সেটা পুরোটাই যার রেসে এবং মদে। বোম্বাই থেকে বড় ছেলে সুবীর মার নামে লুকিয়ে টাকা পাঠায় অন্য ঠিকানার বন্ধু মারফৎ, কিন্তু সে টাকাও এত নয় যে এতগুলো মানুষের পেট ভরাতে পারে। অথচ কোনো না কোনো ভাবে সংসার চলছে ঠিকই। এ-মাসে সবিতার কলেজের মাইনে বাকি পড়লে ও-মাসে বাকি পড়ে ছবির স্কুলের মাইনে। স্কুলের মাইনে যদি বা মেটানো গেল নস্তুর ইজের নেই, বেরুতে পারে না। অত সব করে কে। বাপ তো জন্ম দিয়েই খালি। হেঁজি পেন্সির সাধ্য কি এত বড়ো সংসারকে কাঁধ দিয়ে ঠেলার। কথায় বলে না, ভাত দেবার ভাতার নয়, বউ ঠেঙানোর গোসাই।

ওঘর থেকে ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলার চিংকার শুনে উল্লুনের গনগনে আঁচের মতই জ্বলে উঠল নিরজা। বললে, মর্ মর্, তুই মলে হাতের শাঁখা নোয়া খুইয়ে হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বাঁচি।

সূর্য কলতলার ছিল। কাঠ হয়ে শুনল দিদির কথাগুলো।

ছবি ওপরের ঘরে সবে অ্যালজেব্রার ইকোয়েশনটা নিয়ে বসেছিল। বাপ-মার চিংকারে ওর সমস্ত অঙ্ক গুলিয়ে গেল, ওপর থেকেই গলা চড়িয়ে বললে, যা, তুমি ধামবে। ধামবে তুমি।

নমিতা স্নান সেরে ছাদে গিয়েছিল কাপড় মেলে দিতে। 'চুলের জল ঝাড়তে ঝাড়তে সে গাইছিল, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার; আর সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল। এমন সময় চিংকারগুলো তার কানে গেল। গানের কলিটাকে একপর্দা চড়িয়ে গাইতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে কর্কশ ধারালো গলায় বলে উঠল, বাবারে বাবা, নেমন্তন্ন বাড়িতে এঁটো পাত নিয়ে কুকুররাও এমন কেঁউ কেঁউ করে না।

ততক্ষণে সারা বাড়ি জুড়ে একটা কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। চিংকার করে আদিত্য বলতে থাকে—মরব না রে, মরব না। তোদের সব কটাকে চিত্তেয় না তুলে দিয়ে মরব না রে মরব না।

সবিতা ছিল চিলেকোঠায়, সূত্রতর ঘরে। সূত্রত সাতসকালে বেরিয়েছে টিউশনিতে। কখন ফেরে না ফেরে, এ বাড়িতে সে হিসেব রাখে না কেউ। কোনোদিন ফেরে, কোনোদিন হয়তো ফেরেই না। এ সংসারে সে এত কম কথা বলে যে, সে যে আছে এই কথাটাই মাঝে মাঝে সকলের মনে থাকে না। টেবিলের ওপর ছত্রাকারে ছড়িয়ে আছে বই। কাগজপত্র এলোমেলো, কোনটায় সূত্রতর হাতের লেখা দু-লাইন কবিতার অংশ, আবোলতাবোল সেই করা কাগজ এইসব। সিগারেটের টুকরো আর ছাই জমে জমে মেঝেটা একটা আস্তাকুঁড় হয়ে আছে। এঘরে কচিং কেউ আসে,—একমাত্র সবিতাই আসে নিয়মিত। বয়স প্রায় উনিশ হবে সবিতার। বয়সের তুলনায় রোগা, দেখে পনেরোর বেশি কিছুতেই মনে হয় না।

দাদার বই-এর টেবিল গুছোতে গুছোতে ভাবে, দাদাটা যেন কী। একটু যদি গোছানো হত। সবিতা জানে এ বাড়িতে দাদা যে পরবাসীর মত বাস করে, সে শুধু এ বাড়ির নোংরা পরিবেশের জন্তে। সবিতা ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, নেহাৎ খুঁকিটি নয়, সবই বোঝে। এ বাড়ির হাওয়াতে কেমন একটা চাপা কিস্ফিসানি। সহ্য হয় না সবিতার। কেন, কেন এমন হবে। কেন সবাই মন খুলে হাসবে না, কথা বলবে না, কলেজে যেমনটি হয়, তেমনটি।

সূত্রত কবিতা লেখে। লিখে বিছানার তলার অথবা বই-এর ভাঁজে ফেলে রাখে, কখনো বা ছিঁড়ে ফেলে। সবিতা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। দাদাভাই যেন কী একটা যন্ত্রণায় কাঁটা হয়ে আছে। কী সে যন্ত্রণা বোঝে না সবিতা। অনেকবার ভেবেছে, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু দাদাভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে কোনোদিন আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। রাঙাদা এই ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

সবিতার ভয় করে দাদাভাই-ও কি মনে মনে তেমনি ভয়ংকর কিছু একটা ফাঁদছে। নিচতলায় অনেকগুলো গলার অসম আওয়াজ। কোন্টা মার, কোন্টা বাবার, কোন্টা দিদির—নিভুল বলে দিতে পারে সবিতা। কিন্তু এসব সে শুনতে চায় না, শুনতে ভালো লাগে না। দাদাভাইএর মতো সে যদি পুরুষ মানুষ হত তবে সে ফিরতই না বাড়িতে। থাকতো বাইরে বাইরে। মরুক এরা ঝগড়া করে। সে জানে, এ বাড়ির কোনো কিছুই বদলাবে না। নিচের ঘর তিনখানা করে, একটা বাবার বসবার-শোবার ঘর, আর একটা ঘরে মা থাকেন—বেহু, নস্তু আর সন্তুকে নিয়ে। একতলার একটেরে ছোট্ট ঘরটায় সুবর্ণমাসী থাকেন। দোতলায় তিনখানা ঘর। একটা ঘরে থাকে নমিতা, সবিতা, ছবি, কুবি আর বেবি শোয়, মেঝেতে লম্বা বিছানা ফেলে পাশাপাশি ঘুমোয় ওরা। বেবির ক্রিমির দোষ আছে, ঘুমের মধ্যে ওর দাঁত কিড়মিড় করে। মাঝখানে চট্কা ঘুম ভেঙে গেলে অনেক দিন লক্ষ্য করেছে, দিদি ছটফট করেছে বিছানায়। সবিতা ঘুম জড়ানো গলায় বলে, কিরে দিদি ঘুমোসনি।

—না।

—কেন রে।

—এমনি।

—এমনি কেন রে।

নমিতা ধমক দিয়ে বলে, তুই ঘুমো তো। এত রাতে আর বকবক করতে হবে না।

সবিতা পাশ ফিরে শোয়, কিন্তু ঘুম আসে না অনেকক্ষণ।

চিলে কোঠার আলো জ্বলে পাশের দালানের এক ফালি জারগা আলো হয়ে থাকে। সে আলো দেখেই সবিতা টের পায়, দাদাভাই এখনো জেগে রয়েছে।

এ ঘরের পাশেই আর একখানা দেড়গজি ঘর আছে। সেটা শুধু কাপড় ছাড়া আর পড়া ছাড়া আর কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না; এত ছোট। তার ওপাশেই আর একখানা ঘর। বহুযুগ থেকে বন্ধ আছে। ভাঙা খাটের পাশা, পুরনো দিনের ছেঁড়া জাজিমের ডুলো, পাশা-ভাঙা আলমারি, ভাঙা শিনিবোতল, ভাঙা ট্রাক, ইজিচেয়ারের ফ্রেম—এইসব নানা আসবাবে ঠাসা। অব্যবহার্য পড়ে আছে বহুকাল, সুদূর যে বছর চাকরি পেয়ে বসে চলে যান,

সে বছর থেকেই ও ঘরের কড়ার একটা মরচে পড়া ভালা ঝুলছে। মানে মাঝে যখন ভ্যাপসা গন্ধ ওঠে ঘরের ভেতর থেকে, ভালা খোলা হয়। মরা ইঁদুরকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবার পর ও-ভালা যেমন ছিল তেমনি ভাবে ঝুলতে থাকে। আর খোলবার দরকার হয় না বহুকাল। এত যে শোবার কষ্ট, ওঘরটাকে মুক্ত করার কথা ভাবে না কেউ। সবিতা জানে এ বাড়ির কোনো কিছুই বদলানো যাবে না, যেমন আছে তেমনি চলে যাবে। আড়ালে আড়ালে শুধু বয়স বাড়বে। তারপর হয়তো মান্নরাতে তারও ঘুম পাবে না, ছবি বলবে, কিরে দিদি ঘুমোননি। রেগে উঠে জবাব দেবে সবিতা, তোর তাতে কি? বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই লজ্জায় মুখ লুকোতে হয়। সে জানে বিয়ে হবে না তাদের। যদি হত, দিদির এতদিনে হয়ে যেত। কে দেবে বিয়ে। বাবা?

কিন্তু তাই বলে, নমিতার মতো সব কিছুর ওপর তার আক্রোশ নেই। সে জানে, বেঁচে থাকতে হলে সব কিছু মানতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়, না হলে শুধু অশান্তি, নিজেরই অশান্তি। রাঙাদা গলায় দড়ি দিয়েছে; তাহলে তো সবাইকেই গলায় দড়ি দিয়ে বাঁচার পার্ট চুকিয়ে দিতে হয়। তা সে পারবে না। পড়ার টেবিল গুছিয়ে স্ত্রতর নোংরা বিছানাটাই যথাসম্ভব পার্ট করে রাখলো। খোলা দরজা দিতে একজোড়া চড়ুই পাখি হটোপুটি করতে করতে ঘরের মাঝখানে এসে পড়ল। সবিতা 'হুস্' করে উঠতেই ফুকৎ করে উড়ে গেল। কী ভালোই লাগে সবিতার। এই বিক্রী বাড়িটার মধ্যে বেঁচে থেকেও, সবিতা ভাবতে পারে, বেঁচে থাকাটা সত্যিই আনন্দের।

নিচ থেকে মার তীক্ষ্ণ কর্কশ গলার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি সে দরজার শেকল তুলে দিয়ে নিচে নেমে গেল।

● ● দুই ● ●

এবার ভালো হয়ে কি কি করবে, তার একটা খসড়া করে ফেলল অরুণ। কী আশ্চর্য, এতকাল একবারও মনে হয়নি, জীবনটা হেলাফেলার বস্তু নয়, অনেক কিছু করবার আছে। না-পড়া বইগুলো এবার পড়ে শেষ করে ফেলতেই হবে। না-লেখা কবিতাগুলোকে ওভাবে মরে যেতে দেওয়া হবে না। অসিতের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, উপলক্ষটা মনে নেই। কিন্তু ঝগড়াটা টিকে আছে। ওটাকে এবার মিটিয়ে ফেলতে হবে। চায়ের

দোকানের শ্রীনাথবাবু সাতটা টাকা পাবে, দেওয়া হয়ে ওঠেনি। অনিচ্ছায় নয়, অবহেলায়। এবার ধারটা চুকিয়ে দিয়ে তবে অন্য কথা। শুভেনের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনা উপন্যাসটা এবার একে ফিরিয়ে দিয়ে বলে আসতে হবে, বইটা মেরে দেবার মতো অমন অসৎ মতলব সত্যিই তার ছিল না। আর সুরমা, ভাবলে হাসি পায়, সুরমা কেন ভালবাসতে গেল তাকে। এইবার একদিন ভালো করে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে যে, সে শোফেনহাওয়ারের শিষ্য নয়, সে-সব নাটুকেপনা শুধু তার অভিনয়, সাবানের ফেনার মতো মিথ্যে আবেগের বুদবুদ তৈরি করে নিজেকেই ঠকানো। পাগলের মতো কী সব বলেছিল, সবটা মনেও নেই। কিন্তু মনে আছে, সুরমা কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। কথার দীপ্তিতে। কলেজে পড়া ঐ অতি সাধারণ মেয়ের চোখ খাঁধিয়ে দিয়ে লাভ কী হল তার। সুরমাকে সে অনেক বড়ো কথা বলেছে, কিন্তু সামান্য কথাটা তার অসামান্য কথার ভিড়ে বলতে ভুলেই গিয়েছিল যে, সে বিবাহিত। কেন বলেনি। না, সে জানতো যে সুরমার মতো মেয়েরা একটা বিবাহিত পুরুষের প্রেম চাইতেই পারে না। অনর্থক একটা কোতুকের অনিষ্টকর খেলার মতো সুরমার কতো বড়ো সর্বনাশ সে করতে যাচ্ছিল, ভাবতে গিয়ে অরুণ নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না।

নিজের অভিনীত চরিত্রকে অভিনেতা যে ভাবে দেখে, সেইভাবে সে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। অন্যের সঙ্গে তামাসা করছে ভেবে সঙের মতো নিজেকে সে তামাসা দেখিয়ে এসেছে এতকাল। একটা জটিল মানসিক রোগে ভুগতে ভুগতে সংক্রমণ ছড়িয়েছে, ভেবেছে জয় হল। পরীক্ষায় ভালো পাস করে, ভালো চাকরি পেয়ে, ভালো বিয়ে করে বেঁচে আছে যারা, ঠাট্টার ঘায়ে তাদের মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছে, সে অনেক বড়ো এদের চেয়ে। প্রেম তার কাছে ঠাট্টার বস্তু মেকী রোমান্স বলে (বলাই বাহুল্য, সুরমার সঙ্গে তার প্রেমের নিষিদ্ধ অধ্যায়গুলোতে এই কথাগুলোই ছিল তার পুঁজি), বন্ধু তার কাছে ব্যবসাদারী, রাজনীতি ক্ষমতার লড়াই, ধর্ম আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয়, মোট কথা—সারা দুনিয়ায় সত্যিকারের মহৎ বলে কিছু নেই, নগ্ন স্বার্থপরতার হৃদয় সুরতায় বাঁধা পৃথিবীতে নিজেকে সে বিদ্রোহী ভেবে তৃপ্তি পেত, কেননা তার বিশ্বাস, সে-ই একমাত্র মানুষ যে পারছে সব কিছুকে যথেষ্টভাবে ঘৃণা করতে।

মনে মনে অরুণ খসড়া করতে থাকে, আর এভাবে ক্ষয়ে যাওয়া নয়।

ভালো ভাবে তাকে বাঁচতেই হবে। যক্ষা নাকি রাজব্যাদি—হলে কেউ বাঁচে না। সে বাঁচবে না, এমন অসম্ভব একটা ভবিষ্যতের কথা অরুণ কল্পনাও করতে পারে না। সে বেঁচে থাকবে না, অথচ পৃথিবীর সবকিছু তেমনি চলবে, অসিত শুভেনেরা সাহিত্য নিয়ে তেমনি তর্কের তুফান তুলবে, কলকাতা শহরে ট্রাম চলবে, বাস চলবে, মানুষ হাসবে, ভালবাসবে—এ যেন একটা অসম্ভব মিথ্যা বলে মনে হয় তার।

নিজের মনে মনেই বাঁচা ও মরার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠল অরুণ।

আরতি এসে মাথার ধারের জানালাটা খুলে দিতেই অরুণ তাকে ডাকল। আরতি ধীরে ধীরে অরুণের বিছানার পাশটিতে এসে বসল। অরুণ বললে, জানো আরতি, এবার আমি কি ঠিক করেছি।

কী—

এবার ভালো হয়ে কলকাতা ছেড়ে কোনো গাঁয়ের ঘূলে মাস্টারি নিয়ে চলে যাবো। অনেক খোলা মেলা, অসুখের পক্ষে সে ভালোই হবে, কী বলো।

ভালোই তো।—

আরতির গলার মিথ্যে উৎসাহটুকু ধরতে না পেরে অরুণ বলতে থাকে,— তাছাড়া এখানে তোমারো শরীর টিকছে না, কোনদিন দেখব তুমিও রোগ বাধিয়ে বসে আছো।

অরুণ যে স্বার্থপর নয়, এমন একটা মরণাপন্ন অসুখে পড়েও সে-যে তার স্ত্রীর প্রতি যথা কর্তব্য করতে পারছে এই কথা ভেবে অরুণ মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করে।

মেয়েদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। সেট ইন্দ্রিয় দিয়েই আরতি স্বামীর এই তৃপ্তিটুকু ধরে ফেলে। তবু খুশি হবার ভান করে বলে, সত্যি, কী চমৎকারই হয় তাহলে।

আরতির হাতখানা আলতোভাবে বুকের ওপর তুলে নিয়ে অরুণ বলে, আচ্ছা আজ সুরতর টাকা দিয়ে যাবার কথা আছে না?

স্বামীর হাত থেকে নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু সুরতদার কাছ থেকে টাকা নিতে আমার ভারী লজ্জা করে।

কেন?

সুরতদা কি ভাবেন, বলো তো।

কী আর ভাবেন। বহু-স্ত্রীকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারছে ভেবে মনে মনে খুশিই হয় নিশ্চয়।

ছিঃ, তুমি কি—রাগ করে আরতি বিছানা ছেড়ে উঠে গেল।

হো হো করে হেসে উঠল অরুণ। হাসতে গিয়ে দমকা কাশিতে সিঁটিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। রক্তের গয়ার তুলে বিছানায় এলিয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আরতি একটু হাওয়া করো।

ভাঙা হাতপাখা দিয়ে অরুণকে হাওয়া করতে লাগলো আরতি। গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে অরুণের দেহ। কথা একটু কম বললেই তো ভালো থাকে, তবে এত কথা বলে কেন?

ব্যাপারটা নতুন নয়। কয়েক বছর ধরেই ভেতরে ভেতরে রোগটা অরুণকে ক্ষয় করে আনছিল। কিন্তু শয্যাশায়ী হবার আগের দিন পর্যন্ত অরুণ বিশ্বাস করে এসেছে অসুখটা সাময়িক, নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

কিন্তু সারেনি। বরঞ্চ বেড়েছে। ধীরে ধীরে তার সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য নিভে গেছে, শরীরের হাড় পাঁজরাগুলো চেষ্টা করলে গোন। যায় এখন। একটা সুখী সংসারই তো গড়তে চেয়েছিল আরতি। অনেক কিছু চাহিদা ছিল না তার। বাঁচবার মতো ভালো একটা বাসা, মনের মতো কিছু বইপত্র, আর দুবেলা সসম্মানে খেতে পাবার মতো কিছু টাকা। চেষ্টা করলে কোনো মফস্বল কলেজে প্রোফেসরি পেতে পারতো অরুণ। দুজনে মিলে মিশে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতো জীবনকে। বড়ো বড়ো স্বপ্ন আরতি কোনোদিন দেখেনি, দেখা তার স্বভাব নয়। অরুণ এমন একটা মানুষ যাকে ভালবাসা যায়, কিন্তু ভালবাসা পাওয়া যায় না। বিয়ের আগেও জানতো আরতি, যত উস্তাপ অরুণের কথায় তার সিকিভাগও নেই তার বুকে। অরুণ ভালবাসতে জানে না। ভালো বাসাতে জানে। ভেবেছিল বিয়ে হলে, সেবার ভালবাসায় ভরে দেবে মানুষটাকে। কিছুই হল না। বিয়ের পর আরো দূরে সরে গেল। অভ্যাসের পাকে স্বামী-স্ত্রীর জৈব সম্পর্ক ছাড়া সত্যিই কি আর কোনো সম্পর্ক ছিল তাদের? যতদিন বিয়ে হয়নি আরতিকেই সমস্ত কথা উজাড় করে দিয়েছে অরুণ। বিয়ের পর আরতির সম্পর্কে সমস্ত কৌতূহল তার কুরিয়ে গেছে। আরতি অবাক হয়ে ভাবে এমন কি করে হয়। বিয়ের আগে পর্যন্ত যাকে মনে হত আগ্নেয়গিরি, বিয়ের পর দেখা গেল সে শুধু ছাই। বিয়ে হলে মানুষ এত স্থূল হয়ে পড়ে কেন—এই কথাটা আরতি ভেবে পায় না।

স্বামী সম্পর্কে এষ্ট নগ্ন চিন্তাগুলোকে আরতি কদাচিৎ প্রশ্ন দিত। ঐ মরণাপন্ন লোকটিকে আরো বেশি করেই তো ভালবাসা উচিত। কিন্তু করুণা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই জানে না কেন, ভাবতে গিয়ে আরতি নিজেকেই নিজে বেয়া করতে থাকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসে ঘর অন্ধকার হয়ে গেলোও আরতি আলো জাললো না। কী হবে আলো জ্বলে। গত বছরের ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ছেঁড়া হয়নি, ক্যালেন্ডারের পাশেই ওদের যুগল ছবি—এটা যে অতীতকালের—ক্যালেন্ডারের না-ছেঁড়া পাতাগুলোই তার সাক্ষ্য। বই-এর র‍্যাকে এলোমেলো ছড়ানো বই, কী হবে গুছিয়ে। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি—থার্মোমিটার। মশারির দড়িটা দেওয়ালের কোণ থেকে একটা সরু সাপের মতো ঝুলছে। আলো জাললে এর বাইরে আর কি দেখবে সে।

জানালার ওপাশেই মাথা-উঁচু পাঁচিল। হাওয়াও আসে না, আলোও আসে না। আরতি ভাবে, সমস্ত জগতের মধ্যে বেছে বেছে এমন একটা অন্ধকূপের মধ্যে অরুণ তাকে কেন এনে ফেলেছে। একটু যদি নিশ্বাস নেওয়া যেত, তবে এমন ভয়ংকর বিজ্রী লাগতো না সব কিছুর, হয়তো ভালবাসা যেত অরুণকে। বাইরে ডাকাডাকি শুনে আরতি গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেবেশ, রমেন, সুভাষ আর শোভনা।

—কী ব্যাপার, বাড়িটা একবার অন্ধকার পুরী রেখেছেন?

ওদের পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে এল আরতি। আলো জালিয়ে বললে, বড্ডই কি অসুবিধা হল?

আরতির কথাটায় কেমন যেন একটু খোঁচা। দেবেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না, না, অসুবিধার কি আছে। তারপর প্রশ্ন বদলে বললে, অরুণ কেমন আছে? অরুণ বোধকরি জেগেই ছিল। চোখ মেলে বললে, ভালোই আছি দেবেশ। এতদিনে সময় হল তোদের।

কী একটা জবাবদিহি করতে যাচ্ছিল দেবেশ। আরতি হেসে বললে, আপনারা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।

ঘরে বসবার আসন মাত্র একটি। দেবেশ ইতস্ততঃ করতে থাকে। রমেন আর সুভাষ অরুণের তক্তপোশের পায়ের দিকে বসল। টেবিলের ওপর থেকে ওষুধের শিশি বোতলগুলো সরিয়ে দেবেশ টেবিলের ওপরেই বসল। শোভনা বসল চেয়ারে। আরতি অরুণের মাথার কাছে বসে বললে, চা খাবেন?

ঘরের অন্ন পাওয়াবের আলায় শোভনার মুখের এক দিকটায় ছায়া পড়েছে। সে শুধু চুপ করে রইল। আর তিনজনেই একসঙ্গে আপত্তি করে বললে, না।

—না? আরতি মুখ তুলে তাকাল, আপত্তি কিসের?

দেবেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না আপত্তি কিসের।

আরতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেবেশকে দেখে নিয়ে কথাটাকে আরো একটু ঠেলা দিয়ে এগিয়ে দিল।—এক পেয়লা চায়ে আর কি আপত্তি থাকতে পারে?

এই অসঙ্গত দীর্ঘ মুহূর্তটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে সুভাষ বললে, এই অসময়ে চা চেয়ে আপনাকে নেহাতই বিরক্ত করা।

—বিরক্ত? অরুণার চাপা চোটে কেমন একটা বিকী হাসি।

রমেন বললে, আনুন চা। তারপর বেশ জোর দিয়ে হাওয়াটা হাল্কা করে দেবার জন্তে বললে, আমি কিন্তু চিনি বেশি খাই।

আরতি বললে আপনারা বসুন, চায়ের জল চাপিয়ে এগুনি আসছি। শোভনার দিকে চোখ পড়তেই আরতির মনে হল, কিছুর কথা বলা হয়নি মেয়েটির সঙ্গে। বললে, কী ভাই, তুমি যে কিছু কথা বলছ না।

শোভনা দেবেশের বোন, অরুণের ছাত্রী। চেয়ারের ওপর নড়ে চড়ে বসে অক্ষুট স্বরে কী একটা বলল, ভালো শোনা গেল না।

আরতি বললে, বোসো ভাই, আমি এগুনি আসছি।

আরতি বেরিয়ে যেতেই ঘরের হাওয়াটা কেমন হাল্কা মনে হল।

অরুণ বললে, শুনলাম শৈলেশ নাকি বিয়ে করছে।

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ আবার কি। বিয়ে ও করতই। কেননা ওর মতে অবিবাহিত পুরুষের মতো এমন ভাল্গার জীব পৃথিবীতে আর নেই।:

শোভনা টেবিলের ওপর থেকে একটা পুরনো মাসিক পত্রিকার পাতা উন্টোতে লাগল।

অরুণ বললে, এস্থেটিক ম্যারেজ?

রমেন হেসে বললে, সেই ধরনের একটা কিছু ব্যাপার।

দেবেশ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চায়। শোভনার সামনে এ প্রসঙ্গ না ওঠাই ভালো। কেননা জানে, এ বিষয়ে অরুণের মতগুলো কত তীব্র। তার মনে প্রবৃত্তির কাছে হার মানা মানুষগুলির কুৎসিত সন্তোষ লিঙ্গা ছাড়া বিবাহের

আর কোনো মানে নেই। নিজে সে বিয়ে করেছে, কিন্তু বিবাহ সম্পর্কে মতগুলো তার একটুও নয় করেনি। শোভনার সামনে এ প্রসঙ্গ উঠলে শোভনা হয়তো মনে মনে ঘেরা করবে অরুণকে। তাই দেবেশ এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করল। বললে, শৈলেশ আসে না তোর কাছে?

—না।—একটু চুপ করে থেকে বললে, বরঞ্চ ওর না আসাই ভালো। আসলে আপিসের কেরানী হবার জন্তে ওর জন্ম। কী আছে ওর মধ্যে বল তো—

সুভাষই শৈলেশের সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্য সময় হলে, সে বলত, আসলে আমরা সবাই তাই, জীবন থেকে মার খেয়ে নিজেকে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করেছি। শৈলেশ আর যাই হোক, তার মধ্যে এই মিথ্যে ভাঁড়ামি নেই।

কিন্তু যেহেতু অরুণ অসুস্থ এবং আজ ওরা এসেছে অরুণের দ্বাস্থ্যের খোঁজ নিতেই শুধু, তাই চুপ করে রইল সুভাষ।

অরুণ নিজের চিন্তাটার সূত্র ধরে বলে, আমি ভেবেই পাঠি না, মানুষ কি করে বলে, আমি বেশ আছি, ভালো আছি। একালে বেশ থাকতে পারে একমাত্র তারাই, যারা স্থূল। কর্পোরেশনের ইঞ্জেকসন-দেওয়া ষাঁড়গুলোর কোনো প্রবলেশ নেই, কিন্তু তাকে কি আমরা সুখী বলি কেউ?

ঠিক এই সময় কাঁসার খালার ওপর কানভাঙা চায়ের পেয়ালা নিয়ে আরতি ঢুকল। খালাটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে চা দিল সবাইকে। তারপর হেসে বললে, দেবেশ ঠাকুরপো, ক-গজ কথা হল আপনাদের?

মানে?—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে ঠোট পুড়িয়ে ফেলল দেবেশ।

আরতির কথা বলার ধরনই ওই। কথাকে মাপে ও কাপড়-জামার মাপকাঠিতে, গজ হিসেবে। হেসে বললে, বুঝলেন না অসুখ হয়ে অবদি এই সব গুনছি। কথা দিয়ে যদি কাপড় তৈরি করা যেত, অ্যান্ডিনে তাহলে আমি মস্ত বড়ো মিলওলা হয়ে যেতুম।

একসঙ্গে হেসে উঠল দেবেশ, সুভাষ আর রমেন। শোভনারও পাতলা ঠোটে একটা হৃদয় হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

আপনিও কিন্তু চমৎকার কথা বলেন—বললে দেবেশ।

তাই নাকি—আরতি চোখ নাচিয়ে বললে, তাহলে ওঁর চাষে ফলন ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা অশ্লীল ইঙ্গিত আছে অনুমান করে অরুণ ছটফটিয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে পাশ ফিরে বললে, তোরা আজ আয় দেবেশ।

চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়েছে ওরা। এরই মধ্যে অরুণের এই কথায় ওরা একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। অসমাপ্ত চায়ের পেয়ালা রেখে দিয়ে উঠে যাওয়া যায় না, সেটা হবে চরম অভদ্রতা। অথচ অরুণের ও-কথার পর বসে থাকাটাও গ্লানিকর। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা নাটকীয় মোড় নেবার আগেই ওরা স্বস্তির নিশ্বাস নেবার সুযোগ পেল।

সুব্রত ?—একসঙ্গে সবাই আনন্দিত অভ্যর্থনা জানালো।

অরুণ পাশ ফিরে উজ্জ্বল চোখ মেলে বললে, এসো তাই এসো।

সুব্রত এসে বসল জানালার কাণিসে। রোগা পাতলা দোহারা গড়ন, উজ্জ্বল ফর্সা রঙ, খাঁড়ার মতো ধারালো নাক, চোখ দুটো মুখের তুলনায় বেশি আয়ত, রুক্ষ এলোমেলো কোঁকড়ানো চুল।

দেবেশ বললে, সুব্রতবাবুর সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হল।

রমেন হেসে বললে, সুব্রত তো ডুমুর ফুল। দেখা পাওয়াই ভার। কোথায় থাকো বলা তো ? লিখছ টিখছ আজকাল—

না—

কেন ?

লিখতে পারি না বলে।

সুভাষ হেসে বললে, সুব্রত কি আজকাল ব্রহ্মবোধে পৌঁছে গেছ নাকি ? লিখতে কে পারে বলা দেখি ? তাই বলে, চেষ্টা বন্ধ করতে হবে, এ কেমন কথা—

সুব্রত মূহু একটু হেসে বলল, তা ঠিক। কিন্তু মিথ্যে কথা লিখতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া লিখতেই হবে, এমন কি কথা আছে। আমি বিশ্বাস করি না লিখে কিছু হয়।

কিছু হয় না ?—সুভাষ চটে উঠে বলে, তবে লিখতে কেন ?

—দস্ত। ভাবতুম আমি যেমন জানি, এমনটি আর কেউ জানে না। দেখলুম, নিজের সম্পর্কে ওটা একটু মেকী বিশ্বাস।

শোভনার মুখের এক পাশ অন্ধকার। এই এত কথার মধ্যে শোভনা যেন নিজের চারপাশে একটা অদৃশ্য আবরণ টেনে বসে আছে। সুব্রত যেখানে বসেছিল সেখান থেকে শোভনার মুখের একটা দিক শুধু নজরে পড়ে।

দেবেশই আলাপ করিয়ে দিলে।—শোভনা, ইনি হচ্ছেন সুব্রতবাবু, আমাদের বন্ধু। সুব্রতর দিকে চেয়ে শোভনাকে দেখিয়ে বললে, আমার বোন— শোভনা।

দুজনে হাত তুলে নমস্কার করল।

শোভনার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখের দিকে সুরত চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। চিবুকের ভাঁজে, গলার রেখায় আলো অন্ধকারের বিচিত্র নক্সা, এই নোংরা কুৎসিত ঘরের মধ্যে মানায় না ওকে। পিঠের ওপর নক্সাকাটা বিছানি। একটা নরম পেলব ফুলের মিষ্টি গন্ধ যেন ওকে জুড়ে। পৃথিবী যদি এত নোংরা তবে মানুষ এত সুন্দর হয় কি করে। ওর শুদ্ধতা যেন পবিত্র শুদ্ধতার মতো সুরতর মন ভরে দিল। অরুণের জরতপ্ত মুখ, আরতি-দেবেশ-সুভাষ-রমেন এদের একান্ত সান্নিধ্য সঙ্কেত সুরতর মনে হল, তার এই মুহূর্তের অনুভূতি ওরা কেউ কোনোদিন বুঝবে না।

পুরনো কথার জের টেনে রমেন বললে, লিখে বড়ো কিছু হয় না, সে কথা সত্যি। একালে আর গল্প কবিতা লিখে বড়ো রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভব নয়, কেননা একালের সব থেকে বড়ো ট্রাজেডি, অনুভবের মৃত্যু। মানুষ অনুভব করতে ভুলে গেছে।

সুরত কোন কথা না বলে, অন্ধকার জানালা দিয়ে বাইরের ইঁট-বার করা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের মধ্যে তখন এলোমেলো ঝড়। এতদিনকার চেনা জগতের বাইরে সে যেন কোনো অচেনা গ্রহে চলে গেছে। যেখানে ফুল আলো লতা পাতা প্রভৃতি এবং শুদ্ধতা। যেন বহু দূর থেকে এদের কথা শুনছে, এমনি এক নিঃসঙ্গ দূরত্বে ডুবে গিয়ে সে নিজের মধ্যে একটা বিস্থিত জগৎ খুঁজে পায়। তাদের সেই দীনেজ স্ট্রীটের বাড়ি, তার বাপ, মা, সুবর্ণ মাসী—এরা, এরা সবাই একটা কিস্তিকিমাকার অন্ধকারের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে। যদি না ঐ মুহূর্তে ঐ রক্তমাংসের বিচিত্র মানবীকে সে দেখতে পেতো, তবে সে-ও ঐ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে ডুবে মরে যেত।

কথায় কথায় রাত বাড়ে। কোসো কথাই সুরতর কানে যায় না। তার কানে সেতারের তরল স্রোতের ঘূর্ণী। সেখানে কথা পৌঁছায় না, শব্দ পৌঁছায় না। সুন্দর। সুন্দর তার মন ভরে গেল। বুক ভরে গেল বিচিত্র অনুভূতিতে। অনুভূতির মৃত্যু। ভুল কথা। অনুভূতি মরে না। বুকের মধ্যে রূপকথার রাজকন্তার মতো সে ঘুমিয়ে আছে। সোনারকাঠি হারিয়ে ফেলে আমরা সেই ঘুমন্ত অস্তিত্বকে মৃত মনে করে সোরগোল তুলছি।

সুন্দর। সুন্দর। সমস্ত বুক ভরে সুরত নিশ্বাস নেয়।

দেবেশ হাতঘড়ি দেখে বললে, এবার উঠি, অরুণ। আসবো আবার।

অরুণ বললে, আসিস ভাই। তোরা এলে তবু কথা করে হাঁক ছেড়ে বাঁচি। এই বিছানায় পড়ে পড়ে আমার পিঠ ককিয়ে ওঠে। তোরা আসিস—নিশ্চয়ই আসিস।

দেবেশ সূত্রতকে বললে, আসবেন আমাদের বাড়ি। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাছাড়া আমরা একটা সংস্কৃতি-চক্র গড়েছি। মাঝে মাঝে এলেই তো পারেন।—পকেট থেকে নোটবুক বার করে খসখস করে ঠিকানা লিখে দিল দেবেশ। বললে, কবে আসবেন—

সুভাষ হেসে উঠল।—সূত্রতর কথা, ও ছেড়ে দাও। কন্ঠিনকালেও যাবে না, দেখে রেখো।

সূত্রত যেন ঘোর ভেঙে জেগে উঠল। ঠিকানাটা নিয়ে বললে, শিগ্গিরই যাবো একদিন, দেবেশবাবু।

ওরা চলে গেল।

অরুণ ক্লান্ত হয়েছিল। বললে, আলোটা নিভিয়ে দাও, আরতি।

সূত্রতকে আরতি বললে, কথা আছে, ওঘরে চলো। আলো নিভিয়ে সূত্রত আর আরতি পাশের দরে গেল।

—টাকা এনেছ?

—না। পাইনি।

—পাওনি—আরতি যেন আর্তনাদ করে উঠল। তবে?

—টিউশনির টাকা পেলাম না আজ। কী করব।

—কোনোভাবেই পারলে না টাকা জোগাড় করতে? ধার করে, দেনা করে?

না—তিক্তকণ্ঠে সূত্রত বলে, ধার কেউ দেবে না।

সূত্রত বোঝে আরতির প্রয়োজন। টাকা চাই—কেননা বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে ঐ রোগপাণ্ডুর মানুষটাকে? নিজের সংসারেও সূত্রত সেই একই কথা শুনে আসছে। আরতির দাবিও সে দাবির থেকে কিছুমাত্র কম হিংস্র নয়। সংসারের দাবি সে ঠেকাতে পারে, কিন্তু আরতির দাবি ঠেকাতে পারে না। আরতি সম্মোহন জানে। অজগরের মতো তার সমস্ত স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করে বসে আছে আরতি। আজ আর উপায় নেই, সেই কুহকের জাল ছিঁড়ে ফেলে জানানো—আমি পারবো না।

আরতি এগিয়ে সূত্রতর কাঁধ দুটো চেপে ধরে উদ্বেগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, সত্যি পারবে না টাকা জোগাড় করতে?

সুত্রত চেয়ে দেখল আরতির দিকে। চোখের তারা দুটো উত্তেজনায় কাঁপছে, ঘোমটা খসে পড়েছে, খোঁপা ভেঙে এলিয়ে পড়েছে পিঠে। আরতির সীমস্তুর স্মৃতি সিঁহরের রেখা জলজল করে জলতে থাকে।—সত্যি পারবে না?

স্বয়ং নয় ফিসফিসানি। নিজের হাতে তৈরি প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড দেখলে মনের যে অবস্থা হয়, আরতির মনেও তেমনি সর্বনাশের অগ্নিকাণ্ড দেখে আতকে উঠল। বাঁচার প্রয়োজনে সামান্য বিড়ালটা পর্যন্ত খাবা উঁচোয়, আর আরতি কি কিছুই করবে না।

সুত্রতকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে হিঁস্টরিয়া রোগীর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে আরতি বলল, পারতেই হবে তোমাকে।

সুত্রতও জানে পারতেই হবে। আরতি নিপুণ হাতে যে জাল তৈরি করেছে, সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। নিজের ব্যক্তিত্বহীনতার গ্লানি ঝাঁচায় পোরা পশুর মতো ওকে ছিঁড়তে থাকে।

কোনো কথা বলতে পারল না সুত্রত। ঠাণ্ডা গলায় বললে, ভয় নেই আরতি। টাকা ভূমি পাবে।

এই একটি কথায় আরতির মুখের বাকালো পেশীগুলো সহজ হয়ে এল। মাথার ওপর ঘোমটা তুলে দিয়ে বললে, নদী পেরিয়ে নৌকোকে পা দিয়ে ঠেলে দেওয়াই পুরুষদের ধর্ম। তাই ভয় হয়।

—না ভয় নেই। তেতো গলায় বললে সুত্রত। দুজনে মিলে আমরা না অন্ডায় করেছি, তার জন্তে শুধু একা ভূমি সাজা পাবে কেন?

অন্ডায়?—আরতি মুখ তোলে।

অন্ডায় নয়?—ঠোট কাঁপিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে সুত্রত চূপ করে গেল, পাশের ঘরে অরুণ হয়তো আছে, হয়তো শুনতে পাচ্ছে। তাকিয়ে দেখল, আরতির পাঁজুটে মুখ, সাপের মতো মসৃণ শরীর। কী ছিল এ শরীরে যে নেশার সে মাতাল হয়ে ছিল! প্রেম—ছিঃ, ঘেম্মায় সুত্রত শিউরে উঠল। একেই কি বলে প্রেম। ব্যভিচারকে প্রেম বলে আরতি নিজেকে ঠকাতে চায় ঠকাকু কিন্তু সে জানে, সে একটা নরকের কীট। অরুণের কথাগুলোও তার জীবনে এমন করে সত্যি হয়ে উঠল! অরুণ না তার বন্ধু। সে-ও কি অরুণের মতো বিশ্বাস করে বন্ধু শুধু ব্যবসাদারী, প্রেম শুধু ঘোঁসলিপ্সা! কিছুদিন আগে পর্যন্তও সে বিশ্বাস করত। আরতিকে সে ভালবাসত। বিশ্বাস করত, গৃহপালিত মানুষের চোখে অসমত ঠেকলেও তাদের মিলনে

কাকি ছিল না। প্রেমহীন বিবাহ-বন্ধনকে আরতি ঘৃণা করে তাকে যে ভালবেসেছে, এই ভেবে স্ত্রতর গোপন মনে গর্ব ছিল। রুগ্ন বন্ধুর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছে—ভেবেছিল, অন্ডায় সমাজবন্ধনের বিরুদ্ধে এটা তার বিদ্রোহ।

সময় হলে সমস্ত পৃথিবীকেও জানাতে স্ত্রতর লজ্জা ছিল না যে, আরতিকে সে ভালবাসে। সমাজের চেয়ে ব্যক্তি বড়ো, বড়ো তার হৃদয়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সমাজনীতির অনুশাসনকে জীবন নীতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে আরতির প্রেমকে সে মহৎ মূল্য দিয়েছিল। মনের সেই কাকা অহংকারগুলো দিনে দিনে মেকী বলে প্রমাণ হয়ে গেছে নিজের কাছে। আরতি তার কাছে এখন আর মানসী নয়, একটা শরীর মাত্র, মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত রক্ত মাংস মজ্জা কংকাল ও শিরা-উপশিরায় একটা জ্যামিতিক অবস্থান মাত্র।

কেন এমন হল, ভাবতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে স্ত্রতর। নিজের শরীরে পূর্ব-পুরুষের পাপরক্তের কল্লোল শুনতে পায় সে। সেদিন মাঝরাতে স্ত্রতর মাসীর সামনে মাতাল আদিত্য, আর আরতির মুখোমুখি দাঁড়ানো একালের স্ত্রতর মধ্যে তফাৎ নেই কিছু, অতীতের পাপ রক্তে শুধু পুঁজ আর ঘা। এ থেকে কি পরিভ্রাণ নেই তার। নাকি আরতিকে বলবে, পদস্থলনের স্থায়ী নরকে আর নয়, চলো আমরা শুকতায় স্নান করে পবিত্র হই। আরতি বুঝবে না তার কথা, ভাববে নদী পারানি নৌকোর মত তাকে ভাসিয়ে দেবার মতলব স্ত্রতর। অন্যায় বোধ আর পাপবোধের গ্রানি নিয়ে চিরকাল তাকে দাসত্ব করতে হবে আরতির নগ্ন ইচ্ছাগুলোর কাছে। মনে হয়, সে চিৎকার করে বলে, অন্ডায়—অন্ডায়। একশোবার অন্ডায়। অক্লণকে তার বিছানা থেকে তুলে বীভৎস সত্যটা জানিয়ে দিক, এই—এই তোমার বন্ধু, আর এই—এই তোমার পত্নী। মনে হয় আরতির নিপুণ হাতে শিকার হয়ে জীবন ফুরিয়ে দেওয়ার চেয়ে অনেক ভালো, নিজের হাতেই নিজের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা। জাহ্নক ওরা, স্ত্রতর একটা লম্পট।

কিন্তু এই বিদ্রোহগুলিকে রূপ দেবার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে স্ত্রতর। নিজের যে কত দুর্বল, এত ভালো করে বোঝেনি কখনো।

আরতি স্ত্রতর কপালে হাত রেখে বললে, তোমার কি অসুখ করেছে, স্ত্রতর ?

না।—সত্যিই তো, শরীরে তার অসুখ নেই। অসুখ তার মনের।

নিজের অতীতের কথা মনে করে ঘেরায় শিউরে ওঠে। তার বাল্য নেই, তার কৈশোর নেই, তার যৌবন নেই। ক্রেদান্ত নরকের পাঁকে কে যেন তাকে পুঁতে

রেখেছে। মনে পড়ে হারীনদার কথা। পাড়ার জিমচাফি স্টক ক্লাবের লিডার। একদিন ডেকে গিয়ে তাকে চপ খাওয়ালে। তারপর—তারপরের কথা ভাবতে আজও স্মৃত্তর কপালের শিরাগুলি কেঁপে ওঠে। প্যাণ্টের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে যখন সে ফিরে এল, সমস্ত জীবন তার কাছে বিস্মাদ হয়ে গেছে। সেদিনও তার ইচ্ছে হয়েছিল, চিৎকার করে বলতে, হারীনদা তুমি এই? হারীনদা হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, খবদার একটা কথা যদি আউট হয়। গলার পা দিয়ে খতম করে দেব। সেদিন ভয়ে চপ করে থাকেনি সে, চপ করে ছিল অপরাধবোধের গ্লানিতে। আর আজ, আজও সে বলতে পারতো, আরতি, তুমি এই? কিন্তু আজও সে চপ করে গেল, সেই একই অপরাধবোধের গ্লানিতে। উপায় নেই, নিজের জালেই সে আটকে পড়েছে, কেউ বুঝবে না তাকে, প্রেম মানে কি পর-স্ত্রীর সঙ্গে এই?

আরতি তার মুখের কাছে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে বললে, ছিঃ, লক্ষ্মীটি অমন পাগলামি করে শরীর ধারাপ কোরো না। দেখো তো একজন শরীর ধারাপ করে আমাকে কত ভোগাচ্ছে।

আরতির অন্ত্রটি স্পর্শটাকে দু-হাত দিয়ে রগড়ে মুছে ফেলা যায় না, স্মৃত্তর হাত-পা অসাড় হিম হয়ে আসে। বলে, কাল আসবো। টাকা পাবে। আজ যাই।

আরতি স্মৃত্তর হাতের ওপর একটা অর্থপূর্ণ চাপ দিয়ে বললে, এসো কিন্তু।

স্মৃত্তর চলে গেলে আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আরতি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বুক ঠেলে ওঠা কেমন একটা কান্না পায় তার, অকারণেই। মনে হয়, স্বার্থপর, এরা সবাই স্বার্থপর। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উদ্গত কান্নাটাকে রোধ করতে করতে আরতি ভাবে, এতবড় সংসারে সে এই অন্ধকারের মতো নিঃসঙ্গ—একা একেবারেই একা।

● ● তিন ● ●

ঠিকানা মিলিয়ে দেবেশের বাড়ি বার করে নিতে একটুও অসুবিধে হয়নি স্মৃত্তর। কলিংবেল টিপে এক মিনিটও দাঁড়াতে হয়নি। দেবেশ নিজেই এসে ওপরে নিয়ে গেল। কার্ঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে অনেকগুলি কঠের সম্মিলিত হাসির হুল্লোড় শুনেই স্মৃত্তর বুঝলে এদের সাংস্কৃতিক বৈঠক বেশ জমজমাট।

দেবেশের বাড়ি ছুটো কারণে আসতে হয়েছে স্ত্রীতাকে। এক নম্বর কারণ, দেবেশের আন্তরিক আমন্ত্রণ, দু-নম্বর কারণ, দেবেশের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা ধার পাওয়ার আশায়। অবশ্য এ-ছুটো কারণের কোনোটাই যে আসল কারণ নয়, স্ত্রীত নিজের মনের মধ্যে হাতড়ে দেখলে নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারতো। যেহেতু সে কবিতা লিখত, এবং তার বন্ধুরা তাকে প্রায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল যে সে ভালোই লেখে, সেই হেতু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক আলোচনার ঘরোয়া আসরে মাঝে মাঝে সে ঢালাও আমন্ত্রণ নিশ্চয়ই পেয়ে থাকে। কিন্তু এসব আমন্ত্রণে সে কচিৎ সাড়া দিত; একে তো আলোচনার নামে বড়ো বড়ো কথার ঝুঁসুতে সে ক্রান্ত বোধ করে, তার ওপর অনেক মানুষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেই নিজেকে তার অদ্ভুত করুণ আর বেমানান মনে হত। অনেকের মধ্যে গেলে হীনম্রত্যায় ভুগতে হয় বলেই, একলা থাকাই তার পছন্দ, অন্ততঃ ভিড়ের মধ্যে থাকলেও যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন থাকতেই সে ভালবাসে। অতএব এক্ষেত্রে দেবেশের আমন্ত্রণের অজুহাত নেহাৎই মনকে চোখ ঠারা। দ্বিতীয় কারণ টাকা। এটা অবশ্য সত্যি সত্যি জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু দেবেশের সঙ্গে তার পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠতা পায়নি, যাতে সে টাকা চাইতে পারে তার কাছ থেকে। টাকা পাওয়ার একটা সম্ভাব্য উৎস হিসাবে দেবেশের নাম মনে পড়ামাত্র উৎসাহিত হয়ে চিন্তাটাকে অনেকখানি হাল্কা করে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছিল যে টাকা জোগাড় করার সমস্তাটা মিটে গেছে। অন্ততঃ এজন্তে তাকে তার আংটি বঁধা দিতে হবে না। শেষ পর্যন্ত সংকোচ কাটিয়ে দেবেশের কাছে টাকা চাওয়া কতদূর সম্ভব হবে, এসবক্কে স্ত্রীতরও সন্দেহ ছিল প্রচুর। কিন্তু তবু ঠিকানা খুঁজে দেবেশের বাড়ি পর্যন্ত আসার উৎসাহের পেছনে প্রেরণার অভাব বোধ করেনি। খুব স্পষ্ট নয়, আবছা কুয়াশা ধূসর মনের পটভূমির ওপারে একটা বিষন্ন আলোছায়ার নক্সাকাটা যুগ্মের অস্তিত্ব ক্রমাগত তাকে টানছিল। এবং এই টানটাকে অস্বীকার করতে চাওয়ার পৌরুষেই সে প্রায় বিশ্বাস করছিল যে, দেবেশের আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করা অত্যাশ্চর্য অভদ্রতা হবে এবং কিছু টাকা মুখ ফুটে চাইলে দেবেশের কাছে হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

ঘরে ঢুকেই স্ত্রীত অনাবশ্যক সংকুচিত হয়ে গেল। পরিচিতের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধপরিচিতরাও গলা মিলিয়ে সম্বন্ধনা জানাল, এবং অপরিচিতরাও এতক্ষণকার প্রবহমান আলোচনার হাওয়ায় সংক্ষিপ্ত করে মারপথেই খেমে গেল।

সুত্রতর মনে হল, এবং অকারণেই মনে হল, একটা হাসির রোলার তাকে পিবে ফেলবার জন্তে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়েছে মাত্র। আর তারপর—
কিন্তু তার আগেই দেবেশ আলাপ করিয়ে দিল একে একে সকলের সঙ্গেই।

ইনি শক্তি সেন। কবি এবং প্রাবন্ধিক।—ইয়া সুত্রত একে চেনে। সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু বিভিন্ন সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা মারফৎ একান্ত বিখ্যাত এই ভদ্রলোককে সুত্রত বহুকাল থেকেই চিনে আসছে। শক্তিবাবু মার্জিত মুখের ভাবময় চোখদুটো শুধু তুললেন, হাতদুটো সামান্য একটু তুলে পরিচয় সাক্ষ করলেন।

সুত্রত মনে মনেই ভাবলো, দেবেশের বাড়িতে তবে স্বনামধন্যদের আড্ডা। দেবেশের ক্ষমতা আছে বলতে হবে।

পরিচয় পর্ব সমাধা হলে সুত্রত দেখল উপস্থিতদের তালিকার অন্ততঃ পক্ষে তিনজুত অতিবিখ্যাত, দুজন স্বল্পবিখ্যাত এবং একজন অখ্যাতর সঙ্গে তার নতুন পরিচয় হল। মহিলাদের মধ্যে এক শোভনা ছাড়া সকলের সঙ্গেই নমস্কার বিনিময় করতে হল, কেননা সবার কাছেই সুত্রত অপরিচিত। দেবেশ অবশ্য পরিচয়ের সময় বেশ জোর দিয়েই বলল, কবি সুত্রত—নিশ্চয়ই পড়েছেন কবিতা। কিন্তু সবাই যেভাবে মুখ করে তাকালো তাতে সুত্রত প্রায় ঘেঁমে উঠল। না, সে কবি নয়। কিন্তু ঐটুকু শোনা কথা দেবেশকে ব্যবহার করতে হয়েছিল, না হলে এসভায় তার প্রবেশাধিকারই থাকতো না হয়তো। সুত্রত লক্ষ্য করছিল, সে কবি এই কথায় প্রত্যেকটা মুখের ভদ্রস্থিত হাসির অন্তরালে ব্যঙ্গের ঠোঁট ঝাঁকানো ভঙ্গি কেমন করে উঁচিয়ে উঠছিল। অথচ উপস্থিত বুদ্ধির অভাবেই বুদ্ধি সে তবু একটা ক্লাউনের মতো ব্যবহার করে গেল, হাত তুলে তুলে প্রত্যেকের সঙ্গে মুখে একটা কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে পরিচয়ের দেনা পাওনা মেটালো। এ-ঘটনার অনেক দিন পর পূর্ণস্তুও এই পরিচয় পর্বের অগ্নিপরীক্ষায় নিজের হাশুকর চেহারাটা মনে করে সুত্রতর হাসি পেত।

আলাপ পরিচয় সাক্ষ হবার পর ওদের পুরনো আলোচনাই আবার শুরু হয়ে গেল।

ঘরে সবস্বন্ধ বোলজন পুরুষ, ছ-জন মহিলা। মহিলাষষ্ঠকের মধ্যে দুজন, অর্থাৎ শক্তি সেনের স্ত্রী অমিতা সেন এবং শাস্ত্রু রায়ের স্ত্রী মুক্তি রায়, বিবাহিতা।

মস্তুলঘরের সমস্ত মেঝে জুড়ে বড়ো সতরঞ্চ বিছানো, তার ওপরে বসেছে সবাই। ঘরের নিওন আলোর সঙ্গে সিগারেটের পিঙ্কল ধোঁয়া মিলিয়ে বর্ণ-

বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। ডিস্টেম্পার করা কচি কলাপাতরঙ দেয়াল, দু'পাশে জোড়া জানালা, জানালায় নীল পর্দা। এক পাশে ঘরের জায়গা বাড়ানোর জন্তে সোফাগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে, টেবিল চেয়ারগুলি স্থানান্তরিত বাইরের ঝুল বারান্দায়। দরজায় ভারী কাশ্মিরী পর্দা। এবং সমস্ত ঘরে মাত্র একটি ছবি, সেটি রবীন্দ্রনাথের। বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বহুপরিচিত ছবিগুলির মধ্যে এই ছবিটাই সব থেকে কম চোখে পড়ে। সতরঞ্চের মধ্যখানে, যদিও স্ত্রতর চোখে ব্যাপারটা নেহাৎই বেমানান ঠেকল, একটা বড়ো ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ডাঁটি দাঁড় করানো! এছাড়া চিনেমাটির অ্যাশট্রে তিন সেট, উদগ্র-সুধা গরুড়ের হাঁ-এর ভেতর ছাই ফেলার গছবর।

মাথার ওপর স্তিমিতগতি ক্যান।

এতক্ষণে বোঝা গেল এদের হাসির টার্গেট ছিল জ্যোতির্ময়। নামের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের চেহারা একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। কালো, বারবেল করা পেটানো শরীর, কুস্তিগিরের মতো খোঁচা খোঁচা চুল, খ্যাবড়া নাক এবং ঐ নাকের নিচে নস্যির দাগের মতো এক চিলতে অসমান গোঁফ। সম্মিলিত হাসির পরও ওর বক্তব্যের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকুকে উড়িয়ে দেবার জন্তে শাস্ত্রু বললে, আপনার ঘোঁষ কাব্যের কারখানার প্রডাকশন ইনচার্জ থাকবেন তো আপনারা অর্থাৎ আপনার মতো রাজনীতিজ্ঞরা। চমৎকার প্র্যান!

আবার একটা হাসির হল্লা উঠল।

রীতিমতো চটে গিয়ে বাইসেপ ফুলিয়ে জ্যোতির্ময় বললে, হাসবেন না, এটা হাসির কথা নয়। জনসাধারণের সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগ নেই বলেই, জনসাধারণকে ঠাট্টা করতে আপনাদের বিবেকে বাধে না। ঘরে বসে দুপাচ্য আর দুপাঠ্য কতগুলো ভাবনার উদগার তুলে আপনারা নিজেদের দেশের কালচারাল ভ্যানগার্ড ভেবে বসে আছেন, অথচ একটু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, আপনারা কিচ্ছ না, একেবারেই কিচ্ছ না।

রীতিমতো ধারালো হয়ে উঠলো শাস্ত্রুর ভুরু। সাম্পু করা চুলের ভেতরে অসহিষ্ণু ভাবে আঙুল চালিয়ে উত্তেজিত হয়ে শাস্ত্রু বললে, জনসাধারণ? আপনার ঐ ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মাঠে যারা ভিড় করে, ঐ বোম্বাই সিনেমার কিউ-এ যাদের দেখতে পাঠি, তাদের জন্তে পপুলার কবিতা লিখতে হবে? জনবোধ্যতার নামে শিল্পীর ওপর আপনারা যে ট্যাবু চাপাতে চাইছেন তার মানে কী হয় জানেন, সংস্কৃতির অপমৃত্যু।

রণেন দত্ত তার সাহেবী পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইংরাজিতে যোগ করলেন, এণ্ড ইয়োর জনসাধারণ মিন্স্‌ ইডিয়সি প্লাস ল্যুনাসি।

বরক-চাপা মাছের মতো গিইয়ে ছিলেন অনাদিবাবু—কিছু বলতে না পারার অস্বস্তিতে। এতক্ষণে তাঁর মনে হল, কিছু বলা যায়। বললেন, কিন্তু—বলে দম নিলেন খানিকটা, খুব আস্তে এবং অনেকটা সময় নিয়ে এক একটা বাক্য প্রায় মনে মনে রচনা করে নিয়ে বলতে হয় বলে সাধারণতঃ তাঁকে বেশি কথা বলার সুযোগ দেয় না কেউ,—কিন্তু, কবিতা, কিংবা সাহিত্য—সাহিত্যই বা বলি কেন—ধরা যাক ‘আর্ট’—সব আর্টই কি চায়, যদি ধরা যায়, আর্টের কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে—তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে—

এটুকু বলতে প্রায় পুরো একমিনিট সময় লাগলো। কিংবা দু-মিনিট। এই দীর্ঘসূত্রী বক্তার বক্তব্য শুনতে গিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার কাছটিতে এসে সকলেই প্রায় অর্ধৈর্ষ হয়ে উঠছিল। বোধকরি সেইটে বুঝতে পেরেই, কিংবা না পেরেই অনাদিবাবু হঠাৎ বাক্যবন্ধ শেষ করলেন, কী জানি—আমার তো মনে হয়—

শক্তিবাবু, নিতান্ত বিখ্যাত বলেই, কম কথা বলেন এবং যা বলেন, ভেবে এবং অত্যন্ত ভাবাবার জগেই বলেন। তিনি গোল্ড ফ্রেকের প্যাকেট থেকে আলতো একটা সিগারেট তুলে নিয়ে দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আপনাদের দু-পক্ষেরই ভুল হচ্ছে। জনসাধারণ দেবতাও নয়—দানবও নয়। পারী বা মঙ্কাওতে কী হয় (বিদেশী শব্দের বিস্তৃত উচ্চারণ ব্যাপারে শক্তিবাবুর গোঁড়ামি আছে), সেদিকে তাকিয়ে এদেশের বিচার সম্ভব নয়। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্যাটার্নটাই এমন অদ্ভুত যে মানুষকে তা সত্যিকারের শিক্ষা দেয় না, দেয় শিক্ষার অহংকার। সভার কারু কারু সন্দেহ হল বোধকরি রণেন দত্তকে ইঙ্গিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে শক্তিবাবু বললেন, কলোনিয়াল ভারতবর্ষের সব থেকে বড়ো বিপদ এই, ইংরেজ শাসন শতাব্দীকাল ধরে আমাদের যা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কেড়ে নিয়েছে। চর্চা, বৈষ্ণবগীতি আর কবিরাজদের যুগ থেকে আমরা একেবারে সরাসরি উনিশ শতকের কড়া আলোর মধ্যে এসে পড়লাম। অথচ এদেশে রেনেসাঁও হল না। হল না, তার কারণ খুঁজতে হবে আমাদের দেশের কলোনিয়াল পাটানের ভেতর। একটা উদ্ভট কালচার তৈরি হল। এর নাম দিলাম আমরা মধ্যবিস্তৃত কালচার। আজকের দিনের এই একান্ত এলোমেলো অস্তিত্বের ভাঙনগুলো আসলে আমাদের দেশের ঐ উনিশশতকীয় বৈটে রেনেসাঁর ফল। এমন কি রবীন্দ্রনাথও

শিক্ষিতের রবীন্দ্রনাথ—জনসাধারণের রবীন্দ্রনাথ নয়। অথচ বিশ শতকে শিক্ষিতের চোখের সামনে সারা পৃথিবীর দরজা খুলে গেছে। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে কৃপমণ্ডকের মতো অশিক্ষিত জনসাধারণের জগৎ শিল্প সৃষ্টির উৎসাহ নেই, অথচ যে শিল্পের শিকড় দেশের মাটিতে নয়, তা মরা শিকড় হতে বাধ্য। এই কারণেই, আমার মনে হয়, জনসাধারণ শিল্পীর সৃষ্টিকে গ্রহণ করল কি করল না, এটা যেমন শিল্পবিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি হবে না, তেমনি শুধুমাত্র এলিয়ট অডেন পাউণ্ড বা বদলেয়ার (নামটির তিনি যে বিশিষ্ট উচ্চারণ করেন, বাংলা শব্দে তাকে রূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব) সাত্রে, র'্যাবো, কামু পড়া মন নিয়ে পরগাছা শিল্পচর্চা করে বড়ো কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সব থেকে বড়ো কণ্ট্রাডিকশন, এইখানেই।

স্বভাবতঃ স্বল্পবাক শক্তিবাবু স্বভাববিরোধী দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চূপ করলেন। তারপর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গরুড়ের মুখের মধ্যে কাঠিটা ফেলে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়ালেন।

হরিহর আচার্য অধ্যাপক এবং পণ্ডিত বলে নিজের শিষ্যমহলে সুনাম আছে। উপযুক্ত প্রতিবন্দীর অভাবে এতক্ষণ তিনি মুখ খোলেননি, এবার খুললেন। বললেন, উনিশ শতকের মানবতাবাদকে কি আপনি উড়িয়ে দিতে চান? রবীন্দ্রনাথকে ব্যর্থ রেনেসাঁর কসল বললে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হয়।

শান্তনু বললে, আমাদের দেশের কোনো ইতিহাস তৈরি হয়নি আজো।

জ্যোতির্ময় বললে, ইতিহাসের জারজ সস্তান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এর লোপসাধনই একমাত্র মুক্তির পথ।

রবেন দত্ত বললে, ইডিয়েটস্।—কাকে লক্ষ্য করে বললেন, কেন বললেন বোঝা গেল না।

হরিহর আচার্য বললেন, সমাজবাদই আধুনিক সভ্যতার মুক্তির পথ। ডেকাডেন্ট বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ বংশধর বাংলা দেশের বেঁটে ইন্টালেকচুয়ালয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথার বল নিরে মারাত্মক লোকালুকি শুরু হয়ে গেল। ভদ্রশ্রিত মুখগুলোর পেশি সংস্থান বদলাতে বদলাতে কঠিন, কঠিনতর হয়ে উঠল। ডলি সেই হট্টগলের স্রোতে উঠে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরেই স্তব্ধ নাকঝাড়ার প্রয়োজনে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

তপ্ত খোলায় খই-এর মতো কথা ফুটছে। ফরাসী-জানা শক্তিবাবুর শিষ্যরা তখন

আলোচনাটাকে কীভাবে করাসী দেশে চালান দেবে তাই ভাবছিল, কুশভক্ত হীরেনেরা সে বড়যন্ত্র ভেঙে দিয়ে বেলিনস্কি বাদান্ভ প্রসঙ্গ তুললে। আলোচনা ততক্ষণে বিষয়বস্তুর নোঙর ছিঁড়ে স্পুটনিকের মতো শূন্যে ঘুরছে, সিগারেটের ছাইয়ে উপচে পড়া অ্যাশট্রে এবং বিদেশী নামের ফুলকি। সমস্ত আলোচনাকে ফর্মুলায় বাঁধলে দাঁড়ায় বদলেরার + র'গাবো + সার্ভে + কাম্য (+ + + + +) = + + + + + কাম্য (+ সার্ভে + র'গাবো + বদলেরর)—অর্থাৎ শেষপর্যন্ত শাক্তরাই সভার ঝোলটাকে নিজেদের কোলে টেনে নিতে পেরেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় মেয়েদের চোখ জ্বালা করছিল। খুক খুক করে কাশি চাপবার চেষ্টা করছিল কেউ কেউ। আর, যারা কথা বলছিল, তারা সবাই কথা বলছিল নিজেদের সঙ্গেই। মুক্তি আর অমিতারা নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করে কী একটা প্রসঙ্গ নিয়ে ভারী খুশি হয়ে উঠছিল।

রেলিঙ-এর ওপর আলতো করে কনুই ছুঁইয়ে ডলি বললে, তুমি আবার উঠে আসতে গেলে কেন? ওঁরা কি ভাববেন বলতো, ছিঃ।

ভাবুক গে।—রেলিঙ ডিঙিয়ে সিগারেটের সমাপ্ত প্রায় টুকরো অন্ধকারের দিকে ঝুঁড়ে দিতে দিতে বললে সুভাষ। যোগ করলে, আমার এসব ভালো লাগে না, বিলী লাগে।

ডলি ও সুভাষ সেই অধীকার রেলিঙ-এর ধারে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

সুত্রত এসেছে টাকার খান্দার। টাকা চাই তার। শোনবার চেষ্টা করেও আলোচনার কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, এই বুদ্ধিজীবীদের আসরে একেবারেই বেমানান সে। সবকটা মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে মনে হল, এরা সত্যিই এক অচেনা জগতের বাসিন্দা, যে জগতে সুত্রত একেবারেই রবাহুত। সাম্প্রকরা চল বাকানো ভুরু শাস্ত্রু, কুস্তিগিরের মতো তাগড়াই জোয়ান জ্যোতির্ময়, নিখুঁত সুন্দর স্ত্রী ব্যক্তির প্রভায় উদ্ভাসিত শক্তিবাবু, মাঝ বয়সী মিনমিনে গলার হরিহর আচার্য, বিলিতি পোশাকের নির্ভেজাল সাহেব রণেন দত্ত, হাই পাওয়ারের চশমা পরা দীপঙ্কর, ধৃতি পাঞ্জাবী পরা স্বাস্থ্যাজ্জল দেবেশ এবং আরো কয়েকজন মানুষ, যাদের নাম গনে পড়ছে না সুত্রতর,—এদের সঙ্গে কী যোগ তার। ভাবলে সুত্রত। কেবল ঘরের একটিমাত্র কোণে সে আলতো ভাবে চোখ ছুঁইয়ে গেল মাত্র—যেখানে শোভনা। এখানেও শোভনার চারপাশে সেই অদৃশ্য আবরণ। তাকানো যায় না এমন উজ্জল

শুভ্র অস্তিত্বে ঘরের ও-কোণটা স্ত্রতর কাছে একটা নিষিদ্ধ জগৎ। এতক্ষণে স্ত্রত প্রায় স্পষ্ট করেই আবিষ্কার করে ফেলে যে দেবেশের আমন্ত্রণ কিংবা দেবেশের কাছে টাকা চাওয়ায় প্রয়োজন একটা অছিলামাত্র। আসলে সে উদগ্র হয়ে আছে একটা মুখের স্বপ্নে। যে জগতে তার বাস সেখানে আরতি ময়না ননীকাপ্তেন সুবর্ণমাসী—বাপ মা ভাই বোন—কতগুলো হিংস্র মুখ, কতগুলো ভয়ংকর দাবি। কী ভীষণ একা সে। এখানে এই এতগুলো মানুষ, স্ত্রত স্থির জানে, এরাও দল বেঁধেছে শুধু নিজেদের কাছ থেকে পালাবার ফিকিরে। যত বেশি অসহায়, ততো বেশি চড়া গলার কথা বলছে এরা। অথচ এদের চোখের নিচে যে-চোখ সে চোখের ভেতরে তাকালে বোঝা যাবে এরা বিষণ্ণ—বড়ো বেশি বিষণ্ণ—সমস্ত চিংকার দিয়েও সে বিষণ্ণতা ধূরে ফেলা যায় না। মারমুখী হয়ে নিজেদের সঙ্গেই লড়াই করছে নিজেরা। আর শোভনা—নিজেই বুঝতে পারে না স্ত্রত, কেন কী আছে ওর চারপাশে যে নিজের হৃৎস্বপ্নের পাখুরে বেড়ার ভেতর থেকে একটা স্বপ্ন গুঞ্জন করে উঠতে চায়। যাকে প্রেম করা বলে, প্রেমে পড়া বলে, তাতে স্ত্রতর নিজেরই আর বিশ্বাস নেই। কী হয় প্রেমে—শুধু অন্ধকারে হাত হাতড়াতে হাতড়াতে পাতালের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কী আছে প্রেমে। অথচ শোভনা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো কেবলই তাকে দেলাতে থাকে। শোভনা তো তার কাছে নারী নয়, একটা জগৎ,—নাম নয় একটা স্বপ্ন। ঘরের এই উত্তপ্ত কথার মরুভূমিতে ঐ একটিমাত্র মরুগান, যা ছায়ার মতো স্নিগ্ধ, নক্ষত্রের মতো সুদূর।

স্ত্রত প্রাণপণে নিজের ভেতর থেকে সুন্দর কোনো স্মৃতিকে খুঁজে পেতে চায় এই মুহূর্তের জন্তে। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশের মতো তার মনের মধ্যে এলোমেলো প্রত্যঙ্গহীন আকৃতির ত্রিভুজ শরীর, তার সঙ্গে ভয়ংকর চেহারার কতগুলো মানুষের হিংস্রটে চোখ ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ল না। শুধু আততায়ীদের চোখ। হিংস্রটে ক্ষুরধার বীভৎস ভয়ংকর।

নরকে ডুবতে ডুবতে স্ত্রত যেন একটা ভেলা খুঁজে পেয়েছে। মন্তোচ্চারণের মতো বার বার সে মনে মনে উচ্চারণ করল, সুন্দর সুন্দর।

সব কিছুই শেষ আছে। এদের আলোচনাও শেষ হল আপাতত। শেষ ঠিক নয়, মূলতুবী রইল আগামী বৈঠকের জন্তে। প্রায় দশটা বেজে গেছে। অনেকেরই ট্রাম ধরার তাড়া আছে। একে একে দলে ভাঙন ধরতে শুরু করল। তবু কিছুক্ষণ ছাই-চাপা আগুনের মতো আলোচনাটা থিকিয়ে থিকিয়ে জ্বলতে

লাগলো। এতক্ষণের মধ্যে একবারও স্ত্রুত শোভনার দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকাতে পারেনি। অরুণের ঘরে সেই যে আয়ত চোখের বিবর্ততা তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে আছে, তাকে হারাতে চায় না স্ত্রুত। অথচ ইচ্ছার লোভ মনে ক্রমাগতই তাগিদ তোলে।

এক সময় শোভনাও উঠে গেল ডলিদের এগিয়ে দিতে। শোভনারা উঠে যাবার পর ঘর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সংস্কৃতি চর্চা করে তৃপ্তির উদ্গার তুলতে তুলতে সবাই উঠে পড়ল। স্ত্রুত ভাবলো এবার টাকার কথাটা তোলা যাক। বলি বলি করেও কিছুতেই মুখ দিয়ে কথাটা সে উচ্চারণ করতে পারে না। দেবেশ হয়তো ভাববে, কী স্বার্থপর!

একজন জিজ্ঞাসা করল স্ত্রুতকে, আপনি তো নতুন এসেছেন। কেমন লাগল?

স্ত্রুত বলতে পারতো এই সংস্কৃতি চর্চার মেকী বুদ্ধিজীবীতার তার শ্রদ্ধা নেই। শুকনো হৃদয়হীন কতগুলো কথা ছাড়া মূল্য কি এসবের। কেউ কি বুকে হাত দিয়ে কখনো বলতে পারে, সে যা বলেছে, সেটাই তার মনের কথা? অনেকদিনকার অভ্যাসে ভাঁড়ামিকে এরা বুদ্ধির মোড়ক দিয়ে সাজিয়েছে। কিন্তু এদের ফাঁকা ফাঁপা অস্তিত্বকে ঢাকবে কি দিয়ে। তাই, হয় পরস্পর পরস্পরের পিঠ চুলকোয়, নয় খেয়োখেয়ি করে। এদের জগৎ থেকে স্ত্রুত যে অনেক দূরের মানুষ। নিজের গ্রানির বিষেই নিজে সে নীল হয়ে আছে, সাংস্কৃতিক মাতলামিতে বুদ্ধ হবার মতো সময় কোথায় তার। কিন্তু এসব কিছুই সে বললো না। শুধু বলল, ভালোই তো!

সেই একজন বললো—ভালো? আমার কিন্তু বিক্রী লাগে। আমি বলে দিলাম, এসব করে কিছু হবে না।

যাবার সময় সিঁড়ির মুখে বেঞ্চে আলোর একটা বৃত্ত গোল হয়ে পড়েছে, সেইখানে শোভনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্ত্রুতর। ডলিদের রাস্তা পর্বন্ত এগিয়ে একলাই ফিরে আসছিল শোভনা। সামনে দেবেশ, একটু পিছিয়ে স্ত্রুত।

দেবেশ বলল, ওরা বাস পেল?

হ্যাঁ।—শোভনা বললে।

এতক্ষণ পরে এই প্রথম স্বর শোনা গেল শোভনার। আলোচনায় শোভনা নিজেকে একেবারেই উছ করে রেখেছিল। এই প্রথম, এবং বোধকরি জীবনেই

প্রথম, সুরত এমন একটা স্বর শুনলো যা গান হয়ে তার মনে বাজতে লাগল।
সুরতকে দেখতে পেয়ে শোভনা চোখ তুলে তাকালো। আলোর রঙের ঠিক
বাঁইরে, ফিকে অন্ধকারে অবয়ব যেখানে অন্ধকারের মতো অস্পষ্ট, সেইখানে
শোভনা দাঁড়িয়ে পড়ে সুরতর দিকে পরিপূর্ণ চোখ তুলে তাকালো। দূরের
কোনো একটা বাড়িতে ইমনের আলাপ মোচড় দিয়ে উঠছিল সেতারে। নাকি
সেটা সুরতর কলনাই।

আচ্ছর আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সুরত।

শোভনা কী যেন একটা বলতে গেল। তার ঠোঁটের রেখায় কেমন একটা
অস্পষ্ট কাঁপুনি, প্রজাপতির পাখা যেমন কাঁপে তেমনি। সুরত হাত তুলে
নমস্কার জানাতে গেল, আড়ষ্ট হাত উঠলো না, কিংবা হয়তো নমস্কার করতে
চায়নি সে। শুধু সেকেন্ডের শতাংশের এক ভগ্নাংশে দাঁড়িয়ে তার মনে
হয়েছিল, এইসময় একমাত্র হাত তুলে প্রণাম জানানো ছাড়া আর কিছুই করবার
নেই তার।

শোভনার দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিটা সুরত সময়টুকু অতিক্রম করে আবার চলতে
শুরু করলে। আলোর রঙটার ওপর দিয়ে জরির কাজ করা শ্লিপারের ভেতর
একজোড়া পা চলে গেল, ওপাশে একটা লম্বমান ছায়া ধীরে ধীরে বেকে
বিন্দু হয়ে গেল। সুরতর বৈষ্ণব কবিতা মনে পড়ল, যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ
চলি যাতা। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইরে মরু গাতা।

কিন্তু সময়ের বিচারে ঐ সময়টুকু কতটুকুই বা। বাড়ির গেটের সামনে হঠাৎ—
হ্যাঁ হঠাৎ বই কি—আবিষ্কার করল, দেবেশ হাত তুলে তাকে নমস্কার জানিয়ে
বলছে, আবার আসবেন কিন্তু।

জোর করে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে সুরত এগিয়ে গেল কয়েক পা।

:

● ● চার ● ●

দেবেশদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ ছটফট করে কাটালে সুরত।
কোথায় যাবে সে, কোথাও বা যেতে পারে। এই এতবড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও
তার যাবার জায়গা নেই। বাড়ি? মনের মধ্যে বেঁচে-ওঠা ইমনের রাগটাকে
সে চায় জীইয়ে রাখতে। ইচ্ছে হল অনেকক্ষণ ধরে তাকে লালন করতে। সে যে
একা, একান্তভাবে নিঃসঙ্গ, এই বোধটা ছুরির কলার মতো তার বুকের মাঝখানে
ধিঁধে থাকে।

সময়ের স্রোত কেবলই তাকে নিচে টানে, যেখানে তার বাবা আদিত্য আর সুবর্ণমাসীরা। যেখানে আরতি। হিংস্র আর নগ্ন। বেঁচে থাকাটা এত হিংস্র কেন? নিচের ঘুলিয়ে ওঠা পাঁক থেকে সে আকাশ দেখেছে, দেখেছে নক্ষত্র। সুদূর। যাকে চোঁয়া যাবে না কোনোদিন।

গড়ানো পিচের রাস্তার ডানলপের চাকা ছড় টানে। সূত্রত একটা বিদ্বস্ত আত্মা নিষ্পে ঘুরে বেড়ায়। আরতি না বলেছে, টাকা চাই। মনে যে তার কী যন্ত্রণা, কী করে সে বোঝাবে কাকে। কেউ তার কেউ নয়। তার বন্ধ নেই, সারা পৃথিবী শুধু কতগুলো নথ আর খাবা। বন-ভাড়ানো নিঃসঙ্গ চিতার মতো ঘুরতে ঘুরতে এ কোন্ নরকে সে এসে পৌঁছেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন সে চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে পড়েছে খেয়াল ছিল না। রাত সাড়ে এগারোটা। কিন্তু চৌরঙ্গীতে যেন সব সন্ধ্যা নেমেছে। জোড়ার জোড়ার নারীপুরুষ। নিওন আলো জ্বলছে নিভছে। ইউ-ডি-কলোনের সঙ্গে অ্যাল-কোহলের মূহু মিষ্টি গন্ধ। ফিরিঙ্গী মেয়েদের উঁচু হিল তোলা জুতোর খট খট শব্দ ওঠে কংক্রিটের ফুটপাথে। কানের পাশ দিয়ে মূহু রহস্যময় গলার আওয়াজ শোনা যায়, কলেজ গার্ল! দেখিয়ে সাব! উদ্ধত বুক, ধারালো ঠোঁট মেয়েদের কটিতে পুরুষ লোমশ হাত। ট্যাক্সির হর্ন, কোনো এক বার থেকে ভেসে আসা বলনাচের অর্কেস্ট্রা। সিনেমা হলের সামনে চুপনরত নারীপুরুষের আবক্ষ পোস্টার। ক্রশবেন্ট আঁটা সিনেমার দরোয়ান, লম্বা পাকানো দাড়ি, ভাবলেশহীন মুখ।

কিন্তু মতো দ্রুত চোখের ওপর থেকে সরে যেতে থাকে দৃশ্যগুলো।

হঠাৎ পিঠের ওপর বলিষ্ঠ হাতের চাপড় পড়তেই সূত্রত ঘাড় ফেরায়।

হাল্লো—হাল্লো—হাল্লো—অদ্ভুত কায়দায় পঞ্চম থেকে খাদে গলা নামিয়ে লোকটা সূত্রতর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সূত্রত যেন ঘুমের ঘোরে পথ চলছিল। মুখের দিকে তাকিয়েও সহসা চিনে উঠতে পারলো না লোকটিকে।

লোকটি বললে, Are you drunk?

ওর ইংরেজি উচ্চারণের বিশিষ্ট কায়দায় এবার সূত্রত চিনতে পারলো ওকে। বললে, কী খবর রণেন।

কাঁধ স্পর্গ করে রণেন বললে, Nothing significant. কিন্তু তোর কী ব্যাপার বল তো? পেটিকোট চেজারদের দলে কবে থেকে নাম লেখালি!

সুত্রতর যতদূর মনে পড়ে, রণেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটি তুই-এর পর্যায়ে নয়। নিখুঁত কমে কামানো গৌফ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, ফরসা সুন্দর মুখশ্রী। সুট কোট টাই-এ নিখুঁত—স্মার্ট। কলেজে থাকতে আলাপ ছিল। তারপর মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, কফিহাউসে, কিংবা রাস্তায়। কখনো চিনেছে, কখনো কখনো চেনেনি। আজ ওর গলায় অন্তরঙ্গতার সুর শুনে অবাকই হল সুত্রত।

রণেনের প্রশ্নটার কোনো জবাব না দিয়ে সুত্রত বললে, কী করছ আজকাল?

—Nothing—Nothing—absolutely nothing. তুই?

সুত্রত সেই একই সুরে প্রতিধ্বনি করে বলতে পারতো, Nothing—Nothing—absolutely nothing. কিন্তু বললে না। শুধু বললে, আমিও কিছুই করছি না।

—কবিতা? What about your silly verses.?—ভুরু বাঁকিয়ে কাঁধটা একদিকে হেলিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো রণেন। ওর মুখে মদের ঝাঁঝালো গন্ধ।

সুত্রত বললে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রণেনের ইংরাজির উচ্চারণ নকল করে বললে, We are all damned creatures and, একটু থামলো সুত্রত, তারপর কথাটাকে প্রায় তীরের মতো ছুঁড়ে দিলে, And poetry is not meant for us.

হো হো করে অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠল রণেন। রাস্তা দিয়ে একজোড়া ফিরিঙ্গী যুবক যুবতী যাচ্ছিল। অবাক হয়ে রণেনের দিকে তাকিয়েই নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে করতে চলে গেল। Yes! Yes! We are all dammed creatures. You all right—perfectly right.

সুত্রত ওর এই অস্বাভাবিক হাসির মানে খুঁজে পেল না। তারপর একটু উপখুশ করে, চুরুটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তোর কাছে টাকা আছে সুত্রত। বেশি নয়, এই ধর খাটি চিপস্।

না, টাকা নেই তো—

নেই?—রণেন যেন কেমন চূপসে গেল। বললে,—Believe me থাকলে দে না। কাল শোধ দিয়ে দেব। চোখ নাচিয়ে বললে, ঞ্জালি—She is an angel. যাবি?

সুত্রত হেসে বললে, বললাম তো টাকা নেই।

—নেই? Then I am helpless. আচ্ছা আসি, গুড্‌নাইট।

রণেন চলে গেল। রণেনেরও টাকা চাই। রিপূর আদিম তাড়নায় বুড়কুরা সব শিকারে বেরিয়েছে। এই রণেনদের সঙ্গে সে নিজের কোনো তকাৎ খুঁজে পায় না। অসুস্থতার বিকার নিয়ে মানুষ কেবলই পুড়েছে। অথচ এই নরকের অনেক উর্বে নির্জন নক্ষত্রের মতো শোভনাও তো আছে। শুধু ধ্বংসের ধ্রুব নিয়মে উদ্ধার মত পুড়ে ছাই হওয়া নয়, এই লড়াই-এর ময়দানের বাইরে আছে পরম প্রশান্তি। আছে গান, লতা, পাতা, পাখি এবং শোভনা।

সুব্রতর ভারী ইচ্ছে করছিল শোভনার কাছে ফিরে যায়, বলে দেখো, আমি অনেক যন্ত্রণায় পুড়ে গেছি, জুড়িয়ে দাও আমার সব জ্বালা। আমার খণ্ডিত ধর্ম অধঃপতনকার জীবনকে পূর্ণতা দাও, জীবনে একবারের মতো শুদ্ধ পবিত্র মনোচ্চারণের মতো আমাকে বলতে দাও, আমি ভালবাসি।

বুক জুড়ে শুধু ব্যথা। ভালবাসি। কী আশ্চর্য যাহু ঐ কথাটিতে। এই পৃথিবী জুড়ে এত যে হানাহানি, এ কেন? কেন মন খুলে বলতে পারি না, ভালবাসি। সোনার কাঠি বুঝি হারিয়ে গেছে—সে জাগবে না।

মনের মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছা ক্রমাগত তাকে ঠেলতে থাকে সেই পরিচিত বাড়িটার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে পুড়তে পুড়তে জ্বলতে জ্বলতে যা যাওয়া পশু যেমন জ্বালায় দিকে যায়, তেমনিভাবে সে ফিরে চলল ল্যান্ডাউন রোডের সেই বাড়িটার দিকে। সুব্রতর বোধশক্তি লুপ্ত, চৈতন্য আশ্রয় করে শুধু একটা মুখ, আজীবন যে-মুখ সে কেবলি হারিয়ে আসছে, সেই মুখ ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকানো এক অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ময় রেখায় জ্বলতে লাগল।

তখন প্রায় রাত দুটো। আকাশে ফুটি ফুটি নক্ষত্র। রাস্তার নির্জন আলোগুলি ভুতুড়ে চোখ মেলে ঘুমন্ত মৃত-নগরীর হৃদস্পন্দন শুনতে থাকে শুধু। সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ সেই বাড়ি। অন্ধকারে দুর্গের মতো দেখাচ্ছিল। স্বপ্নে দেখা ঘর বাড়ির মতো পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি। গোল, বাকানো, রূপহীন, অস্পষ্ট, আবছায়া।

নিশ্চক্ৰ নিশ্চিহ্ন রাত্রি। একটা গাছের মাথায় পাখির ডানা ঝটপটানির শব্দ উঠল। একটা জিপ-গাড়ির হেডলাইটের আলো জালিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

সুব্রতর মনে হল, সে যেন মানুষ নয়, একটা উৎপাটিত আত্মা। এই অন্ধকার বাড়িটার সামনে জন্ম-জন্মান্তর দাঁড়িয়ে আছে।

—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

—কে ? সূত্রভয় ভয় পেয়ে ফিরে তাকালো । আরো জোরে হেসে উঠল লোকটা ।
সারা মাথায় নোংরা জটা, অপরিষ্কার শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা পরনে—উন্মাদ ।
খনখনে গলায় হাসতে হাসতে লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল ।

● ● পাঁচ ● ●

সিগারেটের ধোঁয়ায় বাদামী হয়ে গেছে ঘরের রঙ । কানাই সাতরার খেতির
ছোপ ধরা ঠোট বিরক্তিতে ঝুলে আছে একদিকে । মকবুলের পচা ডিমের মতো
সাদা কানা চোখটাও লোভে চিকিয়ে উঠছে ।

বিরক্তিতে তাস তিনখানা ছুঁড়ে ফেলে ননী কাপ্তেন বিড়ি ধরায় । —জাক জ্বলে
গেছে, কিস্তি হবে না ।

মকবুল বোর্ডের মাঝখানে স্তূপীকৃত নোট আর খুচরোগুলো নিজের দিকে টেনে
নিতে নিতে বললে, টোকা না নড়ালে টাকা আসবে কেন । ফেলো বাঘের পাক্তি,
দেখবে তোমার জ্বলা লোকটাই তখন অণু বোল বোলবে ।

এদের কাছে বাঘের পাক্তি মানে একশ টাকার নোট ।

নিপুণ হাতে ঘরের বায়ুমণ্ডলে একটা সাড়া জাগিয়ে তাস সাফল্য করে তিনখানা
করে তাস বাঁটতে লাগল মকবুল ।

সতরঞ্চি বিছানো মেঝের ওপর সাতজন মানুষ—কানাই সাতরা, ননী কাপ্তেন,
মকবুল, জগুয়া, ধীরেন, শশী আর বনবিহারী । ননী কাপ্তেনের পৈতৃক নাম হয়তো
ননীগোপাল কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা ছিল, কিন্তু ইয়ার মহলে শুধু কাপ্তেন
বললে ননী কাপ্তেন ছাড়া আর কাউকে বোঝাতো না । দশাসই জোয়ান মানুষ,
ঝাঁকড়া চুল কপালের উপর লেণ্টে আছে ঘামে আর উত্তেজনায় । ফিনফিনে
আন্ধির পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে গোলাপী নেটের রঙ ফুটে উঠেছে ।
ঘাড়ের কাছটা ঘামে জ্বজ্ববে । মোটা খ্যাবড়া আঙুল, অনামিকায় নকল
হীরের আংটি । জুয়াড়ী মহলে ননী কাপ্তেনের বোর্ডের নামডাক আছে ।

আজ ননীকাপ্তেনের ভাগ্যে যেন শনি । দানের পর দান শুধু মার খেয়ে
চলেছে ।

না দেখে ননীকাপ্তেন চাললে এক টাকা । কানাই, মকবুল, জগুয়া, ধীরেন, শশী,
বনবিহারী সবাই দিলে এক টাকা করে রাইগু । ননী কাপ্তেন আবার চাললে
একটাকা । আবার হাত ঘুরে এল তার কাছে । রাইগু—রাইগু—রাইগু—
রাইগু—না দেখে দান চালায় উত্তেজনায় বোর্ডে টাকার পর টাকা পড়তে লাগল ।

ফ্র্যাশ খেলার বিধানে যে সব থেকে বেশি রাইও চালে, সেই হচ্ছে বিগ-পাক্টার। আজকের খেলায় সবাই যেন বিগ-পাক্টার।

বোর্ডে ধীরে ধীরে টাকা জমতে লাগল। এক টাকার নোট—পাঁচ টাকার নোট—দশ টাকার নোট।

কে হাত তুলবে আগে।

অবশেষে দেখা গেল বনবিহারীই আগে হাত তুললে। বনবিহারী তিনখানি মালচালানী ট্রাকের মালিক, ওর ট্যাক্সিও নাকি ভাড়া খাটে। বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। হাড়গিলে চেহারা, তোবড়ানো গাল, কোটরে বসা চোখ, কণ্ঠার হাড় অস্বাভাবিক উঁচু। চোখ দুটো সার্চলাইটের মতো তীব্র। তাস তিনখানা হাতে তুলে নিয়ে টিপে টিপে তাস খোলে। গহ্বরের ভেতর থেকে চোখ দুটো ধক করে জলে উঠেই আবার নিভে যায়।

—সিন।—বনবিহারী টাকা ফেলে বোর্ডে।

মকবুল ভাবে—শালা ভারী স্থায়না। আমরা দেব রাইও, আর ও মারবে দান।

ননী কাপ্তেনের কপালের ওপর ঘামের হুস্ক হুস্ক বিন্দু ফুটে ওঠে, শালা বুড়ো একের নম্বরের পিন্চাট।

পিন্চাট কথাটাও ননী কাপ্তেনদের তৈরি পরিভাষা, সবচেয়ে সাবধানী খেলোয়াড়কে জুয়ার অভিধানে বলে পিন্চাট।

এক রাইও রাইও ঘুরে এল বুড়োর সিন দান ধরা সবেও। বুড়ো নির্বিকার ভাবে আবার টাকা ফেলে বোর্ডে।

এরপর হাত তুললে জগুয়া। নাকের ওপর বিল্লী লাল দগদগে ঘা, পিটপিটে চোখে চাতুর্ষ আর শয়তানি। জগুয়াও টিপে টিপে তাস খুলে বোর্ডে টাকা ফেলল।

রাইও-সিন-কাউন্টার কাউন্টার কাউন্টার। লোভে চিকিয়ে উঠছে সব কটি চোখ। দৃষ্টিগুলো মাঝখানে জমে ওঠা টাকার ওপর স্থির। রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত।

এর পর অনেকেই হাত তুলতে শুরু করে। ধীরেন আর শশী হাত ফেলে দিলে। মকবুল কানাই আর ননী কাপ্তেন তখনো কাউন্টারে। দেখা তাদের বিরুদ্ধে না-দেখা হাতের বাজিই কাউন্টার। কাউন্টারের বিরুদ্ধে যে তাস দেখে খেলবে, তাকে দিতে হবে দ্বিগুণ টাকা। অবশেষে কানাই আর মকবুলও হাত তুললে। দু-হাত দান চলতেই বোঝা গেল ওদের তাস এমন কিছু ভালো

না যে ষুঝতে পারবে। ওরাও অফ দিলে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলে জগুয়া, বনবিহারী আর ননী কাপ্তেন।

ননী কাপ্তেন বেপরোয়া কাউন্টার চালতে থাকে।

বোর্ডে টাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। ননী কাপ্তেনের মনের অবস্থা, লুটি তো ভাগুর মারি তো হাতী। যদি একটা দান মারতে পারে, তবে এতক্ষণকার সমস্ত লোকসান স্বে আসলে উঠে আসবে। কিন্তু জগুয়া আর বনবিহারীর অফ যাবার লক্ষণ নেই।

পাঁচশ টাকায় লিমিট বোর্ড। দু-হাত থাকলে যে কেউ 'শো' চাইতে পারে, কিন্তু তিনহাতে উপায় নেই, লিমিট পর্যন্ত লড়তেই হবে, নইলে যতটুকু খেলা হয়েছে ততটুকুই লোকসান।

উত্তেজনায় সমস্ত ঘরের নিশ্বাস যেন আটকে গেছে। কে দান পাবে, ঐ পিন্টাট বুড়ো শালিকটা, নাকি সিফিলিসে-ভোগা ঘেয়ো জগুয়া? ননী কাপ্তেনের নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বইতে থাকে।

অবশেষে গুনে দেখা হল, বোর্ডে পাঁচশ টাকা জমেছে। প্রথম পাল্লা জগুয়ার। জগুয়া সন্তর্পণে তাস তিনখানা বোর্ডের ওপর চিতিয়ে রাখলো, চিড়িতনের সাহেব, হরতনের বিবি আর ইস্কাবনের গোলাম।

রান?—সকলে প্রায় এক সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল।

না দেখা তাসে খেলছিল ননী কাপ্তেন। তাস তিনখানা তুলে নিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগলো। দেখা শেষ হলে অসীম ক্রোধে তাস তিনখানা ছুঁড়ে ফেলে বললে, তাসের অ্যায়াস কি ত্যায়াস বলেছি, শালা বানচোত মার্কি তাস—

ননী কাপ্তেন তাস ফেলে দিতেই বুড়ো বনবিহারী নিজের হাতে তিনখানা তাসের ওপর সুদীর্ঘ চুমো দিয়ে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠে বললে, হবে-এ না হবে না। বনবিহারীর হাতে তিনখানা বিবি—অর্থাৎ বিবির ট্রায়ো।

তাস তিনখানা বোর্ডের ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে বোর্ডের টাকাগুলো বনবিহারী টেনে নিলে।

জগুয়া ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে প্রায় স্বগতোক্তি করে বললে, ওই বজ্জাত মাগীটার মুখ দেখে যেদিন উঠবো, সেদিনই কি শালা কপাল লাট ধেয়ে যাবে—বোটি হারামজাদী।

—কার কথা বলছিস রে জগুয়া?—কানাই জিজ্ঞাসা করে।

রেগে উঠে জগুয়া বলে, সে কথায় তোর কি দরকারটা শুনি?

—লে বাবা। বলছিলি, তাই শুধোলাম। অপরাধটা কি হল?

ননী কাপ্তেন হেরে গিয়ে থিঁচিয়ে উঠে বললে, র্যানা বন্ধ করে তাস দে। কবুতরের জ্ঞান নিয়ে খেলতে আসা কেন বাপু? ভাগ, ভাগ, যত সব পিন্‌চাট খেলনে ওয়ালা।

বুড়ো তিনখানা করে তাস বাঁটতে শুরু করল।

গুঞ্জন থেমে গেল। আবার টাকা টাকা টাকা। হাইও—সিন—কাউন্টার। সিন—অফ। ভাগ্যলক্ষী কখনো ভর করে বনবিহারীর ওপর, কখনো মকবুলের ওপর, কখনো বা কানাইয়ের ওপর।

এমনি এক খেলার ঠিক মাঝখানে স্তব্ধত এল। ননী কাপ্তেন হৈ হৈ করে সন্দর্ভনা জানাল, আরে লার্নেড সাহেব যে? বসুন বসুন—একেবারে ডুব দিয়ে ছিলেন। ব্যাপার কি?

এখানে স্তব্ধতর নাম লার্নেড সাহেব। কবে কে যেন বলেছিল, আরে স্তব্ধতবাবু কি আর হেঁজিপেঁজি লোক, স্তব্ধতবাবু রীতিমতো লার্নেড ম্যান। সেই থেকে স্তব্ধতবাবু এদের দলে লার্নেড সাহেব।

বনবিহারী বললে, কী লার্নেড সাহেব, দান দেব।

—উঁহু। পকেট গড়ের মাঠ।

জগুয়া বিদ্রূপ করে বললে, তবে কি লার্নেড সাহেব শুধু গন্ধ শুঁকবে নাকি?

ননী কাপ্তেন দান চালতে চালতে বলল, তাস আর মেয়েমানুষ—বড়ো আজব চিড়, শুধু গন্ধ শুঁকে নেশা মেটে না রে।

মকবুল পানের ছোপ-ধরা নোংরা দাঁত বার করে হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, শুধু গন্ধ শুঁকে শুকেই জগুয়ার নাকটা গেছে।

জগুয়া হিংস্রভাবে মকবুলের দিকে তাকিয়ে বলে, আর তোর চোখটা গেল বুঝি আমি কী করে গন্ধ শুঁকি তাই দেখতে গিয়ে!

ননী কাপ্তেন বোর্ডে একটা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে হেঁড়ে গলায় ধমকে বলল, এ্যাঁইও চুপ যা। শালারা খেঁকি কুত্তার জাত। কেঁউ কেঁউ না করলে বুঝি ভাত হজম হয় না। একদম মুখে রা না করে যদি খেলতে না পারিস তো ভাগ, ভাগ হিঁয়াসে।

ননী কাপ্তেনের তিরস্কারে সকলেই চুপ করে গেল। ননী কাপ্তেন যে সত্য সত্যই ননী কাপ্তেন, তা এই কারণেই। কেননা ওর বোর্ডের আইনগুলো কিছুটা বুনো হলেও একেবারে সোজাসাপ্টা। দরকার হলে ঘাড়ে কয়েকটা রদ্দা দিয়ে পকেটের

লিখছিল (আসলে প্রবন্ধ নয়, ডায়েরি), কলমের ক্যাপ বন্ধ করতে করতে আশ্বাস দিয়ে বললে, ঠিক আছে । আমি যাবো তোমার সঙ্গে ।

যাবার পথে কালোয়ারপাড়া ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই দেখা গেল বৃহৎ রণাঙ্গন । সেই রণাঙ্গন পেরিয়ে হোস্টেলে যাবার আশা ছাড়া । অগত্যা কালোয়ারদের মধ্যেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাদের দু-চারজনকে ভাঙাবার চেষ্টা করল (বক্তৃতার আরম্ভে সূত্রত বলেছিল, ভাইসব, আজ দেশকা বৃহৎ দুদিন স্থায় ইত্যাদি— ভাগ্যক্রমে বক্তৃতার সবটুকু আজ তার মনে পড়ে না, তাই রক্ষে), কিন্তু নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে আসতে চায় না কেউ, এমনি সময়, প্রায় স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো ননী কাপ্তেন বললে, গড়পার ? বৃহৎ আচ্ছা চলুন ।

ননী কাপ্তেনের দলে তখন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জগুয়াই টিকে আছে আজও । সেই যোদ্ধাদলকে নিয়ে এসে ভলান্টিয়ার হিসাবে রাখা হল সেনাবাবুদের বাড়ির তেতলায় এবং সূত্রতকে (কী আশ্চর্য, জনগণের দাবিতে এই নবতম যোদ্ধাদলের তত্ত্বাবধায়ক হতে হয়েছিল তাকেই) রাত জাগতে হয়েছিল এদের সঙ্গে চা খেয়ে এবং এদের শৌর্য বীর্যের লৌকিক অলৌকিক কাহিনী শুনে । একদা সময় হননের প্রয়োজনে তাস এল, খুচরো পয়সা এল, এবং অত্যন্ত অবাক হয়েই সূত্রত আবিষ্কার করল যে জীবন যদিও তাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু তাকে ভাগ্যে তার বৃহস্পতি । ননী কাপ্তেনের প্রিয় হয়ে উঠল সে । দাঙ্গা, রাজনৈতিক ঝগড়া, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে ননী কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় তার কী করে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল, এবং একদা ননী কাপ্তেনের এই আড্ডায় ও কী করে যে হাজিরা দিল, সে সব ইতিহাস এতদিনে নিভুল ভাবে মনে না থাকাই স্বাভাবিক । এবং সে-সব কথা সূত্রত মনে করেও রাখেনি । সূত্রতর শুধু এইটুকু মনে হয়, যে-কোনো বাইরের লোকের কাছে ননী কাপ্তেন যতটা ভয়ংকর, যতটা বর্বর এবং যতখানি গুণ্ডা, তার কাছে সে তার কিছুই নয় । কেন নয় সে বৃহস্পতি সূত্রত কোনোদিনই ভেদ করতে পারেনি । এই বিচিত্র বর্বর লোকটার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই তার, তবু কেমন যেন আকর্ষণের একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক দুজনের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুজনের অজ্ঞাতেই । লোকটা ভালো কি মন্দ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, মানুষ না অমানুষ এসব কথা কোনোদিনই ভাবেনি সূত্রত । অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ সম্পর্কে সে একটা আশ্চর্য নিম্পৃহতা অর্জন করতে পেরেছে—বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, বাপ মা ভাই বোন কারো সম্পর্কেই সে সত্যিকারের কোনো সংপৃক্তি

অনুভব করেনি কোনোদিন ; লোকে কেন করে, সেই ভেবেই বরঞ্চ আশ্চর্য হয়, যখন এতেকে আলাদা জগতের বাসিন্দা এবং এতেকের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ একেবারে আলাদা চেহারার, আলাদা জাতের, মিল খোঁজার চেষ্টা সেখানে নেহাৎই গোঁজামিল। ভাবলে অবাক লাগে সূত্রতর, দেবেশের মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছেলেরা কি ভারতেও পারে কখনো যে সূত্রত শুধু সূত্রতই নয়, সে কখনো কবিতা লিপিত, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ আছে এমনো, তারও এমন একটা জগৎ আছে যেখানে সে শুধু লার্নেড সাহেব? আরতির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কে হরতে তত্ত্বগত কোনো ব্যাখ্যা তৈরি করে ওরা সস্থ করতেও পারে (পর-জীবী সঙ্গে প্রেম করে গর্ব অনুভব করতেও তো দেখেছে কাউকে কাউকে, এবং বলাই বাহুল্য তারা শিল্পী অর্থাৎ মানবসভ্যতার কারুকৃত্য এবং সফল প্রেম যাত্রাই শেষ পর্যন্ত দেহজ), কিন্তু ননী কাপ্তেনের দলে তাকে কিছুতেই ওরা বরদাস্ত করতে পারবে না। ওদের পরিচ্ছন্ন মন আর নিকোনো রুচি ঘেঁরাই বিষিয়ে উঠবে। অবশ্য এসব নিয়ে সূত্রতর মনে কোনো আত্মগ্রানি নেই। কেননা তার বিশ্বাস, সাজিয়ে কথা বললেই সত্যের মুখ ঢাকা যায় না, সরমার সঙ্গে অরুণের প্রেমের নাটক লক্ষ্মীমণির সঙ্গে জগুয়ার নাটকের তুলনায় বড়ো কিসে?

টাকার প্রয়োজন সূত্রতর—অনেক টাকার। আরতি পঞ্চ চেয়ে বসে আছে। টি-বি রোগী অরুণের বহু অনেক, কেননা বহুকাল সে বুদ্ধিচর্চা করে কাটিয়েছে। কিন্তু সে-সব বহুদের কাছে হাত পাতা যায় না। অরুণ আর আরতির আত্মসম্মান জ্ঞান এত প্রখর যে বরঞ্চ উম্মেদে আঁচ পড়বে না, ইঞ্জেকশন বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বহুদের কাছে ছোট হবে না। আর সূত্রত। তার কথা আলাদা। পাপের দেনা তাকে শুধতেই হবে, উপায় নেই। অতএব টাকা চাই। হয় রোজগার করো, নয় চুরি করো। চুরি করতে না পারো, ডাকাতি করো। জুয়া খেলে হোক, ঠকিয়ে হোক—আরতির পাওনাগড়া আরতিকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। নিজের স্বামীকে ভালবেসে, দুঃখ পেয়ে, দুঃখের তপস্যায় পুড়তে পুড়তে আত্মদানের তৃপ্তি থেকে সূত্রতই বঞ্চিত করেছে তাকে। তারই জন্তে না আরতি নষ্ট ঘেরেমানুষ। সেই না শুনিয়েছিল আরতিকে, অন্ধ সংস্কারের চেয়ে প্রেম অনেক বড়ো এবং সত্যিকার একটা কুসংস্কার! অথচ দুজনের মাঝখানে অরুণের বেঁচে থাকাকাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অরুণ বেঁচে আছে কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্তে আরতির আকুলতার কোনো মানে খুঁজে পায় না সূত্রত।

আরতি—অরুণের পাশে নিজেকে একটা নিচ বড়মস্তকারী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। অথচ, এই কি সে চেয়েছিল?

ভাবনার কোনো কূলকিনারা পায় না সে। টাকা চাই—এই একান্ত নিষ্ঠুর বাস্তবটুকু ছাড়া আর সব চিন্তা তার কাছে গৌণ হয়ে গেছে। তার রক্তে লাম্পটোর পুরুমানুক্রমিক প্রবাহ, অথচ আরতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজের কাছে অভ্রান্তভাবে লাম্পট প্রমাণিত হবার মতো মনের জোরও তার নেই। ভদ্রতার যে মুখোশ তার মুখের সঙ্গে জন্মকালের অভ্যাস থেকে শক্ত হয়ে গেছে, আজ হঠাৎ বিদ্রোহ করে সে-ই মুখোশটাকে টান মেরে ফেলে দেবার শক্তিই বা তার কোথায়।

বোর্ডের ওপর জমে-ওঠা স্তূপাকার টাকার দিকে চেয়ে স্তব্ধতর চোখ দুটো টন্ টন্ করে ওঠে। টাকা তার চাই-ই চাই।

তাকিরে দেখল স্তব্ধত, ননী কাপ্তেনের মণিবন্ধে ওয়েস্ট এণ্ডের রিস্টওয়াচ। এককালে এ-ঘড়ির মালিক ছিল স্তব্ধত, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্পেশাল প্রাইজ হিসাবে অধ্যাপক দাশগুপ্ত তার প্রিয়তম ছাত্রকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো এ ঘড়ি নিভুল সময় দিচ্ছে—বারোটা বেজে গাত মিনিট। টাকার প্রয়োজনে ময়নার কাছে বাঁধা দিয়ে ষাট টাকা নিয়েছিল, সে টাকা শোধ হয়নি, ঘড়িও ছাড়ানো যায়নি। টাকা কিছু নিয়েছে আরতি, কিছু গেছে খেলায়। লোকে জানে ময়না ননী কাপ্তেনের বউ। কিন্তু ননী কাপ্তেনের এখানে যারা আসে তারা সবাই জানে ময়না তার বিয়ে করা বউ নয়। চিৎপুরের কোনো এক কুখ্যাত বাড়ি থেকে ননী কাপ্তেন ময়নাকে প্রায় লুট করে এনেছিল। সেই থেকে ওরা একসঙ্গে থাকে। একসঙ্গেই থাকে, কিন্তু ওদের কোনো দাম্পত্য জীবন নেই। প্রথম কিছুদিন একসঙ্গে কাটাবার পরই ওদের আদিম প্রেমের উচ্ছ্বাস নিভে গেল। ননীক্ষেপাল এমন একটা মানুষ যে বিশেষ কোনো একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে বেশি দিন তার চলতে পারে না। আর ময়নার পক্ষেও সম্ভব ছিল না তার পুরনো জীবনকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে আজীবন ননী কাপ্তেনের প্রেমে মশগুল হয়ে থাকবে। দুজনে হয়তো অনেক আগেই ছিটকে নিজের নিজের কক্ষে চলে যেতে পারত, গেল না, কেননা দুজনেই দেখতে পেল, দুজনকে ছাড়া তাদের চলবে না। যে-কোনো বাড়িউলির চেয়ে ননী কাপ্তেন ভালো, কেননা মদ খেয়ে মাতলামি করা ছাড়া ময়নার স্বাধীনতার কখনো সে হাত দিত না, আর যে-কোনো মেয়েমানুষের চেয়ে ময়নার কদর

ঘরখানি যখন খালি হল, বাড়িগুলার সরকার প্রায় বিনা সেলামীতেই ওটা ননী কাপ্তেনকে দিয়ে দিয়েছিল। এ বাড়িতে প্রতিবেশী হিসেবে আর যারা আছে, তাদের সম্পর্কে ননী কাপ্তেনের বা ময়নার বিশেষ কোনো কৌতূহল কোনোদিনই ছিল না। ময়নাদের ঠিক পাশের অংশটাতে থাকে হরিচরণ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই মদ টেনে একেবারে বেহেড। বউ মারা যেতে বাজারের মেয়েমানুষের ঘরেই রাত কাটায় বেশির ভাগ। কিন্তু ছোকরার শ্রদ্ধা ভক্তি আছে; ননী কাপ্তেনকে সিঁড়িতে দেখলে পথ ছেড়ে দিয়ে বলে, ভালো তো কাপ্তানদা। ময়না সম্পর্কে তার অসীম কৌতূহল থাকলেও এ তল্লাট মাড়াতে সাহস পায় না, জানে ননী কাপ্তেন এমন একটা মানুষ, যে মেজাজ বেসরিফ থাকলে ঘাড় মটকে হাইড্রান্টে ফেলে দিয়ে আসবে। এ বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আছে রাধু বোষ্টম, যার ঘরে একটা ছোটখাট বৃন্দাবন বসে রোজ, গানবাজনা চলে অনেক রাত পর্যন্ত এবং সেই রাসলীলায় গোপিনীরা নিজেদের মধ্যে ময়নাকে নিয়ে নানা কটাক্ষ ছড়ায় ও ছড়া কাটে। কিন্তু ময়না বা ননী কাপ্তেনের কানে কোনোদিনই পৌঁছায় না সে-সব। রাধুর পাশের অংশটার থাকে হরিপদ, ট্রাম কণ্ডাকটর, সুন্দরী ও অল্পবয়স্ক। বউটিকে রোজ মারপিট করে এবং ওই নিয়ে একটা অশান্তি ওই চক্করটায় লেগেই আছে। বউটি নাকি সত্যি সত্যি ভালো, তাই তার এই হেনস্তায় সবাই সহানুভূতির নিশ্বাস ছাড়ে।

ননী কাপ্তেন, রাধু, হরিপদ ছাড়াও এ বাড়িতে একুনে প্রায় সাতাশটি পরিবারের বাস। কয়লাওলা ভজ্জহরি সাঁখুখা, সুলতা আর মালতী (লোকে বলে, ওদের ব্যবসা—কি ব্যবসা, বলা বাহুল্য—নাকি বেশ জমজমাট), সুদখোর সিধু সামন্ত, তান্ত্রিক পরমানন্দ, বকাটে ছোকরা পাখিলাল, যে নাকি পকেট কাটে, ইত্যাদি জাতীয় বিচিত্র পেশার মানুষ বাস করে বাড়িটায়। সুত্রত অনেকবার ভেবেছে, এদের নিয়ে কলকাতার ভূগর্ভ জীবনের চমৎকার একটা ইতিহাস লেখা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, এ বাড়িটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানকার আলাদা আইন-কানুন, আলাদা মূল্যবোধ, আলাদা ধর্ম-অর্থীৎ সব কিছু নিয়েই আলাদা একটা জগৎ। ননী কাপ্তেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সুত্রতর সাধ্য নেই এ জগতের ছাড়পত্র পায়।

ময়নার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। ওপরে যতক্ষণ খেলা চলে, ততক্ষণ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবার রেওয়াজ নেই।

কেননা ময়নার কাছে অনেককেই আসতে হয়। কেউ আসে টাকা দিতে, কেউ টাকা নিতে। রোজ সারারাত খেলা হয়। এবং প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মকেল জোটে ননী কাপ্তেনের। খেলায় যারা মোটা জেতে, ময়নার পায়ের কাছে জমা দিবে ভোরবেলা তারা বাড়ি ফেরে। কত নতুন লোক এসেছে, পুরনো হয়ে গেছে, তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেছে; এমন সব লোকের নামধাম মনেও করে রাখেনি ময়না। এমনি করেই একদিন এসেছিল বনবিহারী, মকবুল, জগুয়া, শশী কানাই-রাও। এই আসা-যাওয়ার সড়কে এরাই শুধু টিকে গেছে। নতুন যে আসে, সে যখন সত্যি সত্যি চলে যায় এবং বোঝা যায়, সে আর ফিরবে না, ময়না তার টিয়ারঙ শাড়ীখানা পাট করে তোরঙ্গে তুলে রাখে আর টাকা গোনেন, কত হল। এরই মধ্যে নতুন যখন কেউ আসে, রাজা উজিরের মতো তাদের বাজীতে টাকা হারে কিংবা টাকা জেতে, ময়নার তখন আদর যত্নের ঘটা বাড়ে। কপালে কুম্ভুম পরে, কানে ছল, হাতে ওঠে সব কটা চুড়ি। পুরনো টিয়ারঙের শাড়ীটা পুরনো হলেও ওটাকে বাতিল করে না, কেননা ওটা ওর ভাগ্যবস্ত্র শাড়ী, ওটাই পরে, ঘুরিয়ে আঁট করে।

সুত্রতর জন্তেও একদিন ঐ শাড়ীখানা ঐ ভাবে পরতে হয়েছিল। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই টের পেয়ে যায় ময়না, লোকটা আলাদা জাতের, ময়নার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো পুরুষ লোকটার মধ্যে দেয়নি ভগবান।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে সুত্রত একবার ভাবলো, ফিরে যায়। অথচ টাকার দরকার তার, নিশ্চিত জানে, ময়নার কাছে আংটিটা বন্ধক দিয়ে টাকা পাবেই।

অনেক দিনের আসা-যাওয়ার জানা হয়ে গিয়েছিল সুত্রতর, সুইচ বোর্ডটা কোথায়। আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে হাতড়ে সুইচ টিপলো সুত্রত। সে জানতো ময়না জেগে আছে, ঘরের দরজা খোলা রেখে ঘুমোনো সম্ভব নয় তার। ননী কাপ্তেনের কড়া হুকুম, ঘরে লোক না থাকলে দরজা বন্ধ করতে পারা যাবে না। সারা রাত খেলা চলে, লোক এল তো ভালোই, না হলে দরজা ভেজিয়ে রেখে সারারাত জেগে কাটাতে হয়। দেদাজে সারা জীবনের সঞ্চয় রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে কেইবা ঘুমোতে পারে দরজা খোলা রেখে? অবশ্যই চোর চ্যাচড়ের ভয় করে না ময়না, ননী কাপ্তেনের ঘরে চোর ঢুকবে, চোরের ঘাড়ে এত বড় মাথা নেই। তবু ময়না ঘুমোয় না। বিশ্বাস নেই, মানুষকে বিশ্বাস নেই ময়নার। ওরা সব পারে।

আলো জ্বলতেই ধড়মড় করে উঠে বসল ময়না। ছোট্ট একটুখানি ঘর। একদিকে

ডেসিং টেবিল, লোহার আলমারি আর আলনা। আর ঘরের প্রায় সবখানি ছুড়ে বড়ো সেকলে মেহগেনির খাট। খাটের মাথার কাছে কাঠের ওপর কারু কাজ, সপ্তফণা কাঠের সাপের মাথা ফুড়ে উঠেছে মশারীর স্ট্যাণ্ড। খাটের নিচে থাকে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র, পানের বাটা, ময়নার প্রথম রোজগারের টাকার কেনা তোরঙ্গ, চামড়ার ছেঁড়া স্ট্রটেকেশ, কয়েক পাটি পুরনো জুতো এই সব নানা ধরনের জিনিস।

খাটের ওপর একধারে ময়নার মতো ডেলা তাকিয়ে ঘুমোচ্ছে রেণুবালা,—ময়নার সাত বছরের মেয়ে রেণুবালা।

—একি লার্নেড্ সাহেব? স্ত্রুতকে দেখে অবাক হয়ে বললে ময়না।

—কেন অবাক হবার কি আছে।

—বাঃ অবাক হবো না, অ্যান্দিন কি হয়েছিল?

—কী আবার হবে, কিছু হয়নি।

—তবে ডুব দিয়েছিলে কেন? খেলাধুলো ছেড়ে সরেসী হয়ে গেছ ভাবলাম। খসে পড়া আঁচলটা কাঁধের উপর তুলে দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেয় ময়না, বলে, তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।

স্ত্রুত খাটের পায়ের দিকে বসে বলল, সরেসী আর হতে পারলাম কোথায়। তোমার টানে আসতেই হল আবার।

আমার টানে?—খিল খিল করে হেসে উঠল ময়না। ভাগ্যিস ভগবান মুখ দিয়েছিল নইলে যে স্থাল কুকুরে টেনে নিতো।

—কেন মিথ্যে বলছি?

—মিথ্যে নয়? বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালো ময়না।

সত্যি, ময়না রূপসী। ওর ঘনপশ্ম ডুরু আর টানা টানা আয়ত দুটি চোখের অভিযোগের ভঙ্গিটা ভালো লাগে স্ত্রুতর। কালো মাজা রঙ, কিন্তু মুখশ্রীর তুলনা নেই। ভরাট স্বাস্থ্য উপছে পড়া শরীরে সুন্দর একটা ছন্দ আছে, অন্ত পরিবেশে একেই মনে হতে পারত কোনো এক তন্ময়ী শিল্পীর হাতে তৈরি দার্শন্যাত্মক ভাস্কর কীর্তি। একমাথা চুল, কটিতট ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশি, বাদামী তেলের উগ্র গন্ধটাকেও কেমন যেন ভালো লাগে স্ত্রুতর। বড়ো বেশি শরীর-সচেতন বলে এসব মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে স্ত্রুতর ঘেন্না করে। কিন্তু আজ ময়নার আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নেশা লাগে স্ত্রুতর। বস্তুতঃ ময়নার কাছে সে অনেকবারই এসেছে,

হয় টাকা ধার নিতে, কিংবা টাকা শোধ দিতে। সন্ধ্যাবেলা কিংবা বড় জোর দশটা এগারোটায় মধ্যে। কিন্তু আজ এই নিশ্চিন্তি মধ্যরাতে চেনা ময়নারই যেন আলাদা রূপ, লোকজনের আসাযাওয়ার উচ্চগ্রাম কোলাহলের বেতাল পটভূমিতে যে ছিল শুধু ময়না, আজ এই বদলে-বাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন শুধু ময়না ছাড়া আরো একটা অণু কিছু হয়ে উঠেছে। সেটা শুধু নিজের মনের অনুভব মাত্র, না বাস্তব—টের পায় না স্তব্ধ। মনে হয় দূরের নক্ষত্র শোভনা, কিন্তু কাছে উপগ্রহ তো ময়নাই।

ময়নারও মনে হয়, এই লোকটার এমনি করে আসার মধ্যে যেন কিছু একটা নতুন মানে আছে। কত লোকই তো এসেছে, টাকা দিয়েছে, আদায় করেছে টাকার অনুপাতে মূল্য, কাউকে কাউকে একেবারে হারানোর পর বুকের মধ্যে গোপনে টনটন করেছে কয়েক দিন, কিন্তু কোনোদিন মনে হয়নি আরও কিছু মানে থাকতে পারে এসবের। এই একটি লোক, কী ভাবে ও নিজেকে। ওর জন্মে ময়নার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই জমানো ছিল না। সব সহ হয়, সহ হয় না চরিত্রের অহংকার, ভালমানুষির জ্বালামি। সন্ন্যাসী! এসব ভণ্ডামি অনেক দেখা আছে ময়নার। অনেক দিনের সুপ্ত ঘৃণাগুলো হয়তো এমনি এক সুযোগ খুঁজছিল, ঐ দান্তিক লোকটা পায়ের ওপর মাথা খুঁড়ে বলবে—তোমাকে চাই—তোমাকে চাই, তবে না তার জয়? টাকা দিয়ে মন কিনতে চাইলে, ওর মুখের ওপরেই বলে দেবে ময়না, ওসব এখানে নয়, অন্যখানে যাও। লার্নেড সাহেবের আজকের আসার অণু মানে, যা একটা বোবা অনুভবের মতো তার মনে হতে থাকে, বুঝতে না পেরে ছটফটিয়ে উঠে ময়না ভাবে, হারজিতের খেলায় লোকটার কাছে তাকে জিততেই হবে।

অথচ এত কথা যে তার এইভাবেই মনে আসছিল তা নয়, অনেকগুলো বাকানো ভাবড়ানো চিন্তা ভালগোল পাকানো একটা বস্তুর মতো তার বুকের মধ্যে গড়াতে থাকে।

আগের কথার জের টেনে টোট টিপে হেসে আবার বলে, বলো না, মিথ্যে নয়?—তার আয়ত বিশাল চোখদুটো স্তব্ধতর মুখের ওপর যেন নাচতে থাকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধতর মনে হয়, আংটি বাঁধা দিয়ে কয়েকটা টাকা ধার নিতে এসেছে খেলবার জন্মে একথা শুনে কেমন ধীরে ধীরে নিভে যাবে ওর চোখের ঐ জ্যোতিটুকু। কথাটা সোজাসুজি পাড়তে সংকোচ হয়, বলে, ময়না আজ তোমার ঘরে লোক নেই যে।

—কেন, তুমি কি লোক নও ?

স্বভতর মুখে কোনো উত্তর আসে না।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে ময়না বলে, লার্নেড সাহেব !

বলো—

আমার কাছে কি কিছুই চাও না তুমি ?—কথাটাকে কেমন যেন গুছিয়ে উঠতে পারে না ময়না। অল্প পুরুষের কাছেও অনেকবার এই কথাটি ব্যবহার করেছে পুরনো অভ্যাসমতো। প্রতিবারই উত্তর শুনেছে। কেউ উন্মত্তের মতো চোঁচিয়ে বলেছে, কেউ স্থলিত স্বরে নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, তোমাকে—তোমাকে—তোমাকেই চাই শুধু।

স্বভত ময়নার কথাটার অল্পচার্য ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে, কিন্তু কথাটার অর্থ কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, আংটিটা বাধা রেখে কিছু টাকা দেবে। ভারী টাকার দরকার। দেখি, চেষ্টা করে, খেলে কিছু হয় কিনা।

স্বভত যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই ময়নার চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠোট বাঁকিয়ে বললে, ঘড়িটা তো ছাড়াতে পারলে না আজো—আবার আংটি !

—হ্যাঁ। টাকার বড্ড দরকার।

—আমি কি স্নদের ব্যবসা চালাই।

স্বভত জানতো জিনিস বাধা নিয়ে বিশ্বস্ত লোককে টাকা ধার দেয় ময়না। কিন্তু বললে, না হয় ব্যবসাদার নাই হলে, দরকার কয়েকটা টাকা তাই বলে তুমি আমাকে ধার দেবে না ?

—তোমাকে ? হিসিয়ে উঠল ময়না, কেন দেব ? কাপ্তেনের সাঙাত বলে।

—না, তোমাকে ভালবাসি বলে।—কথাটা মিথ্যে স্বভত জানে। তবু স্বার্থবোধ থেকে ক্রমাগতই তার মাথায় কৃতকগুলো অভিনয় বুদ্ধি প্রথর হয়ে উঠছে। কথাটা তাই অত সহজে অত সুন্দরভাবে বলে ফেলেই সে বুঝতে পারলো টাকা সে পাবেই।

ময়নার বাকানো ঠোটটা সোজা হয়ে সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে অবিশ্বাসের গোপন কাঁটা বিঁধে থাকলেও সেটাকে উপেক্ষা করে সে খুশি হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত ঢেউ তুলে বললে, সত্যি লার্নেড সাহেব ?

—সত্যিই ময়না।

—কই অ্যাড্বিন তো বলোনি ?

—বলবার দরকার পড়েনি তাই।

শ্রোতে-পড়া জন্তুর মতো স্বরতর মনে হতে থাকে, সে যেন ভেসে যাচ্ছে। নিজের তৈরি মিথ্যা ঠেলতে ঠেলতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর একটা মিথ্যার দিকে।

স্বরত বললে, তুমি কী সুন্দর ময়না!

—অ্যান্ডিনে তবে সন্ন্যাসীর চোখ পড়ল।

স্বরত ময়নার চোখের ওপর চোখ রেখে শুধু বলল, হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত দুজনের মনের মধ্যেই যেন ঝড় বইতে লাগল।

সেই মুহূর্তে স্বরতর সত্যিই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, ময়না সুন্দর এবং এতদিন সে নিজেকে ঠকিয়েছে। নিজের মনের মিথ্যাটুকুকে নিজের কাছেই সত্য করে তুলতে ইচ্ছে হল তার। নীতিবোধের মিথ্যে পাঁচিল অনেক দিন ধরে গেছে। আরতির জন্তে টাকা নিতে হয় ময়নার কাছ থেকে, অথচ সেই ময়নাকেই সে ঘৃণা করে এসেছে বারবানিতা বলে,—নিতান্ত যুক্তিহীন ছেলেমানুষী বলে মনে হল যেন তার এই অদ্ভুত নীতিজ্ঞানটাকে। পাপপুণ্যের বোধ তার নেই, নীতিবোধও নেই তার। নিজেকে ধ্বংস করার এক বেপরোয়া উন্মাদনায় তার মনে হতে থাকে, ময়না, তোমাকে আমি ভালবাসি।

অথচ এ-কথার মধ্যে লোভার্ভ পুরুষের কণ্ঠস্বরটি শুনতে পাওয়ার মতো মনের অবস্থা থাকলে, সে নিজেকে ভয় পেয়ে চমকে উঠে ময়নাকে দূরে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেত, আরতির কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার স্বপ্নায় অস্থির হয়ে যে-নরকের বাইরে সে যেতে চাইছে, আবার সে মিথ্যাভিনয়ের মুখোশ এঁটে নিজেকে ঠকিয়ে সে-নরকের মাঝখানে গিয়ে ঠাই চাইত না। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর আর সবকিছু মিথ্যে হয়ে শুধু ময়নার ঐ আয়ত দৃষ্টির সন্ধানটাই তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে উঠল। তার মাতাল রক্তের ওঠাপড়ায় একটাই শুধু কল্লোল উঠলো, শরীর চাই, আরো-একটা নতুন শরীর।

আর ময়নাও ঠিক একই সময়ে অনেক কিছু ভাবলো; সব বার যেমন ভেবেছে যে এবার বুঝি ভালবাসা পেলাম, এবারও তেমনি করে ভাবলো, ভালবাসা পেলাম। স্বরতর আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভুল করে ও ভাবলো, ভালবাসা। ওর লোভার্ভ দৃষ্টিটাকে ভাবলো পূজো। আর ওর শুকনো মুখে তেমনি করে বসে থাকাটাকে মনে হল, লার্নেড সাহেব কত দুঃখী। নবোঢ়া বধূর মতো মনে হল নিজেকে।

সুব্রতর কোলের ওপর মুখ গুঁজে অস্পষ্ট একটা স্নেহের আবেশে তার শরীরে কাঁপুনি ধরল, যেমন ধরত বহু যুগ আগে। মরা অতীত থেকে কুমারী ময়নার সপ্নগুলো চোখের সামনে নেচে উঠল তার।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। পিঠের ওপর সুব্রতর হাতের স্পর্শে মুখ তুলে তাকালো ময়না। বিষয়বুদ্ধি সহজ সংস্কারের মতো তার রক্তে বাসা বেঁধেছে। বললে, কত টাকা চাই?

—ধরো টাকা ত্রিশেক। আংটিটা নাও—সুব্রত টান মেরে পৈতেয় পাওয়া সোনার আংটি আঙুল থেকে খুলে নিয়ে ময়নাকে দিল। ময়না শাড়ীর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে দেবাজ খুললে। আংটিটা রেখে গুনে গুনে টাকা বার করলে। সুব্রতর হাতে দশ টাকার নোট তিনটে দিয়ে বললে, আমার কমিশন?

সুব্রত ময়নাকে দুখানা দশ টাকার নোট ফেরত দিয়ে বললো, রাখো। জিতলে আরো পাবে। ময়না হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বোসো একটু—আসছি।

ময়না পাশের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরটা রান্নাঘর। একটু বাদে ফিরে এসে ঘুমন্ত রেণুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, বোসো, বেঁও না। একে রেখে আসি ওঘরে।

সাত বছরের মেয়েটা ঘুমে দলা পাকিয়ে গেছে। ঠোঁটের কস বেয়ে লাল। ঝরছে লম্বা স্নতোর মতো। তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল ময়না। সুব্রতর এতক্ষণে প্রথম মনে হল, এ কী করেছে সে এতক্ষণ। ছি—ছি।

কিন্তু মনের মধ্যে ছি-ছি করাটা পুরোপুরি রূপ নেবার আগেই ময়না ফিরে এসে দরজার পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, বললো, লার্নেড সাহেব, সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো?

সুব্রতর মনে হল, ঐ ঘণ্য মেয়েটাকে কী করে সে বলতে পেরেছিল, সে ভালবাসে। লক্ষ্মীটেরা রেণুবুবার ঠোঁটের কস বেয়ে ঝরা লালার স্বপ্ন স্নতোটা ফাঁসের দড়ির মতো তার গলায় আটকে তাকে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে দিল। চিৎকার করে সুব্রত বলতে চাইল—না—না—না। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে ময়না সুব্রতর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর, সুব্রতর চোখের সামনে থেকে পরিচিত পৃথিবীর রঙ মুছে যেতে লাগলো, সমস্ত স্মৃতি ভালগোল পাকানো রবারের বলের মতো অকস্মাতে আছড়াতে লাগল, সুদূর নক্ষত্রের মতো হঠাৎ-ই সুব্রতর মনে পড়ে গেল শোভনার চোখ।

ময়না ফিস ফিস করে আবার বললে, বলো না লার্নেড সাহেব, সত্যি আমাকে ভুমি ভালবাসো ?

●● সাত ●●

সময়ের প্রবাহমানতাকে ঠেকিয়ে রাখবার পথ নেই কোনো । সময় বয়ে যাবেই । সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নিয়মিত শৃঙ্খলায় বাধা মানুষের রাজ্যপাট । একদিন একদিন করে জীবন ফুরিয়ে যাবার মোড়ে পৌঁছবেই । সেখানে আলোও থাকবে না, ছায়াও থাকবে না । শেষের সেই ভয়ংকর দিনের কথা কেই বা ভাবে । সারা জীবন ধরে দুর্ভাবনায় চলে পাক ধরে মানুষের, এবং এমনি করে চলতে চলতে জীবনের বস্তু থেকে পাকা ফলের মতো টুপ করে ঝরে পড়ে ।

অথচ কলকাতা শহরের এই জীবন স্রোতের মধ্যে এমন একটা বেপরোয়া উদ্ভাস আছে, যা দেখলে মনেই হয় না, এই ইঁটকাঠ আর হিংস্র বাঁচা-মরার লড়াই সেরে কোথাও কখনো বিরাম নিতে হবে ছায়ায় ।

ঋতু বদলাতে বদলাতে কলকাতা তখন ঠিক শীতের মুখবন্ধে এসে ঠেকেছে । ময়দানের গাছপালায় তখন সবে একটি ছুটি করে পাতা ঝরতে শুরু করেছে । সন্ধ্যায় কুয়াশার মতো বুকচাপা ধোঁয়ার বস্তু । ময়দানের নির্জন ঘাসের ডগায় বুঝিবা কয়েক ফোঁটা শিশিরও । সকালের রোদের রঙ আর টকটকে নয় । হলদে চাঁপাসোনার রঙ । ভালো লাগালে লাগানো যায়, কিন্তু নিরবসর শহরের শহরতলীতে কাজের ভেঁা বাজে, কে দেখবে এই ইঁটকাঠ ঠেলে প্রত্যাখ্যাত ঋতুর নির্জন চলাফেরা ।

আদিত্য দেখে না । রক্তে তার মদের উত্তেজনা, রেসের গতি, আর সুবর্ণনায়ী কোনো এক মহিলার শরীরের তাপ । চোয়ালের ওপর হাড়টা বড়ো বেশি কঠোর হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ জানানি দেয়, : ভুমি বুড়িয়ে যাচ্ছ, অসুস্থমিত যৌবনের জালায় এখন শুধু ওত পেতে বসে থাকা শিকারের জন্তে । সবিতার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে একটা যন্ত্রণার কাতরানি, আরো একটা শীত এল, এবং ছোট ছোট স্বপ্নগুলো এক একটা মরা পায়রার মতো ঝরতে শুরু করেছে । সুকুমার আত্মহত্যা করেছিল, কেন কেউ জানে না । বুঝি সে কোনো মানে খুঁজে পায়নি জীবনের । ছবি রুবি নস্তু সম্ভরা ছোট । আর হিংস্র । শীত তাদের কাছে শুধু একটা শীতের জামা ছাড়া কিছু না । নিরজার খাবড়া কপালে সিঁদুরের বড়ো টিপটার ধার ঘেঁষে অস্বাচ্ছন্দ্যের রেখা ফুটতে থাকে ক্রমশঃ ।

সুবর্ণ একটা বুড়োর ক্লেদাক্ত লোভের আমরণ সন্ধিনী। তার চোখেই পড়ে না, কখন বর্ষা আসে, কখন বা শীত। কেউ যা জানে না, এমন একটা অশ্লীল অস্তিত্ব নিয়ে এ-সংসারের ছোট ঘরটায় দ্বীপাস্থিত সে। চারপাশে ঢেউ, সমুদ্র, হাউর আর চোরাপাহাড়।

প্রত্যেকটি মানুষ তার তাৎক্ষণিক বেঁচে থাকার কুটিল অভিসন্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকছে। ননৌ কাপ্তেন বাঁচছে—ময়না বাঁচছে। দেবেশ, সুভাষ, শান্তনুবাবু হরিহরবাবু সকলেই এই জটিল জীবনের নাগর-দোলায় দুলছে। আরতিদের সেই ঋতুহীন অন্ধকার ঘরের পারদ আরো একটু নিচে নেমে এল মাত্র। নতুন পাখিরা এসে বসল না ছাদের মাথায়, শিশির বুখাই ঝরলো কলতলার সঁাতসঁতে বাসন মেজে রাখা উল্লিষ্ট ছাইএর ওপর।

গত কয়েক মাসে অনেক লোক জন্মেছে এবং মরেছে। খবরের কাগজ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ বিতরণ করে গেছে ঘরে ঘরে, দেশের নেতারা যথোচিত বক্তৃতা দিয়েছেন, বিদেশী ডেলিগেটরা এসেছে গেছে, রেডিওতে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের গান বেজেছে, লোকে লক্ষ লক্ষ কথা বলেছে, একটা বৃহৎ কাজের কারখানায় যন্ত্রগুলি ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে।

গত কয়েক মাসে অরুণের শরীর আরো ধারাপ হয়েছে। বেঁচে থাকলে কী কী করবে তার ধসড়া বার বার করে নতুন করে তৈরি করে সে। কোনো এক মকস্মল স্কুলের মাস্টারি নিয়েই না হয় চলে যাবে, যদি বাঁচে। বাঁচবার ভরসা যত কমতে থাকে, তত বাড়তে থাকে বাঁচবার তৃষ্ণা। আরতি যে বেঁচে আছে সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে, এও তাকে পীড়া দেয়। কাশিটা বেড়েছে, বুক পিঠ জুড়ে ভোঁতা ব্যথা। কয়েক দিন ধরে অরুণ ক্রমাগত ভাবছিল, কথাটা কীভাবে বলবে। বলতে তাকে হবেই। আরতিও অরুণের চোখ দেখে বুঝতে পারছিল, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া ক্রমে ক্রমে কালো হয়ে উঠছে। সে নিশ্চিত বুঝেছে, অরুণ তাকে কোনোদিন ভালবাসেনি, সুব্রতও তাকে ভালবাসে না। কী হল নিজেকে এমন ভাবে ফুরিয়ে দিয়ে। ছোটবেলা থেকে সে ভেবে এসেছে এমন একজন আসবে তার জীবনে যাকে দেখে মনে হবে, একেই সে খুঁজছিল এতদিন। যখন অরুণ এসেছিল জীবনে, মনে হয়েছিল এ সেই। ধোঁয়া দেখে সে আগ্নেয়গিরি ভেবেছিল। অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়ে দিল, ছাই, শুধু ছাই ছাড়া কিছুই নেই আর। বেদী থেকে অরুণের মূর্তি ফেলে দিয়ে সুব্রতকে সেখানে বসিয়েছিল।

প্রথম যেদিন মনে হল সূত্রতই সেই পুরুষ, যাকে সে একদা পাগলের মতো খুঁজেছিল, যা অরুণ নয়, আর কেউ নয়, সেদিন সে কী তার কাঁপুনি। কাঁপতে কাঁপতে কেবলি মনে হচ্ছিল, এ আমি কি করলাম, কেন ভালবাসলাম।

এ যে অন্ডায় —

সেই গোপন প্রেমের ভয়ংকর সুন্দর অনুভূতিটাকে নাকি মনে মনেই লালন করত সে, এমন করে দেউলে হয়ে যেত না। অন্ততঃ অসীম দুঃখের সময় সেই বেদীতে বসানো মূর্তিটাকে করুণা করে মানতে পারতো, আছে সে আছে, যে আমার সব ব্যর্থতাকে পূর্ণ করে দিতে পারতো। সেই ভুল স্বপ্নের ছেলেমানুষীই তো ভালো ছিল এর চেয়ে। কী নেশায় যেতে, কী আশার হরিণকে ছুঁতে গিয়ে নিজের হাতে খুন করল নিজের স্বপ্নকে। সূত্রতর সস্তানের মা হওয়া আর সূত্রতকে ভালবাসা কি এক কথা?

হড়হড়ে বমির মতো নোংরা মনে হয় পুরুষ জাতটাকে। শরীরের ওপর ছমড়ি খেয়ে পড়া দস্যুতা ছাড়া আর কি কিছুই নেই ওদের? কী নগ্ন আর নির্লজ্জ। বেদীতে যাকে পূজা করবে বলে বসানো, কি মন্ত্রে কুকুরের মতো ছোট হয়ে গেল সে।

অরুণ টের পেয়েছে—ওর চোখের উদ্ভ্রান্ত ভীত হিংস্র চাউনি দেখেই আরতি বুঝে ফেলেছে। একটা ভয়ংকর কিছু করে ফেলবে অরুণ, সে ভয় অবশ্য আরতি করে না। তবু গা ছম ছম করে। একটা অস্বস্তিকর শরীর তার শরীরের রস নিরে বাড়ছে। নিজের মধ্যকার ভয়ংকর তিরস্কার ছাড়া আর কাকে সে ভয় করে, অরুণকে? যেদিন অরুণ তাকে প্রথম পেয়েছে, সেদিন থেকেই যে তার কাছে ইঁদুরের মতো ছোট হয়ে গেছে লোকটা। পাঁচজনে কি বলবে, মুখ দেখাবে কি করে, এই ভয়টাও নিজের ভয়ের কাছে কতো ছোট। জঘন্য দুর্নীতির কীট ভেবে ওকে যারা দুয়ো দেবে, তাদের সম্পর্কে আরতির কোনো বোধ নেই, কেননা মানুষ মাত্রেই নির্বোধ এবং নিজের নিজের চেহারা দেখতে ভর পায় বলেই দুর্নীতিকে তাদের এত ঘৃণা। দেশটা বাংলা দেশ, এবং সতী-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে সে। অতএব অসতী বলে তার পাওনা দুর্নাম তাকে পেতেই হবে। ভগবান, তুমি যদি থাকো, (আরতি ভগবানে বিশ্বাস রাখে) তুমি তো জানো, নোংরামি আমি চাইনি। অরুণের ভালবাসার ফাঁকি যদি ধরতে পেরে থাকি, সে কি আমার অপরাধ। আর, সূত্রতর সুন্দর নির্লজ্জ আকৃতির কাছে ভুল করে পূজা দিতে গিয়ে বলি হয়ে গেলাম, সেও কি

আমার অপরাধ। বারবার আরতি প্রার্থনা করে, ভগবান, আমাকে বলে দাও, কেন এমন হল, আমি যা চাইনি, কেন তেমন নোংরা নরকে আমাকে নিয়ে গেলে।

একই ছাদের তলে শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর সেই কয়েকটা দিন কেটেছে ভয়াবহ যন্ত্রণার মধ্যে। মাঝরাতে অরুণ কেশে উঠেছে—ঘঙ—ঘঙ। সেই কাশিটা তার কাঁপা বুকের ভেতর থেকে উঠে দূরের গির্জার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিশে গেছে। আরতির শরীরে কাঁটা দেয়। গির্জার সঙ্গে কবরখানার কেমন যেন একটা মিল আছে। কবরখানার সামনে দিয়ে যেতে যেতে একদিন সে একটা ককিন দেখেছিল। গন্তীর। ঠাণ্ডা। ভয়ংকর।—তার মনের মধ্যে যেন কেমন করে উঠেছিল। অরুণের কাশিতেও সেই মন-কেমন-করা অস্বস্তি। আরতি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী প্রার্থনা করবে কিছুই বুঝতে না পেরে প্রাণপণে শুধু বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার কাঁটা তোলবার জন্যে অস্পষ্ট ভাবে ঠোট নাড়তে থাকে, ভগবান ভগবান।

এমনি করে কয়েক দিন কাটল। অস্বস্তিতে, সংশয়ে, যন্ত্রণায়। এঘর ওঘর মাঝখানের দরজাটা, দিনের মধ্যে পাঁচশ-বার ওঘরে যেতে হয় আরতিকে, তবু অরুণের চোখের মধ্যবিন্দুতে আরতির চোখ আর কিছুতেই পড়ে না।

অবশেষে অনেক পরে, প্রত্যাশিত সময় সীমা পেরিয়ে যাবার অনেক পরে, অরুণ আরতিকে ধরে ফেলল। বললে, বোসো।

নিয়তির এই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে আরতি প্রায় তৈরি হয়েও ছিল। পুরনো শাড়ীটার ছেঁড়া আঁচলটা ছিঁড়ে আরো একটু বাড়িয়ে দিতে দিতে বাধ্য মেয়ের মতো স্বামীর নোংরা বিছানার পাশে এসে বসল আরতি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃত্যুদণ্ডের আগের মুহূর্তটাকেই যেন রবারের মতো টেনে টেনে বাড়িয়ে দিল অরুণ। তারপর একসময় ভেতরে ভেতরে উশখুশ করে উঠে অরুণ অস্বাভাবিক হালকা গলায় বললে, তারপর, কী ঠিক করলে?

এ এক শাস্তি। যদি নোজাসুজি বলতো, আরতি তুমি অসৎ চরিত্র, বিশ্বাসের দাম রাখোনি, তুমি মরে যাও—আরতির পক্ষে সহজ হত সেই মুহূর্তটাকে সহ্য করা। কিন্তু সে-সব কথা অরুণ বললে না। যেন একটু একটু করে চাপ দিয়ে দিয়ে গলা টিপে টিপে শ্বাস বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র নিয়েই অরুণ এমন ঠাণ্ডা গলায় বলতে পারলো, তারপর, কী ঠিক করলে?

তারপর নিজের মধ্যে জেগে সেই অস্বস্তির জটিল মুহূর্তটাকে হৃ-হাতে ছিঁড়ে ফেলে আরতি অনুভূতিহীন গলায় বললে, কিসের ?

অরুণ অনেকক্ষণ আরতির মুখের ওপর তাকিয়ে রইল। কী যে কষ্ট হচ্ছিল আরতির ওর ওই বোবা চোখের ভাষা বুঝতে পেরে। শুধু মনে হয়, তোমার তো সবই গেছে, বাচার আশাটা পর্যন্ত নেই—তবু কেন একবারের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারো না তুমি। সত্যি সত্যি তার গলা টিপে ধরে কেন বলতে পারে না অরুণ, আমি তোমাকে খুন করব এবং সত্যি সত্যি খুন করব। কেননা, আমার ভালবাসাকে তুমি খুন করেছ।—কিন্তু না, অরুণ শুধু মরা ছাই। ওর গলায় শুধু ঠাণ্ডা হয়ে আসা ফ্যাকাশে একটু অভিযোগ।

অরুণ বললে, আমি যদি সত্যি না বাঁচি, খুশি হও, না ?—কথাটা বলতে গিয়ে পঁচাপঁচে একটু স্পর্শকাতরতার হাওয়া দিয়ে কঠিন মুহূর্তের বরফটাকে ও যেন গলিয়ে দিতে চায়।

আরতি উত্তর দেয় না। দেওয়ালের কোণে মাকড়সার জটিল জাকরির মধ্যে ডিম পাড়ছে মেয়ে মাকড়সা—নিশ্চয়ই ডিম পাড়ছে, নাইলে ওখান থেকে এমন একটা গভীর গম্ভীর নিঃশব্দতা বয়ে আসছে কী করে। আরতি ভাবে, এবং ভাবতে গিয়ে আরো অবাক হয়ে গিয়ে ভাবে, এমন ভাবনা তার এল কেন ?

অরুণ উত্তর দাবি করে না আরতি কাছে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণ ডাকল, আরতি—

—বলো—

কেন এমন করলে—

কি—

এই স্তব্ধতার সঙ্গে—আবার চুপ করে গেল অরুণ।

একটা কক্ষিনের ভেতর থেকে কথা বলছে : নাকি অরুণ। নাকি, অরুণ, যে-অরুণকে এতকাল চিনে এসেছে আরতি, মরে গেছে ; আর সে, আরতি, একটা মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলছে।

বেশ, তোমরা স্নেহে থাকো।—বললে অরুণ। আরতি বুঝলো, কথাটা অরুণ বানিয়ে বলল, সাজিয়ে বললো, তাই না এমন নাটকের মতো শোনালো। বুঝি কয়েক সেকেন্ড ধরে মনে মনে আরতি খুঁজে পাচ্ছিল সেই পুরনো একটা স্বপ্নকে, যে-স্বপ্নের বেদীতে ছিল অরুণ। কিন্তু ঐ নাটকটুকুই অসম্ভব একটা মাছির মতো তার ঘায়ের ওপর ভন্ডন করে উঠল। চমকে মুখ

তুলে কর্কশ গলায় আরতি বললে, সে-জন্মে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কেন? ডুব জলে পড়ে যাওয়া মানুষের মতো শোনালো প্রশ্নটা।

আরতির চোখের কোণ জ্বালা করে এল, কিন্তু কারা পেল না একটুও।

এমন কি অরুণের এই নাটুকেপনায় সে যথেষ্ট ভাবে রেগে উঠতে পারছে না

বলে নিজের ওপরেই রাগ হতে থাকে তার। তবু গলাটাকে যথাসম্ভব তীব্র

করে বললে, সব জেনেও স্তব্ধতর কাছ থেকে টাকা নিতে লজ্জা করে না

তোমার। বউ-এর চেয়েও ইঞ্জেকশনের দামটাই যার কাছে বড়ো, তেমন

লোককে আমি ঘেন্না করি।—অরুণের মুখটা ব্যথায় কেমন নীল হয়ে গেল।

আড় চোখে দেখে নিয়ে নাটক করতে করতেই বুকের ভেতরে এঁটে থাকা ভয়াবহ

সত্যটা তার গলা চিরে বেরিয়ে এল, জেনে রেখো, আমি তোমাকে ঘেন্না করি।

ভালবাসি না, দয়া করে তোমার ওষুধের যোগান দিই। বুঝলে, তোমাকে

আমি ঘেন্না করি।

উত্তেজনায় দ্রুত নিশ্বাস পড়তে থাকে আরতির। মানুষ খুন করলেও বোধকরি

এমনি হয়। খুন করে দেখেনি আরতি, কিন্তু মনে হল, সত্যি যদি কখনো মানুষ

খুন করত আরতি, হয়তো এমনি দ্রুততর হত তার শ্বাসক্রিয়া।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। অরুণ নড়লও না, কথাও বললো না। আরতি

স্পষ্ট অনুভব করল, চোখের কোণের জলুনিটা নিভে এসে ভেতর থেকে কী যেন

একটা তরল স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে, তার চোখ দুটো অন্ধকার করে দেবার

জন্মে।

অরুণ গায়ের ওপর চাপানো কঞ্চল ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল। বালিশটা মাথার

দিকে আরো একটু ঠেলে দিয়ে উঠে বসল। আরতি দেখল, অন্ধ হতে হতেও

দেখতে পেল, অরুণের ময়লা গেঞ্জির ভেতর থেকেও সব কটা হাড় পাঁজরা

গুনতে পারা যায়। সেই অবসরে অরুণের চোখেমুখে একটা আদিম হিংস্রতা

ফুটে উঠছিল, হাড় ওঠা শরীরটার দিকে না তাকিয়ে অরুণের মুখের দিকে

তাকালেই বুঝতে পারতো আরতি।

তারপর সেই মানুষটা আরতির দু-কাঁধের ওপর খাবার মতো দুটো কংকালসার

হাত রাখলো। তারপর ভয়ংকর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আরতিকে টেনে

নিয়ে তার বিহ্বল ঠোঁটের ওপর দাঁত বসিয়ে একটা গভীর দীর্ঘ হিংস্র চুসন দিতে

দিতে নিজের বুকের মধ্যে পিষে পিষে, ওকে প্রায় নগ্ন বিবর্ণ শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে

দিতে, মাটির ওপর দুজনে মিলে ছিটকে পড়ে গিয়ে আরতির বুকে পিঠে গালে

োটোটে অন্ধ পশুর মতো অনেকদিনের না-কাটা নখের আচড় দিয়ে দিয়ে, আরতির দেহটাকে টান মেয়ে ঘরের কোণের দেওয়ালে ছিটকে দিয়ে, তক্তাপোশের থেকে অর্ধেক নুলে আসা তোষকের ছেঁড়া তুলোর মতো পেঁজা-পেঁজা একটা শরীরকে শাস্তি দিল। টেবিলের ওপর থেকে উলটে পড়া কাঁচের শিশি মেঝেতে পড়ে টুকরো কাঁচে ঘর ভরে গেল। আর অরুণ হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, তবে মরো। তবে মরো।

কী আশ্চর্য, ঐ অসম্ভব সময়টাতেও আরতির মনে পড়ল বন্ধিম চাটুজ্যের গোবিন্দলালও রোহিনীকে ঐ কথাই বলেছিল।

আরতির গলা দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত ফুটল না। তারপর অরুণ উঠে এল। তোষকটা ঠিক যেমন ছিল হাত দিয়ে তেমনি করে তক্তাপোশের মাপে মাপে বসিয়ে নিয়ে কঞ্চলটা টেনে গায়ে দিতে গিয়ে কাশতে শুরু করল। সেই কাশি যা শুনে মাঝরাতে আরতির গায়ে কাঁটা দেয়। ঘঙ ঘঙ—যেন ধনির ভেতরে কয়লা কাটার শব্দ। কাশতে কাশতে গলা দিয়ে রক্ত উঠল, এবং যতবার রক্ত উঠল, অরুণের মনে হতে লাগল, এবার বেঁচে উঠলে জীবনটাকে ঠিক ঠিক মতো সাজিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে আর নয়—জীবন তো সত্যি আর কিছু ছেলে-খেলার জিনিস নয়।

এ ঘটনার কয়েক দিন পরেই অরুণ মারা গেল, এবং স্মৃতিকেই তার সৎকার করতে হল।

● ● আট ● ●

সিঁড়ির মুখে নমিতা ধরে ফেলল স্মৃতিকে। বললে, দাদা পালিও না, কথা আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল স্মৃতি।—কি কথা?

—আজ তাড়াতাড়ি ফিরিস।

—কেন রে?

—আজ মাংস হবে। মাসের মধ্যে চোদ্দদিন তো বাড়ি ফিরিস না। বলে রাখলাম, বারোটোর মধ্যে ফিরিস কিন্তু।

স্মৃতি একটু অবাক হল। কতদিন বাপ মা ভাইবোনদের সঙ্গে সে কথা বলেনি, আর সেইটাকেই প্রায় নিয়ম করে ফেলেছিল। আজ হঠাৎ নমিতার এই পথ আগলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার আহ্বানে তাই একটু অবাক হতে হয় বৈকি।

আচ্ছা কিরব।—সুত্রত বেরিয়ে পড়ল।

নমিতা কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিচে নেমে এল। রান্নাঘরে সব উলুনে আঁচ পড়েছে, নিরজা চায়ের কেটলিতে হিসেব করে জল মেপে নিচ্ছিল। নমিতা বললে, মা, আজ মাংস হবে।

নিরজা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালো। কেন রে?

—কেন আবার কি, বাঃ। আমি মাইনে পেয়েছি না।—মায়ের অবাক হওয়াটা নমিতার কেমন খারাপ লাগে।

—এই তো সাত দিন চাকরিতে ঢুকেছিস। এরই মধ্যে মাইনে পেলি কি করে।

সাত দিন হোক আর দু-দিন হোক, পয়সা তারিখ হলেই আপিসে মাইনে দেয়। অত বকতে পারিনে বাবু। রীতিমতো বিরক্ত হয় নমিতা।

আদিত্যের তখনো ঘুম ভাঙেনি। ভাঙলেও মাংসের প্রস্তাবটা তাকে আগে জানাতে নমিতার আপত্তি। কেননা, বাপকে সে চেনে। ব্যাপারটাকে ভালো ভাবে নিল তো ভালোই, না হলেই গুণগোল বাধবে, সারা বাড়িতে কুৎসিত কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে যাবে। তাই সে পাশের বাড়ির দাঙকে ভেকে তার হাতে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বললে, বেশ ভালো করে সামনে কাটিয়ে আনিস কিন্তু। দাবনা থেকে নিস তাহলে বেশি মাংস পাবি। বুঝলি?—দাঙ ঠিকমতো বুঝতে পারলো কিনা বুঝতে না পেরে আবার বললে, বুঝলি তো?

দাঙ মাথা নেড়ে বললে, বুঝেছি।

পাশের বাড়ির এই দাঙ ছোড়াটা ভারী কাজের ছেলে। স্কুল ফাইনাল ফেল করে রাস্তায় উইকেট পেতে টেনিস্‌বল পেটে, লুকিয়ে চুরিয়ে সিনেমার টিকিট কেটে এনে দেয় এবং এটা ওটা ফরমাস খাটতে কখনো আপত্তি করে না।

বাজারের টাকা দিয়ে নমিতা মার কাছে এসে একটুখানি ইতস্ততঃ করে বললে, সুহৃদদাকে নেমন্তন্ন করেছি কিন্তু।

কেন, সুহৃদদাকে আবার কেন?—নিরজার কপালের ওপরের ভুরুজোড়া সন্দেহে টান টান হয়ে উঠল।

বাঃ, ঐ তো চাকরিটা জুটিয়ে দিল। ও না থাকলে হঃ—নমিতার মুখে আর কোনো কথা জোগায় না।

ব্যাপারটা নিরজারও অজানা নয়। সুহৃদ তো ছেলে ভালোই। এখানে ওখানে ধরে করেই না চাকরিটা জুটিয়েছে নমিতার। ও চেষ্টা না করলে এ বাজারে

নমিতাকে আর চাকরি পেতে হত না। তবু বাড়াবাড়িটা নিরজার ভালো লাগে না। চাকরি না হয় জুটিয়ে দিইছি, তাই বলে রোজ রোজ একসঙ্গে সিনেমায় দৌড়ুনো, তাও আবার সকলের চোখের ওপর দিয়ে—বেহায়াপনা কেন বাপু।

নমিতা বোঝে, স্নহদকে মা স্নহ করতে পারে না অশ্রু কারণে। বছর তিনেক আগে এপাড়ারই মেয়ে স্ননন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল স্নহদের। পাড়ার সবাই জানে, প্রায় একটি বছর ওরা প্রেম করেছে। আর তারপরই স্নহদ বিয়ে করেছে স্ননন্দাকে। করেছে নয়, করতে হয়েছে। বিয়ের পরবছরই স্ননন্দা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে। ওর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে পাড়ায়, এ বাড়িতে ও বাড়িতে। কিছুদিন শুকনো মুখে বউ-মরা স্নহদ রেস্টোরার বেঞ্চিতে চুপটি করে বসে কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষত শুকিয়ে যাবার পর আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। আবার আসনচ্যুত স্নহদ পাড়ার যুবকমহলে তার নেতৃত্বের আসনে বহাল হয়েছে এবং তদবধি নমিতার আসা যাওয়ার রাস্তার মাঝে মাঝে হিন্দী সিনেমার গান গেয়েছে। এরপরও ওর কাছে চাকরি খুঁজে দেবার উপকারটুকু নিতে নমিতার বাধেনি—নিরজারও না। বরঞ্চ নিরজাই একদিন ডেকে বলেছিল, তোমার তো বাপু অনেক জানাশোনা আছে শুনেছি। দাও না মেয়েটার একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে।

আস্তিন গুটিয়ে স্নহদ বলেছিল, আপনি ভাববেন না কাকীমা? এ-জি-বিতে আমার মেশো, কাজ করেন। দেখছি, কী করতে পারি।

এবং সত্যি সত্যিই এই স্নহদের চেষ্টাতেই একটা মাড়োয়ারী কোম্পানীতে কেরানীর কাজ পেয়ে গেল নমিতা। ভালো হোক, মন্দ হোক, সত্যি সত্যি তো কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে, একটা কৃতজ্ঞতাও তো থাকে মানুষের।

আসলে স্নহদের ঐ ইতিহাসটুকু যদি না থাকতো, নিরজা নিশ্চয়ই খুশি হত মেয়ের একটা হিল্লো হবার সম্ভাবনার। কিন্তু বউ-মরার কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে সে কি আর মানুষ একটা—সে পশু, পশুর হৃদ—ভাবে নিরজা।

কিন্তু সন্ত-চাকরি পাওয়া মেয়েকে চট্টাতে ভরসা হয় না। তাই মনের বিরক্তিকে মুখে ফুটতে না দিয়ে বলে, বেশ। বলেছ যখন, তখন আর কী।

আদিত্য ঘুম ভেঙেই বাড়ির পরিবেশে কিছু একটা পরিবর্তনের আভাস যেন গন্ধ শুঁকেই অনুমান করতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হোক মেজাজ তার ভালোই ছিল, তাই গুরোরের বাচ্চা পরিবৃত এই সংসারে হঠাৎ হংকার ছাড়ার ইচ্ছেটা চেপে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

যাকে চালু ছেলে বলা হয়, দাঙ হচ্ছে তাই। বাজার থেকে বাছাই করে সস্তায় ভালো মাংসই নিয়ে এসেছে সে। বেশ একটা সোরগোল তুলে মাংস রান্নার আয়োজন হচ্ছে। নমিতার অনেক দিন পর খুব ভালো লাগছিল সবকিছু। নিজের হাতে বাটনা বাটল, মাংস ধুয়ে মশলা মাখিয়ে নিজেরই সে মাংস চাপানোর আয়োজন করল। এত সবে মধ্য দাঙকেও নেনস্তর করতে ভোলেনি নমিতা।

এ বাড়ির গতানুগতিক জীবনে মাংস রান্নার ঘটনা কচিং ঘটে। রেসে মোটা রকমের লাভ হলেই কখনো সখনো আদিত্য মাংস কেনে। হয়তো সেইজন্তেই বাড়ি জুড়ে বেশ একটা আনন্দের সোরগোল উঠেছে।

নমিতা বললে, সবিতা, আজ আর তোকে কলেজ যেতে হবে না।

বিশেষ প্রয়োজন সত্ত্বেও সবিতা দিদির এই আদেশ, কিংবা বলা চলে অনুরোধট, উপেক্ষা করল না। ছবি নস্ট্র সস্তদেরও ধুলে যেতে হল না আজ। সারাটা সকাল রোদে ওরা দাপাদাপি করে বেড়ালো। তারপর এক সময় ভর ভর করে মাংসের গন্ধ উঠল। দু-চারটে ভাজাভুজিও হল। অর্থাৎ এবাড়ির তুলনায় বেশ একটা এলাহি ব্যাপারই বলতে হবে।

বেলা বাড়তেই ছেলেমেয়েরা অধৈর্য হয়ে উঠল। রান্না শেষ হয়েই এসেছিল। তবু নিরজা আগে আদিত্যকেই খাইয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে চায়। মেজাজ ভালো আছে, এইবেলা খেয়ে-দেয়ে চটপট ঘুমিয়ে পড়লে এ-বেলার মতো নিশ্চিত। তারপর ধীরে স্নেহে অন্তেরা খেলেও চলবে।

খেতে বসে আদিত্য বললে, নমি চাকরি পেয়ে থাওয়াচ্ছে বুঝি।

—হ্যাঁ। নিরজা বললে।

আদিত্য খুশি হয়ে একটা হাড়ের নালি থেকে মাংস চুষে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, যাক, তবু মেয়েটার হিলে হল।

আজ ঝগড়া করবে না বলে নিরজা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল, তবু ঐ একান্ত সন্তুষ্ট মুখভঙ্গি দেখে পিঙ্কি জ্বলে উঠল তার। বললে, অমন হিলের গলায় দড়ি। বিয়ে দিলে পাঁচ ছেলের মা হত যে, সে খেয়াল আছে। নিজের তো উড়নচণ্ডী হয়ে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে বসে আছ, মেয়ের বিয়ে দেয় কে?

আদিত্য দুই চোঁটের মাঝখানে মাংসের হাড়টা বার করে নিয়ে দাঁতের ঝাঁকে মাংসের ঢেলাটাকে জিভ দিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, বলি থামবি, না বকবক করবি?

অন্টার বলছি যে খামবো—মুখ ঝামটে উঠল নিরজা। স্নহদকে নিমন্ত্রণ করা নিয়ে মনের মধ্যে একটা উত্তাপ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, নমিতাকে ঘাঁটাতে সাহস হয়নি, কিন্তু রাগটা মনের মধ্যে চাপাই ছিল। তাই মাংস খেতে খেতে আদিত্যের মুখে যে লোলুপ পরিতৃপ্তির রেখা ফুটে উঠেছিল, তাই দেখতে দেখতে মনের ভেতরে পুষে রাখা বিক্ষোভ হঠাৎ-ই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ অসম্ভব রুঢ় গলার আদিত্য চিৎকার করে বললে,—বজ্জাত মাগী, নিশ্চিন্তে আমাকে খেতেও দিবিনে?

নমিতা সবে বাথরুমে ঢুকেছিল। আজকের দিনটা বাপের মেজাজের ব্যতিক্রম দেখে মনে মনে খুশি হয়েই সে চান করতে ঢুকেছে। চিৎকার শুনে, বাথরুমে দাঁত দিয়ে টোট চেপে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুবর্ণ তার হবিশি রান্না চাপিয়েছিল সিঁড়ির নিচের জায়গাটুকুতে। আদিত্যের চিৎকারে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সবিতা উপরের ঘরে আধপড়া নভেলের পাতায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করছিল। পাতা খোলাই রইল। মনে মনে সে প্রমাদ গুণল। আজকের দিনটাও বাদ দেবে না?

আদিত্যের বাটিতে তখনো চার টুকরো মাংস এবং একটা মেটে। রাগ করে পাত ছেড়ে উঠে যাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মাংসটা বেশ স্বাদু আর নরম নরম। ভালোই সেক হরেছে বলতে হবে। মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়া সঙ্গেও রাগটাকে যাওয়ার ওপর চালান দেওয়া গেল না। তাই, কাঁপতে কাঁপতে আসন ছেড়ে উঠে এঁটো হাতেই নিরজার পিঠের ওপর দুম্ করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে আবার পাতে গিয়ে বসল। কী আশ্চর্য, এর পর নিরজার পক্ষে চিৎকার করে বাড়ি মাথার করাই উচিত ছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি অন্টার বিচার, ঠিক এই সময় দরজার গোড়ায় স্নহদ এসে ডাক দিল, কাকীমা।

কিল খেয়ে কিল হজম করার শিক্ষা নিরজা পায়নি। :তবু নেহাৎ বাইরের লোকের সামনে কেলেংকারী বাড়াবার সাহস হয় না। নিরজা নিশ্বাসটাকে সহজ করে এনে বলল, এসো বাবা। ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে চলে যাও, গিয়ে বসো। আসছি।

সুবর্ণ হঠাৎ অতিরিক্ত লজ্জাবতী হয়ে মাথার ওপরের খানকাপড়ের ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিল।

যেন কিছুই হয়নি এমন গলার আদিত্য বললে, দাও দেখি আর একটা মেটে। ভারী সুন্দর হয়েছে—

নিরজা রাগে গর্গর করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, না, না আর পাবে না, উঠে যাও, উঠে যাও বলছি।

আদিত্যরও চক্ষু লজ্জায় বোধকরি বাড়াবাড়ি করতে বাধলো। শেষ পর্যন্ত মাংসের অবশিষ্ট ঝোলটুকু চুমুক দিয়ে পেরে সে উঠে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর দাশুও এসে গেল। এঁটো কাপড় ছেড়ে নিরজা ছেলেমেয়েদের খেতে বসালো। নমিতাকে বলল, সুহৃদ আর দাশুকে না হয় ওপরেই পাত পেড়ে দে। এখানে তো এঁটোকাঁটার আস্তাকুড় হয়ে আছে।

নমিতা তদারক করে খাওয়ালো ওদের। এমন কি নিরজাও একবার ওপরে গিয়ে তদারক করে বলে এল, দেখো বাবা লজ্জা করে খেয়ো না যেন।

দাশু একমুখ ভাত মুখে পুরেছিল। অবোধ্য স্বরে শুধু মাথা নেড়ে জানান দিলে, উঁহু।

সুহৃদ বললে, লজ্জা। লজ্জা করব কেন?

খাওয়া দাওয়া সেরে পান না নিয়েই দাশু চলে গেল। খাওয়ার সময় বলে গেল, চমৎকার মাংস হয়েছে, নমিতাদি।

দাশু চলে গেল কিন্তু সুহৃদের যাবার নাম নেই। নিরজা নিচ থেকে হাঁকল, কিরে তোদের হল—

যাই যা—

ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেছে। সবিতাও খেয়ে নিয়েছে। বাকি শুধু নিরজা আর নমিতা। আর সুব্রত এখনো যখন ফিরল না, তখন এবেলা আর ফিরবে কিনা তার ঠিক কি।

—আপনি বসুন সুহৃদদা, আমি খেয়ে আসি চট্ করে।

পানের বোটা থেকে চুনটা ঠোটে নিয়ে সুহৃদ বললে, আমি বরঞ্চ উঠি, কি বলো।

—উঠবেন। এরি মধ্যে?—নমিতা সুহৃদকে বসতে বলতে চায় না, অথচ আচ্ছা আসুন বলে তখনি বিদায় করতে চক্ষু লজ্জায় বাধল।

—বলছ বসতে। তবে বসি—একটা অর্ধপূর্ণ আন্তরিকতার টান এসে সুহৃদ মেঝের ওপর ভাঁজ করা সতরঞ্চের ওপর বসে একটা বালিশ টেনে নিল কোলে।

নমিতা নেমে গেল।

সবিতা হাত মুখ ধুয়ে চুপি চুপি সুব্রতর ঘরের দিকে যাচ্ছিল। দরজার কাছ থেকে সবিতাকে দেখতে পেয়ে সুহৃদ বলল, সবিদদি যে আজ আমাকে চিনতেই পারছ না।

এ কথার পর লোকটাকে নেহাৎ না দেখার ভান করে ওপরে চলে যাওয়া যায় না । সবিতা ঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো । লোকটার চোখে মুখে এমন একটা অসভ্যতা যে ওর গা ঘিনঘিন করে, তবু চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, চিনবো না কেন ।

কোথায় আর চিনলে । এই তো চলে যাচ্ছিলে ।

নস্তু এসে দিদির কোল ঘেঁবে দাঁড়ালো । সুহৃদ মুখের মধ্যে উচ্ছ্রিত পানের পিকটুকু গিলে নিয়ে ডাকলো, নস্তু ভাইটি, এদিকে এসো তো ।

নস্তু নড়বে না । ঐ যে লোকটার সুন্দর করে কামানো গোগের পাশে একটা বিল্লী আঁচিল আর চোখের রঙটা কেমন বাদামী বাদামী—সন্তুর কেমন খারাপ খারাপ লাগলো ।

সুহৃদ এগিয়ে এসে থপ্ করে নস্তুকে গ্রেপ্তার করে তার গাল টিপে দেয় । কিন্তু এত আদরেও নস্তু হাসে না, হাসতে ইচ্ছে করে না ।

সুহৃদের বাহুবন্ধন থেকে ছাড় পেয়েই নস্তু একছুটে ছাদে পালিয়ে যায় । সবিতা হেসে উঠে বলে, পাগল !

সবিতা কিন্তু সোজাসুজি তাকায় না লোকটার দিকে । লোকটার চোখে কেমন একটা বর্বর চাঁউনি, সারা শরীরটা যেন চোখ দিয়ে চাটছে । ছবিটা কি, কোথায় যায় এসময়—সবিতা অস্বস্তিতে প্রায় ঘেমে ওঠে ।

সুহৃদ দেখছিল, সবিতার চোয়ালের হাড় নমিতার চোয়ালের হাড়ের মতো অত স্পষ্ট নয়, শরীরের বাধুনি নমিতার চেয়ে অনেক ভালো । অন্ততঃ তার বন্ধুহলে সবিতাকে নিয়ে সে একটা হৈ চৈ ফেলে দিতে পারে । নিচে নমিতার গলা শোনা গেল । খাওয়া দাওয়া বোধকরি শেষ হল ওদের ।

সুহৃদ পানের পিক ফেলতে উঠে বাইরে নর্দমার ঝাঁঝরির কাছে গেল । তারপর চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্রায় সবিতার গা ঘেঁবে ঘড়ে ঢুকতে গিয়ে একটা বিল্লী কাণ্ড করে বসল ।

সবিতা কিছু অনুমান করবার আগেই এত স্বরিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা যে এক লহমায়, রাগে ফোতে লজ্জার সবিতার মুখ লাল হয়ে উঠল ।

একটা ভীকু পশুর মতো সুহৃদ বললে, রাগ করলে ।

এই মুহূর্তে সবিতা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ভেঙে পড়বে । পায়ের নিচে মেঝেটা ছলতে থাকে, দাঁত দাঁত চেপে বললে, অসভ্য জানোয়ার । কিন্তু শব্দটা গলা পর্যন্ত এল না ।

একটা ভয়ংকর কিছু করে ফেলবে সবিতা। সেই ভয়ংকর কিছুটা কি ভাবতে না পেরে ক্রোধে ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসে। ছি—ছি মানুষ এমন জানোয়ার হয়। ঘেন্নায় বুকের শিরাগুলো মোচড় দিয়ে ওঠে, এইমাত্র যা খেয়ে এসেছে তা যেন এখুনি বমি করে ফেলবে। ঠিক এই সময় নমিতা এসে না পড়লে সবিতা যে কী করতে পারত, আর কী না করতে পারতো সবিতাও ঠিক জানে না। পিঠের কাছে নমিতার গলা শুনেই সে প্রায় কোনোদিকে না তাকিয়ে দু-তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে স্ত্রবতর ঘরের দিকে ছুটতে থাকে।

এভাবে সবিতাকে পালিয়ে যেতে দেখে নমিতা অবাক হয়ে বললো, কী হল। বোকার মতো নমিতার দিকে তাকিয়ে থেকে স্তব্ধ বললে, কী আবার হবে। কিছু না তো। তারপর গলার স্বর সহজ করে বললে, যাওয়া হয়ে গেল?

নমিতা আজ সকাল থেকেই অণু মানুষ হয়ে ছিল। আয়নার যতবার আজ নিজের মুখ দেখেছে ততবার নিজেকে সুন্দর মনে হয়েছে। সকাল থেকেই নমিতা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে—বউ আত্মহত্যা করলেই কী আর মানুষ মানুষ হয় না। এমনই কি খারাপ ছেলে স্তব্ধদা। আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের চেয়ে তো অনেক—অনেক ভালো। অদ্ভুত প্রাণ আছে লোকটার, আর নমিতাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। নাহলে দুনিয়ায় এত মেয়ে থাকতে নমিতার চাকরির জন্তে এত করবে কেন। স্বামী হিসাবে এমনই কি খারাপ। কত পুরুষমানুষই তো তাকিয়েছে নমিতার দিকে, কিন্তু এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ভঙ্গি কার। অনেক দিন স্বপ্ন দেখা ভুলে গিয়েছিল নমিতা। কিন্তু ক-দিন ধরেই কেমন একটা ভালো লাগা স্বপ্নের ঘোরে তাকে পেয়ে বসেছে। দুনিয়াস্তব্ধ লোক খারাপ বললেই একটা লোক খারাপ হয়ে যায় না—স্তব্ধদা ভালো—ভালো—খুব ভালো।

সারা সকাল জুড়ে সে আজ মনে মনে একটা স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি করেছে। বাপ-মা তার বিয়ে দেবে না, দিতে পারবে না। আর স্তব্ধদাই বা এমন কি খারাপ বর, বউ আত্মহত্যা করেছে, দোজ্বর, একটা মানুষের সেইটেই কি হবে সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। অনেক বয়স হয়েছে নমিতার, জীবনের বড়ো আশাগুলো ধুলিসাৎ, কিন্তু মনের যে বয়স বাড়ে না, একজন কাউকে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে বলতে সাধ যায়—ভালোবাসি গো, আমি যে তোমাকে ভালবাসি। হোক সে দোজ্বর, বড়ো নয় হাবড়া নয়—একজন বলিষ্ঠ পুরুষ, আশ্চর্য প্রাণময় মানুষটা, নমিতা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে, জীবনটাকে এমন করে সে ফুরিয়ে যেতে দেবে না। কী থাকবে তার যদি এই অন্ধকার

সঁগাতসেঁতে বাড়িটার মধ্যে এমন করে কাটিয়ে দিতে হয় আজীবন। যা তার যন্ত্রণা বুঝবে না, বাবাও বুঝবে না। ওদের নিজেদের জীবন নিয়েই ওরা ব্যস্ত। আর দাদাভাই, সে-ও নিজের জগতের বাইরে কোনো কিছু তাকিয়ে দেখে না। তবে, এমন করে ফুরিয়ে যাবে সে, ফুরিয়ে যেতে দেবে সে? রাজপ্রাসাদ হল না বলে, কুঁড়ে ঘরও বাঁধবো না?

সারা সকাল স্বপ্নের যে প্রাসাদ উঠেছিল, এইমাত্র সবিতাকে ঐ ভাবে পালিয়ে যেতে দেখে আর সুহৃদদাকে ঐভাবে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তা ভেঙে পড়তে লাগল। স্বপ্ন অনুভব দিয়ে সুহৃদের ঐ দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটার মধ্যে কী যেন খুঁজে পেয়ে নমিতার মনের জগতের সাজিয়ে রাখা বাসনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে।

সুহৃদ বললে, আমি যাই। নমিতা কোনো কথা না বলে রাস্তা ছেড়ে দিল।

সুহৃদ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, কাল এসপ্ল্যান্ডের ট্রামের ঘুমটিতে থাকবে তো সাড়ে পাঁচটায়?

কঠিন গলায় অসম্ভব রুচতা ঢেলে নমিতার বলতে ইচ্ছে হল—না। কিন্তু চেষ্টা করেও স্বরে কাঠিন্য এল না। ঠাণ্ডা মরা গলায় নমিতা বললে, না।

—না? কেন!—ভীষণ অবাঁক হয়ে বললে সুহৃদ।

উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দরজায় পিঠ দিয়ে নমিতা হু হু করে কেঁদে উঠল।

● ● আট ● ●

সুব্রত অনেকবার ভেবে দেখেছে, বেঁচে থাকার যদি কোনো মানে থাকে তবে সে মানেটা ক্রমে ক্রমে তার কাছে শূন্য হয়ে আসছে। কেন আসছে, সে নিজেও জানে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বারবার সে জুড়িয়ে পড়েছে মানে নেই এমন একটা অর্থহীনতার জালে। নিজেকে ভালবাসতে গিয়ে নিজেকে সে কেবল ঘণাই করে এসেছে। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন করে হারিয়ে ফেলার গ্লানির জন্তে কাকে দায়ী করবে সে নিজেকে ছাড়া। কই, কেউ তো তার মতো এমন করে ধ্বংস হয়ে যায় না। সে কেন তবে এমন হল। আকাশ থেকে দুঃখ পেড়ে এনে নিজেকে সে অসুখী ভুলতে চায়নি। বরং সে বাঁচতেই চেয়েছে। যেমন করে বাঁচে সবাই। স্বাস্থ্য, আনন্দ, বন্ধুত্ব, প্রেম—এর কোনোটাকেই মূল্যহীন বলে মদের গ্লাসে চূষুক দিয়ে জীবনটাকে

মিথ্যে দুঃখের বোঝায় ভারী করতে চায়নি। তার প্রত্যয়ের স্পষ্ট কোনো চেহারা ছিল না ঠিকই, তবু একটা বড়ো কিছু প্রত্যয়কে সে ছুঁতে চেয়েছে বরাবর। নাস্তিক বলে ঈশ্বর তার দিকে পিঠ ফিরিয়েছে। সেট ঈশ্বরের কাছে কেরবার পথ নেই তার। ঈশ্বর মরে গেছে। সূর্যতকে সাস্থন! দেবার, ভরসা দেবার, আশ্রয় দেবার শক্তি নেই কাল্পনিক ঈশ্বরেরও। যদি মিথ্যে করেও কেউ তাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো যে ঈশ্বর আছে, এই ধণ্ডিত ভগ্ন জীবনের বাইরে পরিপূর্ণ সত্যের মতো, তবু সে বাঁচার মানে পেত একটা। পণ্ডীচেরীতে হয়তো যেত না, কিন্তু মনের সিংহাসন এমন শূন্য থাকতো না। দেশকে সে ভালবাসে, একথাও বলতে পারে না সে। না, তার মনের অলিগলিতে দেশাত্মবোধের ছিঁটে কোঁটাও খুঁজে পায় না সে। আগস্ট আন্দোলনের সময় মিথ্যেই সে ট্রামবাস পুড়িয়েছে। আজো দেশ বলতে কোনো মহৎ বোধের প্রেরণাই জাগে না তার মনে। কবিতায় সে মুক্তি খুঁজছিল, কিন্তু বোধহীন মন নিয়ে কী লিখবে সে; যে সব অনুভবে নিজেরই সাড়া নেই, কী করে অন্তের মধ্যে সঞ্চারিত করবে সে অনুভবের যন্ত্রণা। তবে? কী আছে তার? নীতিহীন রাজনীতির মধ্যে জীবনের মানে খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে সে কিরে এসেছে, হিংস্র আর স্বার্থপর কতগুলো মানুষ ক্ষমতার লড়াই করছে। সে-লড়াই থেকে ভয় পেয়ে সে পালিয়ে এসেছে। মানব সভ্যতাকে কী ভীষণ ব্যর্থ মনে হয় তার। কেন মনে হয়—কেন সে পারে না, সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে? মানুষের সামনে অমের ভবিষ্যৎ, এট বিশ্বাস নিয়ে সে-ও তো পারতো অনেকের মতোই সুখী হতে? কিন্তু কেন তার অনুভবে এই যন্ত্রণা?—কী দারুণ নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। ব্যর্থতাবোধের ভয়ংকর চেহারা দেখে নিজেরই শিউরে ওঠে সে। এ কী নরক!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সূর্যত কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে স্পষ্ট অনুভব করে একদিন সুকুমার ঐখানে গলায় কাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কেন আত্মহত্যা করেছিল সুকুমার?

তবে কি তার নিয়তিও ঐ আত্মহত্যা। মাথা কুটে মরে গেলেও জীবনে কোথাও কোনো বিশ্বাস মিলবে না। তবু একটা 'না'-এর অঙ্ককার হাঁ তাকে পাতাল থেকে আরো গভীর পাতালে টেনে নেবে। কেন চেষ্টার সমস্ত শক্তি হারিয়ে এমন অথর্ব হয়ে গেল সে? সে কি পারত না, সুখকে ছিনিয়ে আনতে, প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা করতে, ধ্বংসকে ধ্বংস করতে।

কবিতা লিখবে সে, লিখবে জীবনের জয়গান। জীবনের জয়গান! জীবন কোথায়,

জয় কোথায় এবং গানই বা কোথায় ? মিথ্যে করে নিজেকে ভোলাবার জন্তেও
কি লিখতে পারি না ?

না । না । না ।

আমার যে কিছুই ভালো লাগে না । কিছুই না । এ কী রোগ, কেউ কি বলে
দেবে ? সত্যিই কী দারুণ একটা অসুখ করেছে আমার—দারুণ অসুখ, যা হলে
আমি মরে যেতে পারি ।

হঠাৎ চমকে উঠে স্তব্ধতর মনে হল, এই তো । মরে যাওয়ার কথায় ভয় পেয়ে
গেলে তো । তাহলে বাঁচতে তুমি চাও ।

নিজের মনের একটা গোপন ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়ে স্তব্ধত ভাবে, কেন ভয় কি,
মরো না ।

মরো—মরো—তুমি মরো । এ বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না । কোনো
মানেই হয় না । ইচ্ছা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, বিশ্বাস নেই, শক্তি নেই—তবে
কীই বা হবে বেঁচে ।

প্রেমও নেই ।

আরতি আর ময়না দু-জনে মিলে খুন করেছে আমাকে ।

পারি না—এভাবে আর পারি না ।—গভীর শূন্যতাবোধ ডোরাকাটা বাঘের মতো
স্তব্ধতর বুকের মাঝখানে নখ বসিয়েছে । স্তব্ধত বালিশের ওপর থেকে মাথাটা
তুলে অনুভব করতে চেষ্টা করে, সত্যি জেগে আছে সে, না ঘুমিয়ে পড়েছে,
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে ।

দুঃস্বপ্ন হোক । হোক দুঃস্বপ্ন—কী হবে যদি দুঃস্বপ্নই হয় । তবু অভিজ্ঞতা তো
অভিজ্ঞতাই, স্বপ্নের মৃত্যুই কি আর মৃত্যু নয় ?

গভীর রাত । সমস্ত বাড়ি ঘুমে আচ্ছন্ন । এই অসহ জেগে থাকার শাস্তি কেন
শুধু তারই, এই এত লোকের মধ্যে একমাত্র কেন সে এই যন্ত্রণার শিকার ?

কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা । না হলে সে মরে যাবে । কী করবে,
সমস্ত বুক পিঠ জুড়ে ব্যথা, মাথাটা অদ্ভুত শূন্য, রবারের ফুটো করা বলের মতো
চ্যাপটা । তবু কিছু একটা না করতে পারলে. ওই সময়টুকুকে সে কিছুতেই
পার করতে পারবে না ।

তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললো । টেবিল থেকে কাগজ টেনে নিয়ে লিখল,—

‘দিগন্ত আয়ত্তে যত জ্ঞানতর নিস্তেজ নক্ষত্র

অন্ধকারে নগ্নশিখা কল্লোলিনী কামুকী সৈরিণী

বিবেকবিহীন শক্তি, ভীত পাখি পালায় অন্তর
 বিপন্ন বিজয়ী আমি দেবদত্ত চিতাকেই চিনি।
 দর্পণ নির্জন বিশ্ব, ছিন্নভিন্ন বেলাভূমি মন
 হৃদয় গুহায় বন্দী রুগ্ন হাওয়া নিফল অস্থির
 বিষের উত্তাল ঢেউ আইটাই করে সারাক্ষণ
 নিরাশ্রিত বোধবুদ্ধি উত্তেজনা ভোগ্য এ শরীর।
 ক্রতির বিলাপনদী মনস্তাপে নিম্পৃহ সবুজ
 উদ্ধার চিংকার রক্তে চূর্ণ চূর্ণ পাহাড়ের ঘাড়
 রোদের সংকেত চাও ? বোঝো নাকি পবিত্র অবুঝ
 পাপের গন্ধক লিপ্ত দাউ দাউ সময়ের হাড়।
 মুখ থেকে নিঃশেষিত সেইসব সুবাসা মাধুর্য
 আমি একা নষ্ট ফল পরিণামহীনতায় গতি
 মৌনের চূড়ায় স্থির, শোনো, তুমি অলঙ্ঘ্য বৈদ্য
 কখনো হবে না গড়া আকাজ্জার নিটোল স্থপতি।

লেখা শেষ করে দ্বিতীয়বার পড়ল না। শুধু সাজানো ছত্রগুলোর দিকে অর্থহীন
 চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বিজ্রপের হাসি ফুটলো ঠোটে। কবিতা ?
 এখন কবিতা লিখছ, তোমার না অসুখ, ভীষণ অসুখ।
 অথচ এর পর আলো নিভিয়ে আবার যখন সে বিছানায় গা এলিয়ে দিল, মনে
 হল, তার শরীরের জ্বর নেমে গেছে। সারারাত কখনো ঘুমিয়ে এবং কখনো
 অর্ধেক জেগে থেকে সে স্বপ্ন দেখল ঐ কটা শব্দের, পাপের, গন্ধক লিপ্ত দাউ
 দাউ সময়ের হাড়। সত্যি যেন পোড়া গন্ধক, আর চিতায় সময় পুড়ছে আর
 সঙ্গে সঙ্গে পুড়ছে সে-ও।

:

● ● নয় ● ●

শূন্যতাবোধ। নিঃসঙ্গতা। আর অপরিসীম ক্লান্তি।
 স্তব্ধত বিশ্বাস করে, খুব ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস পেলে জীবনটা হয়তো এমন
 শিকড়শূন্য গাছের মতো মরা ঠেকত না। মনের মতো একখানা ঘর, নির্জন মুহূর্তে
 সব ভুলে মগ্ন হয়ে যেতে পারে এমন ক-খানা বই, এমন একজন বন্ধু যে পাশে বসে
 থাকলেও আততায়ী মনে হবে না, আর এমন একজন নারী যাকে সত্যি করে

একবারও বলা যায় ভালবাসি। খুব সামান্য আর সাধারণ কয়েকটা পাওয়ার অভাব কী কোনোদিনই ঘুচবে না।

ঘুচবে না, নিশ্চিত হয়ে উঠেছে স্ত্রুত। নাহলে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এমন একখানা ঘর নিয়তি কেন তার জন্তে বেছে রেখেছিল, যেখানে স্নকুমারের বুদ্ধি আত্ম সারাক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ছড়াচ্ছে। নাহলে এমন একখানা বই-ও সে খুঁজে পেল না, যার পাতায় বাচার মানে খুঁজে পেত কিছু। ময়না আরতিরা শুধু শরীর। জীবনে যে একবারও স্ত্রুতকে মিথ্যে করে বলতে হয়েছিল ভালবাসি, সে পাপ কোনোদিন কি ঘুচবে না তার।

অসম্পূর্ণ মন নিয়ে তোমাকে স্মরণ করা পাপ—স্ত্রুতর কোনো এক কবি-বন্ধুর কবিতার এই একছত্র ভুলতে পারেনি স্ত্রুত। শোভনাকে তাই সে স্মরণ করতে চায় না। শুধু কষ্ট বাড়ানো, শুধু যন্ত্রণাকে দীর্ঘ করে তোলা। কী হবে আর আলোয়, সে যে অন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অন্ধ বই কি। মনের ভেতরে বাইরে এত অন্ধকার।

প্রত্যেকটা দিন স্ত্রুতর কাছে এক একটা নতুন মৃত্যুর রূপ নিয়ে আসে। ওর উদ্ভ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে যে কেউ সন্দেহ করবে, সে অস্বস্থ—ভীষণ অস্বস্থ। অথচ শরীর তো ভালোই আছে তার। একটু রোগা হলেই মানুষ আর এমন কিছু শেষ হয়ে যায় না।

তবে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে যে। একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতে। মাথার ভেতরে একটু ঘিলু থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তস্রাবের ভিজে ভিজে গন্ধ। ভাবতে গিরে দাঁড়িয়ে পড়ল, হঠাৎ মাথা ঘুরে ওঠে, মাথার ওপরের আকাশটা নাগর-দোলার মতো ওপর নিচে দোলাতে লাগল তাকে, তাড়াতাড়িতে একটা ল্যাম্প-পোস্ট ধরে টাল সামলে নিয়ে অসহায়ের মতো উচ্চারণ করল, ভগবান। তারপর শুধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, নিয়তি, আমাকে বলে দাও, আমি কি মরে যাচ্ছি এখন।

না, কিছুই হয়নি তার। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এল। মাথার মধ্যে তার নেই আর, থেকে থেকে কী যে হয় তার। ঐ তো দেবশব্দের বাড়ি। যাবো?

না, যাবো না।

শোভনার কাছে দাঁড়াবো কী ঐশ্বর নিয়ে?

যদি এই দীনাভিদীনকে দেখে ঘৃণার মুখ ফিরিয়ে নেয় শোভনা? যদি নরক খুঁজে পার তার চোখে?

যদি স্বপ্নে দেখা নক্ষত্র আতসবাজির মতো খেলনা হয়ে যায় ?
না, যাবো না । যাবো না কিছুতেই । দুই হাতে, বুক চেপে ধরে নিজেকেই
বোঝাতে চেষ্টা করে সূত্রত, তোমার না ঈশ্বর নেই, তোমার না প্রত্যয় নেই, কী মুখ
নিয়ে যাবে ? নিজেকে তিরস্কার করে সূত্রত, তুমি না অশুচি ?
সূত্রত যদি সত্যি সত্যি মানসিকভাবে এমন অসুস্থ না হত তাহলে তার মনে হতে
পারত এসবের কোনো মানে হয় না । কোথাকার কোন্ এক শোভনাকে নিয়ে
সংকটের ঘূর্ণিতে ঝরা পাতার মতো সে শুধু এলোটা পালট খাচ্ছে—এর কোনো
মানে হয় না । বাচার মানে পোঁজার যেমন মানে হয় না তেমনি যাকে চেনে না
জানে না, তার জন্তে নিজেকে এমন উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ করে পীড়িত হতে ভালো
লাগারও কোনো মানে হয় না । কিন্তু নেহাৎই সে অসুস্থ, সুস্থ অবস্থায় যা ভাবতে
পারতো, তাই কি ভাববে সে এখনো । অথচ এই অসুস্থতাও কী যন্ত্রণাময়
সুন্দর ! নিজেকে নিঙড়োতে নিঙড়োতে অদ্ভুত কষ্ট অনুভব করে
সূত্রত ।

নিজের ছায়া যাকে তাড়া করে, সে কি আর পালাতে পারে, পালাতে পারে কোথাও
অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও । সূত্রত ভাবে, পালিয়ে যাই, ননী কাপ্তেনদের
নিশ্চিস্ত নরকে, মরনাকে কমিশনের টাকা গুনে দিবে অন্ততঃ নিশ্চিস্তে জরে
না পুড়ে একটা রাতও যদি কাটে ।

ল্যান্ডাউন রোডে দেবেশের বাড়ির গেটের সামনে থেকে পালিয়েই আসছিল সে ।
কিন্তু দেবেশ ধরে ফেলল তাকে ।

—আরে সূত্রতবাবু ! তারপর খুশি হয়ে বললে, এ-রাস্তায় কি পথ ভুলে এলেন
নাকি । চলুন চলুন—

দেবেশ সূত্রতকে প্রায় টেনে নিয়ে চললো ।—

বিকেলের শেষ রোদটুকু তখন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল । রাস্তার ধারের
আলোগুলো এখনি জ্বলবে । যাকে গোধূলি বলা যায়, কলকাতায় তা
কোনদিনই হয় না । সূত্রতর কিন্তু মনে হল, এই গোধূলি । সূর্য ডুবে গেছে ।
কিংবা ফোর্ট-উইলিয়মের ধার ঘেঁষে গঙ্গার ঘোলা জলে একটু একটু করে ডুবছে ।
যাবার সময় চোরা আলোর একটুখানি ল্যান্ডাউন রোডের প্রকাণ্ড দেবদারু
মাথায় নিপুণ কাঠবিড়ালীর মতো তরতর করে উঠে গেল । সেই এক মুহূর্ত ।
তারপরই ইলেকট্রিক আলো ।

আজ যে ঘরে দেবেশ সূত্রতকে বসালো, সে ঘরটা আগের দিনের তুলনায় অনেক

ছোট। কিন্তু ঘনিষ্ঠ। কভার দেওয়া বেতের চেয়ার বেতের টেবিলের চারপাশে গোল করে সাজানো। টেবিলরূখে নিপুণহাতের এম্ব্রয়ডারি, ধবধবে সাদা কাপড়ের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে উধাও আকাশ হিসেবে, আর কালো সূতোর কয়েকটা নিপুণ বুননিতে এক ঝাঁক পাখি।

ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস দেবেশ হয়তো পেয়ে গেছে। তাই ওকে দেখলে মনেই হয় না, ওর শরীরে কখনো কোনো যন্ত্রণার আঁচ লেগেছে। মনের মতো ঘর দেবেশের। আর ওর ঐ অতবড় বইয়ের সেল্ফ—মনের মতো বই কি আর একটাও নেই! আর একটা জিনিস কী জানি, হয়তো ওর জমার খাতায় এমন কিছু আছে, যাতে এত উচ্ছল হাসি ও খরচ করতে পারে।

একবার সূত্রের মনে হল, কতকাল সে হাসেনি।

দেবেশ কিন্তু একতরফাই কথা বলে গেল। ওর বিরামহীন কথার ঝাঁকে সূত্রের হুঁ হুঁ করারও প্রয়োজন হল না।

—সংস্কৃতি চক্রটা ভেঙে গেল শেষটায়। বুঝলেন।

তাই নাকি?—সূত্রের কণ্ঠে বিস্ময়ও নেই, কৌতুকও নেই। শুধু একটা কিছু বলতে হয়, তাই বলা।

দেবেশ বিস্মৃত করে সংস্কৃতি চক্র উঠে যাওয়ার কারণগুলি বললে। সংস্কৃতি চক্র যে টিকলো না তার অনেকগুলো কারণ। সব থেকে বড়ো কারণ, টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে সকলের কাছে। এতে অবশ্য সব থেকে বেশি মনঃস্কুণ্ন হয়েছে দেবেশ, কেননা সে বিশ্বাস করত, তার বন্ধুদের কারো কারো মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ আছে এবং শুধুমাত্র প্রেরণার অভাবেই দিনকে দিন যারা ফুরিয়ে আসছিল, একটা যৌথ প্রেরণার প্ররোচনা পেলে হয়তো বড়ো কিছু একটা করে ফেলতেও পারে। এই বড়ো কিছুটা কি, সঠিক জানে না দেবেশ। কিন্তু দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত শুধু অপচরই হয়েছে অনেকটা সময়, কেননা, এখানে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না। আত্মকেন্দ্রিকতা আর বুদ্ধির অহংকার ছাড়া আর কোনো পুঁজিই ছিল না কারো। দেবেশকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করেছে সবাই। বেশ উদ্বেজিত হয়েই জানিয়ে দিল দেবেশ। নাহলে এ কী করে সম্ভব যে সংস্কৃতি চক্র উঠে যাওয়ার পর ক-নাঁসই বা গেছে, এরই মধ্যে ডলির ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, সুরমারও বোধকরি আগামী দু-এক হপ্তার মধ্যেই হয়ে যাবে। এই তো সব সংস্কৃতি চক্রের সদৃশ। স্বার্থ—স্বার্থ—স্বার্থ ছাড়া কিছু ছিল না ওদের।

এই সব সাংঘাতিক ব্যাপারের পরও দেবেশ স্তব্ধতাকে অবশ্য বলতে পারল, ওঃ হো, আপনার সঙ্গে এখনো ভাব হয়নি তো ওর ?

—কার ?

রহস্যময়ভাবে হাসতে হাসতে দেবেশ উঠে গেল।

দুরু দুরু বুকে স্তব্ধত অপেক্ষা করতে লাগলো। অবিচল চুলের ভেতর হাত চালিয়ে দিল স্তব্ধত, উঃ কতদিন তেল পড়েনি চুলে। এত নোংরা তার জামাকাপড় যে ঘরের টেবিলক্লথটা পর্যন্ত যেন তাকে ঠাট্টা করেই অত ফরসা হয়ে আছে। ছি ছি—কেন এইভাবে আসতে গেল। এই স্তব্ধ সূচক ভক্ততার সে যোগ্য নয়। কিংবা তার জগৎই আলাদা।

একটু পরেই দেবেশ কিরে এল, বললে, আলাপ করো।

হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গিটা আনতে গিয়ে বোকা হয়ে স্তব্ধত আরো একবার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল।

দেবেশ বললে, ফ্লোরা, শালুট করো।

ফ্লোরা কিন্তু দেবেশের সম্মান না রেখে জান্তব অভ্যর্থনা জানালে। ‘ঘেউ’ ‘ঘেউ’।

মস্ত এলসেসিয়ান। গলায় বকলশ। লম্বা হিংস্র মুখ। তীব্র এক জোড়া চোখ। বাদামী রঙ।

বাড়িতে যেই আসুক, ফ্লোরার সঙ্গে দেবেশ তাকে আলাপ করিয়ে দেবেই।

স্তব্ধত ভয় পেয়ে চেয়ারের এককোণ ঘেঁষে বসল। দেবেশ বলল, ভয় নেই। চেয়ার ছেড়ে না উঠলে কামড়াবে না।

পশুকে স্তব্ধত বিশ্বাস করে না। তাই, দৃশ্যতঃ ঠিক হয়ে বসলেও মনে মনে আগাগোড়াই সে সংকুচিত হয়ে রইল।

ফ্লোরা গায়ের পাশে এসে দাঁড়াত একটু আদরের ভানও করতে হল। বন্ধুত্বের স্বীকৃতি হিসাবেই কিনা কে জানে, ফ্লোরা স্তব্ধতর হাতের উল্টে-পিঠ খড়খড়ে জিত দিয়ে চেটে দিল।

দেবেশের মার সঙ্গেও আলাপ হল।

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হবে, কিংবা তারও বেশি। কিন্তু মুখে ভারী একটা মিষ্টিভাব। সিঁথিতে স্নগ্ন সিঁদুরের রেখা, কপালের সিঁদুরের চিহ্নটি পর্যন্ত নিখুঁত। ছিমছাম সুন্দর দোহারা গড়ন। পরনের শাড়ী, হাতের একগাছা চুড়ি এমন কি পায়ের শ্লিপারটি পর্যন্ত সুরুচির ছোঁয়া লেগে সুন্দর।

বললেন, দেবেশের কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি। দেবেশ তো রীতিমতো তোমার ভক্ত।

সুত্রত অঝাক হয়ে ভাবলো।

—মা কিন্তু একটু বাড়িয়ে বলছেন, সুত্রতবাবু। আসলে আমি কাউকে ভক্তি করি না। তবে সেদিন পুরনো পত্রিকা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আপনার কিছু কবিতা পেয়ে গেলুম। পড়ে, সত্যি বলতে কি আপনার ওপর রীতিমতো শ্রদ্ধা হল, ইঁ্যা শ্রদ্ধাই বলবো। সত্যি, আজকাল আর লেখেন না কেন বলুন তো?

সুত্রতর মা বললেন, সত্যি কিন্তু। তোমার কবিতা আমাদেরও ভালো লেগেছে। আজকাল কী সব ছাড়াই ভয় বেরোয় বুঝি না কিছু। তোমার কবিতা কিন্তু তেমন নয়, বেশ লাগলো।

সুত্রতর মনে পড়ল, একসময় সে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিল এবং ছাপিয়েছিল। সে-কবিতা কবে তার মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। আজ সেও ঐ ছাড়াই ভয়দের দলেই। তবু তার পুরনো কবিতাও যে কারো ভালো লেগেছে, ভেবে বেশ ভালোই লাগল।

দেবেশ বলল, বুঝলেন সুত্রতবাবু, আপনার কবিতা শুনে বাবারও বেশ ভালো লেগেছে। একদিন আলাপ করিয়ে দেবো বাবার সঙ্গে।

নিজের অতীতকালের কোনো এক অপকীর্তি যে অতের এত স্বতির যোগ্যতা পেতে পারে, কোনোদিন মনে হয়নি সুত্রতর। তবু দেবেশ মিথ্যেই বা বলবে কেন, মিথ্যে বলে দেবেশের মারই বা কী লাভ।

তারপর অনেকক্ষণ আধুনিক কবিতা নিয়ে তিনজনে আলোচনা হল। সুত্রত তার নোংরা জামাকাপড় আর কুকুরের লালার কথা ভুলে গিয়ে সে আলোচনার যোগ দিয়েছে। ঐ আলোচনার এক কঁাকে আরো একটি মানুষ ঐ ঘরে এসে একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। সুত্রত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, শোভনা কেন তাকে চিনেও চিনতে পারে না, কেন হঠাৎ একটা অপরিচয়ের সূতোয় তাদের ঐ রহস্যময় পূর্বরাগ।

পূর্বরাগ! পূর্বরাগ বই কি। অন্ততঃ সুত্রতর দিক থেকে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু শোভনা—সে কি আলোকবস্তুর বাইরে কোনোদিনও আসবে না।

উঠে আসবার সময় দেবেশ সুত্রতকে দুটি খবর দিলে। একটি আগামী রবিবার পিকনিক হবে মধ্যমগ্রামে সুত্রতর বাওয়া চাই-ই। কোনো ভাবেই যেন এ-আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সুত্রত তাদের ঐ নবজাতক বন্ধুকে অমর্যাদা না করে।

আর দ্বিতীয় সংবাদ, দেবেশ খুব দুঃখ প্রকাশ করেই বললে, শোনেনি আপনি, আরতি বৌদি গলার দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অরুণকে সত্যিই ভাল-বাসতো আরতি বৌদি। পারলো না অরুণের মৃত্যুশোক সহ্য করতে। ব্যাপারটা সত্যি দুঃখের, তাই না?—করুণ করে তাকালো দেবেশ।

● ● দশ ● ●

অতঃপর, কোথায় যাবে তুমি, কোথায় যেতে পারো। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সুরত।

এতক্ষণ ছিল একটা মিষ্টি অনুভূতি। নির্বোধ ভালো-লাগা। এবার?

সুরতের কারা পায় না, দুঃখ হয় না, শোক হয় না—কোনো কিছুই হয় না। বুঝি সব কিছুর বাইরে চলে গেছে সে। কেমন ভোঁতা আর নিরর্থক মনে হয় সব কিছু। যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটত এখন যাতে তীব্রতা থাকতো, তার অসাড় শিথিল অনুভূতিটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটুখানি বিষণ্ণ অশ্রু যদি সে তুলে আনতে পারতো মনের তল থেকে, হয়তো মুক্তি পেত সে।

কিন্তু কিছুই হল না। যন্ত্রের মতো রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হতে লাগলো, সে একটা শয়তান। এবং খ্রীষ্টান না হয়েও ভাবতে লাগলো, শয়তানের কাছে আমি আমার আত্মাকে বিকিয়ে দিয়েছি। আমি আজ কতুর, একেবারেই কতুর হয়ে গেছি।

অনেকক্ষণ সে হাঁটলো। এলোমেলো। তারপর ট্রাম নিল। তারপর আবার হাঁটলো। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আরতিদের একতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

গলির এদিকটা অন্ধকার। গ্যাসের চোরা আলোর একটুও ডাস্টবিনের চত্বর ছাড়িয়ে এদিকে এসে পড়ে না। অন্ধকার বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার মনে হল, হয়তো ভুল শুনেছে দেবেশ, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। দরজার কড়া খুঁজে সে এখুনি ডেকে উঠবে ‘আরতি’, সে-ই যেমন ভাবে ডেকেছিল একদিন, যেদিন সে প্রেমে ধনী ছিল, পাপে এমন দীনাতিদীন ছিল না। ভাবতে ভাবতে দৃঢ় হয়ে উঠলো তার প্রত্যয়। না, হতেই পারে না—দেবেশ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে, হয়তো সব জেনেছে, তাই—কিছু-না-জানার ভান করে চরম বিদ্রূপ করেছে।

দরজার কড়া খুঁজে না পেয়ে দরজার ওপরেই সে সজোরে করাঘাত করলো।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলে দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে।

একসঙ্গে অনেকগুলো মাথা এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানালা থেকে উঁকি দিল।

—কে?

সুব্রতর মনে হল সে যেন ধরা পড়ে গেছে। কাঁসীর ছকুম পাওয়া আসামীর মতো গলার ভেতরে ডেলায় মতো কি একটা আটকে গেল।

ভুঁড়ির ওপর আলগোছে লুঙ্গিটা গিঁট দিয়ে এক ভদ্রলোক নেমে এলেন পাশের বাড়ির দোতলা থেকে। আরতিদের বাড়ির বাড়িওয়ালা। মস্ত কালো হাঁড়ির মতো মুখ, বাঁ কপালের ওপর বড়ো আব। বললেন, শোনেননি কিছু—

তাড়া খেয়ে হঠাৎ যেন পিছু হটতে থাকে সুব্রত।—হ্যাঁ শুনেছি—শুনেছি।

ছুটে সে গলির ভেতর থেকে বাইরে আসতে চায়।—শুনেছি। নিশ্চয় শুনেছি।

এত বড়ো ঘটনা—

গলির বাইরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সুব্রত প্রায় ছুটতে লাগল। মনের তল থেকে কে যেন উঠে এসে সুব্রতর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, কী হে সুব্রত, এবার?

একটুখানি বিস্মৃতি চাউ। এমন করে আর পারা যায় না। ভগবান, না হয় তোমাকে বিপ্লবসই করা গেল। পারো না কি একটু শান্তি দিতে, একটু স্বস্তি? কে শান্তি দিতে পারে। এতবড়ো পৃথিবীতে একটি মানুষের মুখ মনে পড়ল না, যে তার এই ঘনিষ্ঠ সংকটে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, ভয় কী, আমি তো আছি।

ঘুণা ঘুণা ঘুণা—নিজেকে শুধু ঘুণা ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে না নাকি? এ কী ভয়ংকর শোধ নিল আরতি। তাকে পাগল করে দিয়ে কী লাভ হল আরতির?

কেন? ময়না তো বলেছিল, ভালবাসি এবং শুনুতে চেয়েছিল সুব্রত তাকে সত্যি ভালবাসে কিনা। সেদিন মিথ্যে করে বলেছিল, ভালবাসি। আর মিথ্যে নয়, এবার গিয়ে সব অভিনয় শেষ করে দিয়ে আসি। আরতি প্রতিশোধ নিয়েছে—আর ময়না, ময়নাও যদি আর কোনো দুর্বোধ্য হিংস্র প্রতিশোধের ফাঁদ পেতে থাকে? সুব্রত ভাবলো, ময়নাকে গিয়ে এখুনি বলে আসবে, তোমাকে ভালবাসি, একথা মিথ্যে, একেবারেই মিথ্যে, ময়না। কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি করেই একটুখানি ভালবাসো। আমি যে আর পারি না, নইলে যে মরে যাবো আমি।

অনেক গলিখুঁজি হেঁটে, অনেক রাতে ননী কাপ্তেনের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সূত্রত। বাইরে থেকে সদর দরজা খোলার যে গোপন কার্যদা ননী কাপ্তেন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, সেই কার্যদায় নিপুণ হাতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সূত্রত। একতলার সিঁড়ি অন্ধকার।

অন্ধকার—এত অন্ধকার।

দোতলাও অন্ধকার। ময়নার ঘরের দরজা বন্ধ। তেতলার যেখানে খেলা বসে সেখানে উঠে গেল। বন্ধ ঘর, আলো জ্বলছে না।

কী হল!

তালাবন্ধ দরজাগুলো একে একে ভালো করে দেশলাই জালিয়ে পরখ করল সূত্রত। না—কেউ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তারপর। বাইরে থেকে সদর দরজা যেমন ছিল তেমনিভাবে বন্ধ করল। মোড়ের পানবিড়ির দোকানে গিয়ে বললে, ননী কাপ্তেন কোথায়—

পানবিড়িওলা সূত্রতকে চিনত, বললে, ও তো কয়েকদিন আগে কেটে পড়েছে।

পুলিস ওর পিছু লেগেছে। কী একটা খুন টুন করে ভেগে পড়েছে—

—খুন?

—হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনি।—বললে পানবিড়িওলা।

—আর ময়না, ময়না কোথায়?

পানবিড়িওলার চোখে একটা সন্ত্রস্ততা ফুটে উঠল। বললে, জানি না বাবু। ওসব কথা পুলিসে গিয়ে শুধোও গিয়ে, আমরা জানি না, কিছুর জানি না।

সূত্রত সেখান থেকে চলে এল। বুঝলো, ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে। পুলিস ননী কাপ্তেনের পিছু লেগেছে, ময়নার খবর কেউ বলতে নারাজ। কী হয়েছে, কে জানে।

যাক—যাক। সব যাক। আরো একটা বন্ধন টুটলো, নরকের আরো একটা গাঁট আলাগা হয়ে গেল।

ননী কাপ্তেন খুন করেছে। কাকে? কে জানে। সে-ও খুন করেছে। আরতিকে।

যাক যাক। নরকের শক্ত বাধুনি থেকে এক একটা গাঁট আলাগা হয়ে পড়ছে।

সেদিন প্রায় মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে এসে সূত্রতর মনে হল, তার ভয়ংকর অসুখ যেন আস্তে আস্তে সেরে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে সুস্থতা চাইলো। ছেলেমানুষের মতো আকৃতিতে। তারপর কাগজ কলম নিয়ে অনেকবার

কাঁটাকুটি করে শুধু লিখে গেল—শোভনা । শোভনা । শোভনা । শোভনা ।
শোভনা ।

তারপর ঠিক যখন ভোরের প্রথম কাক ডেকে উঠল, তখন একটা কবিতা
লিখল—

কেন কষ্ট পাও তুমি, কেন ঢেকে রাখো আপনাকে
উচ্ছ্বাস মৃত্যুর কাছে বশ মেনে ইচ্ছাকে ভুলেছ
বেড়া ভেঙে নিয়ে যাবো অন্তদেশে তোমাকে, বুঝেছ
রাত্রির বৃষ্টির মতো স্বর তার হেনেছে বিবেকে ।
সে যেন বনের মধ্যে গভীর নদীর কালো জল
হরিণের সাস্থনার, মেঘমান চোখের কিনারে
অপরাক্ষ, শ্রাওলার শান্তি অঙ্গে, তুলনাহীনারে
বলি : জানো আজ আর নেই কারো প্রতিভা নির্মল ।
নিয়ে যেতে পারো তুমি অন্তদেশে জীবন যেখানে
রক্তের কল্লোলে শুষ্ক, শূন্যতার রিরংসার হাত—
বিরোধের সংঘর্ষের ডাক নেই, নেই ক্লান্তি পীক,
নরনারী ছাড়া কোনো নাম নেই,—আমি কি সেখানে
যুক্ত হলে আকাশ মাটির রুদ্ধ সং আত্মীয়তা
উজ্জ্বল বর্বর করে জন্ম দিলে শক্তি প্রেমে ঘেরা
শেষ হবে পৃথিবীতে অচেনার মতো চলাফেরা
সুস্থির বিশ্বাসে পাব জীবনের জায়া স্বকীয়তা ।
তাকে তো করেনি স্পর্শ শতাব্দীর রক্তশূন্য রোগ
অবিচল প্রতিশ্রুতি মুখে নিয়ে শাস্ত সুষমার
সে মানবী অন্ধকার বাত্মন্ত্র করে আবিষ্কার
অবচেতনের মতো অনিবার্য মগ্ন ও অমোঘ ।

কবিতা শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সুরত । মানুষকে কিছু পেখাতে
চাই না আমি, এলোমেলো চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল সে । আমি শুধু জেনে যেতে
চাই, জীবনটাকে বতটা ব্যর্থ নিরর্থক বলে জেনে গেলাম, জীবন আসলে ততটা
নিরর্থক নয় । আমি যখন থাকবো না, তখন জীবনস্রোত থমকে থাকবে না ।
চলবে । এবং যেতে যেতে, সমস্ত মানুষ একদিন পূর্ণতাকে ছুঁতে পারবে । শুধু
ধ্বংস আর মৃত্যু নয়, শুধু ঘৃণা আর জিঘাংসা নয়—আরো কিছু, অন্য কিছু—যা

আমার পৃথিবীতে কোথাও নেই, তা আছে, কোথাও না কোথাও আছে। প্রত্যয় আছে। আছে। ধর্মে যা নেই, অর্থে যা নেই, শক্তিতে যা নেই, শিল্পে যা নেই, তা-ই আছে। কোথায় আছে জানি না কিন্তু আছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্নেহত স্বপ্ন দেখল, সে মরে যাচ্ছে এবং তার চারপাশে ফুল। শুধু ফুল। ময়না এনেছে লাল ফুল, রক্তজবা নয়, তার চেয়েও লাল, ঠিকরে আলো বেরায়। আর আরতি এনেছে হলুদে রঙের ফুল, প্রজাপতির পাখার মতো হলুদে। আর শোভনা এনেছে সাদা রজনীগন্ধা, না রজনীগন্ধা নয়, তার চেয়েও সাদা, স্ফটিক শুভ্র। ছুঁলে ঝরে যাবে—এত সাদা।

এবং তার মৃত্যু ঘিরে ময়না-আরতি-শোভনা তিনজনেই মিটিমিটি হেসে বলছে, কই, পারলে পালিয়ে যেতে।

●● এগারো ●●

শুক্রবার দেবেশের চিঠি পেল স্নেহত। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, রবিবার পিকনিক, আসতে ভুল না হয় যেন। শিয়ালদা মেন স্টেশনে গ্লোব নার্শারির সামনে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা।

এক-দিন স্নেহত কেবলই ভেবেছে, সে যে মরে যাচ্ছে, সে শুধু বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায়। সে একলা, ভয়ংকর একলা বলেই সবার থেকে এমন করে সে আলাদা হয়ে গেছে। আবিষ্কার নিঃসঙ্গতার চূড়োর দাঁড়িয়ে এমন করে ছিঁড়ে ছত্রাকার হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না আর। মেলাতে হবে, সকলের সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিতে না পারলে বুনো পশুর মতো আদিম অরণ্য অন্ধকারের গভীরে ডুবে যাবে সে। এর কোনো মানে আছে কি, এই এমনি করে বেঁচে থাকার? স্পর্শ নেই, উত্তম নেই, ইচ্ছা নেই, একী? শ্রদ্ধা নেই, প্রত্যয় নেই, ভালোবাসা নেই, এরই নাম জীবন? স্নেহত বুঝতে পারে, সাধারণ একটা মানুষের মতো বেঁচে থাকার সব উপকরণই তার ছিল, কিন্তু অসাধারণ কতগুলো বোধের নির্বোধ সাধনায় নিজেকে সে কী ভীষণ ঠকিয়েছে। যে লোক সকালবেলা উঠে বাজারের খলে হাতে বাজারে যায়, সস্তা জিনিস বাজিয়ে দর করে কেনে, পান চিবোতে চিবোতে আপিস যায়, ফেরার পথে বউ-এর জন্তে ডালমুট কিনে আনে এক ঠোঙা, নাক দিয়ে গাড়িয়ে পড়া সিকনি উপেক্ষা করেই ছেলেকে চুমু খায়, মৈথুন এবং সন্তান উৎপাদন করে, ভগবান মানে, ধার করে, এবং একটুখানি সুখের জন্তে স্বার্থপর হয়ে ওঠে, তেমন লোককে তার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার জন্তে

ঘণার অস্ত নেই স্ত্রতর। কিন্তু এদের চেয়ে খুব কি আলাদা সে। ঐ অতি সাধারণ মানুষটার তার চারপাশের জগতের সঙ্গে জড়ানো। তাদের পারের তলায় মাটি আছে বলেই, তাদের গায়ে মাটির দাগ লাগলে ভয় পেয়ে তারা জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচে না। কিন্তু সে? নিজেকে স্ত্রতর ওদের চেয়েও নোংরা মনে হয়। ওদের একটা চরিত্র আছে? কিন্তু সে যে নিশ্চরিত্র।

অস্থির হয়ে স্ত্রতর ভাবে, ছি, একি করছো তুমি। ছি-ছি।

এ-অবস্থায় দুটো পথ খোলা থাকে। এক, আত্মহত্যা, নয়তো পাগল হয়ে যাওয়া। আসলে দুটো হয়তো একই। পাগল না হলে কেউ কি আর সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে পারে? স্ত্রতর যে পাগল হয়নি, তার প্রমাণ, স্ত্রতর একবারও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়নি। বাঁচবার স্বাদ ইচ্ছেটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারে না বলেই, স্ত্রতর আবারও ভাবতে বসে, নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের ভেতর থেকেই একটা মানে বার করে আনতে চায় সে, বাঁচার মানে।

এবং অনেক দুর্বোধ্য চিন্তার পর একটা ভাবনা তার মনে গ্লোগানের মতো তার মাথায় বাজতে থাকে, বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকার মানে। বেঁচে থাকতে পারাটাই সত্যিকারের বেঁচে থাকা।

আর সমস্ত যন্ত্রণাকে সে শুধু একটি কথার বুঝেছে, সে হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসাই তার অস্তিত্ব। নিজেকে মনে হয় স্ত্রতর, সে এক বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান, ভালবাসার জগতে সে এই যন্ত্রণার দার ভাগ নিয়েছে।

হ্যাঁ। ভালবাসাই তার অস্তিত্ব। খুঁজতে খুঁজতে একগলা অন্ধকারে ডুবে গেছে, নিরাশা কীটের মতো গা বেয়ে উঠেছে, তবু ভালবাসাই তার শেষ আশ্রয়, গুহার ভেতরে আশ্চর্য প্রদীপ খুঁজতে গিয়ে বাঘের খাবার বিক্ষত হয়েছে। সমস্ত জগৎ রাক্ষসপুরীর হিংস্রতা নিয়ে গ্রাস করেছে তার চৈতন্য—তবু বাঁচতে চাই, বাঁচার মানে চাই। ভালবাসতে চাই, ভালবাসারও তল ছুঁতে চাই।

বাড়ির কুলুপ-আঁটা ভাঙ্গসা ঘরখানার মতো এতকাল মনের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল তার। মনে হয় ছুটে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনে, নমিতা, সবিতা, ছবি, বেবি, নন্দু, সন্তু সবাইকে। লুডো খেলবি, আয় লুডো খেলি। নমিতা সবিতা কি ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে আজকাল। ছোটবেলায় ওরা দুটিতে কী আশ্চর্য সুন্দর হাসতো। না। ইচ্ছে করে মাকে একবার জড়িয়ে ধরে বলে ছোটবেলার মতো, আমাকে একটবার আদর করো না মা।

কিন্তু তা হবার নয়। দিনে দিনে এদের সঙ্গে বিজীৱকম নিঃসম্পর্কীয় হয়ে গেছে

সে। কচ্ছপের মতো নিজের খোলসের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে শুধু কতগুলো 'না' নিয়ে বেঁচে থাকার এই ক্লান্তিকর অধ্যায় সে শেষ করে দিতে চায়। নিজেকে সে আর বিচ্ছিন্ন রাখতে চায় না। কী এক অনিবার্যতার টান তাকে টানতে থাকে। আর এই টানেই রবিবার সকাল আটটার শিয়ালদহ মেন স্টেশনে গ্লোব নার্শারীর সামনে এসে দাঁড়ালো সূত্রত।

স্টেশন চত্বরের ভেতরে উদাস্ত পরিবারগুলির প্রাতঃকালীন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। ট্যাক্সি দাঁড়াবার জায়গাগুলোতেও হোগলা পাতার ছাউনি। এক একটা পরিবার এরই মধ্যে গুছিয়ে সংসার পেতেছে। তোলা উলুনে ভাত চেপেছে। তিন মাসের একটা কচি বাচ্চা ট্যা ট্যা করে টেঁচিয়ে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশটাকে আরো একটু ঘুলিয়ে তুলছে। আক্রহীন মেয়ে, গোরুর মতো ডাবডেবে ভাবলেশহীন চোখ, হাঁপানিগ্রস্ত বুড়ো, অসুস্থ বউ। জীবনে বোধকরি এই প্রথম, নিখাদ দুঃখবোধে সূত্রতর বুকের ভেতরটা টন্টন্ করে উঠল।

একটু পরেই দেবেশদের মস্ত একটা দল হৈ হৈ করতে করতে এসে গেল, দেবেশ, শোভনা, রণেন, শাস্ত্রু, জ্যোতির্ময়, ডলি, সুভাষ, সুজাতাদের মস্ত একটা দল। সূত্রতকে পেয়ে আর এক দকা হল্লোড় তুললো দেবেশ।

মধ্যমগ্রামে দেবেশদের বাগানবাড়ি আছে। আগের দিন মালির সঙ্গে বাসন-কোসন গেছে, আজ শুধু বাজার যাচ্ছে এদের সঙ্গে। টিকিট কেটে হৈ হৈ করে ট্রেনে চাপল সবাই। এবং সূত্রত এই প্রথম দিনের আলোয় শোভনাকে দেখতে পেয়ে নিজের ত্বকার উৎসটাকে দেখতে পেল। এত সুখাও সঞ্চিত ছিল তার জন্তে? দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি কার্পেটের মতো গুটিয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ল, মরুতীর হতে দুর্বা শ্রামলিম পারে। সূত্রত দেখতে পেল, তার মনের দু-কূল একেবারে প্রাবিত হয়ে গেছে। সুন্দর সে অনেক দেখেছে। কিন্তু শোভনা তো কোনো চেনা জগতের রূপে রূপসী নয়। তার রূপ একটা জ্যোতি। এত শুদ্ধ পবিত্র জ্যোতির্ময় কোনো অভিজ্ঞতাই আজ পর্যন্ত হয়নি সূত্রতর। গানের আলাপ ফুরিয়ে গেলে বায়ুমণ্ডলে সূরের যেমন তরঙ্গ ওঠে, তেমনি এক অবোধ্য সৌন্দর্যের তরঙ্গে সূত্রতর সমস্ত হৃদয় দুলাতে লাগলো।

লোকাল ট্রেন। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে। রবিবার। তাই বোধ করি ভিড়ের বর্বরতা নেই। দেবেশ শাস্ত্রু আর সূত্রত বসেছে একদিকের বেঞ্চিতে, জানালার

ধারে। ওপাশের জানালার ধারে রণেন, সুভাষ, জ্যোতির্ময়, ডলি, শোভনা আর সুজাতারা বসেছে। ট্রেনের অগ্ন্যাগ্নি যাত্রীরা বেশ একটু কোঁত্‌হলী হয়েই এদের দলটাকে লক্ষ্য করছিল। ছোটো ছোটো কথার গুঞ্জন, বাইরে পরি-বর্তমান দৃশ্যপট, আর ওদিকের জানালার ধারে জানালার বাইরে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চুলের কুঁচি ওড়াতে ওড়াতে শোভনার বসে থাকা—সব কিছু মিলিয়েই ভারী ভালো লাগছিল সুব্রতর। ট্রেনের ঝমঝমনি কেমন একটা নেশা ধরায়—মনে হয়, অনেক না-বলা কথা বৃষ্টি এই মুহূর্তে বলে ফেলা যায়। মনে মনেই শোভনার সঙ্গে সংলাপ শুরু করে দিল সুব্রত।

—আচ্ছা শোভনা, আমার দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাও না কেন?

—কে বললে তাকাই না। এই তো চেয়ে আছি।

—সে তো শুধু চোখের তাকানো। কিন্তু মন?

—আপনি আবার মনের খবরও রাখেন নাকি?

—কেন রাখতে নেই নাকি?

—না।

—কারণ।

—কারণ আপনি অন্ধ। নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পান না আপনি।

সিগারেট ধান তো। নিন।—দেবেশ সুব্রতকে সিগারেট অফার করল। সিগারেট ধরিয়ে এক লাকে সুব্রত কাল্পনিক সংলাপটাকে অনেকদূর এগিয়ে নিল।

—শোভনা। আমি তোমাকে ভালবাসি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

—এতদিন বলোনি কেন?

—এতদিন সময় হয়নি যে।

—আজ সময় হল কিসে?

—জানি না। কিন্তু বলো না, তুমি কি ভালোবাসো?

বাস্তবে এধরনের কথার উত্তরে শোভনা কি বলতো জানে না সুব্রত। কিন্তু কল্পনায় অন্ততঃ নিজেকে বঞ্চিত করতে ওর ইচ্ছে হল না। শোভনাকে তাই বলতে হল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

ওপাশের বেঞ্চিতে বসে সুভাষ গুন গুন করে কি একটা গানের কলি ভাঁজছিল।

টপ্পার কাজটুকু কানে এসে পৌঁছতেই কাল্লনিক সংলাপ খামিয়ে স্তব্ধত বললে, আরো একটু গলা ছেড়ে করুন না, আমরাও শুনি।

সোৎসাহে সায় দিয়ে দেবেশ বললে, উত্তম প্রস্তাব। স্তব্ধ ভোয়ার গানের ভাগ আমাদেরও কিছু দাও।

স্তব্ধের গলা ভালোই। বিশেষতঃ ট্রেনের যম্‌ঝমানিতে বেসুর আপনিতেই ঢাকা পড়ে। স্তব্ধ গলা চড়িয়ে গান ধরলো, আমি কি গান গাব যে, ভেবে না পাই।

ঘন্টাখানেক লাগলো মধ্যমগ্রাম পৌঁছতে।

ভারপর সবগুলো মানুষ সাহিত্য রাজনীতি বিতর্ক ভুলে গিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলো। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে আরো কিছুটা গেলে একটা মেঠো রাস্তা পড়ে। সেই রাস্তা ধরে বায়ে মটরস্কুটি খেতের সীমানা পেরিয়ে দেবেশদের বাগানবাড়ি। বাগানবাড়ি বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। অর্থাৎ বাগানটাই মুখ্য, বাড়িটা নয়? আম জাম পেয়ারা আর লিচু গাছ আছে অনেকগুলি। তাছাড়া আলু আর কপির ক্ষেতও আছে। এককালে ফুলের গাছও ছিল নানা জাতের। যত্নের অভাবে মরে গেছে। এখন শুধু গাঁদা ফুল। ডাকবাংলো প্যাটার্নের ছোট বাড়ি। ছোটো কিন্তু সুন্দর।

প্রথমে ভাঁড়ে করে চা খেল সবাই। পাউরুটি মাখন আর ডিমসিদ্ধ নিয়ে কাড়া-কাড়ি হল খানিকটা। জিনিস অপর্ষাপুঙ্খ ছিল। কিন্তু কাড়াকাড়ি করে খাওয়ার আনন্দটুকু থেকেও কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। এই হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ ডলির লক্ষ্য পড়ল স্তব্ধের দিকে।

—একি আপনি যে কিছুই নিচ্ছেন না?

—কে বললে নিচ্ছি না, এই তো নিচ্ছি—বলে স্তব্ধ একটা গোটা ডিমসিদ্ধ মুখে পুরে দিল।

—কেড়ে নিতে না জানলে কিন্তু শেষপর্যন্ত ফাঁকিতেই পড়বেন।—ডলি বললে।

হো হো করে হেসে উঠল জ্যোতির্ময়। বললে, ডলি কিন্তু একালের মোক্ষম ফিলজফির কথা বললে। বুঝলেন স্তব্ধবাবু, কেড়ে নিতে জানা চাই।

সার্ভাইভাল অব্‌ দি ফিটেস্ট থিয়োরি নিয়ে একটা জোরালো বিতর্ক শুরু হবার মুখে দেবেশ বললে, কিন্তু রান্নার চার্জে কে থাকবে।

অনেকেই ভলান্টিয়ার হতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডলি আর জ্যোতির্ময়কেই দায়িত্ব নিতে হল। দেবেশ আর স্তব্ধ রইল জোগানদার হিসেবে। আর

একটা দল গ্রামচারণায় বেরুল। স্নাতক, শাস্ত্র আর শোভনারা গিয়ে বসল পুকুর ধারে। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে শোভনা কি ভাবছে, ভেবেই পেল না স্নাতক।

দলের মধ্যে কিন্তু সব থেকে করিৎকর্মা জ্যোতির্ময়। কুস্তিগির আর কুতর্কিক বলে যতই তার দুর্নাম থাকুক, দেখা গেল, কাজেকর্মে ও বিষয় পোক্ত। স্নাতক রান্নার ওখানে গিয়ে তদারকের চেষ্টা করতেই জ্যোতির্ময় একে হটিয়ে দিল, বললে, এখানে নয়, উঁহ, এখানে আপনার ঘারা কিছু হবে না। এই মাংস রান্নার ব্যাপারটা কান্ট হেগেলের আওতার বাইরে।

—আমি কান্ট বা হেগেলের শিষ্য, একথা ভাবছেন কেন?

ডলি ঠোট টিপে হেসে বললে, কারণ আছে। আপনার মতো গোমড়ামুখো মানুষ ঐ সব লোকের শিষ্য না হয়েই যায় না।

—আমি গোমড়ামুখো?

—নয়? আপনার বাড়িতে আসনা নেই বুঝি?

ডলির কথা বলার ধরনে স্নাতক হেসে উঠল। বলা ভালো, সম্প্রতি ডলির বিয়ে হয়েছে স্নাতকের সঙ্গে! বিবাহ-পূর্ব ডলির সঙ্গে স্নাতকের চাক্ষুষ পরিচয় ছাড়া আলাপ প্রায় ছিলই না। বিবাহোত্তর ডলিকে ওর এই সহজ উচ্ছলতার জন্তে ভালোই লাগলো স্নাতকের।

—সত্যি বলুন তো, আপনি এত গোমড়ামুখো কেন?

—গোমড়া-মুখ?

—হ্যাঁ তাই তো। আমরা কত হৈ চৈ করছি। আর আপনি যাত্রাদলের বিবেকের মতো গম্ভীর মুখ। কী ব্যাপার—অন্তরঙ্গ ঠাট্টায় হেসে উঠে যোগ করলে ডলি, প্রেমে ট্রেমে পড়েননি তো?

আকর্ণ লাল হয়ে স্নাতক শুধু বসলে, কী আশ্চর্য!

—উঁহ। ঐ সব আশ্চর্য টাশ্চর্য চলবে না। আপনার প্রেমের গল্প বলতেই হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।—ডলি স্নাতককে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল।

নতুন তৈরি উন্নত থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠছিল। একটা ভাঙা ডাল উন্নত ঠেলে দিতে দিতে ডলি বললে, কিছু বলুন।

—কী বলব।

—বাঃ, কিছু বলার নেই।

দেবেশ বললে, স্নাতকবাবু রীতিমতো ফিলজফার আর কবিও। জানো তো?

কবি এবং দার্শনিক কোনোটার প্রতিই ডলির শ্রদ্ধা খুব প্রচুর নয়। কিন্তু মানুষটা এমনিতে বেশ আকর্ষণীয়। তাই ছেলেমানুষী করে স্ত্রতকে অস্থির করে তুললো।

—প্রেমে বুঝি খুব দাগা পেয়েছেন। উদাস উদাস ভাব করে নিজেকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন বুঝি। বলুন না, কাকে ভালবাসেন। চূপ করে রইলেন। বলুন না।

স্বীতিমতো আবদারের সুর ডলির! অন্য সময় হলে স্ত্রত নিশ্চয়ই বিরক্ত হত কিন্তু আজ ডলির এই ছেলেমানুষীটা পর্যন্ত 'ওর ভালো লাগছে।

জ্যোতির্ময় মাংসে মশলা মাখছিল। খোঁচা খোঁচা চুল, কুস্তিগিরের মতো চেহারা। বললে, স্ত্রতবাবু, খুব সাবধান। আমি সব থেকে ভয় করি মহিলাদের জেরা। জেরায় এরা জাঁদরেল উকিলকেও হার মানিয়ে দেবে। জেরায় জেরায় পেটের নাড়ী থেকে কথা বার করে আনার কৃতিত্ব মহিলাদেরই সবচেয়ে বেশি কিনা।

বটে—কপট ক্রোধে ভুরু কুঁচকে ডলি বললে, আর সেই জেরায় ঘায়েল হয়েই বুঝি লতাদির কাছে হার মানলেন। কবে বেরুচ্ছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা শুনি? লতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের বিয়ে প্রায় সব ঠিকঠাক। কিন্তু সাংসারিক কতগুলো অসুবিধার জন্তে বিয়েটা কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না। উভয় পক্ষই তারা যথেষ্ট বিরহে কাতর। কিন্তু সে জন্তে নয়, লতাপ্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ের একটা লজ্জাকর ব্যাপার ডলির জানা ছিল। লজ্জাকর ঠিক নয়, হাস্যকর। একালে আর নায়িকার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেম নিবেদন করতে হয় না। কিন্তু জ্যোতির্ময়কে বিপাকে পড়ে তাই করতে হয়েছিল। অন্ততঃ লতাদির কাছে থেকে ডলি তেমন খবরই পেয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে ইতিপূর্বে অনেকবার সে জ্যোতির্ময়কে বিপর্যস্ত করেছে। আজ আবার সেই প্রসঙ্গটা উঠে পড়তে পারে সেই ভয়ে জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটাবার ফিকির খুঁজতে লাগলো।

—উঃ, যা ধোঁয়া হচ্ছে। চোখদুটো একেবারে গেল।

মুখফোড় মেয়ে ডলির বুঝতে কষ্ট হল না, এটা হচ্ছে জ্যোতির্ময়ের পলারনোভোগ। বিতর্কে জ্যোতির্ময় ষতটা জাঁদরেল, এসব ব্যাপারে ঠিক ততটাই মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির। বিশেষতঃ লতার কাছে প্রেম নিবেদনের হাস্যকর রকম নাটকীয় ঘটনাটা ডলির জানা। অতএব জ্যোতির্ময়কে ধরাশায়ী করে দেবার মতো যথেষ্ট

তুণ ওর সঞ্চয়ে ।

ডলি বললে, সুব্রতবাবু, শুনবেন জ্যোতির্ময়বাবুর প্রেমের গল্প । বলব জ্যোতির্ময়বাবু ?

জ্যোতির্ময় বললে, দেখুন তো, মাংসে হলুদবাটা আর দেব ।

ডলি মুখ টিপে হেসে বললে, লতাদিকে তো আনেননি ইচ্ছে করেই । কে আর বলে দেবেন বলুন । থাক সুব্রতবাবুকে আর একদিন বলা যাবে আপনার প্রেমের উপাখ্যান । আজ সুব্রতবাবুর প্রেমের গল্পই শোনা যাক ।

দেবেশ বললে, যে-হারে তোমরা প্রেমের গল্প শুরু করেছ, তাতে আজ উপোস দিতে না হয়, তাই ভাবছি ।

দেবেশের ভয় সত্ত্বেও দুপুরে খাওয়াটা অবশ্য ভালোই হল । এমনকি সুব্রতও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেল, অনেক বেশি কথা বললো, ডলিকে দু-চারটে স্মল্ল স্মল্ল খোঁজা দিয়ে সকালবেলার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল এবং শোভনার দিকে স্পষ্টভাবে তাকালেও করেকবার ।

সন্ধ্যার ট্রেন । খাওয়ার পর অনেকটা সময় পাওয়া গেল । সকলে মিলে রক্ত রচনা করে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজালো । শোভনারা হটোপুটি করে লুকোচুরি খেলল । এবং একসময় সবাই ক্লান্ত হয়ে কেউ বিছানায়-সতরঞ্জির ওপর চোখ বুজলো, কেউ পুকুরের ধারে মিষ্টি রোদে গিয়ে বসল । পড়ন্ত দুপুরের অবসাদে বেশ একটা ঝিমুনি পায় সকলের ।

সুব্রত ধীরে ধীরে রেললাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো । ওপারে, অদ্ভুত নীল আকাশ । একটা নিঃসঙ্গ চিল অনেক উর্ধ্বে প্রায় নীলের গভীরে শরীর ভাসিয়ে উড়ছিল । টেলিগ্রাফের তারে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি আটকে আছে । দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল । রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো সুব্রত ।

কী ভালোই লাগছিল । আজ আর কোনো যন্ত্রণা নেই । মাথার ভেতর থেকে সেই গড়ানো ভিজ়ে রক্তের স্বাদ প্রায় মুছে গেছে । চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালো সুব্রত । ছোটো ছোটো কালো বিন্দুগুলো এক সময় সংহত হয়ে আসে, ধ্যানের মধ্যে সুব্রত যেন একটা মূর্তি গড়ে নিতে চায়, যা শুভ্র, শোভনার মতো । পবিত্র— শোভনার মতো ।

চোখ খুলতেই হঠাৎ একটা আলোর বন্যায় তার দু-চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেল । দূরে, বিন্দুর মতো দেখা যায়, ঐ যে সাদা শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে রেললাইনের ওপর তারসাম্য রাখতে রাখতে ছুটে যাচ্ছে, কে ও । শোভনা । শোভনাই তো ?

সুত্রত পা চালানো।

নিঃসঙ্গ নির্জন মধ্যাহ্ন। কিংবা মধ্যাহ্নের শেষ। দু-পাশে একেবারে আকাশের
গায়ের সঙ্গে মিশে-যাওয়া মাঠ। সবুজ। মাথার ওপর আকাশ নীল। দূরে,
শোভনা, শোভনাই তো। সাদা।

সুত্রত প্রায় ছুটছে।

একটা শুভ্র পবিত্র হাতছানি ওকে ওর অনিবার্যতায় ডাক দিয়েছে।

শোভনা! ডাকলো সুত্রত।

নিজের স্বরে এ নামের এই প্রথম উচ্চারণ শুনে অবাক হয়ে গেল সুত্রত।

কীড়াচঞ্চল হরিণীর মতো শোভনা তড়িৎগতিতে দূরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

শোভনা! দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ডাকলো সুত্রত।

নাম-না-জানা একটা পাখি 'টু-উ' ডাকতে ডাকতে চলে গেল। সুত্রতর মনে হল,
পাখি যেন বললে, কেন ডাকছ।

সুত্রত উত্তর দিল, তাকে যে ভালবাসি, তাই।

দাঁড়িয়ে পড়ল সুত্রত। সাদা শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় উড়ছে, আর দ্রুত সরে
যাচ্ছে দূরে। দাঁড়িয়ে পড়লে চলবে না। নিজেকে সে ক্রমাগত আকাজ্জক
দিকে ঠেলে নিয়ে চললো।

কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। জীবনের সব থেকে প্রিয় মুহূর্তটি এই
মুহূর্তে দূরে, ছোট আরও ছোট হয়ে আসছে। সুত্রত ধামবে না, পিছিয়ে
পড়বে না। ধরবে। ওকে তো ছুঁতেই হবে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে। ঐতো। ঐতো।
পায়ের নিচে রেলের লাইন। পাথরকুচি। পা বুঝি ছড়ে গেল। বুঝি রক্ত
পড়ছে আঙুল কেটে। মাথার ওপর নীল আকাশ। দু-পাশে ঘন সবুজ মাঠ।
সুত্রত আর কিছু চায় না, এমন কি ওকে ছুঁতেও না। শুধু বলবে, তোমাকে
আমি ভালবাসি। আমার মৃত শরীরের পাশে তোমার সাদা ফুলটি রেখে দিও।
আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একসময় আকাশের নীল ফুরিয়ে আসতে
লাগলো। দু-পাশের সবুজ মাঠ ঘন কালো অন্ধকার হয়ে যাবে বুঝি।

একী খেলা তোমার। আমাকে হারিয়ে দিয়ে, আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে, কী লাভ
তোমার, মায়াবী।

ছোঁয়া যাবে না তাকে। ধরা যাবে না তাকে। অস্থির আবেগে উত্তেজনায় সুত্রতর
ঠোঁটছুটো কাঁপতে থাকে।

শোভনা, তোমার আলোকবৃত্তের কাছটিতে কখনো কি আমি পৌঁছবো না। হারিয়ে গেলে চলবে না। হেরে গেলে চলবে না। বাঁচার মানে আছে, জীবনের মানে আছে। কঠোর সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, আমি তোমাকে ভালবাসি, শোভনা। তুমি যেও না—

টলতে টলতে একসময় মনে হল, মাথার মধ্যে কতগুলি বিদ্যুৎ চমকে উঠল বৃষ্টি। অদ্ভুত শুভ্র সে যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে। কী কষ্ট। কী অদ্ভুত কষ্ট। দূরে ট্রেনের হুইশল বেজে উঠল। ঝড়ের গতিতে ধোঁয়া উড়িয়ে সমস্ত নৈঃশব্দ্য তোলপাড় করে ট্রেন আসছে। স্তব্ধ লাইন থেকে নেমে দাঁড়ালো। ধুলো কাকরের এলোমেলো ঘূর্ণী তুলে ট্রেন চলে গেল। হঠাৎ স্তব্ধতর খেয়াল হল, একি এখানে কেন সে। সত্যি পাগল হয়ে গেছে নাকি। একটা ভাস্ত্র মনগড়া স্বপ্ন এতদূর ওকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। কী ভাবছে ওরা এতক্ষণ। আশ্চর্য।

তাড়াতাড়ি সে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। ট্রেন কেল করলে কী জবাবদিহি করবে ওদের।

বেশ খানিকটা পৃথক হেঁটে এসেছে। এতটা রাস্তা অবাস্তব স্বপ্নের ঘোরে কি করে সে পেরিয়ে গেছে, ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল স্তব্ধত।

কিছুক্ষণ চলার পর দূরে ডিসট্যান্ট সিগনাল দেখা গেল। অন্ধকার হয়ে আসছে বটে, কিন্তু তখনো অপরাহ্নের শেষ আলোর আভা একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ট্রেন তাহলে ধরা বাবে।

লাইনের বাধ থেকে নিচের পথে চলা রাস্তাটার নামতে গিয়ে স্তব্ধত দেখতে পেল, শোভনা দাঁড়িয়ে আছে, মটরশুঁটি খেতের আলের ধারে। না, ভাস্ত্র নয়।

স্তব্ধত এগিয়ে গিয়ে খমকে দাঁড়ালো। বললে, ওরা কোথায়?

—ভেতরে আছে।

—ট্রেন কটার?

—দেরি আছে আরো।

—আপনি একলা এখানে।

—এমনি। ভালো লাগছে তাই।

এখান থেকে কয়েকগজ দূরেই দেবেশদের বাগান বাড়ি। এখান থেকেই ওদের হুঁগোল শোনা যাচ্ছে। সুভাষ তারস্বরে গান ধরেছে, বাধ ভেঙে দাও, বাধ ভেঙে দাও। ভাঙো।

ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে, বোধকরি ডলিট।

গোধূলি আলোর রঙ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে শোভনা। যাকে সে দূরে খুঁজতে গিয়েছিল, সে এত কাছে, এমন কি তার ছোট ছোট নিশ্বাসের শব্দটিও শোনা যায়।

সুব্রতর ইচ্ছে হল বলে, তোমাকেই আমি খুঁজছি এতকাল। কিন্তু গলা বেধে গেল। এই অপরূপ সুন্দর মুহূর্তটিকে একটা কথার ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হল না তার।

ছোট একটা নিশ্বাস পড়ল শোভনার।

সুব্রত বলল, চলুন যাই।

শোভনা বলল, চলুন।

কিন্তু শোভনা দাঁড়িয়েই রইল। কি করবে বুঝতে না পেরে সুব্রতও দাঁড়িয়ে রইল।

চূপ করে থাকে যে এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সুব্রতর জানা ছিল না। আর কোনো গান নেই, আর কোনো যন্ত্রণাও নেই। অনেক নরক হেঁটে এসে জীবনকে আজ তার সুন্দর মনে করতে ভালো লাগছে। পাগল সে হয়ে যায়নি, হতে পারেনি।

শোভনা বললে, চলুন যাই।

সুভাষের গান বোধ করি শেষ হয়ে এল। একসঙ্গে অনেকগুলো গলার কলরব শোনা গেল।

সুব্রত বললে, চলুন।

গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকলো ওরা। অস্পষ্ট উচ্চারণ, নিজের কানেই শোনা যায় না এমন স্বরে সুব্রত শুধু বললে, আমি ভালোবাসি।

শোভনা বোধকরি শুনতেই পেল না। অন্ধকারে মনে হল, শোভনা বুঝি মাথা নিচু করল, বুঝি চোখের কোণে একফোটা জল টলটল করে উঠল। তারপর আরো অস্পষ্ট গলায় বললে, জানি।

সুব্রতর মনে হল, সুভাষ, ডলি, শাস্ত্রু, সুজাতাদের সমস্ত কলরব ছাপিয়েও সে স্পষ্ট শুনতে পেল, জানি।

• উপন্যাসের কবিতা দুটি লিখেছেন রাম বসু।

পুঁই-পালং-এর স্বাদ ॥ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

পুকুর পাড়ের পতিত ডাঙাটুকুতে আনাজ-পাতির চাব করে গজেন সাঁত দু-বেলা দু-সকলো খাওয়া-পরার জালায় মরতে মরতে বেঁচে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেল।

গজেনের বাবা নবনী সাঁতের বাসনা ছিল কোন রকমে অবস্থাটার একটু ভোল পাঁটাতে পারলেই বাশ-খড়ি কিনে ঐ ডাঙাতেই একটা পানের বরোজ তুলবে। বাসনা পূর্ণ হবার আগেই নবনীকে স্বর্গবাসী হতে হল। নবনীর মৃত্যুর পর প্রায় বছর দেড়েক জায়গাটা বুনো আগাছার জঙ্গল হয়েই পড়েছিল। মগজে বুদ্ধিটা আসার সঙ্গে সঙ্গে গজেন উঠে-পড়ে লেগে গেল সেখানে বাগান বানাতে। শাক-সব্জীর বাগান। একাই গতরে খেটে, মাটি কুপিয়ে চারপাশে কাঁটা বাবলা আর রাং-চিতের ঘন বেড়া দিয়ে ভেতরের ছোট জায়গাটুকুতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফল-ফসলের সমারোহে সবুজের হাট বসিয়ে ফেললে। ফল ফসলগুলো শুধু যে ঘরে খেয়েই বেঁচে থাকার ভরসা এনেছে তা নয়। ওগুলো হাটে-বাজারে বিক্রি করে যে নগদ পরসা আসে তা থেকেও বেঁচে থাকার অত্যান্ত অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। এখন আনাজ তরি-তরকারীর বাজারটা ক্রমশঃই চড়ছে। আজ একরকম, কাল অল্পরকম। তাই ক্রমশঃ তার লোভ-লালসাও বেড়ে চলেছে লাভের গন্ধে। এই চড়া বাজারের মরশুমে সে যদি মোটা মূলধনের আনাজ ব্যবসার নামতে পারতো—তাহলে হ্যাঁ একবার নেড়েচেড়ে হাতের সুখ, ধৈর্য-দেয়ে ভাতের সুখটা মিটতো বটে! কিন্তু বেশি সুখের জন্মনা করানায় বেশি মাথা ঘামাতে গেলে তার মাথার শিরা টনটন করে। তখন সে তার নিজের নৈরাশ্যকেই নিজের প্রবোধ জোগায়। কেন এতেই বা সুখটা কি কম। মাটির দাম নেই। গতরটা নিজের। ফল-ফসলের চারা বা বীজ জোগাড় করতে ক-পরসাই বা লেগেছে। রোদ-জলের পরমায়ু জোগাচ্ছে আকাশ প্রকৃতি। প্রায় বিনা মূলধনে এটাও কী কম লাভের ব্যবসা একটা! গজেনের দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারে একটু একটু করে জীবনের জেল্লা ফুটতে শুরু করেছে। তা বলে এমন নয় যে উর্বশীকে দেখে গজেনের মনে হয়েছে তার

বৌ সত্যিকারের উর্বশীর মত স্বর্গ-মর্ত্যের সেরা সুন্দরী। শুধু উর্বশীর গালে-মুখে একটু মাংস লেগেছে। গোল বাতাবী লেবুর মতো না হলেও গালটা যে রক্ত মাংসের তৈরি সেটা অস্বাভাবিক করা যায়। মাস দুই আগে উর্বশীর গালে সাঁটিয়ে একটা চড় কষাতে গিয়ে তার চোয়ালের হাড়ে গজেনের কড়া-পড়া হাতের আঙুল-গুলো ঠেকের খেয়েছিল। আজ যদি তেমনি কোন কারণে মাথা গরমের ঝোঁকে চড় কষাতে হয় তাহলে..... না, সেরকম মন-মেজাজ আর নেই গজেনের। প্রায় দু-বেলা দু-সন্ধ্যা অনাহার, অর্ধাহার অথবা তুষ-কুঁড়ো মেশানো খুদের জাউয়ের অথবা খাওয়ার বদলে মাজা দাঁতের মতো সাদা ভাত আর বাগানের তাজা আনারাজের তৈরি ডালনা-চচ্চড়ির স্বাদ পেতেই উর্বশীর গালের মতো, গজেনের স্বভাবটারও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। রোগা-ভোগা একপাল চাংটো, আধ চাংটো বুনো শুয়োরকে নিজের ছেলের মতোই আদর করে সে। ক-দিন আগে নিজের গরজেই উর্বশীর জন্মে একটা মাঝারী গোছের শাড়ী কিনে এনেছে সে। নিজের জন্মেও বানিয়েছে মোটা মার্কিন খানের একটা ফতুয়া। শীতকালে শীত কাটাবার কথা মনে রেখে। আর একদিন বাজারের বেচাকেনা সেরে বাড়ি কেয়ার পথে বনমালীর সেলুনে নগদ চার আনা দিয়ে চুল-দাড়ি কামিয়েছে। উর্বশীর ফরমাস মতো টুকিটাকি ঘর সংসারের আরও কিছু জিনিস কেনার কথা মনে মনে ছকা আছে তার। গজেন নিজেই অবাক হয়ে ভাবে নিজের পাটে যাওয়া মনের চেহারাটার কথা। বুঝতে পারে—ঈস্ কী রসকষহীন শুকনো কাঠখোঁটাই না হয়ে গিয়েছিল তার মেজাজটা। ডাল-ভাত, টাকা-পরসার সঙ্গে মানুষের মনের যেন নাড়ীর সম্পর্ক!

সেদিন পারুলী এসেছিল বাজার করতে।

মজার মেয়ে বটে একটা। এমনভাবে কথা কইল, তাকাল যেন গজেন সাঁতকে সে জীবনে কোনদিন চেনেনি, দেখেনি।

তোমার পুঁই-পালং-এর কত করে দর গো, ও দোকানী। আর এই বুড়ো বেগুনের দরটাই বা কি?

গজেনও জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গেই। না-তাকিয়ে, না-হেসে—

বুড়ো নয় গো, একদম আইবুড়ো, ছুঁয়েই দেখ না।

জবাবটা দেওয়ার পর থেকে গজেন তারিফ করে নিজের রসবোধকে। আর ভেবে অবাক হয় ঠিক ঠিক জবাবটা দিয়ে পারুলীকে হতবাক করার মতো বুদ্ধি কি করে এল তার মাঝে!

সেই সন্ধ্যে আরও একটা ভাবনা তার মাথা জুড়ে বসে। আনাজ কিনতে এসে পারুলী সেদিন যখন রুঁকে কোঁচড় পেতে বেগুন নিচ্ছিল, তখন গজেনের চোখে পড়েছে তার শরীরের ও বুকের গড়নটা। বেগুনের মতোই পুষ্ট। অথচ ওর জীবন-ভরা দুর্ভাগ্য। সংসার-ভরা দুর্দশা। জীবন কি ব্যর্থ নয় ওর? অমন শরীরকে সমাদর করার ক'উ নেই যার জীবনে।

একদিন বনমালী তার মেলুন থেকে গজেনকে দেখে হাঁক দেয় :

হেই গজেন, শুনে যা, শুনে যা না রে তাড়াতাড়ি।

গজেন কাছে আসতেই বলে, ইদিকে নয়, উদিকে ঐ বড় রাস্তার দিকে তাকা। দেখতে পাচ্ছ? সাদা পাঞ্জাবী গায়ে ঢ্যাঙা মতন একটা লোক যাচ্ছে, ঐ যে রে ছাতা মাথায় বেঁটে লোকটার পাশে। ওকে চিনতে পার।

গজেন বলে, না, কে বল তো? আমি চিনি নাকি?

বনমালী একজন খন্দেরের গালে সাবান মাখিয়ে নোলানো চামড়ার ফিতের ফুরটায় শান দিতে দিতে বলে, ওকে চিনলুনি, ঐ তো পারুলীর ভাতার। বাস্তবের মানিক পধ্যান। আমার দোকানে এসেছিল চুল চাঁটতে।

তাঁই নাকি? তা পারুলীর খবর-টবর জিজ্ঞেস করলো? নিজের ছেলের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

হ্যাঁ, করল বৈকি। সব খবরই জিজ্ঞেস করলে! জানু, লোকটার বোধায় মন পড়েছে। পারুলীর টানে না হোক, ছেলের টানেই বোধায় নরম হয়েছে মানুষটা! প্রায়ই তো যাতায়াত করে ইখেন দিয়ে। আসলে লোকটার মনের ভাব কি জানু? আশেপাশে ঘুরছে। স্বস্ত্রবাড়ির কেউ দেখতে পেয়ে যদি একটু সাধাসাধি করে তাহলেই রাগ-ভঞ্জন মান-ভঞ্জন হয়।

খবরটা শুনে গজেনের মনে পারুলীর জন্তে এক অদ্ভুত সমবেদনা জাগে।

স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে দীর্ঘকাল বাপের বাড়ির দুঃখকষ্টের সংসারে পারুলীর জীবনটা কত কষ্টেই না কেটে চলেছে।

গজেন ঠিক করে সন্ধ্যের পর পারুলীদের বাড়িতে গিয়ে মানিক প্রধানের খবরটা দিয়ে আসবে।

কিন্তু নানা কারণে তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একদিন দু-দিন নয়। পরপর ক-দিনই। চাববাসের কাজ শেষ হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে গিয়ে জমিতে 'আগো' ঘেরে আসতে হয়। তাছাড়া ক-দিনের প্রচুর বর্ষায় বাগানে জল জমে

গিয়ে আনাজপাতির যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বামেলা-ঝাট সামলাতেও ভারী ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে।

একদিন শেষ-বিকেলে গজেনকে চমকে দিয়ে পারুলী তার বাগানে এসে দাঁড়ায়।

শেষ-বিকেলের রাঙা আলোর চওড়া চওড়া পুঁই-পালং ইত্যাদির সবুজ পাতা-গুলোয় সোনালী আভা ফুটেছে। চারপাশের এই নিবিড় ঘন সবুজ ও সোনালীতে মেশানো উজ্জ্বল রঙের সমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে পারুলীর গায়ের শ্রামল রঙের ও বদল ঘটে যায় কিছুটা।

পারুলী বলে—এই আসতে হল একবার। বাড়িতে কুটুম এসে গেলেন একজন।

কুটুম! গজেনের মনে পড়ে গেল মানিক প্রধানের কথা। শেষ পর্যন্ত সে কি নিজেকে ধরা দিয়ে নিজের পাপ অন্টারের প্রায়শ্চিত্ত করলো নাকি?

কুটুম, কুটুম আবার কে এল?

ছোট বোনের বর এল।

কুটুমটি যে মানিক প্রধান নয় এটা জেনে গজেন খুশি হয়। মানিক প্রধানের খবরটা পারুলীদের বাড়িতে নিজের মুখে জানানোর সুযোগটা এখনো হারায়নি সে। গজেন জিজ্ঞেস করে, তা কিছু কি চাই নাকি? কি দরকারে ইথেনে আগমন হয়েছে গা।

কিছু আনাজ পাতি নিতে এমু। এক সের পুঁই শাক আর একপো করে বেগুন আর ঢেঁড়ুস দাও দেখি।

গজেন বলে, এ বাগান থেকে তো আর বেচাকেনা করিনি। মাপতে ওজন করতে গেলে আবার দাঁড়িপাল্লা আনতে হবে বাড়ি থেকে। তার চেয়ে আমি বরং তোমাকে কিছু খেতে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

বর্ষার অতিরিক্ত জলে গোড়া পচে যে সব গাছের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, এতক্ষণ সেগুলোকেই বেছে সাফ-সোফ করছিল গজেন। কিছু বাদ-সাধ দিয়ে ওর মধ্যে থেকেই আবার ভালো কিছু বেছে কালকের হাটে টাটকা আনাজের সঙ্গে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করা যাবে। গজেন সেই জমানো আনাজপাতি থেকে ভালোমন্দ মিশিয়ে কিছু দেয় পারুলীকে।

বিনা পয়সায় এতগুলো আনাজ পাওয়ার আনন্দে যাবার সময় পারুলী খানিকটা শুকনো খাতির করে।

এসো না গো মোদের বাড়ি। মোদের নতুন জামাইকে দেখবে।

মুখ মিষ্টি করাবে নাকি?

সে হবেখন।

ষাবার পথে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পারুলী হেসে জবাবটা দেয়। তুচ্ছ দু-দশ পরস্যা আনাফের দামের চেয়ে অনেক বেশি দামের হাসি।

গজেন সন্ধ্যাটা পেরুতে না পেরুতেই ঘরে মন টিকোতে পারে না।

উর্বশী তালের বড়া ভাজছিল। একটু বসতে বললে গজেনকে। একটু বসলেই হত। কিন্তু কি ভেবে গজেন উঠে পড়ল।

সেই তালের বড়া জুটে গেল পারুলীদের বাড়ি। তালের বড়ার সঙ্গে ছোটো রসগোল্লা। বোঝা গেল রসগোল্লাটা এনেছে নতুন জামাই। জামাইকে দেখে মন্দ লাগলো না গজেনের। বয়স অল্প। লাডুক ও মেয়েলী ধরনের মুখ। কোথাকার সয়লা-গানের দলে বেহলা সাজে। ভালো গান জানে। চাষী-ভূষিদের ঘরে সচরাচর যেমন জামাই আসে, তেমন নয়। পোশাক পরিচ্ছদে সভ্য-ভব্যতার ছাপ আছে।

আর গজেনের সবচেয়ে অবাক লাগল সেই অল্পবয়সের মুখচোরা জামাইকে কেন্দ্র করে পারুলীর অতিরিক্ত গায়ে-পড়া রং-চং, আদর আবদার, ছল চাতুরী।

গজেন এর কারণটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই তার মনের মধ্যে অভাগিনী পারুলীর জন্তে একটা কোমল বেদনা উৎসারিত হয়। শেষ পর্যন্ত সকলের সামনেই, পারুলীর মাকে উদ্দেশ্য করে গজেন মানিক প্রধানের ঘটনাটা বলে :

মন পড়েছে লোকটার। এ-পক্ষ থেকে একটু ডাকা-হাঁকা পেলেই লোকটা আবার সব গুণগোল মিটিয়ে নিজের সংসারে কিরিয়ে নিয়ে যাবে পারুলীকে।

পারুলীর মা কপালে অনেকগুলো চিন্তার রেখা ফুটিয়ে যখন গজেনকে মানিক সম্বন্ধে আরও ছোটো একটা প্রশ্ন করছিলেন সেই সময় দলিতা-নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল পারুলী।

তোমাকে এত সাউকুড়ি ফলাতে কে বলেছে ইধেনে এসে। দাগালী করতে এসেছ বুঝি? যার বোঁ ছেলের দরকার সে নিজে এসে পায়ে তেল দিয়ে আবাহন করতে পারে না? তোমাকে কেন ওকালুতি করতে হবে তার হয়ে। সে নিজে আসুক না। বুড়ো ঝাঁটায় ঝাঁটিয়ে বিদেয় করবোনি।

পারুলীর রণচণ্ডী মার্কি উগ্র মূর্তি দেখে গজেন ভড়কে যায়। লজ্জাও পায়। অপমানিত হয় আরো বেশি। একটা বিদেশী অচেনা লোকের সামনে তার

মান-মর্যাদা মাটি হয়ে গেল ভেবে। যে পারুলীকে হাসলে এমন সুন্দর দেখায়, সে যে রাগলে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো গজেনের আগে হয়নি। মনটা তার বিষিয়ে থাকে সারারাত।

বাড়ি ফিরে গোত্রাসে একখালা ভাত খায় সে। উর্বশীর রাগা করা কুচো চিংড়ি দিয়ে কুমড়া আর পুঁই শাকের তরকারীটা অমৃতের মত মনে হয়। শরীরে রঙ-জেল্লা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাঁধার হাতটাও কি উর্বশীর খুলে গেছে নাকি?

কয়েকদিন পরে বাজারে যাওয়ার পথে পারুলীর সঙ্গে আবার দেখা হয় গজেনের, ঘাট থেকে বাসন বাজা দিলে পারুলী ডাঙায় উঠে এসে বলে, বলি ও কাজের মানুষ, একমিনিট দাঁড়াবার কুরসুং নেই বুঝি।

গজেন কোন জবাব না দিয়ে কেবল খামে একটু। মাথায় আনাজের বড় ঝোঁড়া। রেগে বুঝি টং হয়ে আছি সেদিনে দুটো গাল-মন্দের কথায়। রাগ কি আর সাধে হয়েছিল। তোমার গায়ে পড়া দরদ দেখে হয়েছিল।

গজেন বলে, আমি কি নিজের জন্তো কথাটা বলেছি। তোমার ভালোর জন্তেই বলেছি। পারুলী ঠোট উল্টে হাসে। কিন্তু পরক্ষণে কথা বলে হাসির উণ্টো ধরনে। কেন গা, তুমি কি আমার ভরণ-পোষণের মালিক নাকি, যে আমার ভালো-মন্দের কথা এত ভাবতে হবে তোমাকে।

সেদিনের অপমানটা বিনাবাক্যে গায়ে মেখে নিয়েছে বলেই বুঝি পারুলীর সাহস বেড়েছে রাস্তায় ঘাটে তাকে অপমান করার। গজেন যেন ভাবে একটা কোনরকম নোংরা কথা বলে পারুলীর বাড়িবাড়ি রকমের ঔদ্ধত্যের জবাব দেয়। কিন্তু তার বদলে সে এক পলকে পারুলীর শরীর ও স্বভাবের মধ্যকার বৈপরীত্যের কথা ভেবে নিয়ে কেমন একটা নিরবয়ব বেদনা উপলব্ধি করে। পারুলীর সামনে না দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা শুরু করার মুখে দুর্বল ভঙ্গিতে বলে যায়, ভরণ-পোষণের মালিক না হলেই বুঝি মানুষের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে নেই।

আকাশের ওপর থেকে সন্ধ্যোটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে মাটির দিকে নামছে। পুকুরের জলে হান হয়ে এসেছে গাছের ছায়া। চারপাশে ভয়ংকর স্তব্ধতা। কতদূরের একটা গাছে একপাল কাকের চেরা গলার কলরব ঘাটে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে পারুলী। মাঠ থেকে ধানের সতেজ চারার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে ভিজে মাটির। পারুলী ঘাটে এসেছে গা ধুতে। পুকুরে নেমে শরীরটাকে জলে ভিজিয়ে তোলার আগে অকারণে এক ঠায়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল চূপচাপ। তার চোখের দৃষ্টি পুকুরের ওপারের লম্বা লম্বা নারকেল গাছের মাথার ওপরের বিস্তৃত

আকাশের দিকে। আনমনে এতক্ষণ সে যে কী ভাবছিল তা সে নিজেকেই হয়তো জানে না। তার ছোট বোন ঘাটের সামনের তুলসীমঞ্চ সন্ধ্যার পিড়িম দেখাতে এলে পারুলী সজাগ হয়ে তরতর করে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে যায়।

পারুলীর এই আনমনা ভাবটা কেবল যে ছোট বোন মনসা-রই চোখে পড়ল তা নয়। জামাই গণেশেরও চোখ এড়িয়ে গেল না। সকাল থেকে তার মনটাও বর্ষা ঝুর মতো মেঘলা মেঘলা। কাল তার চলে যাওয়ার দিন।

কাল সকালের পর আবার কতদিন সে মনসাকে দেখতে পাবে না। বিয়ের সময়কার মনসা শরীরে মনে কী বদলে গেছে এক বছরে! আগে কাছে ডাকলে ঘোমটার আড়ালে থরথর করে কাঁপতো। এখন ঘোমটা খুলে চোখ দুটোকে চড়ুই পাখীর মতো নাচিরে-ঘুরিয়ে পানের পিক-মাখা ঠোঁটে ফিকফিকিয়ে হেসে কাছে এসে দাঁড়ায়। আরো কাছে ডাকলে কাজের ছল করে দূরে সরে যায়। আবার রাগ করে আরো দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে গলা জড়িয়ে বুক জড়িয়ে শরীরটাকে জালিয়ে তোলে।

আজকের একটা রাত্ৰিতে এক সন্ধ্যে কত রাত্ৰির ভালবাসা সে বাসবে তারই বিরামহীন চিন্তার ফাঁকে গণেশের চোখে পড়ে পারুলীর গম্ভীর আনমনা মুখটা। কিন্তু এর কারণ জানবার কোঁহুল সে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। হয়তো সকলের সামনে সেদিনকার গজেনের মত তাকেও অপমান করে বসবে।

গণেশের চোখে মনসা যাই হোক আসলে তো সে এগারো বছরের একরত্তি গৌড় মেয়ে। শরীরের গড়নের জোরেই একটু বড় মনে হয়। চাষী-ভূমির সংসারে এই-রকমই হয়ে থাকে।

বিছানায় শুতে আসার কিছু পরেই মনসার চোখে গাঢ় ঘুম জড়িয়ে আসে সারা দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে। কাল সকালের পর থেকে বুক জড়িয়ে ঘুমোবার মানুষটিকে আর যে বুকের পাশে পাবে না এই বেদনাদায়ক অনুভূতির প্রতি মন তার যতই সঙ্কল্প রকমের সজাগ থাকুক, ঘুম জিনিসটার ক্রিয়া তাকে শরীরে মনে নিশ্চেষ্ট করে রাখে। ক্রমশঃ চোখের পাতা দুটোকে খুলে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তার পক্ষে।

গণেশ নানা কন্দি-ফিকির খাটিয়ে তবু অনেকটা রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখার দুঃসাধ্য চেষ্টা করে।

তার কলেই কিছুক্ষণের মত সে একবার করে জেগে ওঠে। কিন্তু একটু পরেই যখন কানে আসে মনসার মুহূ নাক ডাকার শব্দ—রাগে দুঃখে অভিমানে গণেশের

ইচ্ছে করে এই ঘুন-কাতুরে মেয়েটার গালে ঠাস করে একটা চড় আঁটিয়ে এখুনি তার টিনের স্ট্রটেকশটায় জামা-কাপড় ভরে নিয়ে এখান থেকেই চলে যায়।

গণেশ অত্থানি করতে পারে না বটে কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে বিছানা ছেড়ে। ভিজ্জে উঠোনে সবুজ শ্রাওলা জমেছে। আকাশ মেঘলা। হয়তো শেষ রাত্রে বৃষ্টি হবে। গণেশ ভাবে বৃষ্টিতে পথে-ঘাটে এক হাঁটু জল জমলেও কাল সে এখানে অগ্রগ্রহণ করবে না। এমন কি মনসার চোখের জলেও যদি কোন দিন এই উঠোনের মাটিতে এমনি শ্রাওলা জমে ওঠে—তবুও কিরবে কিনা সন্দেহ। সে কি এতই অপদার্থ যে মনসার মত একটা এককোটা পুঁচকে মেয়ের কাছ থেকে পায়ের ধরে খোসামোদ করে ভালবাসা আদায় করতে হবে।

মনের মধ্যে একটা বিল্ড্রী কঁাকা জ্বালা মোচড় বেতে থাকে তার। সেই সঙ্গে পেটের মধ্যেও কিসের যেন কামড়ানি ওঠে। খুত্তরবাড়িতে এসে ক দিন ধরে কেবল পুঁই শাক আর কুমড়োর ঘন্ট খাচ্ছে। তারই কলে হজমশক্তির কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে গেছে বোধহয়।

পাশের ঘরে পারুলী থাকে। সে এতক্ষণ জেগেই ছিল। ওদের কথাবার্তা কানে আসছিল। সেও তো কিছুকাল একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু পুরুষ মানুষের এমন মেয়েলী স্বভাব তার চোখে পড়েনি। খানিকটা ঈর্ষায় এবং খানিকটা বিরক্তিতে তার একবার ইচ্ছে করছিল নিজের ঘুমন্ত ছেলেকে চিমটি কেটে জাগিয়ে তোলে। ছেলেকে ট্যা ভ্যা করে চেঁচিয়ে কাঁদলে ওদের রাত-জাগা ভালবাসার গজর-গজর তাকে আর শুনতে হবে না। কিন্তু ক্রমশঃ পাশের ঘরটাকে সাড়াশব্দহীন হতে দেখে পারুলী আরও উৎকর্ণ হয়ে ছিল। বোধ হয় মান-অভিমানের পালা চলেছে। শেষ পর্যন্ত গণেশের খিল খুলে বেরিয়ে আসার শব্দে অবাক হল পারুলী। এবং অনেকক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পরও সে ঘরে ঢুকল না। বুঝে পারুলী নিজেই বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজা খুলে দেখলে গণেশ বোকার মত আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কি গ, দাঁড়ি কেন হেথা। পারুলী প্রশ্ন করে গণেশকে।

গণেশ উত্তর দেয় না।

উ বুঝি ঘুমিয়েছে।

গণেশ কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চূপ থাকে।

সমস্ত বাড়িটাও গণেশের না-বলা কথার মত নিশ্চূপ। মানুষের জগতে এই মহা

নিশ্চরতার স্রোতগেই যেন আকাশে মেঘের জগতে একটা বিরাট দুরভিসন্ধি পাকিয়ে উঠেছে। মেটে রঙের জলভারাবনত চাপ চাপ মেঘগুলো যেন একজন আরেকজনকে ঠেলা দিয়ে হুটে নেমে আসতে চাইছে মাটির দিকে। কী যে ব্যথা, কী যে ওদের ক্ষুধা কে জানে। কোথাও কোনখানে মাটির বুকে জলের যৌবনে ভরা শরীরকে আত্মসমর্পণে উজাড় করে দিতে না পারলে হয়তো সে ব্যথা-তৃষ্ণার উপশম নেই।

পারুলী গণেশের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়। যুহু হেসে বলে, মান-অভিমান চলেছে নাকি গা? নইলে বোঁকে ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ি থাকে কেউ। উ-মেয়েটার অমনি স্বভাব বাবু। একটু ঘম-কাতুরে। একে একটু সহ-সামুঠ করে নিতে হবে তোমাকে। পারুলীর কথাগুলো কত অন্তরঙ্গ দরদ-মাখানো।

গণেশ ভাবে পারুলীর মুখ-জোড়া গাঙ্গীর্ষটা হঠাৎ কেনই বা এল, কেনই বা এখন লক্ষণমাত্র অবশিষ্ট নেই তার?

পারুলী গণেশের পিঠে হাত রেখে আরও ঘন হয়ে আসে।

যাও, শুয়ে পড়গে। যাও।

গণেশ এতক্ষণে প্রতিবাদ করে বলে, না গ দিদি, রাগ করে আসিনি আমি।

তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? উসব বুঝি গ বুঝি। যাও, যাও, আমি বরং ডেকে ওর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিচ্ছি। ভাত-ঘুমটা ভেঙে দিলে জাগবে খন।

পারুলীর এ ধরনের কথায় গণেশ লজ্জা পায়। সম্পর্কে গুরুজন তার ওপর মেয়ে এমন একজনের কাছ থেকে এ-ধরনের কথা শুনতে কার না লজ্জা হয়।

গণেশ বলে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, তুমি শুয়ে পড়গে দিদি। আমার পেটটা কামড়াচ্ছিল তাই...কিন্তু গণেশের জীবনের ভালো-মন্দকে নিয়ে ভাবটা যেন আজ রাতে পারুলীর জীবনের একটা মহাকর্তব্য হয়ে উঠেছে।

পারুলী বলে, আর উ-ঘরে যদি শুতে একান্তই অনিচ্ছা থাকে তবে আমার ঘরে শুবে এস, এস না।

গণেশ সত্যিই এতক্ষণ বোকার মত ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়েছিল মেঘলা আকাশের দিকে। পারুলীর শেষ কথা আর কথার স্বরের মায়া তাকে এক নিমেষে হতবুদ্ধি করে তুলল। তার স্বচ্ছন্দ শরীরটা কাঠের মত কঠিন আড়ষ্ট হয়ে উঠল মুহূর্তে। পারুলীর মাংসল মিষ্টি শরীরের ছোয়াটুকু তার বুকের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের তোলপাড় তুলল। এতক্ষণ ধরে তার পেটের মধ্যে যে সত্যিকারের কামড়ানিটা ছিল সেটা উধাও হয়ে গেল নিমেষে।

গণেশ আড়ষ্ট গলায় উচ্চারণ করলে, না গ দিদি, আমার পেটটা কামড়াচ্ছিল ভাত খাবার পর থেকে। সেই জন্তে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমি একবার বাগান থেকে এসি।

প্রায় ছিটকে গণেশ উঠোনে নেমে যায়।

পারুলীর গলায় কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই। সে বলে, একটু পা টিপে-টিপে যেও ভাই। ভারী শাওনা হয়েছে উঠোনটায়।

গণেশ তার পরের দিন সকালেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিলে।

দেখতে দেখতে বর্ষাকালটাও যাই যাই করে চলে গেল। ভাদ্র মাসের আকাশে আশ্বিনের নীল রঙের ছোপ লেগে গেছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের কুণ্ডলী-গুলো পৌরাণিক যুগের বিরাটাকৃতি রথের মত ত্বরঙ্গ গতিতে ছুটে চলেছে কোন অলক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে।

গজেনের বাগানে পুঁই শাকের সবুজ ডাঁটা শুকিয়ে এল। শুকনো শক্ত ডাঁটায় মেচড়ি ধরে গেল। পুঁই-এর জায়গায় পালং-এর বীজ বুনলে। পালং-এর সঙ্গে সঙ্গে শীতের অন্টাণ্ড কয়েকটি ফসলও।

বাগানকে সে আবার নতুন করে সাজালে বটে কিন্তু হিসেব করে দেখলে এদিক-ওদিক করে তার বাকি বকেয়াও জমেছে বিস্তর। দু-বেলা দু-সক্কো পথ চলতে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে এমন চেনা-জানা লোকের সংখ্যাই বেশি। দু-পয়সা বাকির জন্তে দিনে দশবার করে তাগাদা দেবার মত ঝালু ব্যবসায়ী এখনও সে হয়ে উঠতে পারেনি। তার চক্ষুলজ্জায় বাধে।

পারুলীদের একটা গাই প্রসব হবার পর দুধ দিচ্ছে। বামুনপাড়ার দু-তিনটে বাড়িতে সে সকাল-সক্কো উঠনো দুধ দিতে যায় গজেনের বাড়ির বাগানের পাশ দিয়ে। গজেন বাগানে থাকলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে। আবার কোন কোন দিন বাড়িতে এসেও উর্বশীর লুপ্ত আধঘণ্টা বসে থেকে গল্প করে যায়।

উর্বশী গর্ভবতী হয়েছে। তার জিভের স্বাদে অরুচি এসেছে। বাসি, পচা, টক, ঝাল, নোনতা এসব বিস্বাদ জিনিসের প্রতিই তার নজর বেশি। মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে পারুলীকে দু-চারটে পয়সা দেয় বাজার থেকে তেলেভাজা কিনে আনার জন্তে। লক্ষা চটকে বাসী-টক্কা পাস্তাভাতের সঙ্গে খেতে অমৃতের আনন্দ পায়ে সে।

পারুলীরও মনে পড়ে তার নিজের পেটে সন্তান-আসার দিনগুলোর স্মৃতি। সেই সব স্মৃতি মন্বন করেই সে উর্বশীর সঙ্গে গল্প করে যায় মাঝে মাঝে।

গজেন রোজই ভাবে পারুলীকে বাকি পয়সার তাগাদা দেবে। কিন্তু পারুলীর

মুখের দিকে তাকালে তার গলার রুক্ষ স্বরটা নরম হয়ে আসে। যে-ভাষায় মানুষের সুখদুঃখের ভালো-মন্দের খবর নেওয়া যায়, সে-ভাষায় পাণ্ডনাদারের ঝাঁঝালো ভাগাদা যথার্থ হয়ে ফুটতে পারে কি? তা সত্ত্বেও গজেন একদিন পথের মাঝে পারুলীকে ধরলে।

হ্যাঁগা, আজ দিয়ে যাব কাল দিয়ে যাব বলে বাকিতে আনাড়ুপাতি নিয়ে গেলে, বাকি পরসাগুলো কবে দিচ্ছ বলো দিকনি।

গজেন ভেবেছিল পারুলী বোধ হয় ঝাঁঝিয়ে উঠে তাকেই দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। সেজন্তে সে নিজের জিভেও শান দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পারুলীর মুখভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন এবং মুখে বিষণ্ণতার ছায়া ফুটে উঠতে দেখে গজেন অবাক হয়।

আর বলো কেন। দু-বাবুর বাড়ি দুধ নিচ্ছে পোয়াতী খালাস হবার পর। দেড়-মাস দু-মাসের ওপর দাম পড়ে আছে। ই-মাসে নয়, উ-মাসে দুবো, উ-মাসে নয়, সে-মাসে দুবো এই চলেছে। যে-ছেলের পেটে দুধ জোগানোর পরসাগ নেই, তেমন ছেলে বিয়োনো কেন বাবু। আমারই হয়েছে যত ঝামেলা। তুমি আর দু-পাঁচটা দিন অপিয়ে করো। এক বাবু তো বলেছেন আখিনের পুজোর আগে একসঙ্গে দু-মাসের দাম মিটি দিবে।

গজেনের মনটা নরম হয়ে যায় নিমেষে। সত্যিই পারুলীর ওপর তাদের সংসারের সব ঝামেলা। স্বপ্নরবাড়ির সংসার-সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাপের বাড়িতে এসে ধান ভানছে, চাল কুটছে, গতরে খাটছে দিনরাত। এত খেটে-খুটেও মনের সুখ আছে কিনা সন্দেহ। অমন টাটকা শরীরটা সমাদরের অভাবে অকালে নটে গাছের মত শুকিয়ে যাবে ক-দিন পরে। মেয়েমানুষের স্বামী গেল, শরীর গেল তো রইল কি?

গজেন বলে—আজকাল আর এসনি কেন আনাড়ুপাতি নিতে? তুমি কি আর বাকি দান দিবেনি? তবে অনেকদিনের বাকি কিনা, তাই কথাটা মনে করিয়ে দিলুম একবার।

পারুলী বলে তুমিও তো আর আমাদের বাড়ির ছায়া মাড়াওনি। কবে একবার রাগের মাথায় কি বলেছিলুম, সেটাই রাগ এখনো মনে পুষে রেখেছ বুঝি। পুরুষ-মানুষের অত রাগ ভালো নয় বাবু।

না গ না, যাউনি সেজন্তে নয়। যাওয়া হয়ে ওঠেনি পাঁচ-কাজের ঝামেলার। তুমি এস না একদিন। নতুন মূলো হয়েছে। নিয়ে যেও।

তোমার বৌ-এর আবার খুব পুরনো তেঁতুলের টক খাবার সখ হয়েছে। একদিন যাবখন তেঁতুল নিয়ে।

পারুলীর চৌচৌর হাসিটুকু নিয়ে গজেন বাড়ি ফেরে।

উর্বশীর ধুলো কাদা রঙের শরীরটার দিনকে দিন নাতা-ঝাটা দেওয়া উঠোনের মত ঝকঝকে মাজা-ঘষা রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। শরীরটাও কিছু কিছু পুষ্ট হচ্ছে দিনকে দিন। উর্বশী চার ছেলের মা হতে চলেছে। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হয় যেন এই প্রথম পোয়াতী। শরীরটার কম বয়সের গড়ন ঝাধন এখনও এত অটুট রয়ে গেছে।

সে তুলনায় পারুলীকে কত বড়িয়ে-যাওয়া মনে হয়। শরীরের সবই আছে। কানা-ভরা পুকুরের মতই। কিন্তু ওপরটা যেন পানার আবর্জনার মলিন। ঢেউ-এর অভাবেই যেন পানার স্তর ক্রমশঃ জমাট হয়ে উঠছে।

গজেনের মনে পারুলীর জন্তে খানিকটা ব্যথা-বোধ জেগে থাকে।

গজেন একদিন সন্ধ্যার পর পারুলীর বাড়িতে যায়। পারুলী যথেষ্ট খাতির করে। পারুলী কথাবার্তা বলে কম। তার মা-ই নানারকম কথোপকথন করে। মনসার সঙ্গেও দু-একটা ঠাট্টা রসিকতা হয়। কথাপ্রসঙ্গে ছোট-জুমাई গণেশের প্রশংসা করে পারুলীর মা। গজেনও সমর্থন করে সেটা।

কোনো এক ঝাঁকে পারুলী স্থান ত্যাগ করে উঠে গেলে তার মা চুপি চুপি গজেনকে প্রশ্ন করে হ্যাঁ গজেন, তোর সঙ্গে কি মানিকের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

না। বনমালীর দোকানে চুল ছাঁটতে আসে খবর পাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

পারুলী ফিরে এলেই মানিকের কথা চাপা পড়ে। গজেন বোঝে মায়ের প্রাণ স্বামী-সুখ-বকিতা মেয়ের দুঃখে মনে-প্রাণে শাস্তিহারা। গজেন আরো অবাক হয়ে ভাবে পারুলী কী কঠিন প্রাণের মেয়ে। তার দেহের জৌলুহের ওপরেই যে শুধু মলিন আন্তরিক জমেছে তাই নয়, তার মনের চেহারাও অমান ঘন আন্তরিকতা ঢাকা। সেখানে গভীর অন্তরে যে হাসিকান্না ব্যথা-বেদনা তাপ-সস্তাপ, তা কারুরই দৃষ্টি-গোচর হবার উপায় নেই।

আশ্বিনের পূজোর পর গণেশ এসে মনসাকে খসুরবাড়িতে নিয়ে গেল।

পারুলী গজেনের কাছ থেকে আনাজ-তরকারী কিনে একটা বড় মাপের পুঁটলী বানিয়ে দিলে।

শীতের ফসল বেচে গজেনের লাভের পরিমাণটা মন্দ হয়নি। উর্বশীকে সে বেশ দাম দিয়েই একটা চওড়া লাল পাড় শাড়ী, ছেলেমেয়েদের জন্তে মোটা চাদর কিনে দিয়েছে। নিজের জন্তে একটা জুতো কিনেছে পাঁচ টাকা দিয়ে।

মাঠের পাকা ধানের গন্ধ বাতাসকে সুস্বাদু করে তুলেছে।

সকাল-দুপুরের সোনালী রোদ মাঠের শুকনো খড়ের গলা জড়িয়ে দ্রুত শিশুর মত খেলা করে। ধান এবছর ভালো ফলেনি জৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বৃষ্টির অভাবে। খড়গুলোই বেড়েছে ঢাঙা হয়ে।

গজেন ঠিক করে রাখে নতুন খড়ে এ-বছর ঘরের চাল ছাইবে। মাঘ-ফাল্গুনে গিরে একটা গাই গোরু কেনারও ইচ্ছে আছে তার। সেজন্তে আরও কিছু টাকা জমানো দরকার।

গজেনের ইচ্ছে আছে এবারে ধান মাড়া, খড়ের গাদা দেওয়ার কাজ চুকে গেলে রাসপুরের মেলায় দোকান দেবে। রাসপুরের মূলো-কালীর মেলা এক পক্ষ ধরে চলে। দশ-পনেরো মাইল দূর থেকেও লোকজন এখানে আসে। পৌষের অমাবস্তা থেকে শুরু হয় মেলা। নানা উৎসব অনুষ্ঠান, পুতুলনাচ, ম্যাজিক, নাগর দোলা আর কত কিছতে মেলার পনেরোটা দিন জম-জমাট হয়ে থাকে। উর্বশী ছাড়া গজেন আর কাউকেই মেলায় যাওয়ার কথা বলেনি। পারুলী বোধহয় উর্বশীর কাছ থেকেই শুনেছিল। একদিন মুখোমুখি দেখা হতেই পারুলী বললে—আমাকে নিয়ে যাবে গা তোমার সঙ্গে। বিয়ের পর আর কখনো যাইনি রাসপুরের মূলো-কালীর মেলায়।

শুনে গজেন অবাক হয়।

তুমি মেয়েমানুষ কোথাকে যাবে গা। কোথা যাবে, কি করে যাবে, কোথাই বা থাকবে। আর সে-কি এখানে, যে যাওয়া-আসাটা মুখের কথা।

পারুলী রাগিয়ে ওঠে—

ভগবান ছোটো পা দিয়েছেন, পায়ে হেঁটে যাবো, পায়ে হেঁটে ফিরবো। তোমাকে কি পান্থী করে বিয়ের কনে সাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছি। কি করে যাবো সে-ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে কেন? তুমি পাড়া-পড়শী যাচ্ছ বলেই বলা। নইলে আমি আর সঙ্গী জুটোতে পারব নি?

গজেনের ভাবনাগুলো অমূলক নয়। তবু পারুলীর সাহস দেখে সে রাজী হয়। পারুলী গজেনকে ঠাট্টা করে বলে, দেখতে শুনতেই পুরুষমানুষ তুমি, মনটা মেয়েমানুষের চেয়েও ভয়-কাহুরে।

যাবার দিন পারুলী তার মাকে বলে—জানো মা, কিরতে যদি দেরি হয় ভেঁথানি কিছু। কুস্তি মাসীর বাড়িতে থাকবো দু-একদিন। তুমি দু-বাবুর বাড়ি উঠনো-দুধটা সময়মতো দিয়ে এসো।

যাওয়ার দিন পারুলী একটা লাল পেড়ে কাচা শাড়ী পরে। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। মাথায় খোঁপা বাঁধে। শীতের পত্র-বিরল মলিন গাছটি ঠাণ্ডা যেন বনস্তের ফুলে নয়ন-লোভন রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে।

গজেনের মাথায় থাকে বড় ঝোড়া ভতি মূলো। আর পারুলীর হাতে থাকে একটা পুঁটলী। তাতে পরার কাপড় আর যাওয়ার পথে যাওয়ার জন্তে মুড়ি নারকেল। গজেনের বড় ছেলেটাও সঙ্গে আসার জন্তে বায়না ধরেছিল। তাকে সে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে ঠাণ্ডা করেছে। গজেনের বাগানে মূলো বাদে শিম, পালং, লাউ ফলেছে বেশ। সে ছেলেকে বুঝিয়ে স্নিগ্ধে রাজী করিয়েছে যাতে ঐ আনাজগুলো নিয়ে সে বাজারে গিয়ে বসে।

গজেনের ছেলে নিতাই প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। অনেক দিন থেকে তার একটা সাড়ে ছ-আনা দামের ফাউন্টেন পেনের স্বপ্ন। বাপ সেটা কিনে দেওয়ার শপথ করায় সে বাজারে যেতে রাজী হয়েছে।

গজেনের গ্রাম থেকে রাসপুরের মেলা প্রায় দু-মাইল পথ। সেটা সড়ক ধরে গেলে। কিন্তু আজকাল মাঠে ধান-কাটা হয়ে গেছে। মাঠের পথ ধরে গেলে দু-মাইলের মতো কম-কম হয় রাস্তার মাপ। গজেন ও পারুলী মাঠ ঝাঁপিয়েই চলে পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্তে।

দুজনে বেরিয়েছিল চান-খাওয়া করে দশটায়। মেলায় পৌঁছল দুপুরে। গজেন একা হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছত। সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকায় তার সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে হয়েছে। তাতে অস্ববিধে হয়নি কিছু। পরিশ্রমটা অনেক লঘু হয়েছে বরং।

বিরিট একটা ফাঁকা মাঠ জুড়ে মেলা বসে। যারা প্রতি বছর এখানে দোকান দেয় তারা বাশ-বাথারী আর ছই দিয়ে চালা বেঁধেছে। যারা গজেনের মত উঠকো দোকানী, তারা এমনিই বসে থাকে। মাথায় কোন আচ্ছাদন না টাঙিয়ে।

নাগরদোলা এখনো ঘুরতে শুরু করেনি। ঠিকঠাক হচ্ছে। পুতুল নাচের ঘর তৈরি। দুটো বড় সিন ঝুলছে। গজেন দূর থেকে তাকিয়েই বুঝলে একটা সিন হচ্ছে পঞ্চবটী বনে সীতা আঙুল বাড়িয়ে রামচন্দ্রকে সোনার হরিণ দেখাচ্ছেন। আর একটা সিনে কোঁরব-সভায় দুঃশাসন একদিকে দ্রৌপদীর বজ্র হরণ করছেন

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোপদীকে বস্ত্র জোগাচ্ছেন। ম্যাজিকের দলে একটা মেয়ে আছে শুনে বহুলোক ম্যাজিকের এলাকায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এদিক-ওদিকের অনেকগুলো তেলেভাজার দোকান থেকে পচা বাদাম তেলের গন্ধ বাতাসকে ঘুলিয়ে তুলেছে। নানারঙের বেলুন উড়ছে। একজন বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে সিনেমার নানা রকম গানের সুর বাজিয়ে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওপাশ-ওপাশ। বাঁশি বিক্রির চেয়ে বাঁশি শুনিয়ে লোকের মন হরণ করতেই যেন তার আনন্দ বেশি। ছিট কাপড়ের দোকান বসেছে অসংখ্য। তারাই মেলার অধিক রূপ খোলতাই করে তুলেছে। একটা ছাড়া গোক এসে গজেনের ম্লোর ঝোড়াটা শুকে গেল। ঝোড়াটা আগাগোড়া দড়ি জালে মোড়া ছিল বলেই আগে অধিক ভোজন করে বিমুখ হতে হল তাকে।

পারুলীকে ঝোড়ার কাছে বসিয়ে রেখে গজেন ইতিমধ্যে দু-এক চক্র ঘুরে আসে। দু-একজন চেনা লোককে খুঁজে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলে ফিরে এলে পারুলী বলে—এবার চাটি খেয়ে নাও। আমার পুঁটলীতে মুড়ি বাধা আছে।

তোমার খিদে পেয়েছে নাকি ?

আমার পায়নি। তোমার পেয়েছে বলেই বলতেছি।

আমার পায়নি। তুমি খাবে তো খাও। দাঁড়াও কিছু মিষ্টি কিনে আনি।

মিষ্টি কি হবে মিছেমিছি। আমার কাছে নারকেল আছে।

তা থাক। গরম জিলেপী ভাজতেছে। কিনে আনি। আর কিছু খাবে নাকি ?

পারুলী গজেনের আত্মীয়-কুটুম্ব কেউ নয়। পাড়া-পড়শী সম্পর্ক। তাকে এত খাতির না করলেও চলে। তবু যেহেতু গজেনের সঙ্গে সে মেলায় এসেছে তার সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের দায় যেন আপনা থেকেই গজেনের কাঁধে চেপেছে। গ্রহণ করুক বা না করুক মেয়েদের জন্তে এমনি অবাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করার মধ্যে পুরুষরা চিরকাল নিজেদেরই গুরুত্ব বা গৌরব অর্জন করে এসেছে। অধিকারবোধটা পুরুষশ্রেণীর একচেটে। সেটা শাসন করার ক্ষেত্রে, শোষণ করার ক্ষেত্রেও যতটা সত্য, স্নেহ-ভালবাসা দয়া-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রেও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

বিকেলের রোদ শেষ হতে-না হতেই পুতুল নাচের ছই ঘেঁরা ঘরে বাজনা বেজে উঠল। ঢোল, সানাই আর ধ্যানধ্যানে কাঁসি। নাগর-দোলা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে

থাকল আকাশে। ম্যাজিকের ঘরে আলো জ্বলল, বিলিতি বাজনার বাজখাই আওয়াজে মাঠের ফাটা মাটি উঠল কেঁপে কেঁপে। সার্কাসের গেটের সামনে বাঁশের উঁচু মধ্যে শুরু হল কিস্তৃতকিমাকার ক্লাউনের নাচ। ছাউনি বাঁধা দোকানগুলোর হাজারক বাতি সূর্যাস্তের অন্ধকারকে ভাগিয়ে দিলে। গজেনের এতক্ষণে খেয়াল হল সে আলোর কোন বন্দোবস্ত করেনি। কিন্তু ভেবে দেখলে আলোর বিশেষ প্রয়োজন নেই তার। চারপাশের আলোর সমারোহ সমস্ত মাঠটা জুড়েই প্রতিকলিত হয়েছে। তাছাড়া রাত্রে আনাড়-পাতি বেচাকেনা প্রায় হয় না। যা হবার হয় দিনমানে। পারুলী তার কাপড়ের পুঁটলিটা হাতে নিয়ে বললে—
আমি তাহলে যাই গা।

পারুলীর এক নিকট সম্পর্কের মাসীর বাড়ি যে রাসপুরের মেলার কাছাকাছিই সেটা পারুলী আগে বলেনি গজেনকে। বলেছিল আসার পথে।

গজেন বলে—সেই মাসীর বাড়ি যাচ্ছ তো ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা যাও।

পারুলী খানিকটা এগিয়ে গেলে গজেন তাকে ডাকে। একটু ইতস্ততঃ করে বলে—একটা কাজ করতে পার যদি তো ভালো হয়।

কি বলো না।

গজেন তার কোমরে-জড়ানো টাকার গেঁজেলটা বার করে বলে—তুমি তো মাসীর বাড়ি যাচ্ছ। তাইলে এইটা তুমি নিয়ে যাও। নিজের কাছে কাছে রাখবে। এর মধ্যে সাড়ে পনেরোটা টাকা আছে। গুনে দেখে নেবে ?

না থাক।

কালকে কখন আসবে বলো দিকনি।

কাল দুপুর গড়াতে আসবো। টাকা নিয়ে আসতে হবে ?

না কাল আনতে হবেনি। কাল এলে বলে দেবো কবে চাই। এই মালগুলো বেচা শেষ হলে তবে টাকাটা লাগবে। কাছেই আমদানী-রপ্তানীর বড় বাজার আছে নদীর ধারে। সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল কিনবো।

পারুলীর মস্তুর গতিতে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গজেন অনেকবার ভাবলে আত্মীয়-কুটুম্ব নয় এমন একজন মেয়েমানুষের কাছে কি এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত হল তার। মেয়েমানুষের স্বভাব তো—কার কাছে রাখবে, কার কাছে কি বলবে, কে বলতে কে দুপাঁচ টাকা সরিয়ে নিলে তখন কীই বা করবে

সে। কাল পারুলীকে টাকার্টা সঙ্গে আনতে বললেই হত।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার মনটা টাকার চিন্তায় উশকুশ করলো।

রাত্রে খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থাটা মন্দ হল না। গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে খড় বিক্রি হতে এসেছিল মেলায়। এক আঁটি দু-আঁটি সেখান থেকেই চেয়ে-মেগে চমৎকার খড়ের বিছানা তৈরি হয়ে গেল। গজেন আর তার চেনা-জানা আনাজ ব্যাপারী সকলে এক সঙ্গেই পাশাপাশি শোয়ার আয়োজন করলে। দু-একজনের কাছে ছই ছিল। ঠাণ্ডার ভয়ে সেটা টাঙিয়ে একটা লম্বা তাঁবুর মত তৈরি হয়ে গেল। খাওয়াও হল সবাই মিলে একসঙ্গে।

পরের দিন দুপুরের ভেতর গজেনের মাল বিক্রি হয়ে গেল অধিক। অন্তদের চেয়ে দু-পয়সা সস্তা দরে মাল ছাড়তেই খন্দের বেশি পেল সে। দুপুর গড়াতেই পারুলী এসে হাজির। সে একা নয়। সঙ্গে আরও দু-চারজন মেয়েমানুষ। হয়তো মাসীর বাড়ির লোক কিংবা মাসীর গ্রামের পাড়া-পড়শী।

পারুলী এসেই বললে—সাঁতের পো, আমরা আজকে পুতুল-নাচ দেখবো। কি পালা হবে বলো দিকিন আজ।

কি জানি, জানিনি তো ঠিক।

এখন চলি। আমরা অনেক কেনা-কাটা করবো ঘুরে ঘুরে। ই-মেলায় নাকি লোহা-লকড়ের জিনিস খুব সস্তা। তুমি এইখানে থাকবে তো?

ই্যা, থাকবো।

তাহলে যাবার পথে দেখা করে যাবখন। টাকার দরকার থাকলে তখন বোলো।

গজেন টাকার কথাটা তখনি বলতে চাইলে, কিন্তু কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল।

তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে পারুলী ব্যাপারটা বুঝে নিজেই বললে—তোমার টাকার জন্তে ভেবোনি। সে আমি মাসীর কাছে তালা-চাবি এঁটে রেখেছি।

পারুলীকে আজ বেশ প্রাণবন্ত মনে হল গজেনের। একদিনে তার বয়সটা অনেকখানি কমে গিয়ে গাছের বদলে পল্লবিনী লতা করে তুলেছে তাকে। বিনা-পয়সার পুতুল-নাচ দেখার আনন্দেরই কত খুশি-খুশি মেজাজ। অথচ গজেন যদি ইচ্ছে করে তাহলে তিন আনা দামের টিকিট কাটিয়ে তাকে কি একদিন ম্যাজিক দেখিয়ে দিতে পারে না?

খুব পারে। ই্যা, ব্যবসায় ভালো লাভ হলে নিশ্চয় একদিন ম্যাজিক সে দেখিয়ে দেবে পারুলীকে। পারুলীও খুশি হবে খুব। আহ! বেচারার স্বামী থেকেও নেই। সোহাগ করার লোকের অভাবে মনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই

অথরের চারার মত জন্মেই শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, এর দ্বানী সঙ্গে থাকলে কি আর গজেনকে এর জন্তে এত ভাবতে হত।

দু-তিন দিনে গজেনের লাভ হল মন্দ নয়। পারুলীর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে সে পাইকারি দরে কাছের বাজার থেকে আরও অনেক রকমের আনাজ-তরকারী কিনে বড় রকমের দোকান করে তুলেছে। গজেনের মনটা খুব প্রফুল্ল।

পারুলী বিকেলে আসতেই গজেন বললে—আজ যেন চলে যেওনি তাড়াতাড়ি।

কেন বলো তো?

আমি ম্যাজিক দেখবো। তোমাকেও দেখাবো ভাবতেছি।

পারুলী সাদা দাঁতে রঙিন হাসে। গজেনের মনটা আরো রঙিন হয়।

কেন, তুমি আবার পরসা খরচা করবে কেন মিছেমিছি।

তা হোক না। দুজনে একসাথে এলুম। আমি একা একা দেখবো ভাবতে কেমন লাগে নি?

আমার বাবু ভয় করে উ ম্যাজিক দেখতে।

কেন বলো দেখি?

কি সব মেয়ে-মানুষকে কেটে দেখায় বলে। উ-সব কাটাকাটি দেখতে পারবনি আমি!

গজেন তাকে বোঝায় ম্যাজিকের কাটা সত্যিকারের কাটা নয়। কোশলে সত্যিকারের মত দেখায়। ওতে ভয়-পাওয়ার কিছু নেই।

ম্যাজিকে মেয়ে-পুরুষের আলাদা-আলাদা জায়গা। মেয়েদের জায়গার বসে পারুলী দেখে—ম্যাজিকের শেব খেলা ঐ কাটাকাটির খেলা। পারুলীর ঐ সময়ে বুকের মধ্যেটা টিপটিপ করে ওঠে। পুতুল-নাচে অভিমুখ্য বধের দৃশ্যের চেয়ে এই করাত চালিয়ে মেয়েমানুষ কাটার দৃশ্যটা তাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয়। বাইরে বেরিয়ে গজেনের সঙ্গে দেখা হবার পর গজেন লক্ষ্য করে পারুলীর চোখ দুটো ভিজে ছপছপ করছে।

পারুলী বলে—ম্যাজিক তো দেখা হল—এখন একা একা বাড়ি ফিরি কি করে?

চেনা-জানা সঙ্গী কেউ নেই?

এই ভিড়ে কী করে কাকে খুঁজি বলো তো?

এখনও রাত বেশি হয়নি। চলো আমিই না-হয় পৌছে দিয়ে আসি। তোমার মাসীর বাড়িটা চেনা হবে। তাই চলো।

ইদিকে এস।

উদিকে কেন আবার ! কি আছে উদিকে ?

এস না ।

গজেন সটান পারুলীকে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢোকে । গজেনের এত খাতির-অভ্যর্থনা পারুলীর ভালো লাগে না একেবারে । তবু গজেন যদি কিছুতেই আপত্তি না শোনে তাহলে এই লোকজনের ভিড়ের কি চিংকার করবে যে ?

আলো দিয়ে সাজানো দোকান । কাঁচের আলমারিতে থরে থরে নানা ধরনের খাবার সাজানো । দু-পাশে সারি সারি বেঞ্চ । মাঝখানে টেবিল । অনেক ভদ্র গোছের লোকও দোকানে বসে আছে । এই রকম দোকানে বেঞ্চে বসে থাওয়া গজেনের বরাতে কখনো ঘটেনি । শুধু পারুলীকে থাওয়াবার জন্তেই নয় নিজের খেতে পেরেও কম আনন্দ নয় তার ।

বেশি দামের জিনিস কেনার ক্ষমতা নেই । এক আনা দামের সিঙ্গাড়া আর এক আনা দামের গজা কেনে অনেকগুলো ! খুচরোর চেয়ে ওজন দরে নিলে সংখ্যায় বেশি হবে বলে এক পো গজা কিনে নেয় । নিজের চেয়ে পারুলীকেই দেয় বেশি করে । তার ভাবখানা এই রকম যেন আমি পুরুষমানুষ জীবনে এমন খাওয়ার সুযোগ কত পাব, তুমি তো পাবেনি । পারুলী সেগুলো গজেনের পাতে তুলে দেয় । গজেন আবার তুলে দেয় পারুলীর পাতে । ভদ্রলোক খদ্দেরের চোখ-গুলো ওদের এই তোলাতুলির চাবাড়ে ভোজন ক্রিয়া দেখে কোঁতুকে হাসে । ভদ্রলোকের জন্তেই পারুলী জোর গলায় কিছু বলতে পারে না । কিস কিস করে বলাটাকেই যত জোরে পারা যায় বলে । নতুন বোয়েরা স্বামীর সঙ্গে যে-ভাবে লজ্জা-সরম বাঁচিয়ে মনের দ্বিধা প্রকাশ করে, পারুলীর চড়া স্বভাবের এই নরম-কোমল রূপান্তর গজেনকে ভারি উৎফুল্ল করে । দোকানের বাইরে এসে পারুলী তার সমস্ত রাগ প্রকাশ করে । গজেন পরিতৃপ্তির হাসি হাসে কেবল । একটু আগের লজ্জাবতী পারুলীর চেয়ে এই বদরাগী পারুলীকেও যেন তার আরো বেশি ভালো লাগছে । সারাটা পথ পারুলী কথা বলে না গজেনের সঙ্গে ।

গজেন ভেবেছিল পারুলীকে তার মাসীর বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সটান সে চলে আসবে । তা কিন্তু হল না । গজেনকে বাড়ির লোক আটকাল । আপত্তি সত্ত্বেও তাকে জোর করে থাওয়ালে । থাওয়াবার সময় পারুলী বললে, সবাই বলছে, রাতটাও এখানে থেকে যাও না । গজেন রাজী হল না কিছুতে ।

দিন দুই পারুলীর আর দেখা নেই । গজেন ভাবলে সে বোধ হয় বাড়ি চলে গেছে কিন্তু তৃতীয় দিন আবার তাকে একদল মেয়ের সঙ্গে মেলায় আসতে দেখে গজেন

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি যাওনি। ক-দিন আসনি, আমি ভাবলুম বুঝি চলে গেছ।

না যাঠিনি। যাবার ইচ্ছে ছিল। আমার এক মাসভূতো ভায়ের বোঁ এল বাপের বাড়ি থেকে। সেটাই জোর করে যেতে দিলোনি। আজ আঁবার পুতুল-নাচ দেখতে টেনে নিয়ে এল।

গজেন মাথা চুলকে বলে—যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।

কিসের কথা?

রাগ না-করলেই বলি।

বলো না। রাগের কথা না-হলে রাগ করবো কেন?

কাল একজনের সঙ্গে দেখা হল।

কার সঙ্গে?

মানিক পধ্যানের সঙ্গে। আমার দোকানে এসে বসেছিল। বিড়ি খাওয়ালাম। চা খাওয়ালাম। অনেকক্ষণ কথা হল। লোকটার সে চেহারা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। বাড়িতে নাকি খুব অসুখ-বিসুখ। স্বস্তুর বাড়ির খোঁজ-খবর নিলে। ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে। আমি তো বললুম ভালো আছে। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলে আঁচে-আন্দাজে। আমি একদম উন্টে-পাণ্টে ঘা-মনে এল বলে দিলুম। বললুম যে তার শরীরও হাড়-সার মাস-সার। দিনরাত পাটছে। আগে মনসা ছিল। সে চলে গেছে স্বস্তুর বাড়ি। তারপর তোমার মায়ের কথা বলে দিলুম। যে তিনি বাতের রোগে শয্যাশায়ী। ভাগ্যিস তুমি কালকে আসনি।

কেন? কাল এলে কি হত। আমাকে ছেলেধরার মত ধরে নিয়ে যেত নাকি?

না, তা নয়। আমি যে আরেকটা কথা একদম চেপে গেছি। তুমি দু-দিন আসোনি আমি ভাবলুম বুঝি বাড়ি চলে গেছ। তাই তুমি যে এখানে মেলায় এসে মাসীর বাড়িতে আছ সে কথা একদম জানাইনি।

পারুলী গস্তীর মুখে সবটা শোনে। গজেনের কথা শেষ হলে এমন একটা মুখ-ভঙ্গি করে ঠোটের পাতা ওল্টায় যেন এসব সংবাদে তার ঠোটের পাতা ছাড়া আর কিছু ওল্টাবে না।

ওদিকে পুতুল নাচের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। আজ হবে সীতার বনবাস পালা।

পারুলী বলে, ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে। আমি চলি।

সীতার বনবাস দেখে পারুলীর চোখে অনেকক্ষণ কান্নার জল জেগে রইল। সকলের চেয়ে তার রাগ হল রামের ওপর। তুমি এমন একটা রাজা, কত তোমার জ্ঞান

বুঝি, মনে তোমার কত দয়া-মায়া, তুমি কিনা সীতার মত সতী-লক্ষ্মী নারীকে শেষ পর্যন্ত বনে পাঠালে। যে প্রজাগুলো সীতার নামে কলঙ্ক রটাল তাদের মুখে হুড়ো জালিয়ে মুখপোড়া হুমুমান বানিয়ে দিতে পারলে না। তাহলে বুঝতুম একটা মন্দের মত মন্দ বটে। কৈকেয়ীর চেয়েও রামের ওপর তার বিক্ষোভ বেশি। কুর্জী বৃড়ি, কৈকেয়ীদের তো ঐ রকমই কাজ। যত রাজ্যের কুটিল মন্ত্রণা মাথায় বুরছে। কারুর কপালে সুখ দেখলেই তাদের বুক ঈর্ষায় ফেটে গেল। নিজের শাস্ত্রীকে দেখেই তো সে-কথা বোঝা যায়। শাস্ত্রীর চক্রান্তেই তো সে আজ হ-বছর হল স্বামীহারা। তার স্বামীও ঠিক ঐ রামের মত মানুষ। বাড়ির পাঁচজন বলল, তোর বোটা। পাজী, মুখরা, শত্রু-শাস্ত্রীকে হুস্থা-হেনেস্কা করে, তোর ভাই-ভাইবোদের চোখে দেখতে পারে না। সে মানুষটা অমনি দুখলোনি। সত্যি মিথ্যের বিচার করলোনি, কোনটা কার চক্রান্ত ভাবলনি, মারল চুলের মুঠি ধরে চড় চাপড়। তারপর গলাধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে দিলে। তা রামচন্দ্রের মত মানুষ যদি সীতাকে বনবাসে পাঠাতে পারে, আমার স্বামী তো রামচন্দ্রের 'র'-এর যুগ্মি নয় সেই বা তার বো-কে ঘর থেকে তাড়াবেনি কেন? আবার একদিন দুদিন তিনদিন গেল, পারুলীর দেখা নেই। গজেন নিশ্চিন্ত হল পারুলী বাড়ি চলে গেছে ভেবে। গজেন আরো ভাবলে মানিককে সে যে ভাবে বানিয়ে বলেছে তাতে আজ না হোক, কাল না হোক একদিন সে শত্রুর বাড়িতে আসবেই।

দেখতে দেখতে মেলা শেষ হয়ে এল। গজেন যাবার দিন নিজের সংসারের জন্তে টুকটাকি কেনা-কাটা করলে। মাছ-কোটর ঝিট, চাল খোয়ার ধুচনি, কাঞ্চন নগরের ছুরি, প্রদীপ রাখার কাঠের দেয়ালো, বড় ছেলের জন্তে সাড়ে ছ-আনা দামের ফাউন্টেন পেন, উর্বশীর জন্তে একটা রঙীন কাপড়ের সায়ান-ব্লাউজ, নিজের জন্তে একটা কমদামের শাখের আংটি, আর আধসের গজা। এই সব ঝোড়ায় চাপিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলে।

মেলার বেচা-কেনায় বেশ লাভ হয়েছে তার। মনটা স্বচ্ছন্দ খুশিতে পালকের মত হাল্কা। উর্বশী এই রঙীন সায়ান ব্লাউজ পেয়ে কত খুশি হবে। পারুলী বাড়িতে ফিরে হয়তো একদিন উর্বশীর সঙ্গে দেখা করেছে। আমি যে তাকে নিজের পয়সায় ম্যাজিক দেখিয়েছি, দোকানে নিরে গিয়ে খাইয়েছি সে-গল্পও করেছে নিশ্চয় উর্বশীর কাছে। উর্বশী মুখে কিছু প্রকাশ না-করলেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে অন্য মেরের ওপর আমার এত আদর সোহাগ শুনে। কিন্তু যখন দেখবে

উর্বশীর জন্তেও কত দামের জিনিস কিনে এনেছি, পারুলীকে যা খাইয়েছি তার জন্তেও সে খাবার কিনে এনেছি আধসের—নিশ্চয় রাগ থাকলে তা জল হয়ে যাবে উর্বশীর।

কিন্তু পারুলী কি একা উর্বশীকেই বলেছে। নিশ্চয় তার মায়ের কাছেও বলেছে। আরও দু-একজনের কাছেও না বলে থাকতে পারেনি। যারা শুনেছে তারা মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়েছে আমার দু-পয়সা রোজগার করে অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ার কথা ভেবে। পারুলী নিশ্চয় মনে মনে আমার ওপর খুব ক্রতজ্ঞ হয়ে আছে। যাবার সময়েই হয়তো পুকুর পাড়ে দেখা হয়ে যাবে। খুব লজ্জা লজ্জা হাসবে। পারুলীর লজ্জা দেখা গেছে বটে সেদিন মিষ্টির দোকানে। কিস কিস করে বলা তার কথাগুলো যেন বসন্তের হাওয়ার মত স্পর্শ করছিল আমাকে। পারুলীর মাথায় সিঁদুর দেখে দোকানের ভদ্রলোকগুলো হয়তো ভেবেছিল স্বামী-স্ত্রী আমরা। স্বামী-স্ত্রী? ব্যাঃ, স্বামী-স্ত্রী কেন হতে যাব। না, ও-সব কু-ভাবনা আমি ভাবি না। তবে পারুলী মেয়েটাকে বেশ ভালো লাগে আমার। বেশ আপন আপন মনে হয়। জীবনে ঠিকমত স্বামীসহবাসের সুখ পেলোনি বলে দুঃখ হয়। তবে ণ্ডাথ, গ্রামে তো এত লোক আছে, পারুলী নিজের অহংকারে কারুর সঙ্গে কথা বলে কি? অথচ আমার সঙ্গে তো বেশ ভাব সাব।' কথায় কথায় খেঁচিয়ে ওঠে বটে, ওটা ওর স্বভাব। সেহাগের জনকেই মেয়েরা আলা কষ্ট দেয়।

চলতে চলতে গজেন নিজের গ্রামের বাজারে এসে পৌঁছয়। বনমালী পরামানিকের দোকানে ঝোড়া নামিয়ে বলে, কিরে দাড়িটা কামি দিবি নাকি?

দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিতে দিতে বনমালী বলে—এই আসা হচ্ছে বুঝি।

হঁ।

কি রকম হল? বেশ ট্যাঁক মোটা মনে হচ্ছে।

গজেন সাবান-মাখা মুখে লম্বা অংগনার দিকে তাকিয়ে হাসে।

মানিক পধ্যান তার খণ্ডুর বাড়িতে এসেছিল জানো?

কে? মানিক মানে পারুলীর.....

ইয়া গ, এই তো দু-দিন না ক-দিন আগে। এসে দেখে পারুলী নেই। সকালে এসে দুপুরে চলে গেল। সেইদিন বিকেলেই পারুলী এসে হাজির তার মাসীর বাড়ি থেকে। সে তোমার সঙ্গেই তো গেছিল না?

হঁ। তারপর.....

তারপরের সকালে শুনি. পারুলী তার ছেলেকে কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

যাক বাবা, এতদিন পরে মেয়েটার বরাতে আবার স্বামীর ঘর ছুটল।

আন্নার মধ্যে নিজের পরিচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে গজেন লক্ষ্য করলে তার মুখে কোথাও খুশির আভাষ নেই।

বাজার থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু হাঁটতে গিয়ে শরীরটাকে বড্ড ভারী আর ক্লান্ত ঠেকল। আর মনের মধ্যে পারুলীর চলে যাওয়ার ঘটনাটা কেবলই ফিরে ফিরে এসে তাকে কি-রকম বিমর্ষ করে তুললে। অন্য ভাবনা চিন্তা দিয়েও সেটাকে সে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলে না।

অথচ পারুলীর চলে যাওয়ার আমার খুশি হওয়া উচিত। মিছিমিছি করে মানিককে সেদিন ঐ-সব কথা না বললে সে আসতো কি? মানিকের কঠিন মনটাকে স্নেহে গলিয়ে দেওয়ার জন্তেই তো আমি ঐ কাণ্ডটা করেছিলাম। তাহলে আবার দুঃখ কেন? উর্বশীর কথাই ভাবো বরং। উর্বশী গজা খেতে ভালবাসে। গজা পেয়ে খুবই খুশি হবে সে। তার গজার ওপর আবার যখন সায়া ব্লাউজ পাবে তখন। উর্বশী আমার বো। তার পেটে আমার নতুন সন্তান। অথচ সেদিন গজার দোকানে ভদ্রলোকেরা নিশ্চয়ই ভুল করে ভেবেছিল পারুলী আর আমি স্বামী স্ত্রী। স্বামী স্ত্রী না হলে অমন ঘন হয়ে বসে থাকার তোলাতুলি করে কেউ। আবার সেই পারুলীর কথা? হতভাগা রে! আচ্ছা, নিত্যের জন্তে যে সাড়ে ছ-আনার পেনটা কিনেছিলুম সেটা পকেটে আছে তো। হ্যাঁ আছে। নিত্যের ওপর বাগান ছেড়ে দিয়ে গেছলুম। সে আবার কি করল দেখো। পালং-টালং গুলো বাজারে গিয়ে কি রকম বিক্রি করল কে জানে! পারুলী কি যাওয়ার দিন তার বাগান থেকে শাক-টাক নিয়ে গেল নাকি?

গজেন বাড়িতে পা দিয়েই চিৎকার করে উর্বশীকে কাছে ডাকে। উর্বশী রান্না চাপিয়েছে উম্মনে। সঙ্গে সঙ্গে উঠলে তরকারীটা পুড়ে যাবে বলে সে উঠতে পারে না। রান্নাঘর থেকেই চেষ্টা করে বলে—দাঁড়াও না গ একটু, যাচ্ছি। না, গজেনের আর সময় সয় না। এখুনিই উর্বশীকে তার মনের মত জিনিসগুলো দেখাতে না পারলে তার ঘেন্না স্তম্ভি নেই। সে আবার চেষ্টা করে।

কই, এখনো হলনি?

আরে জ্বালা! তরকারীটায় জল ঢেলে তবে না যাব। এই তো এলে। একটু জিরোবে তো আগে।

ছেলেগুলো গজেনের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল কিছু খাবারের লোভে। ছোট ছেলেটা গজেনের ঘাড়ের ওপর চেপে বসার চেষ্টায় পিঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে আছাড় খাচ্ছিল বারবার। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল মূলো পালং-এর গন্ধ। আর সেই সঙ্গে একটা নাকী কান্নার শব্দ। গজেনের মেয়েটা ভীষণ পেট-রোগী বলেই পেটের জ্বালাটা তার সর্বক্ষণের। যতক্ষণ উর্বশী রাঁধে সে রাঁধা তরকারীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে। কোন সময়েই তার পেটের খিদে আর নাকের কান্নার বিরাম নেই। ইতিমধ্যে সাহস পেয়ে মেজ ছেলেটা গজেনের ঝোড়া হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। গজেনের কি হয় কে জানে—ছেলেটার পিঠে চড়াস করে একটা চড় সাঁটিয়ে সে দাবড়ি দিয়ে ওঠে। ঝোড়াটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের মুখে সেটাকে আছড়ে রেখে উর্বশীর দিকে তাকিয়ে খেঁচিয়ে ওঠে গজেন। তখন থেকে ডাকতেছি, এখনো উঠবার সময় হলনি?

উর্বশী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় গজেনের মুখে। মানুষটার হঠাৎ এমন মারমুখো দশার কারণ কি বুঝে উঠতে পারে না।

উ মেয়েটা ওখানে ঘ্যানঘ্যান করতেছে কেন?

কেন আবার? ওর যা চিরকালে ব্যামো।

এ্যাঐ, উঠে আয় দিখি ওখান থেকে। মেয়ে ফেলব একেবারে, উঠে আয় বলছি। মেয়েটা তবু কান্না খামায় না। গজেন রান্নাঘরে ঢুকে মেয়েটার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ওপর তুলে ফেলে।

দিনরাত তোমার পেটের জ্বালা। ভারী তোর খিদে, না। নে খা সব। খা দিকিন ইগুলো।

রান্নাঘরের আনাফের চুপড়ি থেকে এক গোছা পালং শাক সে মেয়েটার মুখে গুঁজে দেয়। কাঁচা পালং-এর আবার স্বাদ কি? মেয়েটা আচমকা দারুণ ভয়ে মরার মত চুপ করে যায়। গজেন দপ্‌দপ্‌ করে পা ফেলে ঘর থেকে বাগানের দিকে চলে আসে।

সবুজ পাতা আর গোলাপী ডাঁটার পালং শাকগুলো হুলছে। শুকনো কটা পুঁই-এর গাছে বেগুনী রঙের অজস্র মেচড়ি ফুটে আছে। শিমের ফুলগুলো কী চমৎকার দেখতে। কিন্তু এসব খাণ্ডবস্ত্র ছাড়াও জীবনে আরো যেন কিছুর প্রয়োজন। যার অভাবে গজেনের মনে কোথাও কোন সুখের স্বাদ নেই। বাগানে ঢোকান সময় সে বীশের আগলটার গায়ে ধড়াস করে একটা লাথি মারে।

সমসাময়িক সাহিত্য

নীল রাত্রি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। দাম তিন টাকা আট আনা। ‘নীল রাত্রি’ উপন্যাস নয়, বড়ো গল্প। এই গল্পের মূল ঘটনা একটি পুরুষ ও একটি মেয়ের গোপন অবৈধ প্রেম। পুরুষটির স্ত্রী মারা গিয়েছে, মেয়েটি স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে। দোতলা একটি বাড়ির দোতলার করিডোরের দু-পাশের দুই ফ্ল্যাটে তারা থাকে। এই করিডোরের একেবারে শেষদিকে রয়েছে একটি বাথরুম যেটা দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদেরই যাতায়াতের জায়গা। দিনের বেলা সেখানে কে কখন যাতায়াত করে টের পাওয়া যায় না কিন্তু মাঝরাতে যাতায়াত করে মাত্র দুজন। তখন এই বাথরুমটাই হয়ে ওঠে এক বিচিত্র প্রেমের লীলাভূমি।

এই দুটি মূল চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে আরো যে-সব চরিত্র বৃত্তান্তিত হয়েছে তারা হচ্ছে পুরুষটির (নীরদ) একমাত্র ছেলে বাবু যার নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়াতে নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই, বাড়ির ঠিকে বি হরির মা যে নীরদের জন্মে দু-বেলা রান্না করে ও বাবুকে মায়ের মতো স্নেহে দেখাশোনা করে, মেয়েটির (মালা) দাদা প্রফুল্ল যে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি বাবার পরে বোয়ের গয়না দিয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে, মালার বৌদি রমলা যে সংসারের খরচ যোগাবার জন্মে চাকরি করে, আর রমলার দেড় বছরের শিশু যার পিছি পিছি চিংকারে মালাকে অনবরত জ্বালাতন হতে হয়। এ ছাড়াও আছে একতলার ডিসপেনসারির ডাক্তার (নীরদের এক গ্রাসের ইয়ার) সুধাংশু চক্রবর্তী, ডিসপেনসারির ছোকরা চাকর লালু, মালার বখাটে বরে যাওয়া স্বামী মানিক, নীরদের আপিসের স্টেনোগ্রাফার রাণু ভৌমিক (যে আপিসের চ্যাটার্জি-সাহেবের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে বড়ো রকমের ঘা খেয়েছে), একটি বিলাতী মদের দোকান, একটি দিশী মদের দোকান, খারাপ পাড়ার ‘মূল গাল’ ডলি ও তার দালাল। গল্পে নীরদের মৃত্যু স্ত্রী প্রতিমার কটোরও কিছুটা ভূমিকা আছে।

গল্পে নীরদের চরিত্রে নানা টানাপোড়েন দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিমার স্মৃতি তার মনের মণিকোঠায় প্রদীপের মতো জ্বলে। মা-হারা পশু রুগ্ন ছেলে বাবু তার কাছে একমাত্র ভরসা ও ভবিষ্যৎ এবং বাবুর জন্মে তার যমতার শেষ নেই। ওদিকে মালার আকর্ষণ তার কাছে এত প্রবল যে চেষ্টা করেও সে এই আকর্ষণের গতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অথচ তার

জীবনের এই প্রেমের ব্যাপারটিকে সে পুরোপুরি গোপন রাখতে চায়, মালাকে নিয়ে নতুন সংসার পাততে হলে তার জীবনে যে বড়ো রকমের 'ওলোট-পালোট' আনা দরকার তাতে তার অনিচ্ছা। সমস্ত দিক বজায় রেখে চলার চেষ্টায় তার জীবন অস্বাভাবিক। তীক্ষ্ণ একটা অপরাধ-বোধ তাকে পীড়িত করে।

মালার মূনে কিন্তু কোনো অপরাধ-বোধ নেই। সে বিবাহিতা বটে কিন্তু দ্বিচারিণী নয়। নীরদের কাছে সে এসেছে পূজার ফুলের মত অকলঙ্ক কৌমার্য নিয়ে। এই কারণেই ক্যালেন্ডারের একটি বিশেষ তারিখ সম্পর্কে তার উদ্বেগ আছে কিন্তু গানি নেই। এই উদ্বেগ তার জীবনকে অস্থির করে তোলে। সে চায়, নীরদ তাকে নিয়ে ঘর বাঁধুক। নীরদের ছেলে বাবুকে সেও ছেলের মতোই ভালোবাসতে পারবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন কিছুই ঘটে না। নীরদ তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায়। মালাকে তার কলঙ্কিত শরীর নিয়ে ফিরে যেতে হয় সেই স্বামীর কাছেই। আর নীরদের বাড়ির ঠিকে ঝি হরির মা বিব-মাখানো ঘাসে জল খেতে গিয়ে রান্নাঘরে মরে পড়ে থাকে। এই বিবের একটা ইতিহাস আছে। নীরদ যে কতবড়ো কাপুরুষ তা বুঝতে পেরে চরম একটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে মালা এই বিষ জোগাড় করেছিল। মালার হাত থেকে বিষের পুরিরাটা নীরদ কেড়ে নেয় এবং নিজের কাছে নিজের জবাবদিহি করার এক অন্ধ মুহূর্তে ঠিক করে যে বাবুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। এই বিষই শেষ পর্যন্ত খেতে হয় হরির মাকে।

গল্পটি পড়ার পরে মনে হয়, ঐ বিষটুকুই হয়তো লেখকের বক্তব্য। নীরদ হচ্ছে মধ্যবিত্ত জীবনের একটি মামুলী টাইপ। সে ভালো চাকরি করে, মদের দোকানে যায়, বেশার বাড়িতে ঢোকে, আবার স্বেচ্ছা পেলে কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে অবৈধ গোপন প্রেমে গা ভাসায়। পুরোপুরি প্রেমও নয়, একটি প্রমত্ত যৌবনকে উপভোগ করার লালসা। এও এক ধরনের বিষ বৈকি। এই বিষের ফল ভোগ করতে হয় মালার মতো সরল বিশ্বাসী মেয়েকে, হরির মার মতো মাতৃরূপিনী নারীকে। শেষ পর্যন্ত নীরদ নিজেও এই বিষের বলি হত যদি না অন্য একদিকে তার বড়ো রকমের একটা জোর থাকত। নিজের ছেলেকে যে সে শেষ পর্যন্ত বিষ খাইয়ে খুন করতে পারেনি তার কারণ সে বাবা। এখানেই তার জোর।

গল্পের একেবারে শেষদিকে দেখা যায়, মালাকে নিয়ে ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে বসে মালার স্বামী মানিক মালাকে বলছে, 'সত্যি আজ এক কথায় তুমি আমার

সঙ্গে চলে আসবে আমি ভাবতে পারি নি।' মালা ক্ষীণ গলায় হেসে জবাব দিচ্ছে, 'সত্যি করে. চেয়েছ বলেই এলাম। চাওয়া সত্যিকারের হলে পাওয়া সহজ হয় তুমি কি জানো না।' আর ওদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে চলা তুফান এক্সপ্রেসের এক কামরায় বসে বাবুর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে নীরদ বলছে, 'তোকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, কেমন রে থোকা?'

অর্থাৎ, মনে হতে পারে, নীরদ এবং মালা জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ ও সিধে রাস্তাটায় পা বাড়চ্ছে। এবং মনে হতে পারে, অতঃপর দুজনের জীবন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শুধু হরির মার মতো যারা বাইরের পৃথিবীটাকে মনের চিন্তা-ভাবনার উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে চায় তারাই শেষ পর্যন্ত মুখ খুবড়ে মরে।

অর্থাৎ, জীবনকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে চেও না। জীবনকে তুমি শুধু গ্রহণ করো, যে বিশেষ রূপেই সে আসুক না কেন। তাকিয়ে দেখ প্রকুল ও রমলার দিকে। সুপুরুষ প্রকুল পেঙ্গুর মতো রমলাকে নিরেও কত সুখী। তাকিয়ে দেখ নীরদের অতীত জীবনের দিকে। বিবাহিত স্ত্রী প্রতিমাকে নিয়ে কী আশ্চর্য সুন্দর জীবন ছিল তার। কত সুখী ছিল সে। তাকিয়ে দেখ রাণু ভৌমিকের দিকে। চ্যাটার্জি-সাহেব বিবাহিত জেনেও তার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে তাকে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে। আর তাকিয়ে দেখ নীরদ ও মালার দিকে। নিজেদের বানানো একটা ঘটনাকে জীবনের মস্ত একটা পাওনা হিসেবে ধরে নিয়ে কী বিপর্যয়ই না তারা ডেকে আনতে চলেছিল।

কিন্তু কেন এমনটি হচ্ছে, কেন এমনটি হতে হবে, তার কোনো বিশ্লেষণ এ গল্পে নেই। নেই বলেই এটি উপন্যাস নয়, নিতান্তই গল্প। কাজেই হরির মার জলের গ্লাস বিষ-মাখানো থাকাটা যতোই আকস্মিক ও কষ্টকল্পিত মনে হোক না কেন—মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। একই কারণে এ আলোচনা তুলেও লাভ নেই যে চরিত্রগুলো কেন এত অপরিচ্ছন্ন, অস্বচ্ছ ও রক্তমাংসহীন। লেখক একটি গল্প শুনিয়েছেন মাত্র, কেন শুনিয়েছেন তা বোঝা না গেলেও ক্ষতি নেই, কী শুনিয়েছেন সেটাই বড়ো কথা। কতোখানি শোনাতে পেরেছেন, বা আদৌ শোনাতে পেরেছেন কিনা, সে-বিচারও এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

অরুণান্ত রায়

কবি সুকান্ত—অশোক ভট্টাচার্য । প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী,
কলিকাতা । দাম আড়াই টাকা ।

“তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বজ্রের ভাঙুক ঘর ;
তা’ যদি না হয়, বুঝবো তুমি তো মানুষ নও
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বণ্ড ।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাই ॥”

(বোধন)

বা

“সহসা জানালায় দেখি ছুভিক্ষের শ্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্রে পর্বতে ;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান ।”

(মৃত্যুজয়ী গান)

বা

“ভারতবর্ষের পরে গলিত সূর্য সবে আজ—
দিগ্নিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর রক্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ দেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ ।”

(বিরূতি)

কবিতার বই ‘ছাড়পত্র’-এর বেশ কিছু পাতা এলোমেলোভাবে উলটে বিভিন্ন কবি-
তার কয়েক পঙক্তি করে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল । উপরের কবিতাগুলির অংশগুলি
পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময়ে রচিত কবির জোরালো বক্তব্য একটিমাত্র

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিমা খুবই সমাজসচেতন। সামাজিক ভাঙা-গড়ার মূল কারণ জানা যার আছে, সভ্যতার ইতিহাসের দ্বারা সম্পর্কে যার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে তার পক্ষে এই বক্তব্য অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এর অর্থ এ নয় যে, অল্প কাব্যবক্তব্যে আস্থাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই জাতের কবিতার স্বাদ নেওয়া একটু আয়াস-সাধ্য হবে। তবে যারা সাধারণতঃ ঘাড় বেঁকিয়ে থাকতে চান তাঁদের কথা আপাতত ধরছি না।

বর্তমানে অশোক ভট্টাচার্য রচিত ‘কবি সুকান্ত’ বইটা পাওয়ার আমাদের কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার সুবিধা হল। বিশেষ করে সুকান্ত রচিত কবিতা সমূহের পিছনকার ইতিহাসের অনেকখানি তিনি আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি-জীবনের স্মরণ থেকে শুরু করে তাঁর কবি-স্বীকৃতি পর্যন্ত —অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি কাহিনী। সাধারণতঃ লেখক কোনো বিতর্কমূলক সমস্যায় বা কোনো ব্যাখ্যামূলক কাব্য-বক্তব্যে তাঁর মত প্রকাশের চেষ্টা করেননি। তিনি আগাগোড়া খুব সরল ও স্পষ্টভাবে কবি-জীবনের আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা মূলতঃ তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। সুকান্ত কমিউনিস্ট কবি। তাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব কবির ওপরে পড়া স্বাভাবিক। কলে তাঁকে অধিকাংশই রাজনৈতিক ভাবধারার অনুপ্রাণিত কবিতাই লিখতে হয়েছিল।

সুকান্ত রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন ঠিক। তার অনুসরণকারী লেখকদের মত কবিতা-বিবর্জিত কাব্য রচনা করেননি। এর কারণ হতে পারে তাঁর নিষ্ঠার প্রগাঢ়তার ও কবিত্বশক্তির প্রতিভার অধিকাংশ রচনাই কাব্যগুণে বিশেষিত হতে পেরেছে। প্রতিটি রচনার মধ্যে এমন একটি সরল ও বিশিষ্ট সুর পাওয়া গিয়েছিল যা তদানীন্তন কোনো কবিরই কবিতায় এতখানি বিস্ফোরক ও জ্বলন্ত প্রেরণার স্পন্দনে স্পন্দিত হতে পারেনি। এমন কি পরবর্তীকালেও না। যদিও কাব্যিক বহিরঙ্গের উৎকর্ষে তিনি তিরিশের কবিদের অনেক পিছনেই ছিলেন।

আবার বিপদের কথাও আছে। সুকান্তের ক্ষেত্রেও ছিল। জীবনকে তিনি একমাত্র সংগ্রামীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। এ-হিসাবে নিকোলাই ভ্যাপসারভ স্মরণীয়। এই পৃথিবীতে অনাচার আছে, অত্যাচার আছে, যন্ত্রণা-জালা-শোক মৃত্যু সবই আছে। মানুষ এই পৃথিবীরই। কাজেই একজন সংকবি এ কথা উপেক্ষা করতে পারেন না। আবার এও ঠিক অপর দিকে আনন্দ সুখ প্রেরণা ভালোবাসাও

৩ আছে। যে কোনো কবিরও এটাও নিশ্চয়ই লেখার বিবয়বস্ত্ত হবে। সুকান্তের কবিতার রাজ্যে যাদেরকে বেশি হাজির করা হয়েছে তারা এতমাত্র শোষক শোষিতের দল। আর যারা আছে তাদের স্বপ্নালোকে চেনাই যায় না। .
খুবই দুঃখের কথা সুকান্তের কাব্য জীবন খুবই অল্পকালের। বিশেষ আগেই ফুরিয়ে যায়। স্বাভাবিক মৃত্যুতে নয়, অকালমৃত্যুতে। বিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো কবিকেই খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি তার কবিতা এরকম জগন্ত সত্যায় যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবতার পক্ষে নিয়োজিত করেছেন। হেলেননি, বেকেননি। ঋতুভাবে মাথা উঁচু করে নিজের নির্মম উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়েছেন। বাহ্যিক অচেতন অথচ অধিকমাত্রায় আত্মসচেতন এই কবি তাঁর দিনরাত্রি কাটিয়েছেন দেশের যে কোনো চিন্তানায়কদের মতোই। জনসাধারণের জন্ত অসীম মমত্ববোধে উদ্দীপিত তাঁর কবিতাগুলি তাদের রক্ষাব্যূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলতে ইচ্ছে করে তিনি মানুষের জন্তে আগুন এনেছিলেন। যারা ঘুমিয়ে আছে, যারা বিধায় আচ্ছন্ন তাদের জড়তাকে পুড়িয়ে তাদেরকে সংগ্রামী মানুষে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অগণিত শৃঙ্খলিত জনতা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শোষণের কবল থেকে মুক্তি পাক। এর জন্তে তাঁর কবিতা সবকিছু করতে রাজী ছিল। এদিক থেকে তাঁকে খানিকটা প্রমিথিসূসের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। সমগ্র মানুষের মঙ্গলের জন্তে তিনি বিপ্লবের আগুন এনে দিয়েছিলেন। পরিণামে তাঁকে আত্মক্ষয়ে অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। সাময়িক আবদ্ধতার নাগপাশের অন্ধকারে নয়, চিরকালীন অন্ধকারে অতি অল্প বয়সেই ডুবতে হয়েছে তাঁকে এর বিনিময়ে।

‘কবি সুকান্ত’ সাধারণ কবি-জীবনী তা আগেই বলেছি। তাঁর কবিতার সমালোচনা নয়। আবার একেবারেই যে সমালোচনা নেই তাও নয়। কিছু কিছু নতুন ঘটনার চমৎকারিত্ব ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টির নয়তায় বইটি পাঠকালে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও আবার মনে হয়েছে যে কবির কবিতা-কে বাদ দিয়ে কী করে কবি-জীবনী গঠিত হয়! কবি-জীবনী কেবলমাত্র কবির জীবনের ঘটনা বা রচিত কবিতাগুলির কালপঞ্জী নয়। সমগ্র নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সজীবতায় এবং ব্যাখ্যার সাহসিকতায় এবং গভীর উপলব্ধিতে যদি বক্তব্য না এগিয়ে আসে তাহলে কবি-জীবনের তাৎপর্য গভীরতা লাভ করে না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের আজ পর্যন্ত কোনো অবিসংবাদী না-হোক অন্ততঃপক্ষে

কোনো নৈর্যাত্তিক মূল্যায়ন হয়নি। বা করার চেষ্টা হয়েছে বলেও মনে হয় না। চোখে যা পড়েছে তাতে সাধারণতঃ চালু বক্তব্যই বলা হয়েছে। এ-ছাড়া নতুন কিছুই হাজির করা হয়নি।

‘কবি সুকান্ত’-এর লেখককে অমুরোধ জানাব অন্ততঃ পরবর্তী সংস্করণ যাতে আরো সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে। তার জন্যে যে কোনো প্রয়াসই প্রশংসনীয়।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বাংলা গল্পের শিল্পিসমাজ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম তিন টাকা চার আনা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত, ‘বাংলা গল্পের শিল্পিসমাজ’ একটি অভাবনীয় চিন্তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছে। পুস্তকের নামকরণেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট। বাংলা গল্পের সচেতন শিল্পী হিসাবে বাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সচেতন গল্প শিল্পী। তবে একথা-ও ঠিক যে গল্পশ্রষ্টা এবং গল্পনির্মাতা হিসাবে বারা সত্যিকারের সচেতন, তাঁদের দেখা পাওয়া যায়, মুখ্যতঃ, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। বিজ্ঞানাগরের হাতে বাংলা গল্পের যে দৃঢ়বদ্ধ কাঠামো গড়ে উঠল সেই কাঠামো অবলম্বন করেই পরবর্তীকালের গদ্যশিল্পীরা নৌধ নির্মাণ করলেন। বিজ্ঞানাগরের হাতে বাংলা গদ্যের বাধুনি আটসাঁট হল বটে, কিন্তু সচেতন শিল্পীর মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, তাকে গড়ে পিটে, রঙ চড়িয়ে, সমস্ত দিকেই উজ্জ্বল করে তুললেন বঙ্কিমচন্দ্র। বলাবাহুল্য, যে সমস্ত গদ্যকারদের সম্পর্কে এই গ্রন্থবর্তী, সেই সমস্ত গল্পকার কোনো-না কোনো দিক দিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। বর্তমান কালের গল্পরীতির সম্যক পরিচয় জানতে হলে, অতীতের দিকে দৃষ্টিপাতের বিশেষ প্রয়োজন। শুধু অধ্যাপক বা ছাত্র কেন, বাংলা সাহিত্যরসিক প্রত্যেকের পক্ষেই এই গ্রন্থটি তাই মূল্যবান সহচর হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে আরম্ভ করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত গল্প-শিল্পীদের গল্পরীতির যে ধারাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে আলোচনার রীতি এবং তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে উপযুক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন গল্পরচয়িতার গল্পরীতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা, এই

পুস্তক থেকে আমরা পেতে পারি। ভাষা-মার্ঘ্য এবং রচনারীতির সাফল্য, এই পুস্তকের মান বৃদ্ধি করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্বতঃই মনে পড়ে। সে কথা হচ্ছে এই যে, এই বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত পূর্বজন্মের কিছু কিছু গ্রন্থ আমরা পাঠ করেছি। সে সব গ্রন্থে যে অভাব অনুভূত হয়েছে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, এই গ্রন্থে সেই বিশেষ অভাবটি পূর্ণ করেছেন ; সে অভাবটি ছিল, সহজ, সুন্দর, প্রাঞ্জল, রসধর্মী ভাষার অভাব ; যার কলে এর আগের অনেক গ্রন্থ তথ্যসমৃদ্ধ হলেও রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলা গদ্যের শিল্পী সমাজের ভূমিকাতে উক্ত শশীভূষণ দাশগুপ্ত অনেক মূল্যবান কথাই বলেছেন ; সে সম্পর্কে দ্বিমত হবার অবকাশ আমাদের-ও নেই। তবু এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আরো বেশি সংবদ্ধ, আরও বেশি মননধর্মী এবং সুদূরপ্রসারী হলে বাংলা গদ্যের আলোচনাক্ষেত্রে আর একটি নতুন পথ আমরা খুঁজে পেতুম। বাংলা গদ্যের উপর ইংরাজি সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত এবং রচনারীতিগত প্রভাব অনিবার্য ভাবেই এসেছিল ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অকিঞ্চিৎকর হলেও গদ্য রচনার ইতিহাসে জীবন্ত। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হলে গ্রন্থের মানবৃদ্ধি হত। গদ্য রচনার উপর যুগধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা হলে, তাও অনেক নতুন ইঙ্গিত বহন করে আনতো।

মৃত্যুঞ্জয় বিষ্ণালংকার সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে দৃঢ় ইঙ্গিত দান করেছেন, তা এর আগে কোথাও পেরেছি বলে মনে হয় না ; এদিক দিয়ে তাঁর সত্য-স্বীকৃতির সাহস প্রশংসনীয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের যথাযথ মূল্য নির্ধারণে তিনি গণ্ডিবদ্ধতাকে এড়িয়ে গেছেন ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই উদারতা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য ; কালীপ্রসন্ন সিংহ তো আধুনিক কালের অনেক গদ্যকারেরই গুরুতুল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমযুগের গদ্যরচনারীতির কিছু নজীর পেশ করতে পারলে বঙ্কিমের প্রারম্ভ এবং পরিণতি বুঝতে আরো সুবিধে হত।

বলাবাহুল্য, এত কথা বলবার প্রয়োজন হত না, যদি-না গ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানাতে পারতুম। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে এ গ্রন্থ উপযুক্ত মূল্য পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সুধীর করণ

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

বাংলা চলচ্চিত্রে বিষয়বৈচিত্র্যের অন্বেষণ

বাংলা চলচ্চিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য হৃদয়পরিবর্তনের দিন নিকটতর হয়ে আসছে একথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যের ঝোঁক যতকাল শুধুমাত্র চমকসৃষ্টর বাসনা থেকে চালু ছিল, ততদিন শিল্পগত পুঁজির দেউলেপনাই প্রকাশ পেয়েছে শুধু। নিতান্ত সম্প্রতি বিষয়বৈচিত্র্যের যে অন্বেষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার প্রেরণাগত উৎসসঙ্কানে নামলে দেখা যাবে, ইদানীং শিল্পভাবনাকে আর নেহাৎ নিমূল্য মনে করা হচ্ছে না। বাংলা চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের যে দান তা হল এই যে, চলচ্চিত্রকে তিনি শিল্পমূল্য দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের এযাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি নিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে। এবং হবেও। এমন কি তাঁর আগামী ছবি নিয়েও জল্পনা-কল্পনা ও কোতূহলের সীমা নেই। এদেশে এবং বিদেশে। এই সব আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা অনুধাবন করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চলচ্চিত্রের মধ্যে আমরা একটা বড়ো শিল্পসম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি। কিছুকাল আগে সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘর ছবিখানা দেখানো হয়ে গেছে। এবং যতদূর জানা গেছে, ব্যবসায়িক বিফলতার দ্বারা পরিণামের দুর্ধোগ ঘটেনি এ ছবির ভাগ্যে। এতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হল যে, বাংলা ছবির দর্শক ক্রমাগতই বরস্ক হয়ে উঠছে এবং বাস্তবিক রুচির সন্তোষ বিধানের কটু কর্তব্যে শিল্পীকে আর একান্তভাবেই আপস রচনা করতে হবে না সবকিছুর সঙ্গে।

জলসাঘর ছবির শিল্প-সাফল্যের দিকগুলো নিয়ে অবশ্য বহু বিতর্কই এতাবৎকাল শুনতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এবং এরা সকলেই গুণী, সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘর আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় দল বলেন, জলসাঘর পরিচ্ছন্ন ছবি হলেও সত্যজিৎ প্রতিভার কথঞ্চিৎ অমনোযোগী সৃষ্টি। এবং এই জন্টেই এ ছবির যতটা হৃদয়সংবেদ্য হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। তর্ক উঠেছে, সামন্ত আভিজাত্যের অনিবার্য ধ্বংসের কার্যকারণ স্তর সম্বন্ধে কিছু বা অণ্ডায় অবহেলা আছে। জমিদার বিশ্বস্তর ব্যক্তি বটে। কিন্তু তিনি একটি সমাজেরও প্রতীক। তবে ছবির চরিত্র ব্যক্তিমাত্রই। ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের দুর্ঘটনা এবং অমের সঙ্গীতলিপ্সা অর্থবান একটি পরিবারের গর্বোদ্ধত মাথাকে মাটিতে নামিয়েছে—এর বেশি কিছু সার্থকতা ছবিতে নেই। কেউ কেউ বলেছেন, জলসাঘর একটি সার্থক ট্রাজেডি। অমোঘ সমাজ-

বিবর্তনের নির্ধূর নিয়মে একদা বিস্তারিত জমিদারের সর্ববিস্তৃত মহৎ পতন একটি গভীর ট্রাজেডি। সময়ের স্রোতের উজানে চলতে গিয়ে একটি মানুষ, নিজের শ্রেষ্ঠ ও মহত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও ধ্বংস হয়ে গেল—এই থেকেই এ ছবির ট্রাজেডি সৃষ্টি হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত জটিল বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কোনো এক মতামতকে প্রতিষ্ঠা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু লক্ষ্য করা যে, ইদানীং বাংলা ছবির বিচার-বিশ্লেষণে মননশীলতার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে এবং শিক্ষিত-দৃষ্টি চিত্রদর্শকদের মন আজ আর মেকীতে তৃপ্ত নয়। তাঁরা ভাবতে চান, ভাবতে চান, তর্ক করেন, হয়তো কুতর্কও করেন, কিন্তু সব মিলিয়ে ছবির কাছে তাঁরা অনেক বড়ো প্রত্যাশা নিয়ে উপস্থিত।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি ছবির কথা এখানে উল্লেখ করা চলে। মরুতীর্থ হিংলাজ ও নীল আকাশের নীচে। ছবিদ্বটির ভালো-মন্দ নিয়ে উভয় পক্ষীর সমালোচকেরই নিরতিশয় তীব্র মতামত শোনা গেছে। কিন্তু এক বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, দুটি ছবির ভিত্তিই হচ্ছে—মানবিক আবেদন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবতাবোধকে গ্রহণ করা নিঃসন্দেহেই দুঃসাহসিক। মরুতীর্থ হিংলাজে একদল তীর্থযাত্রী অতিসাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে অনন্যসাধারণ মানবহৃদয়ের সন্ধানই বোধকরি মুখ্য কথা। আর নীল আকাশের নীচে ছবিটিতে স্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে একটি চীনবাসীর সঙ্গে ভারতবাসীর আত্মার ঘনিষ্ঠ যোগের মাধুর্যটুকু। ছবি কেমন হয়েছে, সে বিচার অবশ্যই বড়ো। কিন্তু কি নিয়ে ছবি উঠছে, সে কথাও নিশ্চয়ই একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বিশেষতঃ, নকশাকাটা অতিনাটকীয় অন্তঃসারশূন্য আপাত প্রেমাতিনয়ের ছবি তুলতে পারলেই যখন কাঞ্চনগত সিদ্ধি প্রায় নিশ্চিত, তখন বিষয়বস্তুগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এগিয়ে আসার এই সংসাহসটুকুকেই বা আমরা মর্যাদা দেব না কেন।

অবশ্য ছবির বিচার করতে হবে সামগ্রিক ভাবেই। এবং সে বিচারে ছবি দুটি যে নিতান্ত সাধারণ, সে-কথা বলতে দ্বিধা থাকা সঙ্গত নয়। মরুতীর্থ হিংলাজে মরুভূমির পটভূমি বাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি। অতি পোষমানা বাপুতটের ওপর কটি চরিত্রের সাধ্যানুযায়ী অভিনয় প্রয়াস কোনোভাবেই শিল্প-সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত একটি ছরছাড়া রোমাটিক প্রেমের নিশ্চিন্ত রোমন্থন এবং পরিশিষ্টে অবধূতি বীভৎস রস পরিবেশন করে

বাজি মাতের চেষ্টা হয়েছে। যে শুভ সম্ভাবনার আশ্বাস নিয়ে ছবির শুরু, সমাপ্তিতে তা ঠুই-কতগুলি ছায়া-পুতুলের যথেষ্টাচার ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠতে পারলো না। মরুভূমিই যে ছবির প্রধান চরিত্র সে ছবিতে যদি মরুভূমির বাস্তবতাই না আসে তবে ঐ পটভূমিতে মানুষের আচরণগুলি বিসদৃশরকম হাস্যকর ঠেকে। বিষয়বস্তু ও পরিবেশের অভিনবত্ব সত্ত্বেও মরুতীর্থ হিংলাজ ব্যর্থ ছবি। এই ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক।

আরো বেদনাদায়ক নীল আকাশের নীচে। পরিচালক যুগল যেন তরুণ এবং ঐর কাছে আমাদের প্রত্যাশা প্রচুর। বলাবাহুল্য বিষয়বস্তুর মধ্যে উদার মানবতা বোধ সত্ত্বেও নীল আকাশের নীচে আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখলো। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এ আলোচনাটি স্বভাবতঃই সংক্ষিপ্ত। তবু এ ছবি সম্বন্ধে দু-একটি বক্তব্য উপস্থিত করা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। প্রথমতঃ, এছবির সবচেয়ে বড়ো ভ্রুটি, কালানৌচিত্যদোষ। ছবির প্রারম্ভে লং শটে যে কলকাতাকে দেখি, তা হালের কলকাতা। আজকের কলকাতায় যদিবা স্কুটার চলে, ছবির কলকাতায় তাকে উল্ল রাখাই সম্ভব ছিল। ছবির নায়িকা একাধীন নায়িকা ও রাজনৈতিক কর্মীর পোশাকে উপস্থিত হয়েছেন। নায়ক স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই একক। স্বদেশে ফাঁকা একটি টিলার ধারে তার নিঃসঙ্গ চাষী জীবন। এবং কলকাতায়ও ছাতাওয়ালা গলিতে স্বদেশী মানুষদের মধ্যেও সে একান্ত বিদেশী! ভারত-চীন মৈত্রীর ব্যাপারটা যদিও হৃদয়গ্রাহী, তবুও নেহাৎ প্রচারধর্মিতাকে কিছুটা সংযত করা প্রয়োজন ছিল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের শটগুলি যোজনা করে এছবির কি মূল্য বাড়লো তাই আমাদের অবোধ্য। ছাতাওয়ালা গলির যে বিচিত্র জীবনযাত্রা, তাকেও কি যথেষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না? বিজ্ঞাপনের ছবিটিকে চিত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টাটাকে বড়ো বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতীকী দ্যোতনা। আনবার জন্তে এই সব কাঁচা কাজ ছবিতে বর্জিত হওয়াই সম্ভব। আসলে, বক্তব্য থাকলেই ভালো ছবি হয় না। কী ভাবে সে বক্তব্যকে বলা হবে, তার ওপরও ছবির শিল্পসাফল্য নির্ভরশীল। শুল হার্দ্য উপকরণ বিতরণ করে স্বদেশে বিদেশে সুপ্রচুর প্রশংসা মিললেও তা শিল্প হয়ে ওঠে না।

অথচ আমরা দুই-ই চাই। চাই এমন বিষয়বস্তু যা আমাদের ভাবনাবৃত্তের পরিচয় দেবে বাড়িয়ে এবং এমন শিল্প-আঙ্গিক যা অনায়াস শিল্প হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ,

এ সেই চিরন্তন আদিক ও বিষয়বস্তুর সমস্ত। শিল্পীর পক্ষে এ সমস্তা চিরকালের সমস্তা।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাঙালী চিত্রনির্মাতাদের দৃষ্টিকোণ পালটাচ্ছে—এটাই সব থেকে আশার কথা। নির্মায়মান ও মুক্তিপ্রতীকিত যে কটি ছবি সম্বন্ধে আমরা এখন থেকে যথেষ্ট প্রত্যাশা পোষণ করছি, তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের ‘অপূর সংসার’, দেবকী বসুর ‘সাগর সঙ্গমে’ রাজেন তরকদারের ‘গঙ্গা’ এবং ঋদ্রিক ঘটকের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’। আমরা বিশ্বাস রাখি, চ্যাম্পিত্রকে শিল্পমূল্যে গরীয়ান করে তুলতে এঁদের প্রয়াস নিঃসন্দেহেই মূল্যবান। সাময়িক ব্যর্থতা, অর্থান্ধকুল্যের অভাব ও পরিবেশের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নিষ্ঠাবান শিল্পীর অধ্যবসায়ী সততার মূল্য কোনোক্রমেই ছোট নয়। তাই আজ একথা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলতে পারা যায়, বাস্তব ছবির জগতে আজ সত্যি সত্যি এক নবজাগৃতির সূচনা দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন সহৃদয় সহানুভূতি দিয়ে এই জাগৃতিকে ব্রহ্মাণ্ডিত করা।

নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়

পাঠকদের প্রতি

কলকাতার বাজারে ছাপার কাগজ যে কেবল দুর্মূল্যই নয়, দুপ্রাপ্য ও বটে, একথা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ওপর বেশ মোটা রকম সেলামী না দিতে পারলে কাগজ মেলে না। আবার সেলামী দিতে রাজী থাকলেও যে কাগজ পাওয়া যাবেই এমন নিশ্চয়তাও নেই। এই হল বর্তমানে কাগজ বাজারের অবস্থা। এই সংকটের মধ্যে পড়ে ‘নতুন সাহিত্য’র মাঘ-চৈত্র সংখ্যা বেরুতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হল। পাঠকরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা করবেন। বলা বাহুল্য, কাগজ সমস্যার আন্ত সমাধান না হলে, ভবিষ্যতে এধরনের বিলম্ব ঘটলে পাঠকরা বিম্বিত বা দুঃখিত হবেন না।

কার্যধ্যক্ষ—‘নতুন সাহিত্য’

• দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য সঙ্গী •

আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হ্যানা স্টোন

ডাঃ আব্রাহাম স্টোন

দুজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের লেখা যৌন-বিজ্ঞান বিষয়ক এই তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ বইখানি নানা কারণে অভিনব ও মৌলিক। আগাগোড়া প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে লেখা এই সুবৃহৎ বইখানিতে যৌন ও দাম্পত্য সমস্তাগুলি অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহের যোগ্যতা, জীবনতত্ত্বের ভূমিকা, শারীরস্থান ও শরীরবৃত্ত, সন্তানধারণ ও সন্তানপালন, পরিবার পরিকল্পনা, উর্বরতা ও অনূর্বরতা, বিবাহের কলাকৌশল, যৌন সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, আদর্শ বিবাহ ও অন্যাগত বহু প্রসঙ্গ বিচক্ষণতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বইখানির ইংরেজি সংস্করণ লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদ এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল। ডবল ডিমাউই সাইজে মুদ্রিত প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই। সচিত্র সংস্করণ। দাম ছয় টাকা। ভি-পি ডাকে সাড়ে ছয় টাকা।

গগুলার বুক ক্লাব

৩, শমুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট .

কলিকাতা-২০